উচ্চ মাধ্যমিক

জীবন বিজ্ঞান

শঙ্কর প্রসাদ মাইতি
বিষ্ণুপদ প্রধান

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (West Bengal Higher Secondary Council) প্রদত্ত জীবন বিজ্ঞানের নূতন পাঠ্যসূচী (Session 1985-86, Exam. 1987) অনুসারে লিখিত।
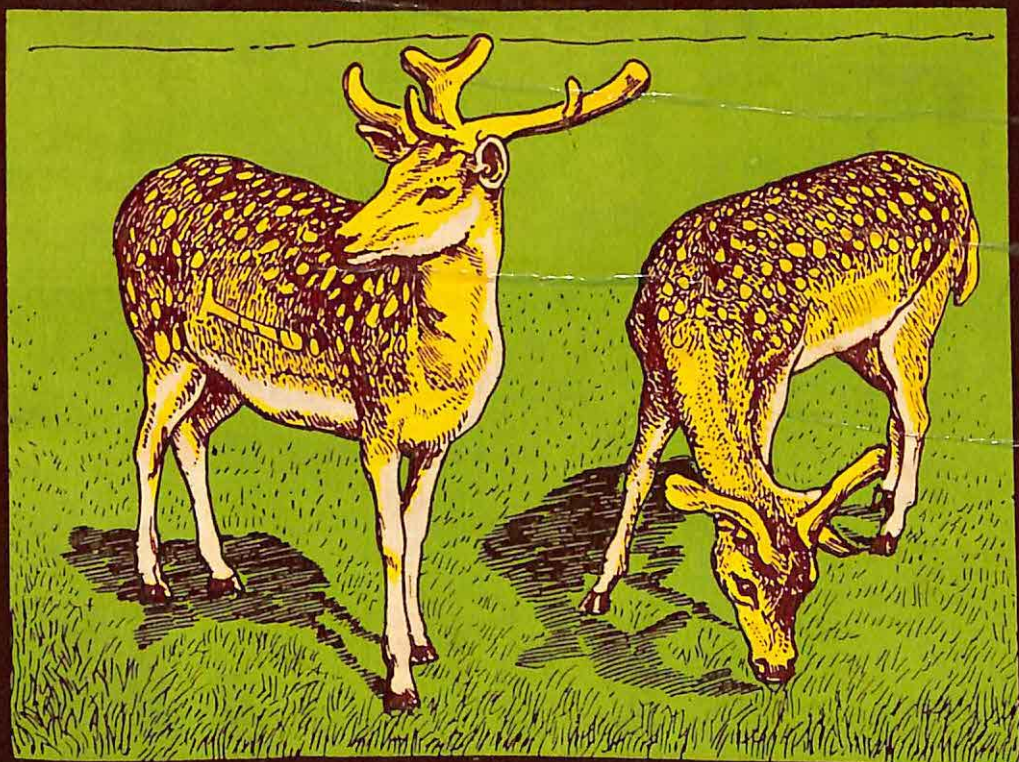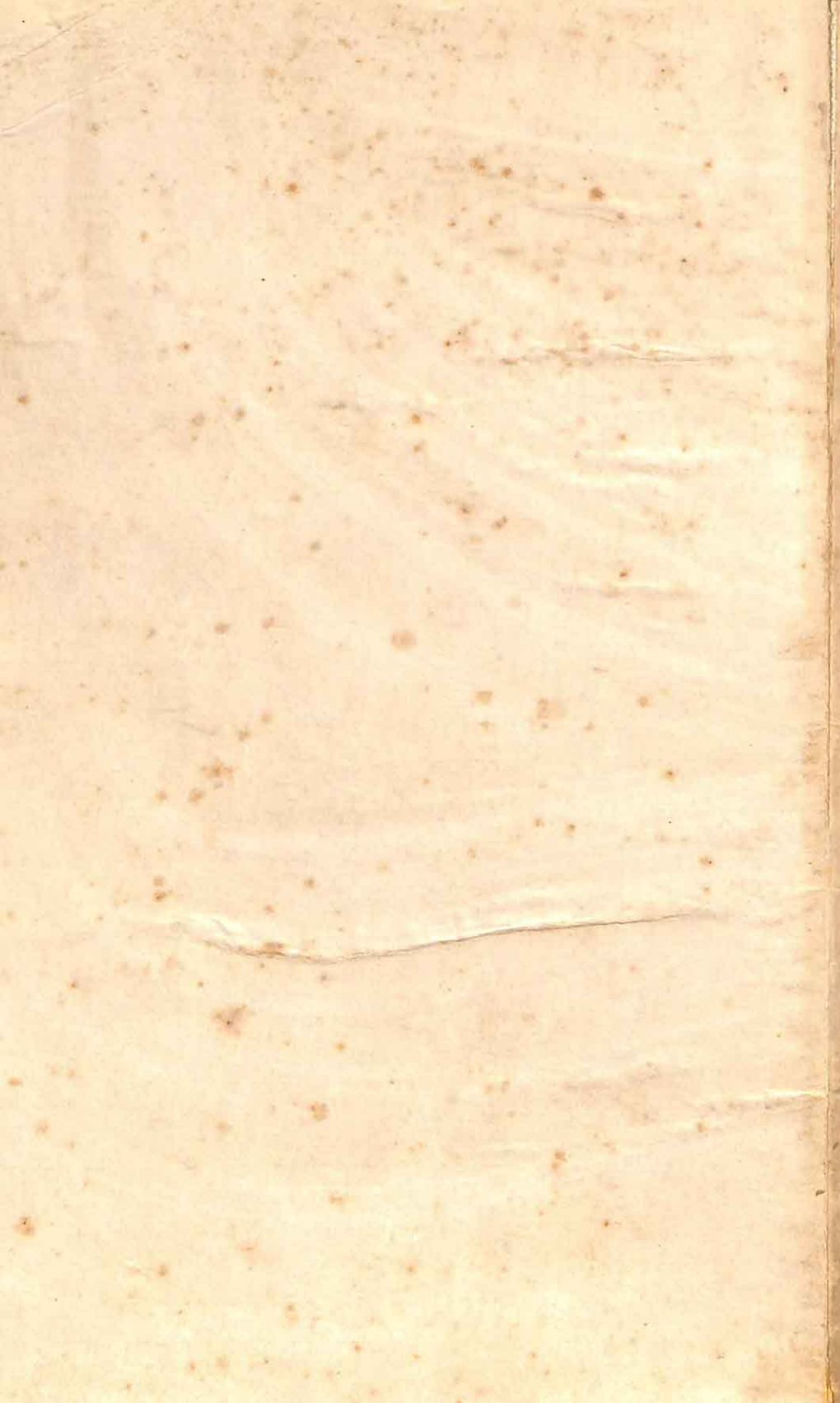
উচ্চ মাধ্যমিক

জীবন বিজ্ঞান

[একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য]

ডঃ শঙ্কর প্রসাদ মাইতি, এম্. এস্-সি., পি-এইচ্. ডি.

॥ বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ,
ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজ, কলিকাতা ॥

অধ্যাপক বিষ্ণুপদ প্রধান, এম্. এস্-সি.

॥ প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি ॥
॥ প্রাক্তন শিক্ষক, সাতমাইল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
এবং সাবাজপুট সম্বোধি শিক্ষাতীর্থ, মেদিনীপুর ॥

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

সেন্ট্রাল পাবলিশিং কনসার্ণ
৮/১ চিন্তামণি দাস লেন • কলিকাতা ৭০০০০৯
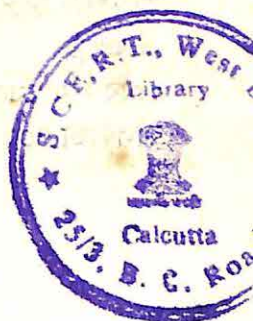
প্রথম মুদ্রণ—আগস্ট, ১৯৮৫

প্রকাশক :
এন. কে. রায়
১০ গ্যালিফ স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৩

মুদ্রণে :

● দি অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ বিধান সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

● লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

● অঙ্কুর
৩০বি সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

দাম ৩০'০০ টাকা

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রবর্তিত জীবন বিজ্ঞানের সংশোধিত পাঠ্যক্রম নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য ও এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের অনুপ্রেরণায় আমরা পুস্তকখানি রচনায় হাত দিয়াছি। দীর্ঘ দিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাকে মূলধন করিয়া পুস্তকখানি রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। পুস্তকটির ভাষা সহজবোধ্য, সরল ও প্রাঞ্জল। পুস্তকটিতে যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় চিত্র এবং আধুনিক তথ্য ও তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু ছাত্র-ছাত্রী ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীদের জন্য পুস্তকটির স্থানে স্থানে পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত অথচ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। বিভিন্ন পুস্তকে কোষবিদ্যা ও ক্রোমোজোম সম্বন্ধে বিভিন্ন মাপ ও তথ্য থাকায় ঐ সকল অংশ রচনাকালে প্রধানত Derobertis, Saez and Derobertis ; Swanson ; Sharp প্রমুখ বিখ্যাত লেখকের পুস্তকের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বিষয়-সংক্ষেপ, পরিশিষ্ট, সংসদের নমুনা প্রশ্ন অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত ও রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী এবং বংশগতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রথম মুদ্রণে কোন পুস্তক সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি বা মুদ্রণ প্রমাদ থাকা অসম্ভব নহে। মানুষ মাত্রেই ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়, আমরা তো নয়ই। তাই বর্তমান সংস্করণে যে সকল অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আছে, পরবর্তী সংস্করণে যাহাতে ঐগুলি সংশোধিত হয় সেই বিষয়ে আমরা যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিব। এই বিষয়ে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণের সহযোগিতা ও মনোজ্ঞ সমালোচনা কামনা করি। পরিশেষে, যাহাদের জন্য পুস্তকখানি রচিত তাহাদের কিঞ্চিৎ উপকারে লাগিলে আমাদের শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব। ইতি—

২৭শে আগস্ট, ১৯৮৫
কলিকাতা

গ্রন্থকারদ্বয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

উচ্চ মাধ্যমিক জীবন-বিজ্ঞান পুস্তকটি রচনা করিবার প্রাক্কালে যে সকল শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁহাদের সুচিন্তিত পরামর্শ, উৎসাহ, উদ্দীপনা, অমূল্য উপদেশ ও তথ্য সরবরাহ করিয়া পুস্তকটিকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। সকলের নাম প্রকাশ করিতে না পারায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে এই বিষয়ে যাঁহাদের দান উল্লেখযোগ্য তাঁহারা হইলেন—

প্রফেসর গোবিন্দ কিশোর মান্না, প্রফেসর অশোক কুমার বসু, ডঃ বনবিহারী জানা (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়), প্রফেসর শ্যামাপদ সেন (উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ আশিস কুমার দত্তগুপ্ত (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ অমৃতাভ দাস (কালিন্দি হাই স্কুল), ভবানীশংকর ডিঙ্গাল (কাঁথি মডেল ইনস্টিটিউশন), গোপালচন্দ্র গুছাইত (রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন), অধ্যাপক গৌরহরি গিরি, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, খগেশ্বর দাস (প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি), অধ্যাপক কাশীনাথ কয়াল (বিজয় নারায়ণ কলেজ, হুগলী), অধ্যাপক সত্যপ্রসাদ চ্যাটার্জী, অসিতেন্দু রায়চৌধুরী (ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজ), যামিনীকান্ত সেন, সেণ্ট্রাল পাবলিশিং কনসার্ণের শ্রীমতি প্রতিমা সেন, অতনু সেন এবং কর্মীবৃন্দ।

BIOLOGICAL SCIENCES

SYLLABUS

PAPER—I

Full Marks—70

1. Biological Sciences—Introduction.
2. Cell structure :
   (a) Prokaryotic cell : Definition and examples—Bacterium & Blue-green alga

   (b) Eukaryotic cell : Definition and examples—Plant cell and animal cell ;

   Structure in out line and functions (in brief) of the following—cell wall and cell membrane, cytoplasm, vacuoles, membrane bound organelles i.e. nucleus, ribosomes, plastids and golgi bodies. Mention only—endoplasmic reticulum, mitochondria, lysosome, centriole and microtubules.

   Ergastic substances—starch grains, glycogen, fat droplets, zymogen grains.

   (c) Differences between Prokaryotic and Eukaryotic cells ; mention only

   (i) plastids, (ii) nuclear membrane and (iii) chromosome.

   (d) Functions : diffusion, osmosis, water and ion absorption (mechanism of ion absorption is not required).

3. (a) Structure of chromosome—mentioning chromatids, centromere, matrix, gene, chemical nature of DNA & RNA (detailed structure and chemical composition not required).

   (b) Cell division : examples—plant and animal cell.

   (i) Amitosis

   (ii) Mitosis and its significance

   (iii) Meiosis (out line idea about stages and substages) and its significance.

4. Tissue : General idea about tissues in plants and animals—out line only.

   (a) Plant tissues—occurrance, functions and classification,—meristematic and permanent, simple and complex.

   (b) Animal tissues—occurance, functions, and out line idea of epithelial, connective, muscular, nervous and secretory tissue.

   Blood as a fluid connective tissue : (mention only) its components—plasma, types of blood cells, haemoglobin and haemocyanin.

5. Elementary idea about life processes.
   A. Transpiration : Definition, factors (mention only) ; One simple experiment showing transpiration.
   B. Photosynthesis : Components—CO_2 and H_2O (with their sources), chlorophyll and sunlight ; mechanism—out line of light and dark reactions ; brief idea of entrapping of solar energy by chloroplasts (names of enzymes not required) ; significance of photosynthesis.
   C. Respiration : Fundamental process—external and internal respiration (site of respiration) ; aerobic respiration anaerobic respiration and fermentation—(outline of the processes, mentioning respective end products) ; Glycolysis [mention—hexose—triose—pyruvic acid—acetyl CoA—Krebs' cycle (mention only CO_2, H_2O and release of energy].
   D. Nutrition : (a) Autotropic—definition, sources of raw materials, macro- and micro-nutrients (mention only).
      (b) Heterotropic—definition, types and sources of food—Carbohydrate, Protein, Fats and oils, vitamins and minerals. (Details and chemical composition not required). Significance of nutrition.
   E. Circulation : Principles of circulation in plants and animals (details not required) ; structures concerned (mention only).
   F. Excretion : Principles of excretion in plants and animals —mention excretory products of plants and animals.
   G. Growth : Definition, factors controlling growth in plants and animals (mention only) ; differences between growth of plants and animals.
   H. Movement : Types of movement
      (a) Movement in plants—
         (i) Tactic :—chemo.— and thermo.— ;
         (ii) Tropic :—photo.—, geo.— and hydro.—
         (iii) Nastic : seismo.— and nycti.—
      (b) Movement in animals—
         (i) Terrestrial—man (bipdeal locomotion only)
         (ii) Aquatic—fish,
         (iii) Aerial—pigeon
         [Structure and mechanism not required]

I. Reproduction ; Asexual and sexual—differences only ; units of sexual reproduction ; iso —, aniso— and co-gamous types ; outline of the process of fertilisation—union of gametes leading to zygote formation. General idea about alternation of generations. (Out line only).
Mention one example in plant and one in animal.

6. Hormones : Definition :
   (a) Plant hormones :—auxine—role in growth, phototropic and geotropic movements ; role in agriculture (mention Indol acetic acid, chemical formula not required).
   (b) Animal hormones :—position of glands—pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal, testis & ovary—
   Pituitary—ACTH, STH, TSH, (GTH) & ADH
   Thyroid—Thyroxin
   Adrenal—Adrenalin
   Testis—-Androgen
   Ovary—Oestrogen
   [Mention respective functions ; histology of glands and chemical composition of hormones not required.]
7. Heredity : Definition, Mendel's experiment, mono-hybrid and dihybrid cross (cite one example from plant and one from animal) ; Mendel's law.
8, Evolution : Definition, evidences—morphological, palaeontological (mention only Archaeopteryx) and embryological (ontogenesis not required),
   [Evidences in out line only]
   Theories of Darwin, Lamarck & De Vries (in brief).
9. Taxonomy : Brief idea about principle and basis of classification, Binomial nomenclature.
10. (a) Eco-system : Explanation : General idea about food chain and energy flow.
   (b) Conservation—definition ; conservation of soil, water, forest and animals (example—Rhinoceros in West Bengal),
   (c) Pollution—in reference to human being
   (Mention air, water and noise)
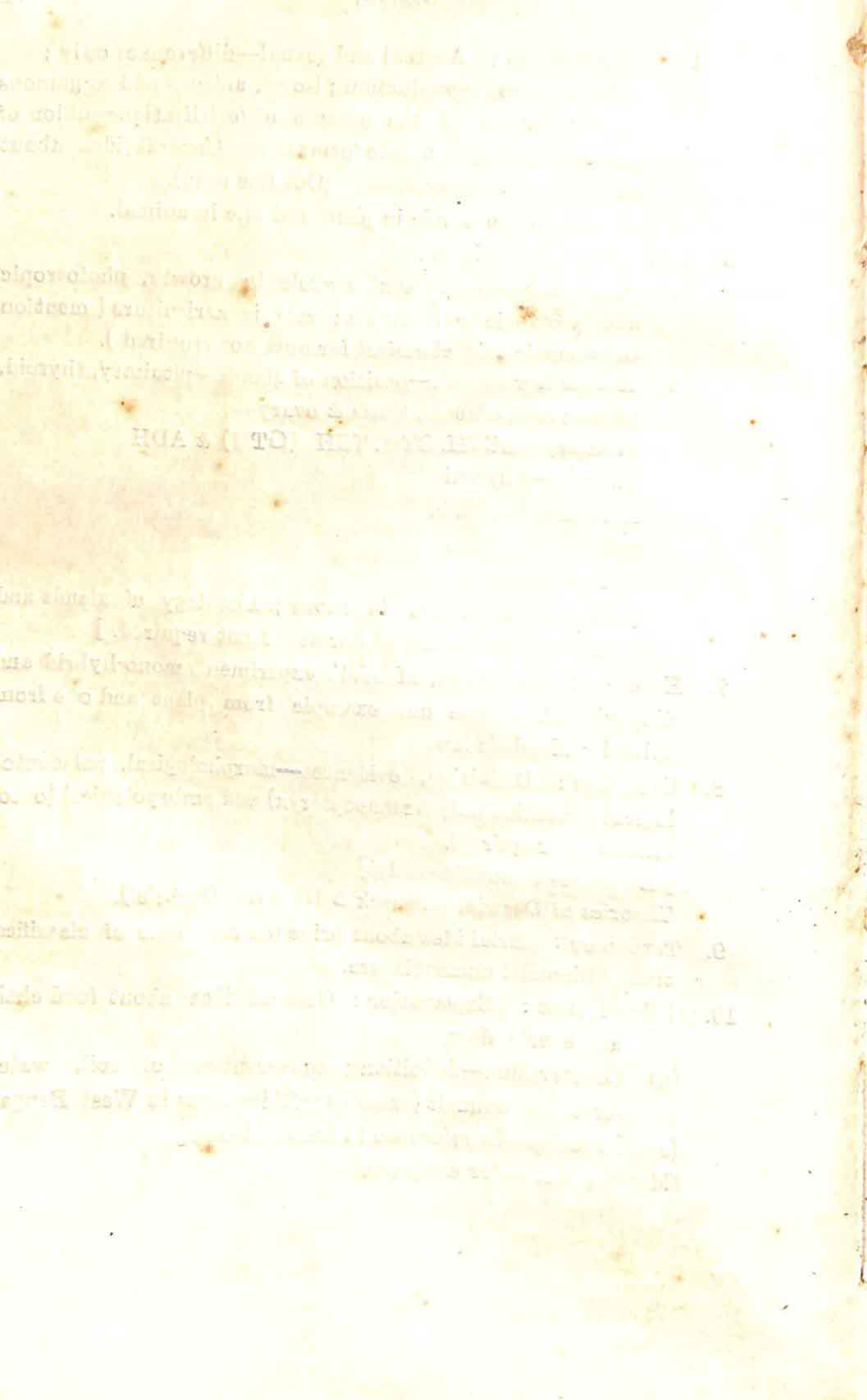
প্রথম অধ্যায় / জীবন বিজ্ঞান এবং উহার শাখা

1.1 জীবন বিজ্ঞান কি? (What is Biology?) : বিজ্ঞান কথার আক্ষরিক অর্থ বিশেষ জ্ঞান। পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণকে বিজ্ঞান বলে। বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণীর আকৃতি, গঠন, গতিপ্রকৃতি, পারস্পারিক সম্পর্ক, পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতি জীবনযাত্রার নিগূঢ় তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাহাকে জীবন বিজ্ঞান বলে। 1801 খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী জ্যঁা ব্যাপটিস্ট ডি মনেট ল্যামার্ক (Jean Baptiste de Monet Lamarck) 'বায়োলজি' কথাটি প্রচলন করেন। গ্রীক শব্দ বায়োলজির অর্থ *Bios*=life (জীবন), *Logos*=knowledge (জ্ঞান)। অর্থাৎ জীব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জনই জীবন বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয়।

উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের গঠন-কাঠামো ও জীবনক্রিয়ার (Life process) মৌলিক ধরন যে একই তাহা সম্যকভাবে উপলব্ধি করাই জীবন বিজ্ঞান অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য। তবে বিভিন্ন জীবের গঠন-প্রকৃতি, জীবনযাত্রার প্রণালী, বাসস্থান প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন সকল জীবের মধ্যে পুষ্টি, শ্বসন, রেচন, প্রোটিন সংশ্লেষ প্রভৃতি ঘটে, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের ক্ষেত্রে এই সকল পদ্ধতির পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়।

1.2 জীবন কি? (What is life?) : বিশাল এই পৃথিবীর জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে বিচিত্র রকমের জীব বসবাস করে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই জীবদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রমাণ করে। কিন্তু জীব বলিতে কি বুঝায়? এক কথায় যাহাদের জীবন আছে তাহারাই জীব। এখন মূল প্রশ্ন হইল 'জীবন কি?' সত্যি কথা বলিতে কি, ইহার সঠিক উত্তর দেওয়া আজও সম্ভব হয় নাই। কিন্তু আমরা জীবের সঙ্গে জড়ের পার্থক্য সহজে উপলব্ধি করিতে পারি। যেমন গরু, কুকুরের সঙ্গে ইট, কাঠের প্রভেদ সহজেই বুঝিতে পারি। অর্থাৎ গরু, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীর সজীবতার লক্ষণ দেখিয়া আমরা উহাদের জীব বলিব কিন্তু ইট, কাঠ প্রভৃতি বস্তুর মধ্যে ঐসব লক্ষণের অনুপস্থিতির জন্য উহাদের জড় বলিব। ইহা ব্যতীত জীব ও জড়ের গঠনগত বা সংগঠক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। যাই হোক, জীবনের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা বিজ্ঞানীগণ প্রণয়ন করিতে না পারিলেও 'জীবন কি' তাহা নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির দ্বারা বুঝা যাইতে পারে।

(i) জীবের বিভিন্ন অঙ্গ বা অঙ্গাণুর পারস্পরিক ধারাবাহিক আন্তঃবিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশকে জীবন বলে।

(ii) বৃদ্ধি, জনন, অভিযোজন, পরিব্যক্তি, প্রকরণ, বিবর্তন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যযুক্ত কোষীয় সজীব জৈব যৌগের বহিঃপ্রকাশকে জীবন বলে।

(iii) ডক্টর এস্. পি. সেনের মতানুসারে 'জীবন হইল কতকগুলি বিক্রিয়কের মধ্যে একপ্রকার ভৌত-রাসায়নিক সাম্যাবস্থা যাহা নির্দিষ্ট কতিপয় শর্তের উপস্থিতিতে কার্যকর হয়'। (Life is a type of physico-chemical equilibrium among a number of reactants in a certain set of conditions.)

1.3 **জীবের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of living objects) :** চারিটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখিয়া জীবকে সহজেই জড় পদার্থ হইতে পৃথক করা যায়। নিম্নে এই সকল বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা হইল।

1. **বার্তা বা সংকেত সঞ্চয় ও স্থানান্তরের ক্ষমতা (Capacity to store and transfer information) :** প্রতিটি জীবের মধ্যে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় বার্তা বা সংকেত বিদ্যমান এবং এই সংকেত স্থানান্তরের মাধ্যমে জীবের বিভিন্ন জৈবনিক কার্য সম্পাদিত হয়। যেমন, প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় সংকেত কোষমধ্যস্থ DNA হইতে RNA সৃষ্টির মাধ্যমে আসে এবং এই RNA, রাইবোজোম ও অন্যান্য উপাদানের সহযোগিতায় কোষের মধ্যে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। শুধু তাহাই নহে, প্রোটিন সংশ্লেষের এই বার্তা DNA-এর মাধ্যমে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। আবার এই সংশ্লেষিত প্রোটিন হইতে জীবের বিভিন্ন উপাদান (উৎসেচক—হর্মোন, অ্যান্টিবডি প্রভৃতি) তৈয়ারী হয় যাহারা বিভিন্ন জৈবনিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। শুধু তাহাই নহে, জীবের আকৃতি, গঠন, বৃদ্ধি প্রভৃতি এই সকল উপাদানের উপর নির্ভরশীল। এই সকল উপাদান বা উহাদের সূচিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে কোন অংশ ত্রুটিপূর্ণ বা বিঘ্নিত হইলে সমগ্র পদ্ধতির ব্যাঘাত ঘটে।

2. **শক্তি সঞ্চয় ও স্থানান্তরের ক্ষমতা (Capacity to store and transfer energy) :** প্রতিটি জীবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল শক্তি সঞ্চয় করা। প্রতিটি জীব কোষস্থ খাদ্যবস্তুর মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং শ্বসনে এই শক্তি ATP বা রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যাহার দ্বারা জীব বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করিতে পারে। আবার একটি জীবকে অপর জীব খাদ্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করিলে প্রথমোক্ত জীবের মধ্য দিয়া শক্তি শিকারীজীবে স্থানান্তরিত হয়।

3. **সংগঠন (Organisation) :** প্রতিটি জীবের একটি নির্দিষ্ট সংগঠন বিদ্যমান। এককোষী জীবের দেহ একটিমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত। অপরপক্ষে, বহুকোষী জীবের দেহে কোষগুলি সুবিন্যস্ত হইয়া বিভিন্ন প্রকার কলা (Tissue) গঠন করে। অনুরূপভাবে, কতকগুলি কলা একত্রে অঙ্গ বা যন্ত্র (Organ) এবং কতকগুলি অঙ্গ সংযুক্ত হইয়া তন্ত্র (System) গঠন করে। আকার, আকৃতি এবং কার্যের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্রগুলি পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জীবদেহের সকল প্রকার কার্য সম্পন্ন করে।

4. **পরিব্যক্তিতা (Mutability) :** জীবদেহের বংশাণুগুলির (জীন) হঠাৎ পরিবর্তনকে **পরিব্যক্তি** (Mutation) বলে। পরিব্যক্তি ঘটানোর ক্ষমতাকে

পরিব্যক্তিতা বলে। পরিব্যক্তি অনেক সময় ক্ষতিকারক হইলে ইহার দ্বারা নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। তাই পরিব্যক্তি জৈব বিবর্তনের একটি প্রধান কাঁচামাল।

উল্লিখিত প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যতীত জীবের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :

1. **আকার ও আয়তন (Shape and Size) :** প্রত্যেক জীবের একটি নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে। যেমন আম, জাম, বট, ধান প্রভৃতি উদ্ভিদ কিংবা মানুষ, ব্যাঙ, মাছ প্রভৃতি প্রাণীর একটি নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন বিদ্যমান। শুধু তাহাই নহে, একটি জীবের আকার ও আয়তন অপর জীবের মত হয় না—অর্থাৎ কোন জীবের আকার কিংবা আয়তন সুনির্দিষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, ধানগাছের আকৃতি কখনও বটগাছের মত অথবা মাছের আকৃতি কখনও মানুষের মত হয় না।

2. **জীবপঙ্ক বা প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) :** (গ্রীক শব্দ *Protos*= প্রথম, Plasma=জীবন) উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষ মধ্যস্থ সজীব পদার্থকে **প্রোটোপ্লাজম** বলে। ইহা প্রায় অর্ধ-স্বচ্ছ, বর্ণহীন, দানাদার, থকথকে কলয়ডাল, আঠালো জেলির ন্যায় পদার্থ। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে সর্বদা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে—অর্থাৎ ইহার মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সেইজন্য প্রোটোপ্লাজমকে 'জীবনের ভৌত ভিত্তি' (Physical basis of life) বলা হয়। প্রোটোপ্লাজম অতি জটিল পদার্থ এবং ইহার সঠিক রাসায়নিক উপাদান নির্ণয় করা খুবই কঠিন। কারণ রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে বিশ্লেষণ করিলে ইহা মরিয়া যায়। তবে জানা গিয়াছে যে প্রোটোপ্লাজম জল, শর্করা, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, নিউক্লিক অ্যাসিড, ভিটামিন, উৎসেচক, খনিজ লবণ প্রভৃতি পদার্থ লইয়া গঠিত।

3. **বিপাক (Metabolism) :** জীবকোষের প্রোটোপ্লাজম মধ্যস্থ সামগ্রিক রাসায়নিক বিক্রিয়াকে বিপাক বলে। ইহা জীবদেহের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিপাক দুইটি বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার সমন্বয়—একটি গঠনমূলক বা উপচিতি (Anabolism —গ্রীক শব্দ *Ana*=উপরে, *Ballo*=নিক্ষেপ করা) ও অপরটি ধ্বংসাত্মক বা অপচিতি (Catabolism—গ্রীক শব্দ *Kata*=নিচে, *Ballo*=নিক্ষেপ করা)। উপচিতি দ্বারা সরল জৈব যৌগ হইতে প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তুর সংশ্লেষ হয় এবং অপচিতি দ্বারা প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তু ভাঙিয়া সরল যৌগে পরিণত হয়॥ জীবদেহে উপচিতি এবং অপচিতি একই সঙ্গে চলিতে থাকে। উপচিতির হার অপচিতি অপেক্ষা বেশী হইলে জীবদেহের পুষ্টি ঘটে, অপরপক্ষে অপচিতির হার উপচিতি অপেক্ষা বেশী হইলে জীবদেহের ক্ষয় ঘটে। সালোকসংশ্লেষ, পুষ্টি উপচিতির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এবং শ্বসন, রেচন, ক্ষরণ অপচিতির উদাহরণ। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ বিপাক পদ্ধতি উল্লেখ করা হইল :

a. **পুষ্টি (Nutrition) :** জ্বালানি দ্বারা যেমন কোন যন্ত্র সচল থাকে তেমনই জীব খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমে সক্রিয় থাকে। খাদ্য ব্যতীত জীব বাঁচিতে পারে না। পুষ্টি বলিতে কেবল খাদ্যগ্রহণকে (Ingestion) বুঝায় না। গৃহীত খাদ্য-

বস্তুর পরিপাক বা পাচন (Digestion), পাচিত খাদ্যের শোষণ (Absorption), শোষিত খাদ্যের আত্তীকরণ (Assimilation)—অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজমের অন্তর্ভুক্তিকে বুঝায়। গৃহীত খাদ্যের সকল অংশ পাচিত হয় না, অপাচ্য বা অজীর্ণ অংশ দেহের বাহিরে নির্গত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বহিঃকরণ (Egestion) বলে। এক কথায়, জীবদেহে গৃহীত খাদ্য যে প্রক্রিয়ায় দেহজ অংশে পরিণত হয় তাহাকে পুষ্টি বলে। পুষ্টির ক্রমান্বয়িক পর্যায়গুলি নিম্নরূপ :

খাদ্যগ্রহণ→পরিপাক→শোষণ→আত্তীকরণ = পুষ্টি

b. **শ্বসন (Respiration) :** সাধারণ অর্থে শ্বসন বলিতে অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ বুঝাইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি জারণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় জীবকোষ মধ্যস্থিত খাদ্যবস্তুর ভাঙন ঘটে এবং খাদ্যস্থিত স্থৈতিক শক্তি গতিশক্তি বা রাসায়নিক শক্তিরূপে নির্গত হইয়া জীবদেহের নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় কার্য পরিচালন করে। জীবদেহের প্রতিটি সজীব কোষে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শ্বাসকার্য চলিতে থাকে। শ্বসন বন্ধ হইলে জীবের মৃত্যু ঘটে। অতএব যে প্রক্রিয়ায় জীবকোষে খাদ্যস্থ সঞ্চিত স্থৈতিক শক্তি গতিশক্তি বা রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প নির্গত হয় তাহাকে শ্বসন বলে।

c. **রেচন (Excretion) :** যে প্রক্রিয়ায় বিপাকীয় কার্যের ফলে উৎপন্ন অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থ (Waste products) জীবদেহ হইতে অপসারিত হয় তাহাকে রেচন বলে। বর্জ্য পদার্থ বা রেচন পদার্থ জীবদেহ হইতে অপসৃত না হইলে উহারা শরীরের নানাপ্রকার ক্ষতিসাধন করিবে, এমনকি মৃত্যুও ঘটাইতে পারে। কার্বন ডাই অক্সাইড, ঘর্ম, মূত্র, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি প্রাণীদের রেচন পদার্থ এবং কুইনাইন, নিকোটিন, র‍্যাফাইড, সিস্টোলিথ প্রভৃতি উদ্ভিদের রেচন পদার্থের উদাহরণ। এমনকি চিংড়ি বা পতঙ্গের খোলসত্যাগ বিশেষ প্রকার রেচন প্রক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।

d. **ক্ষরণ (Secretion) :** জীবদেহের বিশেষ বিশেষ গ্রন্থি হইতে উৎপন্ন যে-সকল আবশ্যকীয় রাসায়নিক পদার্থ শরীরের বিভিন্ন রাসায়নিক বা জৈবনিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাহাদের ক্ষরিত পদার্থ (Secretory products) বলে। যে পদ্ধতিতে এই সকল পদার্থ নিঃসৃত হয় তাহাকে ক্ষরণ বলে। ক্ষরিত পদার্থ বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় এবং উহারা শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া বিভিন্ন প্রকার কার্য সাধন করে অথবা শরীরের বাহিরে আসিতে পারে। যেমন, বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক ও হরমোন বিভিন্ন গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হইয়া দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কার্যে অংশগ্রহণ করে। আবার তৈলগ্রন্থি হইতে নিঃসৃত তৈল, গরুর দুধ, খেজুরের রস প্রভৃতি ক্ষরণজাত পদার্থ শরীর হইতে বাহিরে আসে।

4. **বৃদ্ধি (Growth) :** জীবদেহের আকার, আয়তন ও ওজনের অপরিবর্তনীয় বর্ধনকে **বৃদ্ধি** বলে। অপচিতি অপেক্ষা উপচিতি বেশী ঘটিলে জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে। ক্রমাগত কোষবিভাজন ও প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তুর সংযোজন দ্বারা জীবের

এই বৃদ্ধি ঘটে। তাই এই প্রকার বৃদ্ধিকে আন্তঃসংযোজন বা ইনটাস্সাসসেপশান (Intussusception) বলে। অপরপক্ষে জড়বস্তুরও বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু এই বৃদ্ধি কেবল জড়বস্তুর দেহে উপলেপন দ্বারা ঘটে। জড়ের এই প্রকার বৃদ্ধিকে বহিঃ-সংযোজন বা অ্যাক্রিশান (Accretion) বলে। উদাহরণস্বরূপ, ঘন চিনির দ্রবণে ডোবানো একটি চিনির কেলাসের বৃদ্ধি বা বালুয়াড়ির বৃদ্ধি। সুতরাং জীব ও জড়ের বৃদ্ধি ঘটিলে বৃদ্ধির পদ্ধতি পরস্পরের বিপরীত। ইহা ব্যতীত নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বৃদ্ধি জীবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই বৃদ্ধি অর্থে জীবদেহের বৃদ্ধিকে বুঝায়।

5. **চলন ও গমন (Movement and Locomotion)**: স্বস্থানে থাকিয়া জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়াকে **চলন** এবং জীবদেহের সামগ্রিক স্থানান্তরকে **গমন** বলে। চলন সকল জীবে দেখা যায় কিন্তু গমন কতিপয় নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ (স্লাইম ছত্রাক, ডায়াটোম প্রভৃতি) ও প্রায় অধিকাংশ প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। উদ্ভিদরা মাটির সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকায় উহারা গমনে অক্ষম। প্রাণীদের মধ্যে স্পঞ্জ, সাগরকুসুম প্রভৃতি প্রাণীরা গমনে অক্ষম। উত্তেজনায় সাড়াদান, খাদ্যসংগ্রহ, আত্মরক্ষা এবং জননের জন্য চলন ও গমনের প্রয়োজন হয়। গমনের জন্য বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদ্যমান, যেমন নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের গমনের জন্য ক্ষণপদ, সিলিয়া, ফ্ল্যাজিলা প্রভৃতি অঙ্গ এবং উচ্চতর প্রাণীদের গমনের জন্য পাখনা, ডানা, পদ প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গ বর্তমান।

6. **সংবহন (Conduction/Circulation)**: যে প্রক্রিয়ায় তরলের মাধ্যমে বিভিন্ন পদার্থ জীবদেহের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত হয় তাহাকে **সংবহন** বলে। সংবহনের মাধ্যমে খাদ্যরস, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, বর্জ্য পদার্থ ও বিপাকীয় কার্যের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন পদার্থ জীবদেহের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। উদ্ভিদের সংবহনের মাধ্যম হইল জল এবং প্রাণীদের সংবহনের মাধ্যম জল, রক্ত ও লসিকা। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীরা ব্যাপনের মাধ্যমে সংবহন সম্পন্ন করে। উচ্চস্তরের জীবদেহে সংবহন তন্ত্র বিদ্যমান। উদ্ভিদদেহে জাইলেম ও ফ্লোয়েম দ্বারা গঠিত শিরাত্মক কলাসমষ্টি সংবহনতন্ত্র গঠন করে এবং প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড, ধমনী, শিরা, জালক ও লসিকানালী একত্রে সংবহন তন্ত্র গঠন করে।

7. **উত্তেজিতা (Irritability)**: উদ্দীপকের প্রভাবে জীবের সাড়া দিবার ক্ষমতাকে **উত্তেজিতা** বলে। উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া জীবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আলো, তাপ, শৈত্য, স্পর্শ প্রভৃতি বাহিক উদ্দীপনা এবং উৎসেচক, হরমোন, ক্ষুধা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় জীব সাড়া দান করে। আলোর উৎসের দিকে কাণ্ডের বৃদ্ধি বা মথের আলো দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া, স্পর্শজনিত উদ্দীপনায় লজ্জাবতী লতার পাতা বন্ধ হওয়া বা শামুকের দেহ খোলকের মধ্যে গুটাইয়া লওয়া বিভিন্ন প্রকার উত্তেজিতার উদাহরণ।

8. **অভিযোজন (Adaptation)**: পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া জীবের সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনকে **অভিযোজন** বলে। অভিযোজন জীবের একটি সার্বিক

পদ্ধতি। পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হইতে শুরু করিয়া আজও পর্যন্ত পরিবেশের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু যুগে যুগে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিলেও সুদূর অতীতে উৎপন্ন জীবের অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। ইহার কারণ হইল পরিবর্তিত পরিবেশে অভিযোজনের জন্য জীবদেহের আকৃতিগত ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে যাহা বংশগতি দ্বারা স্থায়িত্ব লাভ করে। অতএব, অভিযোজন হইল জীবদের বাঁচিয়া থাকিবার একটি বড় হাতিয়ার।

9. **বিবর্তন (Evolution) :** যে ক্রমান্বয়িক মন্থর পরিবর্তনের ফলে সরলতম জীব হইতে জটিলতম জীবের আবির্ভাব ঘটে তাহাকে **বিবর্তন** বলে। কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে ও অল্প পরিমাণে চলিতে থাকায় জীবের সার্বিক পরিবর্তন ঘটে এবং নূতন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের সৃষ্টি হয়।

10. **ছন্দোবদ্ধতা (Rythmicity or Periodicity) :** জীবের সকল প্রকার শারীরবৃত্তীয় কার্য একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বা ছন্দে ঘটে, ইহাকে **ছন্দোবদ্ধতা** বলে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, ফুসফুসের সংকোচন-প্রসারণ এমনকি পুষ্টি, শ্বসন, বৃদ্ধি, চলন প্রভৃতি একটি নির্দিষ্ট ছন্দে পরিচালিত হয়। পদ্ম, শালুক প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্ফুটিত হওয়া, স্ত্রীলোকের নির্দিষ্ট সময় (28-32 দিন) অন্তর মাসিক চক্র ঘটা প্রভৃতি ছন্দোবদ্ধতার উদাহরণ।

11. **জনন (Reproduction) :** যে প্রক্রিয়ায় জীব নিজের অনুরূপ অপত্য সৃষ্টি করে তাহাকে **জনন** বলে। জনন দ্বারা জীবের বংশগতি ধারা অব্যাহত থাকে। পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর জীব জননক্ষমতা লাভ করে। জীবজগতে চারি প্রকার জনন দেখা যায়—অঙ্গজ জনন, অযৌন জনন, যৌন জনন ও অপুংজনি। যে-কোন পদ্ধতিতে জীবের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটুক না কেন সবসময় অপত্য জীব পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় জনিতার (Parents) আকৃতিবিশিষ্ট হয়।

12. **জীবনচক্র, জরা ও মৃত্যু (Life cycle, Senescence and Death) :** জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সময়-সীমাকে স্থিতিকাল (Duration) বলে। বিভিন্ন জীবের এই স্থিতিকাল বিভিন্ন। যেমন দেওয়ালী পোকার স্থিতিকাল কয়েক ঘণ্টা, ধানগাছের তিন থেকে ছয় মাস, গরুর কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর, আবার বটগাছের কয়েক শত বছর। জন্মের পর প্রাণীরা শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিক্রম করিয়া বার্ধক্যে উপনীত হয়। যৌবনে অথবা পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্তির পর জীব জননের মাধ্যমে অপত্য জীবের সৃষ্টি করে। ইহার পর বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবের বিপাকীয় ক্রিয়া ও জননক্ষমতা মন্থর হইয়া যায়। জীবের এই অবস্থাকে বার্ধক্য বা জরা বলে। পরিশেষে, সকল জৈবনিক কার্যের সমাপ্তি ঘটে বা জীবনের লক্ষণসমূহ লুপ্ত হইয়া যায়। জীবের এই অবস্থাকে মৃত্যু বলে। তাই জীবের জন্ম ও মৃত্যু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, জন্ম হইতে মৃত্যু এবং ইহার মধ্যে নূতন অপত্যের জন্ম—এইভাবে সকল জীবের আয়ুষ্কাল একটি নির্দিষ্ট চক্রে বা নিয়মে বাঁধা। এই চক্রকে জীবনচক্র বলে। মৃত্যুর পর জীব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া জড় পদার্থে পরিণত হয়।

1.4 জীববিদ্যা একটি নিয়মানুগ বিজ্ঞান (Biology as a scientific discipline) : কোন বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ করাকে বিজ্ঞান বলে। জীব সম্বন্ধে বিশেষ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করাই জীববিদ্যার মূল উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের অন্যান্য সমৃদ্ধশালী শাখার মধ্যে জীববিদ্যা একটি অন্যতম শাখা। কেবল বই পড়িয়া বিজ্ঞানের কোন বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। সেইজন্য দরকার পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত। জীববিদ্যায় জীবের গঠনগত বৈচিত্র্য, জীবনযাত্রার প্রণালী, জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া উহা হইতে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কোন বিষয়ে সুচিন্তিত ও গ্রহণযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গঠিত হয় প্রকল্প (Hypothesis)। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা কোন প্রকল্প বিজ্ঞানী-মহলে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য হইলে উহা তত্ত্ব (Theory) হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। তাই সব প্রকল্প বিজ্ঞানী-মহলে তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারিবে এমন কোন কথা নাই।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত জীববিদ্যাও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। আধুনিক কারিগরিবিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহচর্যে জীববিদ্যার গবেষণাক্ষেত্র আজ সুদূর প্রসারিত। তাই নিত্য-নূতন তত্ত্বের ভিত্তিতে জীববিদ্যা হইয়াছে আরও আধুনিক ও সমৃদ্ধশালী।

1.5 জীববিদ্যার বিভিন্ন শাখা (Different Branches of Biology) : জীববিদ্যার দুইটি প্রধান শাখা—উদ্ভিদবিদ্যা (Botany) ও প্রাণিবিদ্যা (Zoology)। গ্রীক শব্দ *Botane* = উদ্ভিদ হইতে Botany বা উদ্ভিদবিদ্যা কথাটির উদ্ভব হইয়াছে এবং গ্রীক শব্দ *Zoon* = প্রাণী ও *Logos* = জ্ঞান—এই দুইটি শব্দ হইতে Zoology বা প্রাণিবিদ্যা কথাটির উদ্ভব হইয়াছে। উদ্ভিদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য উদ্ভিদবিদ্যায় এবং প্রাণীর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য প্রাণিবিদ্যায় পরিবেশিত হয়। মানুষ সর্বাপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর প্রাণী হওয়ায় প্রাণিবিজ্ঞানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাখা—মানব শারীরবিদ্যা (Human Physiology) গঠিত হইয়াছে যাহার বিষয়বস্তু কেবল মানুষের শারীরবৃত্তীয় কার্যপ্রণালী।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় জীববিদ্যার দুইটি দিক বিদ্যমান—বিশুদ্ধ জীববিদ্যা (Pure Biology) ও ফলিত জীববিদ্যা (Applied Biology)। শুদ্ধ জীববিদ্যায় জীববিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশিত হয় এবং ফলিত জীববিদ্যায় মানবকল্যাণে বিশুদ্ধ জীববিদ্যার জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়।

বিশুদ্ধ জীববিদ্যা অর্থাৎ বিশুদ্ধ উদ্ভিদবিদ্যা ও বিশুদ্ধ প্রাণিবিদ্যার নিম্নলিখিত শাখা-গুলি বিদ্যমান :

1. **অঙ্গসংস্থান বা মরফোলজি (Morphology) :**
(গ্রীক শব্দ Morphe = আকার, Logos = জ্ঞান)
এই শাখায় জীবদেহের আকার ও বাহিক গঠন আলোচিত হয়।

2. শারীরস্থান বা অ্যানাটমী (Anatomy) : (গ্রীক শব্দ Ana = উপরে, Temno = কাটা) এই শাখায় জীবদেহ ব্যবচ্ছেদ করার পর উহার আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।
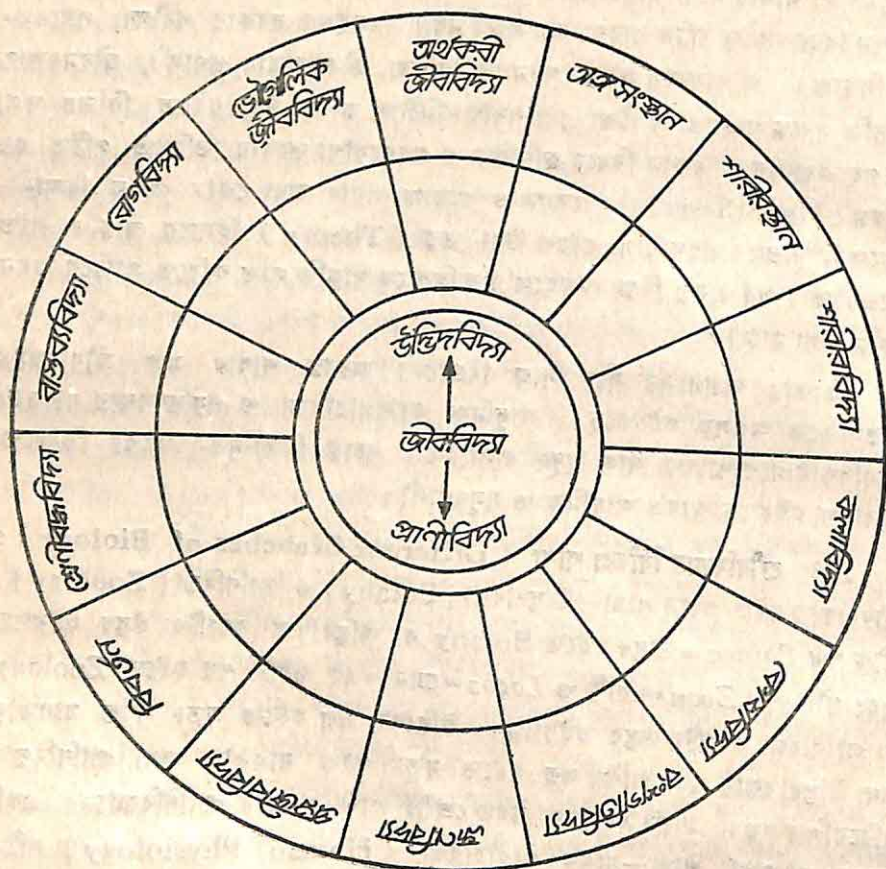
চিত্র 1.1 : জীববিদ্যার বিভিন্ন শাখা

3. শারীরবিদ্যা বা ফিজিওলজি (Physiology) : (গ্রীক শব্দ Physis = প্রকৃতি, Logos = জ্ঞান) এই শাখায় জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

4. কলাবিদ্যা বা হিস্টোলজি (Histology) : (গ্রীক শব্দ Histos = কলা, Logos = জ্ঞান) এই শাখায় জীবদেহের কলার অবস্থান, আকৃতি, গঠন ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

5. কোষবিদ্যা বা সাইটোলজি (Cytology) : (গ্রীক শব্দ Kytos = কোষ, Logos = জ্ঞান) এই শাখায় জীবকোষের গঠন ও কার্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

6. **বংশগতিবিদ্যা বা জেনেটিক্স (Genetics) :** (গ্রীক শব্দ Genesis= উৎপত্তি) এই শাখায় জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্য ও তাহার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

7. **ভ্রূণবিদ্যা বা এম্‌ব্রায়োলজি (Embryology) :** (গ্রীক শব্দ En= ভিতরে, Bryo=স্ফীত হওয়া, Logos=জ্ঞান) এই শাখায় নিষিক্ত ডিম্বাণুর পরিস্ফুরণ, ভ্রূণের গঠন ও সম্পূর্ণ বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

8. **প্রত্নজীববিদ্যা বা প্যালিঅন্টোলজি (Palaeontology) :** (গ্রীক শব্দ Palaios=প্রাচীন, Ont=সত্ত্বা, Logos=জ্ঞান) এই শাখায় পূর্বতন জীবের নিদর্শন যথা প্রস্তরীভূত জীব বা জীবের ছাপ লইয়া আলোচনা করা হয়।

9. **বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বা ইভোলিউশান (Evolution) :** (ল্যাটিন শব্দ E=বাহির, Volvo=আবর্তন) এই শাখায় জীবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—অর্থাৎ বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

10. **শ্রেণীবন্ধবিদ্যা বা ট্যাক্সোনমি (Taxonomy) :** (গ্রীক শব্দ Taxis= বিন্যাস, Nomos=আইন) এই শাখায় উদ্ভিদ ও প্রাণিরাজ্যের শ্রেণীবিভাগ এবং তাহার নিয়মকানুন, সনাক্তকরণ ও নামকরণ করা হয়।

11. **বাস্তবিদ্যা বা ইকোলজি (Ecology) :** (গ্রীক শব্দ Oikos=বাড়ি, Logos=জ্ঞান) এই শাখায় জীবের অবস্থান, পরিবেশের সহিত উহার সম্পর্ক এবং জীবের উপর পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

12. **রোগনিরূপণবিদ্যা বা প্যাথোলজি (Pathology) :** (গ্রীক শব্দ Pathos=রোগ, Logos=জ্ঞান) এই শাখায় জীবের বিভিন্ন রোগের প্রকৃতি, কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

13. **ভৌগোলিক জীববিদ্যা বা বায়োজিওগ্রাফি (Biogeography) :** (গ্রীক শব্দ Bios=জীবন, Geo=ভূ, Graphein=লেখা) বিজ্ঞানের এই শাখায় বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে জীবের বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

14. **অর্থকরী জীববিদ্যা বা ইকোনোমিক বায়োলজি (Economic Biology) :** এই শাখায় অর্থকরী জীবের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

ফলিত জীববিদ্যাও দুইটি ভাগে বিভক্ত—ফলিত উদ্ভিদবিদ্যা (Applied Botany) ও ফলিত প্রাণিবিদ্যা (Applied Zoology)। প্রত্যেকটি আবার নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান শাখার সমন্বয়ে গঠিত।

ফলিত উদ্ভিদবিদ্যা :

1. এগ্রিকালচার (Agriculture)—কৃষিকার্য সম্পর্কীয়।
2. হর্টিকালচার (Horticulture)—উদ্যানপালন সম্পর্কীয়।
3. ফরেস্ট্রি (Forestry)—বনপালন সম্পর্কীয়।
4. ফার্মাকোগ্‌নসি (Pharmacognosy)—ভেষজবিদ্যা বা ঔষধ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ সম্পর্কীয়।

5. মাইক্রোবায়োলজি (Microbiology)—অণুজীব বা আণুবীক্ষণিক জীব সম্পর্কীয়।

6. প্ল্যান্ট ব্রিডিং (Plant breeding)—পরীক্ষামূলকভাবে উন্নত ও বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ সৃষ্টি সম্পর্কীয়।

ফলিত প্রাণিবিদ্যা :

1. পিসিকালচার বা ফিসারি (Pisciculture or Fishery)—মাছ চাষ সম্পর্কীয়।

2. এপিকালচার (Apiculture)—মৌমাছি প্রতিপালন ও মধু উৎপাদন সম্পর্কীয়।

3. সেরিকালচার (Sericulture)—রেশমমথ প্রতিপালন ও রেশম উৎপাদন সম্পর্কীয়।

4. ল্যাককালচার (Lac culture)—লাক্ষা পোকা প্রতিপালন ও লাক্ষা উৎপাদন সম্পর্কীয়।

5. পার্লকালচার (Pearl culture)—মুক্তা-ঝিনুক চাষ ও মুক্তা উৎপাদন সম্পর্কীয়।

6. প্যারাসাইটোলজি (Parasitology)—পরজীবী জীব সম্পর্কীয়।

7. ডেয়ারী (Dairy)—দুগ্ধ উৎপাদন ও দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রাণী সম্পর্কীয়।

8. পোলট্রি (Poultry)—ডিম ও মাংস উৎপাদনকারী পাখী সম্পর্কীয়।

9. অ্যানিম্যাল ব্রিডিং (Animal breeding)—উন্নত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে প্রজনন ও উন্নত প্রাণী সৃষ্টি সম্পর্কীয়।

10. ইউজেনিক্স (Eugenics)—মানুষের বংশগতিতে প্রবাহিত ক্ষতিকর জীন অপসারণ ও মানবজাতির উন্নতি বিধানসম্পর্কীয়।

1.6 জীববিদ্যার সহিত বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক (Relationship of Biology with other Sciences) : বিজ্ঞানের কোন শাখা এককভাবে প্রসারলাভ করিতে পারে না। জীববিজ্ঞানের মত বৃহৎ শাখা তার ব্যতিক্রম নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গতিপথ বিভিন্ন হইলেও বিজ্ঞানের আলোচনার সীমা, গবেষণা যতই প্রসারিত বা উর্ধ্বমুখী হয় ততই বিজ্ঞানের শাখাগুলি পরস্পরের নিকটে আসিয়া পড়ে। ফলস্বরূপ, বিজ্ঞানের নূতন নূতন সহকারী শাখা গড়িয়া উঠে। এইভাবে জীববিদ্যা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সহিত উচ্চস্তরে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত হইয়া নিম্নলিখিত শাখার সৃষ্টি করে।

1. জীব-পদার্থবিদ্যা (Biophysics) : পদার্থবিদ্যা সহযোগে গঠিত জীববিদ্যার শাখাকে জীব-পদার্থবিদ্যা বলে। পদার্থবিদ্যার সাহায্য ব্যতীত জীববিদ্যার উন্নতি হইতে পারে না। যেমন, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর তাহার উন্নতিসাধন পদার্থবিজ্ঞানিগণ করিয়াছেন যাহা জীববিদ্যা গবেষণার একটি আধুনিক হাতিয়ার। জীবের বিভিন্ন

শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া—যেমন ব্যাপন, অভিস্রবণ প্রভৃতি কেবল ভৌত প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ইহা ব্যতীত জীবের গঠন, চলন, গমন, সংবহন প্রভৃতি ভৌত বিজ্ঞানের নিয়মাবলী কর্তৃক অনুসৃত হয়।
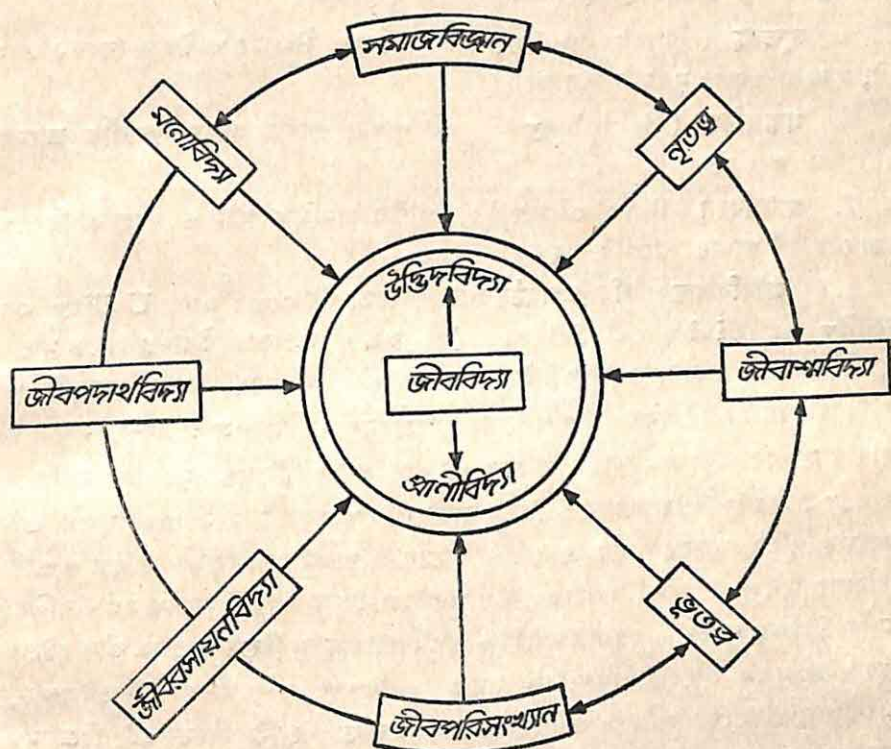
চিত্র 1.2 : জীববিদ্যার সহিত বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক

2. জীব-রসায়নবিদ্যা (Biochemistry) : রসায়নবিদ্যা সহযোগে গঠিত জীববিদ্যার শাখাকে জীব-রসায়নবিদ্যা বলে। এই শাখা বিভিন্ন জৈব বস্তুর উপাদান নির্ণয় বা সংশ্লেষ ; প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তুর উপাদান, বিক্রিয়া এবং উৎসেচক, হরমোন প্রভৃতি জটিল পদার্থের সংযুতি, কার্যপ্রক্রিয়া প্রভৃতি রসায়নবিদ্যা সহযোগে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত জীবের বিপাকীয় কার্য কতকগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমন্বয় মাত্র।

জীববিদ্যার অগ্রগতি ও প্রসারণে জীব-পদার্থবিদ্যা ও জীব-রসায়নবিদ্যা জীববিদ্যার পরিপূরক শাখারূপে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

3. জীব পরিসংখ্যান (Biometrics) : ইহার দ্বারা জীবসংখ্যার (population) পরিমাণ, বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা হয়।

4. ভূতত্ত্ব ও জীবাশ্মবিদ্যা (Geology and Palaeontology) : জীববিদ্যার সহিত ভূতত্ত্বের সম্পর্ক নিবিড়ভাবে যুক্ত। মাটির গঠন ও উহার প্রকৃতি সম্বন্ধে ভূতত্ত্ব

বিশদ জ্ঞান প্রদান করে। আবার এই মাটির সঙ্গে জীব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভূত্বকের স্তরে স্তরে সজ্জিত বিভিন্ন জীবাশ্ম বিবর্তনের পথ নির্দেশ করে। মৃত্তিকাস্তরের বয়স নির্ণয় দ্বারা ভূত্বকে প্রাপ্ত জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করা হয়। সেই দিক হইতে জীববিদ্যা ভূবিদ্যা ও জীবাশ্মবিদ্যার উপর অনেক নির্ভরশীল।

5. **নৃতত্ত্ব (Anthropology):** মানুষের উৎপত্তি ও উহার বিবর্তন এবং কৃষ্টি, সভ্যতা প্রভৃতি নৃতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে।

6. **সমাজবিদ্যা (Sociology):** এই শাখায় প্রাণীর সমাজ সম্পর্কীয় জ্ঞানের আলোচনা করা হয়।

7. **মনোবিদ্যা (Psychology):** প্রাণীর মানসিক গঠন ও তাহার বিকাশ বিজ্ঞানের এই শাখায় আলোচিত হয়।

1.7 জীববিদ্যার পরিধি ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা (Scope and Utility of Study of Biological Sciences): কৃষ্টি ও সভ্যতার উষালগ্ন হইতে মানুষ জীববিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উহার অগ্রগতি ও পরিধি ছিল সীমিত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানিগণের নিরলস গবেষণা, সাধনা ও মূল্যবান তথ্যের পরিবেশন দ্বারা বিজ্ঞানের এই শাখা হইয়া উঠিয়াছে সমৃদ্ধশালী, জটিল ও তথ্যবহুল। তাই জীববিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে এই বিজ্ঞানের পরিধি কতদূর বিস্তৃত এবং উহা পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি ? উদ্ভিদ ও প্রাণী জীববিদ্যার আলোচ্য বিষয় হওয়ায় আপাতদৃষ্টিতে ইহার পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষুদ্রতম জীব হইতে মানুষ পর্যন্ত সকল জীবের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও সম্পর্ক, পরিবেশের সহিত সম্পর্ক, মানবকল্যাণে ইহাদের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বহুমুখী বিষয় এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে। কিন্তু সুদূর অতীত হইতে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধানের পথ-প্রদর্শক রূপে জীববিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিঃসন্দেহে অবর্ণনীয়।

বিশুদ্ধ জীববিদ্যার শিক্ষামূলক উপযোগিতা (Educative value) আছে। বিশুদ্ধ জীববিদ্যায় শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রিগণ বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান (বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়), গবেষণাগারে যুক্ত থাকিয়া কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। তাই বলিয়া এই শাখার সুযোগ সীমিত নয়, কারণ বিশুদ্ধ জীববিদ্যার উপর ভিত্তি করিয়া ফলিত জীববিদ্যার শাখাগুলি স্বনির্ভর ও পরিপূর্ণ হইয়াছে। ফলিত জীববিদ্যায় দীক্ষায়িত ছাত্র-ছাত্রীগণ যেমন স্বনির্ভর অর্থসংস্থানের অথবা কর্মসংস্থানের সুযোগ করিয়া লইতে পারে তেমনি এই শাখার উপর নির্ভরশীল বহু শিল্প বা শাখা (রেশম শিল্প, লাক্ষা শিল্প, মৌ চাষ, মৎস্য চাষ, পোলট্রি, ডেয়ারী শিল্প প্রভৃতি) গড়িয়া উঠিয়াছে যেখানে বহুলোক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাইতেছে। ইহা ব্যতীত গবেষণাগার হইতে নিত্য-নূতন মূল্যবান তথ্য সংযোজিত হওয়ায় ফলিত জীববিদ্যার উপর নির্ভরশীল শিল্প বা শাখাগুলি আরও সমৃদ্ধশালী হইতেছে। ফলস্বরূপ দেশের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ আরও সুদৃঢ় হইতেছে।

নিম্নের আলোচনা হইতে জীববিদ্যা পাঠের বহুমুখী প্রয়োজনীয়তা সহজে উপলব্ধি করা যাইবে।

1. **খাদ্য উৎপাদনে :** সমগ্র প্রাণিজগৎ খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদজগতের উপর নির্ভরশীল। শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাট প্রভৃতি খাদ্যবস্তুকে উদ্ভিদ মূল, কাণ্ড, ফুল, বীজ প্রভৃতি অংশে সঞ্চয় করিয়া নিজেদের ও প্রাণীদের চাহিদা পূরণ করে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাণী মানুষের প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের অন্যতম সরবরাহকারী। যাহাই হউক না কেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজন, নতুবা পৃথিবী হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণিজগৎ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

জীববিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ ও অন্যান্য সহযোগী শাখার সহায়তায় কিভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে।

(i) **উন্নত মানের এবং অধিক ফলনশীল বীজ :** সংকরায়ন (Hybridisation) পদ্ধতির মাধ্যমে আজকাল রোগ প্রতিরোধক্ষম উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাতের ধান, গম, ভুট্টা, পাট, তুলা প্রভৃতি উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে।

(ii) **ফলের সংখ্যা ও আকার বৃদ্ধি :** জীববিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা কমলালেবু, আঙুর, আপেল প্রভৃতি অর্থকরী ফলের সংখ্যা ও আকার বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে।

(iii) **বীজশূন্য ফল :** বীজশূন্য ফল উৎপাদন ব্যবহারিক জীববিদ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। পরাগ-সংযোগ ঘটিবার পূর্বে অক্সিন প্রয়োগে ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধি ঘটাইয়া বীজশূন্য ফল উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। পেয়ারার মত বীজশূন্য ফলের জনপ্রিয়তা ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের জন্য ইহাদের ব্যাপকভাবে চাষ করা হইতেছে।

(iv) **চা উৎপাদন :** ভারত চা রপ্তানি করিয়া প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে ভারতে চায়ের উৎপাদন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ অনেক সুদৃঢ় হইয়াছে।

(v) **জীবাণু ও কীট-পতঙ্গ দমন :** বিভিন্ন প্রকার জীবাণু ও কীট-পতঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ফসলের বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিসাধন করে। তাহাদের জীবন-ইতিহাস, সংক্রমণের পদ্ধতি প্রভৃতি জানা থাকিলে বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ও পেষ্টিসাইড প্রয়োগ দ্বারা সহজে দমন করা যাইতে পারে। তাই সঠিক সময়ে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে ফসলের ফলনের হার অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইবে।

(vi) **উন্নত মানের পশু-পাখী উৎপাদন :** সুপ্রজনন বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা গরু, মহিষ, ছাগল, মুরগী, হাঁস প্রভৃতি পশু-পাখীর কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদন হইতেছে। তাই ডেয়ারী (Dairy) [গরু, মহিষ প্রভৃতি প্রতিপালন] এবং পোল্ট্রি (Poultry) [হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালন] বর্তমানে একটি অর্থকরী শিল্পে পরিণত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কিভাবে আরও

অধিক পরিমাণে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন করা যায় এবং কিভাবে রোগ প্রতিরোধক্ষম উন্নত মানের পশু-পাখী উৎপাদন করা যায়—বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও গবেষণা সেই চিন্তায় মগ্ন।

(vii) **মৎস্য চাষ :** মৎস্য একটি প্রধান অর্থকরী প্রাণী। প্রণোদিত জনন বা কৃত্রিম প্রজনন (Induced breeding), নিবিড় মিশ্র মৎস্য চাষ (Composite Fish Culture) ও বিভিন্ন কার্পের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত মাছকে বিভিন্ন প্রকার রোগের সংক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি ও ঔষধ ব্যবহার করা হইতেছে। ইহা ব্যতীত চিংড়ি চাষ বর্তমানে একটি অতি লাভজনক চাষ। চিংড়ি রপ্তানির মাধ্যমে ভারতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। তাই চিংড়ি চাষে বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগিক কৌশল ও প্রণোদিত জননের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে চিংড়ি উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। মৎস্য চাষের উন্নয়নের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গবেষণাগার বিদ্যমান যাহার মধ্যে উত্তর ২৪-পরগনা (অধুনা বারাসাত) জেলার ব্যারাকপুরের কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণাগার বৃহৎ ও অন্যতম।

(viii) **মৌমাছি চাষ :** স্বল্প ব্যয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করিবার জন্য ইহা একটি অন্যতম পদ্ধতি। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছির চাষ ও অধিক পরিমাণে মধু নিষ্কাশন করিয়া গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীর লোকের আর্থিক উপার্জন সম্ভব হইয়াছে।

2. **পরিধেয় ও ব্যবহার্য বস্তু উৎপাদনে :** বিভিন্ন প্রকার পরিধেয় বস্ত্র উৎপাদনের জন্য উদ্ভিজ্জ তন্তু (পাট ও তুলা), ঘরবাড়ী ও অন্যান্য গৃহসামগ্রী তৈয়ারি করিবার জন্য কাষ্ঠ এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার্য বস্তু উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল উদ্ভিদ সরবরাহ করিতেছে। কিভাবে জীববিদ্যার সহায়তায় ঐসব পদার্থ বেশী পরিমাণে ও উন্নত মানের উৎপন্ন হইতেছে তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে জানা যায়।

(i) **পাট ও বস্ত্র শিল্প :** পাট ও তুলা বস্ত্রশিল্পের প্রধান উপাদান। পাট রপ্তানি করিয়া প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় বলিয়া উহাকে 'স্বর্ণ তন্তু' বলা হয়। জীববিদ্যার সহায়তায় বিভিন্ন প্রজাতির পাট ও তুলার মধ্যে সংকরায়ন ঘটাইয়া উন্নত মানের এবং উচ্চ ফলনশীল পাট ও তুলার উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে।

(ii) **রেশম ও পশম শিল্প :** বিভিন্ন প্রকার রেশমমথের গুটি হইতে তসর, গরদ, এণ্ডি, মুগা প্রভৃতি রেশম উৎপন্ন হয়। জীববিদ্যার নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে উন্নত মানের, রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বেশী উৎপাদনশীল রেশম কীট উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। রেশম শিল্প একটি প্রধান অর্থকরী শিল্প। তাই ইহার উন্নতিসাধনের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে গবেষণাগার গড়িয়া উঠিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার বিদ্যমান।

ভেড়ার লোম হইতে যে পশম পাওয়া যায় তাহা হইতে উৎকৃষ্ট পোশাক তৈয়ারি হয়। জীববিদ্যার সহায়তায় ভেড়ার দেহ হইতে বেশী লোম পাওয়া সম্ভব হইয়াছে।

(iii) **লাক্ষা উৎপাদন :** বিভিন্ন ব্যবহার্য বস্তু তৈয়ারিতে লাক্ষার অবদান অপরিসীম। গ্রামোফোন রেকর্ড, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির অংশ, ভার্নিশ, পালিশ, প্লাষ্টিকের জিনিসপত্র প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু উৎপাদনে লাক্ষা ব্যবহার করা হয়। তাই লাক্ষার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষণাগার বিদ্যমান যাহার মধ্যে রাঁচীর নিকটে নামকুম লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র বিখ্যাত।

(iv) কাগজ, সেলোফেন পেপার তৈয়ারির প্রধান উপাদান উদ্ভিদ হইতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন রঙ ও অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তুর কাঁচামাল উদ্ভিদের গঁদ, রজন, তৈল, রাবার প্রভৃতি পদার্থ হইতে পাওয়া যায়।

3. **রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসাশাস্ত্রে :** মানুষ-সহ বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন রোগের জীবাণু আবিষ্কারের পর ঐসব রোগের প্রতিকার সম্ভব হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু 'প্লাসমোডিয়ামে'র আবিষ্কর্তা রোনাল্ড রস (Ronald Ross), কলেরা রোগের জীবাণু 'ভিব্রিও কলেরি'-এর আবিষ্কারক রবার্ট কক (Robert Koch), বসন্ত রোগের জীবাণু 'ভাইরাস'-এর আবিষ্কর্তা এডওয়ার্ড জেনার (Edward Jenner) প্রমুখ বরেণ্য বিজ্ঞানীর নাম চিরস্মরণীয়। ইহা ব্যতীত হরমোন-ঘটিত ব্যাধি—যথা, বহুমূত্র, বিপাকঘটিত রোগ—যথা, ধবল (Albinism), কালোমূত্র (Alkaptonuria) প্রভৃতি রোগের কারণ জানিবার পর ইহাদের প্রতিকার সম্ভব।

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে বিভিন্ন ঔষধের প্রতিক্রিয়া ব্যাঙ, গিনিপিগ, বাঁদর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর উপর প্রয়োগের পর মানুষের উপর প্রয়োগ করা হয়। ইহা ব্যতীত শল্য চিকিৎসার উন্নতির মূলে আছে ঐসব প্রাণীর অবদান তথা আত্মত্যাগ। বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিবায়োটিক—যথা, পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন, অরিওমাইসেটিন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক ও জীবাণুর দেহ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ হইতে যুগান্তকারী ঔষধ তৈয়ারি হইয়াছে। যেমন, সিঙ্কোনাগাছের ছাল হইতে কুইনাইন, আফিং গাছের ফলত্বক হইতে মরফিন, সর্পগন্ধা-গাছের মূল হইতে রাউলফিন প্রভৃতি রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। তাই চিকিৎসাশাস্ত্রের সহিত জীববিদ্যার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়।

4. **বন্যা ও ভূমিক্ষয় রোধে :** আমাদের দেশে অতিরিক্ত বৃষ্টি ও বন্যায় জন্য ভূমিক্ষয় এক প্রাকৃতিক অভিশাপ। নদীর দুই পার্শ্বে ঘাস রোপণ, নদীর বাঁধে বৃক্ষ রোপণ অথবা নদীর পাড় অনেকক্ষেত্রে পাথর দিয়া বাঁধাইয়া ভূমিক্ষয় রোধ করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলের ভূমিক্ষয় রোধ করিবার জন্য ধাপে ধাপে মাটি কাটিয়া গাছপালা লাগানো হয়।

5. **বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে :** বন ও বন্যপ্রাণীর মত অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ধন করে না, প্রকৃতি তথা ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য রক্ষা করে। তাই বনমহোৎসব, সংরক্ষিত অরণ্য, অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান প্রভৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে বন ও বন্যপ্রাণীকে ধ্বংস বা অবলুপ্তির হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

6. পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে : সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হইতেছে। যানবাহন-পরিত্যক্ত ধোঁয়া, কলকারখানা হইতে নির্গত বিভিন্ন প্রকার বিষাক্ত গ্যাস ও রাসায়নিক পদার্থ, বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক ঔষধের ব্যাপক ব্যবহার প্রভৃতির ফলে বাতাস ও জল ক্রমশ দূষিত হইতেছে। উদ্ভিদ বায়ু হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করিয়া বায়ু পরিশোধনে অংশগ্রহণ করে। কচুরিপানা জলাশয়ের বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া জলকে পরিষ্কার করে। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতি অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া কিভাবে পরিবেশ দূষণের কুপ্রভাব হইতে মানবজাতিকে রক্ষা করা যায় তাহা পৃথিবীর পরিবেশ বিজ্ঞানীদের এক বিরাট চিন্তা ও গবেষণার বিষয়।

7. চিত্ত বিনোদনে : মানুষের চিত্ত বিনোদনে জীববিদ্যার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। চিড়িয়াখানা (Zoological garden), উদ্ভিদ উদ্যান (Botanical garden), অ্যাকোয়ারিয়াম (Aquarium) প্রভৃতি মানুষের ক্লান্তি ও শ্রান্তি দূর করে। প্রকৃতির বিচিত্র রঙের ও আকারের উদ্ভিদ, ফুল-ফল, পশু-পাখী প্রভৃতি মানুষকে অপার আনন্দ দান করে।

8. জ্বালানি উৎপাদন ও সন্ধানে : কয়লা ও খনিজ তৈল সভ্যতার অগ্রগতির প্রধান উপাদান। প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের সরবরাহ এতই কম যে মানব-সভ্যতা অদূর ভবিষ্যতে চরম সমস্যার সম্মুখীন হইবে। তাই মানুষ আজ নূতন কয়লাখনি ও তৈলখনি সন্ধানের কাজে ব্যাপৃত। কয়লা উদ্ভিদ হইতে এবং খনিজ তৈল উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ হইতে প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মৃত্তিকার গভীর স্তরে পরাগরেণু, এককোষী ও শামুক জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম সম্ভাব্য তৈলসঞ্চয়ী স্থানের ইঙ্গিত দেয়। এই জ্বালানি সন্ধানের ব্যাপারে জীববিদ্যাকে ভূতত্ত্ববিদ্যা, জীবাশ্মবিদ্যা ও রেণুবিদ্যার (Palynology) সাহায্য লইতে হয়।

9. জনবিস্ফোরণ রোধে : জনবিস্ফোরণ আজ এক বিশ্বসমস্যা। মানুষ জীববিদ্যালব্ধ জ্ঞান দ্বারা এবং রসায়নবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় তাহার নিজের সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিয়াছে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের নূতন নূতন ব্যবস্থা উদ্ভাবন ব্যতীত বিজ্ঞানিগণ অধিক ফলপ্রসূ এবং দীর্ঘস্থায়ী ও অক্ষতিকারক ঔষধ উৎপাদনের গবেষণায় মগ্ন। জন্মনিরোধক ব্যবস্থার বিবেচনাপূর্ণ ও সুষ্ঠু প্রয়োগ দ্বারা জনবিস্ফোরণ রোধ করা যাইতে পারে।

10. মহাকাশ গবেষণায় : মহাকাশচারিগণ ক্ষুদ্র শৈবাল ক্লোরেল্লাকে (Chlorella) খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। ইহা ব্যতীত ক্লোরেল্লা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পরিত্যক্ত অক্সিজেন দ্বারা মহাকাশচারীর শ্বাসকার্যে সাহায্য করে।

11. মানব সুপ্রজনন বিদ্যায় : বর্ণান্ধতা (Colour Blindness), হিমোফিলিয়া (Haemophilia), টাক (Baldness), বিভিন্ন প্রকার সিনড্রোম (Turner Syndrome, Klinefelter Syndrome) প্রভৃতি রোগ উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তাই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার

পূর্বে এইসব লোকের সুপ্রজননবিদের সাহায্য লওয়া একান্ত প্রয়োজন নতুবা মানব জাতির মধ্যে অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও বিকলাঙ্গ সন্তানের আবির্ভাবের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঐসব লোকের বিবাহ না করাই উচিত।

বিষয়-সংক্ষেপ

1. বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের গঠন, গতি-প্রকৃতি, পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিবেশের সহিত সম্পর্ক প্রভৃতি জীবনযাত্রার নিগূঢ় তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাহাকে জীববিজ্ঞান বলে।

2. উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও উহাদের গঠন কাঠামো ও জীবনক্রিয়ার মৌলিক ধরন যে একই তাহা সম্যকভাবে উপলব্ধি করাই জীববিজ্ঞান অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য।

3. ডঃ এস্. পি. সেনের মতে 'জীবন হইল কতকগুলি বিক্রিয়কের মধ্যে একপ্রকার ভৌত-রাসায়নিক সাম্যাবস্থা যাহা নির্দিষ্ট কতিপয় শর্তের উপস্থিতিতে কার্যকর হয়'।

4. জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল :

(i) বার্তা বা সংকেত সঞ্চয় ও স্থানান্তরের ক্ষমতা,

(ii) শক্তিসঞ্চয় ও স্থানান্তরের ক্ষমতা,

(iii) সংগঠন,

(iv) পরিব্যাক্তিতা।

ইহা ব্যতীত জীবের আকার ও আয়তন, প্রোটোপ্লাজম, বিপাক, বৃদ্ধি, চলন ও গমন, সংবহন, উত্তেজিতা, অভিযোজন, বিবর্তন, ছন্দোবদ্ধতা, জনন, জীবনচক্র, জরা ও মৃত্যু হইল জীবের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য।

5. জীববিদ্যার প্রধান শাখাগুলি হইল—অঙ্গসংস্থান, শারীরস্থান, শারীরবিদ্যা, কলাবিদ্যা, কোষবিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা, প্রত্নজীববিদ্যা, বিবর্তন, শ্রেণীবন্ধবিদ্যা, বাস্তব্য-বিদ্যা, রোগনিরূপণবিদ্যা, ভৌগোলিক জীববিদ্যা, অর্থকরী জীববিদ্যা।

6. জীববিদ্যার সহিত জীব-পদার্থবিদ্যা, জীব রসায়নবিদ্যা, জীব-পরিসংখ্যান, ভূতত্ত্ব ও জীবাশ্মবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, মনোবিদ্যা প্রভৃতির সঙ্গে নিগূঢ় সংযোগ বিদ্যমান!

7. জীববিদ্যার শিক্ষামূলক প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইহা ব্যতীত, জীববিদ্যায় অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনে বহুমুখী প্রয়োগ দ্বারা প্রভূত উপকার হইতেছে। অধিক ফলনশীল শস্য উৎপাদন, উন্নত মানের পশু-পাখী উৎপাদন, মৎস্য চাষ, রেশম চাষ, লাক্ষা উৎপাদন, রোগ নিরূপণ, বন্যা ও ভূমিক্ষয় রোধ, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জনবিস্ফোরণ রোধ প্রভৃতি জীববিজ্ঞানের আধুনিক জ্ঞানের প্রয়োগের ফল।

প্রশ্নাবলী

১। জীবনের সংজ্ঞা দাও।

২। জীবের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৩। জীববিজ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক আলোচনা কর।

৪। 'জীববিজ্ঞান একটি নিয়মানুগ বিজ্ঞান'।—ব্যাখ্যা কর।

৫। নিম্নলিখিত সমস্যা সমাধানে জীববিজ্ঞানের প্রয়োগ ও গুরুত্ব আলোচনা কর :

(ক) খাদ্যোৎপাদনে, (খ) জনবিস্ফোরণ রোধে, (গ) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে, (ঘ) বন্যা ও ভূমিক্ষয় রোধে, (ঙ) মহাকাশ গবেষণায়, (চ) চিকিৎসাশাস্ত্রে, (ছ) মানব সুপ্রজননবিদ্যায়।

৬। জীববিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

৭। টীকা লিখ ;

(ক) বিপাকীয় ক্রিয়া, (খ) উত্তেজিতা, (গ) পরিবর্তিতা, (ঘ) ছন্দোবদ্ধতা, (ঙ) সংগঠন।

দ্বিতীয় অধ্যায় / কোষের গঠন

2.1 কোষ আবিষ্কারের ঐতিহাসিক বিবরণ (Historical background of cell discovery) : প্রাচীনকাল হইতে জীবদেহের গঠন সম্বন্ধে মানুষের জানার অসীম কৌতূহল। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের (Aristotle, 384-322 B.C.) যুগ হইতে এই বিষয়ে চিন্তার সূত্রপাত হইলেও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভাবে এই বিষয়ে গবেষণার কোন উন্নতি হয়নি। 1590 খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের দুই চশমা বিক্রেতা জে. জন্‌সেন্ (J. Janssen) এবং জেড্ জন্‌সেন্ (Z. Janssen) প্রথম যৌগিক অণুবীক্ষণ* যন্ত্রে তৈয়ারি করেন। 1665 খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক (Robert Hooke) স্বউদ্ভাবিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বোতলের ছিপি বা কর্কের একটি সূক্ষ্ম ছেদ পর্যবেক্ষণ করিয়া মৌচাকের ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও প্রাচীরবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ দেখিতে পান এবং ইহাদের তিনি কোষ নামে অভিহিত করেন। রবার্ট হুকের আবিষ্কারের পর প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন বিজ্ঞানী কোষ সম্বন্ধে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য তথ্য পরিবেশন করেন। তাঁহাদের মধ্যে গ্রু (Grew, 1682), উল্‌ফ (Wolf, 1759), দ্য মিরবেল (de Mirbel, 1802), ওকেন (Oken, 1805), ল্যামার্ক (Lamarck, 1809), ডুট্রোচেট (Dutrochet, 1824) প্রভৃতি অন্যতম। এই সকল বিজ্ঞানীর মতানুযায়ী উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ কোষ দ্বারা গঠিত এবং প্রতিটি কোষ গঠন ও কার্যের ব্যাপারে স্বনির্ভর। 1781 খ্রীষ্টাব্দে ফন্টানা (Fontana) কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব অনুমান করিলেও 1833 খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown) উদ্ভিদ কোষে সুস্পষ্ট, গোলাকার নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। 1835 খ্রীষ্টাব্দে ডুজারডিন (Dujardin) কোষমধ্যস্থ জেলির ন্যায় তরল পদার্থকে সারকোড নামে অভিহিত করেন এবং 1839 খ্রীষ্টাব্দে পারকিনজি (Purkinje) ঐ তরল সজীব পদার্থের নাম দেন প্রোটোপ্লাজম।

চিত্র 2.1 রবার্ট হুকের অণুবীক্ষণ যন্ত্র

উদ্ভিদদেহে কোষের উপস্থিতি বিষয়ে সকল বিজ্ঞানী একমত পোষণ করিলেও প্রাণিদেহে এই ধরনের সুনির্দিষ্ট কোষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সেই সময় পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী নিশ্চিতভাবে কিছু বলিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে জার্মান উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী স্লাইডেন

* অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope), গ্রীক শব্দ Micros = ক্ষুদ্র, Skopein = দেখা।

(M. J. Schleiden) এবং জার্মান প্রাণিবিজ্ঞানী সোয়ান (Theodor Schwann) পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কোষ সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য অনুসন্ধান করিবার পর 1839 খ্রীষ্টাব্দে কোষ মতবাদ (cell theory) নামক একটি মতবাদ প্রচার করিয়া জীববিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এই মতবাদের মূল বক্তব্য হইল—

(i) সকল জীবের দেহ এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত—অর্থাৎ জীবিত বস্তুর গঠন একক হইল কোষ।

(ii) জীবনের প্রারম্ভে একটিমাত্র কোষ বিদ্যমান।

(iii) পূর্বসৃষ্ট কোষ হইতে নূতন কোষের সৃষ্টি হয়।

1932 খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী নল ও রাসকৃস-এর (Knoll and Rusks) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার এবং পরে উহার উন্নতিসাধনের পর কোষ ও কোষীয় অঙ্গাণুর আলট্রা গঠন জানা সম্ভব হইয়াছে। ফলস্বরূপ জীববিজ্ঞান অধ্যয়ন ও গবেষণার এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হইয়াছে।

2.2 কোষের সংজ্ঞা (Definition of cell): একটি আদর্শ কোষের কোষ-আবরণী, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস অবশ্যই বিদ্যমান, কিন্তু জীবজগতে আদর্শ কোষ বলিতে কিছুই নাই। শুধু তাই নয় বিভিন্ন কোষের গঠনগত ও চরিত্রগত পার্থক্য বিদ্যমান, যেমন অনেক কোষ নিউক্লিয়াসবিহীন (স্তন্যপায়ীর লোহিত কণিকা, সীভ নল), অনেক কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত (ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল), আবার অনেক কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস বিদ্যমান (প্যারামিসিয়াম, ঐচ্ছিক পেশীতন্তু)। বিভিন্ন কোষের এই প্রকার বিভিন্নতার দরুন এককথায় কোষের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নহে। তাই কোষের বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞা পর পর উল্লেখ করা হইল।

(i) জীবের গঠনগত ও কার্যগত একককে কোষ বলে।

(ii) আবরণবেষ্টিত নানাপ্রকার অঙ্গাণুসমন্বিত নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইটোপ্লাজমকে কোষ বলে।

(iii) অর্ধভেদ্য পর্দাবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমীয় ক্ষুদ্র একক যাহা অনুকূল পরিবেশে স্বনির্ভর ও আত্মপ্রজননশীল, তাহাই কোষ।

(iv) জীবনের প্রকাশ ঘটাইবার গুণসম্পন্ন একখণ্ড প্রোটোপ্লাজম হইল কোষ—ম্যাক্স সুলজ্ (Max Schultze)।

(v) জৈব বস্তুবিহীন আধারে অর্ধভেদ্য পর্দাবেষ্টিত আত্মপ্রজননশীল জৈবনিক কার্যের একককে কোষ বলে।—লোয়ে ও সিকেভিৎস্ (Lowey and Siekevitz)।

(vi) জীবনের ভৌত সত্তার মৌল একককে কোষ বলে। —সোয়ানসন (Swanson)।

2.3 কোষের আকৃতি (Shape of cells): সকল কোষের আকার একরকম নহে। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য কোষের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। উদ্ভিদ কোষে সেলুলোজ নির্মিত দৃঢ় কোষপ্রাচীর থাকায় কোষপ্রাচীরের

আকৃতি অনুযায়ী কোষের আকৃতি গোলাকার, ডিম্বাকার, আয়তক্ষেত্রাকার, বহুভূজাকৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়। প্রাণিকোষের কোষপর্দা পাতলা হওয়ায় উহার উপর পরিবেশের প্রভাব, প্রোটোপ্লাজমের সান্দ্রতা, পৃষ্ঠটান, সন্নিহিত কোষের
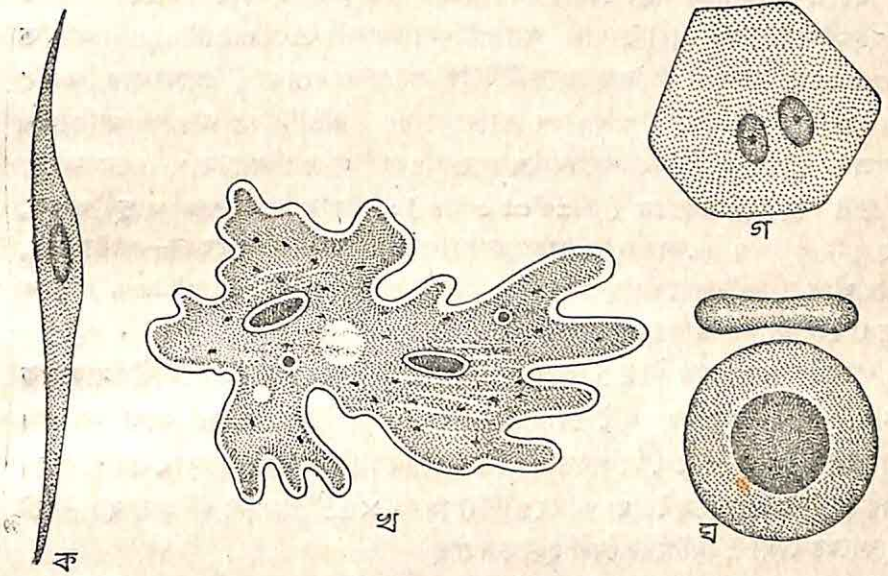
চিত্র 2.2 : বিভিন্ন প্রকারের প্রাণিকোষ
ক = অনৈচ্ছিক পেশীতন্তু, খ = অ্যামিবা, গ = যকৃৎ কোষ, ঘ = মানুষের লোহিত রক্তকণিকা
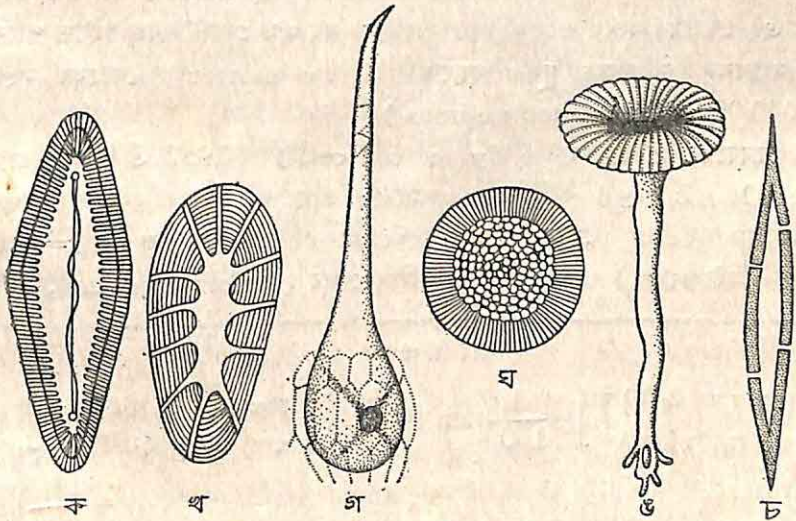
চিত্র 2.3 : বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ কোষ
ক, ঘ = ডায়াটোম, খ = স্ক্লেরাইড, গ = দংশক রোম, ঙ = অ্যাসিটাবুলারিয়া, চ = স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু

যান্ত্রিক চাপ প্রভৃতির ফলে কোষের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। যেমন, আবরণী কোষ চ্যাপ্টা ও পাতলা, পেশী কোষ লম্বা, স্নায়ুকোষ সরু ও শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট, ডিম্বকোষ গোলাকার, শুক্রকোষ লম্বা ও লেজ বা ফ্লাজিলামযুক্ত।

নিম্নশ্রেণীর অনেক উদ্ভিদ কোষের কোষপ্রাচীর সুদৃঢ় না হওয়ায় কোষের আকৃতি পরিবর্তনশীল। এককোষী শৈবাল অ্যাসিটাবুলারিয়ার (Acetabularia) আকৃতি ব্যাঙের ছাতার ন্যায়। আবার ব্যাকটিরিয়ার আকৃতি দণ্ডাকার, গোলাকার, কমার ন্যায় অথবা স্ক্রু-এর মত। অধিকাংশ প্রাণিকোষের একটি নির্দিষ্ট আকৃতি থাকিলেও নিম্নশ্রেণীর প্রাণী অ্যামিবা বা অনেক শ্বেতরক্তকণিকা উহাদের আকৃতি পরিবর্তন করে।

2.4 কোষের আয়তন (Size of cells): কোষ সাধারণত আণুবীক্ষণিক, কিন্তু এমন কতকগুলি কোষ আছে যাহাদের খালি চোখে দেখা যায়, যেমন—পাখীর ডিম, তুলার আঁশ। জীবজগতের ক্ষুদ্রতম জীব মাইকোপ্লাজমার (Mycoplasma) ব্যাস প্রায় 0·1 মাইক্রোমিটার (μm) হয়।

ব্যাকটিরিয়ার ব্যাস 0·2-5 মাইক্রোমিটার হইতে পারে। এককোষী সামুদ্রিক শৈবাল অ্যাসিটাবুলারিয়া [দৈর্ঘ্যে 5-10 সে.মি] উদ্ভিদকোষের মধ্যে বৃহত্তম। তুলার আঁশ দৈর্ঘ্যে 6 সে.মি. পর্যন্ত হয়। উটপাখীর ডিম সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাণিকোষ। উহার আয়তন যথাক্রমে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে 170 মি.মি. $\times$ 135 মি.মি.। মানুষের একটি স্নায়ুকোষের দৈর্ঘ্য 1 মিটারের বেশী হইতে পারে।

2.5 কোষের সংখ্যা (Number of cells): ব্যাকটিরিয়া, নিম্নশ্রেণীর শৈবাল, আদ্যপ্রাণী প্রভৃতির দেহ একটিমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত। আবার বহুকোষী উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহে কোষের সংখ্যা আকার ও আয়তন অনুসারে বেশী বা কম হইয়া থাকে। এই কোষের সংখ্যা কয়েক হাজার হইতে বহু লক্ষ কোটি পর্যন্ত হইতে পারে। যেমন, মানুষের মস্তিষ্কের ধূসর বস্তুতে (Grey matter) কোষের সংখ্যা 1,000,000,000,000 (million millions)।

2.6 কোষের প্রকারভেদ (Types of cell): 1957 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ডগহার্টি (Dougherty) নিউক্লিয়াস সংগঠনের ভিত্তিতে কোষকে দুই ভাগে ভাগ করেন—প্রোক্যারিওটিক কোষ (Prokaryotic cell, গ্রীক শব্দ Pro = আদি, Karyon = নিউক্লিয়াস) এবং ইউক্যারিওটিক কোষ (Eukaryotic cell, গ্রীক

মাপের একক

μ (মাইক্রন বা মিউ) বা μm (মাইক্রোমিটার) $= \frac{1}{1000}$ mm (মি.মি.); 1 mμ (মিলিমাইক্রন) বা 1 nm (ন্যানোমিটার) $= \frac{1}{1000}\mu$m.

1Å (অ্যাংস্ট্রম) $= \frac{1}{10}$ nm বা $\frac{1}{10,000}\mu$m.

শব্দ Eu=প্রকৃত, Karyon=নিউক্লিয়াস)। আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা এই বিভাগ পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

(i) **প্রোক্যারিওটিক কোষ বা আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ (Prokaryotic cell) :** যে সমস্ত কোষের নিউক্লীয় পর্দা বেষ্টিত সংগঠিত নিউক্লিয়াস ও বিশিষ্ট কোষীয় অঙ্গাণু—যথা মাইটোকনড্রিয়ন, গল্গি বস্তু, প্লাস্টিড, সেন্ট্রোজোম, এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা প্রভৃতি থাকে না তাহাদের প্রোক্যারিওটিক কোষ বলে। যেমন—ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ-সবুজ শৈবাল, মাইকোপ্লাজমা, রিকেটসিয়া, স্পাইরোকিটা প্রভৃতি। আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত বা প্রোক্যারিওটিক কোষযুক্ত জীবকে প্রোক্যারিওটস্ (Prokaryotes) বলে।

(ii) **ইউক্যারিওটিক কোষ বা আদর্শ নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ (Eukaryotic cell) :** যে সমস্ত কোষের নিউক্লিয় পর্দা বেষ্টিত সংগঠিত সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস ও মাইটোকনড্রিয়া, গল্গি বস্তু, প্লাস্টিড, সেন্ট্রোজোম, এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা, লাইসোজোম প্রভৃতি কোষীয় অঙ্গাণু বিদ্যমান তাহাদের ইউক্যারিওটিক কোষ বলে। যেমন—উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষ। আদর্শ নিউক্লিয়াসযুক্ত বা ইউক্যারিওটিক কোষযুক্ত জীবকে ইউক্যারিওটস্ (Eukaryotes) বলে।

2.7 প্রোক্যারিওটিক কোষের গঠন (Structure of Prokaryotic cell) : প্রোক্যারিওটিক কোষের নিউক্লিয়াস অতি প্রাচীন, সরল, অনুন্নত এবং নিউক্লিয়
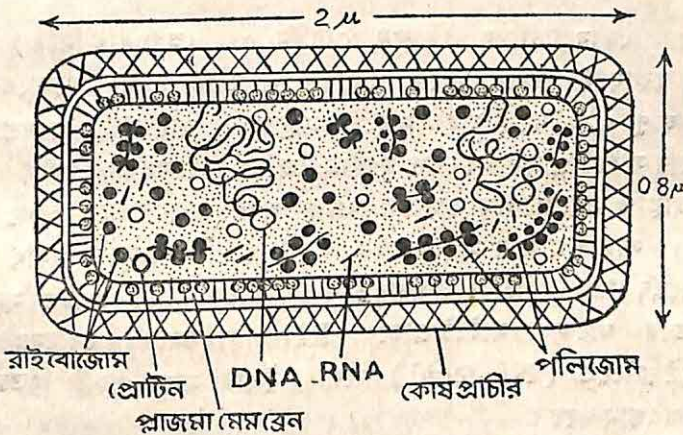
চিত্র 2.4 : একটি আদর্শ ব্যাকটিরিয়া কোষের গঠন (পরিমাপ কাল্পনিক)

পর্দাবিহীন অর্থাৎ সংগঠিত নয়। ইহা ব্যতীত মাইটোকনড্রিয়ন, গল্গি বস্তু, প্লাস্টিড, এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা, লাইসোজোম প্রভৃতি অঙ্গাণু অনুপস্থিত। নিম্নে কয়েক প্রকার প্রোক্যারিওটিক কোষের গঠন উল্লেখ করা হইল।

(i) **ব্যাকটিরিয়া (Bacteria) :** ব্যাকটিরিয়া একপ্রকার অতি-ক্ষুদ্র এককোষী জীব। ইহারা গোলাকার, দণ্ডাকার, কমা চিহ্নের ন্যায়, সর্পিলাকার অথবা স্ক্রু-এর ন্যায়

আকৃতিযুক্ত হয়। ইহাদের ব্যাস 0·2—5 μm হয়। ব্যাকটিরিয়ার কোষপ্রাচীর দৃঢ় এবং জটিল শর্করা, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও মিউরামিক অ্যাসিড দ্বারা গঠিত। অনেক ব্যাকটিরিয়ার কোষপ্রাচীরের বাহিরে একটি পিচ্ছিল আবরণী অথবা শক্ত ক্যাপসুল থাকে। আবার অনেক ব্যাকটিরিয়ার দেহগাত্র হইতে এক বা একাধিক ফ্লাজিলা
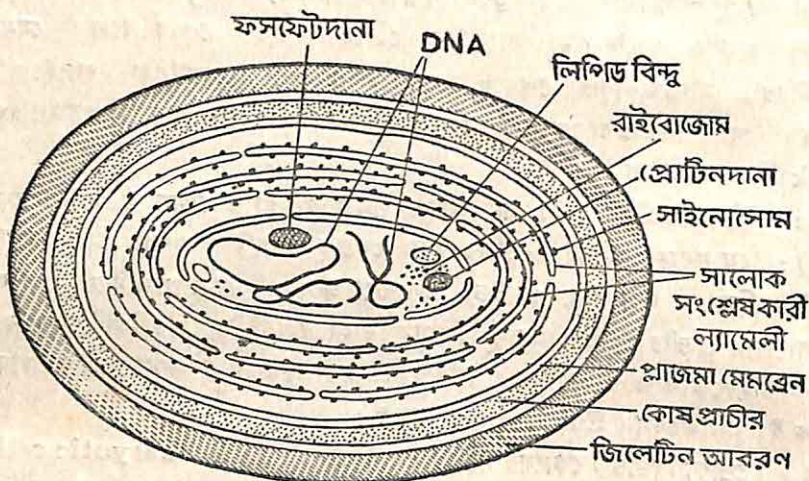
চিত্র 2.5 : নীলাভ-সবুজ শৈবাল

নির্গত হয়। কোষপ্রাচীরের ভিতরে প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ নির্মিত কোষপর্দা বিদ্যমান। কোষপর্দা ভিতরের দিকে প্রবর্ধিত ও ভাঁজ হইয়া মেসোজোম নামক স্থলীবৎ অঙ্গাণু গঠন করে যাহা মাইটোকনড্রিয়নের ন্যায় শ্বসনে অংশগ্রহণ করে। ব্যাকটিরিয়ার সাইটোপ্লাজম অর্ধতরল, বর্ণহীন, জেলির ন্যায় অর্ধস্বচ্ছ পদার্থ। সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্রাকৃতি রাইবোজোম ছড়ানো থাকে অথবা দলবদ্ধভাবে পলিরাইবোজোম গঠন করে। সাইটোপ্লাজমে গ্লাইকোজেন, ফ্যাট, প্রোটিন প্রভৃতি পদার্থ বিদ্যমান। সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটিরিয়ায় পর্দাবৃত থাইলাকয়েড নামক প্লাস্টিড সদৃশ অঙ্গাণু সাইটোপ্লাজমে থাকে। সাইটোপ্লাজমে RNA বিদ্যমান। কোষের মধ্যে ঘন বস্তুকে নিউক্লিয়য়েড (Nucleoid) বলে। ইহার মধ্যে একটি দ্বিতন্ত্রী DNA চক্রাকারে অবস্থান করে।

(ii) **নীলাভ-সবুজ শৈবাল (Blue-green algae)** : ইহারা আদি শৈবাল এবং ব্যাকটিরিয়ার সহিত ইহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই প্রকার শৈবালের দেহ এককোষী অথবা বহুকোষী হয়। ইহাদের কোষপ্রাচীর স্পষ্ট, সুগঠিত এবং সেলুলোজ, পেকটিন ও মিউসিলেজ দ্বারা গঠিত। কোষপ্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ নির্মিত কোষপর্দা বিদ্যমান। কোষের প্রোটোপ্লাজম বহিঃস্থ ক্রোমোপ্লাজম ও অন্তঃস্থ সেন্ট্রোপ্লাজমে বিভক্ত। ক্রোমোপ্লাজম অংশে থাইলাকয়েড নামক সালোক-

সংশ্লেষকারী অঙ্গাণু বিদ্যমান। থাইলাকয়েড-এর মধ্যে ক্লোরোফিল ও অন্যান্য রঞ্জক পদার্থ —যথা, ফাইকোসায়ানিন বিদ্যমান। ইহা ব্যতীত ক্রোমোপ্লাজম অংশে RNA ও বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর কণা দেখা যায়। নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত কিন্তু সেন্ট্রোপ্লাজম অংশে দানাদার ক্রোমাটিন দানা দেখা যায়। ক্রোমাটিন দানা DNA ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত।

(iii) **মাইকোপ্লাজমা (Mycoplasma) বা প্লুরো নিউমোনিয়া সদৃশ জীব (Pleuro-pneumonia like organism বা সংক্ষেপে PPLO) :** ইহারা জীবজগতের ক্ষুদ্রতম স্বাধীনভাবে বসবাসকারী ব্যাকটিরিয়া সদৃশ জীব। ইহাদের ব্যাকটিরিয়ার ন্যায় কোষপ্রাচীর অনুপস্থিত কিন্তু কোষপর্দা বিদ্যমান। ইহারা স্বাধীনজীবী, পরজীবী অথবা মৃতজীবী। একটি পরজীবী প্রজাতি মানুষের নিউমোনিয়া সদৃশ রোগ (প্লুরোনিউমোনিয়া) সৃষ্টি করিতে পারে, সেইজন্য ইহাদের নিউমোনিয়া
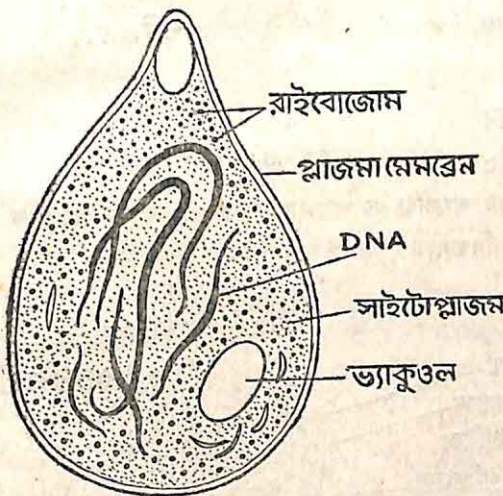
চিত্র 2.6 : মাইকোপ্লাজমা
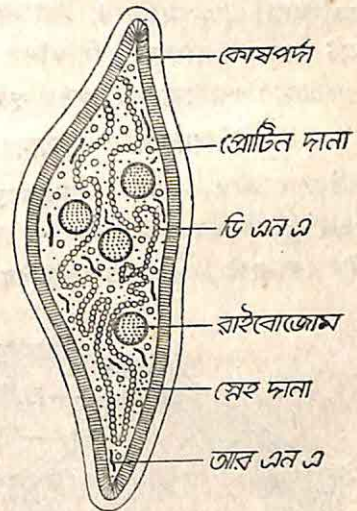
চিত্র 2.7 : রিকেটসিয়া

সদৃশ জীব বলে। বিভিন্ন পরিবেশে ইহারা সর্বদা আকৃতি পরিবর্তন করিতে পারে। ইহারা নিউক্লিয়াসহীন কিন্তু DNA, RNA ও রাইবোজোম বিদ্যমান। অকোষীয় পুষ্টিকর মাধ্যমে ইহাদের বৃদ্ধি ঘটে।

(iv) **রিকেটসিয়া (Rickettsia) :** রিকেটসিয়া ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়ার মধ্যবর্তী একপ্রকার সূক্ষ্মজীব। ইহারা ভাইরাসের ন্যায় পূর্ণ পরজীবী কিন্তু ব্যাকটিরিয়ার ন্যায় কোষপ্রাচীর বিদ্যমান। বিজ্ঞানী দা রোচা লিমা (Da Rocha Lima, 1916) বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড টেলর রিকেটস (Howard Taylor Ricketts)-এর নামানুসারে রিকেটসিয়া গণটির নামকরণ করেন। কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে DNA, RNA, উৎসেচক ও দানাদার খাদ্যবস্তু বিদ্যমান। কোষীয় বস্তুহীন বা কোষহীন পুষ্টিকর মাধ্যমে ইহাদের বৃদ্ধি ঘটে না। রিকেটসিয়া দ্বারা ইঁদুর ও মানুষের টাইফাস জ্বর (Typhus fever) হয়।

(v) স্পাইরোকিটা (Spirochaeta): স্পাইরোকিটা আত্মপ্রাণী বা প্রোটোজোয়া এবং ব্যাকটিরিয়ার মধ্যবর্তী দীর্ঘ সর্পিলাকার আণুবীক্ষণিক জীব। ইহাদের কোষপ্রাচীর নাই কিন্তু তরঙ্গায়িত কোষপর্দা আছে। ইহারা স্বাধীনজীবী, পরজীবী অথবা অনোন্যজীবী (Commensal) হইতে পারে। কোষে নিউক্লিয়াস না থাকিলেও একটি দ্বিতন্ত্রী DNA বিদ্যমান। সাধারণ বা কৃত্রিম অনুশীলন মাধ্যমে (Artificial cultural medium) ইহাদের বৃদ্ধি ঘটে না। মানুষের সিফিলিস রোগ একপ্রকার স্পাইরোকিটা কর্তৃক সৃষ্ট।
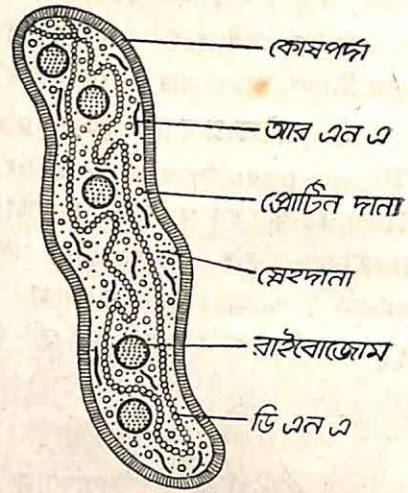
চিত্র 2.8 : স্পাইরোকিটা

2.8 ইউক্যারিওটিক কোষের গঠন (Structure of Eukaryotic cell): উদ্ভিদ ও প্রাণীর সকল কোষের আকৃতি ও গঠনের সাদৃশ্য থাকিলেও প্রত্যেক জীব কোষেরই নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সেইজন্য গঠনগত বিচারে কোন
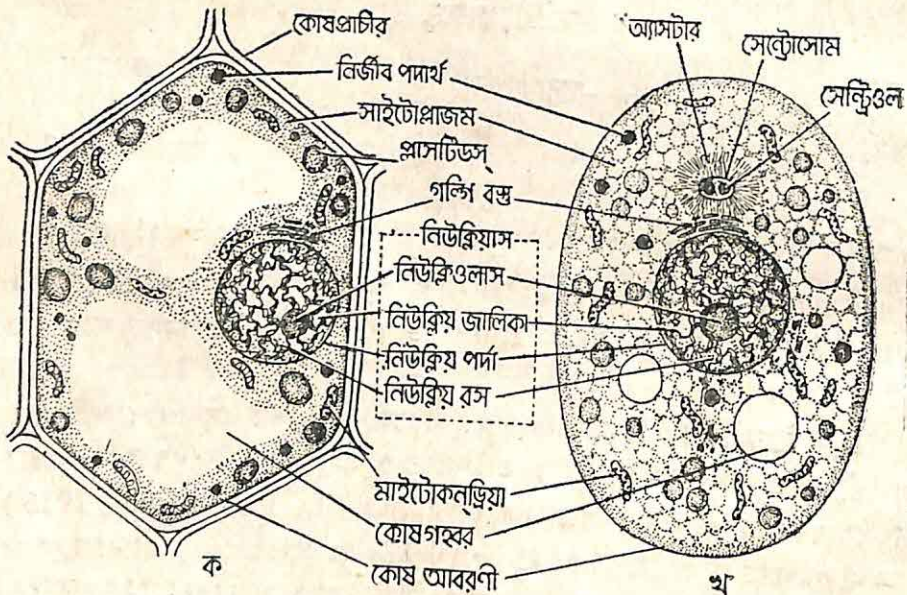
চিত্র 2.9 : (ক) উদ্ভিদ কোষ (খ) প্রাণিকোষ

উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষকে আদর্শকোষ আখ্যা দেওয়া যায় না। তাই কোন একটি কোষ সব উদ্ভিদকোষ বা প্রাণিকোষের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। কোষের সাধারণ

বৈশিষ্ট্য এবং সকল উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া এমন একটি কোষ গঠন করা যাইতে পারে যাহাকে আমরা আদর্শ কোষরূপে অভিহিত করিতে পারি। এমন একটি আদর্শ কোষের বিভিন্ন অংশ নিম্নে আলোচনা করা হইল :
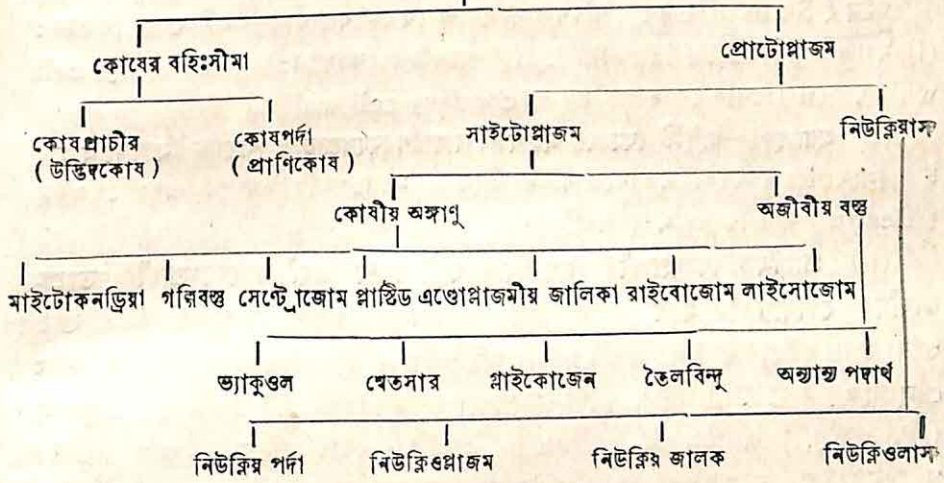
2.9 কোষপ্রাচীর (Cell wall) : উদ্ভিদকোষের প্রোটোপ্লাজমের বাহিরে জড় আবরণকে কোষপ্রাচীর বলে। প্রাণিকোষে কোষপ্রাচীর অনুপস্থিত। জনন-

চিত্র 2.10 : কোষপ্রাচীরের গঠন
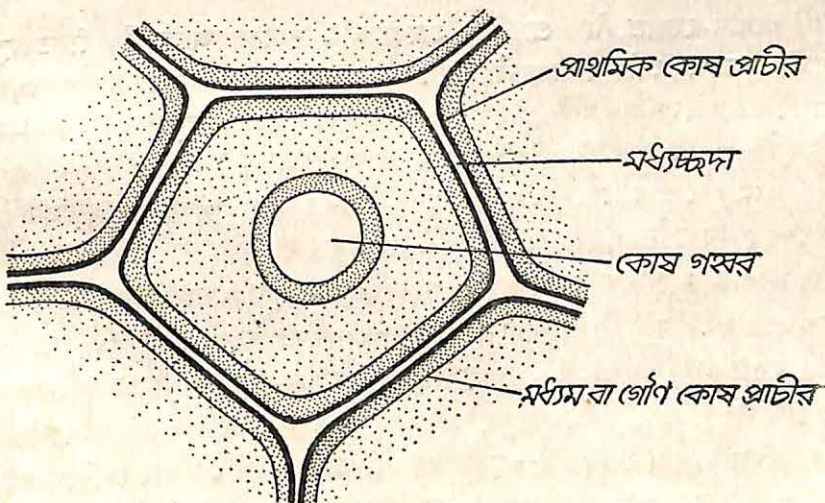
কোষ ও কিছু নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদকোষে কোষপ্রাচীর থাকে না। প্যারেনকাইমা কোষের কোষপ্রাচীর পাতলা আবার জাইলেম কোষে ইহা অপেক্ষাকৃত পুরু। তবে কোষ-প্রাচীর সাধারণত পুরু, শক্ত ও স্থিতিস্থাপক এবং প্রধানত সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। কোষপ্রাচীরে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। ঐ সকল ছিদ্রপথে কোষ সন্নিহিত কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমীয় সংযোগসাধন করে। কোষান্তর সংযোগকারী এই প্রোটোপ্লাজমীয় অংশকে **প্লাসমোডেসমাটা** (Plasmodesmata) বলে।

গঠন (Structure) : পরিণত উদ্ভিদকোষে কোষপ্রাচীর তিনটি স্তরে বিভক্ত : (i) মধ্যচ্ছদা (Middle lamella), (ii) প্রাথমিক কোষপ্রাচীর (Primary cell wall), (iii) গৌণ কোষপ্রাচীর (Secondary cell wall)।

(i) **মধ্যচ্ছদা—দুইটি কোষের মধ্যবর্তী সাধারণ কোষপ্রাচীর স্তরকে মধ্যচ্ছদা বলে।** ইহা সিমেন্টের মত দুইটি কোষকে ধরিয়া রাখে। মধ্যচ্ছদা স্থিতিস্থাপক এবং পেকটিন (Pectin) জাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত।

(ii) **প্রাথমিক কোষপ্রাচীর—মধ্যচ্ছদার দুই পার্শ্বে অবস্থিত কোষপ্রাচীর স্তরকে প্রাথমিক কোষপ্রাচীর বলে।** প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত পদার্থ মধ্যচ্ছদার উপর স্তরে স্তরে জমা হইয়া প্রাথমিক কোষপ্রাচীর গঠিত হয়। ইহা পাতলা, স্থিতিস্থাপক এবং সেলুলোজ (Cellulose), হেমিসেলুলোজ (Hemicellulose), পেকটিন (Pectin), লিগনিন (Lignin) প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট দ্বারা গঠিত। প্যারেনকাইমা, ভাজককলা ও ক্যাম্বিয়ামের কোষের কোষপ্রাচীরে কেবল প্রাথমিক কোষপ্রাচীর বিদ্যমান। প্রাথমিক কোষপ্রাচীর তৈয়ারী হইবার পর কোষ আয়তনে বৃদ্ধি লাভ করে না এবং কোষের বৃদ্ধি বন্ধ হইলে প্রাথমিক কোষপ্রাচীর পুরু হইয়া যায়। ঈষ্ট, ছত্রাক ও লাইকেনের প্রাথমিক কোষপ্রাচীর কাইটিন (Chitin) দ্বারা গঠিত।

(iii) **গৌণ কোষপ্রাচীর—প্রাথমিক কোষপ্রাচীর স্তরের অভ্যন্তরীণ ত্রিস্তরযুক্ত কোষপ্রাচীর স্তরকে গৌণ কোষপ্রাচীর বলে।** কোষের বৃদ্ধি বন্ধ হইবার পর গৌণ কোষপ্রাচীরের উৎপত্তি ঘটে। ইহা সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, লিগনিন, কিউটিন (Cutin), সুবেরিন (Suberin), মোম (Wax) প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা গঠিত। অনেক কোষে গৌণ কোষপ্রাচীরের ভিতরে আর একটি স্তর গঠিত হয়। ইহাকে শেষ কোষপ্রাচীর স্তর (Tertiary wall) বলে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কোষপ্রাচীর স্তরের পদার্থসমূহ অনিয়মিত ও অসমভাবে স্তরীভূত হওয়ায় কোষপ্রাচীরের নানা ধরনের অলঙ্করণ দেখা যায়। যেমন—

ক. বলয়াকার (Annular)—স্থূলীকরণ নির্দিষ্ট ব্যবধানে হওয়ায় দেখিতে আংটির ন্যায় হয়।

খ. সর্পিলাকার (Spiral)—স্থূলীকরণ প্যাঁচানো সিঁড়ির ন্যায় দেখিতে হয়।

গ. জালিকাকার (Reticulate)—স্থূলীকরণ জালকের সৃষ্টি করে।

ঘ. সোপানাকার (Scalariform)—স্থূলীকৃত অংশ সিঁড়ির ধাপের ন্যায়।

ঙ. কূপযুক্ত (Pitted)—স্থূলীকৃত অংশ পুরু ও অস্থূলীকৃত অংশ দেখিতে গর্তের ন্যায়। ঐ অস্থূলীকৃত অংশকে কূপ বলে।

রাসায়নিক উপাদান (Chemical Composition): কোষপ্রাচীরের মূল উপাদান সেলুলোজ। প্রায় 3000 গ্লুকোজ অণু পাশাপাশি অবস্থান করিয়া সেলুলোজ অণু সৃষ্টি করে। প্রায় 100টি সেলুলোজ অণু পরস্পর সমান্তরালভাবে সজ্জিত হইয়া প্রাথমিক গুচ্ছ বা মাইসেলি (Micelle) গঠন করে। 20টি মাইসেলি গুচ্ছ সমান্তরালভাবে থাকিয়া মাইক্রোফ্রাইব্রিল (Microfibril) সৃষ্টি করে। অনেকগুলি মাইক্রোফ্রাইব্রিল একত্রে একটি ম্যাক্রোফ্রাইব্রিলের (Macrofibril) এবং অনেকগুলি ম্যাক্রোফাইব্রিল একত্রে কোষপ্রাচীরের কাঠামো সৃষ্টি করে।

উৎপত্তি (Origin): কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস বিভক্ত হইয়া বিপরীত মেরুতে গমন করিবার পর প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত পেকটিন জাতীয় পদার্থ বিষুব অঞ্চলে (Equator) জমা হইয়া কোষপাত (Cell plate) গঠন করে। এই কোষপাত পরবর্তী পর্যায়ে মধ্যচ্ছদায় রূপান্তরিত হয় এবং মধ্যচ্ছদার উপর কোষপ্রাচীর গঠিত হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা কোষপাত গঠনে গল্গিবস্তুর সক্রিয় ভূমিকা আছে।

কাজ (Functions): (1) কোষের নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে।
(2) প্রোটোপ্লাজমকে বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করে।
(3) কোষের দৃঢ়তা প্রদান করে।
(4) ভেদ্য হওয়ায় বিভিন্ন পদার্থের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে।
(5) প্লাসমোডেসমাটা দ্বারা কোষান্তর সংযোগ স্থাপন করে।

2.10 কোষপর্দা (Cell membrane): উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের প্রোটোপ্লাজমের বাহিরে সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক, সজীব, স্থিতিস্থাপক, পাতলা পর্দাকে কোষপর্দা বলে। অনেক প্রাণিকোষে কোষপর্দার বাহিরে প্রোটিন-শর্করা দ্বারা গঠিত একটি পাতলা ও নরম আবরণী থাকে। ইহাকে কোষ আবরক বা গ্লাইকোক্যালিক্স (Glycocalyx) বলে। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোষপর্দাকে প্রোটোপ্লাজম হইতে পৃথক করা সম্ভব নয় তবে স্নায়ুকোষের মায়েলিন আবরণ (Myelin sheath), রেটিনার রড ও কোণ (Rod and Cone) কোষের কোষ-পর্দাকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

গঠন (Structure): কোষপর্দা খুব পাতলা, অর্ভভেদ্য এবং জীবিত। নিজস্ব ক্ষত পূরণের আংশিক ক্ষমতা, অন্যান্য কোষীয় অঙ্গাণুর সহিত ইহার নিবিড় সম্পর্ক ইত্যাদি প্রমাণ করে যে ইহা জীবিত। বিভিন্ন প্রাণিকোষের কোষপর্দা বিভিন্ন ধরনের। যেমন—লোহিত কণিকার মসৃণ, অ্যামিবার পরিবর্তনশীল, প্যারামিসিয়ামের সিলিয়াযুক্ত, রড ও কোণ কোষের ভাঁজযুক্ত আবার অনেক সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ডিম্বকোষে শক্ত। কোষ আবরণীর স্থানে স্থানে 0·8-5 nm মাপের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দেখা যায়।

ডেনিয়েলি (Danielli, 1935), স্মিট (Schmitt, 1940) প্রভৃতি বিজ্ঞানীর মতানুযায়ী কোষপর্দা একটি ত্রিস্তরযুক্ত (Tri-lamellar) লাইপোপ্রোটিন

পর্দা যাহা প্রায় 7·5 nm পুরু। ইহার বাহির ও ভিতরের স্তর এক অনুস্তর (one molecule thickness) প্রোটিন দ্বারা গঠিত এবং প্রত্যেকেই 2 nm পুরু। এই দুই
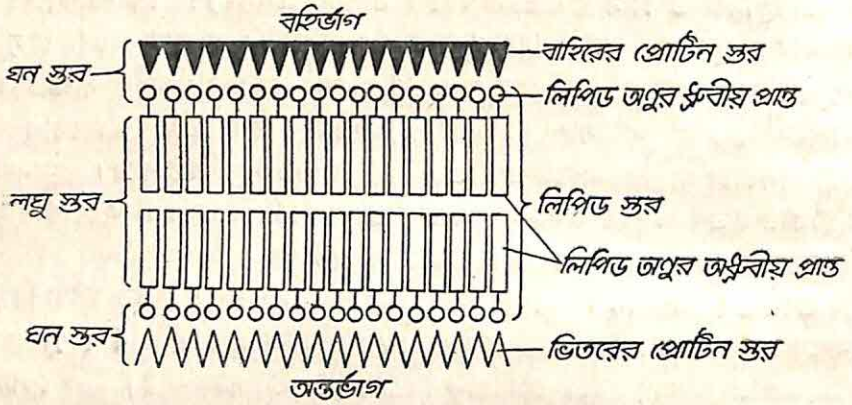
চিত্র 2.11 : কোষপর্দার আলট্রাগঠন

প্রোটিন স্তরের মধ্যে দুইস্তর লিপিড অণু (Bi-molecular layer) মুখোমুখি বিদ্যমান। এই স্তরটি প্রায় 3·5 nm পুরু। কোষমধ্যস্থ সকল অঙ্গাণুর আবরণী কোষপর্দার ন্যায় ত্রিস্তরযুক্ত প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন (P-L-P) দ্বারা গঠিত বলিয়া বিজ্ঞানী রবার্টসন (Robertson, 1959) এইরূপ স্তরযুক্ত সজীব পর্দাকে একক পর্দা (unit membrane) হিসাবে অভিহিত করেন।

রাসায়নিক উপাদান (Chemicai Composition): কোষপর্দায় প্রায় 1-5% কার্বোহাইড্রেট, 30-40% লিপিড ও 60-70% প্রোটিন বিদ্যমান। ইহা ব্যতীত প্রায় 30 প্রকারের উৎসেচকের সন্ধান কোষপর্দায় পাওয়া যায়।

উৎপত্তি (Origin): কোষপর্দার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বিভিন্ন মতবাদ আছে। অনেকে মনে করেন কোষপর্দা এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। আবার অনেকের মতানুযায়ী সাইটোপ্লাজমীয় বহিঃস্তর পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া কোষপর্দার সৃষ্টি করিয়াছে।

কাজ (Functions): (1) কোষমধ্যস্থ বিভিন্ন অঙ্গাণুকে রক্ষা করে।

(2) সন্নিহিত কোষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

(3) প্রভেদক ভেদ্য পর্দা (Selectively Permeable membrane) হিসাবে কাজ করিয়া অভিস্রবণে সাহায্য করে।

(4) পিনোসাইটোসিস ও ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে তরল ও কঠিন খাদ্যগ্রহণে সাহায্য করে।

(5) সক্রিয় শোষণ প্রভৃতির মাধ্যমে আয়ন, অণু-পরমাণুর পরিবহণে সাহায্য করে।

পিনোসাইটোসিস (Pinocytosis, গ্রীক শব্দ Piein = পান করা, Kytos = ফাঁকা স্থান): যে প্রক্রিয়ায় কোষ বাহির হইতে কোষপর্দার সাহায্যে তরল পদার্থ গ্রহণ

করে তাহাকে পিনোসাইটোসিস বলে। এই প্রক্রিয়ায় জলীয় পদার্থ সমেত কোষপর্দার অংশবিশেষ কোষের অভ্যন্তরে ঝুলিয়া পড়ে। পরে এই ঝুলিয়া পড়া অংশটি কোষপর্দা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং কোষপর্দা আবার জুড়িয়া যায়। অ্যামিবায় সর্বপ্রথম এই পদ্ধতি লক্ষ্য করা হয়। 1931 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী লুইস (Lewis) এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোষ হইতে অপ্রয়োজনীয় তরল, উৎসেচক বা উত্তেজক রস বাহিরে আসে। এই পদ্ধতিকে রিভার্স পিনোসাইটোসিস (Reverse Pinocytosis) বলে।

ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis, গ্রীক শব্দ Phagein = ভক্ষণ করা, Kytos = ফাঁকা স্থান): যে প্রক্রিয়ায় কোষ বাহির হইতে কঠিন বস্তু বা জীবাণু কোষপর্দার সাহায্যে গ্রহণ করে তাহাকে ফ্যাগোসাইটোসিস বলে। এই প্রক্রিয়ায় কঠিন বস্তু কোষপর্দার সংস্পর্শে আসিলে কোষপর্দা সমেত কঠিন বস্তু কোষের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে এবং একটি আবরণবেষ্টিত গহ্বরের সৃষ্টি করে। পরে কঠিন পদার্থ সমেত গহ্বর কোষপর্দা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং কোষপর্দা পুনরায় সংযুক্ত হইয়া যায়। এই পদ্ধতিতে অ্যামিবা খাদ্যগ্রহণ অথবা শ্বেতকণিকা জীবাণুকে আত্মসাৎ করে। 1883 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী মেটচুনিকফ (Metchunikoff) ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতি লক্ষ্য করেন ও নামকরণ করেন। কোষ হইতে বিপরীত পদ্ধতিতে অপ্রয়োজনীয় বা অজীর্ণ খাদ্য কোষপর্দা দ্বারা আবৃত হইয়া বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইলে ঐ প্রক্রিয়াকে রিভার্স ফ্যাগোসাইটোসিস (Reverse Phagocytosis) বা এক্সোসাইটোসিস (Exocytosis) বলে।
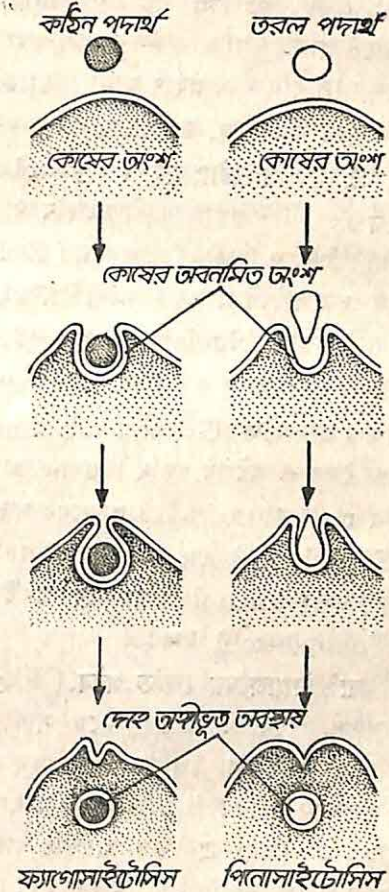
চিত্র 2.12; কোষপর্দার কাজ (ফ্যাগোসাইটোসিস, পিনোসাইটোসিস)

2.11 প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm, গ্রীক শব্দ Protos = প্রথম, plasma = জীবন বা গঠন): কোষমধ্যস্থ অর্ধস্বচ্ছ, দানাদার, থকথকে কোলয়ড জাতীয় সজীব পদার্থকে প্রোটোপ্লাজম বলে। 1839 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী পারকিনজি ইহার নামকরণ করেন। দেহকোষের প্রোটোপ্লাজমকে সোমাটোপ্লাজম (Somatoplasm) এবং

জননকোষের প্রোটোপ্লাজমকে জার্মপ্লাজম (Germplasm) বলে। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে সর্বদা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে অর্থাৎ ইহার মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সেইজন্য বিজ্ঞানী হাক্সলে (Huxley) প্রোটোপ্লাজমকে 'জীবনের ভৌত ভিত্তি' বলিয়া অভিহিত করেন। বিজ্ঞানী সার্প (Sharp) ইহাকে 'গতিশীল ভারসাম্যের তন্ত্র' (A system in dynamic equilibrium) হিসাবে আখ্যা দেন। প্রোটোপ্লাজম অতি জটিল পদার্থ এবং ইহার সঠিক উপাদান নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা গিয়াছে যে ইহা শর্করা, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, নিউক্লিক অ্যাসিড, ভিটামিন, উৎসেচক, খনিজ লবণ প্রভৃতি লইয়া গঠিত।

2.12 সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm, গ্রীক শব্দ Kytos = ফাঁপা, plasma = গঠন) : নিউক্লিয়াস ব্যতীত কোষপর্দা পরিবৃত প্রোটোপ্লাজমকে সাইটোপ্লাজম বলে। 1862 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী কলিকার (Kolliker) নিউক্লিয়াস বেষ্টিত এই সজীব পদার্থের নাম দেন সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজম হইতে কোষীয় অঙ্গাণু (Cell organelle) ও নিউক্লিয়াস (Nucleus) তুলিয়া লইলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাকে সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্র বা হায়ালোপ্লাজম (Hyaloplasm) বা কাইনোপ্লাজম (Kinoplasm) বা গ্রাউণ্ড সাবস্টেন্স (Ground substance) বলে। অর্থাৎ, সাইটোপ্লাজমের যে তরলের মধ্যে জৈব ও অজৈব পদার্থ বিদ্যমান তাহাকে সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্র (Cytoplasmic Matrix) বলে। সাইটোপ্লাজমের স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক, পাতলা বহিঃস্তরকে এক্টোপ্লাজম (Ectoplasm) এবং ভিতরের দানাদার অংশকে এণ্ডোপ্লাজম (Endoplasm) বলে। ভ্যাকুওল (Vacuole) বা গহ্বর বেষ্টিত সাইটোপ্লাজমের পাতলা স্তরকে টোনোপ্লাজম (Tonoplasm) বলে।

সাইটোপ্লাজমের ভৌত গঠন (Physical structure of cytoplasm) : সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে সাইটোপ্লাজম বা সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্রকে অর্ধস্বচ্ছ, বর্ণহীন, আঠালো জেলির ন্যায় থকথকে পদার্থ বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা একপ্রকার কোলয়েড জাতীয় পদার্থ যাহার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার জৈব ও অজৈব পদার্থ ভাসমান অথবা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ধাত্র কোলয়েড স্বভাবের ও উহার মধ্যস্থ জলের পরিমাণের বিভিন্নতার জন্য ইহা তরল অথবা অর্ধকঠিন (Semisolid) অবস্থায় থাকে। ধাত্রের তরল অবস্থাকে জলীয় দশা (Sol Phase) এবং অর্ধকঠিন জেলির ন্যায় অবস্থাকে Gel Phase বলে। সাইটোপ্লাজমের নানাবিধ বিপাকীয় ক্রিয়ার জন্য ধাত্রের এই অবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়—অর্থাৎ সল জেলে এবং জেল সলে পরিবর্তিত হয়।

সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্রের গঠন প্রকৃতি (Appearance of Cytoplasmic matrix) : সাইটোপ্লাজমের ধাত্রের গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রচলিত মতবাদগুলি নিম্নরূপ :

(i) রেটিকুলার মতবাদ (Reticular Theory)—এই মতবাদ অনুযায়ী ধাত্র সূক্ষ্ম জালের মত।

(ii) অ্যালভিওলার মতবাদ (Alveolar Theory)—ধাত্র সাবানের ফেনার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদের মত।

(iii) গ্র্যানুলার মতবাদ (Granular Theory)—ধাত্র বায়োপ্লাস্ট (Bioplast) নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা দ্বারা গঠিত।

(iv) ফাইব্রিলার মতবাদ (Fibrilar Theory)—এই মতবাদ অনুযায়ী ধাত্র তন্তুময়।

(v) কোলয়েড মতবাদ (Colloidal Theory)—ধাত্র একটি জটিল কোলয়েড দ্রবণ।

সাইটোপ্লাজমের ভৌত গুণাবলী (Physical Properties of Cytoplasm) : সাইটোপ্লাজম একটি কোলয়েড দ্রবণ হইবার জন্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য—যেমন সংকোচন ক্ষমতা (Contractibility), সান্দ্রতা (Viscosity), স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity), আসঞ্জনশীলতা (Cohesiveness), বিভিন্ন প্রকার চলন—আবর্তন (Cyclosis), অ্যামিবয়েড চলন (Amoeboid movement), ব্রাউনিয়ান চলন (Brownian movement) বা আঁকাবাঁকা চলন দেখা যায়।

সাইটোপ্লাজমের রাসায়নিক উপাদান (Chemical Composition of Cytoplasm) : সাইটোপ্লাজম অতি জটিল পদার্থ। ইহাতে প্রায় 75% জল বিদ্যমান। তবে জীবকোষ অনুযায়ী জলের পরিমাণের তারতম্য ঘটে। ইহার সঠিক রাসায়নিক উপাদান জানা কঠিন, কারণ সাইটোপ্লাজমে রাসায়নিক পদার্থ দিয়া বিশ্লেষণ করিলে ইহা মরিয়া যায়। মৃত সাইটোপ্লাজম বিশ্লেষণ করিলে প্রধানত কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, সালফার, আয়োডিন, ক্লোরিন প্রভৃতি মৌল পাওয়া যায়। তবে এইসব মৌল শর্করা, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, উৎসেচক, খনিজ লবণ প্রভৃতি উপাদান হিসাবে থাকে। সাইটোপ্লাজম সজীব বলিয়া ইহার উপাদান সবসময় পরিবর্তনশীল।

সাইটোপ্লাজমের কাজ (Functions of Cytoplasm) :

(1) কোষের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সাইটোপ্লাজম দ্বারা সাধিত হয়।

(2) সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্রের বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ কোষের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করে।

(3) বাহ্যিক উদ্দীপনায় (উত্তাপ, আলো, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি) সাড়া দান করে।

(4) ধাত্রের আবর্তিত হইবার ক্ষমতা থাকায় অনেক কোষের বিভিন্ন পদার্থ এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে।

(5) কোষের বিভিন্ন প্রকার রেচন পদার্থ ইহার মাধ্যমে বর্জিত হয়।

(6) কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

(7) ইহা বিভিন্ন প্রকার কোষীয় অঙ্গাণু (Cell organelles) ও অজীবীয় বস্তু (Ergastic substances) ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার কার্য সাধন করে। নিম্নে এইসব অঙ্গাণু ও অজীবীয় বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

2.13 গল্গি বস্তু (Golgi bodies): কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যে সকল সূত্রাকার অথবা গোলাকার অঙ্গাণু পর পর সজ্জিত থাকিয়া প্রধানত কোষের ক্ষরণকার্যে অংশগ্রহণ করে তাহাদিগকে গল্গি বস্তু বলে। 1898 খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় বিজ্ঞানী ক্যামিলিও গল্গি (Camilio Golgi) এক ধরনের পেঁচার স্নায়ুকোষকে অসমিয়াম টেট্রক্সাইড (Osmium tetroxide) ও সিলভার নাইট্রেট দ্বারা রঞ্জিত করিয়া জালকের ন্যায় সূত্রবৎ অংশ দেখিতে পান। পরবর্তীকালে তাঁহার নামানুসারে ইহারা গল্গি বস্তু নামে পরিচিতি লাভ করে। অতীতে জীবকোষে গল্গি বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্ক থাকিলেও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর এই বিতর্কের অবসান ঘটে। ইহারা গল্গি কমপ্লেক্স (Golgi complex), গল্গি অ্যাপারেটাস (Golgi apparatus), লাইপোকনড্রিয়া (Lipochondria), ডিকটিওসোম (Dictyosome) প্রভৃতি নামেও খ্যাত।

অবস্থান বা বিস্তৃতি (Distribution): কোষের কোন সুনির্দিষ্ট স্থানে গল্গি বস্তুর অবস্থান দেখা যায় না। কোষভেদে ইহাদের অবস্থান বিভিন্ন। তবে অনেক কোষে নিউক্লিয়াসের নিকটে সমান্তরালভাবে দলবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়। বহিস্ত্বকের কোষে কোষপর্দা ও নিউক্লীয় পর্দার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ; থাইরয়েড, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি ক্ষরণ কোষে নিউক্লীয় পর্দা ও রসক্ষরণকারী মেরুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ইহাদের দেখা যায়। আবার অধিকাংশ উদ্ভিদকোষে এবং অনেক প্রাণিকোষের সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় গল্গি বস্তু দেখা যায়।

আকার (Shape): ইহারা দীর্ঘ, চ্যাপ্টা, নলাকার, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গোলাকার আকৃতিযুক্ত হয়।

সংখ্যা (Number): গল্গি বস্তুর সংখ্যা বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন তবে ক্ষরণ কোষে ইহাদের সংখ্যা বেশী।

গঠন (Structure): আকার ও আকৃতি অনুযায়ী গল্গি বস্তু তিনপ্রকার, যথা—

(i) ল্যামিলি বা সিস্টার্নি (Lamellae or Cisternae): ইহারা লম্বা চ্যাপ্টা নালিকার ন্যায় ও পরস্পর সমান্তরালভাবে এক বা একাধিক স্তূপ (stack) অবস্থান করে। অধিকাংশ উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষে ইহাদের সংখ্যা 3-7টি। দুইটি ল্যামিলির মধ্যবর্তী দূরত্ব 20-30 nm। প্রতিটি ল্যামিলির দুইটি প্রাচীরের মধ্যবর্তী দূরত্ব 15 nm। ল্যামিলির অগ্রপ্রান্ত বা সৃষ্টির তল (Forming face) নিউক্লীয় আবরণী অথবা এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকার সন্নিকটে থাকে এবং পশ্চাদ্‌প্রান্ত বা পরিণতির তল (Maturing face) ক্ষরণথলির (Secretory vesicle) সঙ্গে সংযুক্ত।

(ii) ভেসিকল্ (Vesicle): ইহারা অতি ক্ষুদ্র এবং ল্যামিলির প্রান্তে অবস্থিত। এই থলিগুলি ল্যামিলির ছিন্নপ্রান্ত হইতে সৃষ্টি হয় এবং ইহাদের ব্যাস 40-80 nm। তবে অধিকাংশ ভেসিকলের ব্যাস 60 nm।
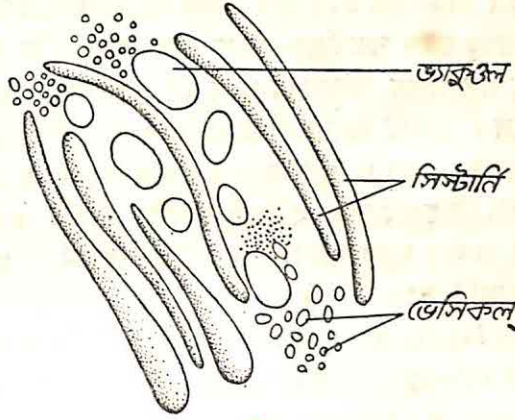
চিত্র 2.13 : গল্গি বস্তুর গঠন

(iii) ভ্যাকুওল বা গহ্বর (Vacuole): ইহারা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গোলাকার থলির ন্যায়। ইহারা ল্যামিলির নিকটে অবস্থিত এবং উহাদের নালীগুলি স্ফীত হইয়া ভ্যাকুওলের সৃষ্টি করে।

গল্গি বস্তুর থলিগুলি মসৃণ, পাতলা এবং প্রায় 7·5 nm পুরু একক পর্দা বা ঝিল্লী দ্বারা গঠিত।

রাসায়নিক উপাদান (Chemical Composition): গল্গি বস্তুর ঝিল্লীতে প্রায় 60% প্রোটিন, 40% লিপিড থাকে। ইহা ব্যতীত ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন C, অ্যাসিড ফসফাটেজ, অ্যালক্যালাইন ফসফাটেজ, ATP-এজ, ADP-এজ প্রভৃতি উৎসেচক পাওয়া যায়।

উৎপত্তি (Origin): ইহারা এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা অথবা নিউক্লীয় আবরণী হইতে সৃষ্ট হইতে পারে। তবে মসৃণ এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকার সহিত সংযুক্ত থাকায় অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ইহারা এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা হইতে সৃষ্ট।

কাজ (Function): (1) বিভিন্ন প্রকার খাদ্যবস্তু—যথা প্রোটিন, লিপিড, লৌহ ও তাম্রযুক্ত বহু যৌগ সঞ্চয় করে।

(2) এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি হইতে হরমোন নিঃসরণে অংশগ্রহণ করে।

(3) প্রাথমিক লাইসোজোম গঠনে অংশগ্রহণ করে।

(4) পরিণত শুক্রাণুর মস্তক টুপি বা অ্যাক্রোজোম (Acrosome) গঠনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

(5) উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর গঠনে সাহায্য করে।

(6) মাইটোকনড্রিয়াকে ATP উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করে।

(7) কার্বোহাইড্রেট, লিপিড সংশ্লেষে এবং উৎসেচক ক্ষরণে অংশগ্রহণ করে।

(8) বিভিন্ন সংশ্লেষিত পদার্থকে কোষের বিভিন্ন স্থানে অথবা কোষের বাহিরে স্থানান্তরিত করিতে অংশগ্রহণ করে।

2.14 প্লাস্টিড (Plastid, গ্রীক শব্দ Plastikas—ছাঁচে তৈয়ারি): উদ্ভিদ-কোষে অবস্থিত সাধারণত রঞ্জক পদার্থযুক্ত অথবা রঞ্জক পদার্থহীন পর্দাবৃত যে-সকল কোষীয় অঙ্গাণু সালোকসংশ্লেষ, খাদ্যসঞ্চয় অথবা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশকে রঞ্জিত করে তাহাদের প্লাস্টিড বলে। 1883 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী স্কিম্পার (Schimper) সর্বপ্রথম প্লাস্টিড কথাটি ব্যবহার করেন। প্লাস্টিডের উপস্থিতি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে জীবদেহে প্লাস্টিড থাকিলে তাহারা উদ্ভিদ এবং না থাকিলে তাহারা প্রাণী। ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক, নীলাভ-সবুজ শৈবাল ব্যতীত সকল উদ্ভিদকোষে প্লাস্টিড বিদ্যমান। প্লাস্টিডের আকার, আয়তন ও সংখ্যা প্রজাতি অনুযায়ী ভিন্ন।

শ্রেণীবিভাগ (Classification): রঞ্জক পদার্থের ভিত্তি করিয়া প্লাস্টিডকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—ক্লোরোপ্লাস্টিড, ক্রোমোপ্লাস্টিড ও লিউকোপ্লাস্টিড। নিম্নে প্রতিটি প্লাস্টিডের বর্ণনা দেওয়া হইল :

1. ক্লোরোপ্লাস্টিড (Chloroplastid, গ্রীক শব্দ Chloros = সবুজ, Plastikas—ছাঁচে তৈয়ারি): সবুজ রঞ্জক পদার্থযুক্ত প্লাস্টিডকে ক্লোরোপ্লাস্টিড বলে। সকল প্রকার প্লাস্টিডের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্টিড সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়াছে। উদ্ভিদের সবুজ অংশে—অর্থাৎ পাতা ও কচি কাণ্ডে ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়।

বিস্তৃতি বা অবস্থান (Distribution): যে-সকল কোষে একটি প্লাস্টিড থাকে, সেখানে প্লাস্টিডের অবস্থান ও সজ্জারীতি নির্দিষ্ট। অধিকাংশ কোষে প্লাস্টিড সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্রে সমভাবে ছড়ানো থাকে।

আকার (Shape): সাধারণত ইহারা গোলাকার, ডিম্বাকার, চ্যাপ্টা অথবা বিভিন্ন আকৃতির হয়। যেমন—ক্ল্যামাইডোমোনাসে কাপের ন্যায়, স্পাইরোগাইরায় ফিতাকৃতি বা সর্পিলাকার, ইডোগেনিয়ামে জালিকাকার প্রভৃতি আকৃতির হয়। ইহাদের ব্যাস প্রায় 4·6 μm।

সংখ্যা (Number): বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টিডের সংখ্যা বিভিন্ন। তবে একই উদ্ভিদের বিভিন্ন কোষে ইহাদের সংখ্যা মোটামুটি নির্দিষ্ট। স্পাইরোগাইরা, ক্ল্যামাইডোমোনাস প্রভৃতি শৈবালের কোষে একটি করিয়া প্লাস্টিড বিদ্যমান। উন্নত উদ্ভিদের প্রতিটি কোষে সাধারণত 20-40টি প্লাস্টিড বিদ্যমান। রিসিনাস (Ricinus) নামক উদ্ভিদের পাতায় প্রতি বর্গ মিলিমিটার স্থানে প্রায় 4,00,000 ক্লোরোপ্লাস্টিড থাকে। তবে ছায়াবৃত স্থানে জন্মানো উদ্ভিদের প্লাস্টিডের সংখ্যা আলোকযুক্ত স্থানে জন্মানো উদ্ভিদ অপেক্ষা বেশী।

গঠন (Structure): ক্লোরোপ্লাস্টিড দুইটি 4-6 nm পুরু একক আবরণী দ্বারা আবৃত। ইহার আবরণীর মধ্যে কোলয়েড জাতীয় সমসত্ত্ব তরল পদার্থকে ধাত্র (Matrix) বা স্ট্রোমা (Stroma) বলে। স্ট্রোমার মধ্যে পর্দাবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

চাকতির ন্যায় দানাকে গ্রানা (Grana) বলে। একটি প্লাস্টিডে গ্রানার সংখ্যা প্রায় 40-60টি এবং ইহাদের মাপ 0 3-1·7 μm। প্রতিটি গ্রানাম (Granum) দ্বি-স্তর

ভ্যাকুওল
ক্লোরোপ্লাস্ট
নিউক্লিয়াস
সাইটোপ্লাজম
পাইরিনয়েড

স্পাইরোগাইরায় ফিতাকৃতি

জিগ্‌নিমায় তারাকৃতি

ক্লোরোপ্লাস্ট
নিউক্লিয়াস

ইউডোগোনিয়ামে জালিকাকার

ক্লোরোপ্লাস্ট

ইউলোথ্রিক্সে বলয়াকার

অ্যান্থোসেরসে পিণ্ডিলাকার

ফ্ল্যাজেলা
নিউক্লিয়াস
পাইরিনয়েড

ক্ল্যামাইডোমোনাসে পেয়ালাকৃতি
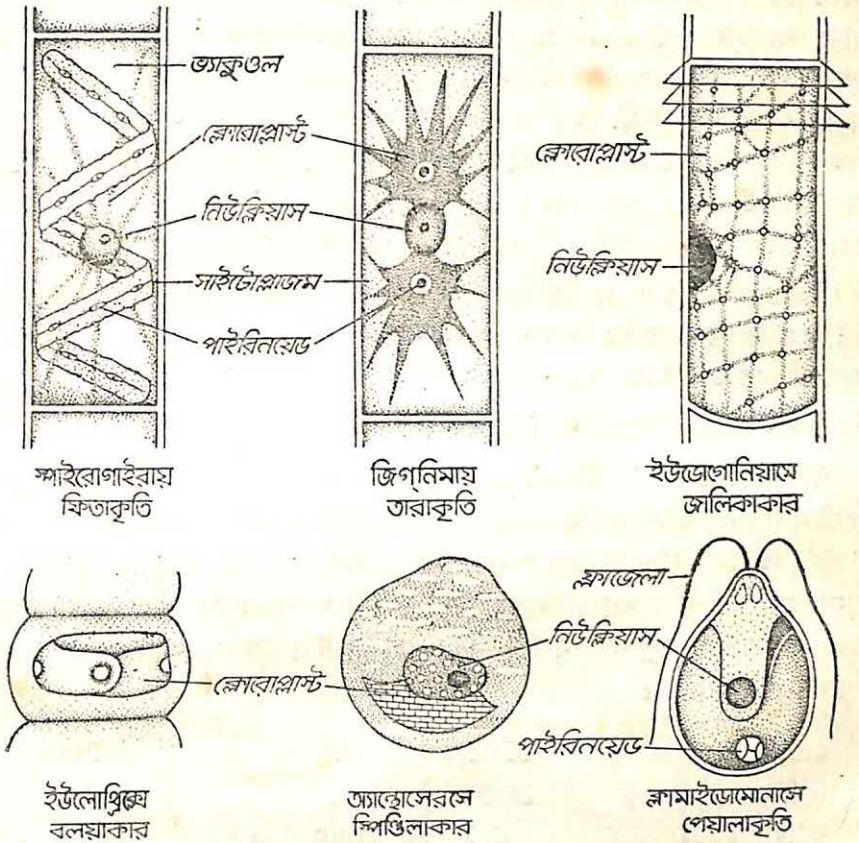
চিত্র 2.14 : বিভিন্ন আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্টিড
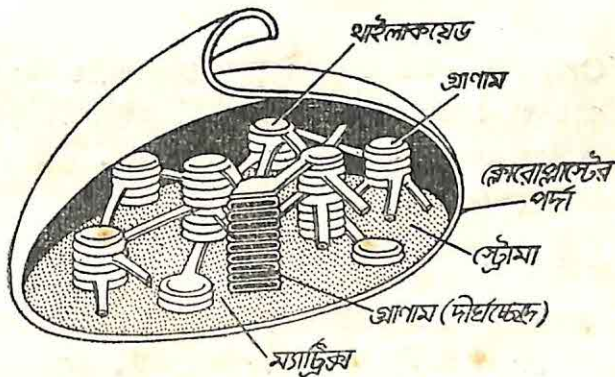
চিত্র 2.15 : ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন

বিশিষ্ট পর্দাবৃত চ্যাপ্টা থলি বা থাইলাকয়েড (Thylakoid) দ্বারা গঠিত। প্রতিটি গ্রানামে ইহাদের সংখ্যা কয়েকটি হইতে 50টি হইতে পারে। থাইলাকয়েডগুলি মুদ্রাস্তম্ভের ন্যায় একটির উপর একটি সজ্জিত থাকে এবং ইহাদের প্রাচীর যুক্ত হইয়া গ্রানা ল্যামিলি (Grana lamellae) গঠন করে। এই গ্রানা ল্যামিলির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার দানা বা কোয়ান্টাজোম (Quantasome) বিদ্যমান। কোয়ান্টাজোমের মধ্যে সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ ক্লোরোফিল ও ক্যারোটিনয়েড (Carotenoid) বিদ্যমান। দুইটি গ্রানার মধ্যবর্তী সংযোগরক্ষাকারী সিঁড়ির ন্যায় অংশকে স্ট্রোমা ল্যামিলি (Stroma lamellae) বলে। ইহাতে উৎসেচক বিদ্যমান কিন্তু কোন রঞ্জক পদার্থ থাকে না।

উচ্চস্তরের উদ্ভিদে ক্লোরোফিল প্রধানত দুই প্রকার—ক্লোরোফিল a এবং b; ইহা ব্যতীত বিভিন্ন শৈবাল ও ডায়াটোমে ক্লোরোফিল c, d, e দেখা যায়। ক্যারোটিনয়েডের মধ্যে কমলা রঙের ক্যারোটিন (Carotene) ও হলুদ বর্ণের জ্যান্থোফিল (Xanthophyll) প্রধান।

রাসায়নিক উপাদান (Chemical Composition) : উদ্ভিদকোষের স্ট্রোমায় প্রোটিন, লিপিড, কার্বোহাইড্রেট, ক্ষুদ্র রাইবোজোম, উৎসেচক, সাইটোক্রোম, RNA, DNA, ভিটামিন K ও E এবং খনিজ আয়ন (Mg, Fe, Cu, Mn, Zn) বিদ্যমান। গ্রানায় ক্লোরোফিল ও ক্যারোটিনয়েড আছে। সালোকসংশ্লেষের আলোকদশা গ্রানায় এবং অন্ধকারদশা স্ট্রোমায় ঘটে। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদকোষের প্লাস্টিডের রাসায়নিক উপাদানগুলি নিম্নরূপ :

প্রোটিন	35-55%	RNA	2-3%
লিপিড	20-30%	DNA	·01-·02%
কার্বোহাইড্রেট	3-7%	ভিটামিন K ও E	অতি অল্প
ক্লোরোফিল	9%	Mg, Fe, Cu, Mn, Zn	অতি অল্প
ক্যারোটিনয়েড	4·5%		

উৎপত্তি (Origin) : উচ্চ স্তরের উদ্ভিদে ক্লোরোপ্লাস্টিড দ্বিস্তরযুক্ত পর্দাবৃত থলির ন্যায় কণিকা বা প্রোপ্লাস্টিড (Proplastid) হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। আলোকের উপস্থিতিতে প্রোপ্লাস্টিডের ভিতরের আবরণী স্থানে স্থানে ভাঁজ এবং পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাইলাকয়েডযুক্ত গ্রানার সৃষ্টি করে।

কাজ (**Function**) :

(1) সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈয়ারি করে।
(2) সালোকসংশ্লেষে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক শক্তি (ATP) সরবরাহ করে।
(3) ফ্যাটি অ্যাসিড ও প্রোটিন সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে।

2. ক্রোমোপ্লাস্টিড (Chromoplastid, গ্রীক শব্দ Chroma=রঙীন): সবুজ রঞ্জক ব্যতীত যে-কোন রঙীন প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্টিড বলে। ইহারা দণ্ডাকার, গোলাকার, তারকার ন্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতির হয়। ক্রোমোপ্লাস্টিডের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ক্যারোটিনয়েড—যথা, কমলা রঙের ক্যারোটিন ও হলুদ রঙের জ্যান্থোফিল নামক রঞ্জক পদার্থ বিদ্যমান। অতি অল্প পরিমাণ ক্লোরোফিল থাকায় ইহারা সক্রিয়ভাবে সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণ করিতে পারে না। পাকা টোমাটোতে লাইকোপেন (Lycopene) নামক একপ্রকার ক্যারোটিনয়েড থাকার জন্য উহাদের রঙ লাল হয়। আবার বিভিন্ন শৈবালের ক্রোমোপ্লাস্টিডে বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ—যথা, ফাইকোএরিথ্রিন (লোহিত শৈবালে), ফাইকোসায়ানিন (নীলাভ-সবুজ শৈবালে) রঞ্জক পদার্থ বিদ্যমান।

ইহারা ক্লোরোপ্লাস্টিড হইতে উৎপন্ন হয় এবং ফুল, ফল, মূল, কাণ্ড প্রভৃতি অঙ্গে থাকিয়া ঐ অঙ্গকে রঞ্জিত করে।

3. লিউকোপ্লাস্টিড (Leucoplastid, গ্রীক শব্দ Leukos=সাদা): রঞ্জক পদার্থবিহীন প্লাস্টিডকে লিউকোপ্লাস্টিড বলে। ইহারা দণ্ডাকার অথবা গোলাকার হয়। উদ্ভিদের যে সমস্ত অঙ্গে আলো পৌছায় না সেই সমস্ত অঙ্গে—যথা, মূল, ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডে ইহারা থাকে। আলোকের উপস্থিতিতে ইহাদের গঠনের পরিবর্তন হয় এবং ক্রোমোপ্লাস্টিড অথবা ক্লোরোপ্লাস্টিডে রূপান্তরিত হইতে পারে। এই কারণে আলুর কোন অংশ আলোর সংস্পর্শে আসিলে সবুজ দেখায়।

$$\text{লিউকোপ্লাস্টিড} \rightleftharpoons \text{ক্লোরোপ্লাস্টিড} \rightleftharpoons \text{ক্রোমোপ্লাস্টিড} \rightleftharpoons \text{লিউকোপ্লাস্টিড}$$

ইহারা খাদ্যবস্তু সঞ্চয় করে। শ্বেতসার সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্টিডকে **অ্যামাইলোপ্লাস্ট** (Amyloplast), প্রোটিন সঞ্চয়কারী প্লাস্টিডকে **অ্যালিউরোপ্লাস্ট** (Aleuroplast) এবং তৈল সঞ্চয়কারী প্লাস্টিডকে **ইলাইয়োপ্লাস্ট** (Elaioplast) বলে। অনেক উদ্ভিদকোষে একই সঙ্গে স্টার্চ ও প্রোটিন দানা একটি প্লাস্টিডে থাকে। শ্বেতসার বা স্টার্চ দানা স্ট্রোমার মধ্যে এবং প্রোটিন দানা গ্রানার মধ্যে থাকে।

2.15 রাইবোজোম (Ribosome): RNA ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত পর্দাবিহীন যে সকল অঙ্গাণু কোষের প্রোটিন সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে তাহাদের রাইবোজোম বলে। ক্লড (Claude) 1943 খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের লক্ষ্য করিলেও বিজ্ঞানী প্যালাডে (Palade) 1955 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ইহাদের নামকরণ করেন। আকৃতিতে অতি ক্ষুদ্র হইলেও ক্ষারীয় রঞ্জক পদার্থ—যথা এরিথ্রোসিন (Erythrocin) দ্বারা রঞ্জিত করিয়া ইহাদের চিহ্নিত করিতে পারা যায়।

অবস্থান (Distribution): প্রোক্যারিওটিক কোষে রাইবোজোম সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। ইউক্যারিওটিক কোষের সাইটোপ্লাজমে অথবা এণ্ডোপ্লাজমিক

জালিকার গাত্রে ইহারা আবদ্ধ থাকে। ইহা ব্যতীত মাইটোকনড্রিয়া এবং প্লাস্টিডের গায়েও দেখা যায়।

আকার (Shape) : রাইবোজোম আকারে গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি। ইহাদের ব্যাস প্রায় 20-25 nm।

সংখ্যা (Number) : কোষে রাইবোজোমের সংখ্যা অসংখ্য। তবে যে সমস্ত কোষে প্রোটিন সংশ্লেষ বেশী হয় সেই কোষগুলিতে ইহাদের সংখ্যা অধিক হয়।
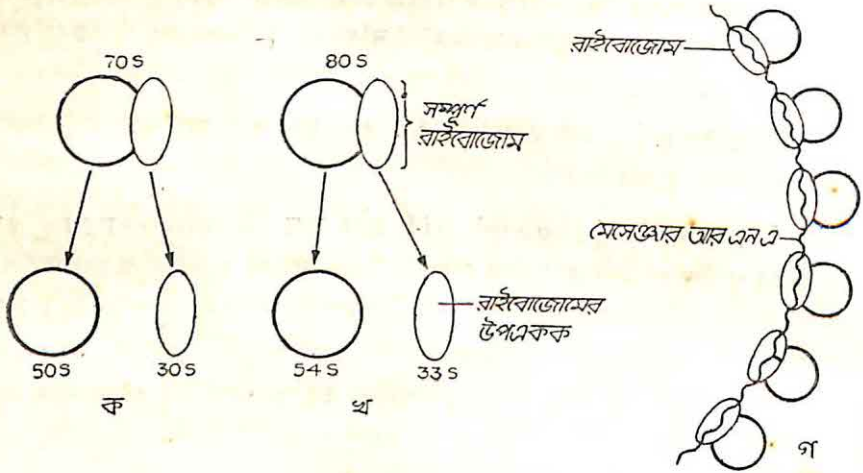
চিত্র 2.16 : ক, খ = রাইবোজোমের গঠন, গ = পলিরাইবোজোম শৃঙ্খল

গঠন (Structure) : প্রতিটি রাইবোজোম দুইটি অধঃএকক (subunit) লইয়া গঠিত। দুইটি অধঃএকক বা অংশের মধ্যে একটি বৃহৎ ও গম্বুজাকৃতি এবং অপরটি ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র অংশটি বৃহৎ অংশের মাথায় অবস্থিত। রাইবোজোমের আয়তন সাধারণত ইহাদের অবক্ষেপ গুণাঙ্কের (Sedimentation coefficient) উপর ভিত্তি করিয়া নির্ণয় করা হয় এবং এই গুণাঙ্কের মাপক স্ভেডবার্গের (Svedberg) নামের আদ্যক্ষর 'S' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। প্রোক্যারিওটিক কোষে রাইবোজোম আকারে ক্ষুদ্র, অবক্ষেপ গুণাঙ্ক 70 S এবং 50 S ও 30 S অধঃএকক লইয়া গঠিত। ইউক্যারিওটিক কোষে রাইবোজোম আকারে বৃহৎ, অবক্ষেপ গুণাঙ্ক 80 S এবং 60 S ও 40 S অধঃএকক লইয়া গঠিত। কোষে ম্যাগনেসিয়ামের ঘনত্ব বেশী হইলে অধঃএকক দুইটি যুক্ত হইয়া যায়, আবার ম্যাগনেসিয়ামের ঘনত্ব কম হইলে অধঃএকক দুইটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অনেক সময় একাধিক রাইবোজোম সংলগ্ন হইয়া একটি পলিজোম (Polysome) বা পলিরাইবোজোম (Polyribosome) গঠন করে।

রাসায়নিক উপাদান (Chemical Composition) : রাইবোজোম প্রায় 60% RNA এবং 40% প্রোটিন দ্বারা গঠিত।

উৎপত্তি (Origin) : রাইবোজোম কোষের নিউক্লিয়াসের নিউক্লিওলাস অংশ হইতে উৎপন্ন হয়।

কাজ (Function) : কোষের প্রোটিন সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করা রাইবোজোমের প্রধান কার্য।

2.16 মাইটোকনড্রিয়া (Mitochondria, গ্রীক শব্দ Mito = সূত্র, Chondrion = দানা) : সাইটোপ্লাজমীয় যে সকল পর্দাবৃত অঙ্গাণুর মধ্যে শ্বসন সম্পন্ন হয় তাহাকে মাইটোকনড্রিয়া বলে। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ইহার বিভিন্ন নামকরণ করেন এবং 1897 খ্রীষ্টাব্দে বেণ্ডা (Benda) ইহার নামকরণ করেন মাইটোকনড্রিয়ন। 1900 খ্রীষ্টাব্দে মাইকেলিস (Michaelis) 'জানুস গ্রীন B' (Ganus green B) রঞ্জক পদার্থ ব্যবহার করিয়া অন্যান্য অঙ্গাণু হইতে ইহাদের সহজে পৃথক করেন।

অবস্থান (Distribution) : মাইটোকনড্রিয়া একক অথবা দলবদ্ধভাবে কোষের সাইটোপ্লাজমের সমস্ত স্থানে বিস্তৃত থাকে। প্রোক্যারিওটিক কোষ ব্যতীত প্রায় সমস্ত কোষে মাইটোকনড্রিয়া বিদ্যমান। স্তন্যপায়ীর পরিণত লোহিত রক্ত-কণিকায় মাইটোকনড্রিয়া থাকে না।

সংখ্যা (Number) : সাধারণত যে-সকল কোষে বিপাকীয় কার্য দ্রুতগতিতে চলে, সেই সকল কোষে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা অধিক। এককোষী শৈবাল মাইক্রোস্টেরিয়াসে (Microsterias) একটি, এককোষী বৃহৎ অ্যামিবা ক্যায়স ক্যায়স (*Chaos chaos*)-এর দেহে 5,00,000 (পাঁচ লক্ষ) থাকে। স্তন্যপায়ীর শুক্রাণুতে প্রায় 25টি, বৃক্ক কোষে প্রায় 300টি এবং যকৃত কোষে 1,000-1,600টি মাইটোকনড্রিয়া থাকে। কিছু কিছু ডিম্বাণুর মধ্যে সর্বাধিক 3,00,000 (তিন লক্ষ) মাইটোকনড্রিয়া থাকে। উদ্ভিদকোষের ক্লোরোপ্লাস্টগুলি মাইটোকনড্রিয়ার কিছু কাজ করে বলিয়া সম্ভবত উহাদের সংখ্যা প্রাণিকোষ অপেক্ষা কম।

আকার ও আয়তন (Size and Shape) : মাইটোকনড্রিয়ন গোলাকার, আংটির ন্যায়, দণ্ডাকার, সূত্রাকার প্রভৃতি আকৃতির হয়। ইহারা দৈর্ঘ্যে 2 μm-7 μm হয় এবং ব্যাস প্রায় ·5 μm হয়।

গঠন (Structure) : মাইটোকনড্রিয়ার গঠন অনেকটা বদ্ধ থলির ন্যায়। ইহা 6 nm পুরু দ্বি-স্তরযুক্ত একক আবরণী দ্বারা আবৃত। বাহিরের আবরণকে বহিঃ-আবরণী এবং ভিতরের আবরণকে অন্তঃআবরণী বলে। আবরণীদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান 6-8 nm এবং ইহাকে বহিঃপ্রকোষ্ঠ বলে। অন্তঃআবরণী বেষ্টিত গহ্বরকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠ বলে এবং ইহা ধাত্রে (Matrix) পূর্ণ। ধাত্রে দানাদার অংশ, এক বা একাধিক দ্বিতন্ত্রী DNA তন্তু এবং ক্রেবসের অম্লচক্রের প্রয়োজনীয় উৎসেচক বিদ্যমান। অন্তঃ-আবরণী অনিয়মিতভাবে ভাঁজ হইয়া ম্যাট্রিক্সের দিকে আঙুলের ন্যায় প্রবর্ধক সৃষ্টি করে। ইহাদের ক্রিস্টি (Cristae) বলে। অন্তঃআবরণী ও ক্রিস্টির অভ্যন্তরীণ প্রাচীরে অসংখ্য দানাদার বস্তু সমদূরত্বে সজ্জিত থাকে। ইহাদের F_1 বস্তু (F_1 particles)

বা অক্সিজোম বা ফারনানডেজ-মোরান অধঃএকক (Farnandez-Moran Subunit) বলে। দানাগুলির ব্যাস প্রায় 8·5 nm এবং দুইটি কণার মধ্যে দূরত্ব 10 nm। মনে
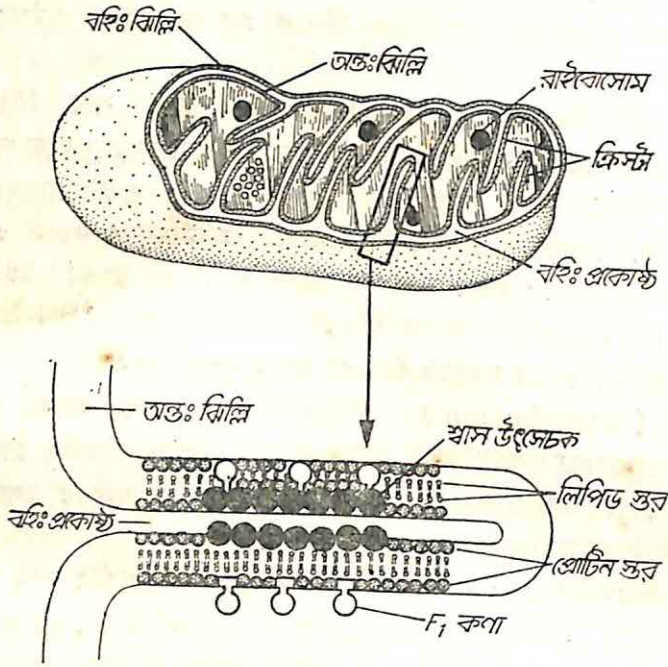
চিত্র 2.17 : মাইটোকনড্রিয়নের আলট্রা গঠন

করা হয় এই কণাগুলি এক বিশেষ ধরনের ATP-এজ উৎসেচক। এই কণাগুলি বৃন্ত ও মস্তকযুক্ত এবং সাধারণত ইহাদের সংখ্যা একটি মাইটোকনড্রিয়ায় 10^4-10^5।

রাসায়নিক উপাদান (Chemical Composition) : মাইটোকনড্রিয়নের 65-70% প্রোটিন, 25-30% লিপিড, 0·5% RNA ও এক বা একাধিক DNA তন্তু বিদ্যমান। নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ DNA হইতে ইহাদের DNA-এর সাইটোসিন (Cytosine) ও গুয়ানিন (Guanine) এর পরিমাণ বেশী। ইহা ব্যতীত প্রায় 70 প্রকার এনজাইম ও কো-এনজাইম বিদ্যমান।

উৎপত্তি (Origin) : অনেকে বলেন যে কোষমধ্যস্থ লিপিড ও প্রোটিন হইতে স্বাধীনভাবে মাইটোকনড্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে। আবার কেহ কেহ মনে করেন পূর্ব-সৃষ্ট মাইটোকনড্রিয়া অথবা কোষপর্দা অথবা এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা হইতে মাইটোকনড্রিয়া সৃষ্টি হয়।

কাজ (Function) :

1. ক্রেবসের অম্লচক্র ও ইলেকট্রন পরিবহণ চক্র মাইটোকনড্রিয়ায় সম্পন্ন হয় বলিয়া প্রচুর পরিমাণ ATP উৎপন্ন হয়। তাই ইহাকে কোষের শক্তিঘর (Power house of cell) বলে।

2. ফ্যাট বিপাকে অংশগ্রহণ করে।

2.17 এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (Endoplasmic reticulum) : সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্রে একক পর্দাযুক্ত যে জটিল তন্ত্র জালিকাকারে বিন্যস্ত থাকিয়া কোষকে অসম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে পরিণত করে তাহাদের এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা বা সংক্ষেপে ER বলে। সাইটোপ্লাজমের এণ্ডোপ্লাজমীয় অংশে ইহারা পরস্পর যুক্ত হইয়া নালিকাযুক্ত জালিকার সৃষ্টি করে বলিয়া ইহাদের এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা বলা হয়। 1945 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী পোর্টার (Porter), ক্লড (Claude) ও ফুলাম (Fullam) ইহাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন এবং পরবর্তীকালে পোর্টার ইহাদের নামকরণ করেন।

অবস্থান বা বিস্তৃতি (Distribution) : ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক ও নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদকোষ ব্যতীত প্রায় সকল উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের সাইটোপ্লাজমে সর্বত্র জালিকাকারে বিন্যস্ত।

আকার (Shape) : ইহারা নলাকার, গোলাকার বা অনিয়ত শাখাযুক্ত হয়।

সংখ্যা (Number) : কোষের আয়তন বেশী হইলে ইহাদের সংখ্যা বেশী হয়।
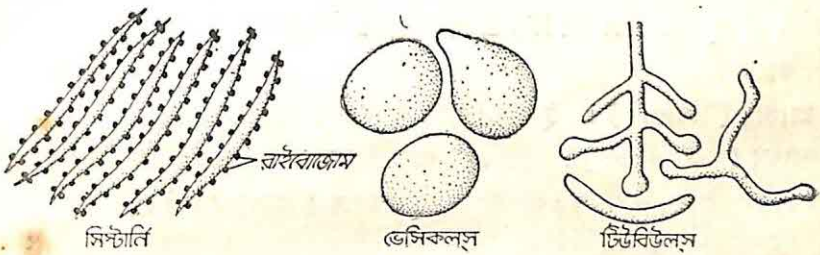
চিত্র 2.18 : বিভিন্ন প্রকার এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা

গঠন (Structure) : ইহারা 5-6 nm পুরু একক পর্দাবৃত বিভিন্ন আকৃতির সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু। কোষ পর্দা হইতে নিউক্লিয় পর্দা পর্যন্ত ইহারা বিস্তৃত। যখন ER-এর পর্দায় রাইবোজোম দানাযুক্ত থাকে তখন তাহাদের অমসৃণ (Rough) ER এবং রাইবোজোম না থাকিলে তাহাদের মসৃণ (Smooth) ER বলে। আকৃতি অনুযায়ী ER তিন প্রকার : (i) সিস্টারনি (Cisternae)—লম্বা, চ্যাপ্টা আকৃতিযুক্ত স্তূপাকারে (stack) সজ্জিত, (ii) ভেসিকল্ (Vesicle)—গোলাকার বা ডিম্বাকার এককভাবে বিন্যস্ত, (iii) টিউবিউলস্ (Tubules)—অনিয়মিত বিন্যাসযুক্ত জালের আকারে সজ্জিত।

উৎপত্তি (Origin) : নিউক্লিয় আবরণীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় অনুমান করা হয় ইহারা নিউক্লিয় আবরণী হইতে সৃষ্ট।

কাজ (Function) : 1. সাইটোপ্লাজমের কাঠামো গঠন করিয়া উহার যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করে।

2. ইহা কোষকে অসম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত রাখে, ফলস্বরূপ সাইটোপ্লাজমের বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া পৃথক থাকে।

3. সংবহনতন্ত্রের ন্যায় বিভিন্ন প্রকার বস্তুর অন্তঃকোষীয় সংবহনে (Intracellular transport) অংশগ্রহণ করে।

4. প্রোটিন, লিপিড, লাইপোপ্রোটিন, গ্লাইকোজেন সংশ্লেষে ER-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান।

5. কোষমধ্যস্থ স্পন্দনকে (Impulse) পেশী ও স্নায়ুর ন্যায় বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে।

2.18 লাইসোজোম (Lysosome, গ্রীক শব্দ Lysis = জারক, Soma = দেহ) : সাইটোপ্লাজম মধ্যস্থ পর্দাবৃত অসংখ্য আর্দ্রবিশ্লেষক উৎসেচক (Hydrolytic enzymes) যুক্ত ক্ষুদ্র অঙ্গাণুকে লাইসোজোম বলে। 1955 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ডি ডুভে (De Duve) ইঁদুরের যকৃৎকোষে ইহাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়া নামকরণ করেন লাইসোজোম।

বিস্তৃতি (Distribution) : প্রায় সকল প্রাণিকোষের সাইটোপ্লাজমের বিভিন্ন স্থানে লাইসোজোম দেখা যায়। সাধারণত উদ্ভিদকোষে লাইসোজোম থাকে না তবে বিজ্ঞানী গাহম্ (Gahm) 1973 খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন উদ্ভিদকোষের মধ্যে ইহাদের অবস্থান লক্ষ্য করেন।

আকার (Shape) : ইহাদের ব্যাস সাধারণত 0 2-0 8 μm হয়।

সংখ্যা (Number) : বিভিন্ন কোষে ইহাদের সংখ্যা বিভিন্ন। তবে ক্ষয়শীল বা ক্ষরণশীল কোষ—যথা শ্বেতকণিকা বা যকৃৎকোষে ইহাদের সংখ্যা বেশী।
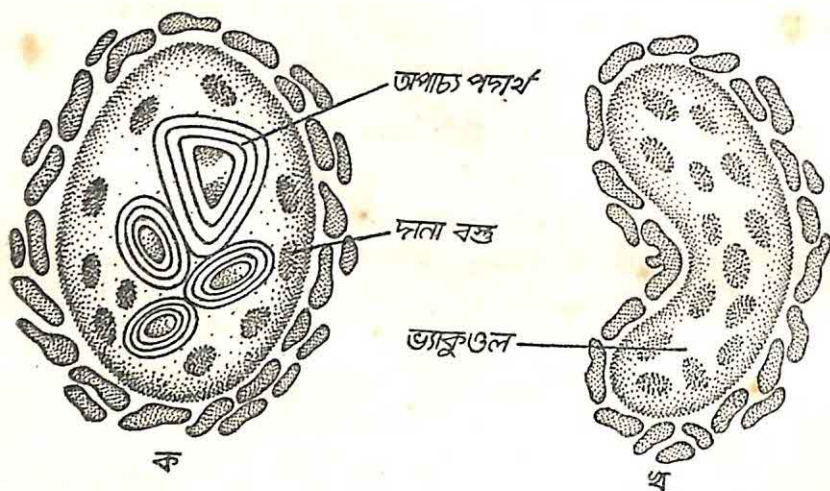
চিত্র 2.19 : ক, খ = দুইটি ভিন্ন আকৃতির লাইসোজোম

গঠন (Structure) : লাইসোজোম একটি লাইপোপ্রোটিন বা একক পর্দাবৃত উৎসেচকযুক্ত থলিবিশেষ। থলির মধ্যে উৎসেচকগুলি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, কিন্তু পর্দা ফাটিয়া গেলে উহারা বাহির হইয়া সক্রিয় হয়। গঠন অনুসারে ইহারা চারি প্রকারের।

(i) প্রাথমিক লাইসোজোম (Primary lysosome)—ইহারা গল্গি বস্তু হইতে সৃষ্ট উৎসেচকযুক্ত একপ্রকার থলি।

(ii) গৌণ লাইসোজোম (Secondary lysosome)—ফ্যাগোসাইটোসিস বা পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় গৃহীত বহিরাগত বস্তুসমেত গহ্বরকে ফ্যাগোসোম (Phagosome) বলে। এই ফ্যাগোসোমের সহিত প্রাথমিক লাইসোজোমের সংযোগে ইহা গঠিত হয়।

(iii) রেসিডুয়াল বডি (Residual body)—অপাচ্য বস্তুযুক্ত গৌণ লাইসোজোমকে রেসিডুয়াল বডি বলে।

(iv) অটোফ্যাগিক ভ্যাকুওল (Autophagic Vacuole)—ইহা একপ্রকার বিশেষ লাইসোজোম যাহার মধ্যে মাইটোকনড্রিয়া বা এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকার অংশ জারিত হয়।

রাসায়নিক উপাদান (Chemical composition): লাইসোজোমের মধ্যে অসংখ্য আর্দ্রবিশ্লেষক উৎসেচক বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে অ্যাসিড রাইবোনিউক্লিয়েজ, অ্যাসিড ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ, অ্যাসিড ফসফাটেজ, ক্যাথেপসিন, কোলাজিনেজ প্রধান।

উৎপত্তি (Origin): ইহারা গল্গি বস্তু কর্তৃক উৎপন্ন থলি (Vesicle) হইতে সৃষ্ট।

কাজ (Function): 1. হেটারোফ্যাগি (Heterophagy)—লাইসোজোম-নিঃসৃত উৎসেচক কোষে গৃহীত বিভিন্ন প্রকার খাদ্যবস্তু, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতিকে জারিত করে।

2. অটোফ্যাগি (Autophagy)—লাইসোজোমের উৎসেচকগুলি বিভিন্ন কোষীয় অঙ্গাণুর অংশকে পরিপাক করিতে পারে। সেইজন্য এই প্রক্রিয়াকে অটোফ্যাগি বা নিজদেহ ভক্ষণ বলে।

3. অটোলাইসিস (Autolysis)—কোষের মৃত্যু ঘটিলে অথবা কোন কারণে লাইসোজোমের ঝিল্লী বিনষ্ট হইলে লাইসোজোম-মধ্যস্থ উৎসেচক বাহির হইয়া কোষকে ভাঙ্গিয়া সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া দেয়। এইজন্য লাইসোজোমকে সুইসাইড ব্যাগ (Suicide bag) বলে।

4. শ্বেতকণিকার জীবাণু ভক্ষণ বা ব্যাঙাচির লেজ নিঃশেষিত হওয়ায় লাইসোজোমের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বিদ্যমান।

2.19 সেন্ট্রোজোম ও সেন্ট্রিওল (Centrosome and Centriole, গ্রীক শব্দ Kentron—কেন্দ্র, Soma = দেহ): নিউক্লিয় পর্দার সন্নিকটে অবস্থিত যে সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু কোষবিভাজনের সময় স্পিণ্ডল গঠন করে তাহাকে সেন্ট্রোজোম বলে। 1888 খ্রীষ্টাব্দে বোভেরি (Boveri) ইহার নামকরণ করেন। সেন্ট্রোজোম-মধ্যস্থ এক বা একাধিক ঘন বস্তুকে সেন্ট্রিওল বলে।

বিস্তৃতি (Distribution): স্নায়ুকোষ ব্যতীত সকল প্রাণিকোষে সেন্ট্রিওল বিদ্যমান। নিম্নশ্রেণীর সিলিয়া ও ফ্লাজিলাযুক্ত শৈবাল—যেমন, ক্ল্যামাইডোমোনাসে সেন্ট্রিওল দেখা যায়। কোষবিভাজনের সময় ইহারা কোষের দুই প্রান্তে অবস্থান করে।

আকার (Shape): সেন্ট্রিওল আকৃতিতে নলাকার এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় 0·3-0 5 μm এবং ব্যাস প্রায় 0·15 μm।

সংখ্যা (Number): কোষবিভাজনের পূর্বে একটি থাকে, তবে কোষবিভাজনের সময় দুইটি সেন্ট্রিওল পরস্পরের সহিত সমকোণে অবস্থান করে।

গঠন (Structure): ইহা দুইমুখ খোলা লম্বা নলের ন্যায় অঙ্গাণু। ইহার প্রাচীর নয়টি ত্রয়ী অণুনালিকা (Triplet tubules) দ্বারা গঠিত। অণুনালিকাগুলি গাড়ির চাকার ন্যায় একটি কেন্দ্রীয় অক্ষকে ঘিরিয়া সমদূরত্বে অবস্থান করে। ত্রয়ী অণুনালিকার বাহির হইতে ভিতরের নালিকাকে যথাক্রমে a, b ও c হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি ত্রয়ী অণুনালিকার ভিতরের নালিকা পার্শ্ববর্তী ত্রয়ী অণুনালিকার বাহিরের নালিকার সঙ্গে যুক্ত। কেন্দ্রে কোন অণুনালিকা বা বিশেষ বাহু থাকে না। সেন্ট্রিওলের চারিপার্শ্বের সাইটোপ্লাজমীয় অংশকে সেণ্টোস্ফিয়ার বলে।
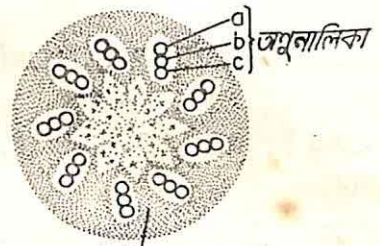
চিত্র 2.20 : সেন্ট্রিওলের গঠন
(a, b, c=অণুনালিকা)

রাসায়নিক উপাদান (Chemical composition): সেন্ট্রিওলের প্রধান উপাদান হইল প্রোটিন। ইহা ব্যতীত ইহার মধ্যে DNA বিদ্যমান।

উৎপত্তি (Origin): সেন্ট্রিওল মাইটোকনড্রিয়নের ন্যায় অর্ধ স্বয়ংশাসিত (semiautonomous) কোষীয় অঙ্গাণু প্রোসেন্ট্রিওল হইতে উৎপন্ন হয়। কোষবিভাজনের সময় একটি সেন্ট্রিওল বিভক্ত হইয়া দুইটি সেন্ট্রিওলের সৃষ্টি করে।

কাজ (Function): (1) কোষবিভাজনের সময় বেম (spindle) ও বেমতন্তু (spindle fibre) গঠন করে। (2) সিলিয়াম ও ফ্লাজিলাম গঠনে অংশগ্রহণ করে। (3) শুক্রাণুর পুচ্ছ গঠন করে। (4) সাইটোপ্লাজম মধ্যস্থ অণুনালিকার (Microtubule) সংগঠন ও সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ করে। (5) কোষবিভাজনের সময় ক্রোমোজোমের প্রান্তীয় গমনে সাহায্য করে।

2.20 অণুনালিকা (Microtubules): ইউক্যারিওটিক কোষের সেণ্ট্রিওল, সিলিয়াম বা ফ্লাজিলাম গঠনকারী সূক্ষ্ম নলাকার অংশকে অণুনালিকা বলে। 1953 খ্রীষ্টাব্দে ই. ডি রবার্টিস এবং সি. এম. ফ্রান্‌চি (E. De Robertis and C. M. Franchi) স্নায়ুকোষের অ্যাক্সোপ্লাজমে ইহাদের সর্বপ্রথম দেখিতে পান এবং এই অণুনালিকাগুলিকে নিউরোটিউবিউল (Neurotubule) নামে অভিহিত করেন।

বিস্তৃতি (Distribution): কোষের সাইটোপ্লাজমের সর্বত্র অথবা সেন্ট্রিওল, সিলিয়া বা ফ্লাজিলায় ইহাদের দেখা যায়।

আকার (Shape): ইহাদের দেখিতে সূক্ষ্ম নলের ন্যায়।

সংখ্যা (Number): ইহাদের সংখ্যা প্রতিটি কোষে অসংখ্য।

গঠন (Structure): অণুনালিকা 25-30 nm ব্যাসযুক্ত দীর্ঘ, ঋজু, নলাকার সূত্রবিশেষ। ইহাদের স্থায়িত্ব কোষ অনুযায়ী ভিন্ন হয়। সাইটোপ্লাজম ও বেমের (spindle) অণুনালিকা অস্থায়ী (Labile) কিন্তু সিলিয়াম ও ফ্লাজিলামের
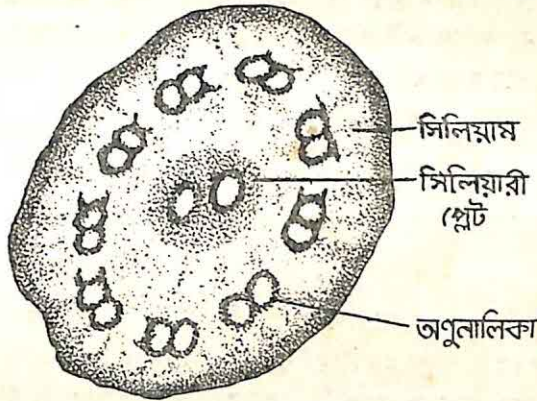
চিত্র 2.21 : অণুনালিকার গঠন

অণুনালিকা প্রতিরোধক্ষম (Resistant) হয়। সিলিয়া ও ফ্লাজিলার প্রস্থচ্ছেদে দেখা যায় যে ইহাদের কেন্দ্রে দুইটি এককভাবে বিন্যস্ত ক্ষুদ্র অণুনালিকা এবং ঐ কেন্দ্রীয় অংশের বাহিরে চক্রাকারে সজ্জিত নয়টি জোড়ায় জোড়ায় অণুনালিকা বিদ্যমান। তাই সিলিয়া বা ফ্লাজিলার অণুনালিকা (9+2) প্রকৃতির হয়।

রাসায়নিক উপাদান (Chemical Composition): ইহারা প্রধানত টিউবিউলিন (Tubulin) নামক প্রোটিন দ্বারা গঠিত।

কাজ (Function). (1) উদ্ভিদকোষের সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর গঠনে সাহায্য করে।

(2) স্নায়ুকোষের কোষীয় কঙ্কাল (Cytoskeleton) রূপে কাজ করিয়া উহার দৃঢ়তা প্রদান করে।

(3) কোষবিভাজনের সময় বেমতন্তু তথা বেম (spindle) সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে এবং বেমের সংকোচন ও ক্রোমোজোমের চলনে অংশগ্রহণ করে।

(4) সিলিয়া, ফ্লাজিলা ও সেন্ট্রিওল গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(5) কোষ-মধ্যস্থ বিভিন্ন অণু, দানা (granule) অথবা থলিকে (Vesicle) কোষের এক স্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবহণে সাহায্য করে।

2.21 নিউক্লিয়াস (Nucleus, ল্যাটিন—Nucleus = শাঁস) : পর্দাবৃত ও ক্রোমোজোমযুক্ত গোলাকার কেন্দ্রীয় কোষীয় অঙ্গাণুকে নিউক্লিয়াস বলে। 1831 খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown) নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন। নিউক্লিয়াস কোষের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু কিন্তু সাইটোপ্লাজম ব্যতীত ইহা বাঁচিতে পারে না। আবার কোষ হইতে নিউক্লিয়াস বাহির করিয়া আনিলে সাইটোপ্লাজমের জৈবনিক কার্য বন্ধ হইয়া যায় এবং কোষের মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ, নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। একটি অ্যামিবা হইতে অতি সতর্কতার সহিত সূক্ষ্ম সূচের (Microneedle) দ্বারা নিউক্লিয়াস বাহির করিয়া আনিলে অক্ষত সাইটোপ্লাজম কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য ইহা বাঁচিতে পারিবে না, কারণ নিউক্লিয়াস ব্যতীত কোষের সমস্ত জৈবনিক কার্য বন্ধ হইয়া যাইবে এবং পরিশেষে মৃত্যু ঘটিবে।

বিস্তৃতি (Distribution) : সকল ইউক্যারিওটিক কোষের সাধারণত কেন্দ্রে সুগঠিত বা প্রকৃত নিউক্লিয়াস থাকে। ইহা অপরিণত উদ্ভিদকোষের কেন্দ্রে থাকিলেও পরিণত কোষে বৃহৎ কোষগহ্বরের উপস্থিতির জন্য কোষপর্দার সংলগ্ন হইয়া অবস্থান করে।

সংখ্যা (Number) : সাধারণত প্রতিটি কোষে একটিমাত্র নিউক্লিয়াস থাকে তবে অনেক সময় একাধিক নিউক্লিয়াসও দেখা যায়। যেমন আদ্যপ্রাণী প্যারামিসিয়ামে, যকৃৎ কোষ ও তরুণাস্থি কোষে দুইটি করিয়া নিউক্লিয়াস বিদ্যমান। আবার স্তন্যপায়ীর সরেখ মাংসপেশীর পেশীতন্তুতে, অস্থি কোষে (Osteoclast), উদ্ভিদের ক্ষীর নালী (Latex tube), ছত্রাক ও ভাউকেরিয়া নামক শৈবালের কোষে বহু নিউক্লিয়াস দেখা যায়। বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রাণিকোষকে সিনসিটিয়াল কোষ (Syncitial cell) এবং বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত উদ্ভিদকোষকে সিনোসাইট (Coenocyte) বলে। উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলার সীভনলে এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত।

আকৃতি (Shape) : ইহা গোলাকার, ডিম্বাকার, মাকুর ন্যায়, অনিয়ত (Irregular) বা খণ্ডিত (Lobed) হইতে পারে।

আয়তন (Size) : নিউক্লিয়াসের আয়তন বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন। সক্রিয় কোষে নিউক্লিয়াসের আয়তন বড়। প্রতিটি কোষে নিউক্লিয়াসের আয়তন কোষের সাইটোপ্লাজমের সহিত প্রত্যক্ষ সমানুপাতিক (Directly proportional) নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের এই অনুপাতকে নিউক্লিও-সাইটোপ্লাজমিক সূচক (Nucleo-cytoplasmic index) বা NP বলে। বিজ্ঞানী হার্টউইগের (Hertwig) সূত্র অনুযায়ী $NP = \frac{Vn}{Vc - Vn}$, যেখানে Vn = নিউক্লিয়াসের আয়তন, Vc = সাইটোপ্লাজমের আয়তন। সাইটোপ্লাজমের আয়তনের তুলনায় নিউক্লিয়াসের

আয়তন খুব কম হইলে সেই নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের সকল কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না।

গঠন (Structure): নিউক্লিয়াস নিম্নলিখিত অংশ লইয়া গঠিত—

(1) নিউক্লিয় পর্দা (Nuclear membrane), (2) নিউক্লিয় রস (Nucleoplasm), (3) নিউক্লিয় জালিকা বা ক্রোমাটিন জালিকা (Chromatin reticulum), (4) নিউক্লিওলাস (Nucleolus)।

নিউক্লিয় পর্দা: নিউক্লিয়াসকে বেষ্টন করিয়া যে পাতলা, অর্ধভেদ্য সজীব পর্দা থাকে তাহাকে নিউক্লিয় পর্দা বলে। ইহা কোষপর্দার ন্যায় দুইটি একক—বহিঃপর্দা ও অন্তঃপর্দা—লইয়া গঠিত। বহিঃপর্দা এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকার সহিত যুক্ত এবং রাইবোজোমযুক্ত হয়। বহিঃপর্দা ও অন্তঃপর্দার মধ্যবর্তী 10-15 nm ব্যবধানকে
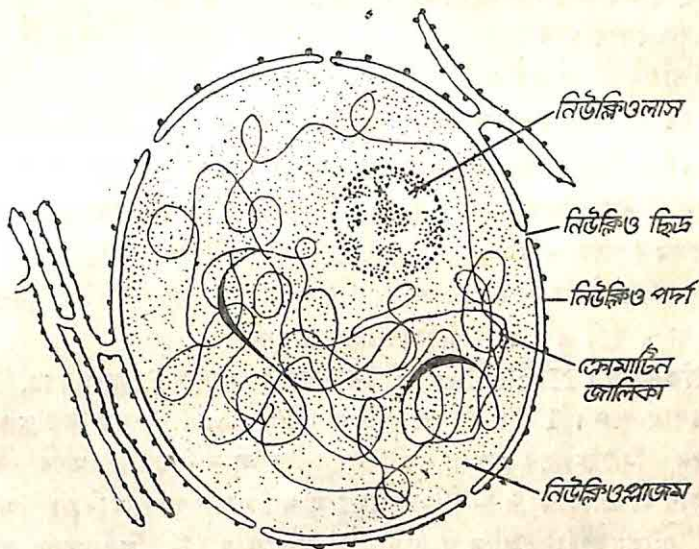
চিত্র 2.22 : একটি আদর্শ নিউক্লিয়াসের গঠন

পেরিনিউক্লিয়ার স্থান (Perinuclear space) বলে। নিউক্লিয় পর্দা অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত হয় অর্থাৎ ঐ স্থানে বহিঃপর্দা ও অন্তঃপর্দা পরস্পর যুক্ত থাকে। বিভিন্ন উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের প্রতি বর্গ মাইক্রোমিটার নিউক্লিয় পর্দার উপর 40-145টি ছিদ্র বিদ্যমান। ছিদ্রগুলি অষ্টভুজাকৃতি (Octagonal) এবং ব্যাস প্রায় 60 nm। ছিদ্রের চারিপার্শ্বে প্রোটিন নির্মিত গোলাকার অঞ্চলকে অ্যানুলি (Annúli) বলে। ছিদ্র ও অ্যানুলিকে একত্রে পোর কমপ্লেক্স (Pore complex) বলে। এই পোর কমপ্লেক্স নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে।

নিউক্লিয় রস বা নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm): নিউক্লিয় পর্দা বেষ্টিত স্বচ্ছ, সমসত্ত্ব, দানাদার, অম্লধর্মী তরল পদার্থকে নিউক্লিয় রস বলে। ইহার রাসায়নিক

সংগঠন খুবই জটিল এবং এই তরলের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থ দ্রবীভূত অথবা ভাসমান অবস্থায় থাকে।

নিউক্লিয় রসে DNA বা ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড, RNA বা রাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড, ক্ষারীয় প্রোটিন (প্রোটামিন, হিস্টোন), এবং আম্লিক প্রোটিন বা নন-হিস্টোন প্রোটিন (ফসফো প্রোটিন) বিদ্যমান। ইহা ব্যতীত DNA-পলিমারেজ, RNA-পলিমারেজ, NAD-সিনথেটেজ, ফসফাটেজ, গুয়ানেজ, ফসফোরাইলেজ প্রভৃতি প্রধান এনজাইম এবং ATP, অ্যাসিটাইল Co-A, NAD প্রভৃতি কো-এনজাইম থাকে। এই সমস্ত পদার্থের সহিত সামান্য পরিমাণ সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাস প্রভৃতি খনিজ পদার্থ বিদ্যমান।

নিউক্লিয় জালিকা (Nuclear reticulum) : নিউক্লিয় রসে অবস্থিত লম্বা, প্যাঁচানো, সূতার ন্যায় সরু জালিকাকে নিউক্লিয় জালিকা বলে। কোষের ইন্টারফেজ দশায় অর্থাৎ কোষ যখন বিভাজিত হয় না তখন এই জালিকা সুন্দরভাবে দেখা যায়। কোষ বিভাজন কালে এই জালিকা রূপান্তরিত হইয়া স্থূল সূতার ন্যায় ক্রোমোজোমে পরিণত হয়। বিশেষ রঞ্জক পদার্থ—যথা, ফুয়েলগেন রঙ (Feulgen stain) ব্যবহার করিলে এই জালিকার স্বল্প অংশ গাঢ় রঙ ধারণ করে এবং অবশিষ্ট অংশ হালকা রঙ ধারণ করে। ইন্টারফেজ দশায় গাঢ় রঙ ধারণকারী অংশকে হেটারোক্রোমাটিন বলে। ইহা বিভাজন দশায়ও গাঢ় রঙ ধারণ করে এবং অল্প পরিমাণ DNA যুক্ত। ইন্টারফেজ দশায় স্বল্প রঞ্জিত ক্রোমোজোমের অংশকে ইউক্রোমাটিন বলে। ইহা বিভাজন দশায় গাঢ় রঙ ধারণ করে এবং বেশী পরিমাণ DNA যুক্ত।

নিউক্লিওলাস (Nucleolus) : নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ ঘন, গোলাকার, উজ্জ্বল বস্তুকে নিউক্লিওলাস বলে। 1781 খ্রীষ্টাব্দে ফন্টানা (Fontana) প্রথম নিউক্লিওলাস সম্পর্কে বর্ণনা দেন। নিউক্লিয়াসে এক বা একাধিক নিউক্লিওলাস বিদ্যমান। তবে একই প্রজাতির উদ্ভিদকোষ বা প্রাণিকোষে নিউক্লিওলাসের সংখ্যা সাধারণত নির্দিষ্ট। অধিক পরিমাণ প্রোটিন সংশ্লেষকারী কোষে (ডিম্বকোষ, স্নায়ুকোষ) নিউক্লিওলাসের আকার অনেক বড় এবং অল্প পরিমাণ প্রোটিন সংশ্লেষকারী কোষে (শুক্রাণু, পেশীকোষ) নিউক্লিওলাসের আকার খুব ছোট। নিউক্লিওলাস ক্রোমোজোমের বিশেষ স্থানে সংযুক্ত থাকে, সেই স্থানটিকে নিউক্লিওলার অর্গানাইজার (Nucleolar organiser) বলে। নিউক্লিওলাস নিম্নলিখিত অঞ্চল লইয়া গঠিত।

(i) **দানাদার অঞ্চল (Granular zone)**—ইহা নিউক্লিওলাসের পরিধির দিকে 15-20 nm ব্যাসযুক্ত ঘন দানাযুক্ত অঞ্চল। ইহা রাইবোনিউক্লিও প্রোটিন দ্বারা গঠিত।

(ii) **সূত্রাকার অঞ্চল (Fibrillar zone)**—ইহা নিউক্লিওলাসের কেন্দ্রীয় 5-10 nm ব্যাসযুক্ত সূক্ষ্ম তন্তুযুক্ত অঞ্চল। ইহা রাইবোনিউক্লিও প্রোটিন দ্বারা গঠিত।

(iii) **অনিয়তাকার অঞ্চল (Amorphous zone)**—প্রোটিন নির্মিত এই ধাত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানা ও তন্তু বিদ্যমান।

(iv) ক্রোমাটিন (Nucleolar associated chromatin)—ইহা নিউক্লিওলাসের পরিধির দিকে 10 nm পুরু সূত্রাকার অংশ। ইহা নিউক্লিওলাসকে আবৃত করে এবং মধ্যে মধ্যে নলাকারে প্রবেশ করিয়া বিভক্ত হয়। ইহা DNA দ্বারা গঠিত।

নিউক্লিওলাসের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হইল RNA ও প্রোটিন, বিশেষত ফসফোপ্রোটিন। ইহা ব্যতীত অ্যাসিড ফসফাটেজ, ফসফোরাইলেজ, NAD-সিন্থেটেজ প্রভৃতি উৎসেচক বিদ্যমান।

কাজ (Function) : (1) নিউক্লিয়াস কোষের যাবতীয় কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। তাই ইহাকে 'কোষের মস্তিষ্ক' (Brain of the cell) বলে।

(2) নিউক্লিওজালিকা মধ্যস্থ DNA বংশগতির ধারক ও বাহক।

(3) রাইবোজোমের RNA ও প্রোটিন সংশ্লেষ নিউক্লিওলাসের প্রধান কাজ।

(4) নিউক্লিওলাস কোষ বিভাজনে অংশগ্রহণ করে।

(5) সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসের বিপাকীয় কার্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা নিউক্লিওলাসের অন্যতম কাজ।

2.22 কোষগহ্বর বা ভ্যাকুওল (Vacuole) : আবরণবেষ্টিত তরল পদার্থে পূর্ণ সাইটোপ্লাজমীয় গহ্বরকে কোষগহ্বর বলে। ইহা প্রধানত উদ্ভিদকোষে দেখা যায়। সাধারণত প্রাণিকোষে কোষগহ্বর থাকে না, তবে থাকিলে ইহারা সংখ্যায় কম ও আকৃতিতে খুবই ক্ষুদ্র হয়। অপরিণত উদ্ভিদকোষ সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে
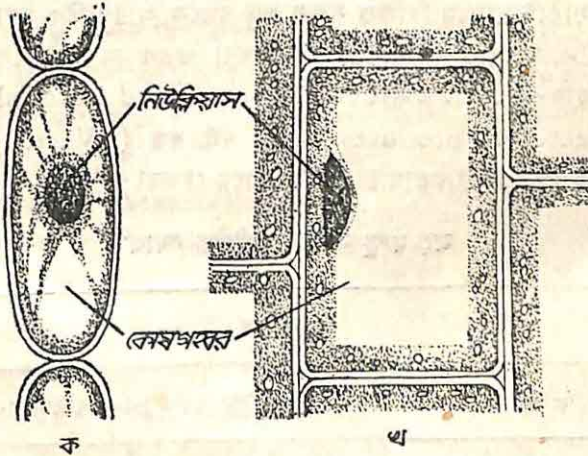
চিত্র 2.23 : বিভিন্ন উদ্ভিদকোষের কোষগহ্বর ; ক=ট্রাডেসকান্সিয়া, খ=পাতা

এবং অতি অল্প সংখ্যক ক্ষুদ্র গহ্বর বিদ্যমান। কোষের আয়তন বৃদ্ধি পাইলে সাইটোপ্লাজমের আয়তন সমানুপাতে বৃদ্ধি না পাওয়ায় গহ্বরগুলি সৃষ্টি হয় এবং পরে মিলিত হইয়া একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় গহ্বরের সৃষ্টি করে। কোষগহ্বরের অবস্থানহেতু পরিণত উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজম কোষপ্রাচীর সংলগ্ন একটি পাতলা স্তরের ন্যায় অবস্থান করে। সাইটোপ্লাজমের এই পাতলা স্তরকে প্রাইমোরডিয়াল ইউট্রিকল (Primor-

dial utricle) বলে। কোষগহ্বরের আবরণীকে টোনোপ্লাস্ট (Tonoplast) এবং ইহার মধ্যস্থ তরল পদার্থকে কোষরস (cell sap) বলে।

কোষরসের মধ্যে শর্করা, লবণ, অ্যাসিড এবং অনেক ক্ষেত্রে রঞ্জক পদার্থ অ্যান্থোসায়ানিন (Anthocyanin) পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত কোষরসের মধ্যে বর্জ্য পদার্থও থাকে।

কাজ : 1. শর্করা, খনিজ লবণ, জৈব অ্যাসিড ও নানাবিধ গ্যাসের সঞ্চয় অঙ্গ হিসাবে কাজ করে।

2. কোষগহ্বরের উপস্থিতির জন্য সাইটোপ্লাজমের পাতলা স্তরের মধ্য দিয়া সালোকসংশ্লেষ এবং শ্বসনের CO_2 ও O_2 গ্যাসের সহজেই বিনিময় ঘটে।

3. ইহা নিম্নশ্রেণীর বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের রসস্ফীতি চাপের (Turgor pressure) দ্বারা উদ্ভিদকে খাড়া থাকিতে সাহায্য করে।

4. কোষরসে মিশ্রিত বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থের জন্য ফুলের পাপড়ির বৈচিত্র্যপূর্ণ রঙের সৃষ্টি হয়।

5. এককোষী প্রাণীদের সংকোচনশীল গহ্বর (Contractile vacuole) রেচন অঙ্গের কাজ করে।

2.23 জড় বস্তু বা আরগাস্টিক পদার্থ (Ergastic substances, গ্রীক শব্দ Ergon=কাজ) : মাইটোকনড্রিয়া, প্লাস্টিড, নিউক্লিয়াস প্রভৃতি সজীব কোষীয় অঙ্গাণু ব্যতীত সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত সকল জড় বস্তুকে আরগাস্টিক পদার্থ বলে। এই পদার্থগুলি কঠিন অবস্থায় সাইটোপ্লাজমে অথবা তরল অবস্থায় কোষরসে থাকে। ইহারা তিন প্রকার—1. সঞ্চিত খাদ্যবস্তু (Reserve food materials), 2. অন্তঃক্ষরিত বস্তু (Secretory products), 3. বর্জ্য বস্তু (Waste products)। নিম্নে বিভিন্ন জড় বস্তুর শ্রেণীবিভাগ ছকের আকারে দেওয়া হইল :
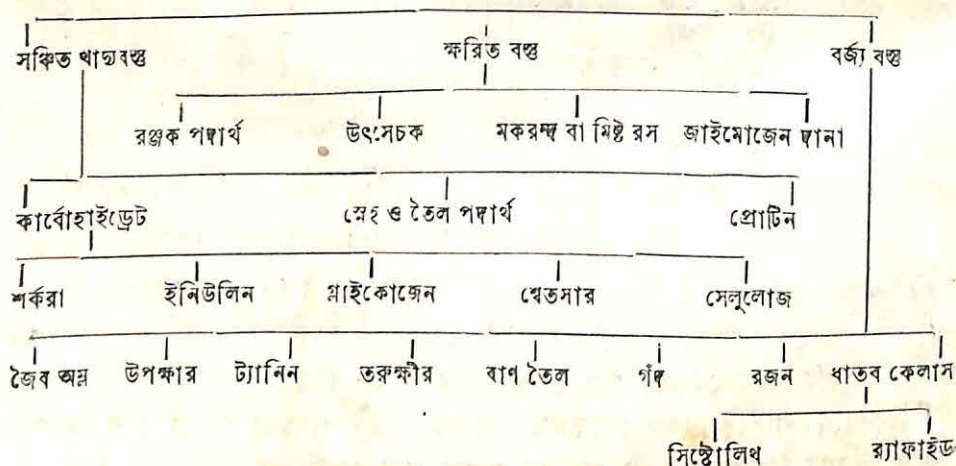
1. সঞ্চিত খাদ্যবস্তু : ইহারা বিপাকীয় কার্যের ফলে উৎপন্ন হয় এবং ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য কোষ ইহাদের সঞ্চিত রাখে। ইহারা তিন প্রকার—কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ ও তৈল পদার্থ এবং প্রোটিন।

A. কার্বোহাইড্রেট : ইহা কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সহযোগে গঠিত জৈব যৌগ. ইহাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত 2 : 1। শর্করা, ইনিউলিন, গ্লাইকোজেন প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট কোষরসে দ্রবীভূত অবস্থায় এবং শ্বেতসার, সেলুলোজ প্রভৃতি অদ্রবণীয় অংশ কঠিন দানার আকারে কোষের মধ্যে ছড়ানো থাকে।

(i) শর্করা (Sugar) : উদ্ভিদের কোষরসে সাধারণত গ্লুকোজ. সুক্রোজ প্রভৃতি শর্করা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ইহা ব্যতীত প্রায় সকল ফল, মধু ও রক্তে গ্লুকোজ পাওয়া যায়।

(ii) ইনিউলিন (Inulin) : এই ধরনের দ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট ডালিয়া, হাতিচোখ প্রভৃতি উদ্ভিদের মূলের কোষরসে সঞ্চিত থাকে।

(iii) গ্লাইকোজেন (Glycogen) : ইহার স্থূল সংকেত ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ-সবুজ শৈবাল, ছত্রাক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে গ্লাইকোজেন পাওয়া যায়। প্রাণিকোষে ও সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট হিসাবে গ্লাইকোজেন থাকে।

(iv) শ্বেতসার (Starch) : ইহা একপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ জটিল অদ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট। ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক ব্যতীত সকল উদ্ভিদকোষে ক্ষুদ্র কঠিন দানারূপে শ্বেতসার সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে। বিভিন্ন উদ্ভিদের মূলে (মূলা, রাঙালু), ভূনিম্নস্থ কাণ্ডে (আলু, ওল) ও বিভিন্ন ফলে (ধান, গম, মটর) প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহারা গোলাকার, ডিম্বাকার, বহুভুজাকার প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়। প্রত্যেক স্টার্চ দানায় একটি নির্দিষ্ট, গোলাকার, উজ্জ্বল বিন্দু বা হাইলামকে (Hilum) ঘিরিয়া কতকগুলি স্তর সজ্জিত থাকে। হাইলামের অবস্থান স্টার্চ দানার একপার্শ্বে হইলে তাহাকে উৎকেন্দ্রীয় (Eccentric) এবং কেন্দ্রে হইলে তাহাকে সমকেন্দ্রীয় (Concentric) শ্বেতসার দানা বলে। যেমন, আলুতে উৎকেন্দ্রীয় ও মটরবীজে সমকেন্দ্রীয় শ্বেতসার দানা দেখা যায়। আবার শ্বেতসার দানা এককভাবে

চিত্র 2.24 : বিভিন্ন প্রকার শ্বেতসার দানা

অথবা দুই বা ততোধিক একসঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। এককভাবে থাকিলে তাহাকে সরল (Simple), দুইটি একসঙ্গে থাকিলে তাহাকে অর্ধ-যৌগিক (Semi-compound) এবং তিনটি বা ততোধিক যুক্ত থাকিলে তাহাকে যৌগিক (Compound) শ্বেতসার দানা বলে।

(v) সেলুলোজ (Cellulose): ইহারা একপ্রকার কঠিন, স্থিতিস্থাপক, স্বচ্ছ, জটিল অদ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট। ইহার স্থূল সংকেত ($C_6H_{10}O_5$)$_n$। উদ্ভিদের কোষ-প্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা গঠিত।

B. স্নেহপদার্থ ও তৈল (Fats and Oil): ইহা কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত জৈব যৌগ। তবে ইহার মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত 2 : 1 নহে, পরন্তু অক্সিজেন অনেক কম। সাধারণ উষ্ণতায় স্নেহপদার্থ কঠিন কিন্তু তৈল তরল অবস্থায় থাকে। উদ্ভিদের সস্য ও বীজপত্রে প্রচুর পরিমাণে স্নেহপদার্থ ও তৈল বিদ্যমান। অনেক প্রাণিকোষে ফ্যাট ও তৈল বিন্দু বিদ্যমান। ইহা ব্যতীত প্রাণিকোষে স্নেহপদার্থ সরল ফ্যাট বা গ্লিসারাইড, যৌন হর্মোন, কোলেস্টেরল, সংযুক্ত লিপিড যথা গ্লাইকোলিপিড, লেসিথিন প্রভৃতি হিসাবে বিদ্যমান।

C. প্রোটিন (Protein): ইহা কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত জৈব যৌগ। তবে কখনও কখনও সালফার বা ফসফরাস থাকে। প্রোটিন তরল অবস্থায় থাকে অথবা কঠিন অবস্থায় সাইটোপ্লাজমে দানার ন্যায় ছড়ানো থাকে। এই দানাগুলিকে প্রোটিড দানা (Proteid grain) বা অ্যালিউরোন দানা (Aleurone grain) বলে। ইহা দুইটি অংশ লইয়া গঠিত—প্রোটিন নির্মিত বহুভুজাকৃতি বড় দানা বা ক্রিস্টালয়েড (Crystalloid) এবং স্বচ্ছ ধাতব পদার্থ দ্বারা গঠিত গোলাকার ক্ষুদ্র দানা বা গ্লোবয়েড (Globoid)। বীজের সস্যে ইহারা প্রচুর পরিমাণ থাকে।

(ii) ক্ষরিত পদার্থ: বিপাকীয় ক্রিয়ায় সৃষ্ট এই সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জীবের উপকারে লাগে।

(a) ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল, অ্যান্থোসায়ানিন প্রভৃতি রঞ্জক পদার্থ ফুলের পাপড়ি বা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের বৈচিত্র্যপূর্ণ রঙের জন্য দায়ী। ক্লোরোফিল সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে।

(b) উৎসেচক বিভিন্ন বিপাকীয় কার্যকে ত্বরান্বিত করে।

(c) ফুলের বিশেষ কতকগুলি কোষ হইতে নিঃসৃত শর্করাযুক্ত মকরন্দ (Nectar) কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করে পরাগসংযোগে সাহায্য করে।

(d) জাইমোজেন দানা (Zymogen granules)—ইহা একপ্রকার প্রোটিন পদার্থযুক্ত ক্ষুদ্র দানা। ইহা প্রাণীদের বিভিন্ন গ্রন্থি যথা প্যারোটিড, অগ্ন্যাশয়, আন্ত্রিক গ্রন্থি প্রভৃতি গ্রন্থিকোষের এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকা (ER) হইতে নিম্নলিখিত উপায়ে পর্যায়ক্রমে সৃষ্ট হয়। অমসৃণ ER→গল্গি বস্তু→সঞ্চয়কারী থলি→জাইমোজেন দানা।

প্রকৃতপক্ষে, ইহারা প্রোটিনযুক্ত উৎসেচকপূর্ণ থলিবিশেষ। যেমন, প্যারোটিড গ্রন্থি নিঃসৃত জাইমোজেন দানায় অ্যামাইলেজ নামক শর্করা পরিপাককারী উৎসেচক বিদ্যমান।

জাইমোজেন দানা উহার মধ্যস্থ পদার্থকে কোষের বাহিরে বা গহ্বরে (Lumen) নিক্ষেপ করে এবং পুনরায় সৃষ্টি হয়। যেমন, আন্ত্রিক গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত জাইমোজেন দানা খাদ্যনালীতে নিক্ষিপ্ত হয়।

(iii) **বর্জ্য পদার্থ :** বিপাকীয় কার্যের ফলে উৎপন্ন অপ্রয়োজনীয় ও অপকারী পদার্থকে বর্জ্য পদার্থ বলে। উন্নত প্রাণীদের মত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের কোন রেচন অঙ্গ বা তন্ত্র উদ্ভিদের নাই। তাই এই সকল পদার্থ পাতা, ছাল অথবা বিভিন্ন অংশে জমা থাকে। পরে এই সকল পদার্থ পাতা ঝরার সময়, ছাল ত্যাগের সময়, ফলচ্যুতির দ্বারা অথবা বিভিন্ন উপায়ে দেহ হইতে পরিত্যক্ত হয়। বর্জ্য পদার্থগুলির মধ্যে জৈব অ্যাসিড, উপক্ষার, ট্যানিন, বান তৈল, গঁদ, রজন, তরুক্ষীর, ধাতব কেলাস উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ 'রেচন' অধ্যায়ে দেওয়া হইল।

ব্যাপন (Diffusion)

কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়—প্রত্যেক পদার্থ অসংখ্য ক্ষুদ্র কণা বা অণুর সমন্বয়ে গঠিত। পদার্থের এই অণুগুলি সর্বদা গতিশীল বা সঞ্চরণশীল এবং এই গতি গ্যাসীয় পদার্থে সর্বাধিক ও কঠিন পদার্থে সর্বাপেক্ষা কম। বেশী ঘনত্ব হইতে কম ঘনত্বের দিকে ছড়াইয়া পড়া পদার্থের গতিশীল অণুগুলির একটি স্বাভাবিক ধর্ম। দুইটি স্থানের ঘনত্বের সমতা না আসা পর্যন্ত অণুগুলি ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। একটি পদার্থের ব্যাপন একই সঙ্গে অন্য পদার্থের ব্যাপনকে প্রভাবিত করে না। যেমন, একটি বীকারের জলে তুঁত ও চিনির দানা পাশাপাশি রাখিলে কিছুক্ষণ পরে জলের রঙ নীল ও স্বাদে মিষ্টি হইবে। জীবের বিভিন্ন পদার্থের অণু বা আয়নের ব্যাপনের জন্য জলের অণুগুলির সহিত ইহাদের সংঘর্ষ প্রধানত দায়ী।

সংজ্ঞা (Definition) : যে প্রক্রিয়ায় পদার্থের অণুগুলি বেশী ঘনত্ব হইতে কম ঘনত্বের দিকে ছড়াইয়া পড়ে তাহাকে ব্যাপন বলে।

একটি সহজ উদাহরণ হইতে ব্যাপন প্রক্রিয়া অনুমান করা যায়। শরবত তৈয়ারির সময় গ্লাসের জলের মধ্যে চিনির অণুগুলি ব্যাপন প্রক্রিয়ার ফলে জলের সর্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে, ফলে শরবতের স্বাদ সর্বত্রই সমান মিষ্টি হয়। কঠিন পদার্থের অণুগুলির বন্ধন গ্যাসীয় ও তরল পদার্থ অপেক্ষা অনেক দৃঢ় হওয়ায় ইহাদের ব্যাপনে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই জলের মধ্যে চিনির অণু কালির অণু অপেক্ষা অনেক দেরিতে ছড়াইয়া পড়ে। বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে ব্যাপন ক্রিয়া চলিতে পারে, যেমন—

(i) তরলে-কঠিনে—জল ও চিনি, জল ও তুঁতের দানা।
(ii) তরলে-তরলে—জল ও কালি, জল ও চিনির দ্রবণ।
(iii) গ্যাসে-কঠিনে—বায়ু ও কপূর, বায়ু ও ন্যাপথ্যালিন।
(iv) গ্যাসে-গ্যাসে—বায়ু ও অ্যামোনিয়া গ্যাস, বায়ু ও সেণ্ট বা আতর।

ব্যাপন চাপ ও ব্যাপন চাপ ঘাটতি (Diffusion Pressure and Diffusion Pressure Deficit) : ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট যে চাপ দ্বারা পদার্থের অণুগুলি বেশি ঘনত্বের স্থান হইতে কম ঘনত্বের দিকে ধাবিত হয় তাহাকে **ব্যাপন চাপ** বলে। পদার্থের অণুর ঘনত্ব বেশি হইলে ব্যাপন চাপ উচ্চ বা বেশি হয় এবং ঘনত্ব কম হইলে ব্যাপন চাপ নিম্ন বা কম হয়।

দ্রবণ ও দ্রাবকের ব্যাপন চাপের পার্থক্যকে অর্থাৎ নিম্ন ব্যাপন চাপ ও উচ্চ ব্যাপন চাপের পার্থক্যকে **ব্যাপন চাপ ঘাটতি (Diffusion Pressure Deficit বা DPD) বলে।** এই চাপের পার্থক্য বেশি থাকিলে ব্যাপন দ্রুত হয় এবং পার্থক্য কম থাকিলে ব্যাপন মন্থর হয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ব্যাপন চাপ ঘাটতি (DPD) বলিতে ইহাদের কোষের জল শোষণের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বুঝায়।

ব্যাপনের শর্তাবলী (Factors affecting Diffusion) : ব্যাপনের হার (Diffusion rate) নিম্নলিখিত শর্তের উপর নির্ভরশীল।

(i) পদার্থের গাঢ়ত্ব (Density)—পদার্থের গাঢ়ত্ব অধিক হইলে ব্যাপন ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

(ii) উষ্ণতা (Temperature)—উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে ব্যাপন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং উষ্ণতা হ্রাস পাইলে ব্যাপন প্রক্রিয়া হ্রাস পায়।

(iii) অণুর আপেক্ষিক আয়তন (Relative size of molecules)—পদার্থের অণুর আকার ছোট হইলে ব্যাপনের হার বৃদ্ধি পায় এবং অণুর আকার বড় হইলে ব্যাপনের হার হ্রাস পায়।

(iv) সান্দ্রতা (Viscosity)—তরলের সান্দ্রতা বেশী হইলে ব্যাপনের হার কমিয়া যায়।

ব্যাপনের গুরুত্ব বা কাজ (Significance or Function of Diffusion) : জীবদেহে ব্যাপনের গুরুত্ব অপরিসীম ও বহুবিধ :

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে :

(1) জীবের বিভিন্ন প্রকার শারীরবৃত্তীয় কার্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ব্যাপন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

(2) ব্যাপন প্রক্রিয়ায় জীবদেহের প্রয়োজনীয় গ্রহণযোগ্য পদার্থসমূহ পরিবেশ হইতে জলে দ্রবীভূত অবস্থায় কোষ পর্দার মাধ্যমে সজীব কোষে প্রবেশ করে এবং অনেক পদার্থ কোষ হইতে বাহির হইয়া যায়।

(3) উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনকালে কার্বন ডাই অক্সাইড ও অক্সিজেনের আদান-প্রদান বা বিনিময় এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

(4) বাষ্পমোচনে প্রয়োজনাতিরিক্ত জল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদদেহ হইতে বাষ্পাকারে নির্গত হয়।

প্রাণীর ক্ষেত্রে :

(1) প্রাণীর ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে বিভিন্ন পদার্থের শোষণ এই প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়।

(2) রক্তরস ও লোহিত কণিকার মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় সম্পন্ন হয়।

(3) রক্তজালকের (Blood capillary) ও কলারসের (Tissue fluid) মধ্যে খাদ্যবস্তু, অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইডের বিনিময় (Exchange) সাধন ব্যাপন ক্রিয়ায় সম্ভব হয়।

(4) শ্বসন ক্রিয়ায় ফুসফুস ও রক্তের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের বিনিময় এই পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়।

ব্যাপনের পরীক্ষা (Experiment showing Diffusion) : একটি কাচের বীকারে বা গ্লাসে জল লইয়া উহার মধ্যে কতিপয় তুঁতের দানা ফেলিয়া দিতে হইবে। কিছুক্ষণের মধ্যে তুঁতের কণাগুলি বীকারের জলের মধ্যে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে, ফলে জলের রঙ হয় নীল। যতক্ষণ-না তুঁতের অণুগুলি জলের মধ্যে সর্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে।

চিত্র 2.25 : ব্যাপনের পরীক্ষা

অভিস্রবণ (Osmosis)

অভিস্রবণ এক বিশেষ প্রকার ব্যাপন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় দুইটি ভিন্ন ঘনত্বের তরলের মধ্যে সরাসরি সংযোগ ঘটে না, পরন্তু দুইটি তরলের মধ্যে একটি পর্দা থাকে। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পর্দা (Membrane) তিন প্রকার :

(i) অভেদ্য পর্দা (Impermeable membrane)—যে সকল পর্দার মধ্য দিয়া দ্রবণ, দ্রাব বা দ্রাবক যাতায়াত করিতে পারে না তাহাদের অভেদ্য পর্দা বলে। যেমন—রাবারের পর্দা।

(ii) ভেদ্য পর্দা (Permeable membrane) : যে সকল পর্দার মধ্য দিয়া দ্রাব (Solute) বা দ্রাবক (Solvent) সহজেই যাতায়াত করিতে পারে তাহাদের ভেদ্য পর্দা বলে। যেমন—কোষপ্রাচীর, ফিল্টার কাগজ।

(iii) অর্ধভেদ্য পর্দা (Semi-permeable membrane) : যে সকল পর্দার মধ্য দিয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট দ্রবণের দ্রাবক বা জল যাতায়াত করিতে পারে তাহাদের অর্ধভেদ্য পর্দা বলে। যেমন—পার্চমেন্ট কাগজ। প্রকৃতপক্ষে জীবজগতে অর্ধভেদ্য পর্দা বিরল। কারণ সকল অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়া কম-বেশি দ্রাব যাতায়াত করিতে

পারে। তাই ইহাদিগকে প্রভেদক ভেদ্য পর্দা (Differentially permeable membrane) বলা যুক্তিযুক্ত। যেমন—কোষপর্দা, মাছের পটকা প্রভৃতি।

সংজ্ঞা (Definition) : দুইটি ভিন্ন ঘনত্বের জলীয় দ্রবণ যখন একটি ভেদ্য বা অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে পৃথক থাকিয়া যে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সমঘনত্বে পরিণত হয় তাহাকে অভিস্রবণ বলে।

অথবা, অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে জলের ব্যাপনকে অভিস্রবণ বলে। অভিস্রবণ দুই প্রকার—অন্তঃঅভিস্রবণ (Endosmosis) ও বহিঃঅভিস্রবণ (Exosmosis)।

অন্তঃঅভিস্রবণ : যখন কম ঘনত্বযুক্ত তরল ভেদ্য বা অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে বেশী ঘনত্বযুক্ত তরলের দিকে ছুটিয়া যায় তাহাকে অন্তঃঅভিস্রবণ বলে। এই প্রক্রিয়ায় কোষ পরিবেশের কম ঘনত্বযুক্ত দ্রবণ হইতে জলের অণু শোষণ করে।

বহিঃঅভিস্রবণ : যখন অধিক ঘনত্বের তরল ভেদ্য বা অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে কম ঘনত্বের তরলের দিকে ছুটিয়া যায় তাহাকে বহিঃঅভিস্রবণ বলে। কোষরসের ঘনত্ব যদি বহিঃপরিবেশ অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে জল কোষ হইতে বাহির হইয়া আসিবে। ইহাকেও বহিঃঅভিস্রবণ বলে।

উভয় ক্ষেত্রেই অভিস্রবণ ততক্ষণ চলে যতক্ষণ-না উভয় দ্রবণের ঘনত্ব সমান হয়। দুই প্রকার অভিস্রবণের মধ্যে অন্তঃঅভিস্রবণ দ্রুততর।

অভিস্রবণ চাপ (Osmotic Pressure), রসস্ফীতি চাপ (Turgour Pressure) ও প্রাচীর চাপ (Wall Pressure) : অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট সর্বাধিক যে চাপ অন্তঃঅভিস্রবণকে বন্ধ করিয়া দুইটি ভিন্ন ঘনত্বের তরলকে সমঘনত্বে পরিণত করে তাহাকে অভিস্রবণ চাপ বা OP বলে।

অথবা, যে শক্তির দ্বারা অধিক ঘনত্বের দ্রবণ জলের অণুকে কম ঘনত্বের দ্রবণ হইতে টানিয়া লয় তাহাকে অভিস্রবণ চাপ বলে।

অন্তঃঅভিস্রবণের ফলে কোষে জল প্রবেশ করিলে কোষরসের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং কোষটি প্রসারিত ও রসস্ফীত (Turgid) হয়। রসস্ফীত কোষ উহার প্রাচীরে যে চাপ প্রদান করে তাহাকে রসস্ফীতি চাপ বা TP বলে। রসস্ফীতি চাপকে বাধা দিবার জন্য কোষপ্রাচীর আবার কোষরসের উপর সমান ও বিপরীতমুখী চাপ প্রদান করে তাহাকে প্রাচীর চাপ বা WP বলে।

ব্যাপন চাপ ঘাটতি (DPD), অভিস্রবণ চাপ (OP), রসস্ফীতি চাপ (TP) ও প্রাচীর চাপ (WP)-এর সম্পর্ক : যখন একটি কোষকে পাতিত জলে ডোবানো হয় তখন অন্তঃঅভিস্রবণ দ্বারা জল কোষের মধ্যে প্রবেশ করিবে। পাতিত জলে জলের অণুর সংখ্যা বা ঘনত্ব বেশী হওয়ায় উহার ব্যাপন চাপ অধিক এবং কোষরসের জলের অণুর সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ায় উহার ব্যাপন চাপ কম। উভয়ের এই চাপের পার্থক্যকে ব্যাপন চাপ ঘাটতি (DPD) বলে। অভিস্রবণের প্রারম্ভে কোষের অভিস্রবণ চাপ ও ব্যাপন চাপ ঘাটতি সমান হয়। অর্থাৎ, যখন কোষ শ্লথ (Flaccid) অবস্থায় থাকে তখন উহার $DPD = OP$ এবং $TP = 0$ হয়। ইহার পর ধীরে ধীরে জল

প্রবেশ করিলে কোষরসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে অর্থাৎ TP বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং DPD কমিতে থাকিবে। এই অবস্থায় TP = WP হইবে। অর্থাৎ, DPD = OP − TP। আবার কোষটি যখন সম্পূর্ণ রসস্ফীত হইবে তখন TP বৃদ্ধি পাইয়া OP-এর সমান হইবে এবং ব্যাপন চাপ ঘাটতি বা DPD থাকিবে না। অর্থাৎ, OP = TP, যখন DPD = 0।

প্রাণিকোষের কোষ প্রাচীর না থাকায় উহাকে পাতিত জলে ডুবাইলে উহার রসস্ফীতি ঘটিয়া বিদীর্ণ হইতে পারে।

একটি কোষকে পাতিত জলে ডুবাইলে তাহার বিভিন্ন সময়ে OP, DPD ও TP কত হয় তাহা নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্যে দেখানো হইল :
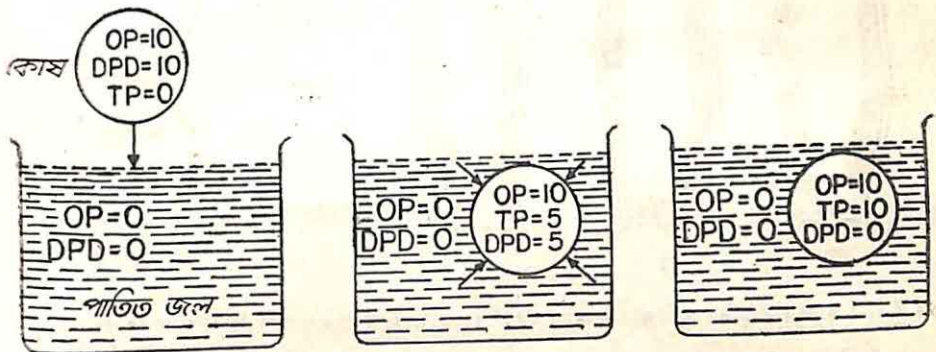
চিত্র 2.26 : (ক) অভিস্রবণের পূর্বে কোষের প্রথম অবস্থায় (খ) অভিস্রবণ চলাকালীন (গ) পূর্ণ রসস্ফীতি অবস্থায়

[OP, DPD ও TP-এর মান বায়ুমণ্ডলীয় একক (Atm)-এ উল্লেখ করা হইয়াছে। 1 Atm = 760 mm. Hg (পারদ)]

কোষের পরিবেশের বিভিন্ন প্রকার দ্রবণ (Types of solution) : কোষের চারিপার্শ্বে দ্রবণের ঘনত্ব বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হয়, এমনকি একটি জীবের বিভিন্ন কোষের ঘনত্ব বিভিন্ন হয়।

(i) **সমসারক দ্রবণ (Isotonic solution) :** পরিবেশের দ্রবণের ঘনত্ব কোষ রসের ঘনত্বের সমান হইলে তখন উভয় দ্রবণকে সমসারক বা আইসোটনিক দ্রবণ বলে।

(ii) **লঘুসারক দ্রবণ (Hypotonic solution) :** পরিবেশের দ্রবণের ঘনত্ব কোষরস অপেক্ষা কম হইলে তখন পরিবেশের দ্রবণকে লঘুসারক দ্রবণ বা হাইপোটনিক দ্রবণ এবং কোষরসের দ্রবণকে অতিসারক বা হাইপারটনিক দ্রবণ বলে।

(iii) **অতিসারক দ্রবণ (Hypertonic solution) :** পরিবেশের দ্রবণের

ঘনত্ব কোষরস অপেক্ষা বেশি হইলে তখন পরিবেশের দ্রবণকে অতিসারক দ্রবণ এবং কোষরসের দ্রবণকে লঘুসারক দ্রবণ বলে।

প্লাজমোলাইসিস ও ডি-প্লাজমোলাইসিস (Plasmolysis and Deplasmolysis): কোন কোষকে আইসোটনিক দ্রবণে ডুবাইলে কোষের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন, 0·9% NaCl দ্রবণ মানুষের লোহিত কণিকার কোষরসের আইসোটনিক হওয়ায় ঐ দ্রবণে লোহিত কণিকাকে রাখিলে উহার কোন পরিবর্তন ঘটিবে না।
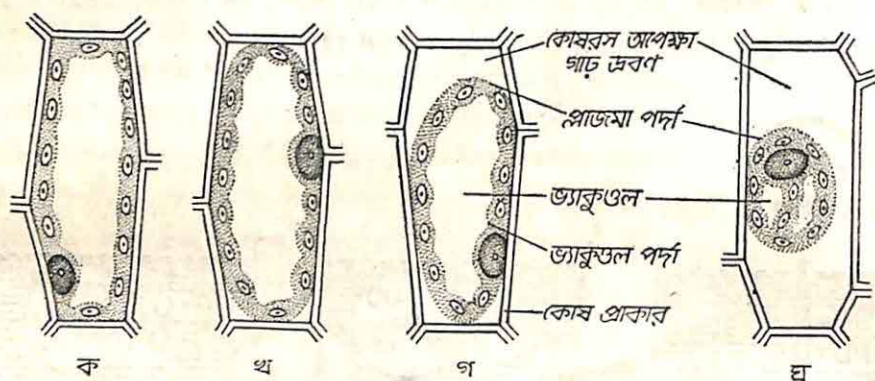
চিত্র 2.27 : প্লাজমোলাইসিস প্রক্রিয়া : ক=পূর্ণ রসস্ফীত কোষ, খ, গ, ঘ=প্লাজমোলাইসিসের বিভিন্ন পর্যায়

যদি ঐ লোহিত কণিকাকে হাইপারটনিক (0·9%-এর অধিক ঘনত্ব) দ্রবণে ডুবানো হয় তাহা হইলে বহিঃঅভিস্রবণ পদ্ধতিতে জল কোষরস হইতে বাহির হইয়া আসিবে এবং প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হইয়া পরিশেষে কোষের মধ্যস্থলে অবস্থান করিবে। প্রাণিকোষের ক্ষেত্রে কোষপর্দা পাতলা হওয়ায় কোষটি সম্পূর্ণ সংকুচিত হইবে। কোষের প্রোটোপ্লাজমের এই সংকোচনকে প্লাজমোলাইসিস বলে। প্লাজমোলাইসিসযুক্ত কোষের প্রথম অবস্থাকে প্রারম্ভিক প্লাজমোলাইসিস (Incipient Plasmolysis) বলে।

প্লাজমোলাইসিসযুক্ত কোষকে হাইপোটনিক দ্রবণে পুনরায় ডুবাইলে অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল কোষের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং প্রোটোপ্লাজম দ্বারা কোষটি পুনরায় পূর্ণ হইবে। এই প্রক্রিয়াকে বিপরীত প্লাজমোলাইসিস বা ডিপ্লাজমোলাইসিস (Deplasmolysis) বলে।

অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ (Osmoregulation): যে প্রক্রিয়ায় জীব উহার কোষমধ্যস্থ অভিস্রবণ চাপ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পরিবর্তিত পরিবেশে মানাইয়া লইতে পারে তাহাকে অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ বা অসমোরেগুলেশান বলে। পরিবর্তিত পরিবেশে জীবের দেহ হইতে যে পরিমাণ জল ও খনিজ লবণ বাহির হইয়া যায়, জীব তাহাদের পরিপূরণের ব্যবস্থা করে অথবা দেহে অতিরিক্ত জল ও খনিজ লবণ প্রবেশ করিলে তাহাদের বাহির

করিবার ব্যবস্থা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সকল জীবের এই ক্ষমতা থাকে না। যেমন, অ্যামিবা সংকোচনশীল গহ্বরের মাধ্যমে দেহ হইতে অতিরিক্ত জল বাহির করিতে পারে ; ভেটকি, পারসে প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্য মিষ্ট জলে বসবাস করিতে পারে। কিন্তু পোনা বা যে-কোন মিষ্ট জলের মাছের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না থাকায় সমুদ্রের জলে রাখিলে উহাদের দেহ হইতে জল বাহির হইয়া আসিবে। ফলে প্লাজমোলাইসিস পদ্ধতিতে প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হইবে এবং মাছের মৃত্যু ঘটিবে।

অভিস্রবণের কাজ (Functions of Osmosis) :

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে :

(1) অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ মূলরোম দ্বারা মাটি হইতে জল শোষণ করে।

(2) এই প্রক্রিয়ায় জল জাইলেমবাহিকা হইতে বিভিন্ন কোষে প্রবেশ করে এবং পরিশেষে জল উর্ধ্বমুখী গতি লাভ করে।

(3) অভিস্রবণের ফলে কোষের রসস্ফীতি ঘটে এবং এই রসস্ফীতি ভাজক কলার বৃদ্ধি ঘটায়।

(4) রসস্ফীতি দ্বারা তরুণ কাণ্ড অথবা বীরৎ জাতীয় উদ্ভিদ খাড়াভাবে দাঁড়াইতে পারে। পাতাকেও প্রসারিত রাখিতে এই প্রক্রিয়া সাহায্য করে।

(5) পত্ররন্ধ্রের প্রহরী কোষের (Guard cell) রসস্ফীতি দ্বারা পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত হয়।

প্রাণীর ক্ষেত্রে :

(1) এই প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহের ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে খাদ্যরস শোষিত হয়।

(2) রক্ত, কলারস, কোষ ও লসিকার মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় এই পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়।

(3) মূত্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।

(4) অভিস্রবণ চাপ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা জীবকে পরিবর্তিত পরিবেশে মানাইয়া লইতে সাহায্য করে।

অভিস্রবণের পরীক্ষা (Experiment showing Osmosis) :

(i) **উপকরণ (Requirements) :** থিস্‌ল্ ফানেল, বীকার, পার্চমেন্ট কাগজ, জল, চিনির ঘন দ্রবণ, ইওসিন রঙ, সুতা, স্ট্যাণ্ড ও ক্ল্যাম্প।

(ii) **পদ্ধতি (Procedure) :** থিস্‌ল্ ফানেলের চওড়া মুখটি পার্চমেন্ট কাগজ দ্বারা আবৃত করিয়া সুতার সাহায্যে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর বীকারে ইওসিন মিশ্রিত লাল জল লইয়া উহার মধ্যে থিস্‌ল্ ফানেলের মুখটি এমনভাবে ডুবানো হইল যাহাতে বীকারের তলা ও ফানেলের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান থাকে। ঐ অবস্থায় ফানেলটিকে স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে ক্ল্যাম্প দ্বারা আটকানো হইল। এইবার চিনির ঘন দ্রবণ ফানেলের সরু মুখ দিয়া ঢালিয়া দেওয়া হইল এবং ঐ দ্রবণ ফানেলের যে অংশ পর্যন্ত উঠিয়াছে সেইখানে একটি চিহ্ন দেওয়া হইল।

(iii) পর্যবেক্ষণ (Observation) : কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে যে ফানেলের ভিতরের চিনির দ্রবণের চিহ্নিত তলরেখা উপরে উঠিয়াছে এবং দ্রবণের রঙ লাল হইয়াছে।

(iv) সিদ্ধান্ত (Inference) : বীকারস্থিত কম ঘনত্বযুক্ত ইওসিন মিশ্রিত লাল জল পার্চমেন্ট কাগজের মধ্য দিয়া অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় থিসল্ ফানেলের ভিতরে অধিক ঘনত্বযুক্ত দ্রবণে প্রবেশ করিয়াছে। সেইজন্য ফানেল মধ্যস্থ তরলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দ্রবণের রঙ লাল হইয়াছে।
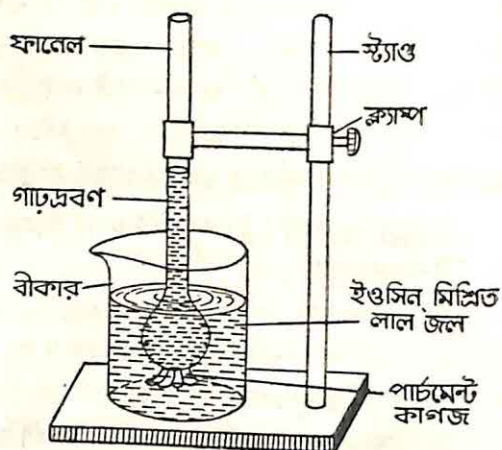
চিত্র 2.23 : অভিস্রবণের পরীক্ষা

শোষণ (Absorption)

জীবিত কোষের তথা জীবের জল ও অজৈব লবণ গ্রহণ করিবার পদ্ধতিকে শোষণ বলে। এককোষী জলজ জীব বহিঃস্থ পরিবেশ হইতে জল ও জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন পদার্থ কোষপর্দা বা কোষপ্রাচীরের মাধ্যমে গ্রহণ করে। উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর রক্ত ও লসিকা সর্বদা কোষের কোষপর্দার সংস্পর্শে থাকায় কোষগুলি রক্ত ও লসিকা অথবা সংবহন তন্ত্র হইতে জল ও বিভিন্ন পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারে। উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ মাটি হইতে জল ও বিভিন্ন খনিজ লবণ মূলরোম দ্বারা শোষণ করে।

উদ্ভিদের জলশোষণ (Absorption of water in plant) : জলজ উদ্ভিদ মূলের প্রায় সমগ্র অংশ দিয়া বহিঃস্থ পরিবেশ হইতে জল শোষণ করে, কিন্তু স্থলজ উদ্ভিদ মাটি হইতে জলকে সক্রিয় শোষণ (Active absorption) এবং নিষ্ক্রিয় শোষণ (Passive absorption) পদ্ধতিতে শোষণ করে। নিম্নে দুই প্রকার শোষণ পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :

(i) সক্রিয় জলশোষণ (Active water absorption) : উদ্ভিদ মাটি হইতে মূলরোম দ্বারা অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল শোষণ করে। এককোষী মূলরোমের কোষপ্রাচীর অর্ধভেদ্য পর্দারূপে কাজ করে। মূলরোম মধ্যস্থিত কোষরস বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থের জটিল দ্রবণ মাত্র। মাটি মধ্যস্থ জলে বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ দ্রবীভূত থাকিলেও ঐ দ্রবণের গাঢ়ত্ব মূলরোমের কোষরসের গাঢ়ত্ব অপেক্ষা লঘু। মূলরোম মৃত্তিকাস্থিত জলের নিবিড় সংস্পর্শে থাকায় অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল মূলরোমের মধ্যে প্রবেশ করে। অতঃপর মূলরোম দ্বারা শোষিত জল কোষান্তর অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বহিঃস্তরের (Cortex) মধ্য দিয়া অন্তস্ত্বকে (Endodermis)

প্রবেশ করে। পরে অন্তস্ত্বক হইতে পারনকোষের (Passage cell) মধ্য দিয়া জাইলেম বাহিকায় পৌছায়। যেহেতু জাইলেমবাহিকা মৃত, সেইহেতু উহার চারিপার্শ্বস্থ বহিস্ত্বকের কোষগুলির সমবেত রসস্ফীতি চাপের ফলে জল জাইলেমবাহিকায় প্রবেশ করিবে। বহিস্ত্বকের রসস্ফীত কোষগুলি যে চাপের দ্বারা জলকে জাইলেমবাহিকায় ঠেলিয়া দেয় তাহাকে মূলজ চাপ (Root pressure বা RP) বলে। জাইলেমবাহিকার মধ্য দিয়া জল উধ্বর্গতি লাভ করে এবং কোষান্তর অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পুনরায় বিভিন্ন কলা কোষে ছড়াইয়া পড়ে।

বাষ্পমোচন কম হইলে এবং মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জল থাকিলে মূলের শোষণ বল বৃদ্ধি পায় এবং জলশোষণ ঘটে। ইহাকে সক্রিয় জলশোষণ বলে। এই প্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে বিপাকীয় শক্তির উপর নির্ভরশীল।

চিত্র 2.29 : মাটি হইতে মূল দ্বারা জল শোষণ
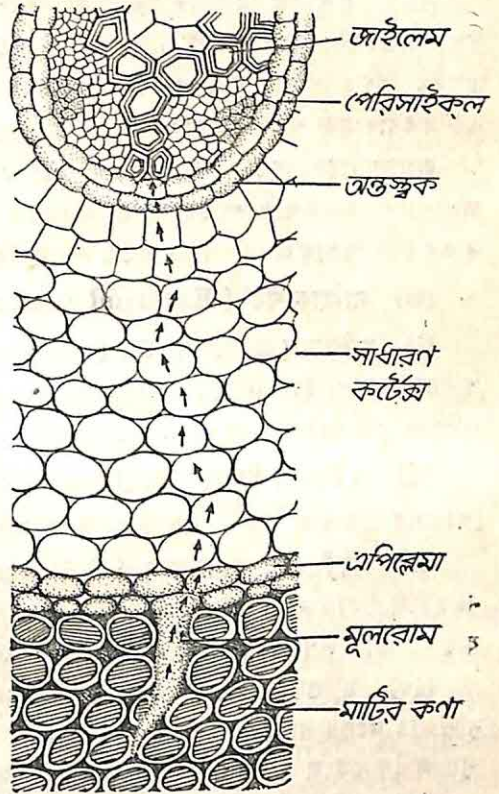
(ii) নিষ্ক্রিয় জলশোষণ (Passive water absorption) : মূলরোম দ্বারা শোষিত জল মূলের কোষের মধ্য দিয়া জাইলেমবাহিকায় পৌছায়। তথা হইতে জল কাণ্ডের জাইলেমের মধ্য দিয়া পাতার মেসোফিল কলায় পৌছায়। মূলরোম হইতে পাতার মেসোফিল কলা পর্যন্ত জলের প্রবাহকে একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা যোগ করিলে একটি কাল্পনিক সূত্র বা নলের সৃষ্টি হয়। এই নলের মধ্যে জলের অণু একটি অবিচ্ছেদ্য টানা নলের সৃষ্টি করে। মেসোফিল কলায় বাষ্পমোচনের ফলে জল-অণুর যে ঘাটতি ঘটে তাহা কাল্পনিক নলের জল-অণু সূত্রের মধ্যে একটি টানের সৃষ্টি করে। এই টান পাতা, কাণ্ড ও মূলের কোষের মধ্য দিয়া মূলরোমে পৌছাইলে মূলরোম সংলগ্ন জল-অণু মূলরোমে প্রবেশ করিবে এবং পুনরায় টানা নলের সৃষ্টি করিবে। মূলরোমের মধ্যে ক্রমাগত এইরূপ টান বা ব্যাপন চাপ ঘাটতির জন্য জল ক্রমান্বয়ে মূলের মধ্যে প্রবেশ করিবে। যেহেতু বাষ্পমোচন কেবল দিনের বেলায় ঘটে, তাই নিষ্ক্রিয় জলশোষণ শুধু দিনের বেলায় ঘটিবে। বাষ্পমোচন বেশী হইলে জলশোষণও বেশী হইবে এবং এই ক্ষেত্রে মূল শুধু পরিবহণ নলের কাজ করে। এই প্রক্রিয়া শক্তি নির্ভর নয় এবং

মূলরোমের ব্যাপন চাপ ঘাটতির জন্য পরোক্ষভাবে জলশোষণ হওয়ায় ইহাকে নিষ্ক্রিয় বা পরোক্ষ জলশোষণ বলে।

(iii) আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী অভিস্রবণ দ্রাবের (Solute) অণুর সংখ্যার উপর নির্ভরশীল, দ্রাবকের (Solvent) অণুর সংখ্যার উপর নয়। অর্থাৎ, দ্রবণে দ্রাবের অণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অভিস্রবণ বেশী হইবে, ফলস্বরূপ জলশোষণ ঘটিবে। এই মতবাদ মুক্ত শক্তি মতবাদ (Free energy theory) নামেও পরিচিত।

জলশোষণের শর্ত (Factors affecting absorption of water): জলশোষণ কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বাহ্যিক ও কতকগুলি অভ্যন্তরীণ। নিম্নে শর্তগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :

(ক) বাহ্যিক শর্ত (External factors):

(i) **মৃত্তিকাস্থ গ্রহণযোগ্য জল (Available soil water):** মৃত্তিকাস্থ জলের পরিমাণ হ্রাস পাইলে নিষ্ক্রিয় জলশোষণের হার বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, মৃত্তিকার জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে জলশোষণ হ্রাস পায়।

(ii) **মৃত্তিকার উষ্ণতা (Soil temperature):** মৃত্তিকার উষ্ণতা বৃদ্ধিতে জল শোষণের হার বৃদ্ধি পায়। স্বল্প উষ্ণতায় শোষণের হার হ্রাস পায়।

(iii) **মৃত্তিকার বাতান্বয়ন (Soil aeration):** মৃত্তিকা উপযুক্ত বাতান্বিত না হইলে উহার মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়, ফলে জলশোষণের হার কমিয়া যায়। তাই উপযুক্ত বাতান্বিত মৃত্তিকায় জলশোষণ সাধারণভাবে সম্পন্ন হয়।

(iv) **মৃত্তিকা দ্রবণের ঘনত্ব (Concentration of soil solution):** মৃত্তিকার জলের বা দ্রবণের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইলে জলশোষণ হ্রাস পায়। এমনকি ঘনত্ব খুব অধিক হইলে মূলের কোষ হইতে জল বাহিরে নির্গত হয়।

(v) **মৃত্তিকার অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব (Acidity and alkalinity of soil):** সাধারণত আম্লিক মাটিতে জলশোষণের হার বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষারীয় মাটিতে শোষণের হার হ্রাস পায়।

(খ) অভ্যন্তরীণ শর্ত (Internal factors):

(i) মূলজ চাপ (RP) : মূলজ চাপ বৃদ্ধি পাইলে শোষণের হার বৃদ্ধি পায়।

(ii) অভিস্রবণ চাপ (OP) : মূলরোমের অভিস্রবণ চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলশোষণের হার বৃদ্ধি পায়।

(iii) বাষ্পমোচন (Transpiration): বাষ্পমোচনের হার বৃদ্ধি পাইলে অধিক পরিমাণ জল উদ্ভিদদেহ হইতে অপসারিত হয়। ফলে নিষ্ক্রিয় জলশোষণের হার বৃদ্ধি পায়।

(iv) প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm): তরুণ কোষের প্রোটোপ্লাজমের জীবনীশক্তি বয়স্ক কোষের প্রোটোপ্লাজম অপেক্ষা অধিক হওয়ায় ইহাদের জলশোষণের হার বয়স্ক কোষ অপেক্ষা বেশি হয়।

জলশোষণের গুরুত্ব বা কাজ (Functions of water absorption) :

(1) জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার জন্য জলের প্রয়োজন।

(2) উদ্ভিদ মৃত্তিকা মধ্যস্থ খনিজ পদার্থকে জলে দ্রবীভূত অবস্থায় শোষণ করে।

(3) সালোকসংশ্লেষ, শ্বসন, পুষ্টি, রেচন প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কার্যে জল অপরিহার্য।

(4) সংবহনের প্রধান মাধ্যম জল।

(5) ব্যাপন, অভিস্রবণ প্রভৃতি কার্যে জলের ভূমিকা অপরিসীম।

(6) বীজের অঙ্কুরোদ্গমে জল একান্ত প্রয়োজন।

(7) ইহা প্রাণিদেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

(8) অত্যধিক উষ্ণতায় জলের বাষ্পীভবনের ফলে দেহ ঠাণ্ডা থাকে।

(9) ইহা ঘর্ষণ ও শুষ্কতা হইতে অঙ্গকে রক্ষা করে।

(10) সর্বোপরি প্রোটোপ্লাজমের প্রধান উপাদান জল, এমনকি জীবদেহের ওজনের প্রায় 60-80 ভাগই জল।

আয়ন শোষণ (Ion absorption)

জীবদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি খনিজ লবণের প্রয়োজন হয়। খনিজ লবণ জলের সহিত মিশ্রিত থাকিলেও উদ্ভিদের জল শোষণের সঙ্গে লবণ শোষণের কোন সম্পর্ক নাই। উদ্ভিদ খনিজ লবণকে আয়ন অবস্থায় শোষণ করে এবং আয়নিত না হইলে উক্ত লবণ শোষিত হইতে পারে না। প্রাণীরা খনিজ লবণকে অন্যান্য খাদ্য-বস্তুর সঙ্গে গ্রহণ করিয়া থাকে। পুষ্টি সাধন বা শক্তি উৎপাদনে অংশগ্রহণ না করিলেও দেহসংরক্ষক বস্তু হিসাবে এবং বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যে খনিজ লবণের ভূমিকা অপরিসীম। তাই এই সকল খনিজ লবণের 'অভাবে জীবদেহে বিভিন্ন প্রকার অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায়।

কার্য (Functions) :

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে—

(1) ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, সালফার, নাইট্রোজেন উদ্ভিদের ক্লোরোফিল গঠনে অংশগ্রহণ করে।

(2) ক্যালসিয়াম কোষপ্রাচীর গঠন, কোষ বিভাজন, নাইট্রোজেন বিপাক প্রভৃতি কার্যে অংশগ্রহণ করে।

(3) পটাসিয়াম উদ্ভিদের শর্করা ও প্রোটিন বিপাকে অংশগ্রহণ করে।

(4) ইহা ব্যতীত ফসফরাস, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, বোরণ, মলিবডেনাম প্রভৃতি বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যে অংশগ্রহণ করিয়া পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে অংশ গ্রহণ করে।

পরিবেশ হইতে সরাসরি ক্যাটায়ন (যেমন K^+) কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু ক্যাটায়ন শোষণে কোন বাহক বা শক্তির প্রয়োজন হয় না।

পরিশেষে মূলরোমের বাহিরে ইলেকট্রন আসিয়া হাইড্রোজেন আয়ন ও অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয় এবং জল প্রস্তুত করে। অ্যানায়ন শোষণের জন্য শক্তি ও অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় বলিয়া সাধারণ শ্বসনের পার্থক্য উল্লেখ করিতে ইহাকে অ্যানায়ন শ্বসন (Anion respiration) অথবা লবণ শ্বসন (Salt respiration) বলে।

(2) ATP যুক্ত বাহক কৌশল (Carrier mechanism involving ATP) :

ATP-র সাহায্যে কিভাবে আয়ন শোষিত হয় তাহার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা বিজ্ঞানী বেনেট ক্লার্ক (Bennet Clark) 1956 খ্রীষ্টাব্দে প্রণয়ন করেন। তাঁহার মতে লেসিথিন (Lecithin) নামক একপ্রকার ফসফোলিপিড (Phospholipid) বাহক অণুর কার্য করে। লেসিথিন দুইটি অংশ লইয়া গঠিত—কোলিন (Choline) ও
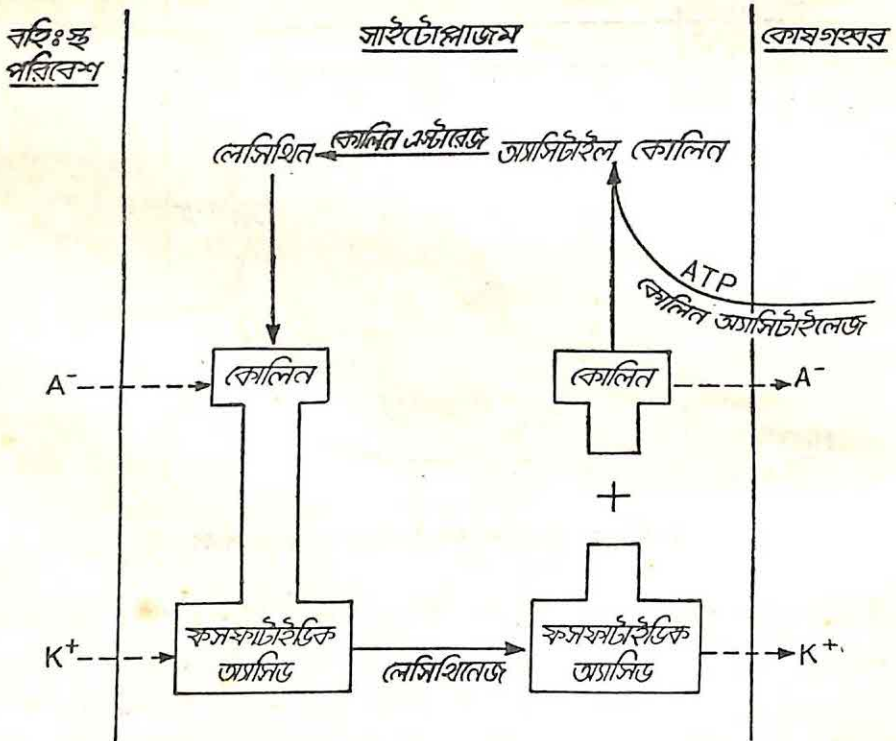
চিত্র 2.31 : বেনেট ক্লার্কের মতবাদ অনুযায়ী আয়ন শোষণ পদ্ধতি

ফসফাটাইডিক অ্যাসিড (Phosphatidic acid)। কোলিন অংশটি অ্যানায়ন (A^-) ও ফসফাটাইডিক অ্যাসিড ক্যাটায়নের (K^+) সহিত যুক্ত হয়। এইরূপ অবস্থায় লেসিথিন কোষগহ্বরের সন্নিকটে আসিলে উহা লেসিথিনেজ (Lecithinase)

উৎসেচকের প্রভাবে ভাঙিয়া অ্যানায়ন ও ক্যাটায়নকে মুক্ত করে। পুনরায় ATP কোলিন অ্যাসিটাইলেজ ও কোলিন এস্টারেজ (Choline esterase) উৎসেচকের সহযোগে লেসিথিন পুনর্গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় একই সঙ্গে অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন শোষিত হইতে পারে। এই প্রক্রিয়া শক্তিনির্ভর ও প্রয়োজনীয় শক্তি মাইটোকনড্রিয়া মধ্যস্থ ATP হইতে আসে।

2.24 প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক কোষের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Prokaryotic and Eukaryotic cell) :

প্রোক্যারিওটিক কোষ	ইউক্যারিওটিক কোষ
1. কোষের গঠন সরল এবং আকারে ছোট (1-10 nm)।	1. কোষের গঠন জটিল এবং আকারে অপেক্ষাকৃত বড় (10-100 nm)।
2. নিউক্লিয় পর্দাবেষ্টিত সংগঠিত নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত। তবে অনেক ক্ষেত্রে ঘন নিউক্লিয়য়েড বিদ্যমান।	2. নিউক্লিয় পর্দাবেষ্টিত সংগঠিত নিউক্লিয়াস বিদ্যমান।
3. প্লাস্টিড অনুপস্থিত। তবে প্লাস্টিড-সদৃশ সালোকসংশ্লেষকারী অঙ্গাণু থাইলাকয়েড বিদ্যমান।	3. সালোকসংশ্লেষকারী জটিল অঙ্গাণু ক্লোরোপ্লাস্টিড বিদ্যমান।
4. ক্রোমোজোম নাই, কিন্তু ক্রোমাটিন বস্তুতে DNA বা RNA আছে।	4. জটিল গঠনযুক্ত ক্রোমোজোমে DNA এবং RNA আছে।
5. গল্গি বস্তু, সেন্ট্রোজোম, লাইসোজোম, এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা, মাইটোকনড্রিয়া প্রভৃতি অঙ্গাণু নাই। কিন্তু মাইটোকনড্রিয়া-সদৃশ পর্দাবৃত অঙ্গাণু মেসোজোম বিদ্যমান।	5. গল্গি বস্তু, সেণ্ট্রোজোম, লাইসোজোম, এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা, মাইটোকনড্রিয়া প্রভৃতি সকল অঙ্গাণু অধিকাংশ কোষে থাকে।
6. মাইটোটিক অ্যাপারেটাস গঠিত হয় না।	6. কোষ বিভাজনের সময় মাইটোটিক অ্যাপারেটাস গঠিত হয়।
7. ফ্লাজিলার গঠন সরল ও একতন্ত্রী।	7. ফ্লাজিলার গঠন জটিল ও (9+2) তন্ত্রীযুক্ত।

2.25. উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Plant cell and Animal cell) :

উদ্ভিদকোষ	প্রাণিকোষ
1. উদ্ভিদকোষের বাহিরে দৃঢ়, পুরু ও জড় কোষপ্রাচীর থাকে।	1. প্রাণিকোষের বাহিরে পাতলা, স্থিতিস্থাপক সজীব কোষপর্দা থাকে।
2. কোষপ্রাচীর সেলুলোজ ও পেকটিন জাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত।	2. কোষপর্দা প্রোটিন ও লিপিড দ্বারা গঠিত।

উদ্ভিদকোষ	প্রাণিকোষ
3. প্লাস্টিড থাকে।	3. প্লাস্টিড থাকে না।
4. সেন্ট্রোজোম থাকে না।	4. সেন্ট্রোজোম থাকে।
5. সাধারণত লাইসোজোম থাকে না।	5. লাইসোজোম থাকে।
6. কোষে বড় ভ্যাকুওল থাকে।	6. সাধারণত ভ্যাকুওল থাকে না, যদি থাকে তাহা হইলে খুব ক্ষুদ্র এবং সংখ্যায় অল্প।
7. পরিণত কোষে প্রাইমোরডিয়াল ইউট্রিকল্ গঠিত হয়।	7. প্রাইমোরডিয়াল ইউট্রিকল্ গঠিত হয় না।
8. সঞ্চিত শর্করা স্টার্চ।	8. কোষের সঞ্চিত শর্করা গ্লাইকোজেন।

● বিষয়-সংক্ষেপ ●

1. জীবদেহের মূল একক কোষ। কোষগুলি সুশৃংখলভাবে সজ্জিত হইয়া জীবদেহ গঠিত হয়। 'সকল জীবের দেহ এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত'—স্লাইডেন ও সোয়ানের এই বক্তব্য কোষ মতবাদ বা কোষতত্ত্ব রূপে পরিচিত।

2. কোষের বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞা আছে। তবে এককথায় আবরণবেষ্টিত নানাপ্রকার অঙ্গাণুসমন্বিত নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইটোপ্লাজমকে কোষ বলে।

3. কোষের আকার ও আয়তন বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন রকমের। কোষের আকৃতি গোলাকার, ডিম্বাকার, বহুভুজাকার, চ্যাপ্টা, লম্বা ও সুচালো প্রভৃতি আকৃতির হয়। জীবজগতের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জীব হইল মাইকোপ্লাজমা (0·25-0·1 μm)। আবার অ্যাসিটাবুলারিয়া (5-10 সে. মি.), উটপাখীর ডিম (170 mm × 135 mm) প্রভৃতি বৃহৎ কোষের উদাহরণ।

4. নিউক্লিয়াসের গঠন অনুসারে কোষ দুই প্রকার—প্রোক্যারিওট ও ইউক্যারিওট। প্রোক্যারিওটিক কোষের নিউক্লিয় পর্দা বেষ্টিত সংগঠিত নিউক্লিয়াস ও বিশিষ্ট কোষীয় অঙ্গাণু, যথা—মাইটোকনড্রিয়া, গলগি বস্তু, প্লাস্টিড, সেন্ট্রোজোম, এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা থাকে না। ব্যাকটিরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল, মাইকোপ্লাজমা প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

ইউক্যারিওটিক কোষের নিউক্লিয় পর্দা বেষ্টিত সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস ও সকল কোষীয় অঙ্গাণু বিদ্যমান। সকল উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষ এই প্রকৃতির।

5. ইউক্যারিওটিক কোষের গঠন —

(ক) কোষপ্রাচীর : উদ্ভিদকোষের প্রোটোপ্লাজমের বাহিরে জড় আবরণকে কোষপ্রাচীর বলে। কোষপ্রাচীর সাধারণত পুরু, শক্ত, স্থিতিস্থাপক এবং প্রধানত সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। সেলুলোজ ব্যতীত কোষপ্রাচীরে পেকটিন, লিগনিন,

হেমিসেলুলোজ প্রভৃতি থাকে। কোষপ্রাচীরের গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। এই সকল ছিদ্রের মাধ্যমে কোষ সন্নিহিত কোষের সঙ্গে প্লাসমোডেসমাটা দ্বারা সংযোগ সাধন করে। পরিণত উদ্ভিদকোষের কোষপ্রাচীরের তিনটি স্তর আছে—মধ্যচ্ছদা, প্রাথমিক কোষপ্রাচীর ও গৌণ কোষপ্রাচীর। অনেক সময় কোষপ্রাচীরের গায়ে বলয়াকার, সর্পিলাকার, জালিকাকার, সোপানাকার প্রভৃতি অলঙ্করণ দেখা যায়। কোষের নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করা, বাহিরের আঘাত হইতে কোষকে রক্ষা করা, কোষের দৃঢ়তা প্রদান করা, বিভিন্ন পদার্থের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা কোষপ্রাচীরের কাজ।

(খ) **কোষপর্দা** : উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের প্রোটোপ্লাজমের বাহিরে সূক্ষ্ম, আণুবীক্ষণিক, সজীব, স্থিতিস্থাপক, পাতলা পর্দাকে কোষপর্দা বলে। কোষপর্দা একটি ত্রিস্তরযুক্ত (7·5 nm পুরু) লাইপোপ্রোটিন পর্দা যাহার মধ্যবর্তী লিপিড স্তর ও দুই পার্শ্বে প্রোটিন স্তর বিদ্যমান। এইরূপে ত্রিস্তরযুক্ত সজীব পর্দাকে বিজ্ঞানী রবার্টসন একক পর্দা হিসাবে অভিহিত করেন। কোষপর্দা সন্নিহিত কোষের সঙ্গে সংযোগস্থাপন, আয়ন, অণু-পরমাণুর চলাচলে সাহায্য করে। ইহা ব্যতীত পিনোসাইটোসিস ও ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে তরল ও কঠিন পদার্থ বাহির হইতে কোষপর্দার মধ্য দিয়া কোষে প্রবেশ করে।

(গ) **প্রোটোপ্লাজম** : কোষ-মধ্যস্থ অর্ধস্বচ্ছ, দানাদার থকথকে কোলয়েড জাতীয় সজীব পদার্থকে প্রোটোপ্লাজম বলে। প্রোটোপ্লাজম অতি জটিল পদার্থ এবং ইহার সঠিক উপাদান নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা গিয়াছে যে ইহা শর্করা, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, নিউক্লিক অ্যাসিড, ভিটামিন, উৎসেচক, খনিজ লবণ প্রভৃতি লইয়া গঠিত। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

(ঘ) **সাইটোপ্লাজম** : নিউক্লিয়াস ব্যতীত প্রোটোপ্লাজমের অবশিষ্ট অংশকে সাইটোপ্লাজম বলে। সাইটোপ্লাজমের যে তরলের মধ্যে কোষীয় অঙ্গাণু ও জড় পদার্থ বিদ্যমান তাহাকে সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্র বলে। সাইটোপ্লাজমের স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক, পাতলা বহিঃস্তরকে এক্টোপ্লাজম ও ভিতরের ঘন, দানাদার স্তরকে এণ্ডোপ্লাজম বলে। ইহা একপ্রকার কোলয়েড জাতীয় পদার্থ এবং শর্করা, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, খনিজ লবণ সহযোগে গঠিত। সাইটোপ্লাজম সজীব বলিয়া ইহার উপাদান সবসময় পরিবর্তনশীল। সাইটোপ্লাজম কোষের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করে, বাহ্যিক উত্তেজনায় সাড়া দান করে, রেচন, বৃদ্ধি, বিভাজন প্রভৃতি নানাবিধ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। নিম্নে সাইটোপ্লাজম-মধ্যস্থ কোষীয় অঙ্গাণু ও অজীবীয় বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :

(i) **গল্গি বস্তু** : সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যে সকল সূত্রাকার বা গোলাকার অঙ্গাণু ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থায় স্তূপাকারে সজ্জিত থাকে তাহাদের গল্গি বস্তু বলে। গঠন অনুযায়ী ইহা তিন প্রকার—চ্যাপ্টা নালিকার ন্যায় বা ল্যামিলি, ল্যামিলির প্রান্তে অবস্থিত অতিক্ষুদ্র থলি বা ভেসিকল এবং ল্যামিলির নিকটে অবস্থিত বৃহৎ গোলাকার থলি বা ভ্যাকুওল।

গল্গি বস্তুর থলিগুলি মসৃণ, পাতলা একক পর্দা দ্বারা গঠিত। ইহা প্রোটিন, লিপিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন ও বিভিন্ন উৎসেচক সহযোগে গঠিত। খাদ্যবস্তু সঞ্চয়. কোষের বিভিন্ন বস্তুর ক্ষরণ, শুক্রাণুর অ্যাক্রোজোম টুপী গঠন ও মাইটোকনড্রিয়াকে ATP গঠনে উদ্বুদ্ধ করা গল্গি বস্তুর প্রধান কাজ।

(ii) প্লাস্টিড : উদ্ভিদকোষের সাধারণত রঞ্জক পদার্থযুক্ত পর্দাবৃত কোষীয় অঙ্গাণুকে প্লাস্টিড বলে। ব্যাকটিরিয়া. ছত্রাক, নীলাভ সবুজ শৈবাল ব্যতীত সকল উদ্ভিদকোষে প্লাস্টিড বিদ্যমান। প্লাস্টিড তিন প্রকার—ক্লোরোপ্লাস্টিড, ক্রোমোপ্লাসটিড ও লিউকোপ্লাস্টিড।

সবুজ রঞ্জক পদার্থ ক্লোরোফিলযুক্ত প্লাস্টিডকে ক্লোরোপ্লাস্টিড বলে। ইহা দুইটি একক আবরণী দ্বারা আবৃত। আবরণীর মধ্যে তরল পদার্থকে স্ট্রোমা এবং স্ট্রোমা মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকতির ন্যায় দানাকে গ্রানা বলে। গ্রানা মধ্যস্থ চ্যাপ্টা থলি বা থাইলাকয়েডের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার কোয়াণ্টাজোম দানা থাকে। এই কোয়াণ্টাজোমের মধ্যে ক্লোরোফিল ও ক্যারোটিনয়েড (ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল) বিদ্যমান। ক্লোরোপ্লাস্টিড সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈয়ারি করে।

সবুজ বর্ণ ব্যতীত যে কোন রঙীন প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্টিড বলে। ইহাদের মধ্যে অল্প পরিমাণ ক্লোরোফিল ও প্রচুর পরিমাণ ক্যারোটিনয়েড, যথা—কমলা রঙের ক্যারোটিন ও হলুদ রঙের জ্যান্থোফিল নামক রঞ্জক পদার্থ বিদ্যমান। ক্রোমোপ্লাসটিড ফুল, ফল প্রভৃতি অঙ্গকে রঞ্জিত করে এবং পরোক্ষভাবে পরাগমিলন, ফল ও বীজের বিস্তারে সাহায্য করে।

রঞ্জক পদার্থবিহীন প্লাস্টিডকে লিউকোপ্লাস্টিড বলে। ইহারা মূল, ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের কোষে বিদ্যমান। আলোকের উপস্থিতিতে ইহারা সবর্ণ প্লাস্টিডে পরিণত হয়। লিউকোপ্লাস্টিড তরল খাদ্যকে সঞ্চিত খাদ্যে রূপান্তরিত করিয়া সংশ্লিষ্ট অঙ্গে জমা রাখে।

(iii) রাইবোজোম : পর্দাবিহীন যে সকল অঙ্গাণু কোষের প্রোটিন সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে তাহাদের রাইবোজোম বলে। রাইবোজোম কোষের সাইটোপ্লাজমে থাকে অথবা এণ্ডোপ্লাজমিক জালিকার গাত্রে আবদ্ধ থাকে। রাইবোজোম আকারে গোলাকার বা ডিম্বাকার এবং দুইটি অধঃএকক লইয়া গঠিত। অধঃ একক দুইটির মধ্যে একটি বৃহৎ ও গম্বুজাকৃতি এবং অপরটি ক্ষুদ্র যাহা বৃহৎ অংশের মাথায় অবস্থিত। রাইবোজোম RNA ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। ইহারা কোষের প্রোটিন সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে।

(iv) মাইটোকনড্রিয়া : শ্বসন সম্পন্নকারী পদাবৃত গোলাকার, দণ্ডাকার, সূত্রাকার প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতির সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুকে মাইটোকনড্রিয়া বলে। মাইটোকনড্রিয়া দ্বিস্তরযুক্ত একক আবরণী দ্বারা আবৃত। বাহিরের আবরণকে বহিঃআবরণী এবং ভিতরের আবরণকে অন্তঃআবরণী বলে। অন্তঃআবরণী

বেষ্টিত গহ্বর ধাত্রে পূর্ণ। অন্তঃআবরণী অনিয়মিতভাবে ভাঁজ হইয়া ধাত্রের দিকে আঙ্গুলের ন্যায় ক্রিস্টির সৃষ্টি করে। অন্তঃআবরণী ও ক্রিস্টির প্রাচীরে অসংখ্য ক্ষুদ্র কণা বা F_1 বস্তু সজ্জিত থাকে। মাইটোকনড্রিয়ায় প্রোটিন, লিপিড, RNA ও এক বা একাধিক DNA তন্তু বিদ্যমান। ইহা ব্যতীত ধাত্রে প্রায় 70 প্রকার এনজাইম ও কো-এনজাইম থাকে। মাইটোকনড্রিয়ায় শ্বসনের ফলে প্রচুর ATP উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে কোষের শক্তিঘর বলে।

(v) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা : সাইটোপ্লাজমে জালিকাকারে বিন্যস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালিকাকে এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা বলে। ইহারা তিন প্রকার—লম্বা, চ্যাপ্টা আকৃতিযুক্ত সিস্টারনি, গোলাকার বা ডিম্বাকার আকৃতিযুক্ত ভেসিকল এবং অনিয়মিত জালের ন্যায় বা টিউবিলস্। এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার গায়ে রাইবোজোম-যুক্ত থাকিলে তাহাদের অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা এবং রাইবোজোম না থাকিলে তাহাদের মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা বলে। এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা কোষের যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করে. প্রোটিন, লিপিড. গ্লাইকোজেন সংশ্লেষ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যে অংশগ্রহণ করে।

(vi) লাইসোজোম : সাইটোপ্লাজম মধ্যস্থ অসংখ্য আদ্র'বিশ্লেষক উৎসেচকযুক্ত ক্ষুদ্র অঙ্গাণুকে লাইসোজোম বলে। লাইসোজোম একটি লাইপোপ্রোটিন পর্দাবৃত থলিবিশেষ। থলির মধ্যে অসংখ্য আদ্র'বিশ্লেষক উৎসেচক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে কিন্তু পর্দা ফাটিয়া গেলে উহারা বাহির হইয়া সক্রিয় হয়। গঠন অনুসারে লাইসোজোম চারি প্রকার—প্রাথমিক লাইসোজোম, গৌণ লাইসোজোম, রেসিডুয়াল বডি ও অটো-ফ্যাজিক ভ্যাকুওল। লাইসোজোমের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে হেটারোফ্যাগি, অটোফ্যাগি, অটোলাইসিস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(vii) সেন্ট্রোজোম ও সেন্ট্রিওল : নিউক্লিয় পর্দার সন্নিকটে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ, গোলাকার কোষীয় অঙ্গাণুকে সেন্ট্রোজোম বলে। স্নায়ুকোষ ব্যতীত সকল প্রাণিকোষ ও কতিপয় নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদকোষে সেন্ট্রোজোম থাকে। সেন্ট্রোজোম মধ্যস্থ এক বা একাধিক ঘন বস্তুকে সেন্ট্রিওল বলে। সেন্ট্রোজোমের চারিপার্শ্বস্থ সাইটোপ্লাজমীয় অংশকে সেন্ট্রোস্ফিয়ার বলে। সেন্ট্রিওলের প্রধান উপাদান প্রোটিন, RNA ও অল্প পরিমাণ DNA। সেন্ট্রোজোম কোষবিভাজনের সময় বেম ও বেমতন্তু গঠন করে। ইহা ব্যতীত সিলিয়া, ফ্লাজিলা ও শুক্রাণুর পুচ্ছ গঠনে অংশগ্রহণ করে।

(viii) অণুনালিকা : সেন্ট্রিওল, সিলিয়া ও ফ্লাজিলা গঠনকারী দীর্ঘ, ঋজু, সূক্ষ্ম নলাকার অংশকে অণুনালিকা বলে। ইহারা প্রধানত টিউবিউলিন নামক প্রোটিন দ্বারা গঠিত। অণুনালিকা সিলিয়া, ফ্লাজিলা, সেন্ট্রিওল, কোষপ্রাচীর, বেম ও বেমতন্ত গঠনে অংশগ্রহণ করে।

(ঙ) নিউক্লিয়াস : কোষমধ্যস্থ পর্দাবৃত ও ক্রোমোজোমযুক্ত গোলাকার কেন্দ্রীয় অংশকে নিউক্লিয়াস বলে। নিউক্লিয়াস নিউক্লীয় পর্দা, নিউক্লীয় রস, নিউক্লিয় জালিকা ও নিউক্লিওলাস লইয়া গঠিত। নিউক্লিয়াসকে বেষ্টন করিয়া যে পাতলা,

অর্ধভেদ্য সজীব পর্দা থাকে তাহাকে নিউক্লিয় পর্দা বলে। নিউক্লিয় পর্দা বেষ্টিত স্বচ্ছ, সমসত্ত্ব, দানাদার, অম্লধর্মী তরল পদার্থকে নিউক্লিয় রস বলে। নিউক্লিয় রসে DNA, RNA, প্রোটিন, এনজাইম, কো-এনজাইম ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। নিউক্লিয় রসে অবস্থিত লম্বা, পঁ্যাচানো সূতার ন্যায় সরু জালিকাকে নিউক্লিয় জালিকা বলে। কোষবিভাজনের সময় নিউক্লিয় জালিকা রূপান্তরিত হইয়া ক্রোমোজোমে পরিণত হয়। ক্রোমোজোমে জিন অবস্থিত এবং ইহা নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বারা গঠিত। নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ ঘন, গোলাকার উজ্জ্বল বস্তুকে নিউক্লিওলাস বলে। নিউক্লিওলাস দানাদার অঞ্চল, সূত্রাকার অঞ্চল, অনিয়তাকার অঞ্চল ও ক্রোমোটিন লইয়া গঠিত। নিউক্লিওলাসের প্রধান উপাদান RNA, প্রোটিন ও এনজাইম। নিউক্লিয়াস কোষের যাবতীয় কার্য, যথা—কোষ বিভাজন, বৃদ্ধি, জনন প্রোটিনসংশ্লেষ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া ইহাকে কোষের মগজ বলা হয়। ক্রোমোজোম মধ্যস্থ জিন বংশগতির ধারক ও বাহক।

(চ) **ভ্যাকুওল :** আবরণবেষ্টিত তরল পদার্থে পূর্ণ সাইটোপ্লাজমীয় গহ্বরকে কোষগহ্বর বলে। ইহা প্রধানত উদ্ভিদকোষে দেখা যায়। অপরিণত উদ্ভিদকোষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্যাকুওল থাকে কিন্তু পরিণত কোষে একটি বড় কেন্দ্রীয় গহ্বর সৃষ্টি হয়। কোষগহ্বর মধ্যস্থ তরল পদার্থকে কোষরস বলে। ভ্যাকুওলের কোষরস শর্করা, লবণ, জৈব অ্যাসিড, নানাবিধ গ্যাসের সঞ্চয় অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। ভ্যাকুওল গ্যাসীয় বিনিময় ও রসস্ফীতি চাপ বজায় রাখিতে সাহায্য করে।

(ছ) **আরগাস্টিক পদার্থ :** সজীব কোষীয় অঙ্গাণু ব্যতীত সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত সকল জড় বস্তুকে আরগাস্টিক পদার্থ বলে। বিপাকীয় ক্রিয়ায় সৃষ্ট এই পদার্থগুলি কঠিন অবস্থায় সাইটোপ্লাজমে অথবা তরল অবস্থায় কোষরসে থাকে। ইহারা তিন প্রকার—

(*i*) **সঞ্চিত খাদ্যবস্তু :** ইহারা ভবিষ্যতের জন্য কোষে সঞ্চিত থাকে। যেমন—গ্লুকোজ, সুক্রোজ, ইনিউলিন, গ্লাইকোজেন. শ্বেতসার সেলুলোজ প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ ও তৈল, প্রোটিন।

(ii) **ক্ষরিত পদার্থ :** এই সকল পদার্থ জীবের উপকারে লাগে। যেমন—রঞ্জক পদার্থ (ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল প্রভৃতি), উৎসেচক, মকরন্দ, জাইমোজেন দানা প্রভৃতি।

(iii) **বর্জ্য পদার্থ :** এই সকল পদার্থ অপ্রয়োজনীয় ও অপকারী, যেমন—জৈব অ্যাসিড, উপক্ষার, ট্যানিন, বানতৈল, গঁদ, রজন, তরুক্ষীর, ধাতব কেলাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

6. **ব্যাপন :** যে প্রক্রিয়ায় পদার্থের অণুগুলি বেশি ঘনত্ব হইতে কম ঘনত্বের দিকে ছড়াইয়া পড়ে তাহাকে ব্যাপন বলে। ব্যাপন প্রক্রিয়া তরলে-তরলে, তরলে-কঠিনে, গ্যাসে-কঠিনে ও গ্যাসে-গ্যাসে সম্পন্ন হইতে পারে। ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট যে চাপ দ্বারা পদার্থের অণুগুলি বেশি ঘনত্বের স্থান হইতে কম ঘনত্বের দিকে

ধাবিত হয় তাহাকে ব্যাপন চাপ বলে। ব্যাপন পদার্থের ঘনত্ব, উষ্ণতা, অণুর আপেক্ষিক আয়তন, সান্দ্রতার উপর নির্ভরশীল। পরিবেশ হইতে প্রয়োজনীয় পদার্থ গ্রহণ, বাষ্পমোচন, গ্যাসীয় বিনিময়, ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে বিভিন্ন পদার্থের শোষণ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়।

7. **অভিস্রবণ :** দুইটি ভিন্ন ঘনত্বের জলীয় দ্রবণ যখন একটি ভেদ্য বা অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে পৃথক থাকিয়া যে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সমঘনত্বে পরিণত হয় তাহাকে অভিস্রবণ বলে। ইহা দুইপ্রকার—অন্তঃঅভিস্রবণ ও বহিঃঅভিস্রবণ। অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট সর্বাধিক যে চাপ দুইটি ভিন্ন ঘনত্বের তরলকে সমঘনত্বে পরিণত করে তাহাকে অভিস্রবণ চাপ বলে। মূলরোম জল শোষণ, ভাজক কলার বৃদ্ধি, তরুণ কান্ডকে খাড়া রাখা, ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে খাদ্যরস শোষণ, রক্ত এবং লসিকার সহিত কোষীয় পদার্থের বিনিময় প্রভৃতি অভিস্রবণের প্রধান কার্য।

8. **শোষণ :** জীবের জল ও অজৈব লবণ গ্রহণ করার পদ্ধতিকে শোষণ বলে। নিম্নশ্রেণীর জলজ জীব উহাদের পরিবেশ হইতে, উদ্ভিদ মাটি হইতে এবং প্রাণী সংবহন তন্ত্র হইতে জল ও বিভিন্ন পদার্থ গ্রহণ করে।

উদ্ভিদ মাটি হইতে মূলরোম দ্বারা অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল শোষণ করে। বাষ্পমোচন কম হইলে এবং মাটিতে জলের পরিমাণ বেশি হইলে উদ্ভিদের শোষণ বল বৃদ্ধি পায় এবং জলশোষণ ঘটে। ইহাকে সক্রিয় জলশোষণ বলে। এই প্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে বিপাকীয় শক্তির উপর নির্ভরশীল। আবার বাষ্পমোচন বেশি হইলে জলশোষণও অধিক হয়। ইহাকে নিষ্ক্রিয় জলশোষণ বলে কারণ এই প্রক্রিয়া শক্তি-নির্ভর নয়। সালোকসংশ্লেষ, শ্বসন, পুষ্টি, রেচন প্রভৃতি কার্যে জল অপরিহার্য। সংবহন ও খনিজ লবণ শোষণে জলের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বিদ্যমান।

9. **আয়ন শোষণ :** উদ্ভিদের খনিজ লবণ আয়ন অবস্থায় শোষিত হয়। আয়ন শোষণ দুই প্রকার—সক্রিয় আয়ন শোষণ ও নিষ্ক্রিয় আয়ন শোষণ। যে প্রক্রিয়ায় খনিজ লবণের আয়ন ঘনত্বের স্বপক্ষে বহিঃস্থ পরিবেশ হইতে কোষে প্রবেশ করে তাহাকে নিষ্ক্রিয় আয়ন শোষণ বলে। ইহা একপ্রকার ব্যাপন প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ায় ATP, বাহক ও উৎসেচকের কোন ভূমিকা নাই। অপরপক্ষে, যে প্রক্রিয়ায় খনিজ লবণের আয়ন ঘনত্বের বিপরীতে বহিঃস্থ পরিবেশ হইতে কোষের মধ্যে প্রবেশ করে তাহাকে সক্রিয় আয়ন শোষণ বলে। এই প্রক্রিয়ায় বাহক ও উৎসেচকের প্রয়োজন হয় এবং ATP ব্যয়িত হয়।

উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর গঠন, কোষবিভাজন, নাইট্রোজেন বিপাক, শর্করা ও প্রোটিন বিপাক, বৃদ্ধি এবং প্রাণীদের হাড় গঠন, দাঁত গঠন, হিমোগ্লোবিন গঠন, পেশী সংকোচন, রক্ত তঞ্চন প্রভৃতি কার্যে আয়নের অবদান অপরিসীম।

প্রশ্নাবলী

A. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ—

(1) প্রোক্যারিওটিক কোষ, (2) ব্যাকটিরিয়া, (3) নীলাভ সবুজ শৈবাল, (4) মাইকোপ্লাজমা, (5) স্পাইরোকিটা, (6) রিকেটসিয়া, (7) কোষ প্রাচীর, (8) রাইবোজোম, (9) প্লাস্টিড, (10) গল্গি বস্তু, (11) এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা, (12) মাইটোকনড্রিয়া, (13) লাইসোজোম, (14) সেণ্ট্রিওল, (15) অণুনালিকা, (16) নিউক্লিয়াস, (17) ভ্যাকুওল, (18) স্টার্চ দানা, (19) গ্লাইকোজেন, (20) জাইমোজেন দানা।

B. পার্থক্য নিরূপণ কর—

(1) প্রোক্যারিওটিক কোষ ও ইউক্যারিওটিক কোষ।
(2) উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষ।
(3) কোষ প্রাচীর ও কোষ পর্দা।
(4) ফ্যাগোসাইটোসিস ও পিনোসাইটোসিস।
(5) হাইপোটনিক ও হাইপারটনিক দ্রবণ।
(6) প্লাজমোলাইসিস ও ডিপ্লাজমোলাইসিস।
(7) অ্যামাইলোপ্লাস্ট ও ইলাইয়োপ্লাস্ট।
(8) ক্লোরোপ্লাস্টিড ও ক্রোমোপ্লাস্টিড।
(9) রাইবোজোম ও লাইসোজোম।
(10) ব্যাপন ও অভিস্রবণ।
(11) অভিস্রবণ চাপ ও মূলজ চাপ।
(12) সক্রিয় শোষণ ও নিষ্ক্রিয় শোষণ।

C. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও—

(1) নিউক্লিয়াসহীন দুইটি সজীব কোষের নাম কর।
(2) প্রোটোপ্লাজম ক্ষরিত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থের নাম কর।
(3) জীবজগতের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম স্বাধীনভাবে বসবাসকারী জীবের নাম কি?
(4) সিনোসাইট ও সিনসিটিয়াম বলিতে কি বুঝ?
(5) ব্যাপনচাপ ঘাটতি বা DPD বলিতে কি বুঝ?
(6) প্রাইমোরডিয়াল ইউট্রিকল কাহাকে বলে?
(7) কিভাবে একটি বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ খাড়াভাবে অবস্থান করে?
(8) একটি জীবিত কোষকে আইসোটনিক, হাইপোটনিক ও হাইপারটনিক দ্রবণে ডোবান হইলে কি ঘটিবে?
(9) ফুলের পাপড়ির রঙ নানারকম হয় কেন?
(10) সেণ্ট্রোজোমের কাজ কি?

(11) একটি মিষ্ট জলের মাছকে সমুদ্রের জলে রাখিলে মাছটির পরিণতি কি হইবে ?

(12) সক্রিয় জলশোষণ ও নিষ্ক্রিয় জলশোষণ বলিতে কি বুঝ ?

(13) আরগাস্টিক পদার্থ কাহাকে বলে ?

(14) একটি কোষ হইতে নিউক্লিয়াস বাহির করিয়া আনিলে কি ঘটিবে ?

(15) বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত দুইটি কোষের নাম কর।

(16) খালি চোখে দেখা যায় এমন দুইটি কোষের নাম কর।

D. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন—

(1) কোষ কাহাকে বলে ? একটি প্রোক্যারিওটিক কোষের সচিত্র গঠন উল্লেখ কর।

(2) একটি ইউক্যারিওটিক কোষের চিত্র অঙ্কন করিয়া উহার বিভিন্ন অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

(3) প্রোটোপ্লাজম বলিতে কি বুঝ ? প্রোটোপ্লাজমের ভৌত ও রাসায়নিক গঠন উল্লেখ কর।

(4) কোষীয় অঙ্গাণু কাহাকে বলে ? যে কোন দুইটি কোষীয় অঙ্গাণুর গঠন ও কাজ উল্লেখ কর।

(5) উদ্ভিদ কিভাবে মাটি হইতে জল অথবা খনিজ লবণ শোষণ করে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(6) অভিস্রবণ কাহাকে বলে ? জীবদেহে অভিস্রবণের গুরুত্ব কি ?

E. সংক্ষিপ্ত রচনা ভিত্তিক :—

(1) কোষতত্ত্বের প্রবক্তা কে ? ঐ তত্ত্বের মূল বক্তব্য কি ?

(2) কোষ পর্দার গঠন উল্লেখ কর। একক পর্দা বলিতে কি বুঝ ?

(3) প্লাস্টিড কয় প্রকার ও কি কি ? প্লাস্টিডের কাজ কি ?

(4) মাইটোকনড্রিয়াকে কোষের শক্তিঘর বলে কেন ? ইহার সহিত মেসোজোমের পার্থক্য কি ?

(5) নিউক্লিয়াসের কাজ উল্লেখ কর। ইহাকে কোষের মগজ বলে কেন ?

(6) জীবদেহে ব্যাপনের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

তৃতীয় অধ্যায়	ক্রোমোজোম ও কোষবিভাজন

3.1. ক্রোমোজোম (Chromosome, গ্রীক শব্দ Chroma = রঞ্জিত, Soma = দেহ) : নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত যে সকল জটিল তন্তুর মাধ্যমে জীবের বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয় তাহাদের ক্রোমোজোম বলে।

বংশগতি নিয়ন্ত্রণে ক্রোমোজোমের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকায় অন্যান্য কোষীয় অঙ্গাণু অপেক্ষা ক্রোমোজোমের প্রতি বিজ্ঞানীদের মনোযোগ ও আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা বেশি। 1879 খ্রীষ্টাব্দে ফ্লেমিং (W. Flemming) সর্বপ্রথম নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ রঞ্জিত সূত্রবৎ বস্তুগুলিকে ক্রোমাটিন (Chromatin) নামে ভূষিত করিলেও 1888 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ওয়ালডিয়ার (Waldeyer) ইহার নামকরণ করেন ক্রোমোজোম।

3.2. সংখ্যা (Number) : একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট। উচু স্তরের উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহকোষে ক্রোমোজোম জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। প্রতি জোড়ার একটি মাতার ও অপরটি পিতার নিকট হইতে আসে। দেহকোষে এইরূপ দুই প্রস্ত (Double set) ক্রোমোজোম থাকায় ইহাদের ডিপ্লয়েড (Diploid) বলা হয়। অপরপক্ষে, জননকোষে (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহকোষের অর্ধেক হয় বলিয়া ইহাদের হ্যাপ্লয়েড (Haploid) বলে। ডিপ্লয়েডকে '2n' দ্বারা এবং হ্যাপ্লয়েডকে 'n' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

সর্বাপেক্ষা কম ক্রোমোজোম (2n = 2) দেখা যায় গোলকৃমি অ্যাসকারিস মেগালোকেফালা (*Ascaris megalocephala*) নামক প্রাণীতে। স্পাইরোগাইরা (Spirogyra), উস্টিলাগো (Ustilago) প্রভৃতি উদ্ভিদে, চ্যাপ্টা কৃমি মেসোস্টোমা (Mesostoma) ও অনেক প্রাণীতে ক্রোমোজোম সংখ্যা 2n = 4। অ্যামিবা প্রোটিয়াসে (*Amoeba proteus*) ক্রোমোজোম সংখ্যা 2n = 500, অফিওগ্লসাম (Ophioglossum) নামক উদ্ভিদে 2n = 1260, অলাকান্থা (Aulacantha) নামক প্রোটোজোয়ায় 2n = 1600টি ক্রোমোজোম।

কয়েকটি পরিচিত উদ্ভিদ ও প্রাণীর ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা

উদ্ভিদ	প্রাণী
1. ধান—24	1. ড্রসোফিলা—8
2. মটর—14	2. কুনোব্যাঙ—22
3. আলু—48	3. মাছি—12
4. পিঁয়াজ—16	4. ইঁদুর—40
5. তামাক—48	5. গিনিপিগ—64
6. গম—42	6. গাধা—62

উদ্ভিদ	প্রাণী
7. বাঁধাকপি—18	7. ঘোড়া—64
8. চা—30	8. বাঁদর—42
9. মুলা—18	9. গঙ্গাফড়িং—24
10. ভুট্টা—20	10. মানুষ—46

3.3. **আয়তন** (Size): একটি প্রজাতির বিভিন্ন ক্রোমোজোমের আয়তন বিভিন্ন। মেটাফেজ দশায় ইহাদের দৈর্ঘ্য 0·1 μm হইতে 32 μm এবং প্রস্থে 0·2-2 μm। তবে উদ্ভিদের ক্রোমোজোম প্রাণিদের ক্রোমোজোম অপেক্ষা বড়।

3.4. **আকার** (Shape): ক্রোমোজোম আকৃতিতে সাধারণত লম্বা তবে কিছু সংখ্যক ক্রোমোজোম আকৃতিতে ক্ষুদ্র ও স্থূল। ইণ্টারফেজ দশায় ইহাদের দেখিতে প্যাচানো সরু সুতার ন্যায় আবার মেটাফেজ বা অ্যানাফেজ দশায় ইহারা মোটা ও অল্প প্যাচানো হয়। মেটাফেজ ক্রোমোজোম আকৃতিতে 'I', 'J', 'L' অথবা 'V'-এর ন্যায় হয়।
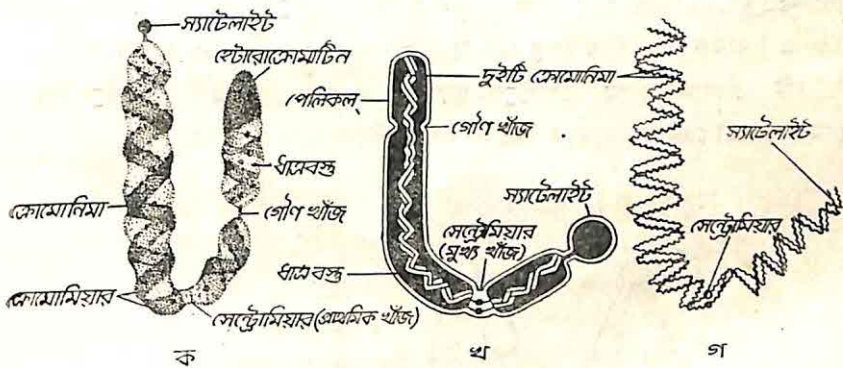
চিত্র 3.1 : ক, খ, গ = ক্রোমোজোমের বিভিন্ন অংশের চিত্ররূপ

3.5. **গঠন** (Structure): ক্রোমোজোম সম্বন্ধে বেশির ভাগ তথ্য মেটাফেজ ক্রোমোজোম হইতে জানা গিয়াছে। কারণ মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমগুলিকে স্পষ্ট দেখা যায় এবং গণনা করা যায়। একটি ক্রোমোজোম নিম্নলিখিত অংশ লইয়া গঠিত—পেলিক্ল্ বা আবরণী (Pellicle), ধাত্র (Matrix), মুখ্য খাঁজ ও সেণ্ট্রোমিয়ার (Primary constriction and centromere), ক্রোমাটিড (Chromatid), ক্রোমোমিয়ার (Chromomere), গৌণ খাঁজ (Secondary constriction) ও স্যাটেলাইট (Satellite)।

(1) **পেলিক্ল্** : ক্রোমোজোমের বাহিরের আবরণকে পেলিক্ল্ বলে। কিন্তু ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই ধরনের আবরণের অস্তিত্ব দেখা যায় নাই।

(2) **ম্যাট্রিক্স বা ধাত্র :** পেলিকলের ভিতরে জেলির ন্যায় পদার্থকে ম্যাট্রিক্স বলে। ম্যাট্রিক্সের গঠন ও কার্য সম্বন্ধে বিশদ জানা যায় নাই তবে অনেকের ধারণা ক্রোমোজোমকে কুণ্ডলীকৃত করিতে ম্যাট্রিক্সের ভূমিকা বিদ্যমান। তবে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ম্যাট্রিক্সের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই।

(3) **মুখ্য খাঁজ ও সেন্ট্রোমিয়ার :** ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট স্থান সংকুচিত হইয়া উহাকে দুইটি বাহুতে বিভক্ত করিয়াছে। ইহাকে মুখ্য খাঁজ (Primary constriction) বলে। মুখ্য খাঁজে অবস্থিত গোলাকার ও স্বচ্ছ অংশকে সেন্ট্রোমিয়ার বা কাইনেটোকোর (Kinetochore) বলে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহাদের দেখিতে 0·20 হইতে ·25 μm ব্যাসযুক্ত প্লেট অথবা কাপের ন্যায়। ক্রোমোজোমের দুইটি ক্রোমাটিড সেন্ট্রোমিয়ার অংশে যুক্ত থাকে। সেন্ট্রোমিয়ারের প্রকৃত রাসায়নিক প্রকৃতি জানা যায় নাই। তবে অনুমান করা হয় যে, ইহা ক্রোমাটিনবিহীন (Non-Chromatin) পদার্থ দ্বারা গঠিত। কোষ বিভাজনের সময় এই অংশের সহিত বেমতন্তু (Spindle fibre) সংযুক্ত থাকিয়া ক্রোমোজোমের চলনে অংশগ্রহণ করে।

অনেক ক্রোমোজোমে দুইটির অধিক সেন্ট্রোমিয়ার দেখা যায় অথবা ক্রোমোজোমের সারা দেহে সেন্ট্রোমিয়ারের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। উহাদের পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার (Diffused Centromere) বলে। এই ধরনের সেন্ট্রোমিয়ার কিছু শৈবাল, লুজুলা (Luzula) নামক উদ্ভিদ ও কিছু পতঙ্গে (Hemiptera group) দেখা যায়।

প্রতিটি ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান নির্দিষ্ট। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।
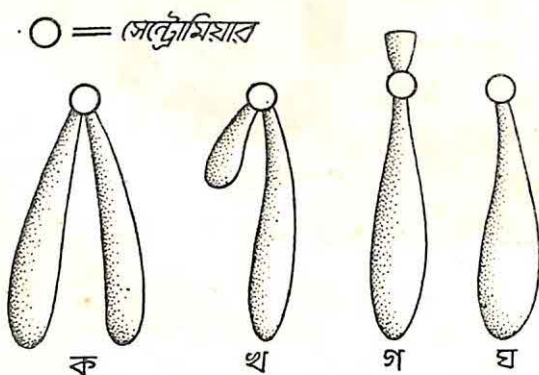
চিত্র 3.2 : বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোজোম (ক=মেটাসেণ্ট্রিক, খ=সাব-মেটাসেণ্ট্রিক, গ=অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক, ঘ=টিলোসেণ্ট্রিক)

(i) **টিলোসেণ্ট্রিক (Telocentric)** বা প্রান্তীয় সেন্ট্রোমিয়ার—সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের একপ্রান্তে অবস্থান করে। এই জাতীয় ক্রোমোজোমকে অ্যানাফেজ দশায় দেখিতে 'I'-এর ন্যায় হয়।

(ii) **অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক (Acrocentric)** বা ঈষদ্ প্রান্তীয়—সেন্ট্রোমিয়ার

ক্রোমোজোমের প্রান্ত হইতে ঈষৎ পশ্চাতে অবস্থান করে। এই ধরনের ক্রোমোজোমকে অ্যানাফেজ দশায় দেখিতে 'J'-এর ন্যায় হয়।

(iii) সাবমেটাসেণ্ট্রিক (Submetacentric) বা ঈষদ্ মধ্য সেণ্ট্রোমিয়ার—সেণ্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের মধ্যভাগের ঈষৎ নিচে অবস্থান করে। এই ধরনের ক্রোমোজোমকে অ্যানাফেজ দশায় দেখিতে 'L'-এর ন্যায় হয়।

(iv) মেটাসেণ্ট্রিক (Metacentric) বা মধ্য সেণ্ট্রোমিয়ার—সেণ্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের মধ্যভাগে অবস্থান করে। এই ধরনের ক্রোমোজোমকে অ্যানাফেজ দশায় দেখিতে 'V'-এর ন্যায় হয়।

(4) ক্রোমাটিড (Chromatid): প্রতিটি ক্রোমোজোম লম্বালম্বি দুইটি প্যাঁচানো তন্তু দ্বারা গঠিত। ইহাদের ক্রোমাটিড বা ক্রোমোনিমাটা (Chromonemata) বলে। প্রকৃতপক্ষে, ইণ্টারফেজ দশায় ক্রোমাটিডগুলিকে সূক্ষ্ম তন্তুর ন্যায় মনে হয় এবং বিভাজনকালে ইহারা কুণ্ডলীকৃত হইয়া ক্ষুদ্র ও স্থূল হয়। ক্রোমাটিড বা ক্রোমোনিমাদ্বয় পরস্পর পরস্পরকে প্যাঁচাইয়া কুণ্ডলী তৈয়ার করে। এই কুণ্ডলী দুই প্রকার—
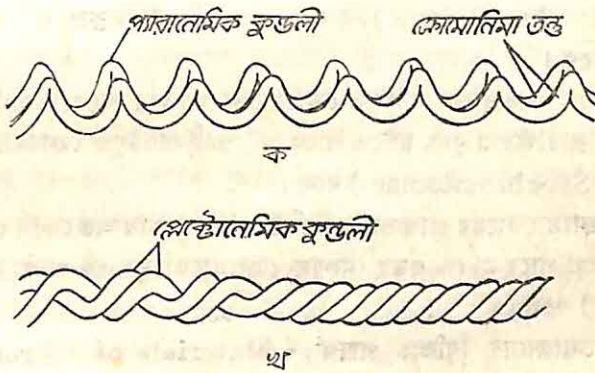
চিত্র 3.3 : ক্রোমোজোমের ক্রোমোনিমা তন্তুর কুণ্ডলী
ক=প্যারানেমিক কুণ্ডলী ; খ=প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী

(i) প্যারানেমিক কুণ্ডলী (Paranemic coil)—যখন ক্রোমাটিড দুইটি জট হইতে সহজে খুলিয়া যায় তাহাকে প্যারানেমিক কুণ্ডলী বলে।

(ii) প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী (Plectonemic coil)—যখন ক্রোমাটিড দুইটি নিজেদের মধ্যে এমনভাবে প্যাঁচাইয়া থাকে যে উহাদের জট হইতে সহজে খোলা যায় না, তখন উহাকে প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী বলে।

অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা প্রতিটি ক্রোমাটিড দুইটি, চারিটি অথবা ততোধিক সূক্ষ্ম তন্তু (Microfibrils or Sub-Chromonemata) লইয়া গঠিত। তবে আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রতিটি ক্রোমাটিড একটিমাত্র সুদীর্ঘ DNA তন্তু লইয়া গঠিত এবং

এই তন্তু প্রথমে কুণ্ডলীকৃত হয় এবং অনুদৈর্ঘ্য-অনুপ্রস্থভাবে ভাঁজ হইয়া ক্রোমাটিডের আকৃতি প্রদান করে।

(5) ক্রোমোমিয়ার (Chromomere): ক্রোমাটিডের গাত্রে অবস্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানার ন্যায় অংশকে ক্রোমোমিয়ার বলে। দুইটি ক্রোমোমিয়ারের সংযোগরক্ষাকারী সূক্ষ্ম তন্তুকে আন্তরক্রোমোমিয়ার তন্তু (Interchromomeric fibre) বলে। একটি ক্রোমোজোমে ক্রোমোমিয়ারের সংখ্যা সর্বদা নির্দিষ্ট। বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী ক্রোমাটিড মধ্যস্থ নিউক্লিও-প্রোটিন পদার্থ ঘনীভূত হইয়া ক্রোমোমিয়ারের সৃষ্টি করে। তবে আধুনিক বিজ্ঞানী গোষ্ঠী মনে করেন যে, ক্রোমোজোমের কুণ্ডলীকৃত অংশ একটির উপর একটি স্থাপিত হইয়া ক্রোমোমিয়ার উৎপন্ন করে। ক্রোমোমিয়ার জীনের অবস্থান সূচিত করে।

(6) গৌণ খাঁজ ও স্যাটিলাইট (Secondary Constriction and Satellite): কিছু ক্রোমোজোমে মুখ্য খাঁজ ব্যতীত এক বা একাধিক খাঁজ দেখা যায় তাহাকে গৌণ খাঁজ বলে। এই খাঁজ ক্রোমোজোমের একটি অথবা দুইটি বাহুতে থাকিতে পারে। এই গৌণ খাঁজ অংশে নিউক্লিওলাস গঠিত হয়। যে গৌণ খাঁজ অংশে নিউক্লিওলাস গঠিত হয় তাহাকে নিউক্লিওলার অর্গানাইজার (Nucleolar organiser) বলে এবং এইরূপ ক্রোমোজোমকে নিউক্লিওলার ক্রোমোজোম (Nucleolar Chromosome) বলে। প্রতিটি নিউক্লিয়াসে এইরূপ দুইটি ক্রোমোজোম থাকে।

গৌণ খাঁজের শেষপ্রান্তে অবস্থিত ক্রোমোজোমের ক্ষুদ্র অংশকে স্যাটিলাইট বলে। ইহা ক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় অথবা বৃহৎ হইতে পারে। স্যাটিলাইটযুক্ত ক্রোমোজোমকে স্যাট-ক্রোমোজোম (Sat-chromosome) বলে।

প্রত্যেক ক্রোমোজোমের প্রান্তভাগে নির্দিষ্ট মেরুত্ব থাকায় অন্য কোন ক্রোমোজোমের সহিত যুক্ত হইতে পারে না। স্বতন্ত্র মেরুযুক্ত ক্রোমোজোমের এই প্রান্তকে টেলোমিয়ার (Telomere) বলে।

3.6 ক্রোমোজোমের বিভিন্ন পদার্থ (Materials of Chromosome): ক্রোমোজোম ক্রোমাটিন পদার্থ দ্বারা গঠিত। ক্রোমাটিন প্রধানত দুই প্রকার—ইউক্রোমাটিন (Euchromatin) ও হেটারোক্রোমাটিন (Heterochromatin)।

ইউক্রোমাটিন: ক্রোমোজোমের অধিক স্থান দখলকারী অঘনীভূত (Non-condensed) অংশকে ইউক্রোমাটিন বলে। ক্রোমাটিনের এই অংশের প্যাঁচ ইন্টারফেজ দশায় খুলিয়া যায় এবং বিভাজন দশায় স্প্রিং-এর ন্যায় কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় থাকে। তাই ইণ্টারফেজ দশায় এই অংশ হালকা রঙ এবং মেটাফেজ দশায় সর্বাপেক্ষা গাঢ় রঙ নেয়। এই অংশে DNA বেশি থাকায় বংশগতির ব্যাপারে সক্রিয়।

হেটারোক্রোমাটিন: ক্রোমোজোমের স্বল্প স্থান দখলকারী ঘনীভূত (condensed) অংশকে হেটারোক্রোমাটিন বলে। ক্রোমাটিনের এই অংশ সর্বদা কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় থাকিবার জন্য সর্বদা গাঢ় রঙে রঞ্জিত হয়। হেটারোক্রোমাটিনের DNA-এর প্রতিলিপি-ভবন (Replication) ইউক্রোমাটিন অপেক্ষা দেরিতে সম্পন্ন হয়। ক্রোমোজোমের

এই অংশ প্রজননিক অর্থে নিষ্ক্রিয় (Genetically inert) হইলেও ইহা নিউক্লিওলার অর্গানাইজার হিসাবে কাজ করে। কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমের পৃথকীকরণে সাহায্য করে এবং নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করে।

3.7 ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদান (Chemical composition of chromosome): ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান হইল DNA, RNA, হিস্টোন বা ক্ষারীয় প্রোটিন ও অহিস্টোন বা আম্লিক প্রোটিন বা রেসিডুয়াল প্রোটিন (Residual Protein)। DNA ও হিস্টোন নিউক্লিও-হিস্টোন যৌগ (Nucleo-Histone Complex) গঠন করে। ক্রোমোজোমের মোট উপাদানের 60-90% এই যৌগ লইয়া গঠিত। এই যৌগ ক্রোমোজোমের গঠনগত কঙ্কাল (Architectural skeleton) তৈয়ার করে এবং ইহার হিস্টোন অংশ DNA-কে আবৃত অথবা অনাবৃত করিয়া জীবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশনে সাহায্য করে। হিস্টোন জাতীয় প্রোটিনে প্রধানত আর্জিনিন (Arginine) ও লাইসিন (Lysine) নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড় থাকে। নিউক্লিও-হিস্টোন যৌগে প্রায় 50% DNA ও 50% হিস্টোন থাকে।

নিউক্লিও-হিস্টোন ব্যতীত ক্রোমোজোমের অবশিষ্ট অংশ RNA ও রেসিডুয়াল প্রোটিন দ্বারা গঠিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা রেসিডুয়াল প্রোটিন ক্রোমোজোমের সংকোচনশীল উপাদান হিসাবে কাজ করে। রেসিডুয়াল প্রোটিনে ট্রিপটোফ্যান (Tryptophan) ও টাইরোসিন (Tyrosine) নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড বেশি থাকে। DNA হইতে RNA সৃষ্টি হয় এবং এই RNA নিউক্লিও পর্দার মধ্য দিয়া সাইটোপ্লাজমে যায় এবং প্রোটিন সংশ্লেষে অংশ গ্রহণ করে। তবে RNA ও রেসিডুয়াল প্রোটিন একসঙ্গে যুক্ত হইয়া কি কাজ করে তাহা জানা যায় নাই।

ক্রোমোজোমের এই সকল উপাদান ব্যতীত ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), লৌহ (Fe) প্রভৃতি ধাতব আয়ন বিদ্যমান। ইহারা ক্রোমোজোমের কাঠামোকে দৃঢ় করে এবং ক্রোমোজোমের বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত রাখে।

ক্রোমোজোমের কার্য (Function of Chromosome):

(1) ক্রোমোজোম-মধ্যস্থ DNA বংশগতির ধারক ও বাহক।
(2) কোষের সকল প্রকার জৈবনিক কার্য ক্রোমোজোমের নির্দেশে ঘটে।
(3) কোষের বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন সংশ্লেষ করে।

3.8 জীন (Gene): মেণ্ডেল ব্যবহৃত বংশগতির উপাদান বা ফ্যাক্টরই আধুনিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে জীন নামে পরিচিত। 1909 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী জোহানসেন বংশগতির উপাদানের নামকরণ করেন জীন। এখনও পর্যন্ত জীনকে চোখে দেখা না গেলেও উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। একটি ক্রোমোজোমের মধ্যে অসংখ্য জীন রৈখিক আকারে সজ্জিত থাকে। ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান DNA-ই জীনের রাসায়নিক রূপ।

জীনের সংজ্ঞা (Definition of gene): জীনের প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ করা একটি বিতর্কের বিষয়। তবে বিভিন্ন বিজ্ঞানী জীনের বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। জীন সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা একত্রিত করিলে বুঝা যায় যে—

(1) জীন ক্রোমোজোমের অবিচ্ছিন্ন অংশ।
(2) জীন নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বারা গঠিত।
(3) ক্ষুদ্র এককরূপে পৃথকভবনের সূত্র অনুসরণ করে।
(4) সংযুতি অপরিবর্তিত রাখিয়া জীনের আত্মোৎপাদনের ক্ষমতা আছে।
(5) জীনের পরিব্যক্তির ক্ষমতা আছে।
(6) জীবের বৈশিষ্ট্য নির্ধারক ও বাহক হইল জীন।

উপরি-উক্ত ধারণাগুলি হইতে জীন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নিরূপণ করা যাইতে পারে—**জীন হইল জীবের পরিস্ফুরণ নিয়ন্ত্রণকারী ও পরিব্যক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন আত্মপ্রজননশীল ক্ষুদ্র একক যাহা জননের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়।**

জীন সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা (Modern concept of gene): আধুনিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিজ্ঞানী জীনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সেইগুলি হইল—

(1) **সিস্ট্রন (Cistron)**—জীন হইল ক্রোমোজোমের ক্ষুদ্র অংশ যাহা একটি একক হিসাবে কার্য করে। তাই জীনকে সিস্ট্রন বা শারীরবৃত্তীয় চরম একক হিসাবে অভিহিত করা হয়।

(2) **রেকন (Recon)**—জীন হইল ক্রোমোজোমের ক্ষুদ্রতম একক এবং ইহাদের যে কোন দুইটির মধ্যে পুনঃসযোজন বা ক্রসিং ওভার ঘটিতে পারে, তাই জীনকে রেকন বা পুনঃসযোজনের চরম একক হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়।

(3) **মিউটন (Muton)**—DNA অণুর পরিব্যক্তিক্ষম ক্ষুদ্রতম অংশকে মিউটন বা পরিব্যক্তির চরম একক বলে।

(4) **কোডন (Codon)**—DNA অণুর একদল বেসকে কোডন বলা হয় যাহারা একটি নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডের কোড বা সংকেত বহন করে।

DNA : DNA-এর পুরো নাম ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Deoxyribonucleic acid)। কয়েক প্রকার ভাইরাস ব্যতীত সকল কোষের ক্রোমোজোমে ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত প্লাস্টিড, মাইটোকনড্রিয়া ও সেন্ট্রিওলে DNA পাওয়া যায়। আবার অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম, ফার্ণ প্রভৃতি কোষের সাইটোপ্লাজমে DNA দেখা যায়।

উপাদান : DNA একটি অতি জটিল বৃহৎ অণুযুক্ত রাসায়নিক যৌগ। ইহা তিন প্রকার অণুর সমন্বয়ে গঠিত। যথা—

(i) একটি পাঁচ কার্বনযুক্ত শর্করা বা পেন্টোজ সুগার যাহা ডি-অক্সিরাইবোজ (Deoxyribose) শর্করা নামে পরিচিত।

(ii) একটি ফসফোরিক অ্যাসিড (H_3PO_4) বা ফসফেট গ্রুপ।

(iii) নাইট্রোজেন বেস : DNA-এর মধ্যে দুই প্রকার নাইট্রোজেনযুক্ত জৈব যৌগ দেখা যায়।

(ক) পিউরিন (Purines) : ইহাতে অ্যাডিনিন (Adenine) ও গুয়ানিন (Guanine) নামক দুই প্রকার বেস থাকে।

(খ) পিরিমিডিন (Pyrimidines) : ইহাতে সাইটোসিন (Cytosine) ও থাইমিন (Thymine) নামক দুই প্রকার বেস থাকে।

নাইট্রোজেন বেসগুলি ডি-অক্সিরাইবোজ শর্করার সহিত রাসায়নিক সংযোগ স্থাপন করিলে তখন ঐ অণুকে নিউক্লিওসাইড (Nucleoside) বলে। আবার এই নিউক্লিওসাইড ফসফোরিক অ্যাসিড বা ফসফেট গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হইলে তাহাকে নিউক্লিওটাইড (Nucleotide) বলে। এই নিউক্লিওটাইড হইতেছে DNA-এর ক্ষুদ্র একক। একটি DNA অণুর মধ্যে অসংখ্য নিউক্লিওটাইড থাকে।

সুগার + বেস = নিউক্লিওসাইড
নিউক্লিওসাইড + ফসফোরিক অ্যাসিড = নিউক্লিওটাইড

3.9 DNA-এর গঠন (Structure of DNA) : 1953 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ওয়াটসন ও ক্রিক (Watson and Crick) DNA-অণুর গঠন প্রকৃতি বর্ণনা দেন। তাঁহাদের মতে DNA-অণু দুইটি প্রলম্বিত প্যাঁচানো রজ্জু বা তন্তু দ্বারা গঠিত। রজ্জু (strand) দুইটি পরস্পর পরস্পরকে সমান্তরালভাবে জড়াইয়া একটি যুগ্ম কুণ্ডলের (Double helix) সৃষ্টি করে যাহাকে দেখিতে প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ির ন্যায়।
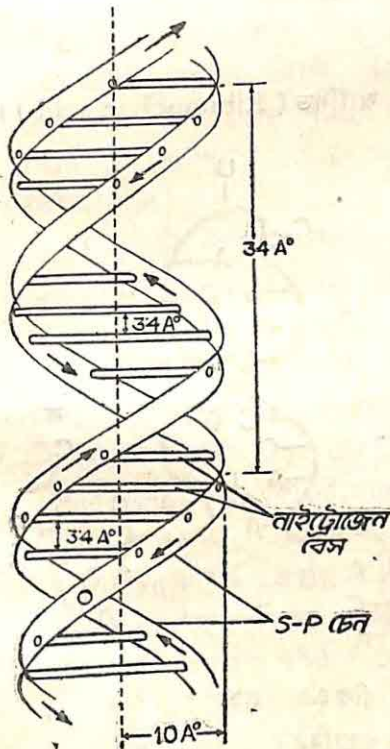
চিত্র 3.4 : DNA-অণুর দ্বিতন্ত্রী গঠন
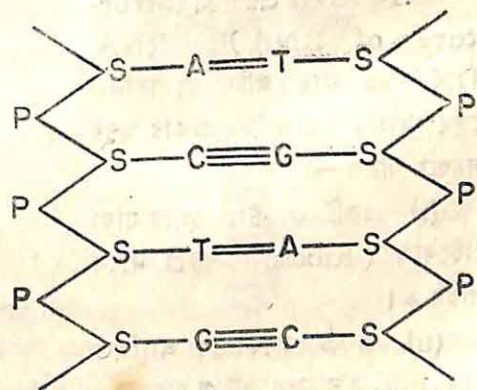
চিত্র 3.5 : নিউক্লিক অ্যাসিডের সজ্জাবিন্যাস
[P=ফসফেট গ্রুপ, S=সুগার বা শর্করা, A=অ্যাডিনিন, T=থাইমিন, C=সাইটোসিন, G=গুয়ানিন]

DNA-অণুর প্রতিটি রজ্জু অসংখ্য নিউক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত। একটি রজ্জুর নিউক্লিওটাইডগুলি পরস্পরের সঙ্গে ফসফেট গ্রুপ ও শর্করার মধ্যে রাসায়নিক বণ্ড স্থাপন করিয়া অবস্থান করে। অর্থাৎ ফসফেট ও শর্করার বণ্ড লোহার সিঁড়ির হাতল তৈয়ার করে। আবার একটি রজ্জুর নিউক্লিওটাইডের নাইট্রোজেন বেস অপর রজ্জুর নিউক্লিওটাইডের বেসের সঙ্গে হাইড্রোজেন বণ্ড দ্বারা অনুপ্রস্থভাবে যুক্ত থাকে। দুইটি রজ্জুর নিউক্লিওটাইডের অনুপ্রস্থ সংযোগ দেখিতে সিঁড়ির ধাপের ন্যায়। তবে একটি রজ্জুর নিউক্লিওটাইডের পিউরিন বেস অপর রজ্জুর নিউক্লিওটাইডের পিরিমিডিন বেসের সহিত যুক্ত হয় এবং সর্বদা অ্যাডিনিন (A) থাইমিনের (T) সঙ্গে দুইটি হাইড্রোজেন বণ্ড দ্বারা (A=T) এবং সাইটোসিন (C) গুয়ানিনের (G) সঙ্গে তিনটি হাইড্রোজেন বণ্ড দ্বারা (C≡G) যুক্ত থাকে।

DNA-অণুর একটি সম্পূর্ণ 360° প্যাঁচের মধ্যে 34Å বা 3·4 nm দূরত্ব বিদ্যমান এবং ইহার ভিতর 10টি ধাপ থাকে। সুতরাং দুইটি ধাপের মধ্যবর্তী দূরত্ব 3·4Å বা 0·34 nm। দ্বিতন্ত্রী DNA-এর দুইটি রজ্জুর মধ্যে দূরত্ব 20Å বা 2 nm অর্থাৎ DNA প্রস্থে 20Å বা 2 nm হয়।

DNA-এর কার্য (Functions of DNA):

(1) DNA বংশগতির ধারক ও বাহক।

(2) ইহা কোষের সকল জৈবিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে।

(3) DNA হইতে RNA সংশ্লেষিত হয়।

(4) DNA প্রোটিন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ করে।

RNA : ইহার পুরা নাম রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Ribonucleic acid)। কিছু কিছু ভাইরাস এবং সকল প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক কোষে RNA থাকে।

3.10 RNA-এর গঠন (Structure of RNA): RNA, DNA-এর ন্যায় জটিল রাসায়নিক জৈব যৌগ। ইহাও তিন প্রকার অণুর সমন্বয়ে গঠিত—

(*i*) একটি পেন্টোজ সুগার যাহা রাইবোজ (Ribose) শর্করা নামে পরিচিত।

(*ii*) একটি ফসফোরিক অ্যাসিড (H_3PO_4) বা ফসফেট গ্রুপ।

(iii) নাইট্রোজেন বেস :

(ক) পিউরিন—অ্যাডিনিন ও গুয়ানিন।

(খ) পিরিমিডিন—সাইটোসিন ও ইউরাসিল (Uracil)।
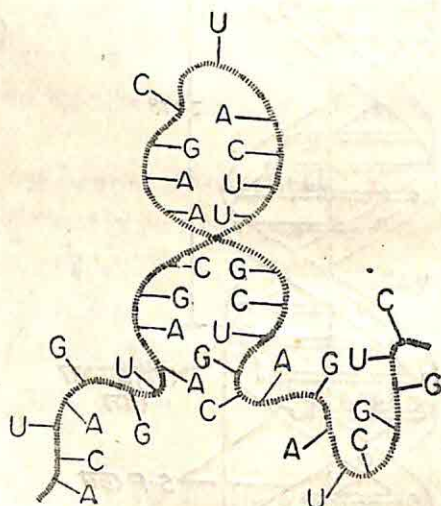
চিত্র 3.6 ; RNA-অণুর গঠন

DNA-এর ন্যায় উপরি-উক্ত তিনটি উপাদান পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া চারিপ্রকার রাইবোনিউক্লিওটাইড গঠন করে।

ফসফোরিক অ্যাসিড + রাইবোজ শর্করা + বেস = রাইবোনিউক্লিওটাইড। একটি RNA-অণুতে এইরূপ অসংখ্য নিউক্লিওটাইড থাকে। ইহারা সাধারণত একতন্ত্রা হয় তবে কখনও কখনও দ্বিতন্ত্রী হয় কিন্তু কখনও DNA-এর ন্যায় যুগ্ম কুণ্ডলী (Double helix) গঠন করে না।

RNA-এর প্রকারভেদ (Types of RNA): বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী RNA দুই প্রকার—

(i) **জেনেটিক RNA (Genetic RNA):** ইহারা বংশগতির বাহক হিসাবে কার্য করে। যেমন কিছু ভাইরাস ও ব্যাকটিরিওফাজের একতন্ত্রী RNA।

(ii) **ননজেনেটিক RNA (Non-genetic RNA):** ইহারা DNA হইতে সংশ্লেষিত হয় এবং প্রোটিন সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে। ইহারা আবার তিন প্রকার—

(ক) বার্তাবহ RNA (Messenger RNA বা mRNA)।

(খ) পরিবৃত্তীয় RNA (Transfer RNA বা tRNA)।

(গ) রাইবোজোমাল RNA (Ribosomal RNA বা rRNA)।

3.11 দৈত্যাকার ক্রোমোজোম (Giant chromosome): কতিপয় প্রাণীর কিছু কিছু কোষে ক্রোমোজোমের আকার খুব বড় হয়। এইরূপ ক্রোমোজোমকে দৈত্যাকার ক্রোমোজোম বলে। ইহারা প্রধানত দুই প্রকার—পলিটিন (Polytene) ক্রোমোজোম ও ল্যাম্পব্রাস (Lamp brush) ক্রোমোজোম।

3.12 পলিটিন ক্রোমোজোম (Polytene Chromosome): ডিপেটরা বর্গের পতঙ্গের লার্ভার লালাগ্রন্থি, খাদ্যনালী, শ্বাসনালী, ম্যালপিজিয়ান নালিকার কোষে এই ধরনের ক্রোমোজোম দেখা যায়। 1881 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বলবিয়ানী (E. G. Balbiani) সর্বপ্রথম এই প্রকার ক্রোমোজোমের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন।

চিত্র 3.6 : পলিটিন ক্রোমোজোম

ইহাদের আকার এত বড় যে ড্রোসোফিলা (Drosophila) নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র মাছির লার্ভার কোষে পলিটিন ক্রোমোজোম সাধারণ ক্রোমোজোমের প্রায় 1000 গুণ বড়। ইহাদের চার জোড়া ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য একত্রে প্রায় 2000 μm হয়। এই ক্রোমোজোমগুলি স্থায়ী প্রোফেজ দশায় থাকে এবং মিয়োসিসের মত সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি জোড় বাঁধিয়া (Somatic pairing) অবস্থান করে। ক্রোমোজোমের
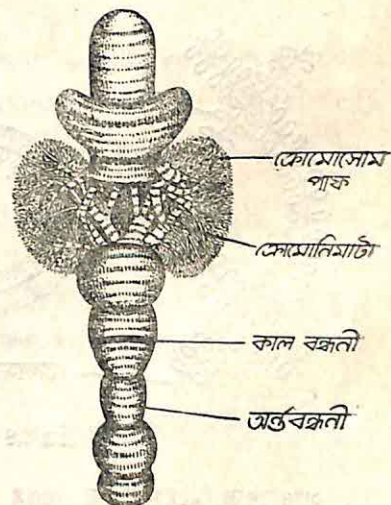
ক্রোমোনিমাগুলির প্রায় 10 বার দ্বিত্বকরণ (Reduplication) ঘটিয়া অসংখ্য ক্রোমোনিমার (প্রায় 1000টি) সৃষ্টি করে কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই সকল ক্রোমোনিমা পৃথক না হইয়া একই সঙ্গে অবস্থান করে। ফলে ক্রোমোজোমের আকার বৃহৎ ও বহুতন্ত্রীযুক্ত হয়। যে পদ্ধতিতে ক্রোমোনিমার বারবার বিভাজন ঘটিয়া বহুতন্ত্রীযুক্ত বৃহদাকার ক্রোমোজোমের সৃষ্টি করে তাহাকে এণ্ডোমাইটোসিস (Endomitosis) বলে।

পলিটিন ক্রোমোজোমকে নির্দিষ্ট রঙে রঞ্জিত করিলে উহার স্থানে স্থানে গাঢ় দাগ বা ডার্ক ব্যাণ্ড (Dark band) ও হাল্কা দাগ বা ইন্টারব্যাণ্ড (Interband) অথবা লাইট ব্যাণ্ড (Light band) দেখা যায়। সন্নিহিত ডার্ক ব্যাণ্ডগুলির স্থানে স্থানে ফোলা অংশ দেখা যায়। ইহাদের পাফ (Puff) বলে। যে সকল পাফের আকৃতি বৃহৎ ও আংটির ন্যায় তাহাদের বলবিয়ানী রিং বলে। পাফ ও বলবিয়ানী রিং যে সকল স্থানে সৃষ্টি হয় সেই সকল স্থানে জীনগুলি অধিক সক্রিয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে RNA ও প্রোটিন ঐ সকল স্থানে সংশ্লেষিত হয় অথবা সঞ্চিত থাকে।

3.13 ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোজোম (Lamp brush chromosome) : মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী জাতীয় প্রাণীর ডিম্বাণুতে (Oocyte) এই প্রকার সর্ববৃহৎ ক্রোমোজোম দেখা যায়। 1892 খ্রীষ্টাব্দে রুকার্ট (Ruckert) এই প্রকার ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন। এই প্রকার ক্রোমোজোম লম্বায় সবচেয়ে বড় হয়। ইউরোডেলা বর্গের উভচর প্রাণীতে ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় 5900 μm হয়।
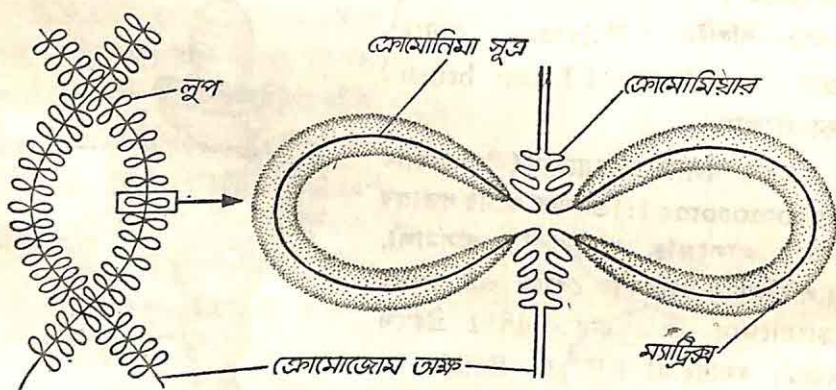
চিত্র 3.8 : ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোজোম

সাধারণত মিয়োসিসের প্রথম প্রোফেজ দশার ডিপ্লোটিনিতে ইহাদের ভালভাবে দেখা যায়। ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোজোমের একটি প্রধান অক্ষ (Axis) এবং অক্ষ হইতে উৎপন্ন পার্শ্বীয় লুপ থাকে। প্রধান অক্ষ চারিটি ক্রোমাটিড লইয়া গঠিত। প্রত্যেকটি ক্রোমাটিডের একই স্থান হইতে পার্শ্বদেশে স্ফীত অংশ বা লুপ (Loop) উৎপন্ন হয়। ফলে ক্রোমোজোমকে দেখিতে ল্যাম্প পরিষ্কার করার বুরুশের (Brush) ন্যায় হয় এইজন্য ইহাদের ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোজোম বলে। লুপগুলিতে RNA ও প্রোটিন

সংশ্লেষিত হয়। সংশ্লেষিত পদার্থ লুপ হইতে নির্গত হইবার পর লুপগুলি ক্রমশ ক্ষুদ্র হয় এবং পরিশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

3.14 কোষ বিভাজন (Cell division)

প্রতিটি জীবের জীবন শুরু হয় একটিমাত্র কোষ দ্বারা। এই কোষটি নিয়মিত বিভাজিত হইয়া বহুকোষের সৃষ্টি করে এবং এই কোষগুলির ক্রমবিভাজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে বহুকোষী লার্ভা বা ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে এই লার্ভা বা ভ্রূণ পরিবর্তিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়। জীবের বৃদ্ধি, জনন, বিভিন্ন অঙ্গের পরিস্ফুরণ ও ক্রমবিকাশের জন্য জীবকোষের ক্রমাগত বিভাজন ঘটিতে থাকে। শুধু তাহাই নয়, পূর্ণাঙ্গ জীবের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও মেরামতের জন্য কোষ বিভাজিত হয়। 1846 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী নাগেলী (Nageli) প্রমাণ করেন যে নূতন কোষের উৎপত্তি কেবল পুরাতন কোষের বিভাজন দ্বারা সম্পন্ন হয়।

যে পদ্ধতিতে একটি কোষ হইতে দুই বা ততোধিক কোষের সৃষ্টি হয় তাহাকে কোষ বিভাজন বলে। এই পদ্ধতিতে কোষীয় উপাদানসমূহ অপত্যকোষে সমভাবে বণ্টিত হয়।

কোষ বিভাজনের কারণ (Causes of cell division) : কোষ কেন বিভাজিত হয় তাহার স্পষ্ট কারণ জানা যায় নাই, তবে নিম্নলিখিত কারণে কোষ বিভাজিত হইতে পারে।

(1) কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত থাকে। এই অনুপাতকে নিউক্লিও-সাইটোপ্লাজমিক সূচক (Nucleo-cytoplasmic index) বা NP বলে। $NP = \frac{Vn}{Vc - Vn}$ [Vn = নিউক্লিয়াসের আয়তন, Vc = সাইটোপ্লাজমের আয়তন]। নিউক্লিয়াসের তুলনায় সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। ফলে কোষ বিভাজিত হয়। তাই NP হ্রাস পাইলে কোষ বিভাজিত হয়। মনে করা হয়, নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ সমানুপাতিক রাখিবার জন্য কোষ বিভাজনের প্রয়োজন।

(2) নিউক্লিয়াসের DNA-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইলে কোষ বিভাজিত হয়।

(3) একটি কোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম উভয়ই বিভাজনের জন্য প্রস্তুত না থাকিলে কোষ বিভাজিত হয় না। যেমন, একটি বিভাজনরত অ্যামিবার প্রোটোপ্লাজম হইতে নিউক্লিয়াস তুলিয়া আনিয়া সেই স্থানে অন্য একটি অ্যামিবার নিউক্লিয়াস বসাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে অ্যামিবার কোষ বিভাজন তখনই বন্ধ হইয়া যায়।

3.15 কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ (Types of cell division) : জীবদেহে তিন প্রকার কোষ বিভাজন দেখা যায়। যেমন—আমাইটোসিস (Amitosis), মাইটোসিস (Mitosis) ও মিয়োসিস (Meiosis)।

আমাইটোসিস (Amitosis, গ্রীক শব্দ A = না, Mitos = সূত্র) : যে প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস তথা সমগ্র কোষের বিভাজন উহাদের মধ্যাংশ বরাবর খাঁজ সৃষ্টির দ্বারা সম্পন্ন হয় তাহাকে আমাইটোসিস বলে। এই ধরনের কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াসটি লম্বা হইয়া যায় যাহার দুই প্রান্ত মোটা ও মধ্যাংশ সরু হয়। পরে মধ্যাংশ আরও সরু হইতে থাকে এবং পরিশেষে মোটা প্রান্ত দুইটির মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।
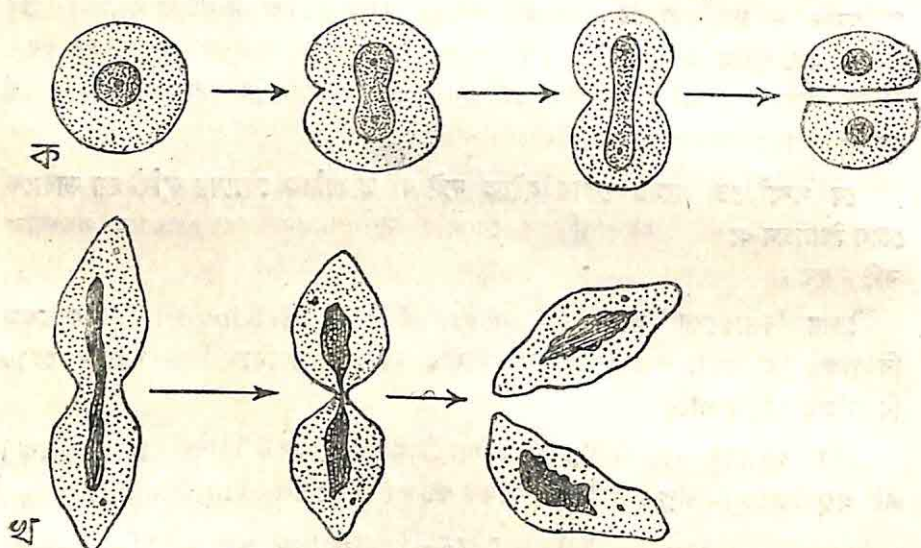
চিত্র 3.9 : ক = আমাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজনের চিত্ররূপ
খ = আমাইটোসিস পদ্ধতিতে প্যারামিসিয়ামের দ্বি-বিভাজন

এইভাবে প্রতিটি প্রান্তে একটি করিয়া নিউক্লিয়াস গমন করে। দুইটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যাঞ্চলে সরাসরি খাঁজের সৃষ্টি হয় এবং দুই ভাগে ভাগ হইয়া দুইটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে। অপত্য কোষ দুইটিতে জনিতৃ-কোষের সমসংখ্যক ও সমগুণসম্পন্ন ক্রোমোজোম থাকায় মাইটোসিস প্রক্রিয়ার সহিত এই কোষ বিভাজনের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ন্যায় ধারাবাহিক দশা দেখা যায় না। এই ধরনের কোষ বিভাজন সরাসরি খাঁজ সৃষ্টির দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহাকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন (Direct cell division) বলে। নিম্নশ্রেণীর জীবে যেমন ব্যাকটিরিয়া, কারা (একপ্রকার শৈবাল), অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম প্রভৃতিতে এই ধরনের কোষ বিভাজন দেখা যায়।

মাইটোসিস (Mitosis, গ্রীক শব্দ Mitos = সূত্র) : 1878 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ফ্লেমিং (W. Flemming) মাইটোসিস পদ্ধতির বিবরণ দেন এবং ঐ সময় এই প্রসঙ্গে

স্লাইচার (Schleicher) নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস রূপে অভিহিত করেন। 1887 খ্রীষ্টাব্দে হুইটম্যান (Whitmann) সাইটোপ্লাজম বিভাজনের নামকরণ করেন সাইটোকাইনেসিস। 1879 খ্রীষ্টাব্দে সেনাইডার (Scheneider) মাইটোসিস পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেন এবং 1960 খ্রীষ্টাব্দে ককরাউম ও ম্যাক্কলে (Cockraum and MacCaulay) এই পদ্ধতির বিশদ বিবরণ দেন।

আক্ষরিক অর্থে মাইটোসিস বলিতে নিউক্লিয়াসের বিভাজন বুঝায়। কিন্তু প্রচলিত অর্থে বা প্রকৃতপক্ষে মাইটোসিস বলিতে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম উভয়ের বিভাজনকে বুঝায়। এই কারণে দেহকোষের বিভাজনকে মাইটোসিস না বলিয়া মাইটোটিক কোষ বিভাজন (Mitotic cell division) বলা সমুচিত। এই প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের বিভাজন সরাসরি না ঘটিয়া কতকগুলি দশা বা ধাপের মধ্য দিয়া সংঘটিত হয়। তাই এই প্রকার বিভাজনকে পরোক্ষ কোষ বিভাজন (Indirect cell division) বলে।

যে প্রক্রিয়ায় জনিতৃ কোষের সমসংখ্যক ও সমগুণসম্পন্ন ক্রোমোজোমযুক্ত এবং সমপরিমাণ সাইটোপ্লাজম-সহ দুইটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় তাহাকে মাইটোসিস বলে।

অথবা, যে পদ্ধতিতে কোষের ইণ্টারফেজ দশায় সংশ্লেষিত দ্বিগুণ পরিমাণ কোষীয় উপাদানের (DNA, সেণ্ট্রিওল) অপত্য কোষে সমপরিমাণ বণ্টন ঘটে তাহাকে মাইটোসিস বলে।

মাইটোসিস কোথায় হয় (Site of Mitosis): উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্ধনশীল অঙ্গের দেহকোষে মাইটোসিস ঘটে। ইহা ব্যতীত জননঅঙ্গের (শুক্রাশয়, ডিম্বাশয়) প্রাথমিক জননকোষগুলি (Primordial germ cell) মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া আদি শুক্রাণু (Spermatogonia) বা আদি ডিম্বাণু (Oogonia) উৎপন্ন করে। এমনকি মিয়োসিস কোষ বিভাজনের দ্বিতীয় দশা মাইটোসিস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

3.16 প্রাণিকোষে মাইটোসিস (Mitosis in animal cell):

মাইটোটিক কোষ বিভাজনকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়—ক্যারিওকাইনেসিস (Karyokinesis, গ্রীক শব্দ Karyon=নিউক্লিয়াস, Kinesis=চলন) বা নিউক্লিয়াসের বিভাজন ও সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis) বা সাইটোপ্লাজমের বিভাজন।

ক্যারিওকাইনেসিস: ক্যারিওকাইনেসিস বা নিউক্লিয়াসের বিভাজন একটি জটিল ক্রমান্বয়িক গতিশীল পদ্ধতি। ইহা চারিটি দশায় বিভক্ত—প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ। কিন্তু মাইটোসিস শুরু হইবার পূর্বে কোষের প্রস্তুতি পর্ব কোষ বিভাজনের জন্য চলিতে থাকে। এই দশাকে ইণ্টারফেজ বলে। নিম্নে এই সকল দশার ক্রমিক ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল।

ইণ্টারফেজ (Interphase, Inter=মধ্য, Phase=দশা): কোষ বিভাজনের পূর্বে অথবা একটি কোষের পর পর দুইবার বিভাজন বা মাইটোসিসের মধ্যবর্তী দশাকে

ইন্টারফেজ বলে। এই দশায় কোষের আয়তন বর্ধিত হয় এবং বিভাজনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা করিলে মনে হয় এই দশায় কোষটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। তাই অনেকে এই দশাকে স্থির দশা বা রেষ্টিং ফেজ (Resting Phase) বলিয়া অভিহিত করেন। প্রকৃতপক্ষে, এই দশায় নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন সংশ্লেষের কাজ দ্রুত হওয়ায় নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের আয়তন বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য বেরিল ও হাসকিন্স (Berril & Huskins, 1936) ইন্টারফেজ দশাকে শক্তি সঞ্চয়ী দশা বলিয়া অভিহিত করেন। কোষ বিভাজনের সকল দশার মধ্যে ইন্টারফেজের স্থিতিকাল সর্বাধিক।

1953 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড ও পেল্ক (Howard and Pelc) বিপাকীয় কার্যের ভিত্তিতে ইন্টারফেজকে তিনটি উপদশায় ভাগ করেন, যথা—G_1 (Gap 1) বা ছেদ দশা 1, S (Synthetic period) বা সংশ্লেষ দশা ও G_2 (Gap 2) বা ছেদ দশা 2। টেলোফেজ দশার পর হইতে সংশ্লেষ দশার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালকে G_1 বলে। এই উপদশায় কোষের বৃদ্ধি ঘটে এবং DNA সংশ্লেষ, সেন্ট্রিওলের প্রতিলিপি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সৃষ্টি হয়। G_1 উপদশায় প্রতিটি ক্রোমোজোম একটি ক্রোমাটিড তথা একটি দ্বিতন্ত্রী DNA দ্বারা গঠিত। এই অবস্থায় ক্রোমোজোমকে মোনাড (Monad) বলে। S বা সংশ্লেষ উপদশায় DNA, RNA ও প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। একতন্ত্রী ক্রোমোজোমের প্রতিলিপিভবন (Replication) ও সেন্ট্রিওলের বিভাজন এই উপদশায় ঘটে। আবার সংশ্লেষমূলক কাজ শেষ হইবার পর হইতে প্রোফেজ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালকে G_2 বলে। G_2 উপদশায় কোষ বিভাজনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈয়ারি হয়। এই উপদশায় প্রতিটি ক্রোমোজোম দুইটি ক্রোমাটিডযুক্ত হয় এবং ক্রোমোজোমের এই অবস্থাকে ডায়াড (Diad) বলে। এই উপদশায় দুইটি সেন্ট্রিওল দেখা যায়।
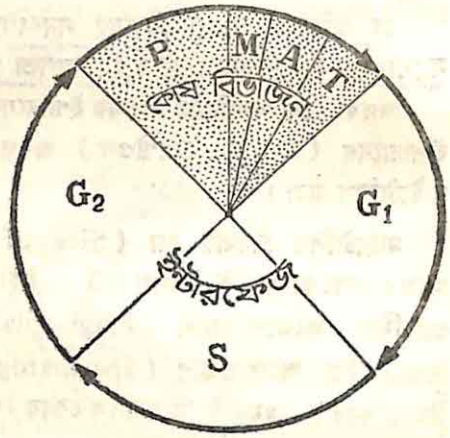
চিত্র 3.10 : মাইটোটিক চক্রের বিভিন্ন দশা

মাইটোসিসের বিভিন্ন দশা ও ইন্টারফেজের বিভিন্ন উপদশা পর পর চক্রাকারে আবর্তিত হয়। ইহাকে মাইটোটিক চক্র (Mitotic cycle) বলে।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যায়, ইন্টারফেজ দশায় নিম্নলিখিত ঘটনাবলী ঘটে :

(1) কোষের আয়তন ও ভর সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়।

(2) DNA-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হয় এবং RNA ও প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

(3) সেন্ট্রিওলের বিভাজন ঘটে।

(4) ক্রোমোজোম মোনাড বা একতন্ত্রী হইতে ডায়াড বা দ্বিতন্ত্রী হয়। ক্রোমোজোমগুলি লম্বা, পাকানো ক্রোমাটিন তন্তুরূপে নিউক্লিওপ্লাজমে অবস্থান করে কিন্তু নিউক্লিওপ্লাজমের প্রতিসরণসূচক (Refractive index) ক্রোমোজোমের সহিত একই মানের হওয়ায় ক্রোমোজোমকে দেখা যায় না।
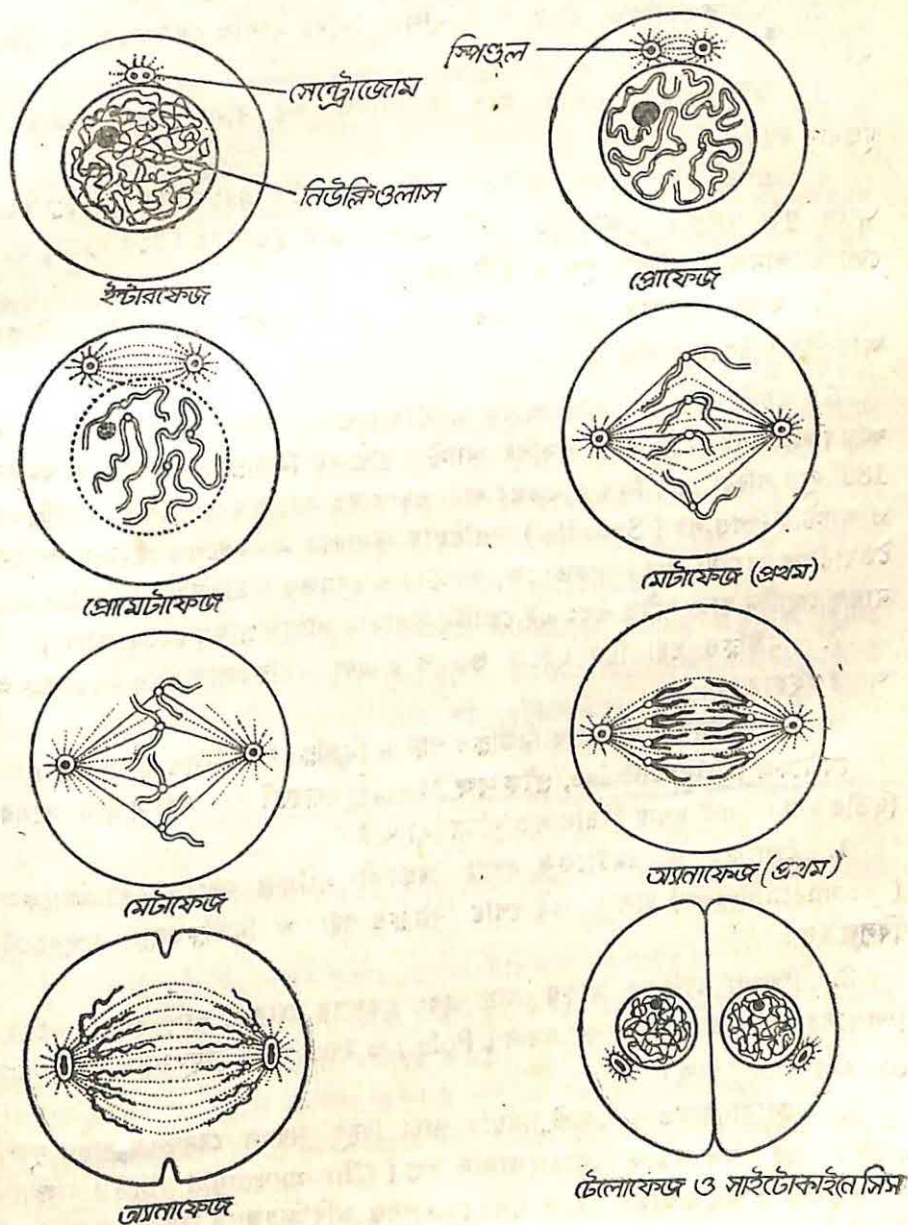
চিত্র 3.11 : প্রাণিকোষে মাইটোসিস বিভাজনের বিভিন্ন দশা

(5) নিউক্লিয় পর্দা অক্ষত।

(6) নিউক্লিওলাস স্পষ্ট ও তুলনায় আকারে বড়।

প্রোফেজ (Prophase, গ্রীক শব্দ Pro = পূর্ব) : ইহা মাইটোসিসের প্রথম দশা। এই দশায় নিম্নলিখিত ঘটনাবলী ঘটে।

1. কোষ গোলাকার ও প্রতিসরণশীল (Refractile) হইয়া উঠে।

2. নিউক্লিওজালিকা ধীরে ধীরে খুলিয়া নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোমে পরিণত হয়।

3. নিউক্লিয়াসের জলীয় অংশ অপসারিত হয় বলিয়া ক্রোমোজোমগুলি দৃশ্যমান হয়।

4. প্রতিটি ক্রোমোজোম দুইটি ক্রোমাটিড দ্বারা গঠিত এবং উহারা সেন্ট্রোমিয়ার অংশে যুক্ত থাকে। ক্রোমাটিড দুইটি স্প্রিং-এর ন্যায় কুণ্ডলীকৃত হইতে থাকে, ফলে ক্রোমোজোমগুলি আকারে স্থূল ও ছোট দেখায়।

5. যতই প্রোফেজ দশা অগ্রসর হইতে থাকে ততই ক্রোমোজোম নিউক্লিও আবরণীর সন্নিকটে যাইতে থাকে।

6. সেন্ট্রিওলদ্বয়ের একটি অর্ধেক অ্যাস্টার রশ্মি-সহ তাহার নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে কিন্তু অপর সেন্ট্রিওলটি অবশিষ্ট অ্যাস্টার রশ্মি-সহ নিউক্লিয়াসের পরিধি বরাবর 180° দূরে সরিয়া যায় কিন্তু বেমতন্তুর দ্বারা পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকে। সেন্ট্রিওল ও অ্যাস্টার স্পিণ্ডলের (Spindle) অপরিহার্য উপাদান না হইলেও ইহারা স্পিণ্ডল তৈয়ারীতে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে, অ্যাস্টার ও বেমতন্তু টিউবিউলিন (Tubulin) নামক প্রোটিন দ্বারা গঠিত এবং এই প্রোটিন উপাদান সাইটোপ্লাজম হইতে আসে।

7. নিউক্লিও পর্দা ছিন্ন হইতে শুরু করে এবং নিউক্লিওলাস ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র ও অস্পষ্ট হইয়া যায়।

8. প্রোফেজের শেষ পর্যায়ে নিউক্লিও পর্দা ও নিউক্লিওলাস বিলুপ্ত হইয়া যায়।

মেটাফেজ (Metaphase, গ্রীক শব্দ Meta = মধ্যবর্তী) : ইহা মাইটোসিসের দ্বিতীয় দশা। এই দশায় নিম্নলিখিত ঘটনাবলী ঘটে।

1. প্রোফেজ ও মেটাফেজ দশার অন্তর্বর্তী সংক্ষিপ্ত দশাকে প্রোমেটাফেজ (Prometaphase) বলে। এই দশায় নিউক্লিও পর্দা ও নিউক্লিওলাস সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়।

2. স্পিণ্ডল দেখিতে মাকুর ন্যায় এবং কোষের মধ্যবর্তী স্থান দখল করে। স্পিণ্ডলের দুইটি প্রান্তকে মেরু অঞ্চল (Pole) ও মধ্যরেখাকে বিষুব অঞ্চল (Equatorial plane) বলে।

3. ক্রোমোজোমগুলি সেন্ট্রোমিয়ার দ্বারা বিষুব অঞ্চলে বেমতন্তুর সহিত যুক্ত থাকে। এই সকল তন্তুকে ক্রোমোজোমাল তন্তু (Chromosomal fibre) বলে।

কতকগুলি তন্তু একমেরু হইতে অপর মেরু পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত, তাহাদের কন্‌টিনিউয়াস তন্তু (Continuous fibre) বলে। আবার স্পিণ্ডলের মধ্যাংশে

যে সকল তন্তু দেখা যায় তাহাদের ইণ্টারজোনাল তন্তু (Interzonal fibre) বলে। ইহা অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ দশার দুই গুচ্ছ ক্রোমোজোমের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে।

4. সাধারণত ক্ষুদ্র ক্রোমোজোমগুলি স্পিণ্ডলের ভিতরের দিকে ও বড় ক্রোমোজোমগুলি পরিধির দিকে অবস্থান করে।

5. এই দশায় ক্রোমোজোমগুলিকে নির্ভুলভাবে গণনা করা যায়।

অ্যানাফেজ (Anaphase, গ্রীক শব্দ Ana = পশ্চাৎ) : ইহা কোষ বিভাজনের তৃতীয় দশা। এই দশায় নিম্নলিখিত ঘটনাবলী ঘটে।

1. সেণ্ট্রোমিয়ার অঞ্চল বরাবর ক্রোমোজোমের লম্বালম্বি বিভাজন ঘটে, ফলে ক্রোমাটিড দুইটির পৃথকীকরণ ঘটে।

2. প্রত্যেক ক্রোমোজোম দুইটি পৃথক ক্রোমাটিডে পরিণত হওয়ায় উহাদের মধ্যে বিকর্ষণ শুরু হয় এবং উহারা পরস্পরের বিপরীত মেরুর দিকে গমন করে। এই দশায় প্রতিটি ক্রোমোজোম একটি ক্রোমাটিড দ্বারা গঠিত।

3. ক্রোমোজোমের মেরুর দিকে চলনকে অ্যানাফেজ চলন (Anaphase movement) বলে। এই চলন প্রধানত বেমতন্তুর দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য ঘটে।

অ্যানাফেজের সময় কিছু কিছু কণ্টিনিউয়াস তন্তু দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ক্রোমোজোমগুলিকে মেরুর দিকে ঠেলিয়া দেয়। অপরপক্ষে, কিছু কিছু কণ্টিনিউয়াস তন্তু দৈর্ঘ্যে সংকুচিত হয় এবং এই সংকুচিত তন্তু ক্রোমোজোমগুলিকে মেরুর দিকে টানিয়া লইয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে একটি ক্রোমোজোমকে বিষুব অঞ্চল হইতে মেরুর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে 30 অণু ATP-র প্রয়োজন হয়।

4. সেণ্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী অ্যানাফেজ চলনের প্রাক্কালে বিভিন্ন ক্রোমোজোমকে দেখিতে বিভিন্ন রকমের হয়। টিলোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম দেখিতে 'I'-এর ন্যায়, অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক 'J'-এর ন্যায়, সাবমেটাসেণ্ট্রিক 'L'-এর ন্যায় ও মেটাসেণ্ট্রিক দেখিতে 'V'-এর ন্যায় হয়।

টেলোফেজ (Telophase, গ্রীক শব্দ Telo = শেষ, Phase = দশা) : ইহা মাইটোসিসের চতুর্থ ও শেষ দশা। এই দশায় নিম্নলিখিত ঘটনাবলী ঘটে।

1. ক্রোমাটিড বা অপত্য ক্রোমোজোম বিপরীত মেরুতে যায় এবং পুনরায় প্যাঁচ খুলিয়া লম্বা হয়।

2. নিউক্লিয়াস জলশোষণ করায় ক্রোমোজোমগুলি অদৃশ্য হয়।

3. এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা হইতে নিউক্লিয় পর্দা ও ক্রোমোজোমের নিউক্লিওলার অর্গানাইজার হইতে নিউক্লিওলাস আবির্ভূত হয়।

4. অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যাস্টার ক্ষুদ্র হইতে থাকে এবং পরিশেষে বিলুপ্ত হয়।

সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis) : সাইটোপ্লাজমের দুইটি খণ্ডকে বিভক্ত হইবার পদ্ধতিকে সাইটোকাইনেসিস বলে। অ্যানাফেজ দশার শেষ পর্যায়ে স্পিণ্ডলের বিষুব অঞ্চল বরাবর ঘন পদার্থ সঞ্চিত হইয়া একটি মিড-বডি (Mid-body) তৈয়ার

করে। একই সঙ্গে কোষের পরিধি হইতে মধ্যরেখা বরাবর একটি খাঁজের (Furrow) সৃষ্টি হয়। এই খাঁজ হইতে সংকোচন শুরু হয় এবং ক্রমশ ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকে। পরিশেষে, এই খাঁজ মিড-বডিতে পৌঁছাইলে সাইটোপ্লাজম দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় এবং দুইটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে।

আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী কোষের খাঁজ অঞ্চল হইতে কোষ পর্দার সংকোচনের জন্য একপ্রকার সংকোচনশীল সূক্ষ্ম তন্তু দায়ী এবং এই তন্তু অ্যাক্টিন সদৃশ প্রোটিন দ্বারা গঠিত। সাইটোকাইনেসিসের সময় মাইটোকনড্রিয়া, গল্গি বস্তু-সহ অন্যান্য সাইটোপ্লাজমীয় উপাদানে বণ্টন অপত্যকোষে সমভাবে সম্পন্ন হয়।

উদ্ভিদকোষে মাইটোসিস (Mitosis in Plant cell) :

উদ্ভিদকোষে মাইটোসিসের পদ্ধতি প্রাণিকোষের অনুরূপ। কিন্তু উদ্ভিদকোষে সেন্ট্রিওল ও অ্যাস্টার অনুপস্থিত হওয়ায় স্পিণ্ডল গঠনে ইহারা অংশগ্রহণ করে না। তাই এই ধরনের মাইটোসিসকে অ্যানেস্ট্রাল (Anastral) মাইটোসিস বলে। উদ্ভিদকোষের মাইটোসিসে বেমতন্তু কিভাবে গঠিত হয় তাহা স্পষ্টভাবে জানা যায় নাই, তবে সাইটোপ্লাজমের প্রোটিন উপাদান বেমতন্তু সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে।

3.17 উদ্ভিদকোষের সাইটোকাইনেসিস : উদ্ভিদকোষের সাইটোকাইনেসিস অ্যানাফেজের মধ্যবর্তী দশা হইতে শুরু হয়। এই সময় স্পিণ্ডলের বিষুব অঞ্চলে ফ্রাগমোপ্লাস্ট (Phragmoplast) নামে একটি সাইটোপ্লাজমীয় কাঠামো তৈয়ার হয়। এই কাঠামো ইণ্টারজোনাল তন্তু ও গল্গি বস্তু হইতে সৃষ্ট গল্গি থলির (Golgi vesicle) সাহায্যে গঠিত হয়। ফ্রাগমোপ্লাস্ট কোষের পরিধি হইতে আংটির আকারে শুরু হয় এবং পরে বিষুব অঞ্চলের সমগ্র স্থান দখল করিয়া কোষপাতে (Cell plate) রূপান্তরিত হয়। এই কোষপাতের পদার্থসমূহ পরিবর্তিত হইয়া মধ্যচ্ছদা (Middle lamella) গঠন করে এবং ইহার উভয় পার্শ্বে প্রধানত পেকটিন জাতীয় পদার্থ জমা হইয়া প্রাথমিক কোষপ্রাচীর সৃষ্টি হয়। পরে প্রাথমিক কোষপ্রাচীরের উপর স্তরে স্তরে সেলুলোজ জমা হইলে কোষপ্রাচীর দৃঢ় ও মোটা হয়। এইভাবে উদ্ভিদকোষে সাইটোকাইনেসিসের মাধ্যমে দুইটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়।
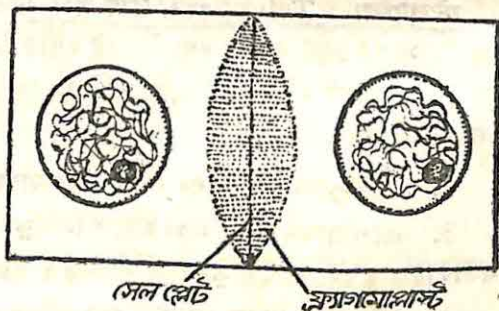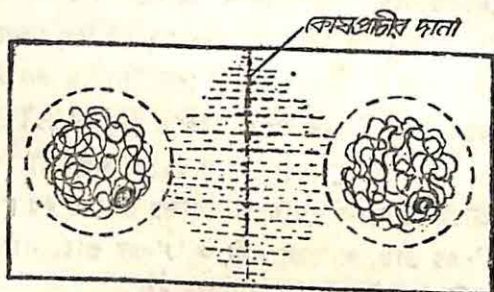
চিত্র 3.12 : উদ্ভিদকোষের সাইটোকাইনেসিস

3.18 মাইটোসিসের তাৎপর্য (Significance of Mitosis) :

(1) জীবনের শুরু একটিমাত্র কোষ হইতে। মাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষ বিভাজন দ্বারা কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বহুকোষী অপত্যজীবের সৃষ্টি হয়।

(2) মাইটোসিসের ফলে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ফলে জীবদেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটে।

(3) অনেক এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণী মাইটোসিস পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে।

(4) জীবের ক্ষতস্থান পূরণ, মেরামত ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের পুনরুৎপাদন (Regeneration) প্রভৃতি মাইটোসিস পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়।

(5) অঙ্গজ জননের ক্ষেত্রে মাইটোসিস একান্ত অপরিহার্য।

(6) মাইটোসিস পদ্ধতিতে উৎপন্ন অপত্যকোষ দুইটিতে মাতৃকোষের সমসংখ্যক ও সমগুণসম্পন্ন ক্রোমোজোমের বণ্টন ঘটে বলিয়া এই প্রকার কোষ বিভাজনকে সমবিভাজন (Equational division) বলে।

(7) পিতা-মাতার জীনগুলির সমবণ্টনের জন্য অপত্যকোষ তথা জীবের বৈশিষ্ট্য পিতা-মাতার ন্যায়।

(8) কোষে DNA ও RNA-এর শতকরা পরিমাণের সমতা বজায় রাখে।

3.19 মাইটোসিস পদ্ধতিতে কত সময় লাগে : সমগ্র মাইটোসিস পদ্ধতির জন্য যে সময় লাগে তাহা সকল জীবে সমান নহে। এমনকি একটি জীবের সকল কোষের বিভাজনের হার সর্বদা সমান নহে। সত্যি কথা বলিতে কি কোষ বিভাজনে যত সময় প্রয়োজন তাহার বেশীর ভাগ অংশ ইণ্টারফেজ দশায় অতিবাহিত হয়। নিম্নে কয়েকটি জীবকোষের ইণ্টারফেজ ও মাইটোসিসের সময়সীমা দেওয়া হইল।

জীবকোষ	ইণ্টারফেজ	মাইটোসিস
(i) মটরের মূল	1,350 মিনিট	177 মিনিট
(ii) ইঁদুরের প্লীহা	480-1,080 মিনিট	43-90 মিনিট
(iii) গঙ্গাফড়িংয়ের স্নায়ুকোষ (নিউরোব্লাস্ট)	27 মিনিট	181 মিনিট
(iv) ড্রসোফিলার নিষিক্ত ডিম্ব	2·9 মিনিট	6·2 মিনিট

আবার মাইটোসিসের প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ দশার জন্য যে বিভিন্ন পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন, তাহা নিম্নের দুইটি উদাহরণ হইতে সহজে উপলব্ধি করা যায় :

জীবকোষ	প্রোফেজ	মেটাফেজ	অ্যানাফেজ	টেলোফেজ
ইঁদুরের প্লীহা	20-35 মিনিট	6-15 মিনিট	8-14 মিনিট	9-26 মিনিট
গঙ্গাফড়িংয়ের স্নায়ুকোষ	102 ,,	13 ,,	9 ,,	57 ,,

তবে অধিকাংশ উদ্ভিদকোষের বিভাজনের জন্য প্রায় 14 ঘণ্টা সময় লাগে যাহার মধ্যে 12 ঘণ্টা ইণ্টারফেজের জন্য ও 2 ঘণ্টা বিভাজন দশার জন্য প্রয়োজন। প্রাণিকোষের ক্ষেত্রে এই সময় প্রায় 19 ঘণ্টা যাহার মধ্যে 18 ঘণ্টা ইণ্টারফেজ ও 1 ঘণ্টা বিভাজন দশার জন্য প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে ইণ্টারফেজ ব্যতীত কোষ বিভাজনের জন্য কোষভেদে সময় লাগে 30 মিনিট হইতে 3 ঘণ্টা।

কোষ বিভাজনে বাধা সৃষ্টি : কতকগুলি ভৌত ও রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগ করিয়া কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে বাধা সৃষ্টি করা যায় অথবা বিভাজনচক্রের কোন দশাকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দেওয়া সম্ভব। রঞ্জনরশ্মি (X-ray), অতিবেগুনী রশ্মি (Ultra-violet ray), টেট্রাসাইক্লিন (Tetracycline), কলচিসিন (Colchicine) প্রভৃতি ইহাদের উদাহরণ। যেমন কলচিসিন প্রয়োগে বেমতন্তু গঠিত হয় না, ফলে কোষ মেটাফেজ দশা অতিক্রম করিতে পারে না।

3.20 প্রাণিকোষ ও উদ্ভিদকোষের মাইটোসিসের পার্থক্য (Difference between Animal and Plant mitosis) :

প্রাণিকোষের মাইটোসিস	উদ্ভিদকোষের মাইটোসিস
(1) সেণ্ট্রিওল ও সাইটোপ্লাজমীয় প্রোটিন হইতে স্পিণ্ডল গঠিত হয়।	(1) শুধু সাইটোপ্লাজমীয় প্রোটিন হইতে স্পিণ্ডল গঠিত হয়।
(2) কোষে বেশী সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকিলে মেটাফেজ প্লেটে বড় ক্রোমোজোম পরিধির দিকে ও ছোট ক্রোমোজোম কেন্দ্রের দিকে সজ্জিত থাকে।	(2) মেটাফেজ প্লেটে ক্রোমোজোম অবিন্যস্ত থাকে।
(3) প্রাণিকোষের সাইটোকাইনেসিস টেলোফেজ শেষ দশা হইবার পর শুরু হয়।	(3) উদ্ভিদকোষের সাইটোকাইনেসিস অ্যানাফেজের মধ্যবর্তী দশা হইতে শুরু হয়।
(4) সাইটোকাইনেসিস ফারোয়িং পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়।	(4) সাইটোকাইনেসিস কোষপাত বা সেলপ্লেট গঠনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

3.21 মিয়োসিস (Meiosis, গ্রীক শব্দ Meioum = হ্রাস পাওয়া)

প্রতিটি বহুকোষী জীবের দেহ অসংখ্য দেহকোষ ও জননকোষ দ্বারা গঠিত এবং একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির জীবদেহে সকল দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট। যৌন জনন সম্পন্নকারী জীবদেহে পুংজননকোষ ও স্ত্রীজননকোষের মিলনে অপত্য জীবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু জননকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা যদি দেহকোষের সমান হয় তাহা হইলে অপত্য জীবের দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা পূর্বের দ্বিগুণ হইবে। কিন্তু বংশ-পরম্পরায় এইরূপ চলিতে থাকিলে জীবকোষের মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যা

ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইবে এবং পিতা-মাতার সঙ্গে অপত্যের সাদৃশ্য থাকিবে না। উপরন্তু, তাহাদের আকৃতি কিরূপ হইবে তাহা অনুমান করাও সম্ভব নয়। ফলে জীবজগতে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকৃতির আনুকুল্যে জীবের জনন-মাতৃকোষে এক বিশেষ ধরনের কোষ বিভাজন ঘটে যাহার ফলস্বরূপ জননকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহকোষের অর্ধেক হয়। এই ধরনের কোষ বিভাজনকে **মিয়োসিস** বলে।

যেহেতু কোন প্রজাতির বৈশিষ্ট্য তাহার কোষস্থ ক্রোমোজোম সংখ্যার উপর নির্ভর করে সেইহেতু বংশ-পরম্পরায় জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখা প্রয়োজন। কোন প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা বংশ-পরম্পরায় অপরিতিত বা অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া আম গাছ হইতে আম গাছ, মটর গাছ হইতে মটর গাছ, গরু হইতে গরু, মানুষ হইতে মানুষ প্রভৃতি হয়।

মিয়োসিস কোষ বিভাজন উদ্ভিদের পরাগধানী ও ডিম্বাশয়ে এবং শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের জনন মাতৃকোষে (Germ mother cell) ঘটে।

সংজ্ঞা : (1) যে পদ্ধতিতে ডিপ্লয়েড জনন মাতৃকোষ বিভাজিত হইয়া চারিটি হ্যাপ্লয়েড জননকোষ বা গ্যামেটের সৃষ্টি করে তাহাকে মিয়োসিস বলে।

(2) বিজ্ঞানী ডার্লিংটনের (Darlington) মতে—'মিয়োসিস হইল এক বিশেষ ধরনের কোষ বিভাজন যাহাতে নিউক্লিয়াসের বিভাজন দুইবার ঘটে কিন্তু ক্রোমোজোমের বিভাজন মাত্র একবার ঘটে, ফলস্বরূপ অপত্যকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হইয়া যায়।' অপত্যকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হওয়ায় এই ধরনের বিভাজনকে হ্রাসকরণ বিভাজন (Reduction Division) বলে।

(3) দুইটি হ্যাপ্লয়েড জননকোষের মিলন বা নিষেকের ফলে ডিপ্লয়েড জীবের সৃষ্টি হয়। পুনরায় এই জীবের যৌন জননের সময় জনন মাতৃকোষের মিয়োসিস বিভাজন হয় এবং হ্যাপ্লয়েড জননকোষ সৃষ্টি করে। ফলে এই পদ্ধতিতে কোন জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। তাই মিয়োসিসকে 'Antithesis of fertilization' বলে।

1887 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বোভেরি (Boveri) অ্যাসকারিস নামক গোলকৃমির জনন অঙ্গে এই প্রকার কোষ বিভাজন লক্ষ্য করেন। 1905 খ্রীষ্টাব্দে জে. বি. ফার্মার (J. B. Farmer) এই ধরনের কোষ বিভাজনের নাম দেন মিয়োসিস।

3.22 মিয়োসিসের প্রকারভেদ (Types of Meiosis) : বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন সময়ে মিয়োসিস সংঘটিত হয় এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়া মিয়োসিসকে নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(1) **প্রান্তীয় (Terminal) বা গ্যামেটিক (Gametic) মিয়োসিস :** এই প্রকার বিভাজনে জননকোষ বা গ্যামেট উৎপন্ন হইবার ঠিক পূর্বে মিয়োসিস বিভাজন ঘটে। অধিকাংশ প্রাণী ও কতিপয় নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে এই ধরনের বিভাজন দেখা যায়।

(2) **মধ্যবর্তী (Intermediate) বা স্পোরিক (Sporic) মিয়োসিস :** এই প্রকার বিভাজনে নিষেক ও জননকোষ গঠনের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে মিয়োসিস বিভাজন ঘটে। সকল সপুষ্পক উদ্ভিদে এই ধরনের বিভাজন ঘটে।

(3) প্রারম্ভিক (Initial) বা জাইগোটিক (Zygotic) মিয়োসিস : এই প্রকার বিভাজনে নিষেকের ঠিক পরেই মিয়োসিস কোষ বিভাজন ঘটে এবং এই ক্ষেত্রে জাইগোটটি একমাত্র ডিপ্লয়েড জহ্। কতিপয় শৈবাল, ডায়াটোম ও ছত্রাকে এই ধরনের বিভাজন দেখা যায়।

3.23 মিয়োসিস পদ্ধতির বিবরণ :

ইন্টারফেজ : মিয়োসিস বিভাজনের পূর্ববর্তী কোষীয় অবস্থাকে ইন্টারফেজ (Interphase) দশা বলে। অর্থাৎ এই দশার অব্যবহিত পরে মিয়োসিস শুরু হয়। মাইটোসিসের ইন্টারফেজের সহিত মিয়োসিসের ইন্টারফেজের খুব বেশী পার্থক্য নাই। এই ক্ষেত্রে DNA-এর দ্বিত্বকরণও 'S' উপদশায় ঘটে কিন্তু 'G_2' উপদশায় এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে যাহার ফলে কোষ মাইটোসিস বিভাজনের পরিবর্তে মিয়োসিস কোষ বিভাজনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

শালুকের পরাগধানীকোষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই পরিবর্তন 'G_2' উপদশার প্রারম্ভে ঘটে কিন্তু ইহার প্রকৃতি আজও জানা যায় নাই। যাই হোক, এই দশায় DNA-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোমোজোমের প্রতিলিপি তৈয়ারি হয়। দ্বিত্বকরণ পদ্ধতিতে একক ক্রোমাটিডযুক্ত ক্রোমোজোম বা মোনাড হইতে ডায়াড হইলে প্রোফেজ দশা আরম্ভ হয়।

3.24 মিয়োটিক বিভাজন : মিয়োটিক বিভাজনকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়—প্রথম মিয়োটিক বিভাজন (Meiotic Division I) ও দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন (Meiotic Division II)। প্রথম ও দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজনের প্রত্যেকটি আবার প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ দশায় বিভক্ত।

মিয়োসিস বিভাজনের বিভিন্ন ঘটনা ও পর্যায়ক্রম নিম্নরূপ—
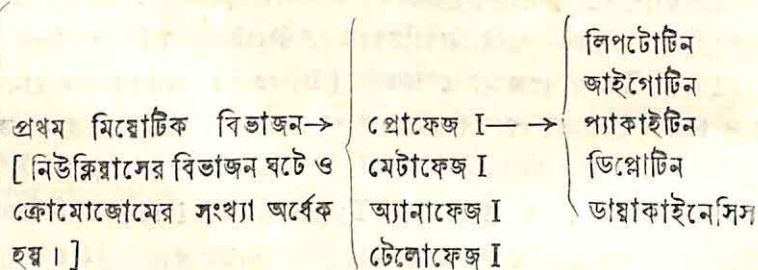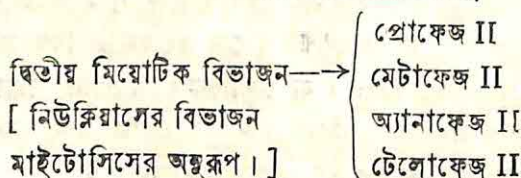
প্রথম মিয়োটিক বিভাজন :

প্রোফেজ I (Prophase I) : প্রথম বিভাজনের প্রোফেজ দশা অত্যন্ত জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী। এই দশায় সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি জোড় বাঁধিয়া অবস্থান করে এবং পরে উহাদের মধ্যে বংশগতির বাহক বা জীনের বিনিময় ঘটে। ইহা ছয়টি উপদশায় বিভক্ত। যেমন—

(i) প্রিলিপ্‌টোনিমা বা প্রিলিপ্‌টোটিন (Preleptonema or Preleptotene)
(ii) লিপটোনিমা বা লিপটোটিন (Leptonema or Leptotene)
(iii) জাইগোনিমা বা জাইগোটিন (Zygonema or Zygotene)
(iv) প্যাকাইনিমা বা প্যাকাইটিন (Pachynema or Pachytene)
(v) ডিপ্লোনিমা বা ডিপ্লোটিন (Diplonema or Diplotene)
(vi) ডায়াকাইনেসিস (Diakinesis)

(i) প্রিলিপ্‌টোনিমা (গ্রীক শব্দ Pre = পূর্ব, leptos = সরু, nema = সূত্র) :— ইহা প্রোফেজের প্রারম্ভিক দশা। এই দশায় ক্রোমোজোমগুলি এত সূক্ষ্ম ও পাতলা যে উহাদের দেখা যায় না।

(ii) লিপ্‌টোনিমা (গ্রীক শব্দ Leptos = সরু, nema = সূত্র) :—

(1) নিউক্লিয়াসের জলীয় অংশ কমিয়া যাওয়ায় নিউক্লিওজালিকা হইতে উৎপন্ন সূত্রবৎ ক্রোমোজোম দৃশ্যমান হয়।

(2) ক্রোমোজোমগুলি সরু, লম্বা এবং জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। এই জোড়ার একটি পুংজননকোষ ও অপরটি স্ত্রীজননকোষ হইতে আসে। এইরূপ ক্রোমোজোম জোড়াকে **সমসংস্থ ক্রোমোজোম (Homologous Chromosome)** বলে।

(3) প্রতিটি ক্রোমোজোম দুইটি ক্রোমাটিড দ্বারা গঠিত কিন্তু তাহারা এত সরু ও সূক্ষ্ম যে উহাদের সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একটি বলিয়া মনে হয়।

(4) ক্রোমোজোমের গায়ে পুঁতির দানার ন্যায় অসংখ্য ক্রোমোমিয়ার রৈখিকভাবে সজ্জিত থাকে।

(5) ক্রোমোজোমের প্রান্তভাগ সেন্ট্রিওলের দিকে নিউক্লিওপর্দার সহিত যুক্ত থাকে এবং অবশিষ্ট অংশ গোলাকারে ভিতরের দিকে অবস্থান করে। এইরূপে সজ্জিত ক্রোমোজোমকে পোলারাইজড (polarised) ক্রোমোজোম বলে। বিজ্ঞানী ডার্লিংটনের ভাষায় ইহাকে ফুলের তোড়া বা বোকে স্টেজ (Boquet stage) বলে।

(6) লিপ্‌টোনিমা যতই অগ্রসর হইতে থাকে ততই ক্রোমোজোমগুলি কুণ্ডলীকৃত হইতে থাকে, ফলে ক্রোমোজোমকে দেখিতে স্থূল সূত্রের ন্যায় হয়।

(7) নিউক্লিওলাস একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের গৌণ খাঁজ অংশে যুক্ত থাকে।

(8) সেন্ট্রিওল দুইটি পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যাইতে থাকে।

(iii) **জাইগোনিমা (** গ্রীক শব্দ Zygon = সংযুক্তিকরণ, nema = সূত্র **) :**

(1) সমসংস্থ ক্রোমোজোমদ্বয় আকর্ষণের ফলে পাশাপাশি আসিয়া জোড় বাঁধে। তাহাকে সাইন্যাপসিস (synapsis) ও জোড় বাঁধা ক্রোমোজোমদ্বয়কে বাইভ্যালেন্ট (Bivalent) বলে। কিন্তু জোড় বাঁধা কেবল সমসংস্থ অংশ বা ক্রোমোমিয়ার অংশে সম্পন্ন হয়।
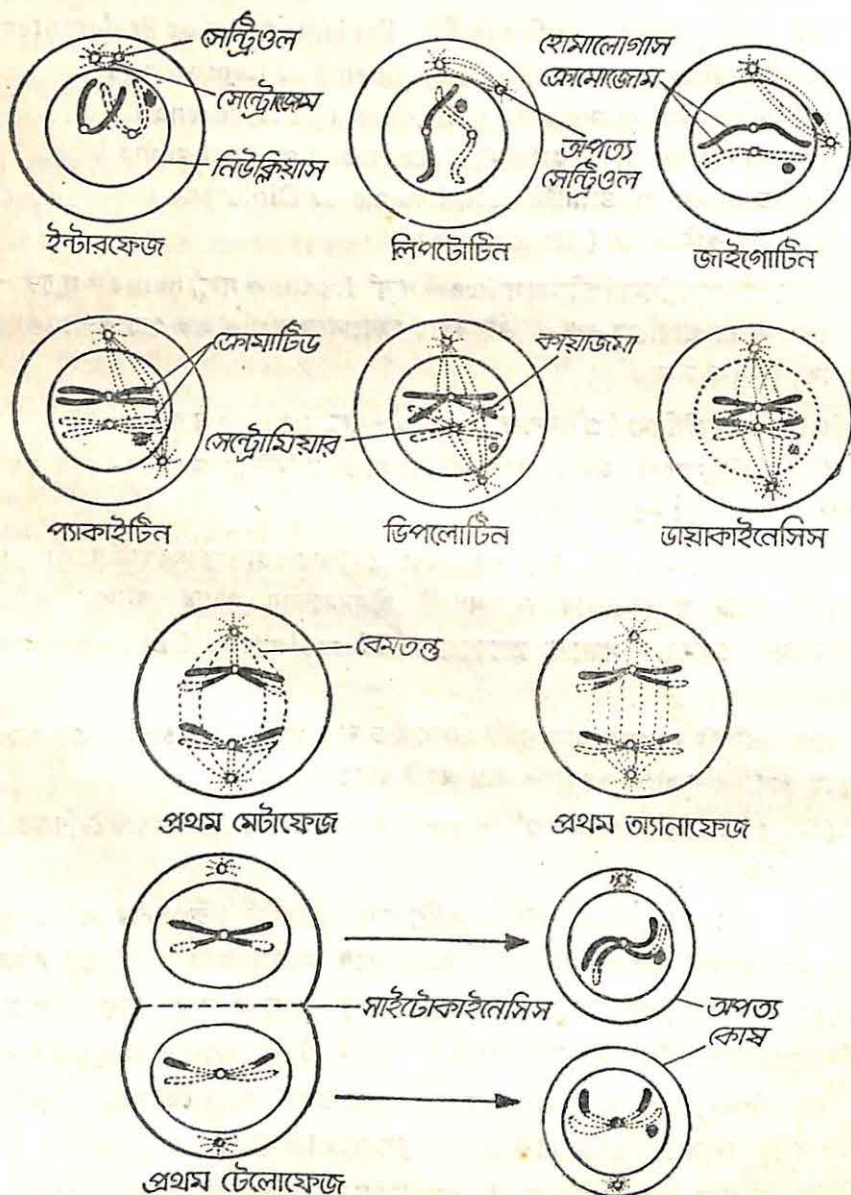
চিত্র 3.13 : প্রথম মিয়োটিক বিভাজনের বিভিন্ন দশা
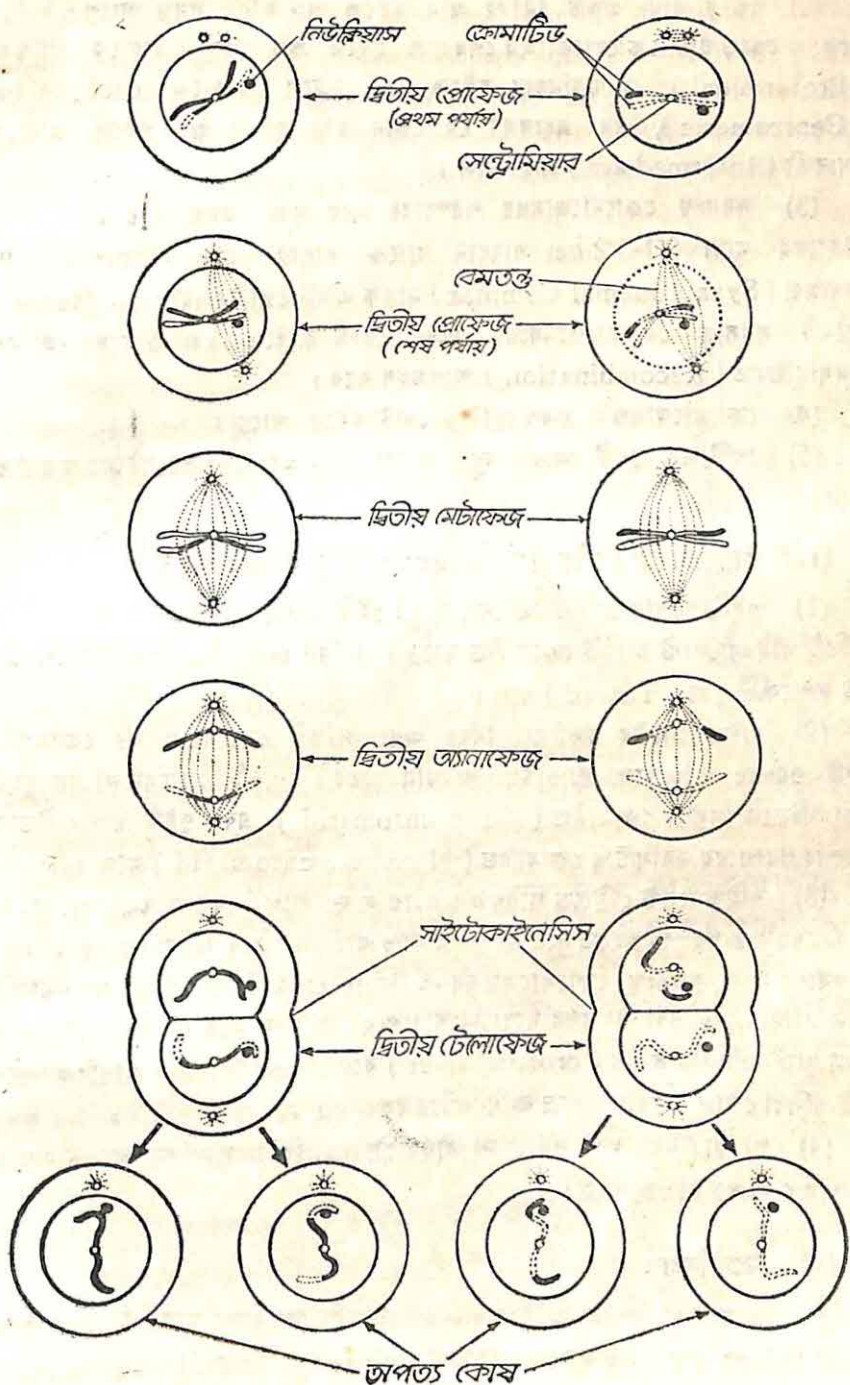
চিত্র 3.14 : দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজনের বিভিন্ন দশা।

(2) জোড় বাঁধা একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে শুরু করিয়া সমস্ত অংশে ছড়াইয়া পড়ে। জোড় বাঁধা ক্রোমোজোমের শেষপ্রান্ত হইতে শুরু হইলে তাহাকে প্রান্তিক (Proterminal), সেন্ট্রোমিয়ার হইতে শুরু হইলে তাহাকে সেন্ট্রোমেরিক (Centromeric), এবং মধ্যবর্তী যে কোন স্থান হইলে শুরু হইলে তাহাকে মধ্যবর্তী (Intermediate) সজ্ঞা বলে।

(3) সমসংস্থ ক্রোমোজোমদ্বয় পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায় না। পরন্তু উহাদের মধ্যে 0·1-0·2 μm ব্যবধান থাকে যাহার মধ্যে সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স (Synaptonemal Complex) নামক একটি প্রোটিন ধর্মীয় গঠন বিদ্যমান। গঠনটি সমসংস্থ ক্রোমোজোমদ্বয়ের মধ্যে জোড় বাঁধিতে এবং উহাদের জীনের পুনর্সংযুক্তিতে (Recombination) অংশগ্রহণ করে।

(4) ক্রোমোজোমগুলি ক্রমশ ছোট ও মোটা হইতে থাকে।

(5) সেন্ট্রিওল দুইটি আরও দূরে সরিয়া যায় এবং বেমতন্তু গঠনের সূত্রপাত করে।

(iv) প্যাকাইনিমা (গ্রীক শব্দ Pachus = পুরু, nema = সূত্র):

(1) এই উপদশায় প্রতিটি ক্রোমোজোমের দুইটি ক্রোমাটিড দৃশ্যমান হয় অর্থাৎ প্রতিটি বাইভ্যালেন্টে চারিটি ক্রোমাটিড থাকে। চারিটি ক্রোমাটিডযুক্ত বাইভ্যালেন্টের এই দশাকে টেট্রাড (Tetrad) বলে।

(2) বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোজোমদ্বয় এবং প্রতিটি ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড দুইটি পরস্পর পরস্পরকে প্যাঁচাইয়া অবস্থান করে। একটি ক্রোমোজোমের দুইটি ক্রোমাটিডকে সিস্টার ক্রোমাটিড (sister chromatid) এবং দুইটি ক্রোমাটিডকে পরস্পর পরস্পরের ননসিস্টার ক্রোমাটিড (Nonsister chromatid) বলে।

(3) বাইভ্যালেন্ট টেট্রাডে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমসংস্থ ক্রোমোজোমদ্বয় বিকর্ষণের জন্য পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যাইতে থাকে। দূরে সরিয়া যাইবার সময় বিকর্ষণের ফলে সমসংস্থ ক্রোমোজোমের ননসিস্টার ক্রোমাটিডগুলির এক বা একাধিক স্থান ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহাদের মধ্যে অংশবিশেষের বিনিময় ঘটে। এই বিনিময়কে পুনর্সংযুক্তি বা ক্রসিংওভার (crossing over) বলে। এই বিনিময় আণবিক স্তরে ঘটে বলিয়া কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ক্রসিংওভার দেখা যায় না।

(4) প্যাকাইনিমা দশা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী, এমনকি কয়েক দিন, কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক বৎসর হইতে পারে।

(v) ডিপ্লোনিমা:

(1) ডিপ্লোনিমা দশায় ক্রসিংওভারের স্থানগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দেখিতে ইংরেজী 'X'-এর ন্যায়। এই স্থানকে কায়াজমা (chiasma, Singular-chiasmata) বলে। কায়াজমার জন্য ক্রসিংওভার ঘটে না। পরন্তু, ক্রসিং-ওভারের ফল বা বহিঃপ্রকাশই কায়াজমা।

ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কায়াজমার সংখ্যা কম বা বেশি হইতে পারে। প্রতিটি বাইভ্যালেন্টে 1-12টি কায়াজমা থাকিতে পারে। বিজ্ঞানী স্টার্ন ও হোট্টা (Stern & Hotta, 1969) প্রমাণ করেন যে এণ্ডোনিউক্লিয়েজ (Endonuclease) নামক উৎসেচক ননসিস্টার ক্রোমাটিডদ্বয়কে একই স্থানে ভাঙিয়া দেয় এবং লাইগেজ (Ligase) নামক উৎসেচক উক্ত ভগ্ন ক্রোমাটিড অংশকে পুনরায় যুক্ত করে।
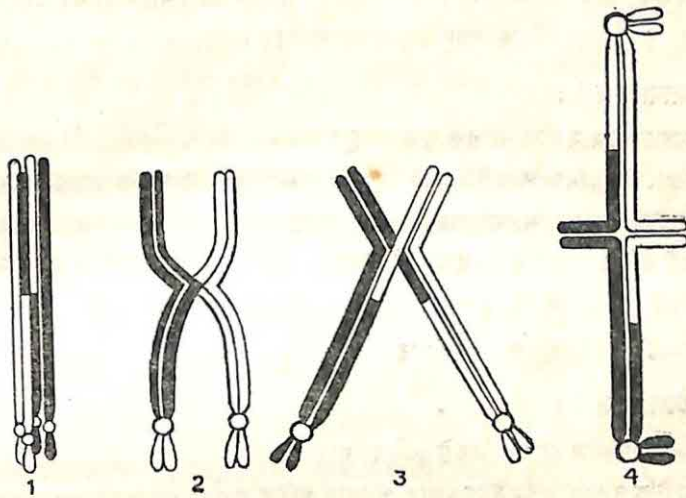
চিত্র 3.15 : 1=ক্রসিং-ওভার, 2=কায়াজমা, 3=কায়াজমার প্রান্তীয় গমন, 4=ক্রোমাটিডের ঘূর্ণন

(2) ক্রোমোজোমগুলি আরও ক্ষুদ্র ও স্থূল হয়।

(3) সমসংস্থ ক্রোমোজোমদ্বয়ের মধ্যে বিকর্ষণ বলের জন্য কায়াজমা ধীরে ধীরে ক্রোমোজোমের প্রান্তের দিকে চলিয়া যায়। কায়াজমার এই চলনকে প্রান্তীয় গমন বা টার্মিনালাইজেশান (Terminalisation) বলে।

(4) ক্রোমোজোম যদি ক্ষুদ্র হয় এবং একটিমাত্র কায়াজমা থাকে তাহা হইলে উহারা 180° ঘুরিয়া যায় ও একটি রেখায় অবস্থান করে। কিন্তু ক্রোমোজোম যদি বড় হয় এবং একাধিক কায়াজমা থাকে তখন উহারা 90° ঘুরিয়া যায়।

(5) সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স অদৃশ্য হয়।

(vi) ডায়াকাইনেসিস (গ্রীক শব্দ Dia=অতিক্রম করা) :

(1) কায়াজমার প্রান্তীয় গমন ডায়াকাইনেসিসের শেষ পর্যন্ত চলিতে থাকে।

(2) এই দশায় বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোজোমদ্বয় প্রান্তীয় বিন্দুতে যুক্ত থাকে এবং এই সংযুতি মেটাফেজ দশা পর্যন্ত থাকে।

(3) ক্রোমোজোম আরও ক্ষুদ্র ও স্থূল হয়।

(4) নিউক্লিওলাস বিলুপ্ত হয়।

b. মেটাফেজ I :

1. নিউক্লিও পর্দা বিলুপ্ত হয়।

2. সেন্ট্রোমিয়ারদ্বয় পরস্পর হইতে 180° দূরে সরিয়া যায় এবং বেমতন্তু-সহ স্পিণ্ডল বা বেম গঠন করে।

3. স্পিণ্ডলের মধ্যরেখা (Equator) বরাবর ক্রোমোজোমগুলি সেন্ট্রোমিয়ার দ্বারা বেমতন্তুর সঙ্গে আটকাইয়া যায়। সমসংস্থ ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার মধ্যরেখা বা বিষুবরেখা হইতে সমদূরত্বে অবস্থান করে।

c. অ্যানাফেজ I :

1. ক্রোমোজোমগুলি আরও ক্ষুদ্র ও স্থূল হয়।

2. ক্রোমোজোমগুলি দুইটি মেরুর দিকে গমন করিতে থাকে। ক্রোমোজোমের এই চলন মাইটোসিসের অ্যানাফেজ চলনের অনুরূপ।

3. এই দশায় ক্রোমোজোমের বিভাজন ঘটে না কিন্তু সমসংস্থ ক্রোমোজোমদ্বয় পরস্পরের বিপরীত মেরুর দিকে গমন করে। ফলস্বরূপ, অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা পূর্বতন কোষের অর্ধেক হইয়া যায়।

d. টেলোফেজ I :

1. ক্রোমোজোম মেরুর নিকট চলিয়া যায়।

2. নিউক্লিও পর্দা ও নিউক্লিওলাস পুনরায় গঠিত হয়।

3. ক্রোমোজোমের কুণ্ডলী খুলিয়া লম্বা হইয়া যায়।

4. নিউক্লিয়াস জল শোষণ করিলে ক্রোমোজোম অদৃশ্য হইয়া যায়।

প্রথম সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis I): অর্ধসংখ্যক ক্রোমোজোম প্রতিটি মেরুতে পৌছাইবার পর মাইটোসিসের ন্যায় সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ঘটে এবং দুইটি হ্যাপ্লয়েড অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়।

ইণ্টারফেজ : প্রথম মিয়োটিক বিভাজন ও দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজনের অন্তবর্তী দশাকে ইণ্টারফেজ বলে। প্রথম বিভাজনের পর কোষ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ইণ্টারফেজ দশায় প্রবেশ করে। এই দশায় ক্রোমোজোমের দ্বিত্বকরণ ঘটে না, কারণ প্রতিটি ক্রোমোজোম দুইটি ক্রোমাটিড দ্বারা গঠিত।

দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন : এই বিভাজন মাইটোসিস কোষ বিভাজনের অনুরূপ।

প্রোফেজ II (Prophase II) : এই দশা অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এই দশা উপস্থিত থাকিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

1. জলীয় অংশ অপসারিত হইবার ফলে ক্রোমোজোম দৃশ্যমান হয়।

2. প্রতিটি ক্রোমোজোম দুইটি ক্রোমাটিড লইয়া গঠিত।

3. স্পিণ্ডল ও বেমতন্তু গঠিত হয়।

মেটাফেজ II (Metaphase II):

1. নিউক্লিও পর্দা ও নিউক্লিওলাস অবলুপ্ত হয়।

2. ক্রোমোজোমগুলি স্পিণ্ডলের মধ্যরেখা বরাবর সজ্জিত হয় এবং বেমতন্তুর দ্বারা সেন্ট্রোমিয়ার অংশে যুক্ত থাকে।

অ্যানাফেজ II (Anaphase II):

1. এই দশায় সেন্ট্রোমিয়ারের বিভাজন ঘটে, ফলে ক্রোমোজোম লম্বালম্বি বিভক্ত হইয়া যায় এবং ক্রোমাটিড দুইটির পৃথকীকরণ ঘটে।

2. প্রত্যেকটি ক্রোমাটিড মেরুর দিকে চালিত হয়।

টেলোফেজ II (Telophase II):

1. ক্রোমাটিডগুলি মেরুতে পৌছায়। তখন উহাদের অপত্য ক্রোমোজোম বলে।

2. নিউক্লিও পর্দা ও নিউক্লিওলাস পুনরায় গঠিত হয়।

3. নিউক্লিয়াস জলশোষণ করিলে পুনরায় অদৃশ্য হয়।

দ্বিতীয় সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis II): কোষে সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ কম হইলেও পুনরায় মাইটোসিসের ন্যায় সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ঘটে এবং চারিটি হ্যাপ্লয়েড কোষের সৃষ্টি হয়।

মিয়োসিসের তাৎপর্য (Significance of Meiosis):

1. জীবকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা বংশ-পরম্পরায় নির্দিষ্ট ও ধ্রুবক রাখে।

2. ক্রসিং-ওভারের ফলে প্রজাতির মধ্যে নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য বা প্রকরণের সৃষ্টি হয় যাহা প্রজাতির বিবর্তনের জন্য অপরিহার্য।

3. শুক্রাণু বা পুং জননকোষ ও ডিম্বাণু বা স্ত্রী জননকোষ উভয়ই হ্যাপ্লয়েড (n) এবং উহাদের মিলনে ডিপ্লয়েড জাইগোট তৈয়ারি হয় যাহা হইতে অপত্য জীবের সৃষ্টি হয়। মিয়োসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড জন্মুর পর্যায়ক্রমিক আবর্তন বা জনুঃক্রম (Alternation of generation) বজায় থাকে।

মাইটোসিস ও মিয়োসিসের পার্থক্য (Differences between Mitosis and Meiosis): লেখ,

মাইটোসিস	মিয়োসিস
1. মাইটোসিস সকল জীবের দেহ-কোষে সম্পন্ন হয়।	1. মিয়োসিস শুধুমাত্র যৌন জনন সম্পন্নকারী জীবের জনন মাতৃকোষে সম্পন্ন হয়।
2. এই প্রক্রিয়ায় দেহের বৃদ্ধি ঘটে।	2. এই প্রক্রিয়ায় জননকোষ তৈয়ারী হয়।

মাইটোসিস	মিয়োসিস
3. নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয়।	3. নিউক্লিয়াস দুইবার এবং ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয়।
4. মাতৃকোষের সমসংখ্যক ও সমগুণসম্পন্ন ক্রোমোজোমযুক্ত দুইটি ডিপ্লয়েড কোষের সৃষ্টি হয়।	4. জনন মাতৃকোষের অর্ধসংখ্যক ক্রোমোজোমযুক্ত চারিটি হ্যাপ্লয়েড কোষের সৃষ্টি হয়।
5. সমগ্র বিভাজন একটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়।	5. সমগ্র বিভাজন দুইটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়।
6. মাইটোসিসের ফলে জীবদেহে সাধারণত প্রকরণ দেখা যায় না।	6. মিয়োসিসের ফলে জীবদেহে প্রকরণ দেখা যায় এবং ফলস্বরূপ প্রজাতির বিবর্তন সম্ভব।
ইণ্টারফেজ	
7. ইণ্টারফেজ দীর্ঘস্থায়ী।	7. ইণ্টারফেজ স্বল্পস্থায়ী।
8. ইণ্টারফেজ দশায় ক্রোমোজোমের দ্বিত্বকরণ ঘটে।	8. ইণ্টারফেজ দশায় ক্রোমোজোমের দ্বিত্বকরণ ঘটিলেও প্যাকাইনিমা উপদশায় দৃশ্যমান হয়।
প্রোফেজ	
9. প্রোফেজ সরল ও উপদশায় বিভক্ত নয়।	9. প্রথম প্রোফেজ জটিল ও পাঁচটি উপদশায় বিভক্ত।
10. সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড় বাঁধে না।	10. সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড় বাঁধে।
11. ক্রসিং-ওভার অথবা কায়াজমা গঠিত হয় না।	11. ক্রসিং-ওভার ও কায়াজমা গঠিত হয়।
মেটাফেজ	
12. ক্রোমোজোম ডায়াড গঠন করে।	12. বাইভ্যালেণ্ট টেট্রাড গঠন করে।
13. সেণ্ট্রোমিয়ার বিষুব রেখায় থাকে এবং বাহুগুলি মেরুর দিকে বিন্যস্ত।	13. প্রথম মেটাফেজের সেণ্ট্রোমিয়ার মেরুর দিকে থাকিলেও বিষুবরেখা হইতে সমান দূরত্বে অবস্থান করে এবং বাহুগুলি বিষুবরেখার দিকে মুখ করিয়া অবস্থান করে।

অ্যানাফেজ

মাইটোসিস	মিয়োসিস
14. সেণ্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় এবং ক্রোমোজোমের লম্বালম্বি বিভাজন ঘটে ও ক্রোমাটিডদ্বয় পৃথক হইয়া যায়।	14. প্রথম অ্যানাফেজে সমসংস্থ ক্রোমোজোমের পৃথকীকরণ ঘটে কিন্তু ক্রোমোজোমের বিভাজন ঘটে না।
15. ক্রোমোজোম মোনাড।	15. ক্রোমোজোম ডায়াড।
16. ক্রোমোজোম সরু, লম্বা ও উহার জীনের সজ্জাক্রম একই।	16. ক্রোমোজোম স্থূল ও খর্ব এবং জীনের সজ্জাক্রমের পরিবর্তন ঘটে।

টেলোফেজ

মাইটোসিস	মিয়োসিস
17. টেলোফেজ সর্বদা দেখা যায়।	17. অনেক সময় প্রথম টেলোফেজ দেখা যায় না।
18. অপত্যকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা ডিপ্লয়েড।	18. অপত্যকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্যাপ্লয়েড।

বিষয়-সংক্ষেপ

1. নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ নিউক্লিওপ্রোটিন দ্বারা গঠিত যে সকল জটিল তন্তু বংশগতির ধারক ও বাহক তাহাদের ক্রোমোজোম বলে। প্রতিটি প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট। দেহকোষে প্রতিটি ক্রোমোজোম দুই প্রস্ত থাকে বলিয়া তাহাকে ডিপ্লয়েড এবং জননকোষে এক প্রস্ত বা একক সংখ্যক থাকে বলিয়া তাহাকে হ্যাপ্লয়েড বলে।

2. গঠন—ক্রোমোজোম পাঁচটি অংশ লইয়া গঠিত—পেলিকল, ম্যাট্রিক্স, মুখ্য খাঁজ ও সেণ্ট্রোমিয়ার, ক্রোমাটিড, গৌণ খাঁজ এবং টেলোমিয়ার।

(i) পেলিকল—ক্রোমোজোমের বাহিরের আবরণকে পেলিকল বলে। তবে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহার অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই।

(ii) ম্যাট্রিক্স—পেলিকলের মধ্যে ঘন জেলির ন্যায় পদার্থকে ম্যাট্রিক্স বা ধাত্র বলে। ধাত্রের গঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় নাই, এমনকি ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহার অস্তিত্বও প্রমাণিত হয় নাই।

(iii) মুখ্য খাঁজ ও সেণ্ট্রোমিয়ার—প্রতিটি ক্রোমোজোমে একটি নির্দিষ্ট অরঞ্জিত স্থান থাকে তাহাকে মুখ্য খাঁজ বলে। মুখ্য খাঁজ অংশে সেণ্ট্রোমিয়ার নামক ক্রোমোজোমীয় অংশ থাকে। সেণ্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোম চারি প্রকার—টিলোসেণ্ট্রিক, অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক, সাব-মেটাসেণ্ট্রিক ও মেটাসেণ্ট্রিক।

(iv) ক্রোমাটিড—ক্রোমোজোম দুইটি লম্বালম্বি সূত্রাকার অংশ লইয়া গঠিত। ইহাদের ক্রোমাটিড বা ক্রোমোনিমা বলে। ক্রোমাটিডদ্বয় সেণ্ট্রোমিয়ার অংশে যুক্ত থাকে। ক্রোমাটিডদ্বয় প্যারানেমিক অথবা প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলীযুক্ত অবস্থায়

ক্রোমোজোম থাকে। ক্রোমাটিডের উপর ক্ষুদ্র পুঁতির দানার ন্যায় গোলাকার অংশকে ক্রোমোমিয়ার বলে। ক্রোমোমিয়ার জীনের অবস্থান সূচিত করে।

(v) গৌণ খাঁজ—মুখ্য খাঁজ ব্যতীত ক্রোমোজোমে আরও সংকুচিত স্থান থাকে, তাহাকে গৌণ খাঁজ বলে। গৌণ খাঁজ অংশে নিউক্লিওলাস গঠিত হইলে তাহাকে নিউক্লিওলার অর্গানাইজার অঞ্চল বলে। গৌণ খাঁজের প্রান্তীয় ক্ষুদ্র অংশকে স্যাটেলাইট বলে। স্যাটেলাইটযুক্ত ক্রোমোজোমকে স্যাট-ক্রোমোজোম বলে।

(vi) টেলোমিয়ার—ক্রোমোজোমের দুইটি বাহুর বিশেষ গুণসম্পন্ন প্রান্তকে টেলোমিয়ার বলে। টেলোমিয়ার না থাকিলে ক্রোমোজোম অস্থায়ী অথবা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

3. ক্রোমোজোমের বিভিন্ন পদার্থ—ক্রোমোজোম ক্রোমাটিন দ্বারা তৈয়ারী ক্রোমোজোমের অধিক স্থান দখলকারী ও প্রজননগত সক্রিয় অংশকে ইউক্রোমাটিন এবং স্বল্প স্থান দখলকারী ও প্রজননিক অর্থে নিষ্ক্রিয় অংশকে হেটারোক্রোমাটিন বলে।

4. রাসায়নিক উপাদান—ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান DNA, RNA এবং হিস্টোন ও অহিস্টোন প্রোটিন। ইহা ব্যতীত Ca^{++}, Fe^{++}, Mg^{++} আয়ন ক্রোমোজোম সংগঠন তৈয়ারীতে অংশগ্রহণ করে।

কোষ বিভাজন :

1. যে প্রক্রিয়ায় একটি কোষ বিভক্ত হইয়া দুইটি অথবা চারিটি কোষে পরিণত হয় তাহাকে কোষ বিভাজন বলে। কোষ বিভাজন তিন প্রকার—আমাইটোসিস, মাইটোসিস ও মিয়োসিস।

2. আমাইটোসিস—যে প্রক্রিয়ায় কোষ সরাসরি বিভক্ত হইয়া দুইটি কোষে পরিণত হয় তাহাকে আমাইটোসিস বলে। এই ধরনের কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াসটি লম্বা হইয়া ডাম্বেলের আকার ধারণ করে। পরে ডাম্বেলের মাঝের সরু অংশটি আরও সরু হইয়া যায় এবং সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া দুইটি নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। পরে সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হইয়া দুইটি কোষে পরিণত হয়।

3. মাইটোসিস—যে প্রক্রিয়ায় দেহকোষ কতকগুলি দশার মধ্য দিয়া বিভক্ত হইয়া সমসংখ্যক ক্রোমোজোমযুক্ত ও সমগুণসম্পন্ন দুইটি অপত্য কোষে পরিণত হয় তাহাকে মাইটোসিস কোষ বিভাজন বলে। মাইটোসিস দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত—নিউক্লিয়াসের বিভাজন বা ক্যারিওকাইনেসিস এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজন বা সাইটোকাইনেসিস। দুইবার কোষ বিভাজনের মধ্যবর্তী দশাকে ইন্টারফেজ বলে। ইন্টারফেজ দশায় DNA ও RNA সংশ্লেষিত হয় এবং DNA-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হয়। এই দশার স্থিতিকাল সর্বাধিক এবং G_1, S ও G_2 উপদশায় বিভক্ত।

(i) ক্যারিওকাইনেসিস—ক্যারিওকাইনেসিস নিম্নোক্ত চারিটি দশায় বিভক্ত :—

(ক) প্রোফেজ—নিউক্লিওজালিকা খুলিয়া ক্রোমোজোমে পরিণত হয়। প্রতিটি ক্রোমোজোম দুইটি ক্রোমাটিড দ্বারা গঠিত। এই দশার শেষ পর্যায়ে নিউক্লিয়পর্দা

ও নিউক্লিওলাস বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং স্পিণ্ডল গঠিত হয়। প্রাণিকোষে সেন্ট্রোজোম স্পিণ্ডল তৈয়ারীতে অংশগ্রহণ করে কিন্তু উদ্ভিদকোষে সাইটোপ্লাজমীয় প্রোটিন হইতে গঠিত হয়।

(খ) মেটাফেজ—এই দশায় ক্রোমোজোমগুলি সেন্ট্রোমিয়ার দ্বারা স্পিণ্ডলের বিষুব অঞ্চলে বেমতন্তু দ্বারা যুক্ত থাকে।

(গ) অ্যানাফেজ—এই দশায় ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল বরাবর বিভাজন ঘটে এবং প্রতিটি ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিডদ্বয় পৃথক হইয়া পরস্পরের বিপরীত মেরুর দিকে গমন করে।

(ঘ) টেলোফেজ—ক্রোমাটিডগুলি মেরুতে পৌঁছায়। নিউক্লিয় পর্দা ও নিউক্লিওলাস পুনরায় আবির্ভূত হয়।

(ii) সাইটোকাইনেসিস—প্রাণিকোষের সাইটোকাইনেসিসে স্পিণ্ডলের বিষুব অঞ্চল বরাবর কোষপর্দা খাঁজ হইয়া খাঁজের সৃষ্টি করে এবং এই খাঁজ ক্রমশ ভিতরে প্রবেশ করিয়া সাইটোপ্লাজমকে দ্বিখণ্ডিত করে। ইহার ফলে দুইটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদকোষে সাইটোকাইনেসিস স্পিণ্ডলের বিষুব অঞ্চলে কোষপাত তৈয়ারীর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

(iii) তাৎপর্য—এককোষী জীবের বংশবিস্তার ; জীবদেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ; ক্ষয়পূরণ, মেরামত ও পুনরুৎপাদন ; অঙ্গজ জনন প্রভৃতির ক্ষেত্রে মাইটোসিস একান্ত অপরিহার্য। ইহা ব্যতীত পিতা-মাতার ক্রোমোজোম ও জীনগুলির সমবণ্টনের জন্য অপত্য কোষ তথা জীবের বৈশিষ্ট্য পিতা-মাতার ন্যায় হয়।

3. মিয়োসিস—যে প্রক্রিয়ায় ডিপ্লয়েড জনন মাতৃকোষ বিভক্ত হইয়া চারিটি হ্যাপ্লয়েড জননকোষ সৃষ্টি করে তাহাকে মিয়োসিস বলে। এই প্রক্রিয়ায় দুইবার নিউক্লিয়াসের ও একবার ক্রোমোজোমের বিভাজন ঘটে বলিয়া অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয় এবং এই কারণে ইহাকে হ্রাসকরণ বিভাজন বলে। মিয়োসিস তিন প্রকার—প্রান্তীয়, মধ্যবর্তী ও প্রারম্ভিক। মিয়োসিস বিভাজনের দশাগুলি হইল—ইণ্টারফেজ, প্রথম মিয়োটিক বিভাজন ও দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন।

(1) ইণ্টারফেজ—এই দশায় DNA, RNA ও প্রোটিন সংশ্লেষ হয় এবং DNA-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হয়।

(2) প্রথম মিয়োটিক বিভাজন—এই পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটে এবং ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়। ইহা প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ দশায় বিভক্ত।

(ক) প্রোফেজ I—প্রোফেজ দশা অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল এবং লিপটোটিন, জাইগোটিন, প্যাকাইটিন, ডিপ্লোটিন ও ডায়াকাইনেসিস উপদশায় বিভক্ত।

(i) লিপটোটিন—এই উপদশায় ক্রোমোজোমগুলি দেখিতে দীর্ঘ, সরু সূতার ন্যায় এবং ইহাদের গায়ে অসংখ্য ক্রোমোমিয়ার সজ্জিত থাকে। সেন্ট্রোজোমের সেণ্ট্রিওলদ্বয় বিপরীত মেরুর দিকে সরিয়া যাইতে থাকে।

(ii) জাইগোটিন—এই দশায় সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলির সাইন্যাপসিস ঘটে। ক্রোমোজোমগুলি ক্রমশ ছোট ও মোটা হইতে থাকে।

(iii) প্যাকাইটিন—প্রতিটি ক্রোমোজোম দুইটি ক্রোমাটিড দ্বারা গঠিত হইলেও এই উপদশায় ইহারা দৃশ্যমান হয়। অর্থাৎ প্যাকাইটিনে সমসংস্থ ক্রোমোজোম বা বাইভ্যালেণ্ট চারিটি ক্রোমাটিড দ্বারা গঠিত এবং ইহাকে টেট্রাড বলে। টেট্রাডের ননসিস্টার ক্রোমাটিডের অংশবিশেষের বিনিময় বা ক্রসিং-ওভার ঘটে। এই উপদশা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী।

(iv) ডিপ্লোটিন—এই উপদশায় ক্রসিং-ওভারের স্থানগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দেখিতে ইংরেজী 'X'-এর ন্যায় হয় এবং ইহাদের কায়াজমা বলে। পরে কায়াজমাগুলি ক্রোমোজোমের প্রান্তের দিকে সরিতে থাকে।

(v) ডায়াকাইনেসিস—কায়াজমার প্রান্তীয় গমন চলিতে থাকে এবং সমসংস্থ ক্রোমোজোমদ্বয় প্রান্তীয় বিন্দুতে যুক্ত থাকে। ক্রোমোজোমগুলি আরও খর্ব ও স্থূল হয় এবং নিউক্লিওলাস অবলুপ্ত হয়।

(খ) মেটাফেজ I—নিউক্লিয় পর্দা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় এবং স্পিণ্ডল ও বেমতন্তু সুগঠিত হয়। ক্রোমোজোমগুলি স্পিণ্ডলের মধ্যরেখা বরাবর সেণ্ট্রোমিয়ার দ্বারা বেমতন্তুর সঙ্গে আটকাইয়া থাকে।

(গ) অ্যানাফেজ I—বাইভ্যালেণ্টের ক্রোমোজোমদ্বয় পরস্পরের বিপরীত মেরুর দিকে গমন করে কিন্তু ক্রোমোজোমের বিভাজন ঘটে না। ইহার ফলে অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হইয়া যায়।

(ঘ) টেলোফেজ I—ক্রোমোজোমগুলি সরু ও লম্বা হয়। বেমতন্তু অবলুপ্ত হয় এবং নিউক্লিয় পর্দা ও নিউক্লিওলাস পুনরায় আবির্ভূত হয়।

সাইটোকাইনেসিস I—মাইটোসিসের ন্যায় ফারোয়িং অথবা কোষপাত সৃষ্টির মাধ্যমে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ঘটে ও দুইটি হ্যাপ্লয়েড অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়।

ইন্টারফেজ—প্রথম বিভাজনের পরবর্তী ইণ্টারফেজ দশা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এই দশার প্রতিটি ক্রোমোজোম দুইটি ক্রোমাটিড দ্বারা গঠিত।

3. দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন—এই বিভাজন মাইটোসিসের অনুরূপ এবং প্রোফেজ, মেটাফেজ, আনাফেজ ও টেলোফেজ দশায় বিভক্ত।

(ক) প্রোফেজ II—প্রতিটি ক্রোমোজোম দুইটি ক্রোমাটিড লইয়া গঠিত। স্পিণ্ডল ও বেমতন্তু গঠিত এবং এই দশার শেষ পর্যায়ে নিউক্লিয় পর্দা ও নিউক্লিওলাস বিলুপ্ত হইয়া যায়।

(খ) মেটাফেজ II—ক্রোমোজোমগুলি স্পিণ্ডলের মধ্যরেখা বরাবর সেণ্ট্রোমিয়ার দ্বারা বেমতন্তুর সঙ্গে যুক্ত থাকে।

(গ) অ্যানাফেজ II—সেণ্ট্রোমিয়ার অঞ্চল বরাবর ক্রোমোজোমের লম্বালম্বি বিভাজন ঘটে। ক্রোমাটিডদ্বয় পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং বিপরীত মেরুর দিকে ধাবিত হয়।

(ঘ) টেলোফেজ II—ক্রোমাটিডগুলি মেরুতে পেঁছায়। নিউক্লিয় পর্দা এবং নিউক্লিওলাস পুনরায় গঠিত হয়।

সাইটোকাইনেসিস II—মাইটোসিসের ন্যায় সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হইয়া চারিটি হ্যাপ্লয়েড কোষের সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য—মিয়োসিসের ফলে জীবকোষ তথা প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা বংশ-পরম্পরায় নির্দিষ্ট ও ধ্রুবক থাকে এবং প্রজাতির মধ্যে নূতন নূতন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে।

প্রশ্নাবলী

A. পার্থক্য নির্দেশ কর :

(1) ক্রোমোজোম ও ক্রোমাটিড।
(2) মুখ্য খাঁজ ও গৌণ খাঁজ।
(3) সেন্ট্রোমিয়ার ও সেন্ট্রোজোম।
(4) ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন।
(5) DNA ও RNA।
(6) হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(1) ক্রোমোজোম কাহাকে বলে ?
(2) অটোজোম ও সেক্স ক্রোমোজোম বলিতে কি বুঝ ?
(3) প্যারানেমিক ও প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী বলিতে কি বুঝ ?
(4) রেসিডুয়াল ক্রোমোজোম কাহাকে বলে ?
(5) দৈত্যাকার ক্রোমোজোম কাহাকে বলে ?
(6) পরিব্যাপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার কি ?
(7) স্যাটেলাইট ও স্যাট-ক্রোমোজোম কাহাকে বলে ?
(8) টেলোমিয়ার কি ?
(9) ক্রোমোমিয়ার কাহাকে বলে ?
(10) জীনের সংজ্ঞা দাও।
(11) ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদান উল্লেখ কর।
(12) সেন্ট্রোমিয়ারের কাজ কি ?
(13) RNA-এর উপাদানগুলি কি কি ?
(14) নিউক্লিওটাইড ও নিউক্লিওসাইড বলিতে কি বুঝ ?
(15) কোষে ক্রোমোজোমের গুরুত্ব কি ?

C. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

(1) ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন উল্লেখ কর।
(2) একটি DNA অণুর গঠন বর্ণনা কর।
(3) ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

D. টীকা লিখ :

(1) সেন্ট্রোমিয়ার, (2) জীন, (3) DNA, (4) পলিটিন ক্রোমোজোম, (5) ল্যাম্পব্রাস ক্রোমোজোম, (6) মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম।

কোষ বিভাজন :

A. পার্থক্য নির্দেশ কর :

(1) মাইটোসিস ও এণ্ডোমাইটোসিস।
(2) মাইটোসিস ও মিয়োসিস।
(3) মাইটোসিস ও আমাইটোসিস।
(4) ডায়াড ও মোনাড।
(5) ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিস।
(6) উদ্ভিদকোষের মাইটোসিস ও প্রাণিকোষের মাইটোসিস।
(7) সাইন্যাপস ও সাইন্যাপসিস।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(1) ইণ্টারফেজ দশা কি ?
(2) মাইটোটিক চক্র কাহাকে বলে ?
(3) মাইটোসিসকে সমবিভাজন ও পরোক্ষ বিভাজন বলে কেন ?
(4) মাইটোসিস কোথায় হয় ? ইহার গুরুত্ব কি ?
(5) উদ্ভিদকোষে স্পিণ্ডল কিভাবে তৈয়ারি হয় ?
(6) সমসংস্থ ক্রোমোজোম কাহাকে বলে ?
(7) মিয়োসিস কোথায় সম্পন্ন হয় ? মিয়োসিসের গুরুত্ব কি ?
(8) মিয়োসিসকে হ্রাসকরণ বিভাজন বলে কেন ?
(9) সাইন্যাপসিস কাহাকে বলে ?
(10) বাইভ্যালেণ্ট বলিতে কি বুঝ ?
(11) সাইন্যাপটোনেমাল কমপ্লেক্স কি ?
(12) ক্রসিংওভার ও কায়াজমা কাহাকে বলে ?
(13) মাইটোসিস ও মিয়োসিসের মেটাফেজ দশার পার্থক্য কি ?
(14) উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষে সাইটোকাইনেসিস কিভাবে সম্পন্ন হয় ?
(15) প্রাণিকোষে নিউক্লিয়াসের বিভাজনে সেণ্ট্রোজোমের ভূমিকা কি ?
(16) কোষ কেন বিভাজিত হয় ?
(17) কোষ বিভাজনের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী দশা কোন্‌টি ?
(18) মিয়োসিসের প্রথম প্রোফেজের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী উপদশা কোন্‌টি ?

C. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

(1) মাইটোসিসের মেটাফেজ ও অ্যানাফেজ দশার সচিত্র বর্ণনা দাও।
(2) মাইটোসিস পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ কর।
(3) মিয়োসিসের প্রথম বিভাজনের প্রোফেজ দশার বিভিন্ন উপদশার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

D. টীকা লিখ :

(1) ইণ্টারফেজ, (2) মাইটোসিসের প্রোফেজ, (3) ফ্রাগমোপ্লাস্ট, (4) লিপটোটিন, (5) প্যাকাইটিন।

কলা (Tissue)

জীবনের সূচনা হয় একটিমাত্র কোষকে কেন্দ্র করিয়া। এককোষী জীব একটি কোষ দ্বারা তাহার জীবনের সকল কার্য সম্পাদন করে। কিন্তু বহুকোষী জীবের দেহে অসংখ্য কোষ থাকিলেও সকল কোষ একই সঙ্গে একটি কার্যে অংশগ্রহণ করে না। পরন্তু জীবদেহে বিচিত্র ও জটিল শারীরবৃত্তীয় কার্য পরিচালনার জন্য কোষগুলির মধ্যে আকৃতিগত ও চরিত্রগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাহাই নহে, সমধর্মী কোষগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে সজ্জিত ও পরিবর্তিত হইয়া জীবের পুষ্টি, শ্বসন, চলন, সংবহন প্রভৃতি কার্যে অংশগ্রহণ করে। একই কার্যে অংশ গ্রহণকারী এইরূপ সমধর্মী কোষগুচ্ছের সমষ্টিকে কলা বলে। এইভাবে বিভিন্ন কোষগুচ্ছ বা কলার মধ্যে শ্রমবিভাজন দ্বারা জীবদেহের সকল প্রকার কার্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। একটি কলার প্রত্যেকটি কোষ একটি সুনির্দিষ্ট কার্যে অংশগ্রহণ করিলেও প্রত্যেকটি কোষ তাহার নিজস্ব সত্তা বজায় রাখিয়া আপন আপন জৈবনিক কার্য পরিচালনা করে।

উৎপত্তিগতভাবে এক এবং একই কার্যে অংশগ্রহণকারী সম বা অসম আকৃতির কোষগুচ্ছকে কলা (Tissue) বলে।

উদ্ভিদ কলা (Plant Tissue)

কোষের অবস্থান, উৎপত্তি, প্রকৃতি, কার্য প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কলার শ্রেণীবিভাগ করা যায়। প্রতিটি কলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তবে উদ্ভিদ কলাকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়—ভাজক কলা ও স্থায়ী কলা।

4.1 ভাজক কলা (Meristematic tissue, গ্রীক শব্দ Meristos = বিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন) :

যে অপরিণত কলার কোষগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হইয়া নূতন কোষ উৎপাদন করে তাহাকে ভাজক কলা (Meristem) বলে।

চিত্র 4.1 : আদর্শ ভাজক কলা

অবস্থান (Location) : মূল, কাণ্ড, পত্র প্রভৃতি বর্ধনশীল অঙ্গের অগ্রভাগে ভাজক কলা থাকে।

গঠন (Structure) : (1) ভাজক কলার কোষগুলি গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা বহুভুজাকার হয়।

(2) কোষগুলি ছোট, ঘনসন্নিবিষ্ট ও কোষান্তর রন্ধ্রবিহীন।

(3) কোষের কোষপ্রাচীর খুবই পাতলা ও সেলুলোজ দ্বারা গঠিত।

(4) প্রতিটি কোষে একটি বড় নিউক্লিয়াস, ঘন ও দানাদার সাইটোপ্লাজম এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগহ্বর থাকে।

(5) কোষে বর্জ্য পদার্থ ও ক্ষরিত পদার্থ থাকে না, তবে তরুণ অবস্থায় প্লাস্টিড থাকে।

কার্য (Function) : এই কলার কোষগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হইয়া নূতন কোষের সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ উদ্ভিদ অঙ্গের সার্বিক বৃদ্ধি ঘটে।

ভাজক কলার শ্রেণীবিভাগ (Classification of meristematic tissue) : উৎপত্তি, অবস্থান, কার্য ও কোষ বিভাজনের প্রকৃতি অনুযায়ী ভাজক কলার শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

ভাজক কলা

উৎপত্তি অনুযায়ী	অবস্থান অনুযায়ী	কার্য অনুযায়ী	বিভাজনতল অনুযায়ী
(১) আদি	(১) অগ্রস্থ	(১) ডারমাটোজেন	(১) মাস
(২) প্রাথমিক	(২) পার্শ্বস্থ	(২) পেরিব্লেম	(২) প্লেট
(৩) গৌণ	(৩) নিবেশিত	(৩) প্লিরোম	(৩) রিব

উৎপত্তি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ (Classification according to origin) :

(ক) **আদি ভাজক কলা** (Promeristem)—মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে নূতন বর্ধনশীল অংশে যে কলা দেখা যায় তাহাকে আদি ভাজক কলা বলে। এই কলার কোষগুলি তরুণ, বিভাজনশীল, একই আকৃতির ও ভ্যাকুওলবিহীন ঘন সাইটোপ্লাজমযুক্ত।

কার্য—নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে।

(খ) **প্রাথমিক ভাজক কলা** (Primary meristem)—উদ্ভিদের ভ্রূণাবস্থা হইতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যে কলা বিভাজনক্ষম থাকে তাহাকে প্রাথমিক ভাজক কলা বলে। এই কলা মূল, কাণ্ড, পত্র ও বিভিন্ন অঙ্গের অগ্রভাগে থাকে।

কার্য—উদ্ভিদের প্রাথমিক দেহ গঠনে অংশগ্রহণ করে।

(গ) **গৌণ ভাজক কলা** (Secondary meristem)—প্রাথমিক ভাজক কলা হইতে উৎপন্ন স্থায়ী কলা পরিবর্তিত হইয়া যে ভাজক কলা সৃষ্টি করে তাহাকে গৌণ ভাজক কলা বলে। এই কলা অনেক উদ্ভিদের কাণ্ডের কর্টেক্স অঞ্চলে থাকে। যেমন—ফেলোজেন বা কর্ক ক্যাম্বিয়াম (Phellogen or Cork cambium)।

কার্য—উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি, রক্ষণ ও জীর্ণ অংশের মেরামতে (Repair) অংশগ্রহণ করে।

অবস্থান অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ (Classification according to position) :

(ক) **অগ্রস্থ ভাজক কলা** (Apical meristem)—উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গের অগ্রভাগে অবস্থিত কলাকে অগ্রস্থ ভাজক কলা বলে। এই কলা মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগে থাকে।

কার্য—উদ্ভিদ অঙ্গের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটায়।

(খ) **পার্শ্বস্থ ভাজক কলা** (Lateral meristem)—উদ্ভিদ অঙ্গের পার্শ্ব-দেশে অবস্থিত ভাজক কলাকে পার্শ্বস্থ ভাজক কলা বলে। ইহা মূল ও কাণ্ডের পার্শ্বদেশে সমান্তরালভাবে স্থায়ী কলার সঙ্গে অবস্থান করে। যেমন—ভ্যাস্কুলার ক্যাম্বিয়াম (Vascular cambium), কর্ক ক্যাম্বিয়াম।

কার্য—উদ্ভিদ অঙ্গের প্রস্থ বা পরিধির বৃদ্ধি ঘটায়।

(গ) **নিবেশিত ভাজক কলা** (Intercalary meristem)—দুইটি স্থায়ী কলার মধ্যে অবস্থিত ভাজক কলাকে নিবেশিত ভাজক কলা বলে। ইহা ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ, ইকুইজিটাম (Equisetum), পাইন প্রভৃতি উদ্ভিদের পর্বমধ্য ও পত্রমূলে থাকে।

কার্য—উদ্ভিদ অঙ্গের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটায়।

কার্য অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ (Classification according to function) :

(ক) **ডারমাটোজেন** (Dermatogen) **বা প্রোটোডার্ম** (Protoderm)—উদ্ভিদ অঙ্গের বাহিরে অবস্থিত যে ভাজক কলা হইতে বহিস্ত্বক গঠিত হয় তাহাকে ডারমাটোজেন বলে। মূলের অগ্রভাগে ডারমাটোজেনের বাহিরে যে একটি অতিরিক্ত কোষস্তর থাকে তাহাকে ক্যালিপট্রোজেন (Calyptrogen) বলে।

(খ) **পেরিব্লেম** (Periblem) **বা গ্রাউন্ড মেরিস্টেম** (Ground meristem)—উদ্ভিদ অঙ্গের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত যে ভাজক কলা হইতে কর্টেক্স বা বহি-র্মজ্জা, মজ্জা ও মজ্জারশ্মি গঠিত হয় তাহাকে পেরিব্লেম বলে।

(গ) **প্লিরোম** (Plerome) **বা প্রোক্যাম্বিয়াম** (Procambium)—উদ্ভিদ অঙ্গের কেন্দ্রীয় অংশের যে ভাজক কলা হইতে স্টীল (জাইলেম, ফ্লোয়েম, ক্যাম্বিয়াম ও পরিচক্র) গঠিত হয় তাহাকে প্লিরোম বলে।

বিভাজনতল অনুযায়ী (According to plane of cell division) **শ্রেণীবিভাগ** :

(ক) **মাস মেরিস্টেম** (Mass meristem)—যে ভাজক কলার কোষগুলি সর্বতলে বিভাজিত হয় তাহাকে মাস মেরিস্টেম বলে। যেমন—সস্য, রেণুস্থলী, মজ্জা, কর্টেক্স প্রভৃতি।

(খ) **প্লেট মেরিস্টেম** (Plate meristem)—যে ভাজক কলার কোষগুলি

(2) কোষপ্রাচীরের কোণে অধিক পরিমাণে সেলুলোজ ও পেকটিন জমা হওয়ায় কোষপ্রাচীর অসমরূপে স্থূল হয়।

(3) কোষে ভ্যাকুওলযুক্ত প্রোটোপ্লাজম থাকে। অনেক কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

(4) সাধারণত কোষান্তর রন্ধ্র থাকে।

কোষপ্রাচীরের স্থূলীকরণ অনুযায়ী ইহা তিন প্রকার :

(i) **কৌণিক** (Angular)—এই প্রকার কোলেনকাইমা কোষের কোণগুলি কেবল স্থূল হয়। কলায় কোষান্তর রন্ধ্র থাকে না। লাউ, কুমড়া, ডালিয়া, ধুতরা প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ডে দেখা যায়।
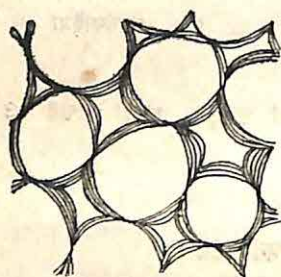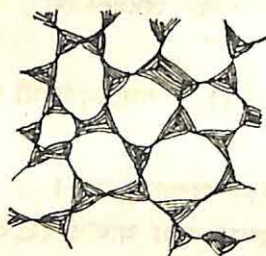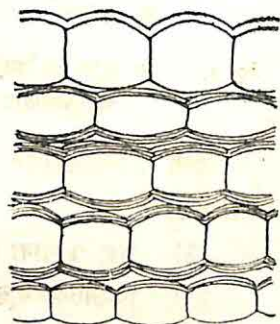
চিত্র 4.5 : (ক) কূপাকৃতি কোলেনকাইমা (খ) কৌণিক কোলেনকাইমা (গ) স্তরীভূত কোলেনকাইমা

(ii) **কূপাকৃতি** (Lacunate) :—এই প্রকার কোলেনকাইমার কোষান্তর রন্ধ্র বড় হয় এবং রন্ধ্রসংলগ্ন কোষপ্রাচীর অংশ স্থূল হয়। আকন্দ, হাতিশুঁড় প্রভৃতির পর্ণবৃন্তে দেখা যায়।

(iii) **স্তরীভূত** (Lamellar) :—এই কলার কোষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট ও কোষান্তর রন্ধ্রবিহীন। কোষপ্রাচীরের স্থূলীকরণ পৃষ্ঠ সমান্তরাল প্রাচীরে নির্দিষ্ট স্তরে হয়। ঘেঁটু, র‍্যামনাস প্রভৃতির কাণ্ডে দেখা যায়।

অবস্থান : কোলেনকাইমা দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের অধস্ত্বক, পত্রবৃন্ত, পুষ্পবৃন্ত প্রভৃতি অংশে দেখা যায়।

কার্য : (1) উদ্ভিদ-অঙ্গের যান্ত্রিক দৃঢ়তা (Mechanical rigidity) প্রদান করে।

(2) কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে।

(3) বর্ধনশীল অঙ্গের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে, ফলে কাণ্ডের অগ্রভাগ সহজে ভাঙ্গিয়া যায় না।

(গ) স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerenchyma)—সমরূপে স্থূল কোষপ্রাচীরযুক্ত মৃত কলাকে স্ক্লেরেনকাইমা বলে।

গঠন : (1) কোষগুলি সরু, দীর্ঘ ও প্রস্থচ্ছেদে বহুভুজাকার হয়।

(2) কোষপ্রাচীর সমরূপে লিগনিন জমা হওয়ায় ইহা স্থূল ও শক্ত হয়।

(3) কোষ মধ্যবর্তী স্থান (Lumen) ক্রমশ সংকুচিত হয় এবং পরিশেষে প্রোটোপ্লাজমের মৃত্যু ঘটিয়া মৃত কোষে পরিণত হয়।

(4) স্ক্লেরেনকাইমা দুই প্রকার—(i) স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু, (ii) স্ক্লেরাইড।

(i) স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু (Sclerenchyma fibre) :—দুই মুখ সূচালো, কূপযুক্ত দীর্ঘ স্ক্লেরেনকাইমা কোষকে স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু বলে। জাইলেমসংলগ্ন স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুকে কাষ্ঠল তন্তু বা উড ফাইবার (Wood fibre) ও ফ্লোয়েম সংলগ্ন স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুকে বাস্ট ফাইবার (Bast fibre) বলে। পাট, শণগাছের তন্তু, নারিকেলের ছোবড়া প্রভৃতি স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু।

চিত্র 4.7 : (ক) লম্বচ্ছেদে স্ক্লেরেনকাইমা (খ) প্রস্থচ্ছেদে স্ক্লেরেনকাইমা (গ) স্ক্লেরাইড

অবস্থান : কাণ্ডের অধস্ত্বক, বহিস্তর বা কর্টেক্স, পরিচক্র ও নালিকা বাণ্ডিলে স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু দেখা যায়।

কার্য : যান্ত্রিক কলা হিসাবে উদ্ভিদ অঙ্গের দৃঢ়তা প্রদান করে।

(ii) স্ক্লেরাইড (Sclereid)—কূপনালি (Pit canal)-যুক্ত বিশেষ বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট কঠিন স্ক্লেরেনকাইমা কোষকে স্ক্লেরাইড বলে। ইহাদের কোষপ্রাচীর খুব স্থূল ও কঠিন বা শক্ত হওয়ায় ইহারা প্রস্তর কোষ (Stone cell) নামে পরিচিত। কোষপ্রাচীর লিগনিন, কিউটিন, সুবেরিণ দ্বারা স্থূলীকৃত হওয়ায় কোষের কেন্দ্রীয় গহ্বর বিভিন্ন দিকে সরু নালিকার ন্যায় বিস্তৃত হয়। ঐ সকল নালীকে কূপনালী বলে। স্ক্লেরাইড গোলাকার বা ডিম্বাকার, দণ্ডাকার, তারকাকার ন্যায় অস্থিসদৃশ অথবা অসম আকৃতিযুক্ত হয়।

অবস্থান : পেয়ারা, নাসপাতি, আপেল প্রভৃতির ফলত্বকে ইহাদের দেখা যায়।

কার্য : যান্ত্রিক কলা হিসাবে উদ্ভিদ অঙ্গের দৃঢ়তা প্রদান করে।

4.2·2 জটিল কলা (Complex tissue) : যে স্থায়ী কলার কোষের আকৃতি ও গঠন বিভিন্ন প্রকার কিন্তু একই সঙ্গে একই কার্যে লিপ্ত থাকে তাহাকে জটিল কলা
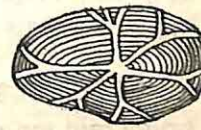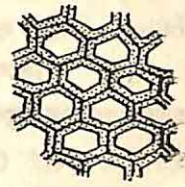
বলে। উদ্ভিদদেহে দুই প্রকার জটিল কলা দেখা যায়—জাইলেম (Xylem) ও ফ্লোয়েম (Phloem)। জাইলেম ও ফ্লোয়েম একত্রে নালিকা বাণ্ডিল (Vascular bundle) গঠন করে।

(ক) **জাইলেম**—যে কলার মধ্য দিয়া জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ মূল হইতে পাতায় সংবাহিত হয় তাহাকে জাইলেম বলে। যে জাইলেম প্রথমে সৃষ্টি হয় এবং যাহার কোষগুলির ব্যাস ছোট তাহাকে প্রোটোজাইলেম (Protoxylem) বলে। আবার যে জাইলেম শেষ পর্যায়ে গঠিত হয় এবং যাহার কোষগুলির ব্যাস বড় হয় তাহাকে মেটাজাইলেম (Metaxylem) বলে। জাইলেম চারি প্রকার কোষ—ট্রাকিড, ট্রাকিয়া, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও জাইলেম তন্তু বা কাষ্ঠল তন্তু লইয়া গঠিত। কোষগুলির মধ্যে জাইলেম প্যারেনকাইমা ব্যতীত সকলেই মৃত।

(i) **ট্রাকিড** (Tracheid) : ইহারা একপ্রকার দীর্ঘ, লম্বাটে, দুই প্রান্ত সরু মৃত কোষ। কোষগুলির প্রান্তভাগ সরু হইলেও ভোঁতা। কোষপ্রাচীর শক্ত, স্থূল, লিগনিনযুক্ত এবং বলয়াকার, সর্পিলাকার, সোপানাকার, জালিকাকার, কূপযুক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অলঙ্করণ দেখা যায়।

অবস্থান—গুপ্তবীজী, ব্যক্তবীজী ও ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের জাইলেম কলায় ইহাদের দেখা যায়।

কার্য—জল সংবহনে অংশগ্রহণ করে। ইহা ব্যতীত উদ্ভিদ অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করে।
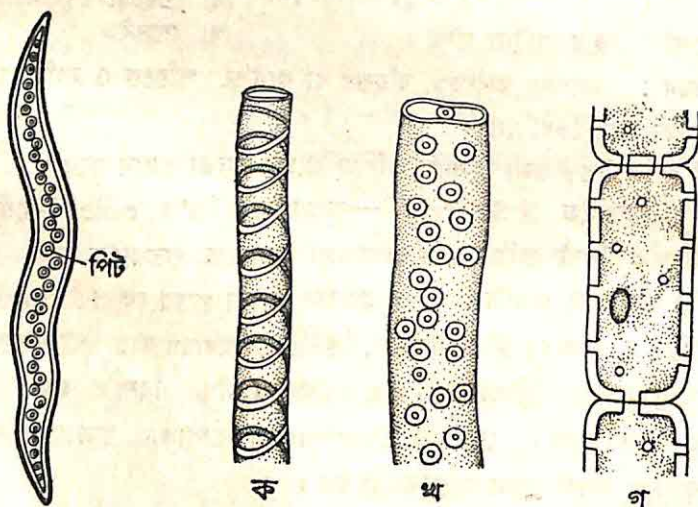
চিত্র 4.7 : ট্রাকিড চিত্র 4.8 : (ক ও খ) দুই প্রকার ট্রাকিয়া (গ) জাইলেম প্যারেনকাইমা

(ii) **ট্রাকিয়া বা ভেসেল** (Trachea or Vessel) : ট্রাকিয়া একপ্রকার লম্বা নলাকার প্রোটোপ্লাজমহীন মৃত কোষ। অপরিণত অবস্থায় পিপার ন্যায় কোষগুলি একটির উপর একটি সজ্জিত হয়। পরিণত হইবার সময় কোষগুলির

সাধারণ প্রস্থপ্রাচীর বিলুপ্ত হওয়ায় একটি টানা নলের সৃষ্টি করে। কোষপ্রাচীর স্থূল, লিগনিনযুক্ত এবং উহার উপর ট্রাকিডের ন্যায় বিভিন্ন প্রকার অলঙ্করণ দেখা যায়।

অবস্থান : প্রায় সকল গুপ্তবীজী ও নিটাম নামক ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের জাইলেমে ট্রাকিয়া থাকে।

কার্য : জল ও জলে দ্রবীভূত লবণ পরিবহণ করে। ইহা ব্যতীত কোষপ্রাচীর স্থূল হওয়ায় উদ্ভিদ অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

(iii) **জাইলেম প্যারেনকাইমা (Xylem parenchyma) :** জাইলেম গঠনে অংশগ্রহণকারী লম্বাটে সজীব প্যারেনকাইমা কোষকে জাইলেম প্যারেনকাইমা বলে। কোষপ্রাচীর পাতলা অথবা স্থূল, কিন্তু কোষগুলি প্রোটোপ্লাজমে পূর্ণ। কোষপ্রাচীর স্থূলীকৃত হইলে লিগনিনযুক্ত হয় এবং কূপযুক্ত হইতে পারে।

অবস্থান : কিছু ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ ব্যতীত সকল ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জাইলেমে থাকে।

কার্য : জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ পরিবহণে সাহায্য করে। খাদ্যবস্তু ও অন্যান্য বস্তু যেমন কেলাস, ট্যানিন প্রভৃতি সঞ্চয় করে। ইহারা অতি অল্প পরিমাণ যান্ত্রিক দৃঢ়তাও প্রদান করে।

(iv) **জাইলেম তন্তু (Xylem fibre) বা কাণ্ঠল তন্তু (Wood fibre) :** জাইলেমে অবস্থিত মৃত স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুকে জাইলেম তন্তু বলে। ইহাদের গঠন স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুর ন্যায়, কোষপ্রাচীর স্থূল ও লিগনিনযুক্ত।

অবস্থান : জাইলেম কলায় দেখা যায়।

কার্য : যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করে।

(খ) **ফ্লোয়েম :** যে কলার মধ্য দিয়া পাতায় তৈয়ারি খাদ্যবস্তু দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তাহাকে ফ্লোয়েম বলে। ফ্লোয়েম চারি প্রকার কোষ—সীভ নল, সঙ্গী কোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও ফ্লোয়েম তন্তু বা বাস্ট তন্তু লইয়া গঠিত। স্ক্লেরাইড ও ক্ষরণ কোষ অনেক সময় ফ্লোয়েম কলায় থাকে। তবে ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে ফ্লোয়েম কলা সীভ নল ও ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা লইয়া গঠিত; আবার একবীজপত্রী উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলা সীভ নল ও সঙ্গী কোষ লইয়া গঠিত।
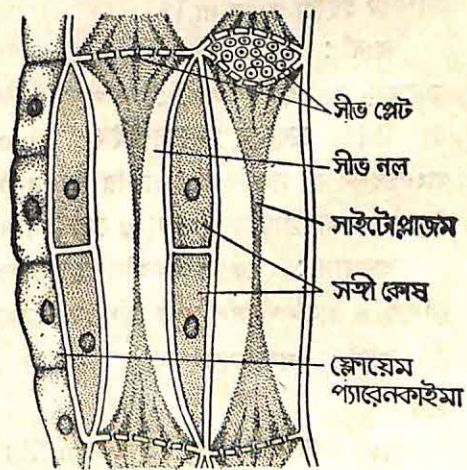
চিত্র 4.9 : লম্বচ্ছেদে ফ্লোয়েম কলার বিভিন্ন কোষ

(i) **সীভ নল (Seive tube)**—ইহারা একপ্রকার লম্বা, গোলাকার, দীর্ঘ

সজীব কোষ যাহারা উপর-নিচ একটি সারিতে সজ্জিত থাকে। কোষপ্রাচীর পাতলা ও সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। পরিণত কোষে একটি কেন্দ্রীয় কোষগহ্বর এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিক্ষিপ্ত স্টার্চ দানা ও কয়েকটি লিউকোপ্লাস্টিড থাকে। পরিণত কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না। সীভ নলের প্রস্থপ্রাচীর চালনীর ন্যায় ছিদ্রযুক্ত। ছিদ্রযুক্ত এই প্রস্থপ্রাচীরকে চালনীচ্ছদা বা সীভ প্লেট (Seive plate) বলে। চালনীচ্ছদার ছিদ্রপথে সাইটোপ্লাজমের সূত্র দুইটি সংলগ্ন সীভ নলের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে। অনেক সময় সীভ প্লেটের উপর ক্যালোজ (Callose) নামক একপ্রকার বর্ণহীন, অদ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট জমা হইয়া ছিপির ন্যায় ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করিয়া দেয়। সীভ প্লেটের উপর ক্যালোজের এইরূপ আবরণকে ক্যালাস প্যাড (Callus pad) বা ক্যালাস বলে। শীতকালে ক্যালাসের জন্য সংযোগ রক্ষা ব্যাহত হয় কিন্তু বসন্ত ঋতুতে আবার ক্যালোজ দ্রবীভূত হইয়া ছিদ্রপথকে উন্মুক্ত করে।

অবস্থান : ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ ও সকল সপুষ্পক উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে ইহাদের দেখা যায়।

কার্য : পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে সংবহন করে। ইহা ব্যতীত সীভ নল খাদ্যসঞ্চয় করে।

(ii) **সঙ্গী কোষ** (Companion cell)—সীভ নল সংলগ্ন পাতলা প্রাচীরযুক্ত বিশেষ ধরনের লম্বা, সজীব প্যারেনকাইমা কোষকে সঙ্গী কোষ বলে। কোষের মধ্যে ঘন সাইটোপ্লাজম ও স্পষ্ট নিউক্লিয়াস বিদ্যমান। কোষে স্টার্চ দানা থাকে না।

অবস্থান : কতিপয় দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ ব্যতীত সকল দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে সঙ্গী কোষ থাকে। ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদে ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে ইহারা থাকে না।

কার্য : সীভ নলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ও সীভ নলের ন্যায় আয়ুষ্কাল হওয়ায় অনুমান করা হয় যে সঙ্গী কোষ খাদ্য পরিবহণে সাহায্য করে।

(iii) **ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা** (Phloem parenchyma) :—ফ্লোয়েম গঠনে অংশগ্রহণকারী সজীব আয়তাকার প্যারেনকাইমাকে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা বলে। ইহাদের কোষপ্রাচীর পাতলা ও সেলুলোজ দ্বারা গঠিত।

অবস্থান : কেবল একবীজপত্রী উদ্ভিদে ইহারা অনুপস্থিত। ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ ও অবশিষ্ট সপুষ্পক উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে ইহাদের দেখা যায়।

কার্য : খাদ্য সঞ্চয় করে। শর্করা ও অনেক সময় প্রোটিন সংবহনে অংশগ্রহণ করে।

(iv) **ফ্লোয়েম তন্তু** (Phloem fibre) **বা বাস্ট তন্তু** (Bast fibre)—ফ্লোয়েম সংলগ্ন লম্বা স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুকে ফ্লোয়েম তন্তু বলে। কোষপ্রাচীর স্থূল, লিগনিনযুক্ত ও কূপযুক্ত।

অবস্থান : প্রায় সকল গুপ্তবীজ উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলায় এই তন্তু থাকে। তবে ফার্ণ জাতীয় ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলায় এই তন্তু থাকে না।

কার্য : সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

4.2.3 **বিশিষ্ট কলা** (Special tissue) : **অন্যান্য কলা অপেক্ষা আকৃতি ও গঠনে পৃথক যে সকল কলা উদ্ভিদদেহে বিশেষ কার্যের জন্য একত্রিত হয় তাহাদের বিশিষ্ট কলা বলে।** এই কলা সাধারণত রেচন ও ক্ষরণ কার্যে অংশগ্রহণ করে। বিশিষ্ট কলা নিম্নলিখিত প্রকারের হইয়া থাকে :

1. **ল্যাটিসিফেরাস কলা** (Laticiferous tissue)—এই কলার কোষের সাইটোপ্লাজম হইতে দুগ্ধের ন্যায় এক প্রকার তরল পদার্থ ক্ষরিত হয়। ইহাকে তরুক্ষীর বলে। তরুক্ষীর বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে অতি দ্রুত জমিয়া যায়। এই কলা দুই প্রকার :

(ক) **ক্ষীর কোষ** (Latex cell)—ইহারা পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত, দীর্ঘ শাখাযুক্ত এককোষী নালী। কোষের মধ্যে অনেক নিউক্লিয়াস থাকে। আকন্দ, বট, করবী, ফণিমনসা প্রভৃতি গাছে ক্ষীর কোষ থাকে।
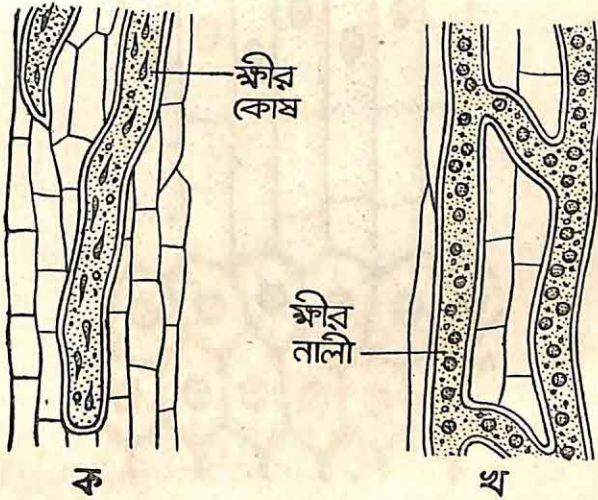
চিত্র 4.10 : বিশিষ্ট কলা—(ক) ক্ষীর কোষ (খ) ক্ষীর নালী

(খ) **ক্ষীর নালী** (Latex vessel)—শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট বহুকোষযুক্ত ক্ষীর কোষকে ক্ষীর নালী বলে। কোষগুলির প্রস্থপ্রাচীর বিলুপ্তির ফলে ক্ষীর নালী গঠিত হয়। এইরূপ নালীতে অসংখ্য নিউক্লিয়াস বিদ্যমান। কচু, রবার, কলা, শেয়ালকাঁটা প্রভৃতি উদ্ভিদে ক্ষীর নালী থাকে।

2. **গ্রন্থি কলা** (Glandular tissue)—ইহারা বহিঃক্ষরণ ও অন্তঃক্ষরণ সম্পন্নকারী একগুচ্ছ কোষের সমষ্টি। এই কলার কোষগুলি সজীব ও কোষপ্রাচীর

অত্যন্ত পাতলা। ক্ষরিত পদার্থ সাইটোপ্লাজম হইতে ক্ষরিত হইয়া ভ্যাকুওলে সঞ্চিত থাকে। ইহারা বিভিন্ন প্রকারের। যেমন,

(ক) **গ্রন্থি রোম** (Glandular hairs)—গ্রন্থি রোম এককোষী অথবা বহু-কোষী এবং বহিঃগাত্রীয় হয়। গ্রন্থি রোম বিভিন্ন পদার্থ—যথা, বিষাক্ত রস, মিউসি-লেজ, উৎসেচক প্রভৃতি ক্ষরিত করে। বিছুটির এককোষী দংশক রোম (Stinging hairs) বিষাক্ত রসপূর্ণ। আবার ঘটপত্রী (Nepanthes), সূর্যশিশির (Drocera) প্রভৃতি উদ্ভিদে প্রোটিন ও লাইটিক এনজাইম নিঃসরণকারী গ্রন্থি আছে।

(খ) **মধু গ্রন্থি** (Nectaries)—মধু গ্রন্থি গাছের ফুলে ও পাতায় থাকে। এই গ্রন্থির কোষগুলি স্তম্ভাকার ও সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ। এই গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত শর্করা জাতীয় রসকে মধু (Nectar) বলে।
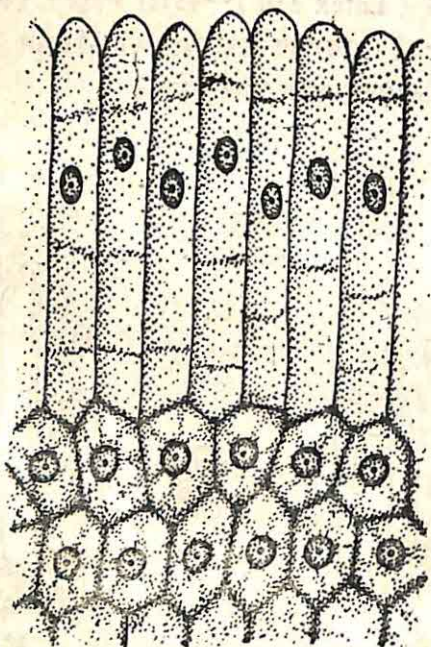
চিত্র 4.11 : মধু গ্রন্থি

(গ) **রজন নালী** (Resin ducts)—যখন রজন, গঁদ প্রভৃতি পদার্থ ক্ষরিত হইয়া নালীর মধ্যে অবস্থান করে তাহাকে রজন নালী বলে। যেমন—পাইন গাছের মূলের রজন নালী।

(ঘ) **তৈল গ্রন্থি** (Oil glands)—লেবু, ইউক্যালিপটাস, সূর্যমুখী প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতায় তৈল নিঃসরণকারী গ্রন্থি দেখা যায়।

3. **হাইডাথোড** (Hydathode)—ইহা একপ্রকার জলশোষণকারী বিশিষ্ট কলা। ইহাদের সাহায্যে জল ও জলে দ্রবীভূত লবণ বাহিরে ক্ষরিত হয় বলিয়া ইহাদের জলপত্ররন্ধ্র (Water stomata) বলে। প্রতিটি হাইডাথোড সবুজকণাহীন, কোষান্তর রন্ধ্রযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। এই কলাকে এপিথেম
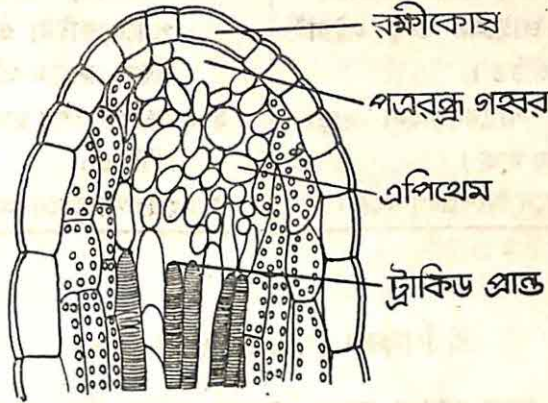
চিত্র 4.12 : হাইডাথোড

(Epithem) বলে। এপিথেমের নিচে জাইলেমের ট্রাকিড বিদ্যমান। ট্রাকিড হইতে নির্গত জল এপিথেম কলার কোষান্তর রন্ধ্রে জমা হয় এবং তথা হইতে পত্ররন্ধ্র গহ্বর মাধ্যমে পাতার বাহিরে আসে এবং পত্রকিনারায় জলবিন্দু রূপে দেখা যায়। হাইডাথোড টোমাটো, কচু, ঘাস প্রভৃতি উদ্ভিদের পত্রকিনারায় থাকে।

ভাজক কলা ও স্থায়ী কলায় পার্থক্য (Differences between Meristematic tissue and Permanent tissue)

ভাজক কলা	স্থায়ী কলা
১। যে কলার কোষগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হইয়া নতুন কোষ উৎপন্ন করে তাকে ভাজক কলা বলে।	১। ভাজক কলা থেকে উৎপন্ন বিভাজন ক্ষমতাহীন কলাকে স্থায়ী কলা বলে।
২। এই কলার কোষগুলি ছোট, ঘনসন্নিবিষ্ট ও সজীব।	২। কোষগুলি অপেক্ষাকৃত বড় এবং সজীব বা মৃত। মৃত কোষে প্রোটোপ্লাজম থাকে না।
৩। কোষপ্রাচীর পাতলা।	৩। কোষপ্রাচীর পাতলা অথবা স্থূল।
৪। কোষগুলির মধ্যে কোষান্তর রন্ধ্র নাই।	৪। কোষান্তর রন্ধ্র আছে।

জাইলেম ও ফ্লোয়েমে পার্থক্য (Differences between Xylem and Phloem)

জাইলেম	ফ্লোয়েম
১। ট্রাকিড, ট্রাকিয়া, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও জাইলেম তন্তু লইয়া জাইলেম গঠিত।	১। সীভ নল, সঙ্গী কোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও ফ্লোয়েম তন্তু লইয়া ফ্লোয়েম গঠিত।
২। জাইলেম প্যারেনকাইমা ছাড়া সকল কোষ মৃত।	২। ফ্লোয়েম তন্তু ছাড়া সকল কোষ জীবিত।
৩। জল সংবহনে অংশগ্রহণ করে।	৩। খাদ্য সংবহনে অংশগ্রহণ করে।

প্রাণিকলা (Animal tissue)

উদ্ভিদদেহ যেমন অসংখ্য কলার সমন্বয়ে গঠিত ঠিক তেমনই প্রাণিদেহও বিভিন্ন রকমের কলা দ্বারা গঠিত। উদ্ভিদের তুলনায় প্রাণীদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি জটিল হওয়ায় ইহাদের কলাগুলিও বহুলাংশে জটিল। উন্নত প্রাণিদেহে বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য বিভিন্ন কলা মিলিত হইয়া অঙ্গ (Organ) গঠন করে। পুনরায় বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়ে তন্ত্র (System) গঠিত হয়। বিভিন্ন তন্ত্রের সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ প্রাণিদেহ গঠিত হয়। সুতরাং দেহের বিভিন্ন কোষ, কলা, অঙ্গ, তন্ত্র, প্রাণিদেহের গঠন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করিতে হইলে বিভিন্ন কলার বৈশিষ্ট্য, গঠন ও কার্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

কোষ→কলা→অঙ্গ→তন্ত্র→প্রাণিদেহ

কলার সংজ্ঞা (Definition of tissue) : **প্রায় একই বা ভিন্ন আকৃতি-বিশিষ্ট কতকগুলি কোষসমষ্টি একই উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দলবদ্ধ বা স্তরে স্তরে সজ্জিত হয় এবং একই ধরনের কার্য সম্পাদন করে তাহাকে কলা (Tissue) বলে।**

বহুকোষী প্রাণিদেহে বিচিত্র ও জটিল শারীরবৃত্তীয় কার্য সম্পাদনের জন্য কোষগুলির মধ্যে আকৃতিগত ও চরিত্রগত পার্থক্য দেখা দেয়। ফলস্বরূপ, বিভিন্ন কোষগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রমবিভাগ ঘটে।

উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী এবং মানবদেহের গঠন ও কার্যের ভিত্তিতে প্রাণিকলাকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

(i) **আবরণী কলা** (Epithelial tissue)

(ii) **যোগ কলা** (Connective tissue)

(iii) **পেশী কলা** (Muscular tissue)

(iv) **স্নায়ু কলা** (Nervous tissue)

(v) **জনন কলা** (Germinal tissue)

নিম্নে পাঁচটি কলার বিবরণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল।

4.3 আবরণী কলা (Epithelial tissue)

সংজ্ঞা (Definition) : **যে কলা প্রাণিদেহের বাহিরের আবরণ ও ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গের উপর পাতলা আচ্ছাদন সৃষ্টি করে তাহাকে আবরণী কলা বলে।**
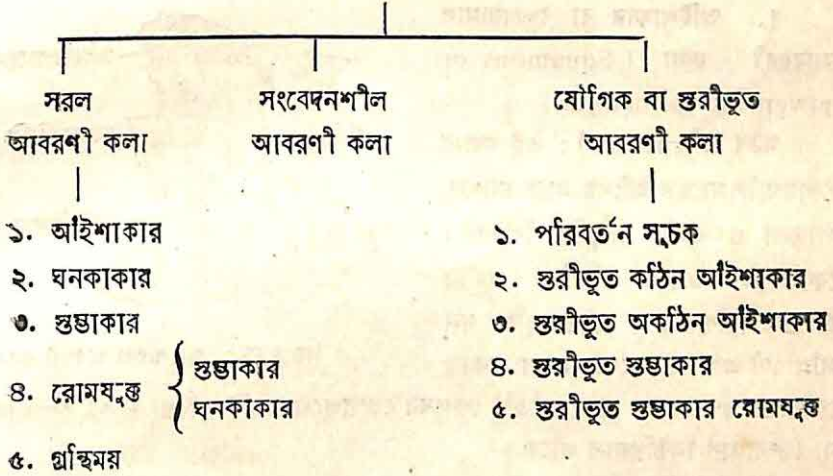
বৈশিষ্ট্য (Characteristics) :

(i) এই কলার কোষগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট।

(ii) এই কলার কোষগুলির পৃষ্ঠীয় অংশ মুক্ত এবং যোগ কলা নির্মিত অতি পাতলা একটি ভিত্তি পর্দার (Basement membrane) উপর এক বা একাধিক স্তরে সাজানো থাকে।

(iii) আবরণী কলার কোষসমূহের মধ্যে কোষান্তর স্থান থাকে না বলিলেও চলে।

(iv) এই কলায় কোন রক্তবাহ (Blood vessel) থাকে না।

(v) অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে এই কলার কোষগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হইয়া মুক্ত প্রান্তের দিকে এক বা একাধিক কোষস্তরের সৃষ্টি করিয়া অঙ্কুর স্তর (Stratum germinativum) গঠন করে।

(vi) সন্ধিপদ প্রাণিদের বহিস্থ আবরণী কলা শক্ত খোলকে পরিণত হয়।

(vii) বহিস্ত্বকের আবরণী কলা থেকে সরীসৃপের আঁশ, পাখীর পালক ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর গায়ের লোম উৎপন্ন হয়।

কার্য (Function) :

(i) সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে রক্ষা করা এই কলার প্রধান কাজ ।

(ii) রসক্ষরণ, রেচন ও শোষণে এই কলা অংশগ্রহণ করে ।

(iii) স্নায়ুর সঙ্গে যুক্ত থাকায় অনেক আবরণী কলা স্বাদ, গন্ধ প্রভৃতি অনুভূতি গ্রহণে সাহায্য করে ।

4.3'1 **সরল আবরণী কলা** (Simple epitheial tissue) : **একটি স্তরে সজ্জিত আবরণী কলাকে সরল আবরণী কলা বলে ।** কোষের আকৃতি ও পার্থক্যের জন্য ইহাদের পাঁচটি শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে ।

1. **আঁইশাকার বা স্কোয়ামাস আবরণী কলা** (Squamous or pavement epithelium)

চিত্র 4.13 : আঁইশাকার আবরণী কলা

গঠন (Structure) : এই কলার কোষগুলি মাছের আঁশের ন্যায় চ্যাপ্টা, পাতলা ও অসম আকৃতি বিশিষ্ট । কোষগুলি একটি ভিত্তি পর্দার উপর অবস্থিত । কোষগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট এবং তাহাদের মধ্যে কোন কোষান্তর রন্ধ্র থাকে না । প্রতিটি কোষের কেন্দ্রস্থলে একটি করিয়া স্পষ্ট গোলাকার বা ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস থাকে ।

অবস্থিতি (Distribution) : ফুসফুসের বায়ুস্থলীর (Alveolus) আবরণ, বৃক্কের বাওম্যানস্ খ্যাত ক্যাপস্যুল ও হেন্‌লী খ্যাত লুপের অন্তঃআবরণ, দেহাভ্যন্তরের পেরিটোনিয়াম (Peritoneum), মানবদেহের ত্বকে, মুখগহ্বরে আঁইশাকার আবরণী কলা দেখিতে পাওয়া যায় । হৃৎপিণ্ডের আঁইশাকার অন্তঃআবরণীকে এণ্ডোকার্ডিয়াম এবং রক্তবাহের আঁইশাকার অন্তঃআবরণীকে এণ্ডোথেলিয়াম বলে ।
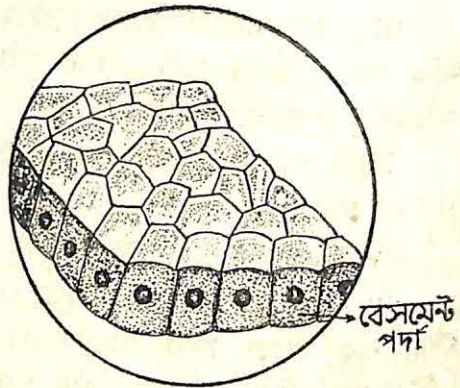
চিত্র 4.14 : ঘনকাকার আবরণী কলা

কার্য (Function) : (i) এই কলা বিভিন্ন প্রকার রোগ জীবাণুর আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করে ।

(ii) তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের আদানপ্রদানে এই কলা সাহায্য করে ।

(iii) পরিস্রাবণে (Filtration) সহায়তা করে।

2. ঘনকাকার আবরণী কলা (Cuboidal epithelium) :

গঠন (Structure) : এই কলার কোষগুলি ঘনকের ন্যায় দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় সমান বলিয়া ইহাকে ঘনকাকার কলা বলা হয়। প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসটি স্পষ্ট এবং সাধারণত গোলাকার হয়।

অবস্থিতি (Distribution) : মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৃক্কনালিকা, লালাগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয়, থাইরয়েড, যকৃৎ, প্রভৃতিতে এই কলা থাকে।

কার্য (Function)— i) সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে রক্ষা করে এবং পৃথক রাখে।
(ii) রসক্ষরণে সহায়তা করে।

3. স্তম্ভাকার আবরণী কলা (Columnar epithelium) :

গঠন (Structure) : এই কলার কোষগুলি স্তম্ভের ন্যায়, কোষের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অপেক্ষা উচ্চতা অনেক বেশী। নিউক্লিয়াস কোষের ভিত্তি পর্দার নিকটে অবস্থিত। ইহা দুই প্রকার :
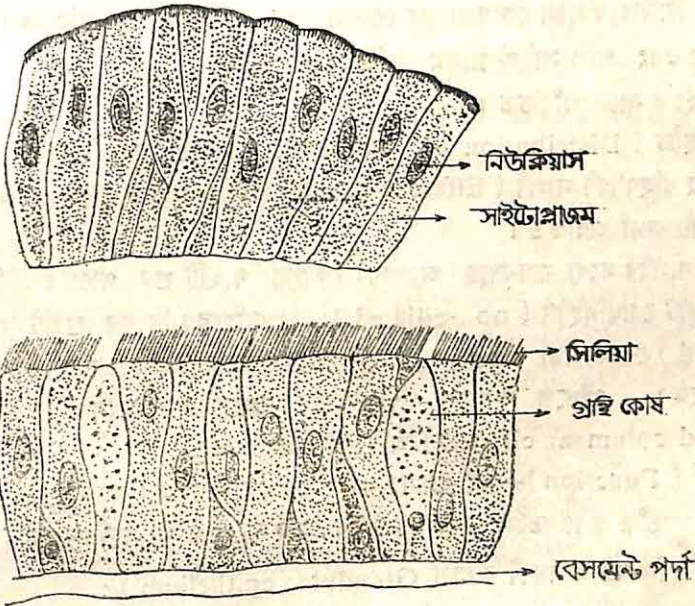
চিত্র 4.15 : স্তম্ভাকার আবরণী কলা (উপরে) ও রোমযুক্ত আবরণী কলা (নিচে)

(i) **ব্রাসবর্ডার স্তম্ভাকার আবরণী কলা (Brassborder columnar epithelium) :** অনেক ক্ষেত্রে (পৌষ্টিক নালী ও নেফ্রনের নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা) কোষের মুক্ত প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিক্ষেপ দেখা যায়। ইহাদের মাইক্রোভিলি (microvilli) বলে। মাইক্রোভিলিযুক্ত এই আবরণী কলাকে ব্রাসবর্ডার (Brassborder) বলে। ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, থাইরয়েড গ্রন্থি ও রেচন নালীতে এই জাতীয় কলা অবস্থিত। শোষণই ইহাদের অন্যতম কার্য।

(ii) **গবলেট কোষ** (Goblet cell)—অনেক সময় স্তম্ভাকার আবরণী কলার কোন কোন কোষ পরিবর্তিত হইয়া কলসীর আকার ধারণ করে তখন সেই কোষগুলিকে গবলেট কোষ (Goblet cell) বা গ্রন্থি কোষ বলে। উৎসেচক নিঃসরণকারী জাইমোজেন দানার উপস্থিতি ইহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ক্ষরণই ইহার প্রধান কার্য।

অবস্থিতি (Distribution) : মেরুদণ্ডী প্রাণীর পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র প্রভৃতি অঙ্গের অন্তঃআবরণ এই কলা দ্বারা গঠিত।

কার্য (Function) : (i) সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে রক্ষা করে।
(ii) ক্ষরণ ও শোষণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

4. **রোমযুক্ত আবরণী কলা** (Ciliated epithelium) :

গঠন (Structure) : এই কলার কোষগুলি সাধারণত স্তম্ভাকার হয় কিন্তু কোন কোন স্থানে ঘনকাকার হয়। কোষের মুক্ত প্রান্তে 20-30টি সচল সিলিয়া থাকে। সিলিয়ামগুলি কোষপ্রান্তের বেসাল কণা (Basal particles) হইতে উত্থিত হয় এবং পরে সাইটোপ্লাজম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই অঞ্চলটি রুটলেট (Rootlet) নামে পরিচিত।

অবস্থিতি (Distribution) : শ্বাসনালী, ফ্যালোপিয়ান নালী, জরায়ু, শুক্রাশয়ের বহির্বাহী নালী (Efferent tubules of testis) প্রভৃতির অন্তঃগাত্রে এই জাতীয় কলা অবস্থিত।

শ্বাসনালীর মধ্যে রোমযুক্ত আবরণী কলার দুইটি স্তর থাকে। ভিতরের দিকের স্তরটি রোমবিহীন (non-ciliated) এবং বাহিরের দিকের স্তরটি রোমযুক্ত (ciliated) কোষ দ্বারা গঠিত। রোমবিহীন কোষস্তর হইতে রোমযুক্ত কোষস্তর উৎপন্ন হয়। এইরূপ কলাকে ছদ্মস্তরীভূত স্তম্ভাকার রোমযুক্ত (Pseudo-stratified columnar ciliated) আবরণী কলা বলে।

কার্য (Function)—এই ধরনের কলার রোমগুলির অনবরত বিচলনের জন্য শ্লেষ্মা, বিজাতীয় কণা, তরল পদার্থ ইত্যাদি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়।

5. **গ্রন্থিময় আবরণী কলা** (Glandular epithelium) :

গঠন (Structure)—এই কলা একপ্রকার বিশেষ ধরনের কোষ লইয়া গঠিত। কোষগুলি সাধারণত ঘনকাকার, স্বল্প দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট স্তম্ভাকার এবং অনেক সময় বহুতলীয় হয়। কোষগুলি একটি ভিত্তি পর্দার উপর একটি স্তরে সজ্জিত থাকে। এই কলা এককোষীয় বা বহুকোষীয় গ্রন্থি সৃষ্টি করে। এক-কোষীয় স্তম্ভাকার এবং বহুকোষীয় গ্রন্থির লোমস্তর ক্রমশ ভাঁজ হইয়া নলের ন্যায় বা থলির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্ত্রের অন্তঃগাত্রে বহু সংখ্যায় এককোষীয় গবলেট কোষ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কেঁচোর

ত্বকে এককোষী গ্রন্থি থাকে। বহুকোষীয় গ্রন্থি হইল স্তনগ্রন্থি, ঘর্মগ্রন্থি, লালা-গ্রন্থি, থাইরয়েড, পিটুইটারী ইত্যাদি।
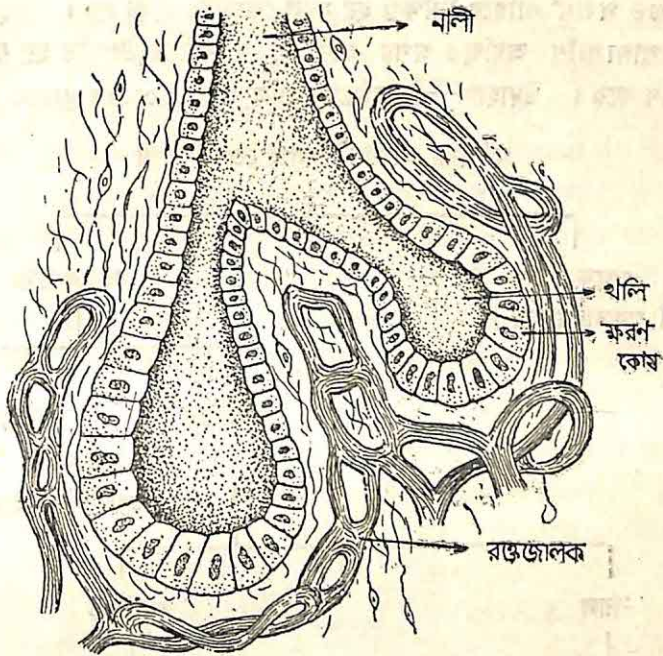
চিত্র 4.16 : গ্রন্থি কোষের গঠন

অবস্থান (Location) : এই জাতীয় কলা ঘর্মগ্রন্থি, স্তনগ্রন্থি, লালাগ্রন্থি, থাইরয়েড, পিটুইটারী, অগ্ন্যাশয়, অন্ত্রের গ্রন্থিতে দেখিতে পাওয়া যায়।
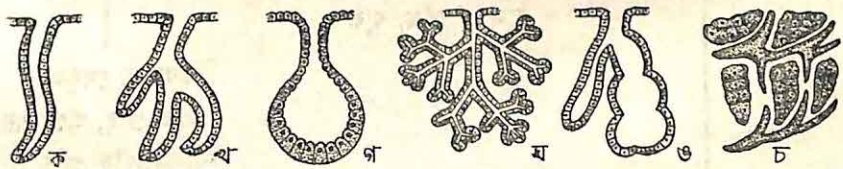
চিত্র 4.17 : বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থি : (ক) সরল নলাকৃতি, (খ) যৌগিক নলাকৃতি, (গ) সরল থলি আকৃতি, (ঘ) যৌগিক নলাকৃতি, (ঙ) নলাকৃতি থলি আকৃতি, (চ) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি

কার্য (Function) : বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থিরস উৎপাদন ও ক্ষরণ করা ইহার অন্যতম কার্য।

ক্ষরণের পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রন্থিময় আবরণী কলাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(i) হলোক্রিন গ্রন্থি, (ii) অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি, (iii) মেরোক্রিন গ্রন্থি।

(i) **হলোক্রিন গ্রন্থি** (Holocrine gland)—এই ধরনের গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত পদার্থ গ্রন্থিকোষের মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। পরে কোষটি ফাটিয়া কোষ মধ্যস্থ সঞ্চিত পদার্থ বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় ফলে কোষটির মৃত্যু হয়। পুনরায় উক্ত কোষের পাশাপাশি অবস্থিত অপর একটি নূতন কোষের উৎপত্তি হয় যাহা একই-ভাবে ক্ষরণ করে। উদাহরণ—সিবেসিয়াস গ্রন্থি (Sebaceous gland)।
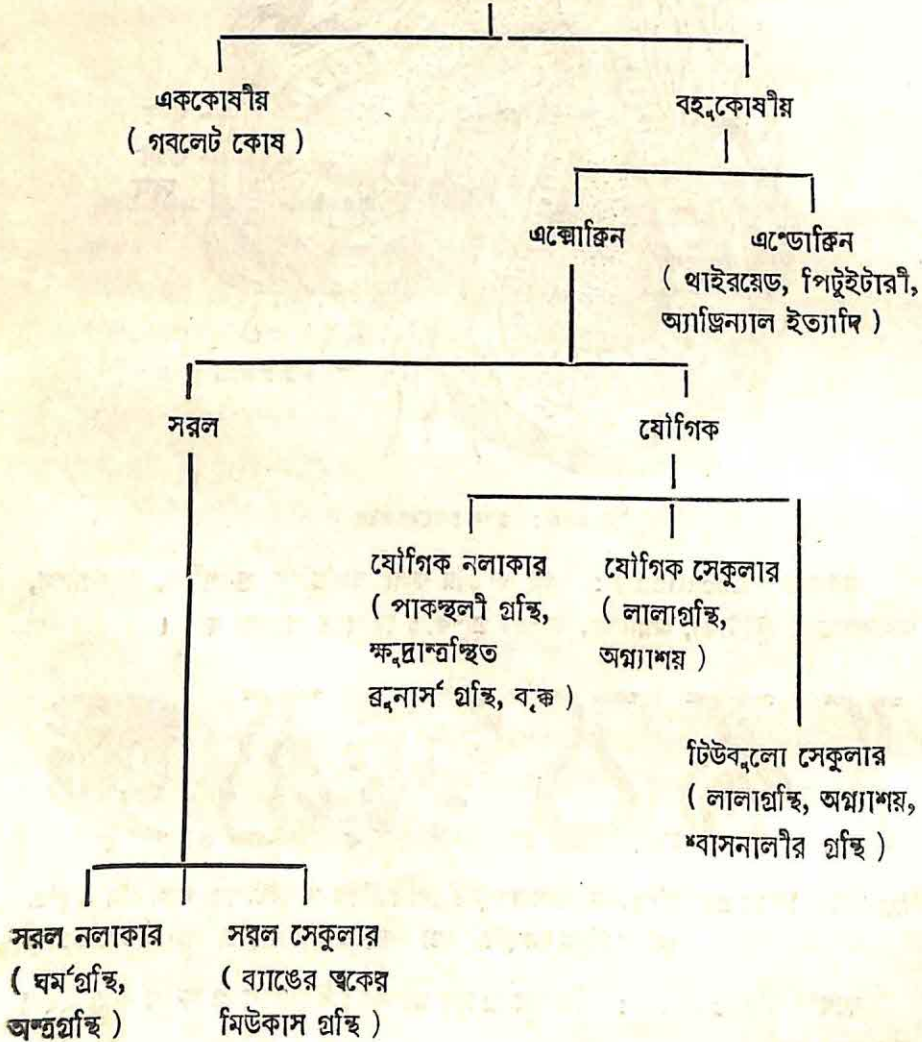
(ii) **অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি** (Apocrine gland)—এই জাতীয় গ্রন্থিকোষে ক্ষরিত পদার্থ কোষের উপরিভাগে সঞ্চিত হইতে থাকে। তারপর উক্ত অংশ ক্রমাগত স্ফীত হয় এবং পরে কোষটির উপরিভাগ ফাটিয়া সঞ্চিত পদার্থ কোষের বাহিরে

নিক্ষিপ্ত হয়। অতঃপর কোষটির উপরিভাগ পুনর্গঠিত হইয়া একই কোষ বারবার ক্ষরণ করিতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোষটির মৃত্যু ঘটে না। উদাহরণ—স্তনগ্রন্থি (Mammary gland)।

(iii) মেরোক্রিন বা এপিক্রিন গ্রন্থি (Merocrine or Epicrine gland)—এই ধরনের গ্রন্থির কোষে কোন পরিবর্তন হয় না। গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত পদার্থ কোষ আবরণী ভেদ করিয়া কোষের বাহিরে আসে। উদাহরণ—লালাগ্রন্থি (Salivary gland), অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine gland)।

4.3·2 যৌগিক বা স্তরীভূত আবরণী কলা (Compound or Stratified epithelial tissue) : এই প্রকার আবরণী কলার কোষগুলি একাধিক স্তরে সজ্জিত থাকে এবং সর্বনিম্ন স্তরটি ভিত্তি পর্দার উপর সজ্জিত। স্তরীভূত আবরণী কলা পাঁচ প্রকার— (i) পরিবর্তনসূচক, (ii) কঠিন আঁইশাকার, (iii) অকঠিন আঁইশাকার, (iv) স্তম্ভাকার, (v) স্তম্ভাকার রোমযুক্ত।

1. পরিবর্তনসূচক স্তরীভূত আবরণী কলা (Stratified Transitional epithelium) :

গঠন (Structure) : এই ধরনের কলা তিন-চারিটি কোষস্তর লইয়া গঠিত। উপরি স্তরের কোষগুলি বৃহদাকার, চ্যাপ্টা ও চতুর্ভুজাকৃতি বিশিষ্ট। এই স্তরের

চিত্র 4.18 : স্তরীভূত আবরণী কলা

প্রতিটি কোষে একটি, কোন কোন সময় দুইটি নিউক্লিয়াস বর্তমান। মাঝের স্তরের কোষগুলির এক প্রান্ত গোলাকৃতি ও অন্য প্রান্ত সূচালো হয়। এইরূপ কোষকে

পাইরিফর্ম কোষ (Pyriform cells) বলে। সর্বনিম্ন স্তরের কোষগুলি বহুতলীয় (Polyhedral cells)।

অবস্থান (Location) : এই কলা প্রধানত বৃক্কের পেলভিস, মূত্রনালী, মূত্রথলী (Urinary bladder) প্রভৃতি স্থানে থাকে।

কার্য (Function) : (i) রেচন নালীকে রক্ষা করে।
(ii) মূত্রের ক্ষতিকারক পদার্থকে পুনঃশোষণে বাধা দেয়।
(iii) জল ও অন্যান্য পদার্থ যাতায়াতে বাধা দেয়।

2. স্তরীভূত কঠিন আঁইশাকার আবরণী কলা (Stratified squamous cornified epithelium) :

গঠন (Structure) : এই কলা অনেকগুলি কোষস্তর লইয়া গঠিত। উপরিভাগের কোষস্তরে কেরাটিন (Keratin) নামক একপ্রকার প্রোটিন পদার্থ সঞ্চিত হওয়ার ফলে কঠিন আকার ধারণ করে। উক্ত স্তরের কোষগুলির চাপে পিষ্ট হইয়া পরবর্তী দুই বা তিনটি কোষস্তরের কোষগুলি চ্যাপ্টা ও পাতলা হয় এবং আঁশের মত সজ্জিত থাকে। সর্বনিম্ন স্তরের কোষগুলি স্বল্প দৈর্ঘ্য ও স্তম্ভাকার। এই কোষগুলি কাঁটার ন্যায় এবং ইহা কণ্টক কোষ (Prickle cell) নামে পরিচিত।

অবস্থান (Location) : দেহত্বক, কেশ, নখ, ক্ষুর, শিং, দাঁতের এনামেল প্রভৃতিতে এই কলা থাকে।

কার্য (Function) : (i) প্রাণীকে আত্মরক্ষায় সহায়তা করে।
(ii) ঘর্ষণ এবং যান্ত্রিক চাপ হইতে রক্ষা করে।

3. স্তরীভূত অকঠিন বা কোমল আঁইশাকার আবরণী কলা (Stratified squamous non-cornified epithelium) :

গঠন (Structure) : এই ধরনের কলার উপরিভাগের কোষস্তরে কেরাটিন থাকে না বলিয়া ইহা কোমল। অন্যান্য কোষস্তর কঠিন আঁইশাকার আবরণী কলার ন্যায়।

অবস্থান (Location) : মুখগহ্বর, গলবিল, গ্রাসনালী, মূত্রনালীর নিম্নাংশ, যোনিপথ, চোখের কর্ণিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কার্য (Function) : ঘর্ষণজনিত আঘাত হইতে ভিতরের কোমল অংশকে রক্ষা করে।

4. স্তরীভূত স্তম্ভাকার আবরণী কলা (Stratified columnar epithelium)

গঠন (Structure) : এই জাতীয় কলার উপরিস্তরের কোষগুলি স্তম্ভাকার, বৃহৎ এবং নিম্নস্তরের কোষগুলি ক্ষুদ্র ও স্বল্প দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট।

অবস্থান (Location) : গলবিল, আলজিহ্বা (Epiglottis), পুরুষের মূত্রনালীর প্রশস্ত অংশে এই কলা থাকে।

কার্য (Function) : এই জাতীয় কলা যান্ত্রিক ঘর্ষণের বিরুদ্ধে দেহের অঙ্গকে রক্ষা করে।

5. **স্তরীভূত স্তম্ভাকার রোমযুক্ত আবরণী কলা** (Stratified columnar ciliated epithelium)

গঠন (Structure) : এই ধরনের কলা অনেকগুলি কোষস্তর লইয়া গঠিত। উপরিস্তরের কোষগুলি রোমযুক্ত (ciliated)।

অবস্থান (Location) : ল্যারিংক্সের কোন কোন স্থানে, শ্বাসনালীতে এই জাতীয় কলা থাকে।

কার্য (Function) : যান্ত্রিক ঘর্ষণের বিরুদ্ধে কার্য করে।

4.3·3 **সংবেদনশীল আবরণী কলা** (Sensory epithelium) : এই ধরনের কলার বাহিরের মুক্ত প্রান্তে সূক্ষ্ম সংজ্ঞাবাহী রোম বা সিলিয়া থাকে। কোষগুলির নিম্নপ্রান্ত সংজ্ঞাবাহী স্নায়ুর সহিত যুক্ত থাকে। এই প্রকার আবরণী কলাকে সংবেদনশীল আবরণী কলা বলে। নাক, জিহ্বা, চর্মে এই ধরনের কলা থাকে। ইহা স্বাদ, ঘ্রাণ, তাপ, চাপ, স্পর্শ প্রভৃতি অনুভূতি গ্রহণ করে।

4.4 যোগ কলা বা যোজক কলা (Connective tissue)

সংজ্ঞা (Definition) : **যে কলা দেহের বিভিন্ন কলা ও অঙ্গসমূহের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে এবং দেহ অঙ্গের ভার বহন করে তাহাকে যোগ কলা বলে। এই কলা ভ্রূণের মেসোডার্ম কোষস্তর হইতে উৎপন্ন হয়।**

বৈশিষ্ট্য—

(i) যোগ কলা প্রধানত ম্যাট্রিক্স বা ধাত্র বা ভূমিবস্তু ও তন্তুদ্বারা গঠিত।

(ii) এই কলায় কোষের সংখ্যা কম এবং ইহারা ঘন সন্নিবিষ্ট নয়।

(iii) ভিত্তি পর্দা থাকে না কিন্তু কোষান্তর পদার্থের আধিক্য দেখা যায়।

(iv) ধাত্র বা ভূমিবস্তু তরল থেকে কঠিন হইতে পারে।

(v) যোগ কলায় প্রধানত দুই প্রকার কোষ থাকে—ফাইব্রোব্লাস্ট নামক স্থির কোষ এবং ভ্রাম্যমাণ কোষ।

যোগ কলায় কোষের প্রকারভেদ (Different types of cells in connective tissue) : যোগ কলায় যে সকল কোষ দেখা যায় তাহাদের মধ্যে হিস্টিওসাইট, ফাইব্রোব্লাস্ট, প্লাজমাকোষ, চর্বিকোষ, রঞ্জককোষ, জালকাকার কোষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে স্থির কোষ হইল ফাইব্রোব্লাস্ট এবং অন্যগুলি ভ্রাম্যমাণ কোষ।

(i) ফাইব্রোব্লাস্ট বা ফাইব্রোসাইট বা স্থির কোষ (Fibroblast or Fibrocyte cell) : যোগ কলায় এই কোষের সংখ্যাই বেশী। ইহারা শাখা-প্রশাখাযুক্ত, অনিয়মিত, লম্বা, চ্যাপ্টা, তারকাকৃতি বা মাকুর ন্যায়। সাইটোপ্লাজম স্বচ্ছ, ক্ষারধর্মী, নিউক্লিয়াস ছোট, গোলাকার বা ডিম্বাকার। সাত প্রকার কোষের মধ্যে ইহারা একমাত্র স্থির কোষ।
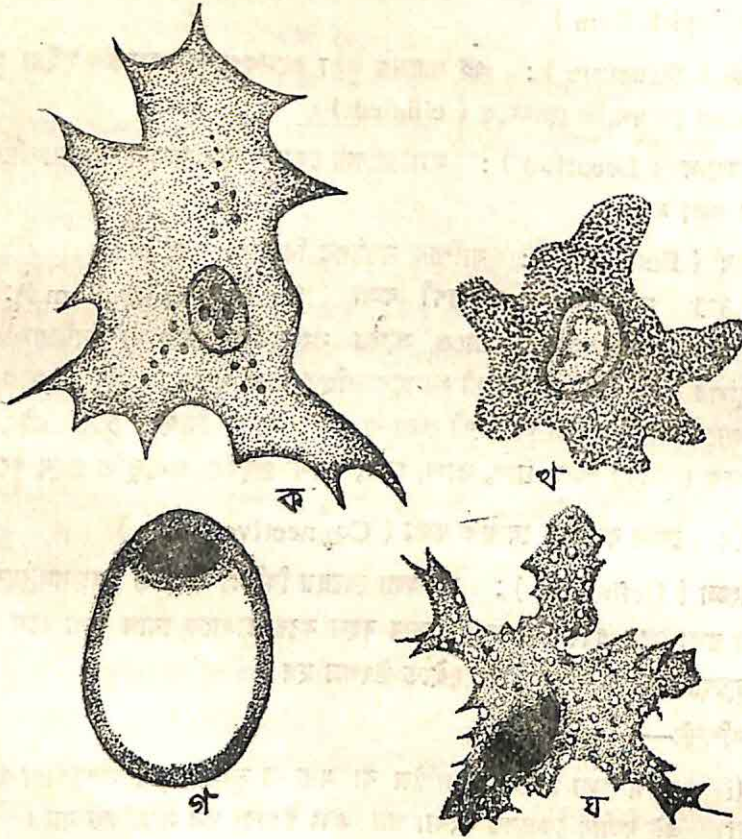
চিত্র 4.19 : যোগ কলার বিভিন্ন প্রকার কোষ : (ক) ফাইব্রোব্লাস্ট, (খ) মাস্ট কোষ, (গ) চর্বি কোষ, (ঘ) হিস্টিওসাইট,

(ii) হিস্টিওসাইট কোষ (Histiocyte cell) : কোষগুলি বৃহদাকার, শাখা-প্রশাখাযুক্ত। কোষের পরিধি অনিয়মিত। ইহা রেটিকিউলো-এন্ডোথেলিয়াম তন্ত্রের (Reticulo-Endothelial System) অন্তর্গত। সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত ও ক্ষারধর্মী, নিউক্লিয়াস এক বা একাধিক। আগ্রাসন ক্ষমতা থাকায় ইহারা বিভিন্ন প্রকার বহিরাগত রোগজীবাণু আত্মসাৎ করে এবং নিজ দেহ হইতে প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক ক্ষরণ করিয়া তাহাদের ধ্বংস করে।

(iii) **প্লাজমা কোষ** (Plasma cell) : কোষগুলি বৃহদাকার, ডিম্বাকৃতি, ক্ষুদ্রাকার নিউক্লিয়াসটি কোষের একপ্রান্তে অবস্থিত। সাইটোপ্লাজম দানাবিহীন, ক্ষারধর্মী। ক্রোমাটিন বস্তুগুলি নিউক্লিয়াসে সাইকেলের চাকার ন্যায় সজ্জিত থাকে। প্লাজমা কোষ গামা-গ্লোবিউলিন (γ-globulin) নামক অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে।

(iv) **চর্বি কোষ** (Fat cell) : কোষগুলি বৃহদাকার, গোলাকার বা ডিম্বাকার। কোষগহ্বর চর্বি বা স্নেহ পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। চর্বির আধিক্যের জন্য নিউক্লিয়াস কোষের একপ্রান্তে সরিয়া যায়।

(v) **মাস্ট কোষ** (Mast cell) : এই ধরনের কোষগুলি গোলাকার, নিউক্লিয়াস ছোট, সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত এবং ক্ষারীয় রঞ্জক পদার্থে রঞ্জিত হইতে দেখা যায়। কোষগুলি হেপারিন, হিস্টামিন এবং সেরোটোনিন নামক রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে।

(vi) **রঞ্জক কোষ** (Pigment cell) : রঞ্জক কোষগুলি ক্ষুদ্রাকার, শাখা-প্রশাখা সমন্বিত। ত্বকসংলগ্ন যোগ কলায় ইহা থাকে। কোষে মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে, ফলে কালো দেখায়। ত্বকে মেলানিন না থাকিলে ত্বক বর্ণ-হীন হয়। ইহা ছাড়া অনেক সময় হলুদ বর্ণের রঞ্জক পদার্থ থাকে। উহাদের জ্যান্থোফোর (Xanthophore) বলে।

(vii) **জালকাকার কোষ** (Reticulocyte) : এই কোষগুলি নক্ষত্রের মত দেখিতে এবং ইহা হইতে জালিকা তন্তু উৎপন্ন হয়।

উপরি-উক্ত কোষগুলি ব্যতীত যোগ কলায় নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল, বেসো-ফিল, লিম্ফোসাইট প্রভৃতি শ্বেতকণিকা থাকে।

যোগ কলায় তন্তুর প্রকারভেদ (Different types of fibres in connective tissue) : যোগ কলায় তিন প্রকার তন্তু দেখা যায়। যথা—শ্বেত তন্তু, হরিদ্রাভ স্থিতিস্থাপক তন্তু ও জালিকাকার তন্তু।

(a) **শ্বেত তন্তু বা কোলাজেনাস ফাইবার** (White fibres or Collagenous fibre) : এই প্রকার তন্তুগুলি শাখা-প্রশাখাবিহীন, সাদা। তন্তুগুলি সাধারণত গুচ্ছাকারে অনিয়মিত ঢেউয়ের ন্যায় অবস্থান করে। ইহারা কোমল, নমনীয় এবং ইহাদের স্থিতিস্থাপকতা নাই। কোলাজেন নামক প্রোটিন দ্বারা এই তন্তুগুলি গঠিত বলিয়া ইহাকে কোলাজেন তন্তুও বলে। যোগ কলায় শ্বেত তন্তু বেশী থাকে।

(b) **হরিদ্রাভ স্থিতিস্থাপক তন্তু** (Yellow elastic fibre) : এই তন্তু-গুলি হলুদ বর্ণের, শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া জালকের সৃষ্টি করে। তন্তুগুলি ইলাস্টিন (elastin) নামক প্রোটিন দ্বারা গঠিত। তন্তুগুলি অপেক্ষাকৃত সরু এবং স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশী।

(c) **জালিকাকার তন্তু** (Reticular fibre) : এই তন্তুগুলি অপেক্ষাকৃত

সরু, শাখা-প্রশাখাযুক্ত। এইগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া জালকের সৃষ্টি করে।

যোগ কলার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Connective tissue) : যোগ কলাকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে : (A) **ভ্রূণজ যোগ কলা** (Embryonal connective tissue), (B) **পরিণত যোগ কলা** (Adult connective tissue)। ভ্রূণজ যোগ কলা আবার দুইটি ভাগে বিভক্ত—যথা, মেসেনকাইম ও ঝিল্লি যোগ কলা। অপরপক্ষে, ধাত্র বস্তু বা ম্যাট্রিক্সের প্রকৃতি ও কোষের আকৃতি অনুযায়ী পরিণত যোগ কলাকে নিম্নলিখিত চারটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে :

1. **এরিওলার কলা** (Areolar tissue) :

গঠন (Structure) : এই কলার প্রকৃত কোন আকার নাই। জেলির ন্যায় অর্ধতরল ধাত্র বস্তুতে অসংখ্য কোষ ও তন্তু বিন্যস্ত থাকে। কোষগুলি প্রধানত ফাইব্রোব্লাস্ট নামক স্থির কোষ এবং হিস্টিওসাইট, প্লাজমা কোষ, রঞ্জক কোষ, মাস্ট কোষ প্রভৃতি ভ্রাম্যমাণ কোষ। তন্তুগুলি দুই ধরনের—শ্বেত তন্তু ও পীত তন্তু।

অবস্থান (Location) : সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং মানুষের পেশী, রক্ত-নালীর প্রাকার, স্নায়ুর আবরণ, শ্লেষ্মা ঝিল্লি, ত্বকের নিচে এই কলা পাওয়া যায়।
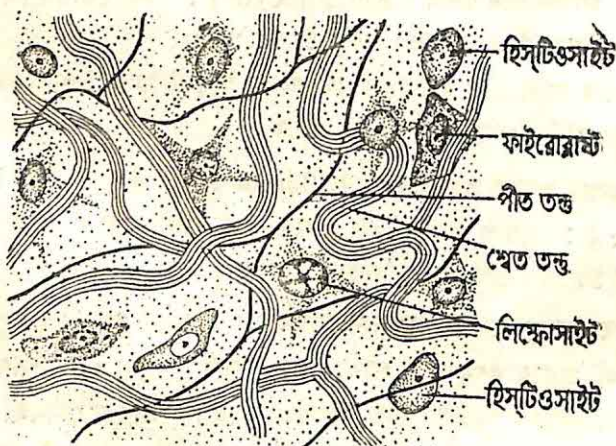
চিত্র 4.20 : এরিওলার যোগ কলা

কার্য (Function) : এই কলা অন্যান্য কলা ও অঙ্গকে পরস্পর যুক্ত করিয়া স্থানচ্যুত হইতে দেয় না বা আঘাত হইতে রক্ষা করে।

তন্তুর আধিক্য অনুযায়ী এই কলা তিন ভাগে বিভক্ত :

(i) **শ্বেত তন্তু কলা** (White fibrous tissue) :

গঠন (Structure) : এই কলায় ধাত্র বস্তুর পরিমাণ অপেক্ষা শ্বেত তন্তুর

পরিমাণ খুব বেশী। এই কলায় নক্ষত্রের ন্যায় কোষ থাকে বলিয়া ইহাদের নক্ষত্র কোষ বলে। এই কলা খুবই শক্ত ও নমনীয় কিন্তু স্থিতিস্থাপক নহে।

অবস্থান (Location) : কণ্ডরা (Tendon), অস্থিবন্ধনী (Ligament) প্রভৃতি এই কলা দ্বারা তৈয়ারি।

কার্য (Function) : এই কলা দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে শক্তভাবে যুক্ত করে। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চাপ ও ভার বহন করে।

(ii) **পীত বা হরিদ্রাভ স্থিতিস্থাপক কলা** (Yellow elastic tissue) :

গঠন (Structure) : এই কলায় পীত তন্তু খুব বেশী থাকে। এই তন্তুগুলি শ্বেত তন্তু অপেক্ষা মোটা এবং শাখা-প্রশাখা যুক্ত হইয়া জালকের সৃষ্টি করে। এই তন্তু ইলাস্টিন নামক প্রোটিন দ্বারা গঠিত এবং স্থিতিস্থাপকতা গুণে সম্পন্ন।

অবস্থান (Location) : শ্বাসনালী, রক্তনালীতে এই জাতীয় কলা থাকে।

কার্য (Function) : অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিশেষভাবে যুক্ত করে। শ্বাস-প্রশ্বাস ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

(iii) **জালিকাকার কলা** (Reticular tissue) :

গঠন (Structure) : এই জাতীয় যোগ কলায় অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে ধাত্র বস্তু এবং প্রচুর পরিমাণে জালিকাকার তন্তু ও কোষ বিদ্যমান। ইহা দেখিতে জালকের ন্যায় বলিয়া এই কলাকে জালিকাকার কলা বলে। এই কলায় জালক কোষগুলির কোষ আবরণী থাকে না এবং কোষের সাইটোপ্লাজম মিশ্রিত অবস্থায় থাকে ও উহার মধ্যে নিউক্লিয়াস বিদ্যমান। এইরূপ বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইটো-প্লাজমীয় বস্তুকে **সিনসিটিয়াম** (Syncitium) বলে।

অবস্থান (Location) : লসিকাগ্রন্থি, প্লীহা, অস্থিমজ্জা, থাইমাস প্রভৃতি স্থানে এই কলা থাকে।

কার্য (Function) : বিভিন্ন অঙ্গের কাঠামো গঠনে অংশগ্রহণ করে। দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াইতে সাহায্য করে।

2. **মেদ কলা** (Adipose tissue) :

গঠন (Structure) : মেদ কলা তন্তু কলার পরিবর্তিত রূপ। ইহার প্রধান উপাদান চর্বি কোষ। এই চর্বিকোষগুলি বেশ বড়, ডিম্বাকার বা গোলাকার হইতে দেখা যায়। প্রতিটি কোষে অধিক পরিমাণে চর্বি থাকার ফলে নিউক্লিয়াস-সহ সাইটোপ্লাজম কোষের এক প্রান্তে অবস্থান করে। নিউক্লিয়াসটি চ্যাপ্টা ধরনের। প্রতিটি কোষ জালকাকৃতি স্থিতিস্থাপক তন্তু দ্বারা আবৃত।

অবস্থান (Location) : মানবদেহের সর্বত্র এই জাতীয় কলা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মেসেনটারী, ত্বকের নিচে, বৃক্কের সন্নিহিত স্থানে, বক্ষে ইত্যাদি অঞ্চলে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

কার্য (Function) :

(i) দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকৃতি দানে সহায়তা করে।
(ii) দেহের আন্তর যন্ত্রকে স্বস্থানে রাখিতে এবং বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করে।
(iii) দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
(iv) কোষের শক্তি সঞ্চয়ে সহায়তা করে।
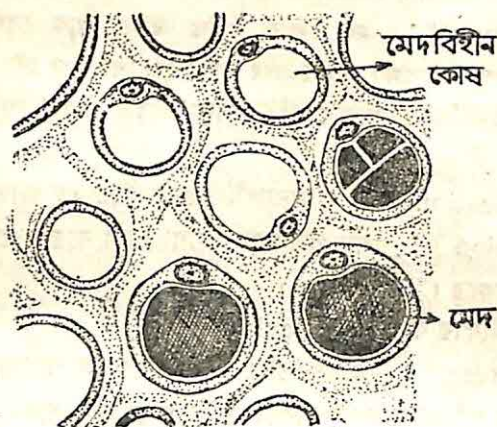
চিত্র 4.21 : মেদ কলা

3. কংকাল কলা (Skeletal tissue) :

কঙ্কাল কলা দেহের সর্বাপেক্ষা কঠিন যোগ কলা। এই কলা প্রাণীর অন্তঃকঙ্কাল গঠনে সাহায্য করে। কঙ্কাল কলা দুই প্রকার—তরুণাস্থি ও অস্থি কলা।

A. তরুণাস্থি (Cartilage) : তরুণাস্থি অপেক্ষাকৃত কঠিন হইলেও এই কলা নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক। স্থিতিস্থাপকতা ও দৃঢ়তার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা তন্তু কলা ও অস্থি কলার মধ্যবর্তী অবস্থা। তরুণাস্থির কোষগুলি কনড্রিন নামক শক্ত ও অর্ধস্বচ্ছ ধাত্র বস্তুতে (Matrix) ছড়ানো থাকে। কোষগুলিকে কনড্রিওব্লাস্ট বা কনড্রোসাইট বলে। ধাত্র বস্তু কনড্রোমিউকয়েড এবং কনড্রোঅ্যালবুমিনয়েড নামক দুই প্রকার প্রোটিন দ্বারা গঠিত। পেরিকনড্রিয়াম নামক তন্তুময় যোগ কলার আবরণ তরুণাস্থিকে বেষ্টন করিয়া রাখে। ধাত্র বস্তু স্বচ্ছ বা তন্তুময় হইতে পারে।

তরুণাস্থি কোষের সংখ্যা ও ধাত্র বস্তুর প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া তরুণাস্থিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—হায়ালিন তরুণাস্থি, স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি ও তন্তুময় তরুণাস্থি।

(i) **হায়ালিন তরুণাস্থি** (Hyaline cartilage) :

গঠন (Structure) : তরুণাস্থি কোষ এবং স্বচ্ছ ধাত্রবস্তু (Matrix) লইয়া হায়ালিন তরুণাস্থি গঠিত। এই ধাত্র বস্তুর মাঝে মাঝে ল্যাকুনা বা ফাঁকা জায়গায় (lacuna) 2-4টি কোষ একত্রে অবস্থান করে। এইভাবে কোষগুলি একত্রে অবস্থান করিবার ফলে কোষগুলি চ্যাপ্টাকৃতি হয় এবং প্রতিটি কোষে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস থাকিতে পারে। কোষের সাইটোপ্লাজমে যেমন প্রচুর পরিমাণে গ্লাইকোজেন থাকে, তেমনি মাইটোকনড্রিয়া, স্নেহবস্তু, গল্গি বডি থাকে। কোষগুলি একটি পুরু তন্তুময় আবরক দ্বারা আবৃত থাকে। এই আবরকটি ক্যাপসুল (capsule) নামে পরিচিত।
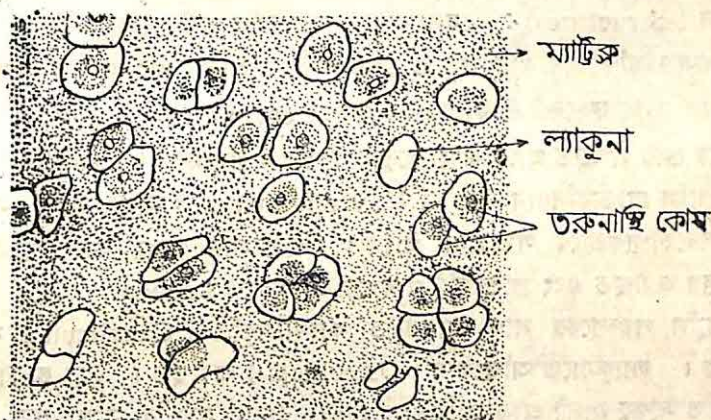
চিত্র 4.22 : হায়ালিন তরুণাস্থির গঠন

অবস্থান (Location) : মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণের সমস্ত কঙ্কাল এই তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত। ইহা ছাড়া পর্শুকার অগ্রভাগ, অস্থিপ্রান্ত, নাক, শ্বাসনালী স্তন্যপায়ী প্রাণীর বহিঃকর্ণ, সামুদ্রিক মাছের অন্তঃকঙ্কাল ইত্যাদি স্থানে এই জাতীয় কলা পাওয়া যায়।

(ii) **স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি** (Elastic cartilage) :

গঠন (Structure) : এই জাতীয় তরুণাস্থির ভিত্তি পদার্থে স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকে। ইহা হালকা হলুদ বর্ণের হয়। ভিত্তি পদার্থে স্থিতিস্থাপক তন্তু ব্যতীত কোলাজেন তন্তু থাকে।

অবস্থান (Location) : বহিঃকর্ণ, আলজিহ্বা, ইউস্টেসিয়ান নালী, স্বরযন্ত্র প্রভৃতি স্থানে ইহা পাওয়া যায়।

(iii) **তন্তুময় তরুণাস্থি** (Fibro cartilage) :

গঠন (Structure) : এই জাতীয় তরুণাস্থিতে কোষের সংখ্যা খুব কম।

ভিত্তি পদার্থের অধিকাংশ স্থানে শ্বেত তন্তুময় তরুণাস্থি ও হরিদ্রাভ স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি অবস্থান করে।

অবস্থান (Location) : আন্তঃকশেরুকার চাক্তি (Intervertebral disc), চোয়ালের সন্ধি, জানুসন্ধির অর্ধচন্দ্রাকৃতি অস্থি প্রভৃতি স্থানে এই জাতীয় তরুণাস্থি থাকে।

তরুণাস্থির কার্যাবলী (Function of cartilage) :

(i) ইহা শরীরের কাঠামো তৈয়ারি করিতে অংশগ্রহণ করে।

(ii) অন্তঃকশেরুকার চাক্তি ও জানুসন্ধির তরুণাস্থি সংশ্লিষ্ট অঙ্গের ঘর্ষণজনিত ক্ষয়রোধ করে।

অস্থি কলা (Bone or Osseous tissue) :

গঠন (Structure) : যোগ কলার মধ্যে অস্থি সর্বাপেক্ষা কঠিনতম কলা। অস্থি প্রধানত অস্থিকোষ, ধাত্র বস্তু ও তন্তু লইয়া গঠিত। ধাত্র বস্তুতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ফসফেট ও কার্বোনেট থাকায় ইহা খুব শক্ত হয়। এই ধাত্র বস্তুগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে এবং প্রত্যেকটি স্তরকে ল্যামেলা (Lamella) বলে। ল্যামেলাগুলি হ্যাভারসিয়ান নালী (Haversian canal) নামক একটি নালীকে ঘিরিয়া সমকেন্দ্রিকভাবে সাজানো থাকে। ল্যামেলার মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট গহ্বর অবস্থিত এবং প্রত্যেকটি গহ্বরকে ল্যাকুনা (Lacuna) বলে। আবার ল্যাকুনাগুলি পরস্পরের সঙ্গে শাখায়িত ক্যানালিকুলি (Canaliculi) নালিকা দ্বারা যুক্ত। ল্যাকুনাতে অস্থিকোষ (Osteoblast) অবস্থিত। ইহা ছাড়া কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম নালী আড়াআড়িভাবে হ্যাভারসিয়ান নালীর সঙ্গে যুক্ত। এই নালীগুলিকে ভল্কম্যান খ্যাত নালী (Volkmann's canals) বলে। হ্যাভারসিয়ান নালী ও ল্যামেলাগুলিকে একত্রে হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র (Haversian system) বলে। প্রতিটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র অপর একটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র হইতে অন্তর্বর্তী ল্যামেলা (Interstitial lamella) দ্বারা পৃথক থাকে। সমগ্র অস্থির চতুর্দিকে একটি তন্তুময় আবরণ থাকে। তাহাকে পেরিঅস্টিয়াম (Periosteum) বলে। অস্থির কেন্দ্রস্থলে লম্বালম্বিভাবে একটি ফাঁপা গহ্বর থাকে যাহা মেডুলারী গহ্বর নামে পরিচিত। এই গহ্বর অস্থিমজ্জা দ্বারা পূর্ণ থাকে। অপর একটি আবরণ মজ্জাগহ্বরকে অস্থি অংশ হইতে পৃথক রাখে, ইহাকে এন্ডোঅস্টিয়াম (Endosteum) বলে।

অস্থিকোষের প্রকারভেদ (Types of bone cells) : অস্থিকোষ প্রধানত তিন প্রকার। যথা—

(i) **অস্টিওসাইট** (Osteocyte) : এই কোষগুলি ল্যাকুনার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কোষগুলি গোলাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি। সাইটোপ্লাজমে গ্লাইকোজেন, চর্বিকণা থাকে।

(ii) **অস্টিওব্লাস্ট** (Osteoblast) : এই কোষগুলি ঘনতলাকার বা পিরামিডাকৃতি। নিউক্লিয়াস বড়, সাইটোপ্লাজম ক্ষারধর্মী এবং ইহাতে মাইটোকন্-ড্রিয়া ও গল্গি বডি থাকে।

(iii) **অস্টিওক্লাস্ট** (Osteoclast) : কোষগুলি বৃহদাকার, সাইটোপ্লাজম দানাদার, ক্ষারধর্মী। কোষের মধ্যে কুড়ি বা ততোধিক নিউক্লিয়াস বর্তমান। ইহার প্রধান কাজ অস্থি হইতে ক্যালসিয়াম ঘটিত লবণ শোষণ করা।
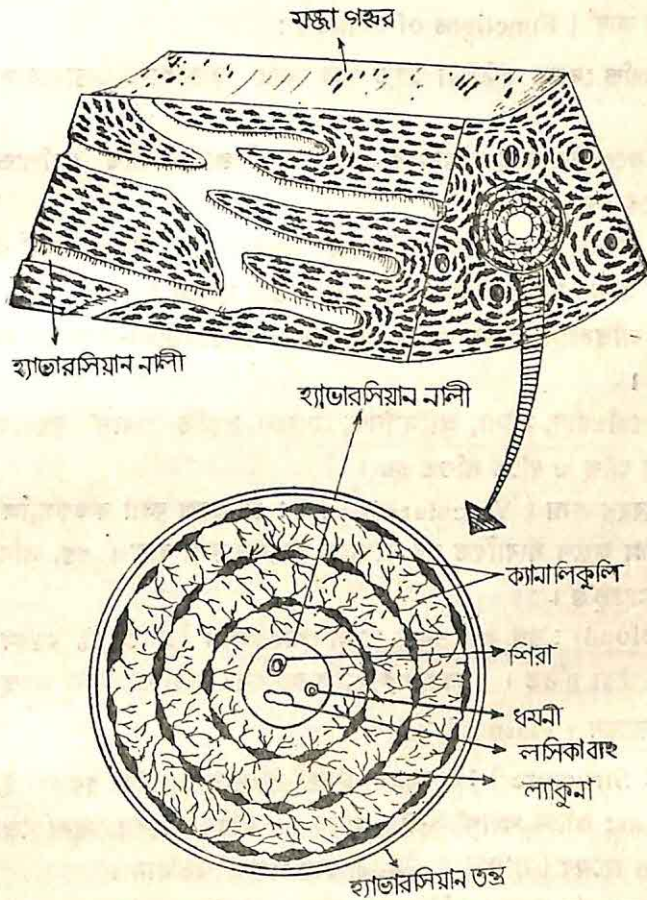
চিত্র 4.23 : লম্বচ্ছেদে দীর্ঘ অস্থির অন্তর্গঠন ও উহার বিবর্ধিত একটি অংশ

অস্থির প্রকারভেদ (Types of bones) : ঘনত্ব ও দৃঢ়তার উপর ভিত্তি করিয়া অস্থি দুই প্রকার। যথা—

(i) **দৃঢ় অস্থি** (Ivory or compact or dense bone) : এই ধরনের লম্বা অস্থির কেন্দ্রস্থলে ফাঁপা অংশ বা মজ্জাগহ্বর বর্তমান এবং অস্থিগাত্রে হ্যাভার-সিয়ান তন্ত্র বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, হাতের হিউমারাস, পায়ের ফিমার প্রভৃতি।

(ii) **স্পঞ্জ অস্থি** (Spongy or Cancellated bone) : এই জাতীয় অস্থিতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কম থাকায় ইহা অপেক্ষাকৃত কম দৃঢ়তাসম্পন্ন হয়। ইহা ছাড়া স্পঞ্জ অস্থির মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রাচীর উপস্থিত থাকায় স্পঞ্জের মত নরম। এই প্রকার অস্থিতে প্রকৃত হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, কশেরুকার অঙ্গ, দীর্ঘ অস্থির প্রান্তদেশ, পাঁজরা জাতীয় চ্যাপ্টা অস্থির ভিতরের অংশ ইত্যাদি।

অস্থির কার্য (Functions of bones) :

(i) অস্থি দেহের কাঠামো সুদৃঢ় করে এবং ভারবহনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

(ii) করোটির অস্থি মস্তিষ্ককে এবং বক্ষঃপিঞ্জরের অস্থি হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি অঙ্গকে রক্ষা করে।

(iii) ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির সঞ্চয় ভাণ্ডার হিসাবে কার্য করে।

(iv) অস্থির সহিত ঐচ্ছিক পেশী ও কণ্ডরা সংযুক্ত থাকে।

(v) অস্থিমজ্জা বিভিন্ন প্রকার রক্তকোষ ও রেটিকিউলো-এণ্ডোথেলিয়াল কোষ উৎপন্ন করে।

(vi) রেডিয়াম, সীসা, আর্সেনিক, ফ্লোরিন প্রভৃতি পদার্থ রক্তপ্রবাহ হইতে পৃথক হইয়া অস্থি ও দাঁতে সঞ্চিত হয়।

4. **সংবহন কলা** (Vascular tissue) : **যে তরল কলা কতকগুলি নালীপথে দেহের বিভিন্ন অংশে সংবাহিত হয় তাহাকে সংবহন কলা বলে।** রক্ত, লসিকা প্রভৃতি এই কলার অন্তর্ভুক্ত।

রক্ত (Blood) : রক্ত এক প্রকার তরল যোগকলা। ইহা 55% রক্তরস ও 45% রক্তকণিকা লইয়া গঠিত। রক্তকণিকাগুলি রক্তরসের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে।

1. **রক্তরস** (Plasma) :

গঠন (Structure) : রক্তরস ঈষৎ হরিদ্রাভ বর্ণের হয়। ইহাতে জল 91-92% এবং কঠিন পদার্থ 8-9% থাকে। কঠিন অংশের মধ্যে জৈব (7·1-8·1%) ও অজৈব (0·9%) উভয় প্রকার পদার্থ বর্তমান।

জৈব পদার্থের মধ্যে প্রোটিন, অপ্রোটিন নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ, গ্লুকোজ, ফ্যাট, বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক, বিলিরুবিন, ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিলিন প্রভৃতি রঞ্জক পদার্থ প্রধান।

অজৈব বস্তুর মধ্যে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, তাম্র ইত্যাদি প্রধান।

রক্তরসের কার্য (Functions of plasma) : বিভিন্ন প্রকার খাদ্য, লবণ, জল, হর্মোন, উৎসেচক, দূষিত পদার্থ ইত্যাদি পরিবহণে প্লাজমা সাহায্য করে।

প্লাজমা রক্ত তঞ্চনে, অভিস্রবণ চাপের সমতা রক্ষায়, অ্যাণ্টিবডি প্রস্তুতে, বাফার হিসাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

রক্ত তঞ্চনের পর জমাট বাঁধা রক্ত হইতে হালকা হলুদাভ যে তরল পদার্থ বাহির হইয়া আসে তাহাকে সিরাম (Serum) বলে।
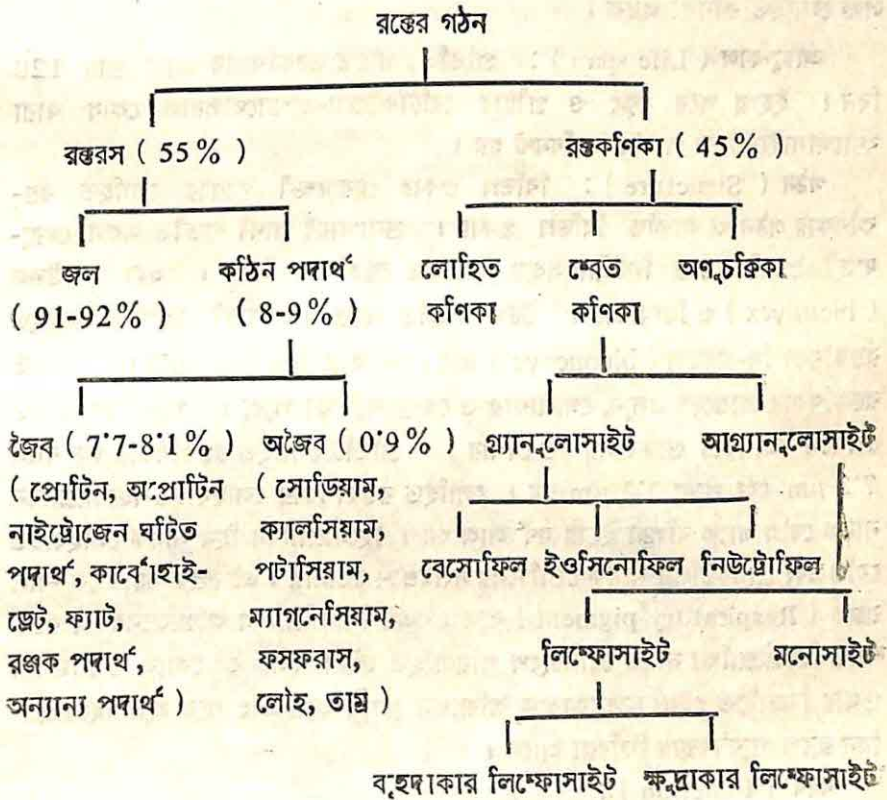
2. রক্তকণিকা (Blood corpuscles) :

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তে তিন প্রকার রক্তকণিকা পাওয়া যায়। যথা—লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের কেবল অ্যামিবার ন্যায় সরল এক প্রকার রক্তকণিকা থাকে। মেরুদণ্ডীদের রক্তকণিকা অস্থির মজ্জায় তৈয়ারি হয় এবং নির্দিষ্ট সময় পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

A. লোহিত রক্তকণিকা (Red blood corpuscle or RBC or Erythrocyte) :

উৎপত্তি (Origin) : জন্মের একমাস পূর্বে যকৃৎ ও প্লীহা হইতে রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়। কিন্তু জন্মের পর অস্থির লোহিত মজ্জায় অবস্থিত হিমোসাইটোব্লাস্ট (Haemocytoblast) হইতে লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়। উৎপত্তিকালে

লোহিত রক্তকণিকা অপরিণত অবস্থায় থাকে এবং এই অবস্থায় নিউক্লিয়াস থাকে। কিন্তু স্তন্যপায়ীর পরিণত লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না।

সংখ্যা (Number) : একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের রক্তে প্রতি ঘন মিলিমিটারে 50 লক্ষ এবং পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকের রক্তে প্রতি ঘন মিলিমিটারে 45 লক্ষ লোহিত কণিকা থাকে।

আয়ুষ্কাল (Life span) : প্রতিটি লোহিত রক্তকণিকার আয়ু প্রায় 120 দিন। ইহার পরে যকৃৎ ও প্লীহার রেটিকিউলো-এণ্ডোথেলিয়াল কোষ দ্বারা ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে বিনষ্ট হয়।

গঠন (Structure) : বিভিন্ন প্রকার মেরুদণ্ডী প্রাণীর লোহিত রক্তকণিকার গঠন ও আকৃতি বিভিন্ন প্রকার। স্তন্যপায়ী প্রাণী ব্যতীত সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তে নিউক্লিয়াসযুক্ত লোহিত রক্তকণিকা থাকে। ইহা দ্বি-উত্তল (biconvex) ও ডিম্বাকার। উট* ব্যতীত সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোহিত রক্তকণিকা দ্বি-অবতল (biconcave) এবং গোলাকার চাকতির ন্যায়। লোহিত রক্তকণিকার প্রান্তদেশ মসৃণ, গোলাকার ও কেন্দ্র অপেক্ষা পুরু। পার্শ্বদেশ হইতে দেখিলে অনেকটা ডাম্বেলের মত দেখায়। প্রতিটি লোহিত রক্তকণিকার গড় ব্যাস 7·2 μm এবং পুরু 2·2 μm হয়। লোহিত রক্তকণিকায় লৌহঘটিত হিমোগ্লোবিন নামক যৌগ থাকে বলিয়া ইহার বর্ণ লাল হয়। হিমোগ্লোবিন হিম নামক লৌহঘটিত যৌগ এবং গ্লোবিউলিন নামক প্রোটিনের সংমিশ্রণে তৈয়ারি। এই রঞ্জক পদার্থকে শ্বাস রঞ্জক (Respiratory pigment) বলে। এই হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সংস্পর্শে অক্সি-হিমোগ্লোবিন নামক যৌগরূপে পরিবাহিত হইয়া কলা ও কোষে পেঁছায়। তথায় বিজারিত হইয়া কলাকোষকে অক্সিজেন প্রদান করে এবং পরে মুক্ত হিমোগ্লোবিন রূপে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে।

কার্য (Function) :

(i) লোহিত রক্তকণিকা হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহণে সহায়তা করে।

(ii) ইহা রক্তের অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের সাম্যাবস্থা রক্ষা করে।

(iii) রক্তের সান্দ্রতা (Viscosity) বজায় রাখিতে সাহায্য করে।

(iv) রক্তের আয়ন সমতা বজায় রাখে।

(v) বিলিরুবিন, বিলিভার্ডিন ইত্যাদি পিত্তরঞ্জক মৃত লোহিত রক্তকণিকা হইতে উৎপন্ন হয়।

---

* উটের লোহিত কণিকা ডিম্বাকার ও নিউক্লিয়াসযুক্ত

$$\mu m = \frac{1}{1000} \text{ millimetre}$$

B. শ্বেত রক্তকণিকা (White blood corpuscles or WBC or Leucocytes)

উৎপত্তি (Origin) : অস্থি মজ্জাস্থিত হিমোসাইটোব্লাস্ট কোষ, প্লীহাস্থিত রেটিকুলোসাইট এবং লসিকাপর্বস্থিত লিম্ফোব্লাস্ট কোষ হইতে শ্বেত কণিকার উৎপত্তি হয়।

সংখ্যা (Number) : মানুষের প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে 6-8 হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। শ্বেত রক্তকণিকা ও লোহিত রক্তকণিকার অনুপাত 1 : 700।
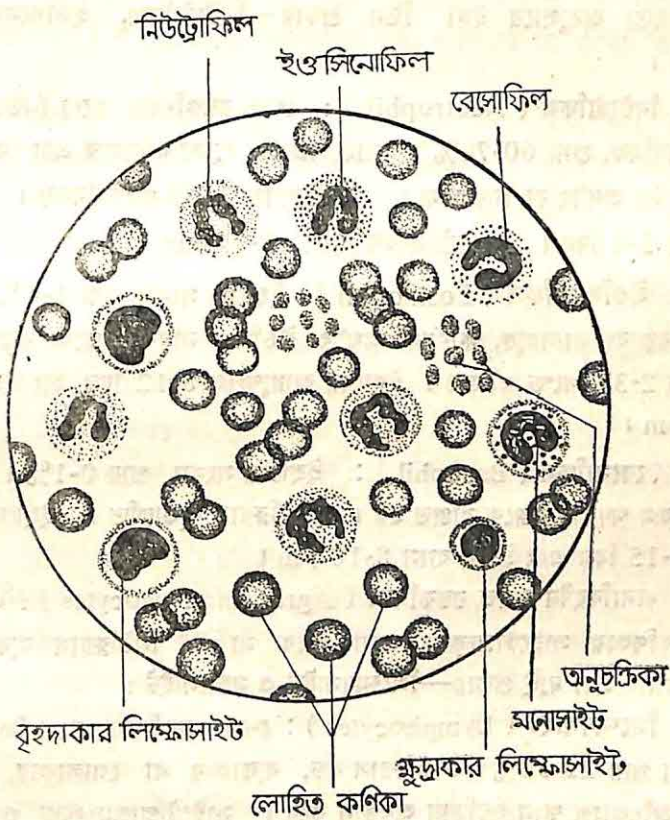
চিত্র 4.24 : মানুষের রক্তকণিকা

আয়ুষ্কাল (Life span) : বিভিন্ন প্রকার শ্বেত রক্তকণিকার আয়ুষ্কাল বিভিন্ন রকম। ইহারা সাধারণত 1-15 দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহাদের আয়ুষ্কাল শেষ হইলে রক্ত সংবহন তন্ত্র বিনষ্ট হয় অথবা রেটিকিউলো-এন্ডোথেলিয়াল কোষ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics) : শ্বেত রক্তকণিকা বর্ণহীন, বৃহৎ নিউক্লিয়াসযুক্ত

এবং ইহাদের অ্যামিবার ন্যায় চলন পরিলক্ষিত হয়। লোহিত রক্তকণিকার তুলনায় রক্তে ইহাদের সংখ্যা খুবই কম।

শ্বেত রক্তকণিকার প্রকারভেদ (Classification of WBC) : আকৃতি ও গঠনগত ভাবে শ্বেত রক্তকণিকাকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয়—দানাদার ও দানাবিহীন শ্বেত রক্তকণিকা।

a. **দানাদার শ্বেত রক্তকণিকা** (Granular leucocytes) : এই শ্রেণীর শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত, নিউক্লিয়াস 2-7টি খণ্ডে বিভক্ত। সাইটোপ্লাজমের বর্ণগ্রহণক্ষমতা অনুসারে ইহা তিন প্রকার—নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল ও বেসোফিল।

(i) **নিউট্রোফিল** (Neutrophil) : শ্বেত রক্তকণিকার মধ্যে নিউট্রোফিলের সংখ্যা সর্বাধিক, প্রায় 60-70%। সাইটোপ্লাজম সূক্ষ্ম দানাযুক্ত এবং কোন রঙে রঞ্জিত হয় না অর্থাৎ রং নিরপেক্ষ। নিউক্লিয়াস 2-7টি খণ্ডে বিভক্ত। ইহাদের আয়ুষ্কাল 2-4 দিন। নিউট্রোফিলের ব্যাস 10-12 μm।

(ii) **ইওসিনোফিল** (Eosinophil) : ইহাদের সংখ্যা প্রায় 1-4%। সাইটোপ্লাজম বড় বড় দানাযুক্ত, ক্ষারধর্মী অর্থাৎ ইওসিন নামক রঞ্জকে রঞ্জিত হয়। নিউক্লিয়াস 2-3টি খণ্ডে খণ্ডিত। ইহাদের আয়ুষ্কাল 8-12 দিন এবং ইহার ব্যাস 10-12 μm।

(iii) **বেসোফিল** (Basophil) : ইহাদের সংখ্যা প্রায় 0-1%। দানাদার সাইটোপ্লাজম ক্ষারীয় রঞ্জকে রঞ্জিত হয়। নিউক্লিয়াস বৃক্কাকৃতি। ইহাদের আয়ুষ্কাল 12-15 দিন এবং ইহার ব্যাস 8-10 μm।

b. **দানাবিহীন শ্বেত রক্তকণিকা** (Agranular leucocytes) : এই প্রকার শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে দানা থাকে না। নিউক্লিয়াস বৃক্কাকার ও গোলাকার। ইহা দুই প্রকার—**লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট**।

(i) **লিম্ফোসাইট** (Lymphocytes) : শ্বেত রক্তকণিকায় মধ্যে লিম্ফোসাইটের সংখ্যা প্রায় 25-30%। নিউক্লিয়াস বড়, বৃক্কাকার বা গোলাকার, সাইটোপ্লাজমের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া অবস্থান করে। সাইটোপ্লাজম স্বচ্ছ ও ক্ষারীয়। ইহা আবার দুই ভাগে বিভক্ত—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র লিম্ফোসাইট। বৃহৎ লিম্ফোসাইটের (Large lymphocyte) গড় ব্যাস 12 μm এবং ক্ষুদ্র লিম্ফোসাইটের (Small lymphocyte) গড় ব্যাস 7·5 μm। ইহাদের আয়ুষ্কাল 2-3 দিন।

(ii) **মনোসাইট** (Monocytes) : মনোসাইট সংখ্যায় 5-10%। ইহাদের নিউক্লিয়াস প্রথম অবস্থায় গোলাকার থাকে এবং পরবর্তী অবস্থায় বৃক্কাকৃতি বা অশ্ব-ক্ষুরাকৃতি হয়। সাইটোপ্লাজম বুদ্বুদযুক্ত (frosted)। ইহার ব্যাস 16-18 μm। ইহাদের আয়ুষ্কাল 2-3 দিন।

শ্বেত রক্তকণিকার কার্যাবলী (Functions of WBC) :

(i) **আগ্রাসন** (Phagocytosis) : দেহের কোন অংশ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইলে শ্বেত রক্তকণিকাস্থিত গ্র্যানিউলোসাইট ও মনোসাইট জীবাণুগুলিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া বিনষ্ট করে। এই পদ্ধতিকে আগ্রাসন বলে। জীবাণুগুলি বিনষ্ট হইবার পর দেহকোষ ও শ্বেত রক্তকণিকা পুঁজ (Pus) রূপে বাহির হইয়া যায়।

(ii) **অ্যান্টিবডি উৎপাদন** (Antibody formation) : লিম্ফোসাইট হইতে γ-গ্লোবিউলিন নামক অ্যান্টিবডি উৎপাদন করিয়া দেহের প্রতিরক্ষায় সহায়তা করে।

(iii) **ফাইব্রোব্লাস্ট উৎপাদন** (Fibroblast formation) : দেহের প্রদাহ অঞ্চলে লিম্ফোসাইট ফাইব্রোব্লাস্টে রূপান্তরিত হয় এবং দেহের মেরামতির কার্যে সাহায্য করে।

(iv) **হেপারিন ক্ষরণ** (Heparin secretion) : বেসোফিল হেপারিন ক্ষরণ করিয়া রক্তনালীর অভ্যন্তরের রক্তকে জমাট বাঁধিতে বাধা দেয়।

(v) **অ্যালার্জিবিরোধী কার্য** (Anti-allergy function) : ইওসিনোফিলস্থিত হিস্টামিন দেহের অ্যালার্জিবিরোধী কার্যে সাহায্য করে।

(vi) **ট্রিফোন** (Trephones) : শ্বেত রক্তকণিকা প্লাজমা প্রোটিন হইতে ট্রিফোন নামক রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে। ইহা কলা কোষের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও সংস্কারের কার্যে সহযোগিতা করে।

অণুচক্রিকা (Thrombocytes) :

উৎপত্তি (Origin) : অস্থিমজ্জার মেগাক্যারিওসাইট হইতে অণুচক্রিকা উৎপন্ন হয়।

গঠন (Structure) : অণুচক্রিকাগুলি সবচেয়ে ছোট ও নিউক্লিয়াসবিহীন কোষ। ইহা গোলাকার বা ডিম্বাকার এবং উভতল চাকতিবিশেষ (biconvex)। ইহার ব্যাস 4-5 μm। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা প্রায় 2·5-4·5 লক্ষ। ইহার আয়ুষ্কাল প্রায় 5-9 দিন। আয়ুষ্কাল শেষ হইলে ইহারা প্লীহা অথবা অন্য অঙ্গের রেটিকিউলো-এন্ডোথেলিয়াল কোষ দ্বারা বিনষ্ট হয়।

কার্য (Function) : (i) অণুচক্রিকার প্রধান কার্য রক্ততঞ্চনে সহায়তা করা। রক্ততঞ্চনের সময় ইহা বিনষ্ট হইয়া থ্রম্বোপ্লাস্টিন নামক পদার্থ মুক্ত করে যাহা প্রোথ্রম্বিনের সহিত যুক্ত হইয়া থ্রম্বিনে রূপান্তরিত হয়। ফলে কাটা স্থানে রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায়।

(ii) বিনষ্ট অণুচক্রিকা হইতে হিস্টামিন ও 5-হাইড্রক্সিট্রিপ্টামিন জাতীয় পদার্থ নির্গত করিয়া রক্তবাহের সংকোচন ঘটাইতে সাহায্য করে। ফলে রক্তপাত বন্ধ হইয়া যায়।

(iii) অণুচক্রিকা রক্তজালিকার ক্ষতিগ্রস্ত অন্তঃআবরণী পর্দার গায়ে আটকাইয়া ক্ষতস্থান দ্রুত মেরামত করিতে সহায়তা করে।

লসিকা (Lymph) :

উৎপত্তি (Origin) : রক্তজালকের মধ্য দিয়া রক্ত চলাচলের সময় জালক-প্রাচীর ভেদ করিয়া কিছু রক্তরস কলান্তানে (Tissue space) প্রবেশ করে। কিন্তু উহার অধিকাংশ পুনরায় রক্তে ফিরিয়া আসিলেও কিছু অংশ কলান্তানে কলারস-রূপে থাকিয়া যায়। এই কলারসকে **লসিকা (Lymph)** বলে। সুতরাং লসিকা হইল পরিবর্তিত কলারস।

গঠন (Structure) : লসিকা একপ্রকার তরল যোগ কলা। ইহাতে রক্তের প্লাজমার মত সকল উপাদান থাকে কিন্তু প্রোটিনের পরিমাণ প্লাজমা হইতে কিছু কম। ইহার জলীয় অংশ 94% এবং কঠিন অংশ 6%। কঠিন অংশের মধ্যে প্রোটিন (অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন), শর্করা, স্নেহপদার্থ (Fat), সামান্য পরিমাণ ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক থাকে। লসিকার মধ্যে শর্করা, ক্লোরাইড ও ফসফরাসের পরিমাণ রক্তের প্লাজমা অপেক্ষা বেশী। ইহা ব্যতীত ইহার মধ্যে অসংখ্য শ্বেত রক্তকণিকা প্রধানত লিম্ফো-সাইট বর্তমান। লসিকার মধ্যে অণুচক্রিকা অনুপস্থিত কিন্তু অতি অল্প পরিমাণ ফাইব্রিনোজেন থাকায় কাটা স্থানে ইহা ধীরে ধীরে জমাট বাঁধে।

কার্য (Function) : (i) দেহের যে সকল কলাকোষে রক্ত পেঁছাইতে পারে না লসিকা সেখানে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ করে।

(ii) লসিকাস্থিত লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করিয়া দেহের প্রতিরক্ষা কার্যে সহায়তা করে।

রক্ত ও লসিকার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Blood and Lymph)

	রক্ত		লসিকা
1.	রক্ত 55 শতাংশ প্লাজমা নামক তরল অংশ এবং 45 শতাংশ কোষ দ্বারা গঠিত।	1.	লসিকা 94 শতাংশ জল এবং 6 শতাংশ কঠিন পদার্থ দ্বারা গঠিত।
2.	লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্ত-কণিকা ও অণুচক্রিকা থাকে।	2.	বিভিন্ন প্রকার শ্বেত রক্তকণিকা বিশেষত লিম্ফোসাইটের প্রাধান্য দেখা যায়। এছাড়া কিছু লোহিত রক্তকণিকা লক্ষ্য করা যায়।
3.	প্লাজমায় প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ লসিকা	3.	প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফস-ফরাসের পরিমাণ রক্ত অপেক্ষা

রক্ত	লসিকা
অপেক্ষা বেশি। শর্করা ও ক্লোরাইডের পরিমাণ লসিকা অপেক্ষা কম।	কম। তবে শর্করা ও ক্লোরাইডের পরিমাণ রক্ত অপেক্ষা বেশি।
4. রক্ত কোষে কোষে সরল খাদ্য-বস্তু ও অক্সিজেন সরবরাহ করে।	4. দেহের যে সব কলা কোষে রক্ত পেঁছাইতে পারে না, লসিকা সেখানে সরল খাদ্যবস্তু ও অক্সিজেন সরবরাহ করে।
5. দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে।	5. অন্ত্র হইতে স্নেহ পদার্থ শোষণ করে।

আবরণী কলা ও যোগ কলার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Epithelial tissue and Connective tissue)

আবরণী কলা	যোগ কলা
1. এই কলার কোষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট এবং ভিত্তিপর্দা নামক একটি সূক্ষ্ম পর্দার উপর এক বা একাধিক স্তরে সজ্জিত।	1. কোষের সংখ্যা কম এবং ঘনসন্নিবিষ্ট নয়। ভিত্তিপর্দা অনুপস্থিত।
2. কোষসমূহের মধ্যে কোষান্তর স্থান প্রায় থাকে না।	2. কোষান্তর পদার্থের পরিমাণ বেশী।
3. সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে রক্ষা করা এই কলার প্রধান কাজ।	3. বিভিন্ন কলা ও অঙ্গকে যুক্ত করা এবং আঘাত থেকে রক্ষা করা এই কলার প্রধান কাজ।

মানুষের রক্তের শ্রেণী (Blood group of the human) : মানুষের দেহে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্তের প্রয়োজন। রক্তপাত, আঘাত, অস্ত্রোপচার, রক্তাল্পতা, রক্তে বিষক্রিয়া ইত্যাদি কারণে রক্তের পরিমাণ হ্রাস পাইলে বাহির হইতে রক্তপ্রদানের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাহির হইতে শিরার মাধ্যমে রোগীর দেহে রক্ত প্রবেশ করানোকে **রক্তপ্রদান** (Blood transfusion) বলে। তবে রক্তপ্রদান করিবার পূর্বে রোগীর দেহের রক্ত এবং 'ব্লাড ব্যাঙ্ক' বা কোন দাতার রক্ত পরীক্ষা করা বিধেয়। তাহা না হইলে রোগীকে বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়, এমন কি রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে।

রক্তের শ্রেণীবিভাগ : মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় অ্যান্টিজেন এবং প্লাজমায় অ্যান্টিবডির উপস্থিতির ও অনুপস্থিতির ভিত্তিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানী

ল্যাণ্ডস্টাইনার (Landsteiner) রক্তকে A, B, AB, এবং O এই চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। ইহা ABO রক্তগ্রুপ নামে পরিচিত।

রক্তের লোহিত কণিকায় A ও B এই দুই প্রকার বা উভয় প্রকার অ্যাণ্টিজেন বা অ্যাগ্লুটিনোজেন থাকে। আবার প্লাজমায় α ও β এই দুই প্রকার বা উভয় প্রকার অ্যাণ্টিবডি বা অ্যাগ্লুটিনিন থাকে। কোন মানুষের রক্ত A গ্রুপের হইলে তাহার রক্তের লোহিত কণিকায় A অ্যাণ্টিজেন এবং প্লাজমায় β অ্যাণ্টিবডি থাকে। এই গ্রুপের রক্তের প্লাজমায় যদি β অ্যাণ্টিবডির পরিবর্তে α অ্যাণ্টিবডি থাকে তাহা হইলে একই প্রকার অ্যাণ্টিজেন ও অ্যাণ্টিবডি বিক্রিয়া করিয়া রক্ত জমাট বাঁধিয়া যাইবে। ফলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। এইজন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির লোহিত রক্ত-কণিকায় যে ধরনের অ্যাণ্টিজেন থাকিবে তাহার বিপরীত অ্যাণ্টিবডি প্লাজমায় থাকে।

রক্তের গ্রুপ	রক্তের লোহিত কণিকায় অ্যাণ্টিজেন	রক্তের প্লাজমায় অ্যাণ্টিবডি
A	A	β
B	B	α
AB	AB	নাই
O	নাই	$\alpha\beta$

বিভিন্ন রক্তগ্রুপের অ্যাণ্টিজেন ও অ্যাণ্টিবডির সম্পর্ক

এইভাবে B গ্রুপের লোহিত রক্তকণিকায় B অ্যাণ্টিজেন থাকে এবং প্লাজমায় α অ্যাণ্টিবডি থাকে। AB গ্রুপের রক্তের লোহিত কণিকায় AB অ্যাণ্টিজেন থাকে কিন্তু প্লাজমাতে কোন অ্যাণ্টিবডি থাকে না। O গ্রুপের রক্তের লোহিত কণিকায় কোন অ্যাণ্টিজেন থাকে না কিন্তু প্লাজমাতে $\alpha\beta$ অ্যাণ্টিবডি থাকে।

দাতার লোহিত রক্তকণিকা	গ্রহীতার প্লাজমা			
	O	α	β	$\alpha\beta$
O	—	—	—	—
A	—	+	—	+
B	—	—	+	+
AB	—	+	+	+

+ জমাট বাঁধে, — জমাট বাঁধে না

বিভিন্ন রক্তগ্রুপ এবং তাহাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া

সুতরাং রক্তপ্রদানকালে দেখা উচিত গ্রহীতার লোহিত রক্তকণিকায় যে ধরনের অ্যান্টিজেন থাকিবে দাতার রক্তের প্লাজমায় যেন বিপরীত ধরনের অ্যান্টিবডি থাকে। AB গ্রুপের রক্তের প্লাজমায় কোন অ্যান্টিবডি না থাকায় ঐ ব্যক্তি যে কোন গ্রুপের রক্ত গ্রহণ করিতে পারে। তাই AB গ্রুপ-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে **সর্বজনীন গ্রহীতা** (Universal recipient) বলে। কিন্তু ইহা নিজস্ব গ্রুপ ছাড়া অন্য কাউকে রক্তপ্রদান করিতে পারে না। অপরপক্ষে, O গ্রুপের রক্তের লোহিত কণিকায় কোন অ্যান্টিজেন থাকে না বলিয়া ইহা সমস্ত গ্রুপবিশিষ্ট ব্যক্তিকে রক্তদান করিতে পারে। এইজন্য ইহাকে **সর্বজনীন দাতা** (Universal donor) বলে। তবে O গ্রুপবিশিষ্ট ব্যক্তি নিজস্ব গ্রুপ ছাড়া অন্য কোন গ্রুপের রক্ত গ্রহণ করিতে পারে না।
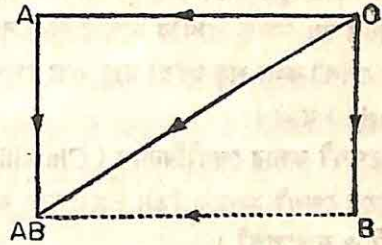
চিত্র 4.25 : গ্রহীতা কোন্ দাতার রক্ত গ্রহণ করিবে তাহা তীর চিহ্নের সাহায্যে প্রদত্ত হইল

4.5 পেশী কলা (Muscular tissue) :

সংজ্ঞা (Definition) : যে কলার সাহায্যে প্রাণীদের অঙ্গ সঞ্চালন সংঘটিত হয় তাহাকে পেশী কলা বলে। প্রতিটি পেশী কলা অসংখ্য লম্বা ও সরু পেশী কোষ বা পেশী তন্তু দ্বারা গঠিত। পেশী তন্তুগুলি পরস্পর যোগ কলা দ্বারা যুক্ত। পেশী কোষে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে।
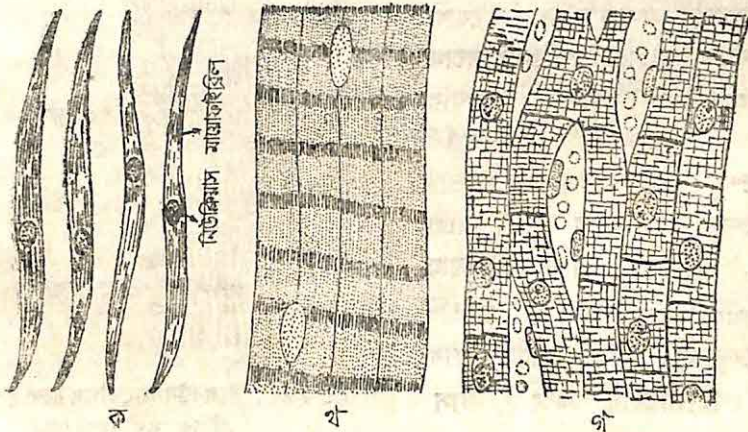
চিত্র 4.26 : পেশী কলার গঠন : (ক) অনৈচ্ছিক পেশী, (খ) ঐচ্ছিক পেশী, (গ) হৃৎপেশী।

পেশীকোষের বৈশিষ্ট্য :

(i) **উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া বা উত্তেজিত হওয়া** (Irritability).

(ii) সঙ্কোচনশীলতা (Contractivity)।

(iii) প্রসারণ ক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা (Extensibility and Elasticity)।

(iv) পরিবাহিতা (Conductivity)।

পেশীতন্তুর সঙ্কোচন ও প্রসারণের জন্য জীবিত পেশী কলা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় কিন্তু প্রাণীর মৃত্যুর পর সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা থাকে না। তখন পেশী কলা শক্ত হইয়া যায় এবং পেশীর এই অবস্থাকে **রাইগর মরটিস** (Rigor mortis) বলে।

পেশী কলার শ্রেণীবিন্যাস (Classification of muscles) : গঠন ও কার্যের ভিত্তিতে পেশী কলাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—**ঐচ্ছিক পেশী, অনৈচ্ছিক পেশী ও হৃৎপেশী।**

1. **ঐচ্ছিক বা সরেখ পেশী** (Voluntary or Striated or Skeletal muscle) : এই পেশীকলা প্রাণীর ইচ্ছানুসারে সংকুচিত ও প্রসারিত হয় বলিয়া ইহাকে ঐচ্ছিক পেশী বলে। এই ধরনের পেশীতন্তুর গাত্রে আড়াআড়ি গাঢ় ও হাল্কা দাগ থাকে বলিয়া ইহাকে সরেখ পেশীও বলা হয়। আবার এই পেশী অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে বলিয়া ইহাকে **কঙ্কাল পেশী** বলা হয়। ঐচ্ছিক পেশী হাত ও পায়ের অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে।

গঠন (Structure) : প্রতিটি পেশী কতকগুলি পেশীতন্তু গুচ্ছ লইয়া গঠিত। এই পেশীতন্তু গুচ্ছগুলি এপিমাইসিয়াম নামক যোগ কলা দ্বারা আবৃত। প্রতিটি পেশীতন্তু গুচ্ছকে **ফেসিকুলাস** (Fasciculus) বলে। প্রতিটি ফেসিকুলাসকে আবৃত করিয়া যে যোগ কলা থাকে তাহাকে **পেরিমাইসিয়াম** (Perimysium) বলে। আবার প্রতিটি ফেসিকুলাস অনেকগুলি পেশীতন্তু দ্বারা গঠিত এবং প্রতিটি পেশীতন্তু যে সূক্ষ্ম পর্দা দ্বারা আবৃত তাহাকে **এন্ডোমাইসিয়াম** (Endomysium) বলে। প্রতিটি পেশীতন্তু বা কোষ দৈর্ঘ্যে প্রায় 1-40 মিলিমিটার এবং ব্যাস 10-100 μm পর্যন্ত হয়।
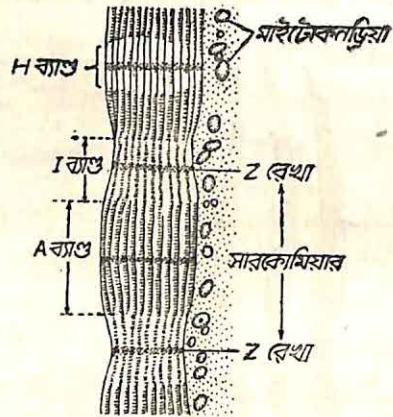
চিত্র 4.27 : ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট ঐচ্ছিক পেশীতন্তুর গঠন

প্রতিটি পেশীতন্তু **সারকোলেম্মা** (Sarcolemma) নামক পাতলা আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। পেশীকোষের সাইটোপ্লাজমকে সারকোপ্লাজম (Sarcoplasm) বলে। সারকোপ্লাজমে অসংখ্য মাইটোকনড্রিয়া, গল্গি বস্তু, এন্ডোপ্লাজমীয়

জালিকা, গ্লাইকোজেন, লিপিড ইত্যাদি থাকে। ইহা ব্যতীত সারকোপ্লাজমে অসংখ্য 2 μm ব্যাসযুক্ত সূত্রাণু থাকে। ইহারা **মায়োফাইব্রিল** (Myofibrils) নামে পরিচিত। এই মায়োফাইব্রিল **অ্যাক্‌টিন** (Actin) ও **মায়োসিন** (Myosin) নামক প্রোটিন তন্তু দ্বারা গঠিত। অপেক্ষাকৃত মোটা তন্তুগুলিকে মায়োসিন তন্তু এবং সরু তন্তুকে অ্যাক্‌টিন তন্তু বলে।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করিলে মায়োফাইব্রিলে পর্যায়ক্রমে অ্যাক্‌টিন ও মায়োসিন তন্তুর বিশেষ অবস্থানের জন্য গাঢ় ও হালকা ব্যাণ্ড দেখা যায়। গাঢ় অংশকে 'A' ব্যাণ্ড ও হালকা অংশকে 'I' ব্যাণ্ড বলে। আবার 'A' ব্যাণ্ডের মধ্যবর্তী স্বচ্ছ রেখাকে 'H' রেখা এবং 'I' ব্যাণ্ডের গায়ের রেখাকে 'Z' রেখা বলে।

দুইটি 'Z' রেখার মধ্যবর্তী অংশকে সারকোমিয়ার (Sarcomere) বলে।

কার্য (Function) : ঐচ্ছিক পেশী প্রাণীর ইচ্ছা অনুসারে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়।

2. **অনৈচ্ছিক বা অরেখ পেশী** (Involuntary or Smooth muscle) : এই পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এইজন্য ইহাদের অনৈচ্ছিক পেশী বলে। তবে ইহার সংকোচন স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আবার এই ধরনের পেশীতন্তুর অনুপ্রস্থে কোন রেখা না থাকার জন্য ইহাদের অরেখ বা মসৃণ পেশী বলে।

গঠন (Structure) : অনৈচ্ছিক পেশীর তন্তুগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, উভয় প্রান্ত সরু ও লম্বা এবং মাকুর মত দেখিতে। কোষের কেন্দ্রস্থলে একটি ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস থাকে। সারকোপ্লাজমে মাইটোকনড্রিয়া, গল্গি বস্তু, এণ্ডোপ্লাজমীয় জালিকা প্রভৃতি থাকে। কোষের দৈর্ঘ্য বরাবর সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত অতি সূক্ষ্ম সুতার মত মায়োফাইব্রিল বর্তমান। মায়োফাইব্রিল অ্যাক্‌টিন ও মায়োসিন তন্তু দ্বারা গঠিত।

অবস্থিতি (Distribution) : হৃৎপিণ্ড ছাড়া দেহের প্রতিটি আন্তরযন্ত্রের প্রাচীরগাত্রে অনৈচ্ছিক পেশী অবস্থিত। পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, গ্রাসনালী, শ্বাসনালী, পিত্তথলি, গবিনী, মূত্রথলি, জরায়ু, ধমনী-শিরা প্রাচীর প্রভৃতিতে অনৈচ্ছিক পেশীর অবস্থান। ইহা আন্তরযন্ত্রে থাকে বলিয়া ইহাদের আন্তরযন্ত্রীয় পেশী (Visceral muscle) বলে।

কার্য (Function) : দেহের বিভিন্ন অঙ্গের স্বয়ংচলনে অংশগ্রহণ করে।

ঐচ্ছিক পেশী ও অনৈচ্ছিক পেশীর মধ্যে পার্থক্য (Difference between Voluntary muscle and Involuntary muscle)

ঐচ্ছিক পেশী	অনৈচ্ছিক পেশী
1. পেশীর সংকোচন ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে হয়।	1. পেশীর সংকোচন ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে হয় না।
2. পেশী অস্থির সঙ্গে যুক্ত।	2. পেশী অনৈচ্ছিক অঙ্গের সঙ্গে যুক্ত।
3. অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে পেশীতন্তুতে আড়া-আড়ি দাগ দেখা যায়।	3. পেশীতন্তুতে কোন দাগ থাকে না।
4. পেশীকোষ বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং পরিধির দিকে সজ্জিত থাকে।	4. পেশীকোষের কেন্দ্রে একটি নিউক্লিয়াস থাকে।
5. স্নায়ু কর্তৃক পেশী সংকোচন নিয়ন্ত্রিত।	5. পেশী সংকোচন স্বসৃষ্ট।
6. পেশী সহজে অবসাদগ্রস্ত হয়।	6. পেশী সহজে অবসাদগ্রস্ত হয় না।

3. **হৃৎপেশী** (Cardiac muscle) : হৃৎপিণ্ডের প্রাকারে যে ধরনের পেশী দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে হৃৎপেশী বলে। ইহা সর্বদা সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। ইহার সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সেই জন্য ইহার প্রকৃতি অনৈচ্ছিক পেশীর ন্যায়। কিন্তু ঐচ্ছিক পেশীর ন্যায় ইহাতে অনুপ্রস্থ রেখা আছে।

গঠন (Structure) : হৃৎপেশীর তন্তুগুলি লম্বাকৃতি শাখা-প্রশাখা যুক্ত। কোষের সারকোলেম্মা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। পেশীতন্তুর শাখা-প্রশাখাগুলি একে অন্যের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া জালক গঠন করে। ফলে সকল পেশীকোষকে একসঙ্গে একটি কোষ বলিয়া মনে হয়। কোষের এইরূপ অবস্থাকে **সিনসিটিয়াম** (Syncitium) বলে। হৃৎপেশীর কোষসমূহের সংযোগস্থলে কোষপর্দা ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া গাঢ় রেখার সৃষ্টি করে। তাহাকে **নিবেশিত ফলক** বা **ইন্টার-ক্যালেটেড ডিস্ক** (Intercalated disc) বলে। প্রত্যেকটি কোষে একটি করিয়া ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস বিদ্যমান। ইহা ছাড়া অন্যান্য গঠন প্রায় ঐচ্ছিক পেশীর ন্যায়। হৃৎপেশী মেরুদণ্ডী প্রাণীর দশম করোটীয় স্নায়ুর (Vagus nerve) কার্ডিয়াক শাখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

কার্য (Function) : পর্যায়ক্রমে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ ঘটাইয়া রক্তবাহের মধ্যে রক্তস্রোতের সৃষ্টি করে।

ঐচ্ছিক ও হৃৎপেশীর মধ্যে পার্থক্য (Difference between voluntary muscle and cardiac muscle)

ঐচ্ছিক পেশী	হৃৎপেশী
1. পেশী ঐচ্ছিক ও সরেখ।	1. পেশী অনৈচ্ছিক ও সরেখ।
2. পেশীর দুই প্রান্ত অস্থির সঙ্গে যুক্ত।	2. পেশীর প্রান্ত অন্য পেশীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া জালকের সৃষ্টি করে।
3. পেশীতন্তু শাখাহীন।	3. পেশীতন্তু শাখাযুক্ত।
4. পেশীতন্তুতে বহু নিউক্লিয়াস আছে।	4. পেশীতন্তুতে একটিমাত্র নিউক্লিয়াস আছে।
5. পেশীর সংকোচন ইচ্ছানুযায়ী হয় এবং ছন্দোবন্ধ নয়।	5. পেশীর সংকোচন স্বতঃস্ফূর্ত ও ছন্দোবন্ধ।

4.6 স্নায়ু কলা (Nervous tissue) :

সংজ্ঞা (Definition) : যে কলার দ্বারা প্রাণী উত্তেজনা গ্রহণ, পরিবহণ এবং আবেগে সাড়া দেয় সেই কলাকে স্নায়ু কলা বলে।
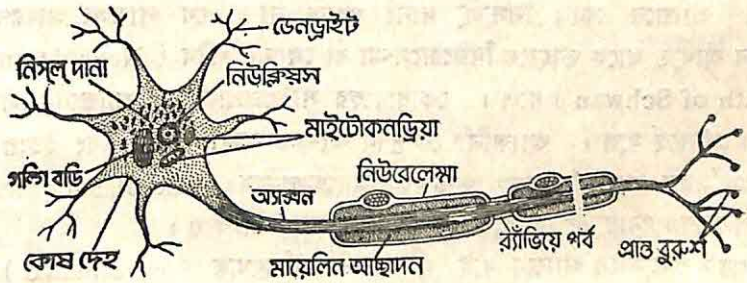
চিত্র 4.28 : একটি আদর্শ স্নায়ুকোষের গঠন

গঠন (Structure) : স্নায়ুকোষ ও নিউরোগ্লিয়া লইয়া স্নায়ু কলা গঠিত। স্নায়ুকোষে সেন্ট্রোজোম না থাকায় ইহাদের বিভাজন ক্ষমতা নাই। সুতরাং নবজাত শিশুর স্নায়ুতন্ত্রে স্নায়ুকোষের সংখ্যা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির স্নায়ুকোষের সংখ্যার সমান।

স্নায়ুকোষ (Neurone) : স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একককে স্নায়ুকোষ বা নিউরোণ বলে। স্নায়ুকোষের তিনটি অংশ থাকে, যথা—কোষদেহ, কৈশতন্তু বা ডেনড্রন এবং অক্ষতন্তু বা অ্যাক্সন।

কোষদেহ (Cell body or Centron) : স্নায়ুকোষের কোষদেহকে **সোমা** (Soma) বলে। কোষদেহ গোলাকার, তারকাকার, ত্রিভুজাকার ইত্যাদি বিভিন্ন আকার হইতে পারে। ইহার ব্যাস প্রায় 100 μm। কোষদেহের মধ্যে একটি বড় নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম বা নিউরোপ্লাজম (Neuroplasm) থাকে। সাইটোপ্লাজমে RNA ও প্রোটিনসমৃদ্ধ নিস্‌ল্ দানা (Nissl's granules) এবং নিউরোফাইব্রিল নামক সূক্ষ্ম তন্তু বিদ্যমান। ইহা ছাড়া সাইটোপ্লাজমে অসংখ্য মাইটোকনড্রিয়া, গল্গি বস্তু প্রভৃতি অঙ্গাণু দেখা যায়। কোষদেহ হইতে উদ্গত ছোট ছোট প্রবর্ধককে ডেনড্রাইট এবং একটি বড় প্রবর্ধককে অ্যাক্সন বলে। কোষদেহ এবং প্রবর্ধকগুলি যে আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে তাহাকে নিউরোণ পর্দা বলে।

কৈশতন্তু (Dendron or Dendrite) : কোষদেহ হইতে বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট যে প্রবর্ধক বাহির হয় তাহাকে **কৈশতন্তু** বলা হয়। কৈশতন্তুতে নিউরোণ পর্দা, নিউরোপ্লাজম, নিস্‌ল্ দানা ও নিউরোফাইব্রিল থাকে। ইহারা উদ্দীপনাকে গ্রহণ করিয়া কোষদেহের দিকে পরিচালিত করে বলিয়া ইহাদের **অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্তু** (Afferent nerve fibres) বলে।

অক্ষতন্তু বা আক্সন (Axon) : কোষদেহ হইতে উদ্গত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সাধারণত শাখাবিহীন প্রবর্ধিত অংশকে **অক্ষতন্তু** বলে। কোষদেহের যে অংশ হইতে ইহা উৎপন্ন হয় তাহাকে **অক্ষস্তূপ** বা **অ্যাক্সন হিলক** (Axon hillock) বলে। অ্যাক্সনে কোন নিস্‌ল্ দানা থাকে না। যে পাতলা আবরণ দ্বারা অ্যাক্সন আবৃত থাকে তাহাকে **নিউরোলেম্মা** বা **সোয়ান শীথ** (Neurolemma or Sheath of Schwan) বলে। কোষদেহের সাইটোপ্লাজম ও অ্যাক্সনের সাইটোপ্লাজম একসঙ্গে যুক্ত। অ্যাক্সনের কেন্দ্রীয় অংশকে **অক্ষীয় স্তম্ভ** এবং ইহার মধ্যে যে অর্ধতরল পদার্থ থাকে তাহাকে **অ্যাক্সোপ্লাজম** (Axoplasm) বলা হয়। অ্যাক্সোপ্লাজম স্নায়ুতন্তুর পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

গঠন অনুসারে অ্যাক্সন দুই প্রকার—**মায়েলিনযুক্ত** (Myelinated) এবং **মায়েলিনবিহীন** (Non-myelinated) স্নায়ুতন্তু। যে সমস্ত অ্যাক্সন মায়েলিন নামক আবরক দ্বারা আবৃত থাকে তাহাদের মায়েলিন বা মেডুলারী স্নায়ুতন্তু বলে। অপরপক্ষে, যে সমস্ত অ্যাক্সন মায়েলিন আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে না তাহাদের আমায়েলিন বা নন-মেডুলারী স্নায়ুতন্তু বলে। মায়েলিন আবরণ স্নেহ জাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। মায়েলিন স্নায়ুতন্তুতে নিয়মিত ব্যবধানে সংকোচন হইতে দেখা যায় এবং এই সংকুচিত স্থানকে **র‍্যাঁভিয়ে পর্ব** (Node of Ranvier) বলে। এই অংশে কোন মায়েলিন আবরণী থাকে না। অ্যাক্সন শেষপ্রান্তে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া প্রান্ত বুরুশের সৃষ্টি করে। অ্যাক্সন উদ্দীপনাকে কোষদেহ হইতে দূরে প্রেরণ করে বলিয়া ইহাকে **বহির্মুখী স্নায়ুতন্তু** (Efferent nerve fibres) বলে।

নিউরোগ্লিয়া (Neuroglia) : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যোজক কলাকে নিউরোগ্লিয়া বলে। আকৃতি, আয়তন ও সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া ইহাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—নক্ষত্রকোষ (Astrocyte), মাইক্রোগ্লিয়া (Microglia) এবং অলিগোডেনড্রোগ্লিয়া (Oligodendroglia)।
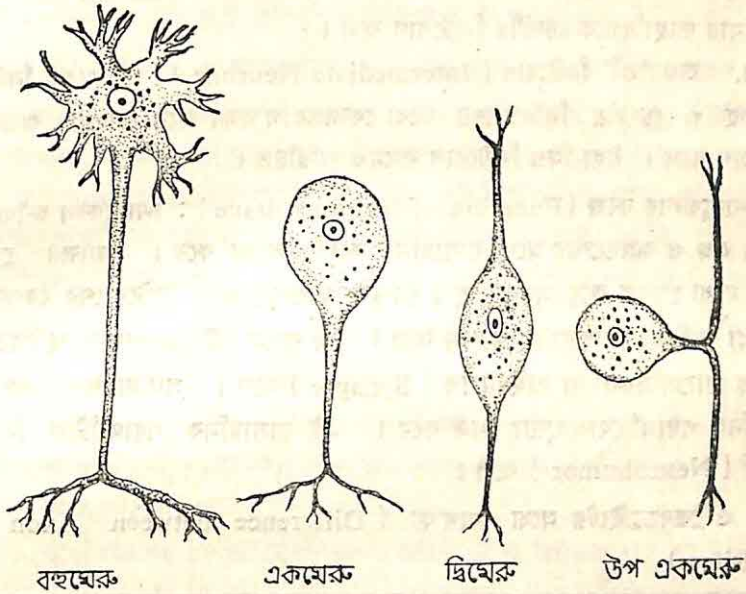
চিত্র 4.29 : বিভিন্ন প্রকার স্নায়ুকোষ

নিউরোণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Neurone) :

A. কৈশতন্তু ও অ্যাক্সনের সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া নিউরোণকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়।

1. **মেরুহীন** (Apolar) : এই জাতীয় কোষে কোন কৈশতন্তু বা অক্ষতন্তু থাকে না।

2. **একমেরু** (Unipolar) : এই কোষে একটিমাত্র অক্ষতন্তু থাকে।

3. **ছদ্মএকমেরু বা উপএকমেরু** (Pseudo-unipolar) : এই কোষের কৈশতন্তু ও অক্ষতন্তু কোষদেহের একজায়গা হইতে উৎপন্ন হয়।

4. **দ্বিমেরু** (Bipolar) : এই কোষের একটি করিয়া কৈশতন্তু ও অক্ষতন্তু থাকে।

5. **বহুমেরু** (Multipolar) : এই কোষে একাধিক কৈশতন্তু ও একটি অক্ষতন্তু থাকে।

B. কার্য অনুসারে নিউরোণকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

1. **সংজ্ঞাবহ নিউরোণ** (Sensory Neurone) : যে সকল নিউরোণ দেহের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে উদ্দীপনা মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডে পরিবহণ করে।

2. **চেষ্টীয় নিউরোণ** (Motor Neurone) : যে সকল নিউরোণ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড হইতে উদ্দীপনা সংগ্রহ করিয়া দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বহন করিয়া লইয়া যায় তাহাদিগকে চেষ্টীয় নিউরোণ বলে।

3. **অন্তর্বর্তী নিউরোণ** (Intermediate Neurone) : যে সকল নিউরোণ সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টীয় নিউরোণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে তাহাকে অন্তর্বর্তী নিউরোণ বলে। ইহা মিশ্র নিউরোণ নামেও পরিচিত।

স্নায়ুকলার কাজ (Function of Nervous tissue) : স্নায়ুকলা জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে রাসায়নিক সংহতি সাধন করে। অ্যাক্সন পেশী-তন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে অথবা ইহার প্রান্ত শাখাসমূহ অন্য নিউরোণের কৈশতন্তুর সান্নিধ্যে আসিয়া যোগাযোগ স্থাপন করে। যে স্থানে এই যোগাযোগ স্থাপিত হয় তাহাকে প্রান্তসন্নিকর্ষ বা **সাইন্যাপস** (Synapse) বলে। সাইন্যাপসে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ যোগসূত্রের কাজ করে। এই রাসায়নিক পদার্থটিকে নিউরো-হিউমর (Neurohumor) বলে।

অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Axon and Dendrites)

অ্যাক্সন	ডেনড্রাইট
1. কোষদেহ থেকে এককভাবে উৎপন্ন হয় এবং শাখাবিহীন।	1. কোষদেহ থেকে একাধিক উৎপন্ন হয় এবং শাখা-প্রশাখাযুক্ত।
2. নিস্‌ল্‌ দানা থাকে না।	2. নিস্‌ল্‌ দানা থাকে।
3. মেডুলারী আবরণ ও নিউরোলেম্মা থাকে।	3. মেডুলারী আবরণ ও নিউরোলেম্মা থাকে না।
4. আবেগ কোষদেহ হইতে দূরে পরিবহণ করে।	4. আবেগ গ্রহণ করিয়া কোষদেহে পরিবাহিত করে।

4.7 জনন কলা (Germinal tissue) :

যে সকল স্বতন্ত্র কলা যৌন জনন পদ্ধতিতে মাতৃদেহ হইতে নূতন বংশধর সৃষ্টি করিয়া প্রজাতি সংরক্ষণে সহায়তা করে তাহাদের জনন কলা বলে। পুরুষের শুক্রাশয়ে যে জননকোষ উৎপন্ন হয় তাহাকে **শুক্রাণু** (Sperm) বলে। অপর-পক্ষে, স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয়ে যে জননকোষ সৃষ্টি হয় তাহাকে **ডিম্বাণু** (Ovum) বলে।

বিষয়-সংক্ষেপ

উদ্ভিদ কলা :

উৎপত্তিগতভাবে এক হইয়াও কোষগুলি যখন একই অথবা ভিন্ন আকৃতি লাভ করিয়া দলবদ্ধভাবে একই ধরনের কার্য সম্পাদন করে তখন সেই দলবদ্ধ কোষের সমষ্টিকে কলা বলে।

উদ্ভিদ কলা প্রধানত দুই প্রকার—ভাজক কলা ও স্থায়ী কলা।

1. **ভাজক কলা**—যে কলার কোষগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হইয়া নূতন কোষ উৎপাদন করে তাহাকে ভাজক কলা বলে। মূল, কান্ড, পত্র প্রভৃতি বর্ধনশীল অঙ্গের অগ্রভাগে ভাজক কলা থাকে। এই কলার কোষগুলি গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা বহুভুজাকার হয়। কোষগুলি ক্ষুদ্র, ঘন সন্নিবিষ্ট ও কোষান্তর রন্ধ্রবিহীন। কোষপ্রাচীর পাতলা ও কোষের মধ্যে দানাদার সাইটোপ্লাজমযুক্ত একটি বড় নিউক্লিয়াস বিদ্যমান। ভাজক কলা উদ্ভিদ অঙ্গের সার্বিক বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে।

উৎপত্তি, অবস্থান, কার্য ও কোষ বিভাজনের তল অনুযায়ী ভাজক কলাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। ইহারা হইল—

(i) উৎপত্তি অনুযায়ী—প্রাথমিক ভাজক কলা ও গৌণ ভাজক কলা।

(ii) অবস্থান অনুযায়ী—অগ্রস্থ ভাজক কলা, পার্শ্বস্থ ভাজক কলা ও নিবেশিত ভাজক কলা।

(iii) কার্য অনুযায়ী—ডারমাটোজেন, পেরিব্লেম ও প্লিরোম।

(iv) কোষ বিভাজনের তল অনুযায়ী—পুঞ্জ ভাজক কলা, চেটাল ভাজক কলা ও পর্শুকা ভাজক কলা।

2. **স্থায়ী কলা**—ভাজক কলা হইতে উৎপন্ন বিভাজন ক্ষমতাহীন সুনির্দিষ্ট আকৃতিযুক্ত কলাকে স্থায়ী কলা বলে। স্থায়ী কলা তিন প্রকার—সরল কলা, জটিল কলা ও বিশিষ্ট কলা।

(ক) **সরল কলা**—এই কলার কোষের আকৃতি, গঠন ও কাজ একই। সরল কলা তিন প্রকার—

(i) প্যারেনকাইমা—কোষগুলি সজীব, গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা বহুভুজাকার এবং কোষান্তর রন্ধ্রযুক্ত। খাদ্যপ্রস্তুত, খাদ্যসঞ্চয় প্রভৃতি কার্যে অংশগ্রহণ করে।

(ii) কোলেনকাইমা—কোষগুলি সজীব, লম্বা, বেলনাকার ও কোষান্তর রন্ধ্রযুক্ত কিন্তু কোষপ্রাচীর অসম স্থূলীকৃত। কোলেনকাইমা সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে বলপ্রদান করে।

(iii) স্ক্লেরেনকাইমা—কোষগুলি সরু, দীর্ঘ ও স্থূল প্রাচীরযুক্ত। পরিণত কোষ মৃত। উদ্ভিদ অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা এই কলার প্রধান কাজ।

(খ) **জটিল কলা**—এই কলা বিভিন্ন আকৃতির কোষ দ্বারা গঠিত এবং ইহারা যৌথভাবে একই ধরনের কার্য করে। জটিল কলা দুই প্রকার—

(i) **জাইলেম**—ইহা ট্রাকিড, ট্রাকিয়া, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও জাইলেম তন্তু দ্বারা গঠিত। জাইলেম প্যারেনকাইমা ব্যতীত সকল কোষ মৃত। জাইলেম জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থ সংবহনে অংশগ্রহণ করে।

(ii) **ফ্লোয়েম**—ইহা সীভ নল, সঙ্গী কোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও ফ্লোয়েম তন্তু দ্বারা গঠিত। ফ্লোয়েম তন্তু ব্যতীত সকল কোষ সজীব, ফ্লোয়েম খাদ্য বস্তু সংবহনে অংশগ্রহণ করে।

(গ) **বিশিষ্ট কলা**—ভাজক ও স্থায়ী কলা ব্যতীত উদ্ভিদদেহে বিশেষ কার্যে অংশগ্রহণকারী কলাকে বিশিষ্ট কলা বলে। বিশিষ্ট কলা বিভিন্ন প্রকার, যথা—গ্রন্থিরোম, মধুগ্রন্থি, রজন ও তৈলনালী, ক্ষীরনালী ও ক্ষীরকোষ, হাইডাথোড।

প্রাণিকলা :

গঠনগত এবং কার্যগতভাবে প্রাণিকলাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—1. আবরণী কলা, 2. যোগ কলা, 3. পেশী কলা, 4. স্নায়ু কলা এবং 5. জনন কলা।

1. **আবরণী কলা**—যে কলা প্রাণিদেহের বাহিরের আবরণ ও ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গের উপর পাতলা আচ্ছাদন সৃষ্টি করে তাহাকে আবরণী কলা বলে। এই কলার কোষগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট, কোন রক্তপ্রবাহ থাকে না, যোগ কলা নির্মিত ভিত্তি পর্দার উপর এক বা একাধিক স্তরে সাজানো থাকে। এই কলার অন্যতম কার্য হইল সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে রক্ষা করা। আবরণী কলাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—সরল, যৌগিক এবং সংবেদনশীল। সরল আবরণী কলা পাঁচ প্রকার, যথা—(i) আঁইশাকার, (ii) ঘনকাকার, (iii) স্তম্ভাকার, (iv) রোমযুক্ত এবং (v) গ্রন্থিময়। যৌগিক আবরণী কলাও পাঁচ প্রকারের, যথা—(i) পরিবর্তনসূচক, (ii) স্তরীভূত কঠিন আঁইশাকার, (iii) স্তরীভূত কোমল আঁইশাকার, (iv) স্তরীভূত স্তম্ভাকার এবং (v) স্তরীভূত স্তম্ভাকার রোমযুক্ত।

2. **যোগ কলা**—যে কলা দেহের বিভিন্ন কলা ও অঙ্গের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং দেহের ভার বহন করে তাহাকে যোগ কলা বলে। যোগ কলা প্রধানত বিভিন্ন প্রকার কোষ, ধাত্র বা ভূমিবস্তু ও তন্তু লইয়া গঠিত। কোষগুলির মধ্যে হিস্টিওসাইট, ফাইব্রোব্লাস্ট, প্লাজমা কোষ, চর্বি কোষ, রঞ্জক কোষ, জালকাকার কোষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যোগ কলা ভ্রূণের মেসোডার্ম নামক বৈজিক স্তর হইতে উৎপন্ন হয়।

কোষের আকৃতি এবং ধাত্র বা ভূমি বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী যোগ কলা চারি প্রকার, যথা—(i) এরিওলার কলা, (ii) মেদ কলা, (iii) কঙ্কাল কলা, (iv) সংবহন কলা।

এরিওলার যোগ কলা পেশী, রক্তনালীর প্রাকার, স্নায়ুর আবরণ, শ্লেষ্মাঝিল্লি এবং ত্বকের নিচে অবস্থিত। এই কলার প্রকৃত কোন আকার নাই। জেলির ন্যায়

ধাত্র বস্তুতে অসংখ্য কোষ ও তন্তু বিন্যস্ত থাকে। কোষগুলি দুই প্রকার, যথা—ফাইব্রোব্লাস্ট নামক স্থির কোষ এবং হিস্টিওসাইট, প্লাজমা কোষ, রঞ্জক কোষ, মাস্ট কোষ নামক ভ্রাম্যমাণ কোষ। তন্তুগুলি দুই প্রকার—শ্বেত তন্তু ও পীত তন্তু।

মেদ কলার প্রধান উপাদান হইল চর্বি কোষ। এই প্রকার কোষে অধিক পরিমাণ চর্বি থাকার ফলে নিউক্লিয়াস-সহ সাইটোপ্লাজম কোষের একপ্রান্তে অবস্থান করে। মানুষের দেহে সর্বত্র এই কলা পাওয়া যায় ; তবে মেসেনটারী, ওমেনটাম, ত্বকের নিচে, বক্ষে বেশী পরিমাণে থাকে। দেহের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রকে স্বস্থানে রাখিতে, বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা করে। ইহা ব্যতীত দেহের শক্তি সঞ্চয়ে ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

কঙ্কাল কলা হইল প্রাণিদেহের সর্বাপেক্ষা কঠিন কলা। তরুণাস্থি এবং অস্থি লইয়া কঙ্কাল কলা গঠিত। প্রথমোক্ত কলা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইলেও ইহা নমনীয় এবং স্থিতিস্থাপক। এই কলার কোষগুলিকে কনড্রিওব্লাস্ট বলে। তরুণাস্থি কোষের সংখ্যা ও ধাত্র বস্তুর ভিত্তিতে ইহাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—হায়ালিন তরুণাস্থি, স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি এবং তন্তুময় তরুণাস্থি। মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণের সমস্ত কঙ্কাল তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত। ইহা ব্যতীত পশুর্কার অগ্রভাগ, অস্থিপ্রান্ত, শ্বাস নালী, স্বরযন্ত্র, জানুসন্ধি, আন্তঃকশেরুকার চাক্তি, বহিঃকর্ণ প্রভৃতি স্থানে এই কলা অবস্থিত। এই কলা দেহের কাঠামো তৈয়ারি করিতে, জানুসন্ধি ও আন্তঃকশেরুকার চাক্তিতে বাফার হিসাবে কার্য করিয়া এই সকল অঙ্গকে ঘর্ষণজনিত ক্ষয় রোধ করিতে সহায়তা করে।

অস্থি সর্বাপেক্ষা কঠিনতম কলা। ইহা প্রধানত অস্থিকোষ, ধাত্র বস্তু ও তন্তু লইয়া গঠিত। অস্থিকোষ তিন প্রকার, যথা—অস্টিওসাইট, অস্টিওক্লাস্ট এবং অস্টিওব্লাস্ট। অস্থির ঘনত্ব ও দৃঢ়তার উপর ভিত্তি করিয়া ইহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—দৃঢ় অস্থি এবং স্পঞ্জ অস্থি। দেহের কাঠামো গঠন, ভার বহন, ঐচ্ছিক পেশী ও কণ্ডরার সংযোজনে ইহা সহায়তা করে। ইহা ব্যতীত অস্থিমজ্জা বিভিন্ন প্রকার রক্তকোষ এবং রেটিকিউলো-এণ্ডোথেলিয়াল কোষ উৎপন্ন করে।

সংবহন কলা হইল তরল যোগ কলা। সংবহন কলা রক্ত ও লসিকা লইয়া গঠিত। 45% রক্তকণিকা এবং 55% রক্তরস লইয়া রক্ত গঠিত। রক্তকণিকা তিন প্রকার—লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা এবং অণুচক্রিকা। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে উট এবং অন্যান্য সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস বিদ্যমান ; কিন্তু উট ব্যতীত অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত।

শ্বেত রক্তকণিকা বৃহৎ নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং সাইটোপ্লাজম স্থিত দানার উপস্থিতির উপর ভিত্তি করিয়া ইহা দুই প্রকার, যথা—গ্র্যানুলোসাইট (দানাদার) এবং অগ্র্যানুলোসাইট (অ-দানাদার)। গ্র্যানুলোসাইট আবার তিন প্রকার, যথা—

নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল এবং বেসোফিল। অগ্র্যানুলোসাইট দুই প্রকার, যথা—লিম্ফোসাইট এবং মনোসাইট। রক্তরস জল (91-92%) ও কঠিন পদার্থ (8-9%) লইয়া গঠিত। অণুচক্রিকাগুলি খুবই ছোট এবং নিউক্লিয়াসবিহীন কোষ। লোহিত রক্তকণিকা গ্যাসীয় পদার্থ পরিবহণে, রক্তের অম্লত্ব-ক্ষারত্বের সাম্যাবস্থা বজায় রাখিতে সহায়তা করে। শ্বেত রক্তকণিকা দেহে অনুপ্রবেশকারী জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করিতে এবং অণুচক্রিকা রক্ত তঞ্চনে সহায়তা করে।

দেহের বিভিন্ন কলাস্থানে রক্ত প্রবাহিত হইবার সময় কিছু রক্তরস কলাস্থানে কলারসরূপে থাকিয়া যায়। ইহা লসিকা নামে পরিচিত। সুতরাং লসিকা হইল পরিবর্তিত কলারস। ইহা 94% জলীয় অংশ এবং 6% কঠিন অংশ লইয়া গঠিত। দেহের যে সকল স্থানে রক্ত পেঁছাইতে পারে না লসিকা সেখানে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। সুতরাং লসিকা কলারস ও রক্তের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। মনোসাইট এবং লিম্ফোসাইট লসিকাগ্রন্থিতে উৎপন্ন হয়।

3. **পেশী কলা**—যে কলার সাহায্যে প্রাণীদের অঙ্গসঞ্চালন সংঘটিত হয় তাহাকে পেশী কলা বলে। এই কলার বৈশিষ্ট্যগুলি হইল উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া, সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা, স্থিতিস্থাপকতা, পরিবাহিতা ইত্যাদি। পেশী কলা তিন প্রকার—ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক ও হৃৎপেশী। ঐচ্ছিক পেশী প্রাণীর ইচ্ছানুসারে সংকুচিত ও প্রসারিত হয় কিন্তু অনৈচ্ছিক ও হৃৎপেশীর ক্ষেত্রে তাহা হয় না। ঐচ্ছিক পেশী অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে বলিয়া ইহাকে অস্থি পেশীও বলে। অনৈচ্ছিক পেশী দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ গঠিত।

4. **স্নায়ু কলা**—যে কলা দ্বারা প্রাণী উত্তেজনা গ্রহণ, পরিবহণ এবং আবেগে সাড়া দেয় তাহাকে স্নায়ুকলা বলে। স্নায়ু তন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত এককে নিউরোন বা স্নায়ুকোষ বলে। স্নায়ুকোষে সেন্ট্রোসোম না থাকায় ইহাদের বিভাজন ক্ষমতা নাই। স্নায়ুকোষ তিনটি অংশ লইয়া গঠিত, যথা—কোষদেহ, ডেনড্রন এবং অ্যাক্সন।

কোষদেহ হইতে শাখা-প্রশাখাযুক্ত প্রবর্ধককে ডেনড্রন বলে এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ শাখাবিহীন প্রবর্ধককে অ্যাক্সন বলে। যে সমস্ত অ্যাক্সন মায়েলিন নামক আবরক দ্বারা আবৃত থাকে তাহাকে মায়েলিন বা মেডুলারী স্নায়ুতন্তু এবং মায়েলিন আবরক অনুপস্থিত থাকিলে তাহাকে অ-মায়েলিন স্নায়ুতন্তু বলে। ডেনড্রন ও অ্যাক্সনের সংখ্যার ভিত্তিতে নিউরোন পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা—মেরুহীন, একমেরু, উপএকমেরু বা ছদ্মএকমেরু, দ্বিমেরু, বহুমেরু কোষ। একটি স্নায়ুকোষের অ্যাক্সন অন্য স্নায়ুকোষের ডেনড্রাইটের সান্নিধ্যে আসিয়া যোগাযোগ স্থাপন করে। যে স্থানে এই যোগাযোগ স্থাপিত হয় তাহাকে প্রান্তসন্নিকর্ষ (Synapse) বলে। প্রান্তসন্নিকর্ষে নিউরোহিউমর নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ যোগসূত্র রচনা করে।

5. **জনন কলা**—যে সকল স্বতন্ত্র কলা যৌন জনন পদ্ধতিতে মাতৃদেহ হইতে নূতন বংশধর সৃষ্টি করিয়া প্রজাতি সংরক্ষণে সাহায্য করে তাহাকে জনন কলা বলে। পুরুষের শুক্রাশয়ে শুক্রাণু এবং স্ত্রীদের ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু নামক জনন কোষ সৃষ্টি হয়।

প্রশ্নাবলী

উদ্ভিদ কলা

A. **পার্থক্য নির্দেশ কর :**

1. ভাজক কলা এবং স্থায়ী কলা।
2. প্রাথমিক ভাজক কলা এবং গৌণ ভাজক কলা।
3. সরল কলা এবং জটিল কলা।
4. প্যারেনকাইমা ও কোলেনকাইমা।
5. কোলেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা।
6. জাইলেম ও ফ্লোয়েম।
7. ক্ষীরনালী ও ক্ষীরকোষ।

B. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

1. ভাজক কলা কাহাকে বলে ?
2. আদি ভাজক কলা কাহাকে বলে ?
3. প্যারেনকাইমা ও কোলেনকাইমা কলার কাজ কি ?
4. পাট কোন্ ধরনের তন্তু ?
5. জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলার কাজ কি ?
6. জাইলেম কি কি কোষ দ্বারা গঠিত ? ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি জীবিত ?
7. ফ্লোয়েম কি কি কোষ দ্বারা গঠিত ? ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি মৃত ?
8. ক্যালাস প্যাড কাহাকে বলে ?
9. হাইডাথোড কি ?
10. প্রস্তর কোষ কাহাকে বলে ?

C. **টীকা লিখ :**

(i) প্যারেনকাইমা, (ii) কোলেনকাইমা, (iii) স্ক্লেরেনকাইমা, (iv) জাইলেম, (v) ফ্লোয়েম, (vi) ক্যালোজ, (vii) হাইডাথোড।

D. **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :**

1. উৎপত্তি, অবস্থান ও কার্য অনুযায়ী ভাজক কলার শ্রেণীবিভাগ কর।
2. প্যারেনকাইমা কলার গঠন, অবস্থান ও কার্য উল্লেখ কর।

3. সংবহন কলা কাহাকে বলে ? এই কলার গঠন ও কার্য সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
4. বিশিষ্ট কলা কাহাকে বলে ? উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার বিশিষ্ট কলার বিবরণ দাও।

প্রাণিকলা

A. পার্থক্য লিখ :

1. আবরণী কলা এবং যোগ কলা।
2. অস্থি ও তরুণাস্থি।
3. রক্ত ও লসিকা।
4. সারকোলেম্মা ও নিউরেলেম্মা।
5. ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশী।
6. ঐচ্ছিক পেশী এবং হৃৎপেশী।
7. অ্যাক্সন ও ডেনড্রন।
8. অ্যাপোক্রিন ও এপিক্রিন গ্রন্থি।
9. শ্বেত তন্তু ও পীত তন্তু।
10. লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকা।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

1. আবরণী কলার বৈশিষ্ট্য কি ?
2. আবরণী কলার কাজ কি ?
3. হলোক্রিন গ্রন্থি কাহাকে বলে ?
4. এক্সোক্রিন ও এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি বলিতে কি বুঝ ?
5. গবলেট কোষ কি ?
6. ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ কি ?
7. পেরিঅস্টিয়াম ও পেরিকনড্রিয়াম বলিতে কি বুঝ ?
8. কিসের উপর ভিত্তি করিয়া রক্তের শ্রেণীবিভাগ করা হয় ?
9. সিরাম ও প্লাজমার মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।
10. সাইন্যাপস্ বা প্রান্তসন্নিকর্ষ কাহাকে বলে ?
11. রক্ততঞ্চন কিভাবে সম্পন্ন হয় ?
12. রক্তনালীতে রক্ত জমাট বাঁধে না কেন ?
13. হ্যাভারসিয়ান নালী কাহাকে বলে ?
14. সারকোপ্লাজম ও অ্যাক্সোপ্লাজম বলিতে কি বুঝ ?
15. ব্যাঙের রক্তের সঙ্গে মানুষের রক্তের পার্থক্য কি ?

C. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

1. আবরণী কলার শ্রেণীবিভাগ ও কাজ উল্লেখ কর।
2. অস্থি বা তরুণাস্থির গঠন উল্লেখ কর।
3. ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক পেশীর গঠন, অবস্থান ও কাজ উল্লেখ কর।
4. রক্তের গঠন ও কাজ উল্লেখ কর।
5. একটি নিউরোনের সচিত্র গঠন ও কাজ উল্লেখ কর।

পঞ্চম অধ্যায়	প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন (Transpiration)

5.1 উদ্ভিদ মাটি হইতে প্রচুর পরিমাণ জল ও খনিজ লবণ শোষণ করে। শোষিত জলের অতি অল্প পরিমাণ উদ্ভিদের খাদ্য তৈয়ারি ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কার্যে প্রয়োজন হয়। অবশিষ্ট জল উদ্ভিদদেহ হইতে যদি বাহিরে নির্গত না হয় তাহা হইলে উদ্ভিদের কোষ তথা উদ্ভিদদেহ ফাটিয়া যাইবে। সুতরাং এই অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় জল উদ্ভিদ প্রধানত পত্ররন্ধ্র ও কাণ্ডস্থিত লেন্টিসেল দ্বারা বাষ্পের আকারে দেহের বাহিরে নির্গত করে।

যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত জল দেহ হইতে বাষ্পাকারে প্রধানত পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাহিরে নির্গত করে তাহাকে প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন বলে। প্রকৃতপক্ষে ইহা একপ্রকার সূর্যালোক প্রভাবিত শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। প্রস্বেদন তিন প্রকার, যেমন ঃ—

(i) **পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন** (Stomatal transpiration)—এই প্রক্রিয়ায় জল কেবল পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বাষ্পাকারে নির্গত হয়।

(ii) **ত্বক্তিক প্রস্বেদন** (Cuticular transpiration)—এই প্রক্রিয়ায় পাতার বহিঃত্বকীয় কোষের কিউটিকলের গাত্র হইতে জল সরাসরি বাষ্পাকারে নির্গত হয়।

(iii) **লেন্টিসেল প্রস্বেদন** (Lenticular transpiration)—এই প্রক্রিয়ায় কোমল কাণ্ডস্থিত সূক্ষ্ম ছিদ্র বা লেন্টিসেলের (Lenticel) মাধ্যমে জল বাষ্পাকারে নির্গত হয়।

উপরি-উক্ত তিনটি পদ্ধতির মধ্যে পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদনের দ্বারা অধিক পরিমাণ জল বাষ্পাকারে পরিত্যক্ত হয়।

5.2 **পত্ররন্ধ্রের উন্মোচন ও বন্ধের পদ্ধতি** (Mechanism of opening and closing of stomata) : উদ্ভিদের পত্রের নিম্নপৃষ্ঠ অথবা উভয় পৃষ্ঠে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র বা রন্ধ্রপথ বিদ্যমান, তাহাদের পত্ররন্ধ্র (Stomata) বলে। শৈবাল, ছত্রাক ও কতিপয় জলজ উদ্ভিদ ব্যতীত সকল উদ্ভিদে পত্ররন্ধ্র বিদ্যমান। পত্র-রন্ধ্র আণুবীক্ষণিক ও রক্ষীকোষ (Guard cell) নামক দুইটি বিশেষ কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত। রক্ষীকোষের অঙ্কীয় তলের (রন্ধ্রের দিকে) প্রাচীর পুরু ও অস্থিতিস্থাপক এবং উহার বিপরীত বা পৃষ্ঠীয় তলের প্রাচীর পাতলা ও স্থিতি-স্থাপক হয়। রক্ষীকোষে প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্টিড বিদ্যমান এবং ইহাদের চারিপার্শ্বে সাহায্যকারী কোষ (Subsidiary cell) পরিবেষ্টন করিয়া রাখে। প্রকৃতপক্ষে এই রক্ষীকোষ দুইটি পত্ররন্ধ্রকে মুক্ত অথবা বন্ধ রাখিতে পারে।

আলোকের উপস্থিতিতে পত্ররন্ধ্র দিবাভাগে মুক্ত হয় এবং অন্ধকারে বন্ধ থাকে। বিজ্ঞানীদের মতে রক্ষীকোষের রসস্ফীতির জন্য পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে কিভাবে রক্ষীকোষের রসস্ফীতি ঘটে ? দিনের বেলায় রক্ষীকোষে অধিক পরিমাণ শর্করা জাতীয় বস্তুর (গ্লুকোজ) অধিক সঞ্চয়ের ফলে কোষরসের ঘনত্ব ও অভিস্রবণ চাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে পার্শ্ববর্তী সাহায্যকারী কোষ হইতে জল রক্ষীকোষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার রসস্ফীতি ঘটায়। রসস্ফীতির ফলে রক্ষী-কোষের রন্ধ্রসংলগ্ন পুরু ও অস্থিতিস্থাপক প্রাচীরের খুব কম প্রসারণ ঘটে কিন্তু পৃষ্ঠ প্রাচীর পাতলা ও স্থিতিস্থাপক হওয়ায় উহার প্রসারণ খুব বেশি ঘটে। ইহার ফলস্বরূপ দুইটি রক্ষীকোষের মধ্যস্থ ছিদ্রপথ বা পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত হয়। রাত্রি-বেলায় বা অন্ধকারে প্রচুর পরিমাণ শ্বেতসার থাকায় পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়।
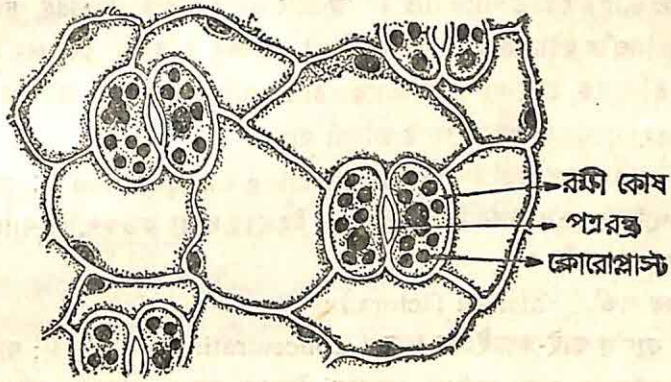
চিত্র 5.1 : পত্ররন্ধ্রের গঠন

আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে আলোকের উপস্থিতিতে রক্ষীকোষে অধিক পরিমাণ ম্যালিক অ্যাসিড সঞ্চিত হয়, ফলে পটাসিয়াম আয়নের (K^+) শোষণ ঘটে। এইভাবে রক্ষীকোষে ম্যালিক অ্যাসিড ও K^+-এর অধিক সঞ্চয়ের জন্য অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল সাহায্যকারী কোষ হইতে রক্ষীকোষে প্রবেশ করে। এই জল প্রবেশের জন্য রক্ষীকোষ স্ফীত হয় ও পত্ররন্ধ্রের উন্মোচন ঘটে।

চিত্র 5.2 : বাষ্পমোচনের পরীক্ষা

5.3 বাষ্পমোচনের পরীক্ষা :

উপকরণ (Requirements) : টবসমেত একটি চারাগাছ, কাচের বেল-জার, রবারের চাদর, ভেসলিন ও সুতা।
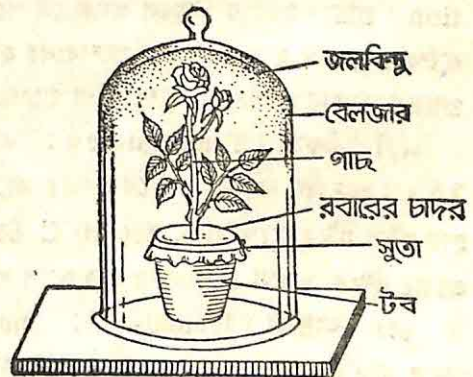
পদ্ধতি (Procedure) : টবসমেত একটি চারাগাছের গোড়ার চারিদিক

ঘিরিয়া টবের মাটির উপরের অংশ রবারের চাদর দিয়া ঢাকিয়া উহাকে ভাল করিয়া সূতা দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। ইহার পর টবসমেত গাছকে টেবিলের উপর রাখিয়া তাহার উপর বেলজার উপুড় করিয়া দিতে হইবে। জোড় মুখগুলি বায়ু-নিরুদ্ধ করিবার জন্য ভেসলিন দিয়া ভালভাবে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এই অবস্থায় টবসমেত গাছকে 5-6 ঘণ্টা সূর্যালোকে রাখিতে হইবে। বেলজারটিকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য বেলজারের উপরের কিছু অংশ সিক্ত কাপড় দ্বারা আবৃত করিতে হইবে।

পর্যবেক্ষণ (Observation) : কিছুক্ষণ পরে বেলজারের ভিতরের গায়ে বিন্দু বিন্দু জলকণা জমা হইতে দেখা যাইবে।

সিদ্ধান্ত (Inference) : টবের মাটি রবারের চাদরে আবৃত থাকায় জল মাটি হইতে বাহির হইতে পারে নাই। সুতরাং এই জলবিন্দু নিশ্চয়ই চারাগাছের দেহ হইতে নির্গত হইয়াছে। অর্থাৎ উদ্ভিদ প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় যে জলীয় বাষ্প পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই বাষ্প বেলজারের ঠাণ্ডা গায়ের সংস্পর্শে আসিয়া ঘনীভূত হইয়া জলকণারূপে বেলজারের গায়ে জমিয়া থাকে।

5.4 **প্রস্বেদনের শর্ত** (Factors affecting transpiration) : প্রস্বেদনের হার কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বাহ্যিক এবং কতকগুলি অভ্যন্তরীণ।

বাহ্যিক শর্ত (External factors) :

(1) **কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব** (Concentration of CO_2) : বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাণ হ্রাস পাইলে পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত হয়। আবার অধিক ঘনত্বে (0·03% এর বেশী) আলোর উপস্থিতিতেও পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকে। পত্ররন্ধ্র বেশী উন্মুক্ত হইলে প্রস্বেদনের হার বৃদ্ধি পায়।

(2) **আলো** (Light) : প্রস্বেদন একটি বিশেষ বাষ্পীভবন (Evaporation) প্রক্রিয়া হওয়ায় উজ্জ্বল আলোকে পত্ররন্ধ্রের বৃদ্ধি ঘটে ও প্রস্বেদনের হার বৃদ্ধি পায় এবং ম্লান আলোকে প্রস্বেদনের হার হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত, আলোর প্রভাবে পাতার তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটায় প্রস্বেদন বেশি হয়।

(3) **উষ্ণতা** (Temperature) : একটি পরিমিত উষ্ণতায় ($10^\circ C$ হইতে $25^\circ C$) প্রস্বেদন স্বাভাবিকভাবে চলিতে থাকে। উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে বাষ্পমোচনের হার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, তবে $30^\circ C$ উষ্ণতার ঊর্ধ্বে প্রস্বেদন বন্ধ হইয়া যায়। আবার উষ্ণতা হ্রাসে প্রস্বেদনের হার হ্রাস পায়।

(4) **আর্দ্রতা** (Humidity) : বায়ুতে জলীয় বাষ্প কম থাকিলে অর্থাৎ বায়ুর আর্দ্রতা কম হইলে প্রস্বেদনের হার বৃদ্ধি পায় এবং জলীয় বাষ্প বেশী থাকিলে অর্থাৎ আর্দ্রতা বেশী হইলে প্রস্বেদনের হার হ্রাস পায়।

(5) **বায়ুপ্রবাহ** (Air flow) : পত্রপৃষ্ঠে বায়ুচলাচল ঘটিলে প্রস্বেদনের

হার বৃদ্ধি পায়। আবার বায়ুর গতি বেশি (ঝড়ো বাতাস) হইলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হইয়া যায় ও প্রস্বেদন হার হ্রাস করে।

(6) **প্রাপ্তিসাধ্য জল** (Available water) : মাটিতে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য জলের পরিমাণ কম হইলে এবং জল শোষণ কম হইলে প্রস্বেদন হার হ্রাস পায়।

(7) **মাটির দ্রবণের ঘনত্ব** (Concentration of soil solution) : মাটির দ্রবণের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইলে প্রস্বেদন হার হ্রাস পায়।

(8) **জলপীড়ন** (Water stress) : জল শোষণ অপেক্ষা প্রস্বেদন হার বৃদ্ধি পাইলে উদ্ভিদের জলের ঘাটতি ঘটে, ফলে পাতা নেতাইয়া (wilting) পড়ে ও পত্ররন্ধ্র বন্ধ হইয়া যায় এবং প্রস্বেদন ব্যাহত হয়।

অভ্যন্তরীণ শর্ত (Internal factors) :

(1) **পত্ররন্ধ্র** (Stomata) : পাতার আকৃতি বড় হইলে তথা পাতায় পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা বেশি হইলে প্রস্বেদন বেশি হয়।

(2) **পত্রত্বকের প্রকৃতি** (Nature of Epiblema) : পুরু কিউটিকলযুক্ত ত্বক, কাঁটা বা রোমযুক্ত ত্বক, চকচকে বা মোমযুক্ত ত্বকে প্রস্বেদন কম হয়।

(3) **প্রোটোপ্লাজম** (Protoplasm) : প্রস্বেদনের উপর প্রোটোপ্লাজমের প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব না থাকিলেও পরিণত উদ্ভিদকোষের প্রোটোপ্লাজমের প্রস্বেদন হার তরুণ কোষ অপেক্ষা বেশি।

5.5 **প্রস্বেদনের গুরুত্ব** (Significance of transpiration) :

(1) প্রস্বেদনের মাধ্যমে উদ্ভিদদেহের প্রয়োজনাতিরিক্ত জল দেহের বাহিরে নির্গত হয়।

(2) উদ্ভিদদেহে জল চলাচলে প্রস্বেদনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান।

(3) কোষের মধ্যে জলের নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখা এই প্রক্রিয়ার অন্যতম কাজ।

(4) প্রস্বেদন উদ্ভিদের লবণ শোষণ ও তাহাদের সংবহনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

(5) এই প্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে গ্যাসীয় আদান-প্রদানে সাহায্য করে।

(6) প্রস্বেদনের মাধ্যমে উদ্ভিদকোষের সৌর শক্তি হইতে প্রাপ্ত তাপশক্তির অপচয় ঘটে বলিয়া পত্রকোষে তাপের আধিক্য ঘটিলেও কোন ক্ষতি হয় না।

(7) প্রস্বেদন দ্বারা গাছ লীন তাপ পরিত্যাগ করিয়া উহার দেহকে শীতল রাখে।

(8) প্রস্বেদন উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণে সাহায্য করে।

বিষয়-সংক্ষেপ

যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত জল দেহ হইতে বাষ্পাকারে ত্যাগ করে তাহাকে বাষ্পমোচন বলে। ইহা একপ্রকার সূর্যালোক প্রভাবিত শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। বাষ্পমোচন তিন প্রকার—পত্ররন্ধ্রীয় বাষ্পমোচন, ত্বকীয় বাষ্পমোচন, লেন্টিসেল বাষ্পমোচন। উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্রীয় বাষ্পমোচন দ্বারা অধিক পরিমাণ জল পরিত্যক্ত হয়।

পত্ররন্ধ্র আণুবীক্ষণিক ও দুইটি রক্ষীকোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত। বিজ্ঞানীদের মতে দিনের বেলায় রক্ষীকোষের রসস্ফীতির জন্য পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত হয় ও বাষ্পমোচন ঘটে। দিবালোকে রক্ষীকোষে অধিক পরিমাণ গ্লুকোজ সঞ্চয়ের জন্য কোষরসের ঘনত্ব ও অভিস্রবণ চাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে পার্শ্ববর্তী সাহায্যকারী কোষ হইতে জল রক্ষীকোষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার রসস্ফীতি ঘটায়। রাত্রিবেলায় রক্ষীকোষে প্রচুর পরিমাণ শ্বেতসার থাকায় পত্ররন্ধ্র বন্ধ হইয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে রক্ষীকোষে অধিক পরিমাণ ম্যালিক অ্যাসিড ও K^+ আয়ন সঞ্চয়ের ফলে জল পার্শ্ববর্তী কোষ হইতে রক্ষীকোষে প্রবেশ করিয়া রসস্ফীতি ঘটায় ও পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত হয়।

বাষ্পমোচনের হার আলোক, উষ্ণতা, বায়ুর আর্দ্রতা, বায়ু চলাচল, গ্রহণযোগ্য জলের পরিমাণ, মৃত্তিকার দ্রবণের ঘনত্ব, জলপীড়ন, প্রোটোপ্লাজম ও পাতার বহিঃত্বকের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

প্রশ্নাবলী

A. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

1. বাষ্পমোচন কখন ও কোন্ কোন্ অঙ্গের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় ?
2. রক্ষীকোষ কাহাকে বলে ?
3. শোষণ ও বাষ্পমোচনের পার্থক্য কি ?
4. বাষ্পমোচন কি কি শর্তের উপর নির্ভরশীল ?
5. রাত্রিবেলায় বাষ্পমোচন হয় না কেন ?

B. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

1. বাষ্পমোচন কাহাকে বলে ? উদ্ভিদের বাষ্পমোচন পদ্ধতি উল্লেখ কর।
2. বাষ্পমোচনের শর্তাবলীর একটি বিশদ বিবরণ দাও।
3. বাষ্পমোচনের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায় | সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis)

6.1 জীবদেহের সকল কার্য সম্পাদনের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় সেই শক্তি আসে খাদ্যবস্তু হইতে। প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদজগৎ সমগ্র প্রাণিকুলকে এই খাদ্যবস্তু তথা শক্তি সরবরাহ করে। প্রশ্ন হইতেছে, উদ্ভিদজগৎ এই অফুরন্ত শক্তি কোথা হইতে সংগ্রহ করে? সবুজ উদ্ভিদ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যবস্তু তৈয়ারি করিবার সময় একটি বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিরূপে খাদ্য-বস্তুর মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখে। এই শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis, গ্রীক শব্দ—Photo = আলো, Synthesis = সংশ্লেষ) রূপে পরিচিত। 1898 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বার্নেস (Barnes) সালোকসংশ্লেষ কথাটি প্রথম প্রচলন করেন। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া ঘটিলেও কৃত্রিম দৃশ্য-মান আলোকে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে।

সংজ্ঞা ঃ যে প্রক্রিয়ায় সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্বারা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যবস্তু তৈয়ারি হয় এবং উপজাত পদার্থ হিসাবে জল ও অক্সিজেন নির্গত হয় তাহাকে সালোকসংশ্লেষ বলে।

অথবা, **যে প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহাকে সালোকসংশ্লেষ বলে।**

সালোকসংশ্লেষের সময় পরিবেশের কার্বন ডাই-অক্সাইডের কার্বন বা অঙ্গার জৈব বস্তুতে আবদ্ধ হইয়া জীবদেহে অঙ্গীভূত হয় বলিয়া এই প্রক্রিয়াকে অঙ্গার আত্তীকরণ (Carbon assimilation) বলে।

6.2 **সালোকসংশ্লেষ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতবাদ :** সালোকসংশ্লেষ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্ল্যাকম্যান (Blackmann), রবীন হিল (Robin Hill), রুবেন (Ruben), ক্যামেন (Camen), বেনসন (Benson), কেলভিন (Calvin) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 1905 খ্রীষ্টাব্দে ব্ল্যাকম্যান সর্বপ্রথম মন্তব্য করেন যে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিটি দুইটি দশা—আলোক দশা ও অন্ধকার দশার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। 1937 খ্রীষ্টাব্দে রবীন হিল পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে আলোক, জল ও উপযুক্ত হাইড্রোজেন গ্রাহকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যতীত অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। সুতরাং সালোকসংশ্লেষে পরিত্যক্ত অক্সিজেন নিশ্চয়ই জল হইতে আসে। 1941 খ্রীষ্টাব্দে রুবেন ও ক্যামেন তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন (^{18}O) দ্বারা গঠিত জলের সাহায্যে প্রমাণ

করেন যে সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন অক্সিজেন জল হইতে আসে। 1956 খ্রীষ্টাব্দে বেনসন ও কেলভিন তেজষ্ক্রিয় কার্বন সহযোগে গঠিত কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্বারা প্রমাণ করেন যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী পদার্থরূপে ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

সালোকসংশ্লেষের উপাদান ও তাহাদের উৎস (Components of photosynthesis and their sources) : সালোকসংশ্লেষের মূল উপাদান বা কাঁচা মাল হইল জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড। স্থলজ উদ্ভিদ মূলরোম দ্বারা জল শোষণ করে এবং পত্ররন্ধ্র দ্বারা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। জলে নিমজ্জিত উদ্ভিদ পরিবেশ হইতে সমগ্র দেহ দ্বারা জল ও জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। জলে ভাসমান উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র পাতার ঊর্ধ্ব বহিস্ত্বকে বিদ্যমান। ক্লোরোফিল ও সূর্যালোক এই প্রক্রিয়ায় অপরিহার্য হইলেও সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন কার্বোহাইড্রেটের কোন উপাদান নয়।

6.3 সালোকসংশ্লেষ কোথায় ও কখন হয় ঃ

দিবালোকে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সবুজ উদ্ভিদের পাতার মেসোফিল কলায় সালোকসংশ্লেষ ঘটে। ইহা ব্যতীত উদ্ভিদের যে কোন সবুজ অংশ যথা কচি কাণ্ড, ফুলের বৃতি, পর্ণকাণ্ড প্রভৃতি অংশে সালোকসংশ্লেষ হয়। ইহা ব্যতীত নিম্নশ্রেণীর প্রাণী—যথা, ইউগ্লিনা (Euglena), ক্রাইসামিবার (Chrysamoeba) দেহে ক্লোরোফিল থাকায় উহারা সালোকসংশ্লেষ করিতে পারে। আবার নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ—যথা, শৈবাল অথবা কিছু ব্যাকটিরিয়া সমগ্র দেহ দ্বারা এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু তৈয়ারি করিতে পারে।

6.4 সালোকসংশ্লেষের একক ঃ

সবুজ উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাসটিড-মধ্যস্থ কোয়াণ্টাজোমের (Quantasome) প্রায় 250টি ক্লোরোফিল অণু একত্রে সালোকসংশ্লেষের আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়াকে স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। তাই ইহাদের একত্রে সালোকসংশ্লেষীয় একক বলে।

6.5 সৌরশক্তি কি এবং উহার কত পরিমাণ সালোকসংশ্লেষে প্রয়োজন হয় ঃ

পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত সৌরশক্তি কতকগুলি অদৃশ্য ফোটন (Photon) কণিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সূর্যের উত্তপ্ত কেন্দ্রের হাইড্রোজেন পরমাণু হইতে হিলিয়াম পরমাণুর রূপান্তরের সময় যে শক্তি বিচ্ছুরিত হয় তাহাকে ফোটন কণিকা বলে।

হিসাব করিয়া জানা গিয়াছে যে পত্রের উপর আপতিত সৌরশক্তির 1-2 % সালোকসংশ্লেষে প্রয়োজন হয় এবং অবশিষ্ট শক্তি বিভিন্নরূপে অপচয় হয়। যেমন আপতিত শক্তির 50% বাষ্পমোচনে জলকে বাষ্পীভূত করে, 30 % পত্র দিয়া বাহির হয় এবং অবশিষ্ট 19 % পত্র দ্বারা শোষিত হইয়া তাপে পরিণত হয়। আপতিত

আলোকরশ্মির 643-700 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যযুক্ত আলোকরশ্মি সালোকসংশ্লেষে বেশি কার্যকর।

6.6 সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ :

উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টিডে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার ক্লোরোফিলই সালোকসংশ্লেষের প্রধান রঞ্জক পদার্থ। ইহা ব্যতীত কমলা রঙের ক্যারোটিন (Carotene) ও হলুদ রঙের জ্যান্থোফিল (Xanthophyll) সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে। ক্লোরোফিল a, b, c, d এবং e ; ব্যাকটিরিওক্লোরোফিল, ব্যাকটিরিওভিরিডিন নামক সাত প্রকারের ক্লোরোফিল উদ্ভিদকোষে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ক্লোরোফিল a ও ক্লোরোফিল b উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ ও শৈবালে দেখা যায়। ইহা ব্যতীত সকল উদ্ভিদে ক্লোরোফিল a এবং অন্য একটি সাহায্যকারী ক্লোরোফিল থাকে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ক্লোরোফিল অণুর রাসায়নিক সংকেত উল্লেখ করা হইল :

ক্লোরোফিল a— $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$

ক্লোরোফিল b—$C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$

ক্লোরোফিল c—সঠিক গঠন অজ্ঞাত

ক্লোরোফিল d—$C_{54}H_{70}O_6N_4Mg$

ব্যাকটিরিওক্লোরোফিল—$C_{55}H_{74}O_6N_4Mg$

ব্যাকটিরিওভিরিডিন—$C_{55}H_{72}O_6N_4Mg$
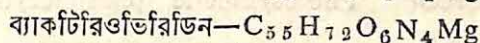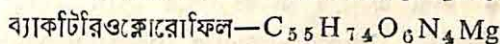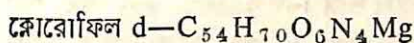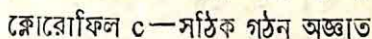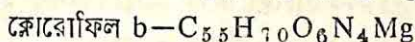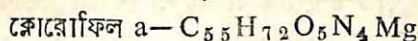
6.7 সালোকসংশ্লেষের পদ্ধতি (Mechanism of Photosynthesis) :

সালোকসংশ্লেষ প্রকৃতপক্ষে একটি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া। ইহা একপ্রকার জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া (Oxidation-Reduction process)। কারণ এই প্রক্রিয়ায় জল জারিত হইয়া অক্সিজেন নির্গত করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারিত হইয়া কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন করে। সালোকসংশ্লেষের সংক্ষিপ্ত বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$$
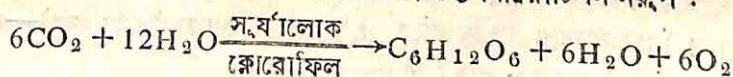
সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি আলোক ও অন্ধকার বিক্রিয়ায় বিভক্ত। আলোক বিক্রিয়ায় আলোক অপরিহার্য, তাই উহাকে আলোক দশা (Light phase) এবং অন্ধকার বিক্রিয়া আলোক নিরপেক্ষ বলিয়া উহাকে অন্ধকার দশা (Dark phase) বলে।

(a) **আলোক বিক্রিয়া (Light reaction) :** এই বিক্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্টিডের গ্রানা অংশে সীমাবদ্ধ। এই প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত ঘটনা ও জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে :

(i) ক্লোরোফিল অণু কর্তৃক সৌরশক্তি শোষণ (Absorption of solar energy by chlorophyll molecules)

(ii) সৌরশক্তির রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর (Conversion of solar energy into chemical energy)

(iii) জল অণুর বিশ্লেষণ বা ফোটোলাইসিস (Photolysis)
(iv) হিল বিক্রিয়া (Hill reaction)
(v) বিজারিত NADP+* বা $NADPH_2$** গঠন (Formation of $NADPH_2$)

(i) ক্লোরোফিল অণু কর্তৃক সৌরশক্তি শোষণ : আধুনিক গবেষণায় জানা গিয়াছে সৌরশক্তি দুইটি পৃথক রঞ্জকতন্ত্র (Pigment System বা PS)—যথা, প্রথম রঞ্জকতন্ত্র (PS-I) ও দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্রের (PS-II) মাধ্যমে শোষিত হয়। প্রথম রঞ্জকতন্ত্রে ক্লোরোফিল a প্রধান রঞ্জক পদার্থ এবং ইহা 700 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি শোষণ করে। অপরপক্ষে, দ্বিতীয় রঞ্জকতন্ত্রে ক্লোরোফিল a, b ও অন্যান্য সহায়ক রঞ্জক পদার্থ থাকিলেও প্রথমে ক্লোরোফিল b 643-645 nm তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি শোষণ করে।

উভয় তন্ত্রের ক্লোরোফিল সূর্যালোক বা অদৃশ্য ফোটন কণিকা শোষণ করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং উহাদের হাইড্রোজেনের বহিঃকক্ষপথ হইতে উচ্চ শক্তি-সম্পন্ন ইলেকট্রন বাহির হইয়া যায়। এই উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন বহু জৈব বাহকের মাধ্যমে পরিক্রমাকালে শক্তি নির্গত করে এবং এই শক্তি ATP হিসাবে সঞ্চিত থাকে। সৌরশক্তি দ্বারা এইরূপ ফসফরাসযুক্ত যৌগ ATP গঠনকে সালোকসংশ্লেষীয় ফস্ফোরীভবন (Photosynthetic phosphorylation) বা ফোটোফস্ফোরাইলেশান বলে।

$$\text{ADP} + \text{Pi (অজৈব ফসফেট)} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} \text{ATP}$$
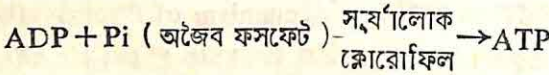
(ii) সৌরশক্তির রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর :

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে সৌরশক্তি সালোকসংশ্লেষীয় ফস্ফোরীভবনের মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তিরূপে ATP-তে আবদ্ধ হয়। বিজ্ঞানী আরননের (Arnon, 1961) মতানুসারে উদ্ভিদজগতে দুই প্রকার ফস্ফোরীভবন ঘটে—আবর্তাকার (Cyclic) ও অনাবর্তাকার (Non-cyclic)।

আবর্তাকার : যে PS-I প্রক্রিয়ায় তন্ত্রের ক্লোরোফিল a হইতে নির্গত তেজোময় ইলেকট্রন (e^-) বিভিন্ন জৈব বাহকের (ফেরিডক্সিন, সাইটোক্রোম b, সাইটোক্রোম f, প্লাস্টোসায়ানিন প্রভৃতি) মাধ্যমে পরিক্রমাকালে লব্ধশক্তি স্থানান্তরিত করিয়া নিস্তেজ হইয়া চক্রাকারে পুনরায় ঐ ক্লোরোফিল অণুতে ফিরিয়া আসে তাহাকে আবর্তাকার ফস্ফোরীভবন বলে। এই পদ্ধতিতে ইলেকট্রন পরিবহণ নিম্নলিখিত পথে সম্পন্ন হয় :

$$\text{ক্লোরোফিল a} \xrightarrow{e^-} \text{সাইটোক্রোম b} \xrightarrow{e^-} \text{সাইটোক্রোম f} \xrightarrow{e^-} \text{প্লাস্টোসায়ানিন} \xrightarrow{e^-} \text{ক্লোরোফিল a}$$
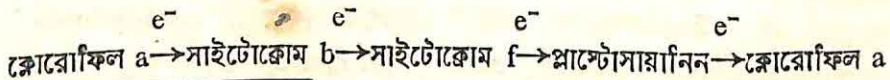
* NADP—নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট।
** বিজারিত NADP+ কে সাধারণভাবে $NADPH_2$ হিসাবে লেখা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহাকে $NADPH+H^+$ হিসাবে লেখা বিধেয়।

কেহ কেহ মনে করেন যে উল্লিখিত বাহক ব্যতীত ভিটামিন K ও FMN* ইলেকট্রন পরিবহণে অংশগ্রহণ করে। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে এই পদ্ধতি PS-II ব্যতীত সম্পন্ন হয়। এই পদ্ধতিতে জলের ফোটোলাইসিস হয় না এবং অক্সিজেন ও বিজারিত $NADP^+$ গঠিত হয় না। এই চক্রে কেবল ATP তৈয়ারি হয়। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে তাই আবর্তাকার ফস্ফোরীভবনের গুরুত্ব এখন বিতর্কের বিষয়।
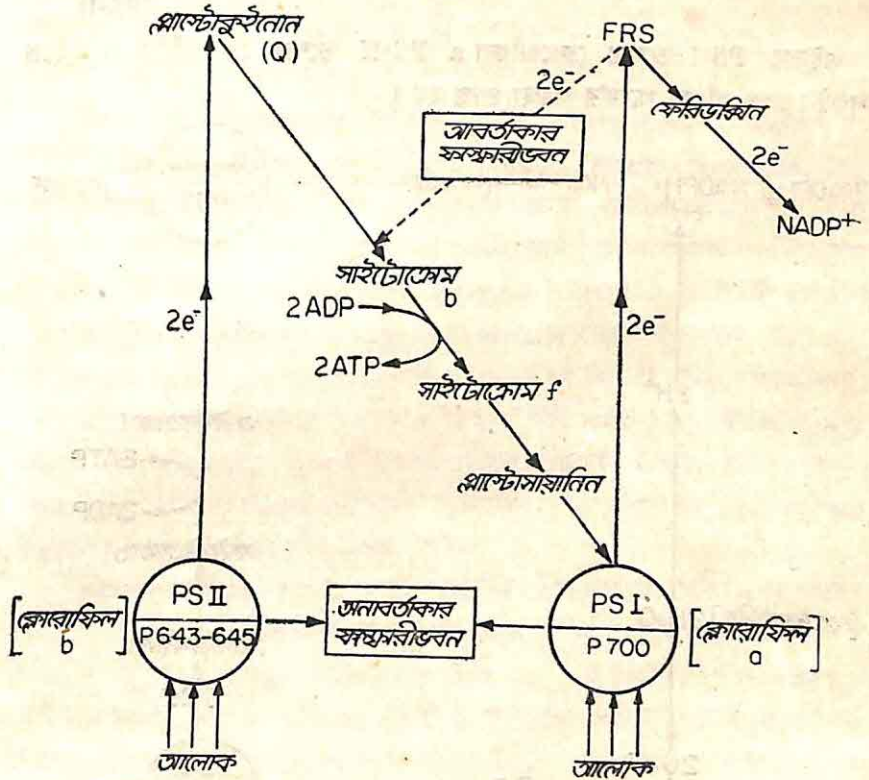
চিত্র 6.1 : সালোকসংশ্লেষের আলোক বিক্রিয়ার প্রথম রঞ্জক তন্ত্র (PS-I) ও দ্বিতীয় রঞ্জক তন্ত্রের (PS-II) সম্পর্ক। চিত্রে আবর্তাকার ও অনাবর্তাকার ফস্ফোরীভবনের সম্পর্কও দেখানো হইয়াছে।

অনাবর্তাকার : যে প্রক্রিয়ায় PS-I তন্ত্রের ক্লোরোফিল a হইতে নির্গত উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন বিভিন্ন জৈব বাহকের (FRS**, ফেরিডক্সিন) মাধ্যমে প্রান্ত-গ্রাহক $NADP^+$-র সহিত মিলিত হয় এবং ক্লোরোফিল a অণুর শূন্যস্থান PS-II তন্ত্রের ক্লোরোফিল b হইতে নির্গত তেজোময় ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হয় এবং পথে ATP তৈয়ারি হয় তাহাকে অনাবর্তাকার ফস্ফোরীভবন বলে। প্রকৃতপক্ষে PS-II

* FMN=ফ্লাভিন মনোনিউক্লিওটাইড (Flavin mononucleotide)

** FRS=ফেরিডক্সিন বিজারক পদার্থ (Ferredoxin reducing substance)

হইতে PS-I তন্ত্রে ইলেকট্রনের স্থানান্তকরণ বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে নিম্নলিখিত পথে সম্পন্ন হয় ঃ

$$\text{ক্লোরোফিল b (PS-II)} \xrightarrow{e^-} \text{প্লাস্টোকুইনোন} \xrightarrow{e^-} \text{সাইটোক্রোম b} \xrightarrow{e^-} \text{সাইটোক্রোম f} \xrightarrow{e^-} \text{প্লাস্টোসায়ানিন} \xrightarrow{e^-} \text{ক্লোরোফিল a. (PS-I)}$$
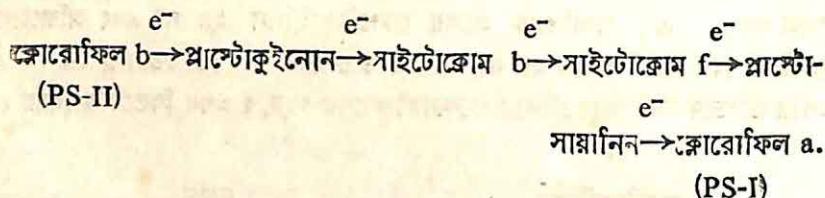
এইভাবে PS-I তন্ত্রের ক্লোরোফিল a PS-II তন্ত্রের ক্লোরোফিল b হইতে ইলেকট্রন গ্রহণ করিয়া পূর্বের অবস্থা প্রাপ্ত হয় ।
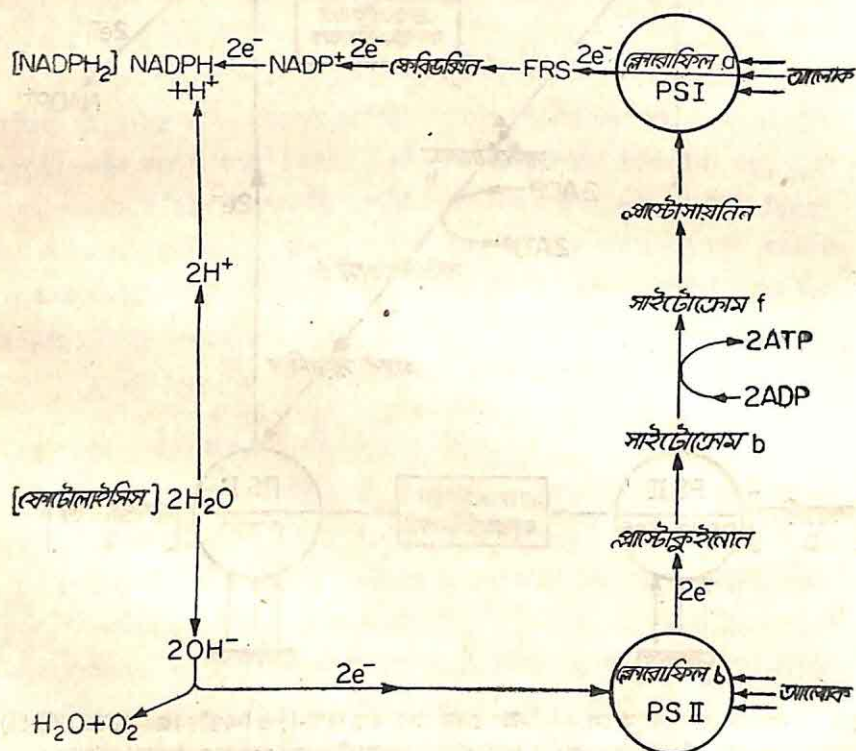
চিত্র 6.2 : PS-I, PS-II ও ফোটোলাইসিসের সম্পর্কের রূপরেখা

(iii) জল অণুর বিশ্লেষণ : PS-II তন্ত্রের ক্লোরোফিল b হইতে ইলেকট্রন বিচ্যুত হইলে উক্ত ক্লোরোফিল জারিত হয় । আলোর প্রভাবে জারিত ক্লোরোফিল ও জল অণুর বিক্রিয়ার ফলে জল বিশ্লিষ্ট হইয়া H^+ ও OH^- আয়নে পরিণত হয় । জল অণুর এই বিশ্লেষণকে ফোটোলাইসিস বলে । ফোটোলাইসিসের বিশদ ব্যাখ্যা জানা যায় নাই, তবে জল অণুর বিশ্লেষণে ফোটোএনজাইম (Photoenzyme) নামক উৎসেচক, Mn^{++} ও Cl^--এর ভূমিকা অনস্বীকার্য । ফোটোলাইসিসের

ফলে উৎপন্ন H^+এবং PS-I তন্ত্রের মাধ্যমে বিচ্যুত ইলেকট্রন $NADP^+$কে বিজারিত করে। আবার OH^- হইতে একটি ইলেকট্রন বাহির হইলে OH^- আয়ন OH মূলকে (Radicle) পরিণত হয়। এই OH মূলক বিশ্লিষ্ট হইয়া জল ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে। OH^- আয়ন হইতে বিচ্যুত ইলেকট্রন জারিত ক্লোরোফিল b-র সহিত যুক্ত হইলে উক্ত ক্লোরোফিল পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসে এবং পুনরায় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিতে পারে।

$$H_2O \rightarrow H^+ + OH^-, \ OH^- - e^- \rightarrow OH$$
$$2\ OH \rightarrow H_2O_2, \ 2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$$
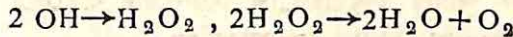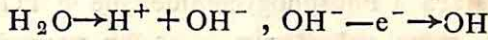
(iv) **হিল বিক্রিয়া** (Hill Reaction) : 1940 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হিল প্রমাণ করেন যে অন্তরিত (Isolated) বা পৃথকীকৃত ক্লোরোপ্লাস্টে আলোক, জল ও হাইড্রোজেন গ্রহীতার উপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যতীত অক্সিজেনের উদ্ভব ঘটে। হিলের এই বিক্রিয়াকে হিল বিক্রিয়া এবং হাইড্রোজেন গ্রাহককে (সাধারণত $NADP^+$) হিল বিকারক (Hill reactant) বলে। বর্তমানে তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে সালোকসংশ্লেষে উদ্ভূত অক্সিজেন জল হইতে আসে। উচ্চস্তরের উদ্ভিদে ফোটোলাইসিস ও হিলের বিক্রিয়া একই এবং অভিন্ন।

(v) **বিজারিত $NADP^+$ বা $NADPH_2$ গঠন** : PS-I তন্ত্রের ক্লোরোফিল a হইতে নিক্ষিপ্ত ইলেকট্রন (e^-) ও ফোটোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত H^+ (প্রোটন) দ্বারা $NADP^+$ (Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) বিজারিত হয় এবং $NADPH_2$ গঠন করে।

$NADP^+ + 2e^- + 2H^+ \rightarrow NADPH_2$ [প্রকৃতপক্ষে $NADPH + H^+$]

এই $NADPH_2$ অন্ধকার দশায় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

(b) অন্ধকার বিক্রিয়া (Dark reaction) : এই বিক্রিয়া আলোক নিরপেক্ষ অর্থাৎ দিনের বেলায় ঘটিলেও আলোর প্রয়োজন হয় না। অন্ধকার বিক্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্টিডের স্ট্রোমা অংশের মধ্যে সম্পন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় আলোক দশায় উৎপাদিত ATP সহযোগে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। বিজ্ঞানী ব্ল্যাকম্যান এই বিক্রিয়া আবিষ্কার করেন বলিয়া ইহাকে ব্ল্যাকম্যান বিক্রিয়া (Blackmann reaction) বলে। এই বিক্রিয়ায় নিম্নলিখিত ঘটনাবলী ঘটে—

(i) **কার্বন ডাই-অক্সাইডের স্থিতিকরণ** (Fixation of CO_2) : এই বিক্রিয়ার প্রথমে বায়ুমণ্ডল হইতে গৃহীত CO_2 মেসোফিল কোষস্থিত পাঁচ কার্বনযুক্ত জৈব যৌগ রাইবিউলোজ বাইফসফেট (RuBP)* এর সহিত যুক্ত হইয়া একটি অস্থায়ী যৌগ কিটো অ্যাসিড ডাইফসফেট (Keto acid diphosphate) গঠন করে এবং ইহা পরে ভাঙিয়া দুই অণু তিন কার্বনযুক্ত ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড

* RuBP (Ribulose biphosphate) কে RuDP বা Ribulose diphosphate (রাইবিউলোজ ডাইফসফেট) বলা হয়। তবে বর্তমানে RuBP হিসাবে লেখা হইয়া থাকে।

(PGA) উৎপন্ন করে। এই PGA সালোকসংশ্লেষে উৎপাদিত প্রথম কার্বনযুক্ত জৈব যৌগ।

(ii) **PGA-এর বিজারণ** (Reduction of PGA): এই দশায় PGA আলোক দশায় উৎপন্ন ATP-র সহিত যুক্ত হইয়া ডাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (Diphosphoglyceric acid বা DPGA) উৎপন্ন করে। এই DPGA পরবর্তী পর্যায়ে আলোক দশায় উৎপন্ন $NADPH_2$ দ্বারা বিজারিত হইয়া তিন কার্বনযুক্ত ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইডে (Phosphogyceraldehyde বা PGALD) পরিণত হয়। PGALD আবার ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটে (Dihydroxy acetone phosphate বা DAP) রূপান্তরিত হয়।

$$PGA + ATP \rightarrow DPGA + ADP$$

$$DPGA + NADPH_2 \rightarrow PGALD + NADP, \; PGALD \rightleftharpoons DAP$$
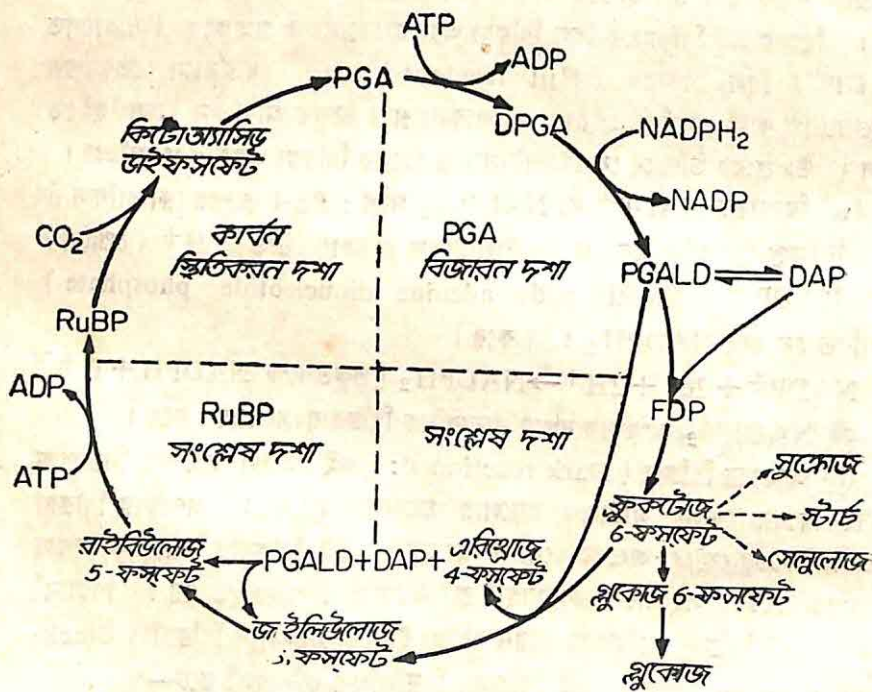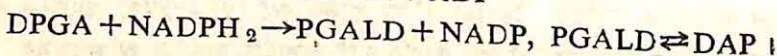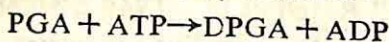
চিত্র 6.3 : কেলভিন চক্রের (অন্ধকার বিক্রিয়া) রূপরেখা

(iii) **সংশ্লেষ দশা** (Synthetic phase): এই পর্যায়ে PGALD ও DAP যুক্ত হইয়া এক অণু ফ্রুকটোজ ডাইফসফেট (Fructose diphosphate বা FDP) গঠন করে। এই FDP হইতে ধারাবাহিক বিক্রিয়ায় ফ্রুকটোজ 6 ফসফেট, গ্লুকোজ ফসফেট এবং পরিশেষে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে, সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন ফ্রুকটোজ 6 ফসফেটের স্বল্প পরিমাণ গ্লুকোজে পরিণত হয়। উহার বেশির

ভাগ বিভিন্ন জটিল বিক্রিয়ার মাধ্যমে সুক্রোজ, স্টার্চ ও সেলুলোজ উৎপন্ন করে।

PGALD + DAP→FDP, FDP→গ্লুকোজ

(iv) **RuBP সংশ্লেষ** (Synthesis of RuBP) : সকল PGALD অণু গ্লুকোজ বা অন্যান্য শর্করা গঠনে অংশগ্রহণ করে না, পরন্তু বেশির ভাগ RuBP গঠনে অংশগ্রহণ করে। এই পর্যায়ে PGALD ও ফ্রুকটোজ 6 ফসফেট বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে রাইবিউলোজ মনোফসফেট (RuMP) বা রাইবিউলোজ 5 ফসফেট তৈয়ারি হয় ও তথা হইতে ATP সহযোগে রাইবিউলোজ বাইফসফেট (RuBP) গঠিত হয়। ইহা ব্যতীত DAP রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিয়া RuMP সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে। এই RuBP পুনরায় সালোকসংশ্লেষের অন্ধকার দশায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের (CO_2) সহিত যুক্ত হয়।

যে চক্রাকার ও জটিল প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের CO_2-এর সংবন্ধন ও তাহার ধারাবাহিক বিজারণের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য ও RuBP প্রস্তুত হয় তাহাকে কেলভিন চক্র (Calvin cycle) বলে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে কেলভিন চক্রের প্রতিটি বিক্রিয়ায় উৎসেচকের প্রয়োজন হয়। কেলভিন চক্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছকের আকারে দেওয়া হইল।
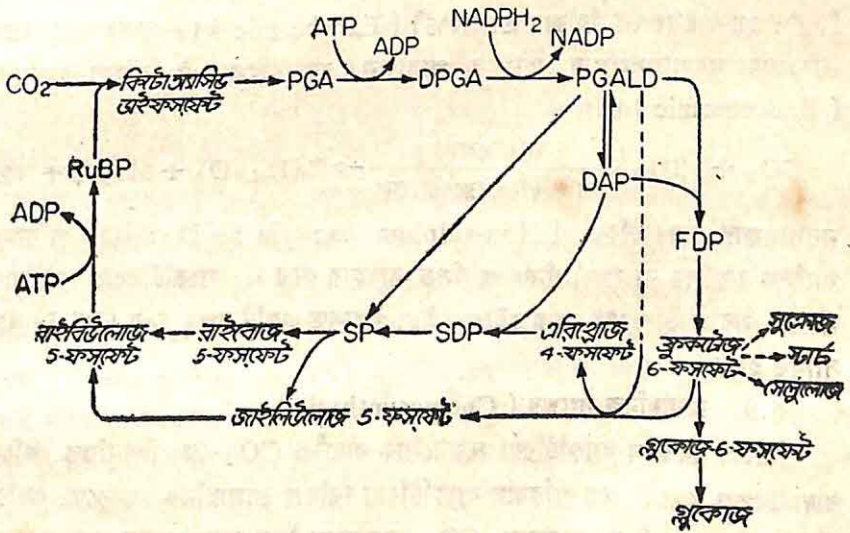
চিত্র 6.4 : কেলভিন চক্র বা অন্ধকার বিক্রিয়ার সম্পূর্ণ ছক

রাইবিউলোজ বাই ফসফেট (RuBP) সংশ্লেষের সংক্ষিপ্তসার :

(i) ফ্রুকটোজ 6 ফসফেট (FP) + PGALD→জাইলিউলোজ 5 ফসফেট (XP) + এরিথ্রোজ 4 ফসফেট (EP)

বা { FP→EP + অ্যাকটিভ গ্লাইকল অ্যালডিহাইড (AGA)
AGA + PGALD→XP

(ii) EP + DAP→SDP (সেডোহেপটিউলোজ ডাই-ফসফেট)
SDP→SP (সেডোহেপটিউলোজ 7 ফসফেট)
SP + PGALD→RP (রাইবোজ 5 ফসফেট) + XP

(iii) XP→RuP (রাইবিউলোজ 5 ফসফেট)
RP→RuP

(iv) RuP—RuBP

6.8 **ব্যাকটিরিয়ার সালোকসংশ্লেষ** (Photosynthesis in Bacteria) :

সবুজ সালফার ব্যাকটিরিয়া (Green sulphur bacteria, যেমন—ক্লোরোবিয়াম), নীল লোহিত সালফার ব্যাকটিরিয়া (Purple sulphur bacteria, যেমন—ক্রোম্যাটিয়াম) প্রভৃতির দেহে যথাক্রমে ব্যাকটিরিওভিরিডিন বা ব্যাকটিরিওপারপিউরিন (Bacterioviridin বা Bacteriopurpurin), ব্যাকটিরিওক্লোরোফিল (Bacteriochlorophyll) প্রভৃতি সালোকসংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ বিদ্যমান। এই রঞ্জক পদার্থ সালফার ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে H_2S হইতে হাইড্রোজেনকে মুক্ত করিয়া CO_2 বিজারণের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষ করে। এই জাতীয় সংশ্লেষে অক্সিজেনের পরিবর্তে সালফার উৎপন্ন হয় যাহা কোষে জমা হইতে থাকে এবং শক্তি নির্গত হয় অর্থাৎ এই বিক্রিয়া তাপমোচী (Exothermic)। অপরপক্ষে উন্নত উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষে তাপের প্রয়োজন হয় বলিয়া ঐ বিক্রিয়া তাপগ্রাহী (Endothermic)।

$$6CO_2 + 12H_2S \xrightarrow[\text{ব্যাকটিরিওক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 12S$$
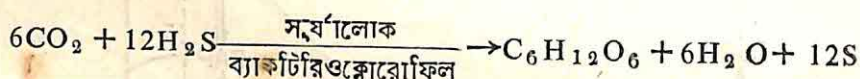
ননসালফার ব্যাকটিরিয়া (Non-sulphur bacteria) H_2S-এর পরিবর্তে ম্যালিক অ্যাসিড বা সাকসিনিক অ্যাসিড ব্যবহার করে। ব্যাকটিরিয়ার সালোকসংশ্লেষ সবুজ উদ্ভিদের ন্যায় হইলেও ইহা প্রধানত একটি রঞ্জক তন্ত্র (PS-I) দ্বারা সাধিত হয়।

6.9 **রাসায়নিক সংশ্লেষ** (Chemosynthesis) :

বিভিন্ন বর্ণহীন ব্যাকটিরিয়া সূর্যালোক ব্যতীত CO_2-কে বিজারিত করিয়া খাদ্য উৎপন্ন করে। যে প্রক্রিয়ায় ব্যাকটিরিয়া বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুকে জারিত করিয়া উৎপন্ন শক্তির সাহায্যে CO_2 সহযোগে জৈব খাদ্য প্রস্তুত করে তাহাকে রাসায়নিক সংশ্লেষ বলে। এই প্রক্রিয়াও তাপমোচী। নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া (নাইট্রোসোমোনাস), বর্ণহীন সালফার ব্যাকটিরিয়া (থায়োব্যাসিলাস), লৌহ ব্যাকটিরিয়া (ফেরোব্যাসিলাস), হাইড্রোজেন ব্যাকটিরিয়া (হাইড্রোজেনোমোনাস) প্রভৃতি এই প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে। সালফার ব্যাকটিরিয়ার রাসায়নিক সংশ্লেষের পদ্ধতি উল্লেখ করা হইল—

$$2H_2S + O_2 \rightarrow 2H_2O + 2S + 83 \text{ ক্যালোরি}$$

$2S + 2H_2O + 3O_2 \rightarrow 2H_2SO_4 + 256$ ক্যালোরি
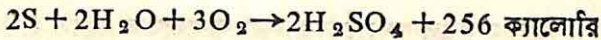
এই শক্তি CO_2-কে বিজারিত করিতে প্রয়োজন হয়।

সুতরাং $6CO_2 + 12H_2S \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 12S$
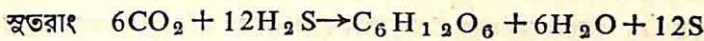
হাইড্রোজেন ব্যাকটিরিয়ার রাসায়নিক সংশ্লেষ: $H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O + 56$ ক্যালোরি

$6CO_2 + 12H_2 \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 112$ ক্যালোরি।
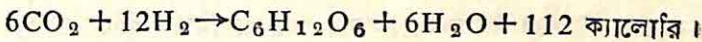
6.9 **আলোকশ্বসন** (Photorespiration) : আলোকের উপস্থিতিতে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষকারী অঙ্গে শ্বসনের হার অন্ধকার পরিবেশ অপেক্ষা অধিক হওয়ায় বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। এই পদ্ধতিকে আলোকশ্বসন বলে। অর্থাৎ আলোক উদ্দীপিত শ্বসনকে আলোকশ্বসন বলে।

6.10 **সালোকসংশ্লেষের তাৎপর্য** (Significance of Photosynthesis) : জীবজগতে সালোকসংশ্লেষের গুরুত্ব অপরিসীম। সমগ্র জীবজগৎ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সালোকসংশ্লেষের উপর নির্ভরশীল। জীবজগতে সালোকসংশ্লেষের অবদান কত পরিমাণ তাহা নিম্নের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে।

1. **শক্তির রূপান্তর ও সঞ্চয় :** সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তির কিয়দংশ রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যে আবদ্ধ হয়। এই শক্তির কিছু অংশ জীবদেহের বিভিন্ন কার্যে ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট পরিমাণ রাসায়নিক শক্তিরূপে কোষমধ্যস্থ ATP-র মধ্যে সঞ্চিত থাকে। প্রাণিজগত এই শক্তি খাদ্যবস্তু হিসাবে উদ্ভিদ হইতে সংগ্রহ করে। এমনকি কাঠ, কয়লা ও পেট্রল হইতে উৎপন্ন শক্তি সৌরশক্তি ব্যতীত কিছুই নয়।

2. **খাদ্যের সরবরাহ ঃ** সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈয়ারি করে এবং পরে এই কার্বোহাইড্রেট হইতে প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্য সংশ্লেষিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ উৎপন্ন খাদ্যের একাংশ নিজস্ব শারীরবৃত্তীয় কার্যে ব্যয় করে এবং অবশিষ্ট অংশ মূল, কাণ্ড, পাতা, ফল বা বীজে সঞ্চয় করিয়া রাখে। শাকাশী বা তৃণভোজী প্রাণীরা খাদ্যের জন্য সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। মাংসাশী প্রাণীরা এই সকল শাকাশী প্রাণীদের খাদ্যবস্তুরূপে গ্রহণ করে। তাই ইহারা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ তথা সালোক-সংশ্লেষের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের এই সম্পর্ক নিম্নের ছক হইতে সহজে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

উদ্ভিদ→পতঙ্গ→ব্যাঙ→সাপ→ময়ূর।

প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানুষ সরাসরি উদ্ভিদকে অথবা উহার ফুল, ফল এবং বীজকে খাদ্য-বস্তুরূপে ভক্ষণ করে এবং পরোক্ষভাবে অন্যান্য প্রাণিকুলের মাধ্যমে (ডিম, মাংস, দুধ) খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে।

3. **বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা ঃ** বায়ু-মণ্ডলের অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হইল যথাক্রমে 20·60%

এবং 0·04 %। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের জন্য বায়ুমণ্ডল হইতে CO_2 গ্রহণ করে এবং O_2 পরিত্যাগ করে। আবার প্রাণিকুল ও উদ্ভিদজগত শ্বাসকার্যের জন্য বায়ুমণ্ডল হইতে O_2 গ্রহণ করে এবং CO_2 পরিত্যাগ করে। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষে যে পরিমাণ O_2 পরিত্যাগ করে তাহার তুলনায় খুব অল্প পরিমাণ O_2 শ্বসনে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের সময় বায়ুমণ্ডল হইতে CO_2 গ্রহণ করিয়া দূষিত বায়ুমণ্ডলকে পরিশোধন করে ও অক্সিজেন ত্যাগ করিয়া বায়ুমণ্ডলে O_2-এর পরিমাণ সঠিক রাখে অথবা বাড়াইয়া দেয়। উদ্ভিদজগত ধ্বংস হইলে বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে। তাই শিল্পাঞ্চলের বাতাসে CO_2-এর পরিমাণ গ্রামাঞ্চল বা সমুদ্রতীর অপেক্ষা অধিক।

4. **সালোকসংশ্লেষ ও মানবসভ্যতা** :

(i) কাগজ শিল্পে ব্যবহৃত কাঠ ও বাঁশের প্রধান উপাদান সেলুলোজ সালোক-সংশ্লেষের অবদান।

(ii) বস্ত্রশিল্পের তুলা ও অন্যান্য শিল্প-সামগ্রী, যথা—কাঠ, রবার, রেয়ন, ফিল্ম, সেলোফেন কাগজ, কোহল, উদ্ভিদ হইতে সংগৃহীত হয়।

(iii) মরফিন, কুইনিন, বেলেডোনা প্রভৃতি ঔষধ উদ্ভিদ তথা সালোকসংশ্লেষের অবদান।

(iv) মানবসভ্যতার দুইটি প্রধান উপাদান কয়লা ও পেট্রল নিঃসন্দেহে সালোকসংশ্লেষের অমূল্য দান।

5. **ভবিষ্যতের জ্বালানি** : সৌরশক্তি অফুরন্ত শক্তির আধার। উদ্ভিদের ন্যায় যদি আমরা এই শক্তিকে যে কোন উপায়ে সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগাইতে পারি তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জ্বালানির কোন চিন্তা থাকিবে না ও মানবসভ্যতার অগ্রগতি আরও দ্রুততর হইবে।

বিষয়-সংক্ষেপ

যে প্রক্রিয়ায় সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্বারা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যবস্তু তৈয়ারি হয় এবং উপজাত পদার্থ হিসাবে জল ও অক্সিজেন নির্গত হয় তাহাকে সালোকসংশ্লেষ বলে।

সালোকসংশ্লেষ দিনের বেলায় সূর্যালোকের উপস্থিতিতে উদ্ভিদের যে কোন সবুজ অংশে ঘটে। ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদে ক্লোরোফিল না থাকায় উহারা সালোক-সংশ্লেষ করিতে পারে না। আবার ইউগ্লিনা, ক্লাইসামিবা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ক্লোরোফিলযুক্ত হওয়ায় উহারা সালোকসংশ্লেষ করিতে পারে। সালোকসংশ্লেষের

কাঁচামাল হইল জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড। এই প্রক্রিয়ায় সাহায্যকারী রঞ্জক পদার্থ হইল বিভিন্ন প্রকার ক্লোরোফিল এবং ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল।

সালোকসংশ্লেষ প্রকৃতপক্ষে একটি জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$$
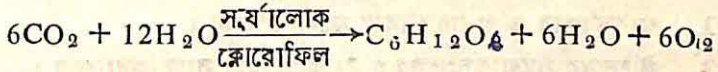
সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি আলোক ও অন্ধকার দশায় বিভক্ত। আলোক দশায় সূর্যালোক অপরিহার্য এবং ইহা ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানা অংশে সম্পন্ন হয়। অন্ধকার দশায় আলোর প্রয়োজন হয় না এবং ইহা ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমা অংশে সম্পন্ন হয়।

1. **আলোক দশা :** আলোকদশায় ক্লোরোফিল সৌরশক্তি শোষণ করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং উহার হাইড্রোজেনের বহিঃকক্ষপথ হইতে উচ্চশক্তিসম্পন্ন একটি ইলেকট্রন বাহির হইয়া যায়। এই ইলেকট্রন জৈব বাহকের মাধ্যমে পরিক্রমা-কালে শক্তি নির্গত করিয়া পুনরায় ঐ ক্লোরোফিল অণুতে ফিরিয়া আসে অথবা প্রান্তগ্রাহক NADP-র সহিত মিলিত হয়। নির্গত শক্তি ATP হিসাবে সঞ্চিত থাকে এবং ইহাকে সালোকসংশ্লেষীয় ফস্ফোরীভবন বলে। ক্লোরোফিল হইতে ইলেকট্রন বিচ্যুত হইলে উহা জারিত হয়। আলোর প্রভাবে জারিত ক্লোরোফিল ও জল অণুর বিক্রিয়ার ফলে জল অণু বিশ্লিষ্ট হইয়া H^+ ও OH^- পরিণত হয় এবং ইহাকে ফেটোলাইসিস বলে। OH^- হইতে ইলেকট্রন বিচ্যুত হইলে OH মূলকে পরিণত হয় এবং OH মূলক বিশ্লিষ্ট হইয়া জল ও অক্সিজেন গঠন করে। ক্লোরো-ফিল হইতে বিচ্যুত ইলেকট্রন (e^-) ও জল অণু হইতে প্রাপ্ত H^+ আয়ন NADP-র সহিত যুক্ত হইয়া $NADPH_2$ গঠন করে।

2. **অন্ধকার দশা :** অন্ধকার দশার প্রারম্ভে CO_2 রাইবিউলোজ বাইফস-ফেটের (RuBP) সহিত যুক্ত হইয়া কিটো অ্যাসিড ডাইফসফেট গঠন করে এবং পরে ভাঙিয়া দুই অণু ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (PGA) উৎপন্ন করে। PGA অতঃপর ATP-র সহিত যুক্ত হইয়া ডাই ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (DPGA) উৎপন্ন করে এই DPGA পরে $NADPH_2$ দ্বারা বিজারিত হইয়া ফসফোগ্লিসার্যাল-ডিহাইডে (PGALD) পরিণত হয়। PGALD আবার ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোনে (DAP) পরিণত হয়। PGALD ও DAP যুক্ত হইয়া ফ্রুকটোজ ডাইফসফেট (FDP) গঠন করে। এই FDP হইতে ধাপে ধাপে ফ্রুকটোজ 6 ফসফেট, গ্লুকোজ ফসফেট ও পরিশেষে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। বেশির ভাগ PGALD অণু ও ফ্রুকটোজ 6 ফসফেট হইতে জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে RuBP তৈয়ারি হয়। ইহাকে কেলভিন চক্র বলে।

তাৎপর্য—সালোকসংশ্লেষ সৌরশক্তির রূপান্তর ও সঞ্চয় খাদ্যের সরবরাহ, বায়ুমণ্ডলের O_2 ও CO_2-এর ভারসাম্য রক্ষা ও মানবসভ্যতার বিভিন্ন কার্যে সাহায্য করে।

প্রশ্নাবলী

A. পার্থক্য উল্লেখ কর :

1. আলোক দশা ও অন্ধকার দশা।
2. আবর্তাকার ও অনাবর্তাকার ফস্ফোরাইভবন।
3. উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ ও ব্যাকটিরিয়ার সালোকসংশ্লেষ।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

1. সালোকসংশ্লেষকে অঙ্গার আত্তীকরণ বলে কেন ?
2. ফোটন কণিকা কি ?
3. সালোকসংশ্লেষ কোথায় ও কখন ঘটে ?
4. সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণকারী রঞ্জক পদার্থগুলির নাম উল্লেখ কর।
5. অধিকাংশ গাছের পাতা সবুজ কেন ?
6. সালোকসংশ্লেষের মূল উপাদান কি কি ?
7. সালোকসংশ্লেষীয় একক কাহাকে বলে ?
8. আলোক দশা ও অন্ধকার দশা ক্লোরোপ্লাস্টের কোথায় কোথায় সম্পন্ন হয় ?
9. ফোটোফোস্ফোরাইলেশন বা সালোকসংশ্লেষীয় ফস্ফোরাইভবন কাহাকে বলে ?
10. আলোর সহিত ক্লোরোফিল কণার সম্পর্ক কি ?
11. NADP, RuBP, PGALD, PGA, FDP, ATP-র পুরো নাম কি ?
12. সালোকসংশ্লেষে উৎপাদিত অক্সিজেন কোথা হইতে আসে ?
13. সালোকসংশ্লেষে উৎপাদিত প্রথম জৈব যৌগের নাম কি ?
14. সালোকসংশ্লেষকে জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া বলে কেন ?

C. টীকা লিখ :

1. আলোক দশা, 2. অন্ধকার দশা, 3. হিল বিক্রিয়া, 4. ফোটোলাইসিস, 5. কেলভিন চক্র, 6. রাসায়নিক সংশ্লেষ।

D. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

1. সালোকসংশ্লেষ কাহাকে বলে ? এই প্রক্রিয়ায় আলোক দশার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
2. ব্যাকটিরিয়ার সালোকসংশ্লেষ ও রাসায়নিক সংশ্লেষের পদ্ধতি উল্লেখ কর।
3. সালোকসংশ্লেষের তাৎপর্য উল্লেখ কর।

সপ্তম অধ্যায়	শ্বসন (Respiration)

7.1 জীবদেহের সকল শারীরবৃত্তীয় কার্য পরিচালনার জন্য শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তির উৎস খাদ্যবস্তু হইলেও খাদ্যবস্তু হইতে সরাসরি শক্তি উৎপন্ন হয় না। যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই খাদ্যবস্তু ভাঙিয়া শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাকে শ্বসন বলে। শ্বসনে জটিল খাদ্যবস্তু ভাঙিয়া সরল খাদ্যে পরিণত হয় বলিয়া ইহাকে অপচিতি (Catabolism) প্রক্রিয়া বলে।

যে প্রক্রিয়ায় জীবকোষের জটিল জৈব যৌগ বা খাদ্যবস্তু জারিত হইয়া সরল পদার্থে পরিণত হইবার সময় খাদ্যস্থিত স্থৈতিক শক্তি রাসায়নিক শক্তি (ATP) বা গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় ও তাপশক্তি উৎপাদন করে তাহাকে শ্বসন বলে। ইহা একপ্রকার ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়া (Physico-chemical process)। শ্বসনের ভৌত প্রক্রিয়ায় বা প্রাথমিক পর্যায়ে শ্বাস অঙ্গে অক্সিজেন প্রবিষ্ট হয় ও শ্বাস অঙ্গ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। ইহাকে বাহিক শ্বসন (External respiration) বলে। আবার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বা দ্বিতীয় পর্যায়ে কোষস্থিত খাদ্যবস্তু জারিত হইয়া শক্তি উৎপাদন করে। তাই ইহাকে অভ্যন্তরীণ শ্বসন (Internal respiration) বা কলাশ্বসন (Tissue respiration) বলে।

7.2 **শ্বাসকার্য ও শ্বসন** (Breathing and Respiration) : জীবের শ্বাস অঙ্গে অক্সিজেনের প্রবেশ ও ঐ অঙ্গ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নির্গমনকে শ্বাসকার্য বলে। ইহা শ্বসন প্রক্রিয়ার একটি অংশ মাত্র। ইহাকে সাধারণ কথায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বলে। কিন্তু শ্বসন একটি সম্পূর্ণ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যাহা শুধু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বা ভৌত প্রক্রিয়া নয়, পরন্তু ইহার মাধ্যমে খাদ্যবস্তু জারিত হইয়া শক্তি উৎপন্ন করে।

শ্বসনস্থল (Site of respiration): শ্বসন সকল সজীবকোষে দিবারাত্র সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে গ্যাসীয় বিনিময় সম্পন্ন হইবার পর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রথম অংশ কোষের সাইটোপ্লাজমে ও দ্বিতীয় অংশ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে কোষের মাইটোকনড্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। শ্বসন বন্ধ হইলে জীবদেহের মৃত্যু ঘটে।

শ্বসনবস্তু (Respiratory substrate): শ্বসনকালে যে সকল খাদ্যবস্তু জারিত হইয়া শক্তি উৎপাদন করে তাহাকে শ্বসনবস্তু বলে। শর্করা, প্রোটিন, স্নেহ-পদার্থ ও জৈব অ্যাসিড বিভিন্ন প্রকার শ্বসনবস্তু হইলেও প্রধান শ্বসনবস্তু হইল গ্লুকোজ নামক সরল শর্করা।

7.3 **শ্বসনের প্রকারভেদ** (Types of respiration) : শ্বসন দুই প্রকার—সবাত শ্বসন (Aerobic respiration) ও অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration)।

(i) **সবাত শ্বসন**—যে প্রক্রিয়ায় কোষমধ্যস্থ শ্বসনবস্তু (সাধারণত গ্লুকোজ) অক্সিজেনের সাহায্যে সম্পূর্ণ জারিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ও প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে তাহাকে সবাত শ্বসন বলে। এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের সমপরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়।

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 673$ কিলো ক্যালোরি।
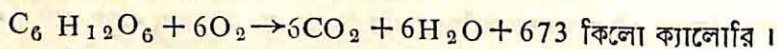
(ii) **অবাত শ্বসন**—যে প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ব্যতীত কোষমধ্যস্থ শ্বসনবস্তুর অসম্পূর্ণ জারণ ঘটে ও অল্প পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয় তাহাকে অবাত শ্বসন বলে। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ কোষে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও ইথাইল অ্যালকোহল এবং ব্যাকটিরিয়া ও পেশীকোষে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3.CH_2.OH + 2CO_2 + 28$ কিলো ক্যালোরি
গ্লুকোজ ইথাইল অ্যালকোহল

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3.CHOH.COOH + 36$ কিলো ক্যালোরি
গ্লুকোজ ল্যাকটিক অ্যাসিড
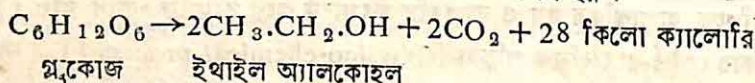
7.4 **ক্ষয়, সন্ধান ও শটন বা পচন** (Decay, Fermentation and Putrefaction) :

(i) **ক্ষয়**—অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ব্যাকটিরিয়া কর্তৃক জৈববস্তুর ভাঙনকে (Decomposition) ক্ষয় বলে। ইহার ফলে কোন দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয় না।

(ii) **সন্ধান**—ইহা একপ্রকার অবাত শ্বসন। কতিপয় ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ কর্তৃক হেক্সোজ জাতীয় শর্করার অবাত জারণই সন্ধান। সাধারণত ঈস্ট কর্তৃক কোষবহিঃস্থ শর্করার (গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ প্রভৃতি) অবাত জারণকে কোহল সন্ধান (Alcoholic fermentation) বলে। ইহার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইথাইল অ্যালকোহল ও শক্তি উৎপন্ন হয়। আবার অনেক ব্যাকটিরিয়া, কোষবহিঃস্থ শর্করাকে গাঁজাইয়া (Ferment) অ্যাসিটোন, মিথাইল অ্যালকোহল, ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রভৃতি পদার্থে পরিণত করে। যেমন ল্যাক্টোব্যাসিলাস (Lactobacillus) ব্যাকটিরিয়া দুগ্ধ শর্করা ল্যাক্টোজকে ভাঙ্গিয়া ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত করে। এই প্রক্রিয়াকে ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধান (Lactic acid fermentation) বলে।

(iii) **শটন বা পচন**—অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে ব্যাকটিরিয়া কর্তৃক নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব যোগের ভাঙনকে শটন বা পচন বলে। ইহার ফলে দুর্গন্ধময় সালফারযুক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয়।

7.5 **শ্বাসহার** (Respiratory quotient বা RQ) : শ্বসনক্রিয়ায় পরিত্যক্ত CO_2 ও গৃহীত O_2-এর অনুপাতকে শ্বাসহার বলে। ইহা একটি অনুপাত মাত্র।

$$RQ = \frac{\text{পরিত্যক্ত } CO_2\text{-এর পরিমাণ}}{\text{গৃহীত } O_2\text{-এর পরিমাণ}}$$

শ্বাসহার বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন। শ্বসনে কি ধরনের খাদ্যবস্তু জারিত হয় তাহা শ্বাসহার হইতে বুঝা যায়।

সবাত শ্বসনে গ্লুকোজের $RQ = \frac{6CO_2}{6O_2} = 1$

অবাত শ্বসনে গ্লুকোজের $RQ = \frac{2CO_2}{O} = \infty$ (অসীম)।

স্নেহপদার্থ বা ফ্যাটের ক্ষেত্রে অক্সিজেনের পরিমাণ কার্বন ও হাইড্রোজেন অপেক্ষা কম হওয়ায় ইহাদের জারণে অধিক পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়।

যেমন, ওলিক অ্যাসিডে $RQ = \frac{18CO_2}{25 \cdot 5\ O_2} = 0 \cdot 71$

প্রোটিনে অক্সিজেনের পরিমাণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা বেশী হওয়ায় শ্বাসহার 1 অথবা উহার বেশী হয়।

যেমন, অ্যালানিনে $RQ = \frac{3CO_2}{3O_2} = 1$

অ্যাসপারটিক অ্যাসিডে $RQ = \frac{4CO_2}{3O_2} = 1 \cdot 33$

7.6 **শ্বাসরঞ্জক** (Respiratory Pigments) : উচ্চস্তরের প্রাণীদের শ্বসনে গ্যাসের পরিবহণ রক্তের যে পদার্থের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাহাকে শ্বাসরঞ্জক বলে। ইহা প্রধানত চারি প্রকার—

(i) **ক্লোরোক্রুওরিন** (Chlorocruorin) : ইহা হিমোগ্লোবিন সদৃশ একপ্রকার লোহঘটিত সবুজ রঞ্জক পদার্থ যাহা অঙ্গুরীমাল পর্বের পলিকীট জাতীয় প্রাণীদের রক্তরসে থাকে।

(ii) **হিমোএরিথ্রিন** (Haemoerythrin) : ইহা একপ্রকার লোহঘটিত বেগুনী রঞ্জক পদার্থ যাহা পলিকীট ও বিভিন্ন ক্রিমির রক্তকণিকায় থাকে।

(iii) **হিমোসায়ানিন** (Haemocyanin) : ইহা একপ্রকার তাম্রঘটিত নীল রঞ্জক পদার্থ যাহা চিংড়ি, কম্বোজ প্রাণীর রক্তরসে থাকে।

(iv) **হিমোগ্লোবিন** (Haemoglobin) : ইহা একপ্রকার লোহঘটিত লাল রঞ্জক পদার্থ যাহা কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তরসে ও সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর লোহিত রক্তকণিকায় থাকে।

ইহা ব্যতীত পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপেশী ও ঐচ্ছিক পেশীতে মায়োগ্লোবিন (Myoglobin) নামক লৌহ-প্রোটিন রঞ্জক পদার্থ থাকে যাহার অক্সিজেন পরিবহণের ক্ষমতা আছে।

উচ্চস্তরের প্রাণীদের অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অক্সিহিমোগ্লোবিন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া কার্বামিনো-হিমোগ্লোবিন গঠন করিয়া পরিবাহিত হয়।

7.7 শ্বাসঅঙ্গ (Respiratory organs) : বিভিন্ন প্রকার জীবে শ্বাসঅঙ্গ বিভিন্ন। এই সকল অঙ্গের মাধ্যমে জীব পরিবেশ হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং দেহ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার জীবের শ্বাস অঙ্গ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হইল।

1. উদ্ভিদের শ্বাস অঙ্গ—উদ্ভিদের কোন নির্দিষ্ট শ্বাস অঙ্গ নাই। জলজ উদ্ভিদ জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন ও নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ বায়ু হইতে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন গ্রহণ করে। উচ্চস্তরের উদ্ভিদ পত্ররন্ধ্র ও লেন্টিসেল দ্বারা বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে। আবার একই অঙ্গের মাধ্যমে শ্বসনে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহের বাহিরে পরিত্যক্ত হয়।
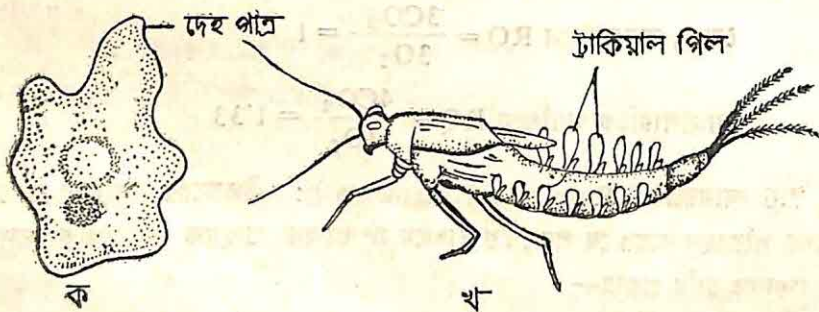
চিত্র 7.1 : বিভিন্ন প্রাণীর শ্বাসঅঙ্গ : (ক) অ্যামিবার দেহগাত্র, (খ) পতঙ্গের ট্রাকিয়াল গিল

2. প্রাণীদের শ্বাস অঙ্গ—নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের কোন নির্দিষ্ট শ্বাস অঙ্গ নাই। উচ্চস্তরের প্রাণীদের দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী শ্বাসঅঙ্গের গঠন ও শ্বাস গ্রহণ পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের শ্বাস অঙ্গ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

(i) দেহগাত্র (Body surface)—অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম, স্পঞ্জ, প্ল্যানেরিয়া, হাইড্রা প্রভৃতি প্রাণীরা দেহগাত্রের মাধ্যমে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে ও দেহ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। এই সকল প্রাণীর দেহগাত্র শ্বসনতল হিসাবে কাজ করে।

(ii) চর্ম (Skin)—কেঁচো, জোঁক, ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণীরা রক্তজালকযুক্ত সিক্ত ত্বকের দ্বারা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কোষ হইতে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্বকের দ্বারা একই প্রক্রিয়ায় পরিত্যাগ করে।

(iii) শ্বাসনালী (Trachea)—আরশোলা, প্রজাপতি, মথ, ফড়িং, পিঁপড়া প্রভৃতি পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণী শ্বাসনালীর মাধ্যমে শ্বাসকার্য চালায়। শ্বাসনালী দেহের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালিকায় পরিণত হয় ও সরাসরি কোষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। শ্বাসনালী বাহিরে শ্বাসছিদ্র পথের (Spiracle) সঙ্গে যুক্ত হইবার জন্য ঐ ছিদ্রপথ দ্বারা অক্সিজেন শ্বাসনালীর মাধ্যমে সরাসরি কোষে কোষে প্রবেশ করে ও শ্বসন অন্তে একই পথে কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহের বাহিরে নির্গত হয়। সেইজন্য এই সকল প্রাণীর রক্ত সংবহন-তন্ত্রে কোন রঞ্জক পদার্থের প্রয়োজন হয় না এবং ইহাদের রক্ত সংবহন তন্ত্রের সঙ্গে শ্বসন তন্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই।
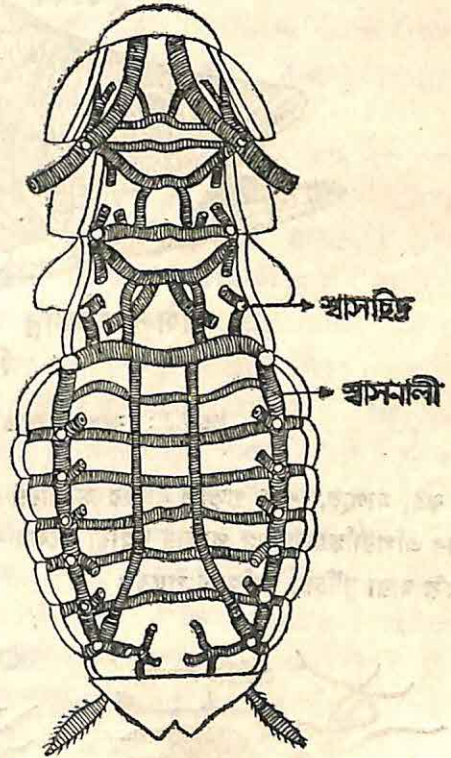
চিত্র 7.2 : আরশোলার শ্বাসনালী

(iv) ফুলকা (Gill) : চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক, সেপিয়া, ললিগো, ব্যাঙাচি, মাছ প্রভৃতি জলজ প্রাণীরা ফুলকার মাধ্যমে শ্বাসকার্য চালায়। ফুলকা আবৃত অথবা অনাবৃত অবস্থায় থাকে। ফুলকাগুলি রক্তজালক সমৃদ্ধ হইবার জন্য উহারা জল হইতে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন গ্রহণ করে ও একই পদ্ধতিতে দেহ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে।

মশা, গুবরে পোকা প্রভৃতির লার্ভার ফুলকায় রক্তজালকের পরিবর্তে সূক্ষ্ম শ্বাসনালীর জালক থাকে। তাই এই জাতীয় ফুলকাকে শ্বাসনালী ফুলকা (Tracheal gill) বলে। এই জাতীয় ফুলকা জলের উপরিতলে ভাসমান অবস্থায় থাকিয়া বাতাস হইতে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করে।

রাজকাঁকড়ার (King Crab) দেহের অঙ্কীয়তলে অবস্থিত ফুলকাগুলি দেখিতে পুস্তকের পৃষ্ঠার ন্যায় অনেক ভাঁজযুক্ত হওয়ায় এই ধরনের ফুলকাকে পুস্তক ফুলকা (Book gill) বলে। ইহারা পুস্তক ফুলকা দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়।
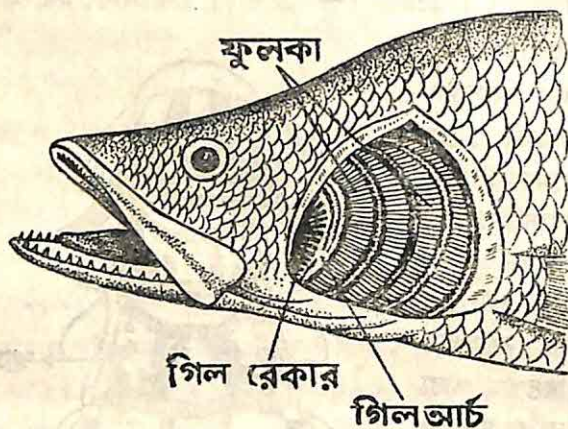
চিত্র 7.3 : মাছের শ্বাসযন্ত্র (ফুলকা)

কই, মাগুর, শিঙি প্রভৃতি মাছের অতিরিক্ত শ্বসন অঙ্গ এবং শোল, ল্যাটা প্রভৃতি মাছের এপিব্রাঙ্কিয়াল অঙ্গ থাকায় উহারা জলের বাহিরে অনেকক্ষণ বায়বীয় শ্বাসকার্যের দ্বারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

চিত্র 7.4 : অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র : (ক) মাগুর মাছ, (খ) শিঙ্গি মাছ

(v) **ফুসফুস** (Lungs) : উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী শ্রেণীর সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্বাসঅঙ্গ ফুসফুস। এমনকি তিমি, শুশুক, ডলফিন, ডিউগং, ম্যানাটি প্রভৃতি জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ফুসফুস দ্বারা শ্বসন সম্পন্ন করে। ফুসফুস রক্তজালকযুক্ত হওয়ায় বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করিলে রক্তজালকস্থিত রক্ত ফুসফুস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং উহার পরিবর্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে।

ডিপনই (প্রোটোপটেরাস, নিওসেরাটোডাস, লেপিডোসাইরেন) মাছের ফুলকা ও বায়ুথলি বা ফুসফুস থাকে যাহার দ্বারা উহারা স্থলজ শ্বাসকার্য চালায়।

পাখীর ফুসফুসের সঙ্গে অতিরিক্ত নয়টি বায়ুস্থলী (Air-sacs) যুক্ত থাকায় উহারা দীর্ঘসময় ব্যাপিয়া আকাশে বিচরণ করিতে পারে।

মাকড়সা, বিছা প্রভৃতি প্রাণীদের বায়ুথলি বা ফুসফুস ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন গ্রহণ করে তাই এই জাতীয় ফুসফুসকে ব্যাপন ফুসফুস (Diffusion lungs) বলে। এই জাতীয় ফুসফুসের গঠন পুস্তকের পৃষ্ঠার ন্যায় খাঁজযুক্ত হওয়ায় ইহাদের পুস্তক-ফুসফুস (Book-lungs) বলে।

মানুষের শ্বসনঅঙ্গ (Respiratory organs in Man) : মানুষের শ্বাস-অঙ্গ হইল ফুসফুস। ফুসফুসদ্বয় বক্ষঃগহ্বরের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের দুই পার্শ্বে অবস্থান করে। স্পঞ্জের ন্যায় গঠনযুক্ত ফাঁপা ফুসফুসদ্বয় দ্বিস্তরযুক্ত আবরণ বা প্লুরা (Pleura) দ্বারা আবৃত। বাহিরের আবরণকে প্যারাইটাল প্লুরা (Parietal pleura) ও ভিতরের আবরণকে ভিসেরাল প্লুরা (Visceral pleura) বলে। দুইটি আবরণীর মধ্যে বা প্লুরাগহ্বরের মধ্যে পিচ্ছিল তরল বিদ্যমান। প্লুরার প্রদাহ ও উহার গহ্বরের মধ্যে তরল জমা হইলে ঐ রোগকে প্লুরিসি (Pleurisy) বলে। বক্ষঃগহ্বরের প্রাচীর উরঃফলক (Sternum), পাঁজরা (Rib) ও তৎ-সংলগ্ন পেশী দ্বারা গঠিত। বক্ষঃগহ্বরের তলদেশে মধ্যচ্ছদা অবস্থান করে। প্রতি পার্শ্বের ফুসফুস হইতে উদ্গত ক্লোমশাখা (Bronchiole) দুইটি যুক্ত হইয়া শ্বাস-নালী বা ট্রাকিয়া (Trachea) গঠন করে। শ্বাসনালীর উপরের প্রসারিত অংশকে স্বরযন্ত্র (Larynx) বলে। শ্বাসনালী গ্লটিস (Glottis) ছিদ্রপথে গলবিলে মুক্ত হয়। তবে গ্লটিস ছিদ্রপথের উপরে উপজিহ্বা বা এপিগ্লটিস (Epi-glottis) নামে একটি বৃন্তময় অংশ থাকায় খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণের সময় শ্বাস-নালীতে প্রবেশ করে না। ফুসফুসদ্বয় অসংখ্য কুঠুরীযুক্ত বা বায়ুস্থলী (Alveoli) যুক্ত। এই বায়ুস্থলী ঘন রক্তজালক বেষ্টিত থাকায় ফুসফুসকে লাল দেখায়।

মানুষের শ্বসনজনিত বিচলন প্রক্রিয়া (Mechanism of respiratory movement) :

মানুষের শ্বাসকার্য দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত—শ্বাস গ্রহণ (Inspiration) ও নিঃশ্বাস ত্যাগ (Expiration)।

শ্বাসগ্রহণ—পরিবেশ হইতে নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে ফুসফুসের বায়ুস্থলীতে বায়ু প্রবেশ করাকে শ্বাস গ্রহণ বলে। এই প্রক্রিয়া পাঁজরা-সংলগ্ন বহিঃপেশী বা এক্সটার-ন্যাল ইণ্টারকস্টাল পেশী (External intercostal muscle) ও মধ্যচ্ছদা পেশী (Diaphragm muscle) সংকোচনের ফলে ঘটে। ইণ্টারকস্টাল পেশীর সংকোচনের ফলে পাঁজরা বাহিরের দিকে ও উপরের দিকে সরিয়া যায়, ফলস্বরূপ বক্ষঃগহ্বরের প্রসারণ ঘটে। আবার মধ্যচ্ছদা পেশী সংকোচনের ফলে মধ্যচ্ছদা নিচের দিকে

নামিয়া যায়, ফলে বক্ষঃগহ্বরের আয়তন সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পায়। বক্ষঃগহ্বরের অন্তঃপ্রাচীরের সঙ্গে ফুসফুস যুক্ত হওয়ায় বক্ষঃগহ্বরের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের আয়তন বৃদ্ধি পায় তথা প্রসারণ ঘটে। ইহার ফলে ফুসফুস-মধ্যস্থ বায়ুর চাপ হ্রাস পায় এবং বায়ুমণ্ডলের উচ্চচাপযুক্ত বায়ু সহজেই নাসারন্ধ্র পথে ফুসফুসে প্রবেশ করে।

নিঃশ্বাস ত্যাগ—ফুসফুস হইতে নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ু নির্গমন করাকে নিঃশ্বাস ত্যাগ বলে। নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় পাঁজরা-সংলগ্ন আন্তঃপেশী বা ইণ্টারন্যাল ইণ্টারকস্টাল পেশী (Internal intercostal muscle) সংকোচন ও এক্সটারন্যাল ইণ্টারকস্টাল পেশীর প্রসারণের ফলে পাঁজরা নিচের দিকে ও ভিতরের দিকে চালিত হয়। ইতিমধ্যে মধ্যচ্ছদা পেশীর প্রসারণের ফলে মধ্যচ্ছদা উপরের দিকে তথা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসে। ইহাদের সম্মিলিত চাপে বক্ষঃগহ্বরের আয়তন হ্রাস পায়। এই চাপ ফুসফুসের উপর আরোপিত হওয়ায় ফুসফুসের আয়তন হ্রাস পায় এবং উহার মধ্যস্থ বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলস্বরূপ ফুসফুস হইতে বায়ু শ্বাসনালী দ্বারা নাসারন্ধ্র পথে বাহিরে নির্গত হয়।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (Regulation of respiratory movements) : বক্ষঃগহ্বরের আয়তনের পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সুষুম্নাশীর্ষকে (Medulla) অবস্থিত প্রশ্বাসকেন্দ্র ও নিঃশ্বাসকেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রশ্বাসকেন্দ্র হইতে স্নায়বিক উদ্দীপনা গ্রীবাদেশীয় সুষুম্না স্নায়ুতে (3য় হইতে 5ম) পেঁছাইলে ঐ উদ্দীপনা ইণ্টারকস্টাল স্নায়ু ও ফ্রেনিক স্নায়ুর মাধ্যমে যথাক্রমে এক্সটারন্যাল ইণ্টারকস্টাল পেশী ও মধ্যচ্ছদাতে পেঁছায়। ফলস্বরূপ প্রশ্বাসকালে ঐ পেশীগুলি সংকুচিত হইয়া বক্ষঃগহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি করে। আবার ফুসফুসের বৃদ্ধির জন্য বায়ুস্থলীর গাত্রে অবস্থিত টানগ্রাহক (Stretch receptor) উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনা দশম করোটি স্নায়ুর (Vagus nerve) মাধ্যমে নিঃশ্বাসকেন্দ্রকে উদ্দীপিত করিলে প্রশ্বাসকেন্দ্র প্রশমিত হয় এবং ইণ্টারকস্টাল পেশী ও মধ্যচ্ছদা প্রসারিত হইয়া পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসে। ইহার ফলে বক্ষঃগহ্বরের আয়তন হ্রাস পায় এবং চাপে পিষ্ট ফুসফুস সংকুচিত হইয়া নিঃশ্বাসকার্য সম্পন্ন করে।

শ্বসন প্রক্রিয়া (Mechanism of respiration) : সকল জীবের প্রধান শ্বসনবস্তু হইল গ্লুকোজ। কিন্তু প্রাণিদেহে সঞ্চিত শর্করা বা গ্লাইকোজেন ভাঙ্গিয়া গ্লুকোজ অথবা গ্লুকোজ-1-ফসফেট উৎপন্ন করে এবং অতঃপর ইহাদের জারণ ঘটে। উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত স্টার্চ ভাঙ্গিয়া গ্লুকোজে পরিণত হইবার পর উহার জারণ ঘটে।

জীবদেহে সঞ্চিত প্রোটিন ভাঙ্গিয়া অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। অতঃপর অ্যামাইনো অ্যাসিডের অ্যামাইনো (NH_2) অংশ মুক্ত হইয়া ইহা পাইরুভিক

অ্যাসিড বা আলফা কিটো গ্লুটারিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে ক্রেবসের অম্লচক্রে প্রবেশ করে।

সঞ্চিত ফ্যাট ভাঙ্গিয়া ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয়। ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাসিটাইল কো-এনজাইম A (Co-A)-তে পরিণত হয় এবং ক্রেবস্ চক্রে অংশগ্রহণ করে। গ্লিসারল রূপান্তরিত হইয়া ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটে (DAP) পরিণত হয় এবং গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

সকল প্রকার শ্বসন ক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না এবং এই প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ ভাঙ্গিয়া দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। ইহাকে গ্লাইকোলাইসিস বলে। দ্বিতীয় পর্যায়ে মুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিড সম্পূর্ণ জারিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ও শক্তি উৎপন্ন করে। ইহাকে ক্রেবসের অম্লচক্র বলে। নিম্নে ইহাদের বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল।

১ **গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis)**: **যে প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ ভাঙ্গিয়া দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড, দুই অণু ATP ও দুই অণু $NADPH_2$ উৎপন্ন করে তাহাকে গ্লাইকোলাইসিস বলে।** এই প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক হইলেন বিজ্ঞানী এম্বডেন (Embden), মেয়ারহফ্ (Meyerhof), পারনাস (Parnas)। আবিষ্কারকদের আদ্যক্ষর অনুযায়ী এই প্রক্রিয়াকে তাই EMP পথ বলে। এই পদ্ধতি কোষের সাইটোপ্লাজমে অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। গ্লাইকোলাই-সিসে পাইরুভিক অ্যাসিডের জারণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন যুক্ত হয় না, হাইড্রোজেনের বিয়োজন ঘটে। এই প্রক্রিয়ার ধাপগুলি সংক্ষেপে ছকের আকারে আলোচনা করা হইল।

ব্যাখ্যা : (1) এই প্রক্রিয়ার প্রথমে গ্লুকোজ ATP হইতে এক অণু ফসফেট লইয়া গ্লুকোজ-6-ফসফেটে পরিণত হয়। ইহা হেক্সোকাইনেজ নামক উৎসেচক দ্বারা পরিচালিত হয়।

$$\text{গ্লুকোজ} + ATP \rightleftharpoons \text{গ্লুকোজ-6-ফসফেট} + ADP$$
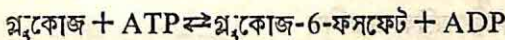
(2) গ্লুকোজ-6-ফসফেট আন্তঃ আণবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ফ্রুকটোজ-6-ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। ইহা ফসফোগ্লুকো আইসোমারেজ উৎসেচকের প্রভাবে ঘটে।

$$\text{গ্লুকোজ-6-ফসফেট} \rightleftharpoons \text{ফ্রুকটোজ-6-ফসফেট}$$
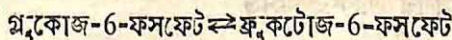
(3) ফ্রুকটোজ-6-ফসফেট আরও একটি ATP হইতে এক অণু ফসফেট লইয়া ফ্রুকটোজ-1, 6-ডাইফসফেটে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়া ফসফোহেক্সোকাইনেজ উৎসেচকের প্রভাবে ঘটে।

$$\text{ফ্রুকটোজ-6-ফসফেট} + ATP \rightleftharpoons \text{ফ্রুকটোজ-1, 6-ডাইফসফেট} + ADP$$
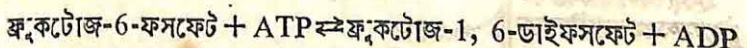
(4) ফ্রুকটোজ-1, 6-ডাইফসফেট অ্যালডোলেজ উৎসেচকের প্রভাবে বিশ্লিষ্ট হইয়া তিন কার্বনযুক্ত এক অণু 3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড ও এক অণু ডাইহাইড্রক্সি

অ্যাসিটোন ফসফেটে পরিণত হয়। আবার এই দুইটি পদার্থ ট্রায়োজফসফেট আইসোমারেজ উৎসেচকের প্রভাবে পরস্পর পরিবর্তনশীল।

ফ্রুকটোজ-1, 6-ডাইফসফেট ⇌ 3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড ⇅ ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট

(5) 3-ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড পরবর্তী পর্যায়ে ফসফরাসযুক্ত হয় এবং ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের প্রভাবে দুইটি হাইড্রোজেন
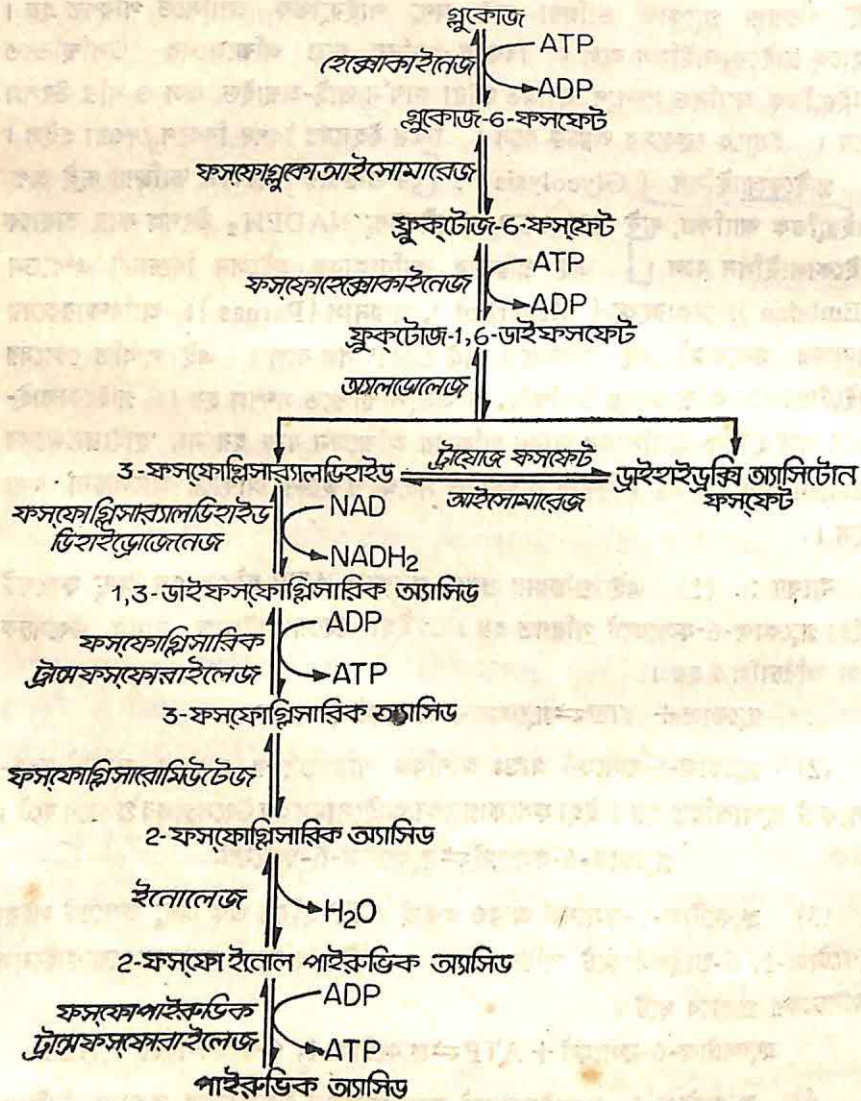
চিত্র 7.5 : গ্লাইকোলাইসিস বা E M P পদ্ধতি

পরমাণু পরিত্যাগ করিয়া জারিত হয়। ফলে 1, 3 ডাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড গঠিত হয়। পরিত্যক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড (NAD) দ্বারা গৃহীত হয় ও $NADH_2$ গঠন করে। সবাত শ্বসনে $NADH_2$ ইলেকট্রন পরিবহণ চক্রে প্রবেশ করে এবং অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া জল ও ATP উৎপন্ন করে।

3 ফসফো গ্লিসার‍্যালডিহাইড + Pi (ফসফেট) + NAD ⇄

1, 3-ডাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড + $NADH_2$
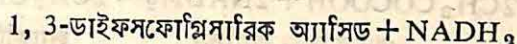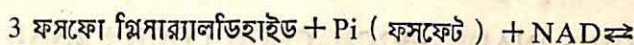
(6) 1, 3-ডাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড হইতে এক অণু ফসফেট বিযুক্ত হইয়া 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড ও ATP গঠিত হয়। ইহা ফসফোগ্লিসারিক ট্রান্সফসফোরাইলেজ উৎসেচকের সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

1, 3-ডাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড + ADP ⇄ 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড + ADP
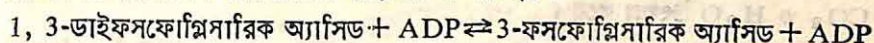
(7) 3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড ফসফোগ্লিসারোমিউটেজ উৎসেচকের সাহায্যে 2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

3-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড ⇄ 2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড
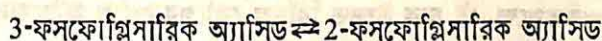
(8) 2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড হইতে এক অণু জল বাহির হইয়া 2-ফসফো ইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। ইহা ইনোলেজ উৎসেচকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

2-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড ⇄ 2-ফসফো ইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড
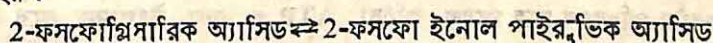
(9) 2-ফসফো ইনোল পাইরুভিক অ্যাসিড এক অণু ফসফরাস ত্যাগ করিয়া পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয় ও ATP গঠিত হয়। এই বিক্রিয়া ফসফো-পাইরুভিক ট্রান্সফসফোরাইলেজ উৎসেচকের প্রভাবে ঘটে।

সুতরাং গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় এক গ্রাম অণু গ্লুকোজ (180 গ্রাম) হইতে 2 অণু পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। গ্লাইকোলাইসিসে 4 অণু ATP উৎপন্ন হয় কিন্তু 2 অণু এই পদ্ধতিতে ব্যয় হয়। সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় 2 অণু ATP লাভ হয়।

পাইরুভিক অ্যাসিডের পরিণতি (Fate of Pyruvic acid):

উদ্ভিদের অবাত শ্বসনে অর্থাৎ অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিড ডি-কার্বোক্সিলেজ উৎসেচকের সাহায্যে এক অণু CO_2 মুক্ত করিয়া অ্যাসিট্যালডিহাইডে পরিণত হয় এবং পরে ইহা ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের সাহায্যে বিজারিত হইয়া ইথাইল অ্যালকোহলে পরিণত হয়।

$$C_6H_{12}O_6 + 2NAD \rightarrow 2CH_3.CO.COOH + 2NADH_2$$

পাইরুভিক অ্যাসিড

$$2CH_3.CO.COOH \rightarrow 2CH_3CHO + CO_2$$

অ্যাসিট্যালডিহাইড

$2CH_3CHO + 2NADH_2 \rightarrow CH_3CH_2OH + 2NAD + 28$ কিলোক্যালরি
ইথাইল অ্যালকোহল
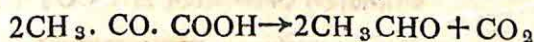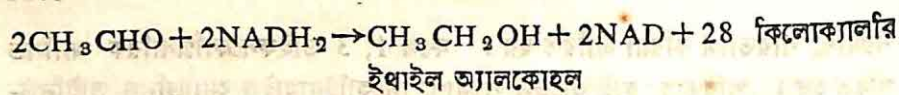
পেশী কোষ ও অন্যান্য প্রাণিকোষে অবাত শ্বসনে পাইরুভিক অ্যাসিড ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের প্রভাবে বিজারিত হইয়া ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

$2CH_3COCOOH + 2NADH_2 \rightarrow 2CH_3CHOH\ COOH + 2NAD + 36$
পাইরুভিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড কিলোক্যালরি
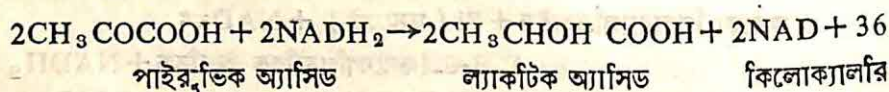
সবাত শ্বসনে অর্থাৎ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পাইরুভিক অ্যাসিড মাইটোকনড্রিয়ায় প্রবেশ করে এবং ক্রেবসের অম্লচক্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে জারিত হইয়া CO_2 ও H_2O উৎপন্ন করে।

ক্রেবস্ চক্র (Krebs cycle) : ক্রেবসের চক্র কোষের মাইটোকনড্রিয়ার মধ্যে সম্পাদিত হয় এবং এই চক্র পরিচালনার প্রয়োজনীয় উৎসেচক মাইটোকনড্রিয়ার মধ্যে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই চক্রে উদ্ভূত বিভিন্ন যৌগের জারণ অক্সিজেন সহযোগে হয় না, হাইড্রোজেন অপসারণের দ্বারা সম্পন্ন হয়। NAD, FAD (ফ্লাভিন অ্যাডিনিন ডাই-নিউক্লিওটাইড) প্রভৃতি বাহক হাইড্রোজেন অপসারিত করিয়া বিজারিত হয় এবং এই বিজারিত বাহকসমূহ ($NADH_2$, $FADH_2$) পরবর্তী পর্যায়ে ইলেকট্রন পরিবহণ চক্রে প্রবেশ করিয়া ATP ও জল উৎপাদন করে। 1937 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হ্যানস্ ক্রেবস্ (Hans Krebs) এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ঐ বিজ্ঞানীর নামানুসারে এই চক্রকে ক্রেবস্ চক্র বলে। এই চক্রের প্রথম উৎপাদিত পদার্থ সাইট্রিক অ্যাসিড বলিয়া ইহাকে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র (Citric acid cycle) বলে। সাইট্রিক অ্যাসিডে তিনটি কার্বক্সিল বর্গ ($-COOH$) থাকায় ইহাকে ট্রাই-কার্বক্সিলিক অ্যাসিড চক্র (Tricarboxylic acid cycle) বা TCA চক্র নামে অভিহিত করা হয়। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় ক্রেবস্ চক্রের বিক্রিয়াগুলি সংক্ষেপে ছকের আকারে আলোচনা করা হইল।

ব্যাখ্যা :

(1) এই প্রক্রিয়ার প্রথমে পাইরুভিক অ্যাসিড কোএনজাইম A ও NAD-এর সহিত যুক্ত হইয়া 2-কার্বনযুক্ত অ্যাসিটাইল কোএনজাইম A-তে পরিণত হয় ও CO_2 এবং $NADH_2$ উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়া পাইরুভিক ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের প্রভাবে ঘটে।

পাইরুভিক অ্যাসিড + কোএনজাইম A + NAD $\rightarrow$
অ্যাসিটাইল কোএনজাইম A + CO_2 + $NADH_2$
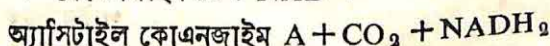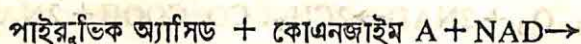
(2) অ্যাসিটাইল কোএনজাইম 4-কার্বনযুক্ত অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডের

সহিত যুক্ত হইয়া 6-কার্বনযুক্ত সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। সাইট্রেট সিন্থেটেজ উৎসেচকের প্রভাবে জল সহযোগে এই বিক্রিয়া ঘটে।

অ্যাসিটাইল কোএনজাইম A + অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড $\xrightarrow{+ H_2O}$ সাইট্রিক অ্যাসিড + কোএনজাইম A.
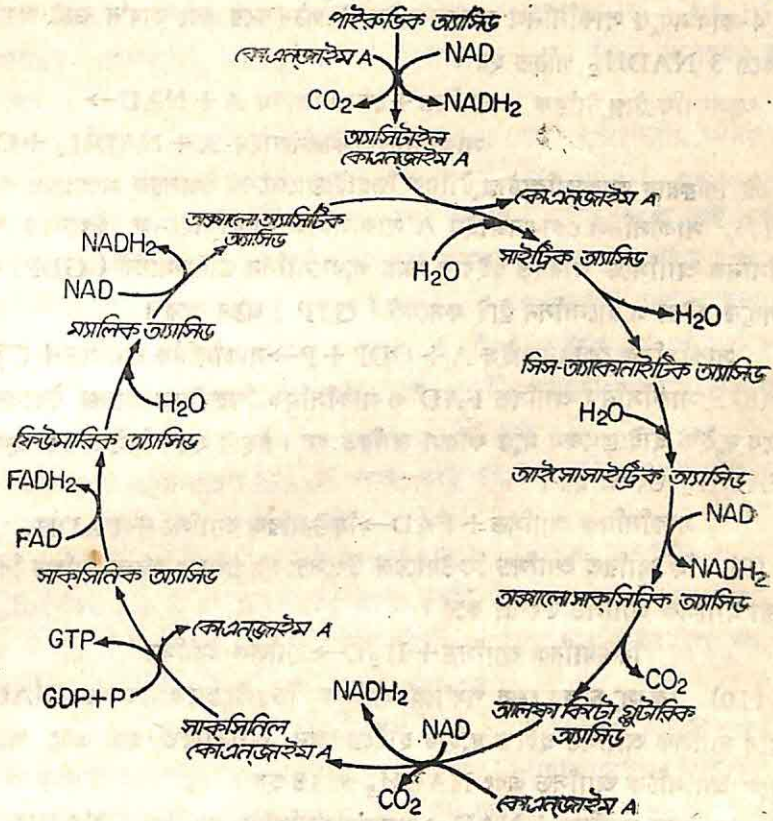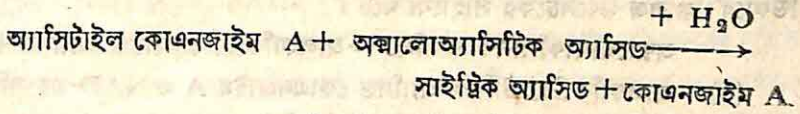
চিত্র 7.6 : ক্রেবসের অম্লচক্র

(3) সাইট্রিক অ্যাসিড হইতে জল বিয়োজনের ফলে সিস্-একোনাইটিক অ্যাসিড ও সিস্-একোনাইটিক অ্যাসিড পুনরায় জলের সহিত বিক্রিয়া করিয়া আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। উভয় বিক্রিয়া অ্যাকোনাইটেজ উৎসেচকের প্রভাবে সম্পন্ন হয়।

সাইট্রিক অ্যাসিড − H_2O → সিস্-একোনাইটিক অ্যাসিড।

সিস্-একোনাইটিক অ্যাসিড + H_2O → আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড।

(4) আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড আইসোসাইট্রিক ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের প্রভাবে NAD দ্বারা জারিত হইয়া অক্সালোসাকসিনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড + NAD → অক্সালোসাকসিনিক অ্যাসিড + $NADH_2$
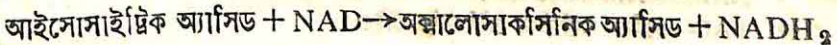
(5) অক্সালোসাকসিনিক অ্যাসিড কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত করিয়া 5-কার্বনযুক্ত আলফাকিটোগ্লুটারিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়া অক্সালোসাকসিনিক ডিকার্বোক্সিলেজ উৎসেচকের সাহায্যে ঘটে।

অক্সালোসাকসিনিক অ্যাসিড→আলফাকিটো গ্লুটারিক অ্যাসিড + CO_2

(6) আলফাকিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড কোএনজাইম A ও NAD-এর সহিত যুক্ত হইয়া 4-কার্বনযুক্ত সাকসিনিল কোএনজাইম A গঠন করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত করে 3 $NADH_2$ গঠিত হয়।

আলফাকিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড + কোএনজাইম A + NAD→
সাকসিনিল কোএনজাইম A + $NADH_2$ + CO_2

এই বিক্রিয়ায় আলফাকিটোগ্লুটারিক ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচক অংশগ্রহণ করে।

(7) সাকসিনিল কোএনজাইম A সাকসিনিক থায়োকাইনেজ উৎসেচক দ্বারা সাকসিনিক অ্যাসিডে পরিণত হইবার সময় গুয়ানোসিন ডাইফসফেট (GDP) ফসফরাসযুক্ত হইয়া গুয়ানোসিন ট্রাই ফসফেট (GTP) গঠন করে।

সাকসিনিক কোএনজাইম A + GDP + P→সাকসিনিক অ্যাসিড + GTP

(8) সাকসিনিক অ্যাসিড FAD ও সাকসিনিক ডিহাইড্রোজেনেজ উৎসেচকের প্রভাবে দুইটি হাইড্রোজেন মুক্ত করিয়া জারিত হয়। ইহার ফলে ফিউমারিক অ্যাসিড ও $FADH_2$ উৎপন্ন হয়।

সাকসিনিক অ্যাসিড + FAD→ফিউমারিক অ্যাসিড + $FADH_2$

(9) ফিউমারিক অ্যাসিড ফিউমারেজ উৎসেচকের প্রভাবে জলের সহিত বিক্রিয়া করিয়া ম্যালিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

ফিউমারিক অ্যাসিড + H_2O→ম্যালিক অ্যাসিড

(10) ক্রেবস্ চক্রের শেষ পর্যায়ে ম্যালিক ডিহাইড্রোজেনেজ ও NAD-এর প্রভাবে ম্যালিক অ্যাসিড হইতে দুইটি হাইড্রোজেন অপসারিত হয় এবং পুনরায় অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং $NADH_2$ গঠিত হয়।

ম্যালিক অ্যাসিড + NAD→অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড + $NADH_2$

অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপন্নের সঙ্গে সঙ্গে এই চক্রের সমাপ্তি ঘটে এবং পুনরায় ইহা নূতন অ্যাসিটাইল কোএনজাইম A অণুর সহিত যুক্ত হইয়া একই চক্রের সূচনা করে।

ইলেকট্রন পরিবহণ পদ্ধতি (Electron Transport System বা ETS):

আমরা জানি যে সবাত শ্বসনে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু গ্লাইকোলাইসিস বা ক্রেবসের অম্লচক্রের কোথাও অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে ক্রেবস্ চক্রে উদ্ভূত বিভিন্ন অ্যাসিড ও যৌগগুলি বিভিন্ন বাহকের (NAD*, FAD**

---

* NAD—নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড।

** FAD—ফ্ল্যাভিন অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড।

প্রভৃতি) সাহায্যে হাইড্রোজেন অপসারণের মাধ্যমে জারিত হয়। অপসারিত হাইড্রোজেন বাহকের সহিত যুক্ত হইলে বাহকগুলি বিজারিত হয় এবং এই বিজারিত বাহকগুলি ($NADH_2$*, $FADH_2$** প্রভৃতি) জারিত হইবার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিজারিত বাহকগুলির হাইড্রোজেন সরাসরি অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইতে পারে না, পরন্তু ইহা কতিপয় অন্তর্বর্তী যৌগের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হইয়া পরিশেষে অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হয় এবং জল প্রস্তুত করে। এইভাবে বিজারিত বাহকগুলি জারিত হইয়া পুনরায় ক্রেবসের অম্লচক্রে অংশগ্রহণ করিতে পারে।

যে প্রক্রিয়ায় বিজারিত বাহকের হাইড্রোজেন শেষ পর্যায়ে অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন করে তাহাকে প্রান্তীয় শ্বসন (Terminal respiration) বলে। সবাত শ্বসনের ইহাই অন্তিম বা শেষ পর্যায়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে হাইড্রোজেন বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন (H^+) ও ইলেকট্রন (e^-) উৎপন্ন করে। উদ্ভূত ইলেকট্রন বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হইয়া অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হয়। তাই এই প্রক্রিয়াকে ইলেকট্রন পরিবহণ পদ্ধতি বলে। ইলেকট্রন বাহকগুলি লৌহঘটিত প্রোটিন জাতীয় সাইটোক্রোম হওয়ায় ইহাকে সাইটোক্রোম পথ (Cytochrome path) বলে।

এই চক্রের প্রথম বাহক NAD^+ শ্বসন বস্তু হইতে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু (e^- সহ) গ্রহণ করিয়া বিজারিত হয়।

$$NAD^+ + 2H^+ + 2e^- \rightarrow NADH + H^+ \text{ বা } NADH_2$$
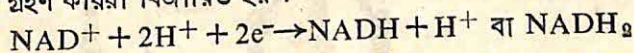
এই বিজারিত NAD বা $NADH_2$ অপর একটি বাহক FAD-এর সংস্পর্শে আসে এবং উহার হাইড্রোজেন FAD-কে স্থানান্তরিত করিয়া পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু FAD বিজারিত হইয়া $FADH_2$-তে পরিণত হয়।

$$NADH_2 \text{ বা } [NADH + H^+] + FAD \rightarrow FADH_2 + NAD$$
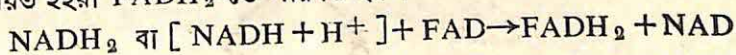
দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর $NADH_2$ হইতে FAD-তে স্থানান্তরের প্রাক্কালে ADP অজৈব ফসফেটের (Pi) সহিত যুক্ত হইয়া ATP উৎপন্ন করে। অতঃপর $FADH_2$ হইতে বিচ্যুত হাইড্রোজেন অণু বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন আয়ন ($2H^+$) ও ইলেকট্রনে ($2e^-$) পরিণত হয়। হাইড্রোজেন আয়ন ($2H^+$) কোষের সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায় থাকে কিন্তু ইলেকট্রন ($2e^-$) পরবর্তী বিক্রিয়ায় বিভিন্ন সাইটোক্রোম বাহকের (সাইটোক্রোম b, c, a, a_3) মাধ্যমে স্থানান্তরিত হইয়া শেষ পর্যায়ে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ উৎসেচকের প্রভাবে আণবিক অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হয়। বিক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে হাইড্রোজেন আয়ন, ইলেকট্রন ও অক্সিজেন যুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন করে। এক বাহক হইতে অন্য বাহকে ইলেকট্রনের স্থানান্তরকালে কিছু

* $NADH_2$—বিজারিত NAD, প্রকৃতপক্ষে ইহাকে $NADH+H^+$ হিসাবে লেখা হয়।

** $FADH_2$—বিজারিত FAD।
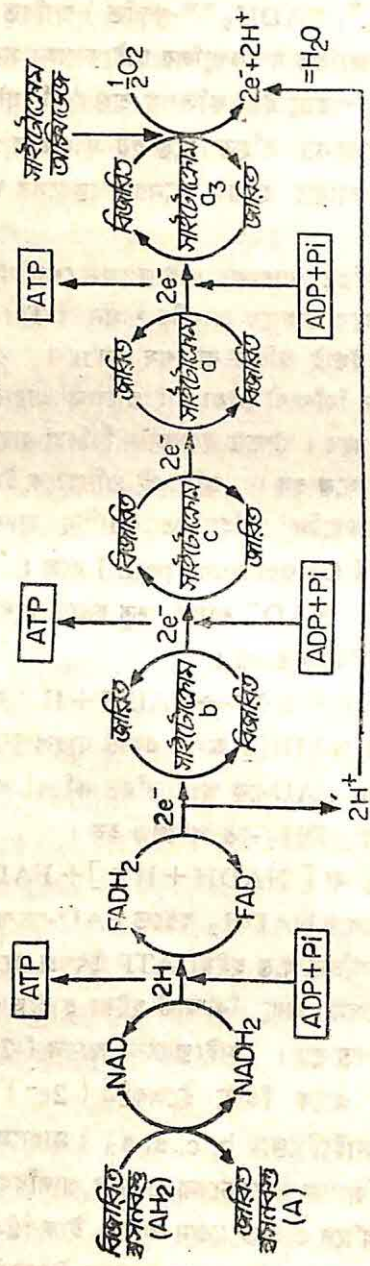
চিত্র 7.7 : ইলেকট্রন পরিবহণ পদ্ধতি

পরিমাণ শক্তি পরিত্যক্ত হয়। এই শক্তি ADP ও Pi-কে যুক্ত করিয়া ATP প্রস্তুত করে। অক্সিজেন গ্রহণের মাধ্যমে এইরূপ ATP অণুর সৃষ্টিকে অক্সিডেটিভ ফস্-ফোরাইলেশান (Oxidative phosphorylation) বলে। যাহাহউক, প্রান্তীয় শ্বসনে $NADH_2$ হইতে FAD-তে হাইড্রোজেন স্থানান্তরের সময় 1 অণু ATP এবং সাইটোক্রোম b হইতে c-তে ও a হইতে a_3-তে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হইবার সময় এক অণু করিয়া মোট দুই অণু ATP উৎপন্ন হয়। সেজন্য প্রতি অণু $NADH_2$ হইতে এই প্রক্রিয়ায় 3 অণু ATP ও প্রতি অণু $FADH_2$ হইতে দুই অণু ATP উৎপন্ন হয়।

সবাত শ্বসনে উৎপন্ন ATP, CO_2 ও H_2O-এর পরিমাণ :

ATP-র পরিমাণ—

(i) গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় লাভ (4 − 2) = 2 অণু ATP
(ii) গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় 2 অণু $NADH_2$ হইতে (2 × 3) = 6 অণু ATP
(iii) পাইরুভিক অ্যাসিড জারণে উৎপন্ন 2 অণু $NADH_2$ হইতে (2 × 3) = 6 অণু ATP
(iv) ক্রেবস্ চক্রে উৎপন্ন 6 অণু $NADH_2$ হইতে (6 × 3) = 18 অণু ATP
(v) ক্রেবস্ চক্রে উৎপন্ন 2 অণু $FADH_2$ হইতে (2 × 2) = 4 অণু ATP
(vi) ক্রেবস্ চক্রে উৎপন্ন 2 অণু GTP হইতে (2 × 1) = 2 অণু ATP

মোট = 38 অণু ATP

CO_2-এর পরিমাণ—

2 অণু পাইরুভিক অ্যাসিড হইতে অ্যাসিটাইল Co-A উৎপন্ন হইবার সময় = 2 অণু CO_2

2 অণু পাইরুভিক অ্যাসিডের ক্রেবস্ চক্রে প্রবেশের ফলে উৎপন্ন (2 × 2) = 4 অণু CO_2

মোট = 6 অণু CO_2

জলের পরিমাণ—

দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড ক্রেবস্ চক্রে প্রবেশের ফলে জল ব্যয়িত হয় (2 × 3) = 6 অণু। সুতরাং শ্বসনে উদ্বৃত্ত জলের পরিমাণ 12 − 6 = 6 অণু।

বিষয়-সংক্ষেপ

যে প্রক্রিয়ায় জীবকোষের জটিল খাদ্যবস্তু জারিত হইয়া সরল পদার্থে পরিণত হইবার সময় খাদ্যস্থিত স্থিতিশক্তি রাসায়নিক শক্তি বা গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় ও তাপশক্তি উৎপাদন করে তাহাকে শ্বসন বলে।

শ্বসন দুই প্রকার—সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসন। যে প্রক্রিয়ায় কোষস্থ খাদ্যবস্তু (প্রধানত গ্লুকোজ) অক্সিজেনের সাহায্যে সম্পূর্ণ জারিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ও প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে তাহাকে সবাত শ্বসন বলে। সবাত শ্বসনের বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ—

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 673 \text{ কিলোক্যালারি}$$

আবার যে প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন কোষস্থ খাদ্যবস্তুর অসম্পূর্ণ জারণ ঘটে এবং অল্প পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাকে অবাত শ্বসন বলে। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ-কোষে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও ইথাইল অ্যালকোহল এবং ব্যাকটিরিয়া ও পেশী-কোষে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি নিম্ন রূপ—

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH \text{ (ইথাইল অ্যালকোহল) } + 2CO_2 + 28 \text{ কিলোক্যালোরি}$$

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3.CHOH.COOH \text{ (ল্যাকটিক অ্যাসিড)} + 36 \text{ কিলো-ক্যালোরি}$$
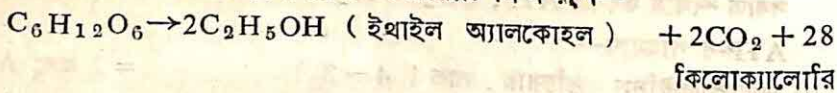
শ্বসন প্রক্রিয়ায় পরিত্যক্ত CO_2 ও গৃহীত O_2-এর অনুপাতকে শ্বাসহার বলে। ইহা বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন।

শ্বসনে অংশগ্রহণকারী অঙ্গকে শ্বাসঅঙ্গ বলে। উদ্ভিদের কোন শ্বাসঅঙ্গ নাই। উহারা পত্ররন্ধ্র ও লেণ্টিসেলের মাধ্যমে শ্বসন সম্পন্ন করে। বিভিন্ন প্রকার প্রাণী বিভিন্ন প্রকার শ্বাসঅঙ্গের দ্বারা শ্বসন সম্পন্ন করে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার শ্বাস-অঙ্গের নাম উল্লেখ করা হইল।

(i) দেহগাত্র—অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম, স্পঞ্জ, প্লানেরিয়া, হাইড্রা প্রভৃতি।
(ii) চর্ম—কেঁচো, জোঁক, ব্যাঙ প্রভৃতি।
(iii) শ্বাসনালী—আরশোলা, প্রজাপতি, ফড়িং, পিঁপড়া প্রভৃতি।
(iv) ফুলকা—মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক প্রভৃতি। [রাজকাঁকড়ার পুস্তক ফুলকা]
(v) অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র—কই, মাগুর, শিঙি প্রভৃতি।
(vi) ফুসফুস—উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী, স্তন্যপায়ী ও ফুসফুসযুক্ত মাছ।
(vii) পুস্তক ফুসফুস—মাকড়সা, কাঁকড়াবিছা প্রভৃতি।

শ্বসন প্রক্রিয়া : শ্বসনকালে জটিল খাদ্যবস্তু ভাঙ্গিয়া প্রধানত গ্লুকোজে পরিণত হয়। সবাত ও অবাত শ্বসনের প্রাথমিক পর্যায়ে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না এবং এই প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ ভাঙ্গিয়া দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড, 2 অণু ATP ও 2 অণু $NADH_2$ উৎপন্ন করে। ইহাকে গ্লাইকোলাইসিস বলে। গ্লাইকোলাইসিস কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে।

সবাত শ্বসনে পাইরুভিক অ্যাসিড অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ক্রেবসের অম্লচক্রে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন অ্যাসিড ও 8 অণু $NADH_2$, 2 অণু $FADH_2$, 2 অণু

GTP উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়া কোষের মাইটোকনড্রিয়ায় ঘটে। ক্রেবস্ চক্রে উৎপন্ন বিজারিত বাহকগুলি ($NADH_2$, $FADH_2$) সরাসরি অক্সিজেনের সহিত যুক্ত না হইয়া হাইড্রোজেন বিয়োজনের মাধ্যমে জারিত হয়। এই প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে হাইড্রোজেন বিশ্লিষ্ট হইয়া ইলেকট্রন উৎপন্ন করে যাহা বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হয়। ইহাকে ইলেকট্রন পরিবহণ চক্র বলে। ইলেকট্রনের স্থানান্তরের প্রাক্কালে ইলেকট্রন হইতে নির্গত শক্তির সাহায্যে ADP অজৈব ফসফেটের সহিত যুক্ত হইয়া ATP উৎপন্ন করে। প্রতি অণু $NADH_2$ হইতে 3 অণু ATP_3 এবং $FADH_2$ হইতে 2 অণু ATP উৎপন্ন হয়। পরিশেষে ইলেকট্রন, প্রোটন (H^+) ও অক্সিজেন যুক্ত হইয়া জল উৎপাদিত হয়।

প্রশ্নাবলী

A. **পার্থক্য নির্দেশ কর :**

1. শ্বসন ও দহন।
2. অবাত শ্বসন ও সবাত শ্বসন।
3. অবাত শ্বসন ও কোহল সন্ধান।
4. বহিঃশ্বসন ও অভ্যন্তরীণ শ্বসন।
5. হিমোগ্লোবিন ও হিমোসায়ানিন।

B. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

1. শ্বসন কাহাকে বলে ? শ্বসন কখন ও কোথায় সম্পন্ন হয় ?
2. শ্বাসকার্য ও শ্বসন বলিতে কি বুঝ ?
3. শ্বসনবস্তু কাহাকে বলে ?
4. ক্ষয়, সন্ধান ও শটন বলিতে কি বুঝ ?
5. ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধান কাহাকে বলে ?
6. শ্বাসহার কাহাকে বলে ?
7. উদ্ভিদ কিভাবে শ্বসন সম্পন্ন করে ?
8. কেঁচো, প্রজাপতি, চিংড়ি, রাজকাঁকড়া, তিমি, মাকড়সা, অ্যামিবার শ্বাসঅঙ্গের নাম লিখ।
9. প্লুরা কাহাকে বলে ?
10. গ্লাইকোলাইসিস কোথায় সম্পন্ন হয় ? গ্লাইকোলাইসিসে উৎপাদিত পদার্থ কি কি ?
11. ক্রেবস্ চক্র কোথায় সম্পন্ন হয় ? ইহাকে TCA চক্র বলে কেন ?
12. প্রান্তীয় শ্বসন কাহাকে বলে ?

C. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

1. গ্লাইকোলাইসিস কাহাকে বলে ? এই পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই পদ্ধতিকে EMP পথ বলে কেন ?
2. মানুষের শ্বসনজনিত বিচলন প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
3. প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার শ্বাসঅঙ্গের বিবরণ দাও।
4. ক্রেবস্ চক্রের বিভিন্ন স্তরগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

D. টীকা লিখ :

1. সবাত শ্বসন 2. অবাত শ্বসন 3. হিমোগ্লোবিন 4. হিমোসায়ানিন 5. গ্লাইকোলাইসিস

অষ্টম অধ্যায়	পুষ্টি (Nutrition)

8.1 যে প্রক্রিয়ায় জীবের খাদ্যগ্রহণ, গৃহীত খাদ্যের পাচন, পাচিত খাদ্যের শোষণ ও শোষিত খাদ্যের আত্তীকরণ বা প্রোটোপ্লাজমে অঙ্গীভূত হয় তাহাকে পুষ্টি বলে। এককথায় জীব কর্তৃক সরল খাদ্যগ্রহণ ও উহার ক্রমান্বয়িক প্রোটোপ্লাজমের অংশে পরিণত হওয়াকে পুষ্টি বলে।

অধিকাংশ উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে, তাই ইহাদের স্বভোজী (Autotrophs) বলে। অধিকাংশ প্রাণী খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, তাই ইহাদের পরভোজী (Heterotrophs) বলে। প্রাণীদের জীবনক্রিয়ার পদ্ধতি উদ্ভিদ অপেক্ষা জটিল হওয়ায় ইহাদের পুষ্টি পদ্ধতিও খুবই জটিল।

আলোচনার সুবিধার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর পুষ্টি পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল।

8.2 উদ্ভিদের পুষ্টি (Nutrition in plants) : উদ্ভিদের পুষ্টি পদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—**স্বভোজী পুষ্টি** (Autotrophic nutrition) এবং **পরভোজী পুষ্টি** (Heterotrophic nutrition)।

1. **স্বভোজী পুষ্টি** : যে পুষ্টি পদ্ধতিতে উদ্ভিদ অজৈব উপাদান (CO_2, H_2O, H_2S, NO_3 প্রভৃতি) হইতে খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে তাহাকে স্বভোজী পুষ্টি বলে। ক্লোরোফিলযুক্ত উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। তাই ইহাদের স্বভোজী (Autophyte or Autotroph) বলে। সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদ তাহার পরিবেশ হইতে গ্রহণ করে। স্থলজ উদ্ভিদ মাটি হইতে মূলরোম দ্বারা জলশোষণ করে এবং বায়ুমণ্ডল হইতে পত্ররন্ধ্র ও লেন্টিসেল দ্বারা কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। জলে নিমজ্জিত উদ্ভিদ পরিবেশ হইতে জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। ইহা ব্যতীত কিছু সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটিরিয়া ও রাসায়নিক সংশ্লেষকারী ব্যাকটিরিয়া কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে।

শর্করা হইতে বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে স্নেহপদার্থ ও তৈল গঠিত হয়। আবার উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত নাইট্রোজেন ঘটিত নাইট্রেট লবণ ও জৈব অম্লের মিলনে অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রস্তুত হয়। পরে অ্যামাইনো অ্যাসিড হইতে উদ্ভিদের চাহিদানুযায়ী প্রোটিন গঠিত হয়।

8.3 **স্বভোজী পুষ্টিতে খনিজ লবণের ভূমিকা** (Role of Minerals in Autotrophic nutrition) :

উদ্ভিদ মাটি হইতে জল শোষণের সময় বিভিন্ন খনিজ লবণকে আয়ন

অবস্থায় শোষণ করে। এই সকল খনিজ লবণ বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজন। যদিও ইহারা সংশ্লেষিত খাদ্যবস্তুর কোন উপাদান নয় তথাপি এই সকল খনিজ লবণ বিভিন্ন জটিল খাদ্যবস্তু অথবা উৎসেচক, ভিটামিনে যুক্ত হয়। এমনকি এই সকল লবণ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যে অংশগ্রহণ করিয়া বিভিন্ন উপাদান সংশ্লেষে সাহায্য করে। পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খনিজ উপাদানকে একত্রে অপরিহার্য উপাদান (Essential element) বলে। অপরিহার্য উপাদানকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়—অতিমাত্রিক মৌল বা ম্যাক্রোএলিমেণ্ট (Macro-elements) এবং স্বল্পমাত্রিক মৌল বা মাইক্রোএলিমেণ্ট (Microelements)।

(i) ম্যাক্রোএলিমেণ্ট : উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যে সকল খনিজ লবণ বা উপাদান অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাহাদের ম্যাক্রোএলিমেণ্ট বলে। ইহাদের যে কোন একটির অভাব ঘটিলে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায়। ম্যাক্রোএলিমেণ্টগুলি হইল—কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P), পটাসিয়াম (K), ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), সালফার (S) ও লৌহ (Fe)। অনেকে মনে করেন লৌহ উদ্ভিদের বিপাকে খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাই ইহাকে মাইক্রোএলিমেণ্ট বলার পক্ষপাতী। দশটি ম্যাক্রোএলিমেণ্টকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে—C, H, O, P, S, K, N, Ca, Fe, Mg।

(ii) মাইক্রোএলিমেণ্ট : উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যে সকল খনিজ লবণ স্বল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাহাদের মাইক্রোএলিমেণ্ট বলে। প্রয়োজন অল্প হইলেও ইহাদের অভাবে পুষ্টি ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মাইক্রোএলিমেণ্টগুলি হইল—ম্যাঙ্গানিজ (Mn), বোরন (B), দস্তা (Zn), তামা (Cu), মলিবডেনাম (Mo)। ইহা ব্যতীত বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সোডিয়াম (Na), আয়োডিন (I), সিলিকন (Si), অ্যালুমিনিয়াম (Al) প্রভৃতি মাইক্রোএলিমেণ্টের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

2. পরভোজী পুষ্টি : যে পুষ্টি পদ্ধতিতে উদ্ভিদ অন্য জীব অথবা জৈববস্তু হইতে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে তাহাকে পরভোজী পুষ্টি বলে। এই সকল উদ্ভিদের ক্লোরোফিল না থাকায় পুষ্টির ব্যাপারে পরনির্ভর। তাই ইহাদের পরভোজী উদ্ভিদ (Heterophyte or Heterotroph) বলে। পরভোজী পুষ্টিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(a) পরজীবীয় পুষ্টি (Parasitic nutrition) : যে পুষ্টি পদ্ধতিতে উদ্ভিদ অন্য জীবদেহ হইতে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিসাধন করে তাহাকে পরজীবীয় পুষ্টি বলে। পরজীবীয় পুষ্টি সম্পন্নকারী জীবকে পরজীবী (Parasite) বলে। সাধারণত এই জাতীয় উদ্ভিদ আশ্রয়দাতা বা পোষক উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলা হইতে চোষকমূলের (Haustoria) সাহায্যে খাদ্যরস শোষণ করে। পরজীবীয় পুষ্টি দুই প্রকার—(i) পূর্ণ পরজীবী এবং (ii) আংশিক পরজীবী।

(i) **পূর্ণ পরজীবী** (Total parasite) : স্বর্ণলতা, র‍্যাফ্লেসিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদ পুষ্টির জন্য আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাই ইহাদের পূর্ণ পরজীবী বলে।
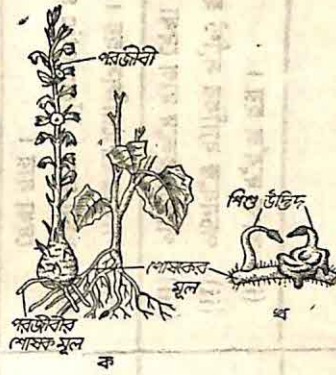
চিত্র 8.1 : পরজীবীর পুষ্টি : (ক) বেনেবৌ (পূর্ণ পরজীবী) (খ) শিশু বেনেবৌ

(ii) **আংশিক পরজীবী** (Partial parasite) : চন্দন, লোরান্থাস প্রভৃতি উদ্ভিদ স্বভোজী হইলেও পুষ্টির ব্যাপারে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের উপর আংশিক নির্ভরশীল। তাই ইহাদের আংশিক পরজীবী বলে।
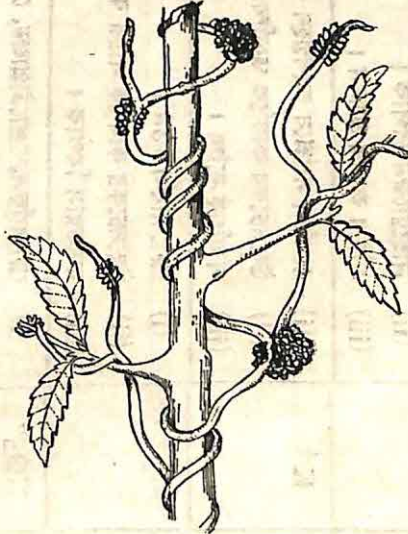
চিত্র 8.2 : স্বর্ণলতা (পূর্ণ পরজীবী)

(b) **মৃতজীবীয় পুষ্টি** (Saprophytic nutrition) : যে পুষ্টি পদ্ধতিতে উদ্ভিদ মৃত, পচা, গলিত জৈব বস্তু হইতে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিসাধন করে। তাহাকে মৃতজীবীয় পুষ্টি বলে। মৃতজীবীয় পুষ্টি সম্পন্নকারী জীবকে মৃতজীবী

নিম্নে বিভিন্ন খনিজ লবণের (মৌল) নাম, উহাদের কাজ ও অভাবজনিত লক্ষণ দেওয়া হইল :

মৌল	যেভাবে গৃহীত হয়	কাজ	অভাবজনিত লক্ষণ
1. ক্যালসিয়াম (Ca)	Ca^{++}	(i) কোষ প্রাচীর গঠন । (ii) নাইট্রোজেন বিপাক । (iii) মাটির অম্লত্ব প্রশমন ।	(i) মূল, কাণ্ড, পাতার বৃদ্ধি হ্রাস । (ii) পাতার ক্লোরোসিস হয় ।
2. পটাসিয়াম (K)	K^{+}	(i) প্রোটিন সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে । (ii) উৎসেচকের কার্যকে ত্বরান্বিত করে । (iii) সামগ্রিক বৃদ্ধি ।	(i) কাণ্ড দুর্বল হয় । (ii) পচনযুক্ত ব্যাধির সৃষ্টি হয় । (iii) পাতায় হলুদ দাগ দেখা যায় ।
3. ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	Mg^{++}	(i) ক্লোরোফিল গঠন । (ii) উৎসেচকের কার্যকে সক্রিয় করে । (iii) ফসফরাস বিপাক ।	(i) পাতার ক্লোরোসিস হয় । (ii) পচন দাগ (Necrotic spot) দেখা যায় ।
4. নাইট্রোজেন (N)	NO_3^- অথবা NH_4^-	(i) ক্লোরোফিল, প্রোটোপ্লাজম, প্রোটিন প্রভৃতির গঠনগত উপাদান । (ii) সামগ্রিক বৃদ্ধি, পাতা ও ফুলের প্রাচুর্য আনে ।	(i) পাতার ক্লোরোসিস হয় । (ii) ফুল ফুটতে দেরি হয় । (iii) খর্ব বৃদ্ধি হয় ।
5. ফসফরাস (P)	$H_2PO_4^-$	(i) প্রোটিন সংশ্লেষ । (ii) ফসফোলিপিড, নিউক্লিক অ্যাসিড সংগঠনে ব্যবহৃত হয় । (iii) ATP গঠনে সাহায্য করে ।	(i) খর্ব বৃদ্ধি হয় । (ii) পাতা ঝরিয়া পড়ে ।

নিম্নে বিভিন্ন খনিজ লবণের (মৌল) নাম, উহাদের কাজ ও অভাবজনিত লক্ষণ দেওয়া হইল :

মৌল	যেভাবে গৃহীত হয়	কাজ	অভাবজনিত লক্ষণ
6. সালফার (S)	$SO_4^{=}$	(i) প্রোটিন ও অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষ । (ii) মূলের বৃদ্ধি, কো-এনজাইমের উপাদান ।	(i) পাতার ক্লোরোসিস হয় । (ii) খর্ব বৃদ্ধি ও কাণ্ড দুর্বল হয় ।
7. লৌহ (Fe)	Fe^{++}	(i) ক্লোরোফিল সংশ্লেষ । (ii) সাইটোক্রোম ও ফেরিডক্সিনের উপাদান ।	(i) তরুণ পত্রের ক্লোরোসিস হয় । (ii) বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ।
8. ম্যাঙ্গানিজ (Mn)	Mn^{++}	(i) উৎসেচককে সক্রিয় করে । (ii) ক্লোরোফিল সংশ্লেষ ।	(i) পাতার আন্তঃশিরায় ক্লোরোসিস হয় ।
9. বোরন (B)	$BO_3^{\equiv}$	(i) শর্করা পরিবহণে সাহায্য করে । (ii) অর্বুদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে । (iii) নিউক্লিক অ্যাসিড বিপাক ।	(i) পত্র বিবর্ণ, পত্রাগ্র কুঞ্চিত হয় । (ii) উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের পচন হয় ।
10. জিঙ্ক বা দস্তা (Zn)	Zn^{++}	(i) ইণ্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (IAA), ও অনেক উৎসেচক গঠনে অংশগ্রহণ করে । (ii) ফল ও বীজ সুগঠিত হয় ।	(i) পত্রের বৃদ্ধি হ্রাস, পত্রের কিনারা বিকৃতি ও কুঞ্চন ঘটে ।
11. তাম্র (Cu)	Cu^{++}	(i) কতিপয় উৎসেচকের গঠনগত উপাদান । (ii) ইলেকট্রন বাহক ।	(i) পাতা শুকাইয়া যায়, পাতার কুঞ্চন ও পচন দেখা যায় ।
12. মলিবডেনাম (Mo)	Mo^{+++}	(i) নাইট্রোজেন সংবন্ধন । (ii) কতিপয় উৎসেচকের গঠনগত উপাদান ।	(i) ক্লোরোসিস হয় । (ii) তরুণ পত্রের পচন, কুঞ্চন ও বিকৃতি দেখা যায় ।

(Saprophyte) বলে। এই ধরনের উদ্ভিদ উহাদের নিজ দেহ হইতে উৎসেচক নিঃসৃত করিয়া মৃত, পচা ও গলিত জৈব বস্তুকে পাচিত করে এবং পরে ঐ তরল খাদ্য

চিত্র 8.3 : র‍্যাফ্লেসিয়া
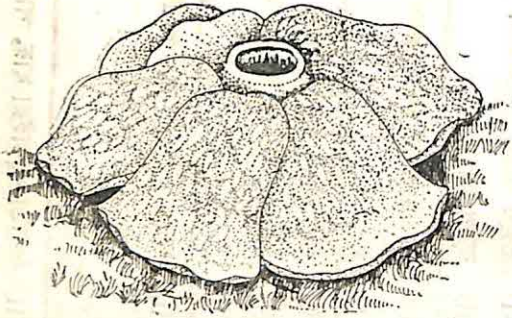
শোষণ করিয়া নিজেদের পুষ্টিসাধন করে। মৃতজীবীয় পুষ্টি অনুযায়ী ইহা দু'প্রকার :

(i) **পূর্ণ মৃতজীবী** (Total Saprophyte) : এই ধরনের পুষ্টি পদ্ধতিতে উদ্ভিদ মৃত জৈব বস্তুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলিয়া ইহাদের পূর্ণ মৃতজীবী বলে। যেমন—মিউকর, পেনিসিলিয়াম, অ্যাগারিকাস বা ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতি।
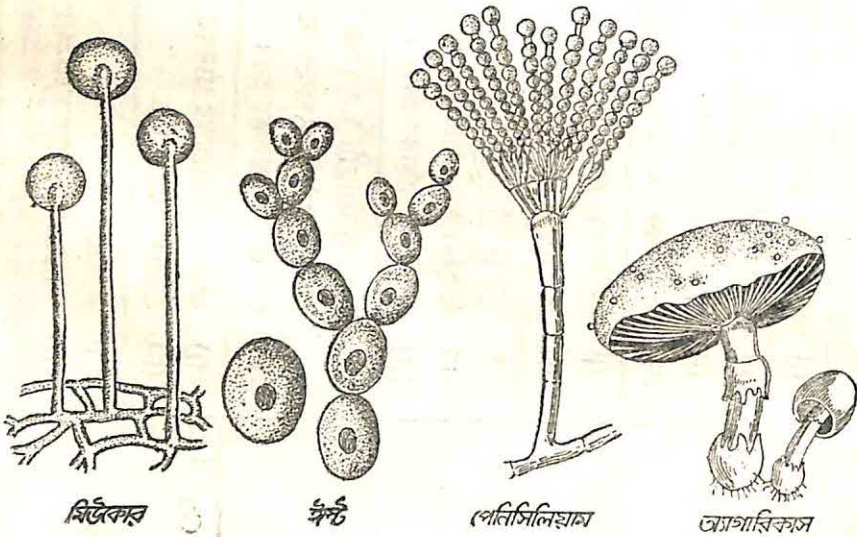
চিত্র 8.4 : মৃতজীবীয় পুষ্টি

(ii) **আংশিক মৃতজীবী** (Partial Saprophyte) : কতকগুলি সবুজ উদ্ভিদ পুষ্টির জন্য মৃত জৈব বস্তুর উপর আংশিক নির্ভরশীল হওয়ায় ইহাদের আংশিক মৃতজীবী বলে। ইহারা মৃত, পচা ও গলিত পদার্থ হইতে সরাসরি খাদ্যরস শোষণ করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, ইহাদের মূল অংশে বসবাসকারী

ছত্রাক মৃতজীবীয় পুষ্টিতে সাহায্য করে। উচ্চস্তরের উদ্ভিদের মূলের সঙ্গে ছত্রাকের সংযোগ ঘটায় বলিয়া এই ধরনের মূলকে ছত্রাক মূল (Fungus root) বা মাইক্রো-রাইজা (Mycorrhiza) বলে। যেমন—মনোট্রোপা।

(c) **মিথোজীবীয় পুষ্টি** (Symbiotic nutrition): যে পুষ্টি পদ্ধতিতে দুইটি উদ্ভিদ একত্রে বসবাস করিয়া পুষ্টি ও জীবনধারণের জন্য একে অপরকে সাহায্য করে তাহাকে মিথোজীবীয় পুষ্টি বলে। মিথোজীবীয় পুষ্টি সম্পন্নকারী জীবকে মিথোজীবী (Symbiont) বলে। এই জাতীয় পুষ্টিতে দুইটি উদ্ভিদ পরস্পর পরস্পরের সাহচর্যে ও সহযোগিতায় বাঁচিয়া থাকে। মিথোজীবী পুষ্টি দুই প্রকার:
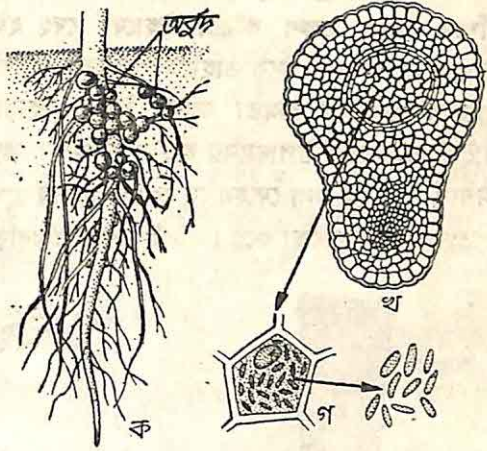
চিত্র 8.5: মিথোজীবীয় পুষ্টি
(ক) মটর মূলে অর্বুদের অবস্থান, (খ) মূলের প্রস্থচ্ছেদ,
(গ) রাইজোবিয়াম ব্যাকটিরিয়া

(i) **ব্যতিহারী পুষ্টি** (Mutualism): যখন দুইটি উদ্ভিদ একত্রে বসবাস করিয়া একে অপরের নিকট হইতে পুষ্টি গ্রহণ করে তখন তাহাকে ব্যতিহারী পুষ্টি বলে। সাধারণত এই ধরনের পুষ্টিতে একশ্রেণীর উদ্ভিদ আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ হইতে পুষ্টি গ্রহণ করে এবং বিনিময়ে উদ্ভিদটি আশ্রয়দাতাকে প্রয়োজনীয় তৈয়ারী খাদ্য সরবরাহ করে। যেমন—লাইকেন। ইহা সবুজ শৈবাল ও ছত্রাক মিলিত হইয়া গঠিত হয়। ছত্রাক অংশ ভিতরের শৈবাল অংশকে আবৃত করিয়া অবস্থান করে। শৈবাল ছত্রাক হইতে জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড, খনিজ লবণ প্রভৃতি পায় এবং বিনিময়ে ছত্রাক শৈবাল হইতে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য ও অক্সিজেন পায়। ইহা ব্যতীত ছত্রাক শৈবালকে শুষ্কতার হাত হইতে রক্ষা করে। অনুরূপভাবে, শিম্ব-গোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে অবস্থিত রাইজোবিয়াম (Rhizobium) নামক ব্যাকটিরিয়া আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে (শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদ) নাইট্রোজেন সরবরাহ করে, বিনিময়ে ব্যাকটিরিয়া আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ হইতে পুষ্টি ও আশ্রয় লাভ করে।

(ii) **সহভোক্তা পুষ্টি** (Commensalism): যখন দুইটি উদ্ভিদ একত্রে বসবাস করিয়াও প্রত্যেকে পৃথকভাবে পুষ্টি সংগ্রহ করে তখন তাহাকে সহভোক্তা পুষ্টি বলে। এই জাতীয় পুষ্টিতে একটি উদ্ভিদ উপকৃত হয় কিন্তু আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। যেমন রাস্না অন্য উদ্ভিদের উপর পরাশ্রয়ীরূপে বসবাস করিলেও নিজেরা খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে কিন্তু আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের কোন

প্রকার ক্ষতিসাধন করে না। খেজুর ও বট, বট ও অশ্বত্থ এইরূপ পুষ্টির উদাহরণ।

(d) **পতঙ্গভুক পুষ্টি** (Insectivorous nutrition) : যে পুষ্টি পদ্ধতিতে উদ্ভিদ পতঙ্গ ভক্ষণ করিয়া উহাদের দেহ হইতে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সংগ্রহের মাধ্যমে পুষ্টিসাধন করে তাহাকে পতঙ্গভুক পুষ্টি বলে। এই জাতীয় উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের ক্ষমতা আছে কিন্তু ইহারা যে মাটিতে জন্মায় সেই মাটিতে নাইট্রোজেনঘটিত উপাদানের অভাব থাকে। তাই ইহারা নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য দেহের যে কোন অংশের রূপান্তর ঘটাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ ধরিবার ব্যবস্থা করে। এই সকল পরিবর্তিত অঙ্গে কীটপতঙ্গ প্রবেশ করিলে

চিত্র ৪.6 : পতঙ্গভুক উদ্ভিদের পুষ্টি : (ক) ঘটপত্রী, (খ) পাতা ঝাঁঝি ও ফাঁদি থলির বিবর্ধিত চিত্র
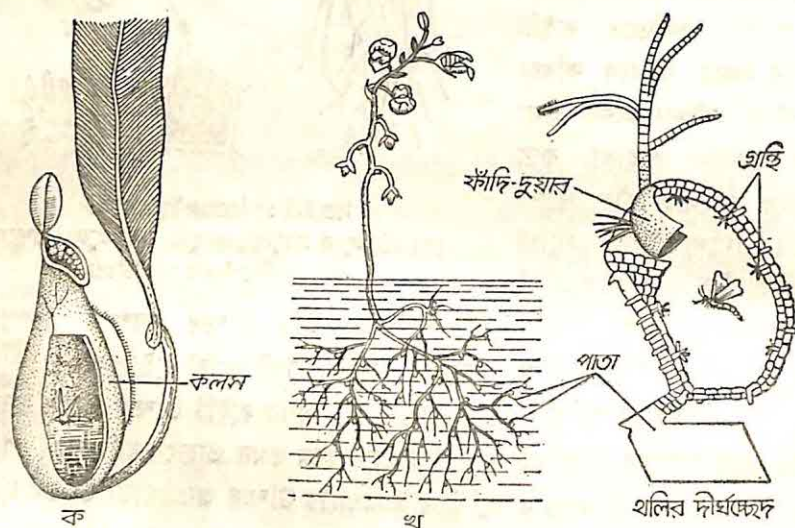
ঐ অঙ্গ হইতে নিঃসৃত শর্করায় পতঙ্গ আটকাইয়া যায়। অতঃপর উদ্ভিদের সংশ্লিষ্ট গ্রন্থিকোষ হইতে জারকরস নিঃসৃত হইয়া পতঙ্গের প্রোটিন অংশকে পাচিত করে। এই পাচিত প্রোটিন শোষণ করিয়া উদ্ভিদ পুষ্টিসাধন করে।

উদাহরণ :—(i) কলসপত্রী বা ঘটপত্রী উদ্ভিদের পাতার ফলকের অগ্রপ্রান্ত ঢাকনাযুক্ত কলসীর আকারে রূপান্তরিত হয় এবং পিচ্ছিল ও উজ্জ্বল ঢাকনায় পতঙ্গ বসিবামাত্র কলসীর মধ্যে পড়িয়া যায়।

(ii) সূর্যশিশিরের পাতার কর্ষিকা হইতে বিন্দু বিন্দু শর্করা নির্গত হয় এবং পাতায় পতঙ্গ বসিলে উহারা কর্ষিকা দ্বারা আবদ্ধ হয়।

(iii) পাতাঝাঁঝির পত্রক রূপান্তরিত হইয়া ফাঁদি-দুয়ার সৃষ্টি করে যাহার মধ্যে পতঙ্গ একবার প্রবেশ করিলে আর বাহিরে আসিতে পারে না।

এইভাবে বিভিন্ন উদ্ভিদ তাহার বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটাইয়া পতঙ্গ ধরিবার ও উহাদের জারিত করিবার ব্যবস্থা করে।

8.4 প্রাণীদের পুষ্টি
(Animal Nutrition)

উদ্ভিদের ন্যায় প্রাণীরা পুষ্টির জন্য নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না। সমস্ত প্রাণিকুল তাহাদের খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। আদ্যপ্রাণী পর্বভুক্ত কয়েকটি প্রাণী ব্যতীত সমস্ত প্রাণী পরভোজী (Heterotroph)। সুস্থ ও সক্রিয় জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ অত্যাবশ্যক এবং এই খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমে দেহের পুষ্টি সাধিত হয় যাহা দেহের স্বাভাবিক গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয় পূরণ, শক্তি প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।

8.5 খাদ্য

যে সকল বস্তু গ্রহণ করিবার পর পাচিত হইলে জীবদেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ এবং দৈনন্দিন কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন সাধিত হয় তাহাকে **খাদ্য** বলে।

প্রাণীরা পুষ্টিসাধনের জন্য যে সকল খাদ্য গ্রহণ করে তাহাদের ছয়ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) কার্বোহাইড্রেট, (২) প্রোটিন, (৩) ফ্যাট, (৪) ভিটামিন, (৫) খনিজ লবণ ও (৬) জল। যে খাদ্যে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান (কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল) নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে তাহাকে **সুষম খাদ্য** (Balanced diet) বলে। একজন সুস্থ, স্বাভাবিক, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সুষম খাদ্যে 405 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, 100 গ্রাম প্রোটিন ও 100 গ্রাম ফ্যাট থাকা আবশ্যক এবং ইহা হইতে 3000 ক্যালোরী শক্তি উৎপন্ন হয়। দুধের মধ্যে উক্ত ছয়টি খাদ্য উপাদান বিদ্যমান তাই দুধকে **সম্পূর্ণ খাদ্য** (Complete food) বলে। শিশুর ক্ষেত্রে দুগ্ধ সুষম খাদ্য, কারণ শিশুর প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান ইহার মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে। কিন্তু পরিণত মানুষের ক্ষেত্রে ইহা সুষম খাদ্য নহে। খাদ্যের মধ্যে ইহার যে কোন একটির অভাব হইলে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ফলে দেহ রুগ্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই রকম অবস্থাকে **অপুষ্টি** (Malnutrition) বলে।

কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট—এই তিন খাদ্যসামগ্রী দেহে শক্তি উৎপাদন, দেহ বৃদ্ধি ও গঠনমূলক কার্য সুসম্পন্ন করে বলিয়া ইহাদের **শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য** (Energy producing food) বলে। অপরপক্ষে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল দেহের রোগপ্রতিরোধ ও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে কার্য করে। এইজন্য ইহাদের **দেহসংরক্ষণকারী খাদ্য** (Protective food) বলে।

মৌল বিপাকীয় হার (Basal Metabolic Rate or BMR): একজন সুস্থ, স্বাভাবিক, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পূর্ণ বিশ্রামরত (শারীরিক ও মানসিক) অবস্থায় প্রত্যহ যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তাহাকে মৌল বিপাকীয় হার বলে। এই শক্তি তাহার পরিপাক, শ্বসন, হৃৎস্পন্দন, সংবহন প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কার্য সম্পাদনে প্রয়োজন

হয়। একজন স্বাভাবিক ও প্রাপ্তবয়স্ক পরুষ ও স্ত্রীলোকের BMR হইল প্রতি ঘণ্টায় প্রতি বর্গমিটার দেহতলে যথাক্রমে 40 ক্যালোরী ও 37 ক্যালোরী।

8.5.1 খাদ্যের প্রধান প্রধান উপাদান

[A] কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate)

উৎস (Source): চাউল, গম, যব, ভুট্টা, আলু, বার্লি, চিনি, গুড় ইত্যাদি খাদ্য-সামগ্রীতে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়।

গঠন (Structure): কার্বোহাইড্রেট সাধারণত কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H) ও অক্সিজেনের (O) যৌগ বিশেষ। সাধারণত ইহাতে জলের গঠনের ন্যায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 2 : 1 অনুপাতে থাকে। কার্বন ও জলের সহযোগে কাবোহাইড্রেট গঠিত হয় বলিয়া ইহাকে **হাইড্রেটেড কার্বন** (Hydrated Carbon) বলে। কার্বোহাইড্রেটের আণবিক সংকেত (Formula) $C_n(H_2O)_n$। উদাহরণস্বরূপ, গ্লুকোজের ফর্মুলা $C_6H_{12}O_6$। অবশ্য এই আণবিক সংকেতের যথেষ্ট ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। যেমন র‍্যামনোজ (Rhamnose) একটি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থ যাহার ফর্মুলা $C_6H_{12}O_5$। আবার অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH), ল্যাকটিক অ্যাসিড ($CH_3CHOHCOOH$), ফর্ম্যালডিহাইড ($HCHO$) ইত্যাদি পদার্থের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত 2 : 1 হইলেও উহারা কার্বোহাইড্রেট নয়।

কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Carbohydrates):

সরল শর্করার* সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া কার্বোহাইড্রেটকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—মনোস্যাকারাইড, অলিগোস্যাকারাইড এবং পলিস্যাকারাইড।

1. **মনোস্যাকারাইড** (Monosaccharide, গ্রীক শব্দ Monos=এক, Sakkharon=শর্করা): এই জাতীয় কার্বোহাইড্রেটের প্রতিটি অণু একটি সরল শর্করা একক দ্বারা গঠিত। যথা—গ্লুকোজ (Glucose), ফ্রুকটোজ (Fructose), গ্যালাকটোজ (Galactose) প্রভৃতি। একক **শর্করাকে** আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়।

(i) **কার্বন পরমাণুর সংখ্যা অনুযায়ী** (According to the number of carbon atom): একক শর্করা ম্যানোজ (একটি কার্বনযুক্ত বা 1C), ডায়োজ (2C), ট্রায়োজ (3C), ···, অক্টোজ (8C) প্রভৃতি।

(ii) **বিজারণক্ষম গ্রুপের প্রকৃতি অনুযায়ী** (According to the nature of reducing group): একক শর্করা অ্যালডোজেস (Aldoses) এবং কিটোজেস (Ketoses) হইতে পারে। বিজারণক্ষম অ্যালডিহাইড (—CHO) মূলকযুক্ত একক শর্করাকে **অ্যালডোজেস** বলে। যেমন—গ্লুকোজ। আবার বিজারণক্ষম কিটোন (C=O) মূলকযুক্ত একক শর্করাকে **কিটোজেস** বলে, যেমন—ফ্রুকটোজ।

---

*যে শর্করা পাচিত না হইয়া সরাসরি খাদ্যনালী কর্তৃক শোষিত হয় তাহাকে **সরল শর্করা** বা **একক শর্করা** বলে।

2. **ওলিগোস্যাকারাইড** (Oligosaccharide) : দুইটি হইতে দশটি একক শর্করার সমন্বয়ে ওলিগোস্যাকারাইড গঠিত। ইহার আণবিক সংকেত $C_n(H_{2n}O_n)_{2-10}$। কয়েকটি ওলিগোস্যাকারাইড নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

(i) **ডাইস্যাকারাইড** (Disaccharide) : শুধু দুইটি একক শর্করা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন (Glycosidic bond) দ্বারা যুক্ত হইয়া এবং এক অণু জল মুক্ত করিয়া একটি ডাইস্যাকারাইড গঠন করে। যেমন—ল্যাকটোজ, মল্টোজ, সুক্রোজ।

(ii) **ট্রাইস্যাকারাইড** (Trisaccharide) : ইহা তিনটি একক শর্করা দ্বারা গঠিত। যেমন—ম্যানোট্রায়েজ, রোবিনোজ, র‍্যাফিনোজ, জেনটিয়ানোজ।

(iii) **টেট্রাস্যাকারাইড** (Tetrasaccharide) : ইহা চারিটি একক শর্করা দ্বারা গঠিত। যেমন—স্ট্যাকিয়োজ, স্কেরোডোজ।

3. **পলিস্যাকারাইড** (Polysaccharide) : দশের অধিক সংখ্যক একক শর্করা-যুক্ত হইয়া পলিস্যাকারাইড গঠিত হয়। ইহার আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। উদাহরণ—স্টার্চ, গ্লাইকোজেন, ডেক্সট্রিন, সেলুলোজ, ইনুলিন, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড, হেপারিন প্রভৃতি। একই প্রকার শর্করা দ্বারা যখন ওলিগোস্যাকারাইড গঠিত হয়-তখন তাহাকে **সমরূপ পলিস্যাকারাইড** (Homopolysaccharide) বলে। আবার বিভিন্ন প্রকার একক শর্করা দ্বারা যখন পলিস্যাকারাইড গঠিত হয় তখন তাহাকে **অসমরূপ পলিস্যাকারাইড** (Hetropolysaccharide) বলে। উদাহরণ—হায়ালুরোনিক অ্যাসিড (Hyaluronic acid), হেপারিন (Heparin)।

কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা (Role of Carbohydrate) :

(i) কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যকে জ্বালানীরূপে ব্যবহার করিয়া জীব সহজে শক্তি উৎপন্ন করে। এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট হইতে 4·1 ক্যালোরী শক্তি উৎপন্ন হয়।

(ii) প্রাণিদেহে যকৃৎ ও পেশীতে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চিত থাকে।

(iii) অ্যামাইনো অ্যাসিড ও ফ্যাটি অ্যাসিডের সংশ্লেষে ইহা অংশগ্রহণ করে।

(iv) শাক-সব্জি হইতে রাফেজ* বা সেলুলোজ খাদ্যগ্রহণে কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত হয়।

[*B*] **প্রোটিন** (Protein)

উৎস (Source) : **প্রাণিজ প্রোটিন** : মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা প্রভৃতি।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন : ডাল, শিম, সয়াবিন, গম ইত্যাদি।

গঠন (Structure) : **প্রোটিন একটি জটিল নাইট্রোজেনযুক্ত** (16%) **জৈব যৌগ পদার্থ**। নাইট্রোজেন ছাড়া ইহার মধ্যে কার্বন (54%), হাইড্রোজেন (7%), অক্সিজেন (22%) বর্তমান। ক্ষেত্রবিশেষে প্রোটিনের মধ্যে স্বল্প পরিমাণ সালফার, ফসফরাস থাকে। বিভিন্ন প্রোটিনের সম্পূর্ণ আর্দ্র বিশ্লেষণ (Acid hydrolysis) করিলে ইহারা ভাঙ্গিয়া

* আপাতদৃষ্টিতে যে সকল বস্তুর প্রয়োজনীয়তা নাই অথচ অন্যান্য খাদ্যবস্তুর সহযোগে গ্রহণ করিলে প্রাণিদেহে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তাহাকে রাফেজ (Roughage) বলে।

অসংখ্য স্বল্প আণবিক ওজনসম্পন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডে (Amino acid) পরিণত হয়। **সেইজন্য অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিন** অণুর একক। প্রতিটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে অন্তত পক্ষে একটি মুক্ত অ্যামাইনো ($-NH_2$) এবং একটি মুক্ত কার্বোক্সিল ($-COOH$) গ্রুপ থাকিবে। সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাধারণ সংকেত $R-CH.NH_2.COOH$। প্রতিটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের পার্শ্বীয় শৃঙ্খল (side chain) বা 'R' অংশের বিভিন্ন গঠনের ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। একটি বৃহৎ প্রোটিন অণুর সম্পূর্ণ আর্দ্র বিশ্লেষণ করিলে 20টি বিভিন্ন প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিডের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত প্রকৃতিতে প্রায় 150 রকম অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের অ্যামাইনো গ্রুপ ($-NH_2$) অপর একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপের ($-COOH$) সঙ্গে যে বন্ধনী দ্বারা যুক্ত হয় তাহাকে **পেপটাইড বন্ধনী** (Peptide bond) বলে। ইহার ফলে এক অণু জল (H_2O) অপসারিত হয়।

$$CH_3.CH.NH_2-CO\,|\overline{OH+H}|\,NH.CH_2.COOH$$

অ্যালানিন গ্লাইসিন

$$=CH_3.CH.NH_2\,|\overline{CO-NH}|\,CH_2.COOH+H_2O$$
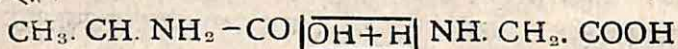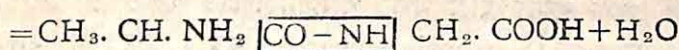
পেপটাইড বন্ধনী অ্যালানাইল গ্লাইসিন

এই পেপটাইড বন্ধনীটি CO–NH প্রকৃতির। অনেকগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড সংযুক্তির মাধ্যমে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করিয়া অবশেষে প্রোটিন গঠন করে। এই ধাপগুলি হইল :

অ্যামাইনো অ্যাসিড→ডাইপেপটাইড→পলিপেপটাইড→পেপটোন→প্রোটিওজেস →মেটাপ্রোটিন→প্রোটিন।

প্রোটিনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Protein) :

প্রোটিনকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা—সরল প্রোটিন, যুগ্ম প্রোটিন এবং লব্ধ বা ডিরাইভড্ প্রোটিন।

1. **সরল প্রোটিন** (Simple protein) : যে সমস্ত প্রোটিনের অণু শুধু অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত তাহাদের সরল প্রোটিন বলে। উদাহরণস্বরূপ—প্রোটামিন (কয়েকটি মাছের শুক্রাণুতে পাওয়া যায়), হিস্টোন, অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, প্রোলামিন, গ্লুটেলিন, স্ক্লেরোপ্রোটিন।

2. **যুগ্ম প্রোটিন** (Conjugated protein) : সরল প্রোটিনের সঙ্গে কোন অ-প্রোটিন (Non-protein) বস্তু সংযুক্ত থাকিলে সেই যৌগকে যুগ্ম প্রোটিন বলে। শেষের এই অ-প্রোটিন অংশটিকে প্রোস্থেটিক গ্রুপ (Prosthetic group) বলে। যেমন—ক্রোমোপ্রোটিন, নিউক্লিওপ্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন, ফসফোপ্রোটিন, লিপোপ্রোটিন, মেটালোপ্রোটিন।

3. **লব্ধ প্রোটিন** (Derived protein): এই জাতীয় প্রোটিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। একটি বৃহৎ প্রোটিন অণুর সম্পূর্ণ আর্দ্র বিশ্লেষণের ফলে পর্যায়ক্রমে লব্ধ প্রোটিন পাওয়া যায়। যেমন—প্রোটিয়োজ, পেপটোন, পেপটাইড ইত্যাদি।

প্রোটিনের ভূমিকা (Role of Protein):

(i) প্রোটিন দেহের বৃদ্ধি, কোষ বিভাজন, ক্ষয় পূরণ এবং অন্যান্য বিপাকীয় কার্যে ব্যবহৃত হয়। দেহের শক্তি উৎপাদনেও প্রোটিন অংশগ্রহণ করে। 1 গ্রাম প্রোটিন দহনের ফলে 4·1 কিলো ক্যালোরী শক্তি উৎপন্ন হয় এবং প্রতিদিন যে শক্তি ব্যয়িত হয় তাহার 10 শতাংশ শক্তি প্রোটিন সরবরাহ করে।

(ii) প্রাণিজ প্রোটিন উদ্ভিজ্জ প্রোটিন অপেক্ষা সহজপাচ্য হওয়ায় এবং উহার মধ্যে অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের* (Essential amino acids) পরিমাণ ও সংখ্যা অধিক থাকার ফলে প্রাণিদেহে ইহার গুরুত্ব বেশী।

(iii) প্রাণিদেহ অস্থি, তরুণাস্থি, সন্ধিবন্ধনী, কণ্ডরা, পেশী, নখ, চুল, শিং, খুর, পালক, কিউটিকল্ প্রভৃতি প্রোটিন দ্বারা গঠিত।

(iv) দেহের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত উৎসেচক (Enzymes) এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত হর্মোন (Hormones) প্রভৃতি প্রোটিনজাত পদার্থ।

(v) হিমোগ্লোবিন, হিমোসায়ানিন, সিরাম অ্যালবুমিন ইত্যাদি প্রোটিন পরিবহণে অংশগ্রহণ করে।

(vi) দেহে রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

নাইট্রোজেন সাম্য (Nitrogen Balance): যদি দেহে প্রোটিনের মাধ্যমে নাইট্রোজেন গ্রহণ এবং বর্জনের পরিমাণ সমান হয় তখন ঐ অবস্থাকে নাইট্রোজেন সাম্য বলে। যদি নাইট্রোজেন গ্রহণ বর্জন অপেক্ষা বেশী হয় তখন তাহাকে ধনাত্মক নাইট্রোজেন সাম্য (Positive nitrogen balance) বলে। ইহা শৈশব অবস্থায় দেখা যায়। অপরপক্ষে, যখন নাইট্রোজেন গ্রহণ বর্জন অপেক্ষা কম হয় তখন তাহাকে ঋণাত্মক নাইট্রোজেন সাম্য বলে (Negative nitrogen balance) বলে। ইহা বার্ধক্য অবস্থায় দেখা যায়।

[C] **ফ্যাট বা লিপিড (Fat or Lipids)**

উৎস (Source): দুধ, ঘি, মাখন, চর্বি, তৈল, সয়াবিন প্রভৃতিতে স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়।

---

* যে সকল অ্যামাইনো অ্যাসিড দেহের অভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হইতে পারে না অথচ দেহের পক্ষে অপরিহার্য তাহাদের অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে। এইগুলি বাহির হইতে খাদ্যের মাধ্যমে দেহে সরবরাহ করা হয়। মানবদেহে আটটি অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রয়োজন, যথা—(i) লাইসিন, (ii) ভ্যালিন, (iii) মিথিওনিন, (iv) থ্রিওনিন, (v) লিউসিন, (vi) আইসোলিউসিন, (vii) ট্রিপ্টোফ্যান, (viii) ফিনাইল অ্যালানিন।

গঠন (Sructure): কার্বোহাইড্রেটের ন্যায় ফ্যাট কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H) এবং অক্সিজেনের (O) সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু ইহাতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ অক্সিজেনের তুলনায় অনেক বেশি থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ফ্যাটে নাইট্রোজেন (N), সালফার (S) এবং ফসফরাস (P) থাকে। ইহা ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের সমন্বয়ে গঠিত। ফ্যাটের অপেক্ষাকৃত কঠিন ও নরম অবস্থাকে **চর্বি** বলে। সাধারণ তাপমাত্রায় যে সমস্ত স্নেহ পদার্থ তরল অবস্থায় থাকে তাহাকে **তৈল** (oil) বলে। ফ্যাট জলে অদ্রবণীয় কিন্তু ইথার, ক্লোরোফর্ম, বেনজিন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে দ্রবণীয়। সাধারণত ইহা ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের এস্টার * বিশেষ (Esters of fatty acids)।

লিপিডের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Lipids):

লিপিড সাধারণত দুই প্রকার, যথা—সরল লিপিড এবং যৌগিক লিপিড।

1. **সরল লিপিড** (Simple Lipid): ইহা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল বা কোহলের একটি এস্টার। ইহা দুই প্রকার, যথা—প্রকৃত স্নেহ পদার্থ এবং মোম।

(i) **প্রকৃত স্নেহ পদার্থ** (True Fats): ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের এস্টারকে **প্রকৃত স্নেহ পদার্থ** বলে। ইহা ট্রাইগ্লিসারাইড নামে পরিচিত। যেমন—নারিকেল তৈল, সয়াবিন তৈল, বাদাম তৈল, মাখন, ঘি প্রভৃতি।

(ii) **মোম** (Waxes): ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের এস্টারকে **মোম** বলে। মানুষের দেহে মোমজাতীয় যে পদার্থ সচরাচর দেখা যায় তাহা রক্তের কোলেস্টেরল এস্টারবিশেষ। ইহা ব্যতীত রক্ত, অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি, গোনাড, ত্বকের সিবেসিয়াস গ্রন্থি (Sebaceous glands) প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে মোম পাওয়া যায়।

2. **যৌগিক লিপিড** (Compound Lipids): যখন স্নেহদ্রব্য বা ফ্যাট অন্য কোন অ-স্নেহ পদার্থের সংযোগে জটিল জৈব পদার্থ সৃষ্টি করে তাহাকে **যৌগিক লিপিড** বলে। শেষোক্ত অ-স্নেহ পদার্থকে প্রোস্থেটিক গ্রুপ বলে। যৌগিক লিপিড পাঁচ প্রকার। যথা—**ফসফোলিপিড, গ্লাইকোলিপিড, লিপোপ্রোটিন, সালফোলিপিড** এবং **গ্যাংলিওসাইড**।

ফসফোলিপিড বা ফসফাটিড (Phospholipids or Phosphatids): ফ্যাটি অ্যাসিড, ফসফোরিক অ্যাসিড ও নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষার (Nitrogenous base) মিলিত হইয়া ইহা গঠিত হয়। প্রকৃতিতে তিনপ্রকার ফসফোলিপিড পাওয়া যায়। যথা—লেসিথিন, কেফালিন ও স্ফিঙ্গোমাইলিন।

লিপিডের ভূমিকা (Role of Lipids):

(i) স্নেহজাতীয় খাদ্য হইতে অধিক পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয়। 1 গ্রাম ফ্যাট হইতে 9·3 কিলো ক্যালোরী শক্তি উৎপাদিত হয়।

---

* অ্যালকোহল ও অ্যাসিডের লবণকে এস্টার বলে।

(ii) স্নেহ পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয় না বলিয়া শরীরের ত্বকের নিচে সঞ্চিত খাদ্যরূপে জমা থাকে।

(iii) ত্বকের নিচে পুরু চর্বির স্তর থাকায় শরীরের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং কমনীয়তা বৃদ্ধি করে।

(iv) ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন (A, D, E এবং K) সহজে ইহার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

(v) ইহা কোষপর্দা গঠনে অংশগ্রহণ করে।

(vi) কোলেস্টেরল হইতে যৌন হর্মোন, অ্যাড্রিনোকর্টিকয়েড হর্মোন, ভিটামিন D, ফোলিক অ্যাসিড ইত্যাদি সংশ্লেষিত হয়।

স্টেরয়েড পদার্থ (Steroid Compound) :

জীবদেহে স্নেহ পদার্থের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মের অনুরূপ একটি পদার্থ পাওয়া যায় যাহা স্টেরয়েড পদার্থ হিসাবে পরিচিত। ইহা স্নেহদ্রাবকে দ্রবণীয় কিন্তু জলে অদ্রবণীয়। স্টেরয়েড পদার্থকে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষিত করা যায়।

স্টেরয়েডের উদাহরণ—কোলেস্টেরল, পিত্ত অম্ল, অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির হর্মোন, যৌন হর্মোন প্রভৃতি।

কোলেস্টেরল (Cholesterol) :

কোলেস্টেরল একটি সাদা কেলাসিত পদার্থ। অ্যাসিটিক অ্যাসিড হইতে ইহা সংশ্লেষিত হয়। ইহা জলে দ্রবীভূত হয় না কিন্তু ইথার, অ্যালকোহল, ক্লোরোফর্ম প্রভৃতি তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয়। স্নেহ পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলে অবদ্রবের (Emulsion) সৃষ্টি করে।

ইহা মানুষের দেহে সর্বত্র বিদ্যমান। স্বাভাবিকভাবে রক্তের মধ্যে 0·15-0·20% কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। কিন্তু কোন ক্রমে রক্তের স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা ইহার মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে রক্ত নালীর গাত্রে সঞ্চিত হইয়া রক্ত প্রবাহের গতিকে মন্দীভূত করে। রক্তে ইহার মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হইয়া যথাক্রমে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস এবং করোনারি থ্রম্বোসিস নামক মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি করে।

8.5.2 খাদ্যের সহায়ক উপাদান

[D] ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ (Vitamin) :

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ একপ্রকার শক্তিশালী জৈব পদার্থ যাহা প্রাণিদেহের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কার্যের পক্ষে অপরিহার্য উপাদানবিশেষ। জীবদেহে ইহা উৎসেচকের ন্যায় জৈব অনুঘটকের (Biological catalyst) কার্য করে। বিজ্ঞানী ক্যাশিমির ফাঙ্ক (Cashimir Funk, 1911) সর্বপ্রথম ভিটামিন (Vitamine) কথাটি প্রবর্তন

করেন। [ভিটামিন কথাটির অর্থ—ল্যাটিন শব্দ 'Vita'=জীবন এবং ইংরাজী শব্দ 'Amine'=রাসায়নিক মূলক (Amine group)]। অধ্যাপক জে. সি. ড্রুমণ্ড (Prof. J. C. Drumond, 1920) ফাঙ্ক-প্রবর্তিত Vitamine কথাটির শেষ অক্ষর 'e' বাদ দিয়া জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য উপাদানগুলি একত্রে নামকরণ করেন Vitamin.

প্রধানত সবুজ উদ্ভিদ ভিটামিন সংশ্লেষ করিতে পারে কিন্তু উহাদের দেহে ভিটামিনের কার্যকারিতা কি তাহা স্পষ্টভাবে জানা সম্ভব হয় নাই। প্রাণীরা উদ্ভিদদেহ হইতে ভিটামিন সংগ্রহ করে, অবশ্য কয়েকটি ভিটামিন—যথা ভিটামিন D, A এবং B প্রাণিদেহে সংশ্লেষিত হয়।

সংজ্ঞা (Definition) : **জীবদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, পুষ্টি প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কার্য সম্পাদন করিবার জন্য স্বল্পমাত্রায় খাদ্যস্থিত জৈব যৌগকে ভিটামিন বলে।**

ভিটামিনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General Characteristics of Vitamins) :

1. **বিস্তৃতি** (Distribution) : উদ্ভিদদেহে প্রায় সমস্ত ভিটামিন সংশ্লেষিত হয়। অবশ্য কিছু কিছু ভিটামিন প্রাণিদেহে সংশ্লেষিত হইয়া থাকে।

2. **প্রাত্যহিক চাহিদা** (Daily requirements) : অল্প গাঢ়ত্বে ভিটামিন কার্য করে বলিয়া দৈনিক স্বল্পমাত্রায় ভিটামিন দরকার। ভিটামিনের চাহিদা প্রত্যেকের সমান নহে। বাড়ন্ত শিশু, স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থা; স্তন্যদান কাল, পেশী সঞ্চালনকাল প্রভৃতি অবস্থায় ভিটামিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

3. **সঞ্চয়** (Store) : ভিটামিনকে অল্পমাত্রায় দেহের মধ্যে সঞ্চয় করা যায়।

4. **কার্যপদ্ধতি** (Mode of action) : সকল ভিটামিনের কার্যপদ্ধতি এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নাই। তবে অনেক ক্ষেত্রে ভিটামিন বিপাক ক্রিয়ার সময় উৎসেচকের সঙ্গে সহ-উৎসেচকরূপে (Co-enzyme) কার্য করে।

ভিটামিনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Vitamins) : দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে ভিটামিনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা—I : ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন এবং II : জলে দ্রবণীয় ভিটামিন।

I. **ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন** (**Fat-soluble Vitamins**) : এই জাতীয় ভিটামিন শুধু ফ্যাট বা স্নেহ দ্রাবকে দ্রবণীয়। ইহা চারিপ্রকার। নিম্নে ইহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

1. ভিটামিন A (Retinol or Antixerophtbalmic factor) :

উৎস (Source) : গাজর, সবুজ শাক-সব্জি, টোমাটো, পাকা ফল ; হ্যালিবাট ও কড মাছের যকৃতের তৈল, দুধ, মাখন, ডিম, মাছ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী (Functions or Actions) : (i) দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

(ii) দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ন রাখিতে সহায়তা করে।

(iii) অস্থির স্বাভাবিক আকৃতি ও কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(iv) স্নায়ুকোষের কর্মক্ষমতা ও পুষ্টি বজায় রাখে।

(v) প্রোটিন সংশ্লেষ ও কার্বোহাইড্রেট বিপাকে সহায়তা করে।

অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency signs) :

(1) **দেহবৃদ্ধি** : দেহবৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(2) **চোখের বিভিন্ন রোগ** : (i) রাতকানা রোগ (Night blindness or Nyctalopia) ভিটামিন A-এর অভাবে হয়। (ii) চোখের অশ্রুগ্রন্থি (Lachrymal glands) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফলে চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করে, শুষ্ক হয় (Xerophthalmia) এবং চোখের উজ্জ্বলতা হয়। (iii) চোখের কর্ণিয়া বিনষ্ট হইলে (Keratomalacia) চোখে ছানি পড়ে।

(3) **আবরণী কলার পরিবর্তন** ঃ ত্বক পুরু, শুষ্ক ও খসখসে হয়। ত্বকের এই অবস্থা ব্যাঙের ত্বকের মত গুটিযুক্ত ও কর্কশ হওয়ার জন্য ইহাকে 'টোড স্কিন' বা 'ফ্রিনোডার্মা' (Toad skin or Phrynoderma) বলে।

(4) **স্নায়ুতন্ত্র** : স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে।

(5) **অস্থি** : মেরুদণ্ড ও করোটীর কোন কোন অংশের অস্থির অত্যধিক বৃদ্ধি ঘটে।

2. **ভিটামিন** D (Vitamin D or Calciferol or Antirachitic factor)

উৎস (Source) : উদ্ভিজ্জ তৈলে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত কড ও হ্যালিবাট নামক সামুদ্রিক মাছের যকৃতের তৈল, মাখন, দুগ্ধ, ডিম ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। সূর্যালোকের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে ত্বকের নিচে ভিটামিন D সংশ্লেষিত হয়।

কার্যাবলী (Functions or Actions) :

(i) ইহা অন্ত্রে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণে সহায়তা করে।

(ii) অস্থি কোষের উপর সরাসরি কার্য করিয়া অস্থি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

(iii) দন্তের বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে।

অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency signs)

(1) **রিকেট** (Rickets) : ভিটামিন D-র অভাবে অস্থিতে ঠিকমত ক্যালসিয়াম জমা হয় না ফলে শিশুদের অস্থি সুগঠিত হয় না। এই অবস্থাকে **রিকেট** বলে।

(2) **ওসটিওম্যালাসিয়া** (Osteomalacia) : বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে ভিটামিন D-র অভাবে অস্থিগুলি কোমল ও নরম হয়। দেহভারে লম্বা অস্থিগুলি বাঁকিয়া যায়। এই অবস্থাকে **ওসটিওম্যালাসিয়া** বলে।
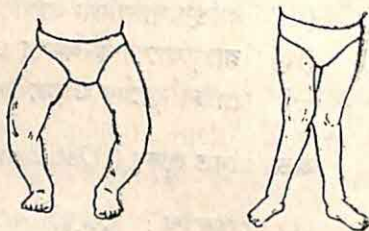
চিত্র 8.7 : রিকেট রোগাক্রান্ত শিশু।

3. **ভিটামিন E** (Vitamin E or Tocopherols or Antisterilitic factor)

উৎস (Source) : সবুজ শাক-সব্জি, গম, সয়াবিন ; মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী (Functions) :

(i) স্বাভাবিক প্রজনন ক্রিয়ায় উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

(ii) গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

(iii) বন্ধ্যাত্ব দূরীভূত হয়।
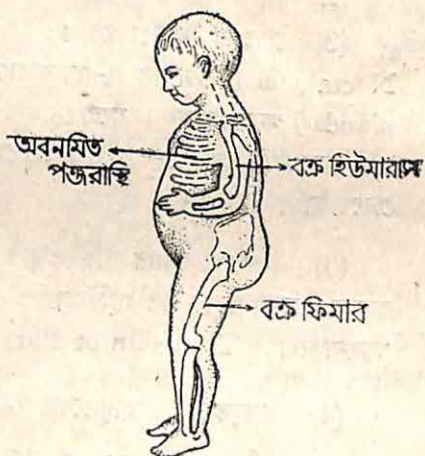
অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency signs) :

(i) প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

(ii) ভিটামিন E-র অভাবে বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

(iii) রক্তের লোহিত রক্তকণিকা বিনষ্ট হয়।

4. **ভিটামিন K** (Vitamin K or Methyl phytyl naphthoquinone or Antihaemorrhagic factor)

উৎস (Source) ঃ বাঁধাকপি, টোমাটো, পালংশাক, শাক-সব্জি, সয়াবিন ; প্রাণিদেহের অন্ত্রে বসবাসকারী ব্যাক্টিরিয়া কর্তৃক কিছু পরিমাণ ভিটামিন K সংশ্লেষিত হয়।

কার্যাবলী (Functions) : (i) রক্তস্থিত প্রোথ্রোম্বিনের সঠিক মাত্রা বজায় রাখিয়া রক্ত তঞ্চনে সহায়তা করে।

(ii) পিত্তরস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত করে।

অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency sign) : ভিটামিন K-র অভাবে রক্ত তঞ্চিত হয় না ফলে রক্ত ক্ষরণ ঘটে।

II. **জলে দ্রবণীয় ভিটামিন** (Water-soluble vitamins) : জলে দ্রবণীয় ভিটামিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিনগুলি হইল ভিটামিন B-কমপ্লেক্স, ভিটামিন C।

ভিটামিন B-কমপ্লেক্স (Vitamin B-Complex) : ইহা প্রায় 14টি ভিটামিনের সমন্বয়ে গঠিত। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভিটামিন আলোচনা করা হইল :

1. **থায়ামিন** (Thiamin or Vitamin B_1 or Antiberiberi vitamin).

উৎস (Source) : শস্যজাতীয় খাদ্য, ডাল, ঢেঁকিছাটা চাউল, বাদাম, সবুজ শাক-সব্জি, গাজর, বীট, ফুলকপি, পেয়ারা, বীন ; ঈস্ট ; ডিমের কুসুম প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী (Functions) : কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিনসংশ্লেষে প্রয়োজনীয় উৎসেচককে তাহাদের কার্যে সহায়তা করে।

অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency signs) : থায়ামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগের সৃষ্টি হয়। বেরিবেরি রোগে নার্ভতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পায়ে **শোথ** (Oedema) হয় অর্থাৎ পা ফুলিয়া উঠে, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি দেখা যায়। পাখীদের পলিনিউরাইটিস রোগ দেখা যায়।

2. **রাইবোফ্লেভিন** (Riboflavin or Vitamin B_2) :

উৎস (Source) : সবুজ শাক-সব্জি ; দুগ্ধ, ডিম, যকৃত, বৃক্ক, পেশীতে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী (Functions) : (i) দেহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। (ii) শ্বসনে সংশ্লিষ্ট উৎসেচকরূপে কার্য করে। (iii) প্রোটিন বিপাকে অংশগ্রহণ করে।

অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency signs) : (i) দেহবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। (ii) ঠোঁটের কোণে ঘা (Cheilosis) হয়। ঠোঁটের উভয় পার্শ্ব ফাটিয়া যায়, পরে ক্ষত সৃষ্টি হয় ; জিহ্বার ক্ষত সৃষ্টি (Glossitis) হইয়া প্রদাহ হয়। (iii) ত্বক খসখসে ও শুষ্ক হয়, চুল উঠিয়া যায়।

3. **প্যান্টোথ্যানিক অ্যাসিড** (Pantothenic acid or Vitamin B_3) :

উৎস (Source) : মটর, মিষ্টি আলু, গুড় ; দুগ্ধ, ডিমের কুসুম, যকৃত, বৃক্ক ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী (Functions) : বিপাকীয় ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, ত্বকের কমনীয়তা রক্ষা করে।

অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency signs) : চর্মরোগ, স্নায়ুক্ষয়, থাইমাস গ্রন্থি চুপসাইয়া যায়।

4. **নিকোটিনিক অ্যাসিড এবং নিকোটিনামাইড** (Nicotinic acid and Nicotinamide) :

উৎস (Source) : সবুজ শাক-সব্জি, মটর শুটি, টোমাটো, বীন ; মাছ, মাংস, দুগ্ধ, যকৃত ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী (Functions) : (i) দেহ বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে। (ii) পেলাগ্রা (Pellagra) রোগ দমন করে। (iii) কার্বোহাইড্রেট হইতে ফ্যাট তৈয়ারিতে সহায়তা করে।

অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency signs) : (i) এই ভিটামিনের অভাবে পেলাগ্রা রোগ হয়। এই রোগের লক্ষণগুলি তিনটি 'D' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

চিত্র 8.8 : ক—স্বাভাবিক হস্ত খ—পেলাগ্রা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির হস্ত

(a) **ডার্মাটাইটিস** (Dermatitis) : দেহত্বক খসখসে ও কঠিন হয়।

(b) **ডায়েরিয়া** (Diarrhoea) : পাকস্থলী ও অন্ত্রের গোলযোগ পরিলক্ষিত হয়।

(c) **ডিমেনসিয়া** (Dementia) : মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়।

(ii) দেহের ওজন ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, রক্তাল্পতা দেখা যায়।

(iii) শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

5. **পাইরিডক্সিন** (Pyridoxine or Vitamin B_6) :

উৎস (Source) : সবুজ শাক-সব্জি, অঙ্কুরিত শস্য ; ডিমের কুসুম, মাংস, যকৃত প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী (Functions) : প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট হইতে ফ্যাট সংশ্লেষে সহায়তা করে ; প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট বিপাকে অংশগ্রহণ করে।

অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency sign) : অ্যাক্রোডাইনিয়া (Acrodynia) নামক এক প্রকার চর্মরোগ দেখা যায়।

6. ফোলিক অ্যাসিড (Folic acid):

উৎস (Source) : পত্রবহুল শাক, ফুলকপি ; যকৃত, বৃক্ক প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী (Functions) : লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন ও পরিণত করিতে সহায়তা করে।

অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency sign) ঃ রক্তাল্পতা দেখা যায় বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় ইহা পরিলক্ষিত হয়।

7. সায়ানোকোবালামিন (Cyanocobalamin or Vitamin B_{12}):

উৎস (Source) : *Streptomyces griseus* নামক ছত্রাক, ডিম, দুগ্ধ, গরুর মাংস, যকৃত, বৃক্ক ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী (Functions) : (i) লোহিত রক্ত কণিকার উৎপাদন ও পরিণতিতে অপরিহার্য। (ii) অস্থিমজ্জার উপর কার্য করিয়া শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। (iii) কার্বোহাইড্রেট হইতে ফ্যাট তৈয়ারীতে সহায়তা করে।

অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency signs) : পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া (Pernicious anaemia) নামক রক্তাল্পতা দেখা যায়। রক্ত শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

8. বায়োটিন (Biotin or Vitamin H) ঃ

উৎস (Source) ঃ ফুলকপি, মটরশুটি ; ডিম, বৃক্ক, যকৃত প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী (Functions) : (i) লিপিড সংশ্লেষে সহায়তা করে, (ii) ইঁদুর ও কুকুরের চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।

অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency signs) : (i) বায়োটিনের অভাবে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। (ii) চর্মরোগের সৃষ্টি হয়। (iii) ইঁদুর ও কুকুরের চর্মরোগ পরিলক্ষিত হয়।

উপরি-উক্ত ভিটামিনগুলি ব্যতীত ভিটামিন B-কমপ্লেক্সে লিপোইক অ্যাসিড, কোলিন, ইনোসিটল, প্যারাঅ্যামাইনো-বেনজয়িক অ্যাসিড থাকে।

ভিটামিন C (Vitamin C or Ascorbic acid):

উৎস (Source) : কমলালেবু, পাতিলেবু, আমলকী, টোমাটো, আনারস, পেঁপে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লেটুস শাক, কাঁচা লঙ্কা, বরবটী, অঙ্কুরিত ছোলা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মাংস, মাছ, দুগ্ধ প্রভৃতিতে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

কার্যাবলী (Functions) : (i) অস্থি, তরুণাস্থি, দাঁত, ত্বক এবং সংযোগ রক্ষাকারী কলার কোষাস্থিত পদার্থ বজায় রাখিতে সহায়তা করে।

(ii) অন্ত্র দ্বারা লৌহ (Iron) শোষণে সহায়তা করে।

(iii) লোহিত রক্তকণিকাকে পরিণত করিতে সহায়তা করে।

(iv) ক্ষত নিরাময়ে সহায়তা করে।

অভাবজনিত লক্ষণ (Deficiency signs) :

(i) ভিটামিন C-র অভাবে স্কার্ভিরোগ দেখা দেয়। এই রোগে দাঁতের মাড়িতে ঘা হয়, পুঁজ পড়ে, রক্তক্ষরণ হয়, দাঁতের মাড়ি স্পঞ্জী ও ছিদ্রযুক্ত হয়।

(ii) দাঁত ও অস্থি কদাকার রূপ ধারণ করে। অস্থির ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায় বা অস্থি সহজে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

(iii) লোহিত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকার সংখ্যা হ্রাস পায়।

(iv) শরীর সহজে জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে।
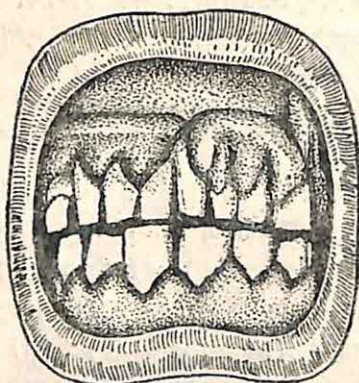
চিত্র 8.9 : স্কার্ভিরোগ

(v) ত্বকে ফুসকুড়ি (Eruption) দেখা দেয়।

ভিটামিন P (Vitamin P or Citrin)

ইহা একটি জলে দ্রবণীয় ভিটামিন এবং ভিটামিন C-এর সহিত একযোগে উদ্ভিজ্জ খাদ্যে পাওয়া যায়। ইহা রক্তজালকের ভেদ্যতা বজায় রাখে এবং ভিটামিন C-এর কার্যকারিতাকে উদ্বুদ্ধ করে। ইহার অভাবে স্কার্ভি রোগ দেখা যায়।

বিভিন্ন ভিটামিনের উৎস, শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী, অভাবজনিত লক্ষণ ও প্রাত্যহিক চাহিদার তালিকা 8.23—8.25 পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

প্রোভিটামিন (Provitamin) **: যে সকল জৈব যৌগ হইতে প্রাণীরা ভিটামিন সংশ্লেষ করিতে পারে তাহাদের প্রোভিটামিন বলে।** যেমন—ভিটামিন A-র প্রোভিটামিন হইল ক্যারোটিন। ভিটামিন D-র প্রোভিটামিন—আর্গোস্টেরল।

অ্যান্টিভিটামিন (Antivitamin) : **যে সমস্ত ভিটামিনসদৃশ রাসায়নিক পদার্থ ভিটামিনের কার্যে বাধা প্রদান করিয়া ইহাকে নিষ্ক্রিয় বা বিনষ্ট করে সেইসব পদার্থকে অ্যান্টিভিটামিন বলে।** যেমন—(i) **পাইরিথিয়ামিন** (Pyrithiamine), **অক্সিথিয়ামিন** (Oxythiamine) থিয়ামিনের কার্যে বাধা দান করে।

(ii) **গ্যালাক্টোফ্ল্যাভিন** রাইবোফ্ল্যাভিনের (ভিটামিন B_2) অ্যান্টিভিটামিন।

(iii) **অ্যাভিডিন** বায়োটিনের অ্যান্টিভিটামিন।

(iv) **অ্যামাইনোপটেরিন** এবং **অ্যামেথোপটেরিন** ফোলিক অ্যাসিডের অ্যান্টি-ভিটামিন।

সিউডোভিটামিন (Pseudovitamin) : **যে সকল জৈব যৌগের গঠন ভিটামিনের ন্যায় কিন্তু ভিটামিনের গুণসম্পন্ন নহে তাহাদের সিউডোভিটামিন বলে।** যথা—সায়ানোকোবালামিন (ভিটামিন B_{12})-এর সিউডোভিটামিন মিথাইলকোবালামিন।

আভিটামিনোসিস (Avitaminosis) **: দেহে ভিটামিনের অভাব হইলে সেই অবস্থাকে আভিটামিনোসিস বলে।**

বিভিন্ন ভিটামিনের উৎস, শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী, অভাবজনিত লক্ষণ ও প্রাত্যহিক চাহিদার তালিকা

ভিটামিনের নাম	উৎস	শারীরবৃত্তীয় কার্য	অভাবজনিত লক্ষণ	প্রাত্যহিক চাহিদা
A. স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন- 1. ভিটামিন A	গাজর, শাকসব্জি, টোমাটো, হ্যালিবাট, কড মাছের যকৃতের তৈল, ডিম, মাছ, মাখন, দুধ।	দেহের বৃদ্ধিতে, দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে, অস্থি ও দন্তের স্বাভাবিক আকৃতি ও কার্যে, এপিথেলিয়াল কলার স্বাভাবিকতা, স্নায়ুকোষের কর্মক্ষমতা, প্রোটিন সংশ্লেষ ও কার্বোহাইড্রেট বিপাক নিয়ন্ত্রণ, রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।	দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, রাতকানা রোগ, চোখের অশ্রুগ্রন্থি বিনষ্ট হয়, চোখে ছানি পড়ে, ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হয়। স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষয় প্রাপ্তি ঘটে, দেহে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।	পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী লোকের 5,000 i.u. বাড়ন্ত শিশু, গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদাত্রীর 6,000-8,000 i. u.
2. ভিটামিন D	কড ও হ্যালিবাট মাছের যকৃতের তৈল, মাখন, দুধ, ডিম, মানুষের ত্বকে সংশ্লেষিত হয়।	অন্ত্রে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণে, অস্থি ও দন্তের বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে।	অস্থিতে প্রয়োজন মত ক্যালসিয়াম জমা হয় না। ফলে শিশুদের রিকেট, এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ওস্টিওম্যালাসিয়া রোগ হয়।	নবজাত শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রীদের ক্ষেত্রে 400 i.u.
3. ভিটামিন E	শাক-সব্জি, গম, সয়াবিন, মাছ, মাংস, ডিম।	স্বাভাবিক প্রজনন ক্রিয়ায়, পেশী, অঙ্গ, ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে, দেহের অপ্রয়োজনীয় জারণ বন্ধে, বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে সহায়তা করে।	প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়, বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্তি ঘটে, দেহের পেশী ক্ষয় হয়, ভ্রূণের অকাল মৃত্যু ঘটে।	15-20 mg
4. ভিটামিন K	বাঁধাকপি, টোমাটো, পালং-শাক, সয়াবিন, প্রাণীদের অন্ত্রে বসবাসকারী ব্যাকটিরিয়া ইহা সংশ্লেষ করে।	রক্তাস্থিত প্রোথ্রোম্বিনের সঠিক মাত্রা বজায় রাখিতে, রক্ততঞ্চনে অংশগ্রহণ করে।	রক্ত তঞ্চিত হয় না, রক্তক্ষরণ ঘটে।	5 mg

পুষ্টি

বিভিন্ন ভিটামিনের উৎস, শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী, অভাবজনিত লক্ষণ ও প্রাত্যহিক চাহিদার তালিকা

ভিটামিনের নাম	উৎস	শারীরবৃত্তীয় কার্য	অভাবজনিত লক্ষণ	প্রাত্যহিক চাহিদা
B. জলে দ্রবনীয় ভিটামিন 1. থায়ামিন (ভিটামিন B_1)	সবুজ শাক-সব্জি, গাজর, বীট, লেটুস শাক, ফুলকপি, পেয়ারা, ডাল, ঢেঁকিছাটা চাউল, ডিমের কুসুম।	থায়ামিনের পাইরোফস্ফেট এস্টার, কার্বোক্সিলেজের কো-এনজাইমরূপে সহায়তা করে, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন সংশ্লেষে প্রয়োজনীয় উৎসেচককে তাহাদের কার্যে সাহায্য করে।	বেরিবেরি রোগের সৃষ্টি হয়, নার্ভতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পা ফুলিয়া উঠে, ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়। পাখীদের পলিনিউরাইটিস রোগ দেখা যায়।	1·8 mg
2. রাইবোফ্ল্যাভিন (ভিটামিন B_2)	সবুজ শাক-সব্জি, দানা শস্য, দুধ, ডিম, যকৃত, বৃক্ক, পেশী।	দেহের বৃদ্ধি, প্রোটিন বিপাকে, শ্বসনে সংশ্লিষ্ট উৎসেচকের সহ-উৎসেচকরূপে কাজ করে।	দেহবৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ঠোঁটের কোণে ঘা হয়, জিহ্বায় ক্ষত সৃষ্টি হয়, ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হয়, চুল উঠে।	1·5-1·8 mg
3. প্যান্টেথ্যানিক অ্যাসিড (ভিটামিন B_3)	মটর, মিষ্টি আলু, দুধ, ডিমের কুসুম, যকৃত, বৃক্ক।	বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে, কো-এনজাইমরূপে কার্য করে, পুষ্টি ও ত্বকের কমনীয়তা রক্ষা করে।	চর্মরোগ, স্নায়ুক্ষয় প্রভৃতি দেখা যায়, থাইমাস গ্রন্থি চুপসে যায়।	10 mg
4. নিকোটিনিক অ্যাসিড এবং নিকোটিনামাইড	শাক-সব্জি, মটরশুঁটি, টোমাটো, বীন, মাছ, মাংস, দুধ, যকৃত।	দেহের বৃদ্ধি, পেলাগ্রা রোগ দমনে, কার্বোহাইড্রেট হইতে ফ্যাট তৈয়ারিতে সাহায্য করে, বিপাক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।	পেলাগ্রা রোগ হয়, স্নায়বিক দূর্বলতা, অস্থিরতা, ওজন ও কর্ম-ক্ষমতা হ্রাস, রক্তাল্পতা, শিশুদের দেহবৃদ্ধি ব্যাহত হয়।	12-18 mg
5. পাইরিডক্সিন (ভিটামিন B_6)	অঙ্কুরিত শস্য, সবুজ শাক-সব্জি, ডিমের কুসুম, মাংস, যকৃত, বৃক্ক।	প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট হইতে ফ্যাট সংশ্লেষে সহায়তা করে, প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট বিপাকে অংশগ্রহণ করে।	অ্যাক্রোডাইনিয়া নামক চর্মরোগ হয়, বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, স্নায়ুক্ষয়, অনিদ্রা, অস্থিরতা দেখা যায়, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত ঘটে।	শিশুদের ক্ষেত্রে 0·3 mg এবং প্রাপ্ত-বয়স্কদের ক্ষেত্রে 2 mg.

ভিটামিনের নাম	উৎস	শারীরবৃত্তীয় কার্য	অভাবজনিত লক্ষণ	প্রাত্যহিক চাহিদা
6. ফোলিক অ্যাসিড	পত্রবহুল শাক-সব্জি ফুলকপি, বৃক্ক, যকৃত।	লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন ও পরিণত হইতে সহায়তা করে, কোষের নিউক্লিয়াসের DNA সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে।	গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের রক্তাল্পতা দেখা যায়।	50 মাইক্রোগ্রাম
7. সায়ানোকোবালামিন (ভিটামিন B_{12})	ডিম, দুধ, যকৃত, বৃক্ক। *Streptomyces griseus* নামক এক প্রকার ছত্রাক।	লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন ও পরিণতিতে অপরিহার্য, শ্বেত রক্ত-কণিকা ও অণুচক্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে, সহ-উৎসেচক হিসাবে কার্য করে।	পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া নামক রক্তাল্পতা দেখা যায়, রক্ত শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় আন্ত্রিক শোষণের অক্ষমতা দেখা যায়।	1 মাইক্রোগ্রাম
8. বায়োটিন	ফুলকপি, মটরশুঁটি, ডিম, বৃক্ক, যকৃত।	লিপিড সংশ্লেষে সহায়তা করে, ইঁদুর ও কুকুরের চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।	রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, চর্মরোগের সৃষ্টি হয়।	150-300 মাইক্রোগ্রাম।
9. ভিটামিন C	সমস্ত লেবুজাতীয় ফল, আমলকী, আনারস, টোমাটো, আম, আপেল, লঙ্কা, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি।	অস্থি, তরুণাস্থি, দাঁত গঠনে, লোহিত রক্তকণিকাকে পরিণত করিতে, ক্ষত নিরাময়ে, অন্ত্র দ্বারা লোহ শোষণে, রক্তবাহকে সতেজ রাখিতে সহায়তা করে।	স্কার্ভিরোগ হয়, দাঁত ও অস্থি কদাকার রূপ ধারণ করে, অস্থির ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায়, লোহিত রক্ত-কণিকা ও অণুচক্রিকার সংখ্যা কমিয়া যায়, শরীর সহজে জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে।	শিশুদের 30-80 মিলিগ্রাম, বয়স্কদের 60-75 মিলিগ্রাম, স্তন্যদাত্রীদের 100-150 মিলিগ্রাম।

হাইপারভিটামিনোসিস (Hypervitaminosis) ঃ দেহের প্রয়োজনের তুলনায় ভিটামিনের পরিমাণ বেশি হইলে সেই অবস্থাকে হাইপারভিটামিনোসিস বলে।

[E] **খনিজ লবণ** (Minerals) ঃ খনিজ পদার্থ দেহে শক্তি সরবরাহ না করিলেও দেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি, বিভিন্ন বিপাকীয় কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য অল্প পরিমাণ জীবদেহে অপরিহার্য। খাদ্যগ্রহণ না করা অপেক্ষা খনিজ লবণ গ্রহণ না করা জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর।

বিভিন্ন খনিজ লবণের উৎস, শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী, অভাবজনিত লক্ষণ ও প্রাত্যহিক চাহিদার তালিকা 8.27 8.29 পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

[F] জল (Water) ঃ

1. প্রোটোপ্লাজমের প্রধান উপাদান হইল জল, এমনকি জীবদেহের ওজনের প্রায় 60-80 শতাংশ জল।

2. জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া, যথা—সালোক সংশ্লেষ, শ্বসন, প্রস্বেদন, পুষ্টি, রেচন প্রভৃতির জন্য জল অপরিহার্য।

3. সংবহনের প্রধান মাধ্যম জল।

4. ব্যাপন, অভিস্রবণ প্রভৃতি কার্যে জলের ভূমিকা অপরিসীম।

5. প্রাণীদের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

6. অত্যধিক উষ্ণতায় জলের বাষ্পীভবনের ফলে দেহ ঠাণ্ডা থাকে।

7. ইহা ঘর্ষণ ও শুষ্কতা হইতে অঙ্গকে রক্ষা করে।

8. বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

8.6 পরভোজী পুষ্টির প্রকারভেদ (Types of Heterotrophic nutrition) ঃ প্রাণীদের খাদ্য সংগ্রহ অনুযায়ী পুষ্টি প্রধানত চারিপ্রকার, যথা—

1. **মৃতজীবীয় পুষ্টি** (Saprozoic nutrition) : **যে প্রক্রিয়ায় প্রাণীরা দেহ-নিঃসৃত রস দ্বারা পচনশীল জৈব খাদ্যকে তরল করে এবং ব্যাপনের মাধ্যমে শোষণ করিয়া পুষ্টিলাভ করে তাহাকে মৃতজীবীয় পুষ্টি বলে।** এই পদ্ধতিতে প্রাণীরা নিজেদের হইতে উৎসেচক নিঃসৃত করিয়া পচনশীল জৈব খাদ্যকে পাচিত করে। ফলে ইহা তরল ও সরল খাদ্যে পরিণত হয় এবং প্রাণীরা এই খাদ্যকে শোষণ করে। উদাহরণস্বরূপ আদ্যপ্রাণী ইউগ্লিনা (Euglena) এই পদ্ধতিতে পুষ্টি সাধন করে।

2. **পরজীবীয় পুষ্টি** (Parasitic nutrition) : **যে পদ্ধতিতে প্রাণীরা অন্য কোন প্রাণিদেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহা হইতে খাদ্য গ্রহণ করে তাহাকে পরজীবীয় পুষ্টি বলে।** এই পদ্ধতিতে যে সমস্ত প্রাণী অন্য প্রাণীর দেহে বাস করিয়া খাদ্য শোষণ করে সেই সমস্ত প্রাণীকে **পরজীবী** (Parasite) প্রাণী বলে এবং যাহার দেহে পরজীবী প্রাণী বাস করে তাহাকে **পোষক** (Host) বলে। পরজীবী প্রাণী পোষকের দেহের বাহিরে অথবা দেহের ভিতরে বসবাস করিয়া পুষ্টি লাভ করিতে পারে। যখন পরজীবী প্রাণী পোষক দেহের বাহিরে বসবাস করে তখন তাহাকে **বহিঃপরজীবী** (Ectoparasite) প্রাণী বলে। যেমন—ছারপোকা, উকুন, এঁটুলি প্রভৃতি। আবার যে পরজীবী প্রাণী

বিভিন্ন খনিজ লবণের উৎস, শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী, অভাবজনিত লক্ষণ ও প্রাত্যহিক চাহিদার তালিকা

খনিজ দ্রব্য	উৎস	শারীরবৃত্তীয় কার্য	অভাবজনিত লক্ষণ	প্রাত্যহিক চাহিদা
1. ক্যালসিয়াম	সবুজ শাক-সব্জি, ডিম, দুধ, মাখন, খরজল।	দেহের অস্থি ও দাঁত গঠনে, রক্ত তঞ্চনে, পেশী সঞ্চালনে, দুগ্ধ তঞ্চনে সহায়তা করে, বিভিন্ন উৎসেচককে সক্রিয় করে।	অস্থি ও দাঁতের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, টিটেনাস, রিকেট ও স্নায়ুর উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়।	1-1·5 গ্রাম
2. ফসফরাস	শাক-সব্জি, ডিম, দুধ যকৃত, মাংস প্রভৃতি।	দেহের অস্থি ও দাঁত গঠনে, পেশী সংকোচনে, রক্ততঞ্চনে ভিটামিনের সহিত যুক্ত হইয়া কো-এনজাইম-রূপে কার্য করে।	অস্থি ও দাঁতের গঠন ব্যাহত হয়, শিশুদের রিকেট ও বয়স্কদের ওস্টিওম্যালাসিয়া রোগ দেখা যায়।	1-1·5 গ্রাম
3. সোডিয়াম	সাধারণ লবণ, শাক-সব্জি, দুধ।	হৃৎপিণ্ডের সংকোচনে, কোষের স্বাভাবিক কার্যে, পেশী সংকোচনে, ফ্যাট শোষণে, রক্ত ও মূত্রের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করে।	স্নায়ু বৈকল্য, ওজন হ্রাস এবং বৃক্কের কার্যে ঘাটতি দেখা যায়।	5-10 গ্রাম
4. পটাসিয়াম	সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে।	অন্তঃকোষীয় বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করিতে, CO_2 পরিবহণে, স্নায়ুতন্ত্রের কার্যে।	বন্ধ্যাত্ব, অসম্পূর্ণ বৃদ্ধি, হৃৎস্পন্দন ও দুর্বল পেশী নিয়ন্ত্রণ করে, স্নায়বিক অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণ করে।	4 গ্রাম

বিভিন্ন খনিজ লবণের উৎস, শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী, অভাবজনিত লক্ষণ ও প্রাত্যহিক চাহিদার তালিকা

খনিজ দ্রব্য	উৎস	শারীরবৃত্তীয় কার্য	অভাবজনিত লক্ষণ	প্রাত্যহিক চাহিদা
5. ম্যাগনেসিয়াম	শাক-সব্জি, পাঁউরুটি, মাংস।	অস্থি ও দাঁত গঠনে, পেশীর কার্যে, উৎসেচককে সক্রিয় করে।	রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, টিটেনাস রোগ, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন দেখা যায়।	300-3 0 মিলিগ্রাম
6. লৌহ	শাক-সব্জি, পেয়ারা, কাঁচকলা, মাংস, ডিম, যকৃত।	রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈয়ারিতে, লোহিত রক্তকণিকা বৃদ্ধি ও পরিণতিতে, পেশীতে অক্সিজেন সরবরাহে সাহায্য করে।	রক্তাল্পতা রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ হ্রাস পায়।	15-20 মিলিগ্রাম
7. তাম্র	শাক-সব্জি, দুধ, যকৃত, রক্ত, সামুদ্রিক জল।	রক্তের হিমোসায়ানিন, হিমোগ্লোবিন গঠনে, অস্থি বৃদ্ধিতে অংশ গ্রহণ করে।	রক্তাল্পতা দেখা যায়।	2 মিলিগ্রাম
8. ম্যাঙ্গানিজ	লেট্যুস শাক, বাঁধাকপি, কমলালেবু, বাদাম, ডিমের কুসুম।	ভ্রূণের পূর্ণাঙ্গ গঠনে এবং বিভিন্ন প্রকার উৎসেচকের কর্মক্ষমতাকে উদ্দীপিত করে।	দেহবৃদ্ধি ও অস্থিবৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ভ্রূণের অসম্পূর্ণ গঠন দেখা যায়।	2 মিলিগ্রাম

পুষ্টি

খনিজ দ্রব্য	উৎস	শারীরবৃত্তীয় কার্য	অভাবজনিত লক্ষণ	প্রাত্যহিক চাহিদা
9. সালফার	শাক-সব্জি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ।	নখ, চুল, শিং, ক্ষুর, তরুণাস্থি প্রভৃতিকে শক্ত করে ; রক্ত তঞ্চন, অক্সিজেন পরিবহণে সহায়তা করে। দেহের বিষক্রিয়া নষ্ট করে।	স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শর্করা বিপাকে ত্রুটি দেখা যায়।	1-1·5 মিলিগ্রাম
10. কোবাল্ট	সবুজ শাক-সব্জি।	রক্ত গঠন এবং ভিটামিন-B_{12} গঠনে সহায়তা করে।	রক্তাল্পতা দেখা যায়।	0·02 মিলিগ্রাম
11. দস্তা (জিংক)	সাধারণ খাদ্যদ্রব্যে।	অগ্ন্যাশয়ে ইনসুলিন হর্মোনকে সঞ্চিত করিতে, ইনসুলিনের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।	স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, লোমহীন (Alopecia) অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।	12 মিলিগ্রাম
12. আয়োডিন	সাধারণ লবণ, দুধ, ডিম, মাছ, সামুদ্রিক জল ও সামুদ্রিক উদ্ভিদ ইত্যাদি।	থাইরয়েড গ্রন্থিতে থাইরয়েড হর্মোন সংশ্লেষে ইহা প্রয়োজন।	গলগণ্ড রোগ দেখা যায়।	0·05 মিলিগ্রাম
13. ক্লোরিন	সাধারণ লবণ, দুধ।	দেহে জলের সমতা, রক্তে অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব সমতা বজায় রাখে।	বৃক্কের কার্যের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।	10-12 গ্রাম
14. ফ্লোরিন	পাণীয় জলে	অস্থি ও দাঁত গঠনে সহায়তা কর।	অস্থি ও দাঁতের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।	খুব অল্প পরিমাণ।

পোষকের দেহের ভিতর বসবাস করিয়া খাদ্য শোষণ করে তাহাকে **অন্তঃপরজীবী** (Endoparasite) প্রাণী বলে। যেমন—প্লাসমোডিয়াম (ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী আদ্যপ্রাণী), গোলকৃমি, ফিতাকৃমি ইত্যাদি।

3. **মিথোজীবীয় পুষ্টি** (Symbiotic nutrition) : এই ধরনের পুষ্টিতে দুইটি ভিন্ন গোষ্ঠীর প্রাণী একে অপরের সঙ্গে বসবাস করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। এই প্রকার পুষ্টি পদ্ধতিতে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যাহাতে একের অনুপস্থিতিতে অপরের জীবনধারণ করা কষ্টসাধ্য। এইজাতীয় জীবন ধারণ করার পদ্ধতিকে মিথোজীবীতা (**Symbiosis**) বলে।

মিথোজীবী পুষ্টি দুইপ্রকার, যথা—

(i) **ব্যতিহারী পুষ্টি** (Mutualism) **: যখন দুইটি জীব একত্রে বসবাস করিয়া একে অপরের নিকট হইতে পুষ্টি গ্রহণ করে তাহাকে ব্যতিহারী পুষ্টি বলে।** সাধারণত এই ধরনের পুষ্টিতে এক শ্রেণীর প্রাণী আশ্রয়দাতা প্রাণী হইতে পুষ্টি গ্রহণ করে এবং বিনিময়ে প্রাণীটি আশ্রয়দাতাকে প্রয়োজনীয় তৈয়ারি খাদ্য সরবরাহ করে। যেমন—তৃণভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণীরা (গরু, ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি) তৃণে অবস্থিত সেলুলোজকে (cellulose) খাদ্যনালীর মধ্যে পাচিত করিতে পারে না। কিন্তু এই সমস্ত প্রাণীর অন্ত্রে এক প্রকার ব্যাক্টিরিয়া বাস করে যাহারা তাহাদের দেহ-নিঃসৃত সেলুলেজ উৎসেচক দ্বারা সেলুলোজকে সহজেই পাচিত করিয়া সরল শর্করায় পরিণত করিতে সহায়তা করে। ইহার প্রতিদানে ব্যাক্টিরিয়া স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্ত্রে বাস করে এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া পুষ্টি লাভ করে।

গিনিপিগ, খরগোশ প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণীদের সিকামে অবস্থিত মিথোজীবী ব্যাক্টিরিয়া উৎসেচক নিঃসৃত করিয়া তৃণের সেলুলোজকে পাচিত করে এবং ইহাকে সরল শর্করায় পরিণত করে। পরিবর্তে ব্যাক্টিরিয়া স্তন্যপায়ী প্রাণীর সিকামে আশ্রয় লাভ এবং পুষ্টি গ্রহণ করে।

উইপোকা (Termite) সাধারণত কাঠ খাইয়া জীবন ধারণ করে। কাঠে অবস্থিত সেলুলোজকে ইহারা পাচিত করিতে পারে না কিন্তু ইহাদের অন্ত্রে বসবাসকারী একপ্রকার আদ্যপ্রাণী **ট্রাইকোনিম্ফ** (Trichonymph) সেলুলেজ উৎসেচক নিঃসৃত করিয়া কাঠের সেলুলোজকে পরিপাক করিতে সহায়তা করে। বিনিময়ে আদ্যপ্রাণী উইপোকার অন্ত্রে আশ্রয় ও পুষ্টিলাভ করে।

অনেকক্ষেত্রে প্রাণীর সঙ্গে উদ্ভিদের সহাবস্থানের মাধ্যমে ব্যতিহারী পুষ্টি পরিলক্ষিত হয়। যেমন—সবুজ হাইড্রার দেহাভ্যন্তরে **জুক্লোরেল্লা** (Zoochlorella) নামক শৈবাল বসবাস করে। জুক্লোরেল্লা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সবুজ হাইড্রাকে খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। বিনিময়ে হাইড্রা জুক্লোরাল্লাকে আশ্রয়দান এবং নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ ও কার্বন ডাই অক্সাইড সরবরাহ করে।

(ii) **সহভোক্তা পুষ্টি** (Commensalism) **: যখন দুইটি প্রাণী একত্রে**

বসবাস করিয়াও প্রত্যেকে পৃথকভাবে পুষ্টি সংগ্রহ করে এবং একটি প্রাণী উপকৃত হয় কিন্তু আশ্রয় দাতার কোন ক্ষতি করে না তাহাকে সহভোক্তা পুষ্টি বলে। যেমন—
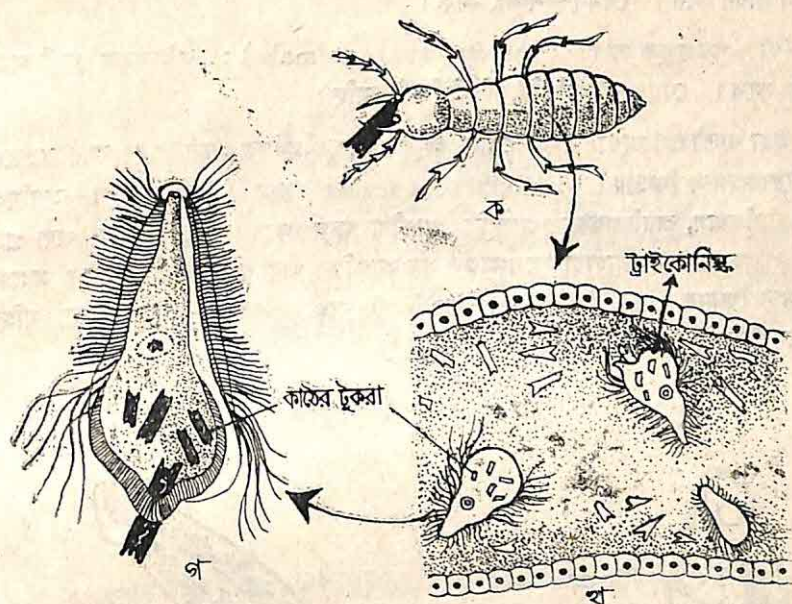
চিত্র 8.10 : মিথোজীবীয় পুষ্টি, ক = উইপোকার কাঠের টুকরা গ্রহণ, খ = ট্রাইকোনিম্ফ, গ = ট্রাইকোনিম্ফের বিবর্ধিত চিত্র।

হাঙ্গরের গায়ে **চোষক মাছ** (Sucker fish) চোষক দ্বারা আটকাইয়া থাকে এবং হাঙ্গরের সাহায্যে স্থানান্তর গমন করিয়া উপকৃত হয়। অনুরূপ, তিমির দেহগাত্রে বার্নাকল্ (Burnacles) নামক সন্ধীপদ প্রাণী বসবাস করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর সহাবস্থানের মাধ্যমে এই ধরনের পুষ্টি সাধিত হয়। যেমন—ব্যাসিক্ল্যাডিয়া (Basicladia) নামক শৈবাল কচ্ছপের পৃষ্ঠে বসবাস করে।

4. **হোলোজোয়িক পুষ্টি** (Holozoic nutrition) : এই ধরনের পুষ্টি পদ্ধতিতে প্রাণীরা ক্ষুদ্র আকৃতির উদ্ভিদ বা প্রাণীকে কঠিন খাদ্যবস্তুরূপে গ্রহণ করে।

হোলোজোয়িক পুষ্টি পদ্ধতি অনুযায়ী পাঁচ প্রকারের প্রাণী দেখা যায়। যেমন—

(i) **শাকাশী বা তৃণভোজী প্রাণী** (Herbivorous animals) : যাহারা লতাপাতা, ঘাস, শাক, উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ড প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। যেমন—গরু, মহিষ, ভেড়া, ঘোড়া, গিনিপিগ, খরগোশ প্রভৃতি প্রাণী।

(ii) **মাংসাশী প্রাণী** (Carnivorous animals) : এই সমস্ত প্রাণী শুধু মাংস খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, যেমন—বাঘ, সিংহ, শৃগাল ইত্যাদি।

(iii) **সর্বভুক প্রাণী** (Omnivorous animals) : এই জাতীয় প্রাণী উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয় ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে। যেমন—মানুষ, ভল্লুক, ইঁদুর প্রভৃতি।

(iv) **শবাহারী প্রাণী** (Carrion feeders) : যাহারা মৃত প্রাণীর মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে। যেমন—শকুন, কাক।

(v) **পতঙ্গভুক প্রাণী** (Insectivorous animals) : এই সমস্ত প্রাণী পতঙ্গ ভক্ষণ করে। যেমন—গিরগিটি, টিকটিকি ইত্যাদি।

ইহা ব্যতীত, প্রাণী যখন কোন ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক খাদ্য গ্রহণ করে তাহাদের **মাইক্রোফ্যাগাস ফিডার** (Microphagous feeder) বলে। উদাহরণস্বরূপ—অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম, অ্যাম্ফিঅক্সাস প্রভৃতি প্রাণীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক খাদ্য গ্রহণ করে। অপরপক্ষে, যাহারা অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির খাদ্য গ্রহণ করে তাহাদের **ম্যাক্রোফ্যাগাস ফিডার** (Macrophagous feeder) বলে। যেমন—গরু, ঘোড়া, মহিষ, মানুষ ইত্যাদি।

চিত্র 8.11 : প্যারামিসিয়ামের খাদ্যগ্রহণ

চিত্র 8.12 : প্লানেরিয়ার শাখান্বিত পৌষ্টিক নালী

হোলোজোয়িক পুষ্টি পদ্ধতি খুবই জটিল এবং পাঁচটি পর্যায়ের মাধ্যমে ইহা সম্পাদিত হয়, যথা—খাদ্যগ্রহণ, গৃহীত খাদ্যের পাচন, পাচিত খাদ্যরসের **শোষণ**, শোষিত খাদ্যরসের **আত্তীকরণ** এবং অপাচ্য অংশের বহিষ্করণ। নিম্নে পুষ্টির পাঁচটি পর্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

A. খাদ্যগ্রহণ (**Ingestion**) : খাদ্যগ্রহণ পুষ্টির প্রথম পর্যায়। এই প্রক্রিয়ায় খাদ্য দেহের ভিতরে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রাণিজগতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যগ্রহণ দেখা যায়। যেমন—

1. **ব্যাপন প্রক্রিয়ায় খাদ্যগ্রহণ** : **প্লাসমোডিয়াম, মনোসিসটিস, ফিতাকৃমি** প্রভৃতি প্রাণীরা পোষকের দেহ হইতে খাদ্যরস ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষণ করিয়া পুষ্টি সাধন করে।

2. **ক্ষণপদের সাহায্যে খাদ্যগ্রহণ ঃ** আদ্যপ্রাণী অ্যামিবা দেহের যে কোন অংশ হইতে ক্ষণপদ সৃষ্টি করিয়া খাদ্যগ্রহণ করিয়া থাকে। কোন খাদ্যবস্তু অ্যামিবার দেহের সংস্পর্শে আসিলে দুইটি ক্ষণপদ সৃষ্টি করিয়া জলসমেত খাদ্যবস্তুকে বেষ্টন করে।

চিত্র 8.13 : অ্যামিবার খাদ্যগ্রহণ

ফলে একটি খাদ্য গহ্বরের (food vacuole) সৃষ্টি হয়। এই খাদ্যগহ্বর পাকস্থলীর ন্যায় কাজ করে এবং ইহার মধ্যে খাদ্য পাচিত হয়।

3. **সিলিয়া এবং ফ্লাজেলার সাহায্যে খাদ্যগ্রহণ : প্যারামেসিয়াম, ভর্টিসেল্লা** নামক আদ্যপ্রাণী সিলিয়া দ্বারা খাদ্যগ্রহণ করে। ইহাদের মুখসংলগ্ন সিলিয়ার সঞ্চালনের ফলে একটি জলস্রোতের সৃষ্টি হয়। ফলে জলসমেত খাদ্যবস্তু দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটি খাদ্যগহ্বরের সৃষ্টি করে। এই খাদ্যগহ্বরের মধ্যে খাদ্যবস্তুর পরিপাক সম্পন্ন হয়। স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রে কলার কোষের (Collar Cell) মুক্ত প্রান্তে ফ্লাজেলাম (Flagellum) অবস্থিত। এইরূপ অনেকগুলি ফ্লাজেলার সঞ্চালনে নালীতন্ত্রে জলস্রোতের সৃষ্টি হয় এবং জলস্রোতে আগত আণুবীক্ষণিক জীবকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

4. **কর্ষিকার সাহায্যে খাদ্যগ্রহণ : হাইড্রার** মুখছিদ্রকে ঘিরিয়া কতকগুলি সূত্রাকার কর্ষিকা (Tentacles) সজ্জিত। এইসব কর্ষিকায় অসংখ্য নিমাটোসিস্ট (Nematocyst) থাকে এবং ইহা হইতে এক প্রকার বিষাক্ত তরল পদার্থ বাহির হয় যাহা খাদ্যবস্তুকে অসাড় করিয়া মুখগহ্বরে প্রবেশ করাইতে সহায়তা করে।

5. **চোষকের সাহায্যে খাদ্যগ্রহণ : জোঁক, চ্যাপ্টাকৃমি** চোষক দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করে। জোঁকের ক্ষেত্রে মস্তক অঞ্চলের অঙ্কীয় দিকে অগ্রচোষক (Anterior sucker) অবস্থিত এবং ইহা কোন প্রাণীর দেহত্বকে প্রতিস্থাপিত করিয়া রক্ত শোষণ করে।

চ্যাপ্টা কৃমির ক্ষেত্রে মস্তকের শীর্ষে অগ্রচোষক বিদ্যমান এবং ইহার কেন্দ্রে মুখছিদ্র অবস্থিত। পোষক দেহ হইতে ইহারা চোষকের মাধ্যমে খাদ্যরস শোষণ করিয়া জীবনধারণ করে।
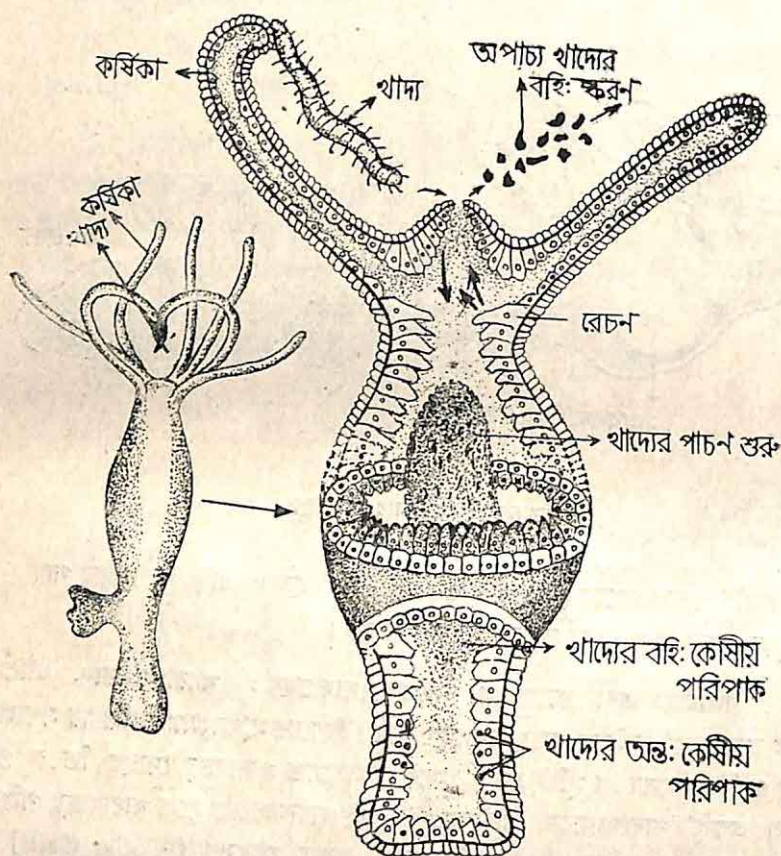
চিত্র 8.14 : (ক) হাইড্রার খাদ্যগ্রহণ (খ) হাইড্রার বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় পরিপাক

6. **মিউকাস দ্বারা খাদ্যগ্রহণ :** **কিটোপটেরা, ভার্মিটাস (Vermitus)** প্রভৃতি প্রাণীরা মুখ হইতে মিউকাস নিঃসৃত করিয়া জলের মধ্যে ফাঁদ গঠন করে। এই ফাঁদে খাদ্যবস্তু আসিলে তাহা খাদ্যরূপে গ্রহণ করে।

7. **মুখোপাঙ্গ* দ্বারা খাদ্যগ্রহণ :** আরশোলা, কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি সন্ধীপদ প্রাণীরা মুখোপাঙ্গগুলি দ্বারা খাদ্যবস্তুকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে এবং ইহার সাহায্যে খাদ্যবস্তু মুখবিবরে নীত হয়।

* মুখোপাঙ্গ—ম্যাক্সিলা, ম্যাণ্ডিবল, ল্যাব্রাম, ল্যাবিয়াম, চেলিসেরী, পেডিপাল্পা প্রভৃতি।

8. **চোষক নলের সাহায্যে খাদ্যগ্রহণ :** মশা, মৌমাছি, প্রজাপতি, মথ, ছারপোকা প্রভৃতি পতঙ্গ উহাদের মস্তক অংশে অবস্থিত চোষক নলের মাধ্যমে খাদ্যরস শোষণ করে।

চিত্র 8.15 : ভার্মিটাসের মিউকাস নির্মিত ফাঁদ
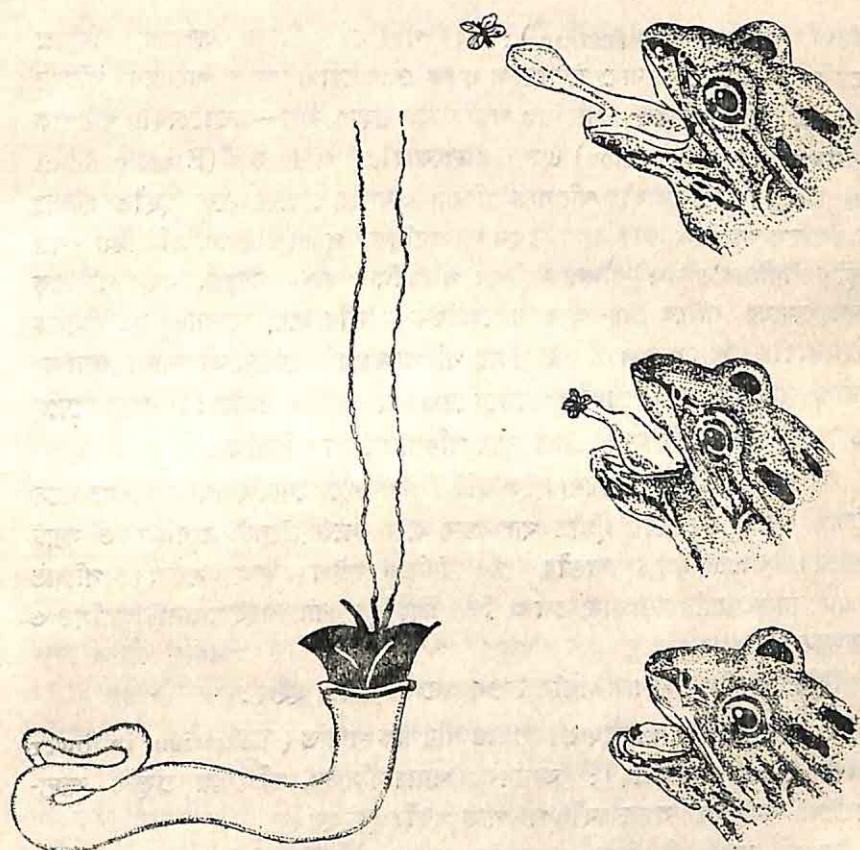
চিত্র 8.16 : ব্যাঙের খাদ্যগ্রহণ

9 **জিহ্বার সাহায্যে খাদ্যগ্রহণ :** ব্যাঙের মুখবিবরস্থিত মেঝেতে মাংসল জিহ্বা বিদ্যমান। জিহ্বার সম্মুখের অংশ মেঝের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু পশ্চাৎ অংশ মুক্ত। খাদ্যবস্তু ধরিবার সময় জিহ্বাটি উল্টাইয়া শিকারের উপর নিক্ষেপ করে এবং জিহ্বার অগ্রভাগে আঠালো গ্রন্থি থাকিবার ফলে খাদ্যবস্তু আটকাইয়া যায়। পরে জিহ্বাটিকে মুখের মধ্যে টানিয়া লইয়া খাদ্য গ্রহণ করে।

10. **চঞ্চু দ্বারা খাদ্যগ্রহণ :** পক্ষীজাতীয় প্রাণীরা শক্ত চঞ্চুর সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে। কোন খাদ্যবস্তু শক্ত হইলে তাহা চঞ্চুর দ্বারা ভাঙ্গিয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া লয়।

11. **ওষ্ঠ ও চোয়াল দ্বারা খাদ্যগ্রহণ :** মৎস্য, স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ওষ্ঠ এবং চোয়ালের সাহায্যে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। কোন কোন প্রাণীর দেহে অন্যান্য উপাঙ্গ খাদ্যগ্রহণে সহায়তা করে।

B. **পরিপাক** (Digestion) : যে পদ্ধতিতে জটিল খাদ্যবস্তু বিভিন্ন উৎসেচকের মাধ্যমে কোষ বা প্রোটোপ্লাজম কর্তৃক শোষণযোগ্য সরল খাদ্যরসে পরিণত হয় তাহাকে **পরিপাক** বলে। পরিপাক পদ্ধতি দুই প্রকার, যথা—**অন্তঃকোষীয় পরিপাক** (Intra-cellular digestion) এবং **বহিঃকোষীয় পরিপাক** (Extra-cellular digestion)। অন্তঃকোষীয় পরিপাক প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু কোষের মধ্যে গৃহীত হইবার পর সেখানে পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম, ভর্টিসেল্লা স্পঞ্জ প্রভৃতি প্রাণীদের এইরূপ পরিপাক ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। আবার, যখন পরিপাক ক্রিয়া কোষের বাহিরে দেহ-গহ্বর বা পৌষ্টিক নালীর মধ্যে সম্পাদিত হয় তাহাকে বহিঃকোষীয় পরিপাক বলে। এই প্রকার পরিপাক পদ্ধতি কেঁচো, আরশোলা, অ্যাম্ফি-অক্সাস, সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। একনালীদেহী হাইড্রার দেহে অন্তঃকোষীয় এবং বহিঃকোষীয় উভয়প্রকার পরিপাক ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

পরিপাক ক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হইল জটিল খাদ্যবস্তুকে শোষণযোগ্য সরল খাদ্যরসে পরিণত করা। প্রাণীদের গৃহীত খাদ্যবস্তুর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট অন্যতম। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য বিশ্লিষ্ট হইয়া সরল শর্করায় পরিণত হয়। প্রোটিন ভাঙ্গিয়া অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং ফ্যাট পাচিত হইয়া ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয়।

বিভিন্ন প্রাণীর পরিপাক পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

1. **নিম্নশ্রেণীর অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পরিপাক পদ্ধতি** (Digestion in lower Invertebrate animals) : অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম, ভর্টিসেল্লা প্রভৃতি আদ্যপ্রাণীদের খাদ্যগহ্বরে অন্তঃকোষীয় পরিপাক পদ্ধতি দৃষ্ট হয়।

অন্যান্য আদ্যপ্রাণী, যথা—**প্লাসমোডিয়াম, মনোসিসটিস, ট্রাইপানোসোমা** প্রভৃতি আদ্যপ্রাণীরা পোষক দেহ হইতে পাচিত খাদ্যরস দেহগাত্র দ্বারা শোষণ করে।

অ্যামিবার ন্যায় স্পঞ্জ জাতীয় বহুকোষী প্রাণীদের অন্তঃকোষীয় পরিপাক ক্রিয়া দেখা যায়। স্পঞ্জের নালীতন্ত্রে অবস্থিত কলার কোষ (Collar cell) খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করিবার পর ইহার নিম্নে অবস্থিত অ্যামিবোসাইট কোষসমূহে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হাইড্রা অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় উভয় প্রকার পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু পাচিত করে। কর্ষিকা দ্বারা খাদ্যবস্তু হাইড্রার খাদ্যনালীতে নীত হইলে গ্রন্থিকোষ হইতে নিঃসৃত উৎসেচক খাদ্যবস্তুর কিছু অংশকে পাচিত করে। ইহা বহিঃকোষীয় পরিপাক নামে পরিচিত। খাদ্যবস্তুর বাকী অংশ খাদ্যনালীস্থিত অ্যামিবার ন্যায় নিউট্রিটিভ পেশী কোষের ক্ষণপদ দ্বারা সংগৃহীত হয় এবং তথায় খাদ্যবস্তুর অন্তঃকোষীয় পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

প্লানেরিয়া, যকৃৎকৃমি প্রভৃতি প্রাণীর পায়ুছিদ্র থাকে না, ইহাদের পৌষ্টিক নালী অসম্পূর্ণ* এবং শাখা-প্রশাখাযুক্ত। প্লানেরিয়ার ক্ষেত্রে অন্তঃকোষীয় পরিপাক পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়।

2. উন্নত শ্রেণীর অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পরিপাক পদ্ধতি (Digestion in higher Invertebrate animals) :

উন্নত ধরনের অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে (অ্যানিলিডা, আর্থ্রোপোডা, মোলাস্কা পর্বভুক্ত) বহিঃকোষীয় পরিপাক পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের পৌষ্টিক নালীটি দেহের অগ্রভাগে অবস্থিত মুখছিদ্রে আরম্ভ হইয়া দেহের পশ্চাতে অবস্থিত পায়ুছিদ্রে শেষ হয়। বিভিন্ন পাচন গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত পাচক রসের সহায়তায় খাদ্যবস্তু পাচিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রাণীদের কার্যের ভিন্নতার জন্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত পৌষ্টিক নালী পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত পৌষ্টিক নালীটি নিম্নলিখিত অংশ লইয়া গঠিত। যথা—**মুখছিদ্র** (Mouth aperture), **মুখবিবর** (Buccal cavity), **গলবিল** (Pharynx), **গ্রাসনালী** (Oesophagus), **ক্রপ** (Crop), **গিজার্ড** (Gizzard), **পাকস্থলী** (Stomach), **ক্ষুদ্রান্ত্র** (Small Intestine), **বৃহদন্ত্র** (Large Intestine), **মলাশয়** (Rectum) এবং **পায়ুছিদ্র** (Anal aperture)।

বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার অঙ্গ খাদ্যকে মুখছিদ্রে প্রবেশ করাইতে সহায়তা করে। মুখবিবরের পরবর্তী অংশ গলবিল এবং এই অংশে অবস্থিত লালাগ্রন্থি হইতে মিউসিন (Mucin) নামক লালাজাতীয় পদার্থ নিঃসৃত হয় যাহা খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া একটি খাদ্যমণ্ড সৃষ্টি করে। এই লালামিশ্রিত খাদ্যমণ্ডটি অনায়াসে পৌষ্টিক নালীর পরবর্তী অংশে চালিত হয়। ইহা ব্যতীত কোন কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে মুখবিবরে শর্করাজাতীয় খাদ্যের পাচন ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। কেঁচোর ক্ষেত্রে গলবিল হইতে নিঃসৃত পদার্থ প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করিতে সহায়তা করে। গলবিলের পরবর্তী অংশ গ্রাসনালী। পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীতে গ্রাসনালীর পশ্চাদংশ স্ফীত হয় এবং স্ফীত অংশকে **ক্রপ** (Crop) বলে। এই অংশে খাদ্য সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে। ক্রপ হইতে খাদ্যবস্তু স্থূল প্রাকারযুক্ত গিজার্ড নামক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ

চিত্র 8.17 : কেঁচোর পৌষ্টিক তন্ত্রের রূপরেখা

---

* যখন পৌষ্টিক নালীর একপ্রান্তে মুখছিদ্র এবং অপর প্রান্তে পায়ুছিদ্র থাকে তখন তাহাকে সম্পূর্ণ পৌষ্টিক নালী বলে। অপরপক্ষে, পৌষ্টিক নালীর মধ্যে শুধু মুখছিদ্র বর্তমান কিন্তু পায়ুছিদ্র থাকে না তাহাকে অসম্পূর্ণ পৌষ্টিক নালী বলে।

করে। কেঁচোর দেহে গিজার্ডটি পেশীবহুল এবং ইহার অভ্যন্তরে এপিথেলিয়ামের কৃত্তিকাবরণী থাকায় খাদ্য চূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় পরিণত হয়। আরশোলার ক্ষেত্রে গিজার্ডের অভ্যন্তরে কাইটিন নির্মিত দন্ত অবস্থিত এবং ইহা খাদ্যবস্তুকে চূর্ণ করিতে সহায়তা করে। গিজার্ড অতঃপর পাকস্থলীতে উন্মুক্ত হয়। পাকস্থলীর প্রাচীর গ্রন্থিময় এবং এই অংশ হইতে উৎসেচক নিঃসৃত হইয়া খাদ্যবস্তুকে পরিপাক করে। ইহার পশ্চাতে অন্ত্র অবস্থিত। অন্ত্রের প্রথম অংশটি ক্ষুদ্রান্ত্র এবং শেষ অংশটি বৃহদন্ত্র নামে পরিচিত। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর গ্রন্থিযুক্ত এবং রক্তজালিকা দ্বারা আবৃত। এই অংশে বিভিন্ন উৎসেচকের সহায়তায় খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পাচিত হয় এবং সরল খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রের আবরণী কোষ দ্বারা শোষিত হয়। খাদ্যের অপাচ্য অংশ অন্ত্রের শেষ অংশে অর্থাৎ বৃহদন্ত্রে সঞ্চিত হয়। বৃহদন্ত্রের অন্তঃগাত্র দ্বারা জল শোষিত হয় এবং এই অংশ হইতে শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ নিঃসরণে অপাচ্য অংশের গতিপথ পিচ্ছিল ও মসৃণ হয়। ফলে অপাচ্য অংশ মলরূপে মলাশয়ের মাধ্যমে পায়ুছিদ্র পথে দেহের বাহিরে মুক্ত হয়।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পৌষ্টিক নালীতে বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে খাদ্যবস্তু পাচিত হয়। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য **অ্যামাইলেজেস** (Amylases), প্রোটিন জাতীয় খাদ্য **প্রোটিয়েজেস** (Proteases) এবং স্নেহজাতীয় খাদ্য **লাইপেজেস** (Lypases) দ্বারা পাচিত হইয়া শোষণযোগ্য সরলতম খাদ্যে পরিণত হয়। ইহা ব্যতীত, বিভিন্ন প্রকার আর্দ্রবিশ্লেষক উৎসেচক (Hydrolytic enzyme) খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পৌষ্টিক নালীতে পেপসিন উৎসেচক নিঃসৃত হয় না। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উইপোকার অন্ত্রে বসবাসকারী আদ্যপ্রাণী ট্রাইকোনিম্ফ সেলুলেজ জাতীয় উৎসেচক নিঃসৃত করিয়া কাঠের সেলুলোজকে পরিপাক করিতে সহায়তা করে।

মাকড়সা, গুবরে পোকার লার্ভা দেহের বাহিরে খাদ্যবস্তুর পাচনক্রিয়া সম্পন্ন করে। মাকড়সার ফাঁদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ জাতীয় প্রাণী ধরা পড়িলে মাকড়সা তাহার বিষগ্রন্থি হইতে পাচক রস ফাঁপা বিষদন্তের সাহায্যে অসাড় করিয়া দেয়। অতঃপর খাদ্যবস্তু পাচকরস দ্বারা পাচিত হইলে তাহা ফাঁপা বিষদন্তের সাহায্যে ইহা শোষিত হয়।

3. মেরুদণ্ডী প্রাণীর পৌষ্টিক নালীর গঠন ও পরিপাক (Digestion in Vertebrates): মেরুদণ্ডী প্রাণীর পৌষ্টিক তন্ত্রটি পৌষ্টিক নালী এবং পৌষ্টিক গ্রন্থি লইয়া গঠিত। পৌষ্টিক নালীটি মুখছিদ্র হইতে শুরু করিয়া পায়ুছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা একটি ফাঁপা পেশীযুক্ত নলবিশেষ, যাহা কোথাও সোজা, কোথাও কুণ্ডলীকৃত, কোথাও মোটা অথবা কোথাও সরু। প্রাণীর খাদ্যাভ্যাস, পাচন এবং শোষণের উপর পৌষ্টিক নালীর দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। সেইজন্য মাংসাশী প্রাণীর পৌষ্টিক নালীর দৈর্ঘ্য ছোট এবং শাকাশী প্রাণীর ক্ষেত্রে ইহার দৈর্ঘ্য বড়।

পৌষ্টিক নালী কয়েকটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। যথা—**মুখছিদ্র** (Mouth aperture), **মুখবিবর** (Buccal cavity); **গলবিল** (Pharynx), গ্রাসনালী

(Oesophagus), **পাকস্থলী** (Stomach), **ক্ষুদ্রান্ত্র** (Small Intestine), **বৃহদন্ত্র** (**Large Intestine**) এবং **মলাশয়** (**Rectum**)। পৌষ্টিক গ্রন্থিগুলি
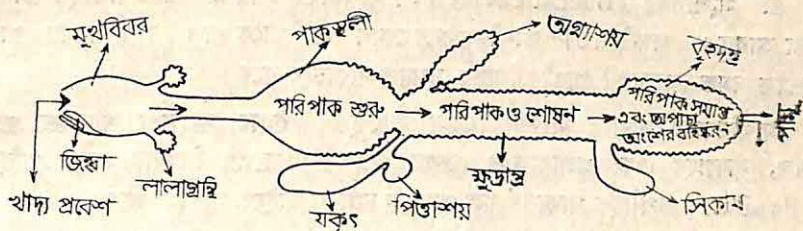
চিত্র 8.18 : মেরুদণ্ডী প্রাণীর পৌষ্টিক তন্ত্রের রূপরেখা

হইল **লালাগ্রন্থি** (Salivary glands), **যকৃত** (Liver), অগ্ন্যাশয় (Pancreas)। এই সমস্ত গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত উৎসেচক খাদ্যবস্তু পরিপাকে সাহায্য করে। ইহা ব্যতীত পাকস্থলীস্থিত গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত **পাকস্থলী রস** (Gastric juice) এবং অন্ত্রস্থিত গ্রন্থি হইতে **আন্ত্রিক রস** (Succus Entericus) বিভিন্ন প্রকার খাদ্যকে পাচিত করে।

চিত্র 8.19 : সরীসৃপের পৌষ্টিক তন্ত্রের রূপরেখা

পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশের প্রস্থচ্ছেদ করিলে দেখা যাইবে যে, ভিতরের গাত্র হইতে বাহিরের গাত্র পর্যন্ত চারিটি স্তর বিদ্যমান। যথা—

1. **শ্লৈষ্মিক স্তর** (Tunica mucosa) : এই স্তরে শোষণ কোষ, কোরিয়াম নামক যোগ কলা, লসিকা নালী, অনুদৈর্ঘ্য ও চক্রপেশী বিদ্যমান।

2. **অধঃশ্লৈষ্মিক স্তর** (Tunica submucosa) : এই স্তরে গ্রন্থিকোষ, যোগকলা, রক্তনালী, লসিকানালী এবং স্নায়ু বর্তমান।

3. **পেশীস্তর** (Muscular coat) : এই স্তরে অনুদৈর্ঘ্য ও চক্রপেশী থাকে।

4. **সেরাস স্তর** (Serosa) : ইহা সর্বাপেক্ষা বাহিরের যোগকলাযুক্ত স্তর।

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর পৌষ্টিক তন্ত্রের গঠন ও কার্য প্রায় একই হইলেও কিছু কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে মানুষ সহ মেরুদণ্ডী প্রাণীর পৌষ্টিক তন্ত্রের গঠন ও পরিপাক পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল :

1. **মুখছিদ্র** (Mouth aperture): পৌষ্টিক নালীর অগ্রভাগে মুখছিদ্র অবস্থিত। মুখছিদ্রের উপর ও নিচে দুইটি ওষ্ঠ (lips) বিদ্যমান এবং ইহার সাহায্যে খাদ্যবস্তু মুখবিবরে প্রবেশ করে।

2. **মুখবিবর** (Buccal cavity): মুখবিবর উপর ও নিচের দাঁতযুক্ত চোয়াল দ্বারা আবদ্ধ। পক্ষীজাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রে কোন দাঁত থাকে না। সর্পজাতীয় প্রাণী ব্যতীত সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর নিচের চোয়াল নাড়াচড়া করে।

মুখবিবরের মেঝেতে মাংসল জিহ্বা অবস্থিত। ইহার সাহায্যে খাদ্যবস্তু গ্রহণ, চর্বণ, স্বাদগ্রহণ এবং গলাধঃকরণ সম্পন্ন হয়। বিড়ালের জিহ্বায় শক্ত পীড়কা (Papillae) উপস্থিত থাকায় তরল খাদ্যকে চাটিয়া খাইতে সাহায্য করে।

মুখবিবরস্থিত লালাগ্রন্থি হইতে নিঃসৃত লালা খাদ্যবস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া নরম খাদ্যমণ্ড প্রস্তুত হয়। লালার মধ্যে জল, লবণ ও অ্যামাইলেজ উৎসেচক এবং সামান্য পরিমাণ মলটেজ (Maltase) উৎসেচক থাকে। অ্যামাইলেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য মলটোজ সদৃশ খাদ্যবস্তুতে পরিণত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে মলটেজ উৎসেচকের সহায়তায় গ্লুকোজে পরিণত হয়। মানুষের মুখবিবরে **প্যারোটিড** (Parotid), **সাবলিঙ্গুয়াল** (Sublingual) এবং **সাবম্যাক্সিলারী** (Submaxillary) নামক একজোড়া করিয়া মোট তিনজোড়া লালাগ্রন্থি বিদ্যমান। মৎস্য, উভচর প্রাণীর মুখবিবরে কোন লালাগ্রন্থি থাকে না।

3. **গলবিল** (Pharynx): মুখবিবরের পশ্চাতে গলবিল অবস্থিত। অ্যাম্ফিওক্সাস, মৎস্য ও জলজ উভচর প্রাণীর গলবিল অংশে ফুলকা ছিদ্র দেখা যায়। গ্রাসনালীর অঙ্কীয়দেশের সম্মুখে **শ্বাসরন্ধ্র** বা **গ্লটিস** (Glottis) ছিদ্রপথ থাকায় বায়ু শ্বাসনালীতে যাইতে পারে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের গলবিলের অঙ্কীয়দেশে এবং জিহ্বার পাদদেশে **এপিগ্লটিস** (Epiglottis) নামক ঢাকনা থাকায় খাদ্যবস্তু শ্বাসনালীতে প্রবেশ করিতে পারে না। গলবিল অংশে খাদ্যবস্তু পাচিত হয় না।

4. **গ্রাসনালী** (Oesophagus): গলবিলের পরবর্তী অংশ গ্রাসনালী নামে পরিচিত। ইহা লম্বা, দেহের গ্রীবা ও বক্ষ অংশে অবস্থিত। পাখীর ক্ষেত্রে গ্রাসনালীর শেষ অংশ হঠাৎ স্ফীত হইয়া ক্রপে (Crop) পরিণত হইয়াছে। এই অংশে খাদ্য সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে। প্রজনন কালে পায়রার ক্রপের অন্তঃআবরণী স্তর হইতে প্রোটিনযুক্ত সাদা আঠালো পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহাকে **পায়রার দুগ্ধ** (Pigeon's milk) বলে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পায়রা এই দুধ নিঃসৃত করিতে পারে এবং পায়রার পিতামাতারা নবজাতকদের (Squab) এই দুগ্ধ পান করায়।

গ্রাসনালীর পেশী সংকুচিত ও প্রসারিত হওয়ার ফলে খাদ্যমণ্ড পাকস্থলীতে পৌঁছায়।

5. **পাকস্থলী** (Stomach): গ্রাসনালীর পরবর্তী মাংসল, থলিবিশেষ অংশকে পাকস্থলী বলে। পাকস্থলীর সম্মুখ অংশ গ্রাসনালীর সহিত যুক্ত থাকে। এই অংশ হৃৎপিণ্ডের দিকে থাকে বলিয়া ইহাকে **হার্দপ্রান্ত** (Cardiac end) বলে।

আবার পাকস্থলীর শেষ অংশ ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত যুক্ত থাকে এবং এই অংশকে **প্রণালিকা-প্রান্ত** (Pyloric end) বলে। খাদ্যবস্তুর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য হার্দপ্রান্ত এবং প্রণালিকা প্রান্তে যথাক্রমে **হার্দ পেশীবলয়** (Cardiac sphincter) এবং **প্রণালিকা পেশীবলয়** (Pyloric sphincter) থাকে। পাখীর ক্ষেত্রে পাকস্থলীর পশ্চাদভাগের পেশীবহুল অংশকে **গিজার্ড** (Gizzard) বলে। গিজার্ডের অন্তঃগাত্র কৃত্তিকাবরণী দ্বারা আবৃত থাকায় খাদ্যবস্তুর সহিত গিজার্ডের ঘর্ষণ ও পেষণের ফলে খাদ্যবস্তু চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। পাখীদের দাঁত না থাকায় ইহা দাঁতের কাজ পূরণ করে।

মানুষের পাকস্থলী ইংরাজী 'J' অক্ষরের ন্যায় এবং ইহা **কার্ডিয়াক** (Cardiac), **ফাণ্ডাস** বা **বডি** (Fundus or Body) এবং **পাইলোরাস** (Pylorus) অংশে বিভক্ত।

পাকস্থলীর প্রাচীরে অসংখ্য **সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম** পাচন গ্রন্থি (Gastric gland) অবস্থিত এবং এই গ্রন্থিগুলি হইতে **পাকস্থলী রস** (Gastric juice) নিঃসৃত হয়। পাকস্থলী রসে জল, লবণ, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl—0.2%), **পেপসিন** এবং **লাইপেজ** নামক উৎসেচক থাকে। খাদ্যবস্তুর সঙ্গে কোন ব্যাকটিরিয়া থাকিলে তাহা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে বিনষ্ট হইয়া যায়। পেপসিন (Pepsin) উৎসেচক হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে বিশ্লিষ্ট করে। ফ্যাট জাতীয় খাদ্য লাইপেজ (Lipase) উৎসেচকের উপস্থিতিতে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে রেনিন উৎসেচক দুধের প্রোটিন অংশ ক্যাসিনোজেনকে **কেসিন** (Casein) বা ছানায় পরিণত করে।

পাকস্থলীতে খাদ্য আংশিকভাবে পাচিত হইয়া **পাকমণ্ডে** (Chyme) পরিণত হয় এবং পাকস্থলীর পেশী ক্রমসংকোচন ও ক্রমপ্রসারণ বা পেরিস্টলসিসের (Peristalsis) ফলে পাকমণ্ড গ্রহণীতে প্রবেশ করে।

6. **ক্ষুদ্রান্ত্র** (Small Intestine) : পৌষ্টিক নালীর দীর্ঘতম এবং পাকস্থলীর পরবর্তী অংশ ক্ষুদ্রান্ত্র নামে পরিচিত। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ গ্রহণী এবং দ্বিতীয় অংশ ইলিয়াম। মানুষের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রান্ত্র—**গ্রহণী** (Duodenum), **জেজুনাম** (Jejunum) এবং **ইলিয়াম** (Ileum) এই তিনটি অংশে বিভক্ত। যকৃত হইতে আগত পিত্তনালী এবং অগ্ন্যাশয় হইতে আগত অগ্ন্যাশয় নালী ভ্যাটার খ্যাত অ্যাম্পুলার (Ampula of Vater) মাধ্যমে গ্রহণীতে যুক্ত হয়। এই দুইটি নালীর মাধ্যমে যথাক্রমে **পিত্তরস** (Bile juice) এবং **অগ্ন্যাশয় রস** (Pancreatic juice) গ্রহণীতে অবস্থিত পাকমণ্ডের সহিত মিশ্রিত হয়। মৎস্য জাতীয় প্রাণীতে অগ্ন্যাশয় থাকে না।

অগ্ন্যাশয় রসে কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী অ্যামাইলেজ ; প্রোটিন পরিপাককারী ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, কার্বোক্সিপেপটিডেজ প্রভৃতি এবং ফ্যাট পরিপাককারী লাইপেজ উৎসেচক থাকে। পিত্তরসে কোন পরিপাককারী উৎসেচক থাকে না কিন্তু ইহার প্রকৃতি ক্ষারকীয় হওয়ায় পাকস্থলী হইতে আগত অম্লধর্মী পাকমণ্ডকে প্রশমিত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পিত্তরসে উপস্থিত পিত্তলবণ ফ্যাটকে ভাঙ্গিয়া ফ্যাটের অবদ্রব (Emulsion)

তৈয়ার করে। এই সমস্ত উৎসেচক দ্বারা খাদ্যবস্তু গ্রহণী অংশে সম্পূর্ণরূপে পাচিত হয় না। পরন্তু ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে অবস্থিত অসংখ্য গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত **আন্ত্রিক রস** বা **সাক্কাস এণ্টারিকাস** (Succus Entericus)-এর সহায়তায় খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণরূপে পাচিত হইয়া সরল ও শোষণযোগ্য খাদ্যরসে পরিণত হয়। এই খাদ্যরসকে **কাইল** (Chyle) বলে। আন্ত্রিক জারক রসে বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক থাকে। এই রসে কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী মলটেজ, লেকটেজ, সুক্রেজ ; প্রোটিন পাচনকারী ইরেপসিন এবং ফ্যাট বিশ্লিষ্টকারী লাইপেজ এবং লেসিথিনেজ প্রভৃতি উৎসেচক থাকে। এই সমস্ত উৎসেচকের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য সরল শর্করায়, প্রোটিন জাতীয় খাদ্য অ্যামাইনো অ্যাসিডে এবং ফ্যাট জাতীয় খাদ্য ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে অসংখ্য আঙ্গুলের ন্যায় প্রবর্ধক থাকে। ইহাদের **ভিলাই** (Villi) বলে এবং ইহার দ্বারা খাদ্যরস শোষিত হয়। ইহা ব্যতীত, ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইতে এককোষী শ্লেষ্মা ক্ষরণকারী গ্রন্থি কোষ থাকে। তাহাকে **গবলেট কোষ** (Goblet cell) বলে।

7. **বৃহদন্ত্র** (Large Intestine) : ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষে এবং ইহার সমকোণে বৃহদন্ত্র অবস্থিত। ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত স্ফীত অংশকে **সিকাম** (Caecum) বলে। মানুষের সিকাম হইতে অঙ্গুলীসদৃশ উপবৃদ্ধিকে **অ্যাপেনডিক্স** (Appendix) বলে এবং ইহা পাচনে অংশগ্রহণ করে না। বৃহদন্ত্রের প্রথম অংশকে **কোলন** (Colon) শেষাংশকে **মলাশয়** (Rectum) বলে। মলাশয়ে সাময়িকভাবে মল সঞ্চিত হয় এবং প্রয়োজনমত পায়ুছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাহিরে মুক্ত হয়। পক্ষীজাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রে মলাশয় অনুপস্থিত। সুতরাং মল বৃহদন্ত্রে সঞ্চিত থাকে না। বৃহদন্ত্রের গায়ে শুধু জল ও লবণ শোষিত হয় এবং মিউকাস পদার্থের নিঃসরণের জন্য মল নরম ও পিচ্ছিল হয় যাহা সহজে পায়ুছিদ্রের মাধ্যমে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে।

C. **খাদ্যরস শোষণ** (Absorption) : যে সমস্ত প্রাণিদেহে অন্তঃকোষীয় পরিপাক সম্পন্ন হয় তাহাদের ক্ষেত্রে খাদ্যরস ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাইটোপ্লাজম দ্বারা শোষিত হয়। বহিঃকোষীয় পরিপাক পদ্ধতিতে পৌষ্টিক নালীর ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রস্থিত ভিলাই দ্বারা খাদ্যরস ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শোষিত হয়। প্রতিটি ভিলাসের মধ্যবর্তী স্থানে **ল্যাকটিয়াল** (Lacteal) নামক লসিকাবাহ থাকে এবং ইহাকে অসংখ্য রক্তজালক ঘিরিয়া রাখে। ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল ব্যতীত সমস্ত খাদ্যরস রক্তজালক দ্বারা শোষিত হইয়া রক্তস্রোতের মাধ্যমে যকৃতে পৌঁছায়। কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল ল্যাকটিয়ালের লসিকা দ্বারা শোষিত হইয়া রক্তস্রোতে মিশ্রিত হয়।

পাকস্থলীতে জল, অ্যালকোহল, ভিটামিন, সামান্য গ্লুকোজ এবং কিছু কিছু ঔষধ সরাসরি শোষিত হয়। বৃহদন্ত্রে জল ও লবণ শোষিত হয়।

D. **আত্তীকরণ** (Assimilation) : আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় শোষিত খাদ্যরস দেহের প্রোটোপ্লাজমে অঙ্গীভূত হয়। অতিরিক্ত খাদ্যরস যকৃত অথবা ত্বকে সঞ্চিত থাকে অথবা কোষের প্রোটোপ্লাজমের উপাদানে পরিণত হইয়া বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ প্রভৃতিতে সহায়তা

পরিপাকে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গ্রন্থি, উৎসেচক, খাদ্যবস্তু এবং পরিবর্তিত সরল খাদ্যের ছক :

পৌষ্টিক নালীর অংশ	গ্রন্থি	নিঃসৃত উৎসেচক	খাদ্যবস্তু	পরিবর্তিত সরল খাদ্য
মুখবিবর	লালাগ্রন্থি	অ্যামাইলেজ	স্টার্চ (কার্বোহাইড্রেট)	মলটোজ এবং আইসো-মলটোজ
পাকস্থলী	পাকগ্রন্থি	HCl পেপসিন লাইপেজ রেনিন	সুক্রোজের আর্দ্র বিশ্লেষণ প্রোটিন ফ্যাট দুগ্ধ (কেসিনোজেন)	গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ প্রোটিওজ ও পেপটোজ ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল কেসিন (ছানা)
	যকৃত	পিত্তরস	ফ্যাট	ফ্যাটের অবদ্রব
ক্ষুদ্রান্ত্র	অগ্ন্যাশয়	অ্যামাইলেজ ট্রিপসিন কাইমোট্রিপসিন লাইপেজ	কার্বোহাইটেড প্রোটিন, প্রোটিওজ পেপটোন ফ্যাট	মলটোজ, আইসোমলটোজ পলিপেপটাইড ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল
	আন্ত্রিক গ্রন্থি	অ্যামাইলেজ মলটেজ ল্যাকটেজ সুক্রেজ ইরেপসিন লাইপেজ	স্টার্চ মলটোজ ল্যাকটোজ সুক্রোজ পলিপেপটাইড ফ্যাট	মলটোজ গ্লুকোজ গ্লুকোজ+গ্যালাকটোজ গ্লুকোজ+ফ্রুক্টোজ অ্যামাইনো অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল

করে। সরল শর্করা শ্বসনে অংশগ্রহণ করিয়া শক্তি উৎপন্ন করে এবং অবশিষ্ট অংশ যকৃতে গ্লাইকোজেন রূপে সঞ্চিত থাকে। অ্যামাইনো অ্যাসিড দেহকোষের প্রোটো-প্লাজমের অংশবিশেষে পরিণত হইয়া বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে ব্যবহৃত হয়। ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল কলাকোষে কোলেস্টেরল, ফস্‌ফোলিপিড প্রভৃতির উপাদান অক্ষুণ্ণ রাখে।

E **বহিষ্করণ** (Egestion) : পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে খাদ্যবস্তু পাচিত হইবার পরেও কিছু অংশ অপাচিত থাকিয়া যায়। এই অপাচিত অংশকে দেহ হইতে মুক্ত করাকে **বহিষ্করণ** বলে। এককোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে সংকোচনশীল গহ্বরের (Contractile vacuole) মাধ্যমে অপাচ্য অংশের বহিষ্করণ হয়। হাইড্রা, প্লানেরিয়া ইত্যাদির দেহে পায়ুছিদ্র না থাকায় মুখছিদ্রের মাধ্যমে অপাচ্য অংশ দেহের বাহিরে নির্গত হয়। উন্নত প্রাণীদের অপাচ্য অংশ অবসারণী ছিদ্র বা পায়ুছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাহিরে মুক্ত হয়।

কয়েকটি বিশিষ্ট প্রাণীর সেলুলোজ পরিপাক :

গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি জাবরকাটা বা রোমন্থক প্রাণীদের পাকস্থলী চারিটি প্রকোষ্ঠযুক্ত, যথা—রুমেন (Rumen), রেটিকুলাম (Reticulum), ওমেসাম
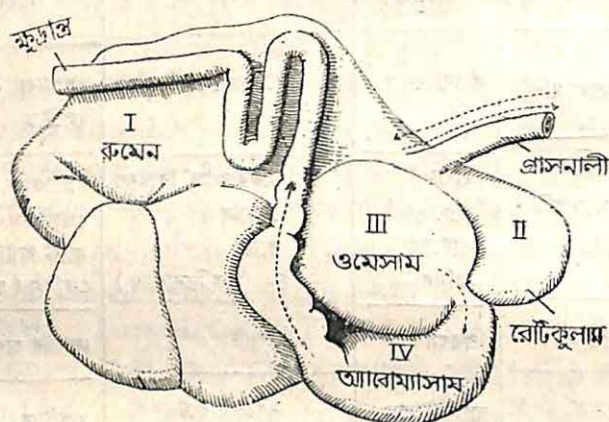
চিত্র 8.20 : গরুর পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশ

(Omasum) এবং অ্যাবোম্যাসাম (Abomasum)। প্রাণীরা যখন খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে তখন ভালভাবে চর্বণ না করিয়া রুমেনের মাধ্যমে রেটিকুলামে সঞ্চিত রাখে। বিশ্রামের সময় সঞ্চিত খাদ্য রেটিকুলাম হইতে গ্রাসনালীর মাধ্যমে মুখবিবরে আসে। তথায় ভালভাবে চর্বণ করিবার পর পাকস্থলীর প্রথম তিনটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া খাদ্যবস্তু চতুর্থ প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ অ্যাবোম্যাসামে পৌঁছায়। রুমেন অংশে অবস্থানকারী ব্যাক্টিরিয়া কর্তৃক নিঃসৃত সেলুলেজ উৎসেচক সেলুলোজকে পাচিত করিয়া সরল শর্করায় পরিণত করে এবং অন্যান্য খাদ্যবস্তু অ্যাবোম্যাসামে বিভিন্ন প্রকার উৎসেচকের সংস্পর্শে পাচিত হয়।

গিনিপিগ, খরগোস প্রভৃতি প্রাণীদের সিকামে সেলুলোজ পাচনে সাহায্যকারী ব্যাক্টিরিয়া বিদ্যমান। ইহারা পায়ুছিদ্র হইতে অসম্পূর্ণ পাচিত খাদ্যবস্তুকে সরাসরি ভক্ষণ করে। মলের অপাচ্য সেলুলোজ অংশ পুনরায় সিকাম অংশে প্রবেশ করিলে ইহার পাচন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। এইপ্রকার মল ভক্ষণের প্রক্রিয়াকে **কপ্রোফ্যাগী** (Coprophagy) বলে।

ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি প্রাণীদের সিকামে অবস্থিত ব্যাক্টিরিয়া সেলুলোজ পরিপাকে সহায়তা করে। কিন্তু রোমন্থনকারী প্রাণীদের মত ইহারা জাবর কাটিতে পারে না এবং পাচন পৌষ্টিক নালীর শেষ অংশে ঘটে বলিয়া সেলুলোজ সম্পূর্ণরূপে পাচিত হয় না। তাই ইহাদের মলে উদ্ভিজ তন্তুর পরিমাণ বেশী।

পুষ্টির তাৎপর্য (Signification of Nutrition)

1. পুষ্টির মাধ্যমে জীবদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্পাদিত হয়।

2. পুষ্টি জীবদেহে শক্তির উৎস।
3. পুষ্টির মাধ্যমে সুস্থ, সবল দেহ গড়িয়া উঠে এবং রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
4. ইহা বুদ্ধিমত্তা, মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কার্যকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

বিষয়-সংক্ষেপ

যে প্রক্রিয়ায় জীবদেহের খাদ্যগ্রহণ, গৃহীত খাদ্যের পাচন, পাচিত খাদ্যের শোষণ ও শোষিত খাদ্যের আত্তীকরণ বা প্রোটোপ্লাজমে অঙ্গীভূত হয় তাহাকে পুষ্টি বলে।

উদ্ভিদের পুষ্টি দুই প্রকার—স্বভোজী পুষ্টি ও পরভোজী পুষ্টি। যে পুষ্টি পদ্ধতিতে উদ্ভিদ অজৈব উপাদান হইতে খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে তাহাকে স্বভোজী পুষ্টি বলে। সবুজ উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু তৈয়ারি করে তাই ইহাদের স্বভোজী বলে। যে পুষ্টি পদ্ধতিতে উদ্ভিদ অন্য জীব অথবা জৈব বস্তু হইতে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে তাহাকে পরভোজী পুষ্টি বলে। এই সকল উদ্ভিদ পুষ্টির ব্যাপারে পরনির্ভর বলিয়া ইহাদের পরভোজী বলে। পরভোজী পুষ্টি চারিপ্রকার—

(1) পরজীবীয় পুষ্টি—অন্য জীব হইতে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিসাধন করিলে তাহাকে পরজীবীয় পুষ্টি বলে। পরজীবী দুইপ্রকার—পূর্ণ পরজীবী (স্বর্ণলতা, রাফ্লেসিয়া) ও আংশিক পরজীবী (চন্দন, লোরানথাস)।

(2) মৃতজীবীয় পুষ্টি—মৃত, পচা, গলিত জৈববস্তু হইতে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিসাধন করিলে তাহাকে মৃতজীবীয় পুষ্টি বলে। মৃতজীবী দুইপ্রকার—পূর্ণ মৃতজীবী (মিউকোর, পেনিসিলিয়াম) ও আংশিক মৃতজীবী—মনোট্রোপা।

(3) মিথোজীবীয় পুষ্টি—দুইটি জীব একত্রে বসবাস করিয়া পুষ্টিসাধন করিলে তাহাকে মিথোজীবীয় পুষ্টি বলে। ইহা দুইপ্রকার—ব্যতিহারী পুষ্টি (লাইকেন) ও সহভোক্তা পুষ্টি (রাস্না ও অন্য উদ্ভিদ)। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে মিথোজীবীয় পুষ্টি (জুক্লোরেল্লা ও হাইড্রা) এবং দুইটি প্রাণীর মধ্যে মিথোজীবীয় পুষ্টি (উইপোকা ও ট্রাইকোনিম্ফ) দেখা যায়।

(4) পতঙ্গভুক পুষ্টি—কীট-পতঙ্গ ভক্ষণ করিয়া পুষ্টিসাধন করিলে তাহাকে পতঙ্গভুক পুষ্টি বলে। যেমন—কলসপত্রী, সূর্যশিশির, পাতাঝাঁঝি।

প্রাণীদের পুষ্টি ঃ

প্রাণিদেহের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীকে (গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয় পূরণ, প্রয়োজনীয় শক্তি প্রভৃতি) সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। সুষম খাদ্যে নির্দিষ্ট অনুপাতে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং জল বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন প্রকার খাদ্য জারিত হইয়া শক্তি উৎপাদন করে এবং শেষোক্ত তিন প্রকার খাদ্য দেহের রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে কাজ করে।

কার্বোহাইড্রেট তিন প্রকার, যথা—মনো-, ডাই- এবং পলিস্যাকারাইড এবং এই শ্রেণীবিভাগ সরল শর্করার সংখ্যার ভিত্তিতে করা হইয়াছে। এই জাতীয় খাদ্য হইতে দেহে তাড়াতাড়ি শক্তি পাওয়া যায়। অন্যদিকে দেহের বৃদ্ধি, গঠন কাঠামো এবং রোগ-প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। কোষের প্রোটোপ্লাজমের প্রধান অংশ হইল প্রোটিন। প্রোটিন সাধারণত তিন প্রকার, যথা—সরল, যুগ্ম এবং লব্ধ প্রোটিন। প্রোটিন ভাঙ্গিয়া কতকগুলি পলিপেপটাইডের মাধ্যমে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। সেইজন্য প্রোটিনের একক হইল অ্যামাইনো অ্যাসিড। ফ্যাটজাতীয় খাদ্য হইতে অধিক পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয়। ইহা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলের সমন্বয়ে গঠিত। ফ্যাট বা লিপিড দুই প্রকার—সরল এবং যৌগিক লিপিড। রক্তে যে ধরনের ফ্যাট পাওয়া যায় তাহার মধ্যে কোলেস্টেরল উল্লেখযোগ্য। বার্ধক্য অবস্থায় ধমনী প্রাচীরে কোলেস্টেরল সঞ্চয়ের ফলে মস্তিষ্কে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস এবং হৃৎপিণ্ডে করোনারি থ্রম্বোসিস নামক মারাত্মক রোগ দেখা যায়।

জীবদেহে স্বাভাবিক বৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্বল্প মাত্রায় জৈব যৌগ বা ভিটামিন প্রয়োজন। দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে ভিটামিন দুই প্রকার, যথা—ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন (A, D, E ও K) এবং জলে দ্রবণীয় ভিটামিন (ভিটামিন B কমপ্লেক্স, C)।

ভিটামিন A গাজর, শাক-সব্জি, হ্যালিবাট, কড মাছের যকৃতের তৈল, দুধ, মাখন, ডিম, মাছ ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে, দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে এবং অস্থির স্বাভাবিক কার্যে সহায়তা করে। ইহার অভাবে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, রাতকানা রোগ দেখা দেয়, দেহে রোগ সংক্রমণে প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।

ভিটামিন D কড, হ্যালিবাট মাছের যকৃতের তৈল, মাখন, দুধ, ডিম প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। ইহা অন্ত্রে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণে, অস্থি ও দন্ত গঠনে অংশগ্রহণ করে। ইহার অভাবে শিশুদের রিকেট এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ওস্টিওম্যালাসিয়া নামক রোগ দেখা যায়।

ভিটামিন E শাক-সব্জি, গম, সয়াবিন, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। ইহা দেহের স্বাভাবিক প্রজনন, গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের বৃদ্ধি এবং বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে সহায়তা করে।

ভিটামিন K সবুজ শাক-সব্জিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং অন্ত্রে বসবাস-কারী ব্যাক্টিরিয়া কর্তৃক সংশ্লেষিত হয়। ইহা রক্তে প্রোথ্রম্বিনের মাত্রা বজায় রাখিয়া রক্ত তঞ্চনে সহায়তা করে। ইহায় অভাবে রক্ত তঞ্চিত হয় না।

ভিটামিন B কমপ্লেক্স প্রায় 14টি ভিটামিনের সমন্বয়ে গঠিত। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভিটামিনগুলি হইল - থায়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, প্যান্টোথ্যানিক অ্যাসিড নিকোটিনিক অ্যাসিড ও নিকোটিনামাইড, পাইরিডক্সিন, ফোলিক অ্যাসিড, সায়ানোকোবালামিন, বায়োটিন। দেহে থায়ামিন ভিটামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগের সৃষ্টি হয়। নিয়াসিনের অভাবে পেলাগ্রা নামক রোগ দেখা যায়। সায়ানোকোবালামিনের অভাবে পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া নামক রক্তাল্পতা রোগ দেখা দেয়।

দেহের অস্থি, তরুণাস্থি গঠনে, লোহিত রক্ত কণিকাকে পরিণত করিতে, ক্ষত নিরাময়ে এবং স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধে ভিটামিন C অপরিহার্য। ইহা লেবু জাতীয় ফল, আমলকী, আম, আমড়া, আপেল, লঙ্কা, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

প্রাণিদেহে খনিজ লবণ খুবই প্রয়োজন। খাদ্যগ্রহণ না করা অপেক্ষা খনিজ লবণ গ্রহণ না করা জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকারক। ক্যালসিয়াম ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহ, তাম্র, আয়োডিন প্রভৃতি খনিজ লবণ কোষের প্রোটোপ্লাজমের পক্ষে অপরিহার্য। দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যাদির জন্য জলের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রাণীরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করিতে পারে না। খাদ্যবস্তুর জন্য ইহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এজন্য ইহাদের পরভোজী প্রাণী ও ইহাদের পুষ্টি পদ্ধতিকে পরভোজী পুষ্টি বলে। পরভোজী পুষ্টি চারি প্রকার, যথা—মৃতজীবীয়, পরজীবীয়, মিথোজীবীয় এবং হোলোজোয়িক পুষ্টি।

হোলোজোয়িক পুষ্টি পদ্ধতি খাদ্যগ্রহণ, পাচন, শোষণ, আত্তীকরণ ও বহিষ্করণ এই পাঁচটি পর্যায়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

খাদ্যনালীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উৎসেচকের সহায়তায় খাদ্যবস্তু পাচিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া অন্ত্রের মাধ্যমে শোষিত হয়। মুখবিবরে অবস্থিত লালাগ্রন্থি হইতে মলটেজ এবং অ্যামাইলেজ নামক উৎসেচকের সহায়তায় খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট মলটোজ ও গ্লুকোজে পরিণত হয়। পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, পেপসিন, লাইপেজ, রেনিন নামক উৎসেচকের সাহায্যে খাদ্যবস্তু আংশিক পাচিত হইয়া পাকমণ্ডে পরিণত হয়। পাকস্থলীর পেপসিন প্রোটিনকে অম্লীয় পরিবেশে প্রোটিওজ ও পেপটোন, লাইপেজ ফ্যাটকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল এবং রেনিন দুধের কেসিনোজেনকে কেসিন বা ছানায় পরিণত করে।

পাকস্থলী হইতে আগত পাকমণ্ড ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডিনামে পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় রসের সহিত মিশ্রিত হয়। পিত্তরস পাকমণ্ডের অম্লীয় অবস্থাকে প্রশমিত করিয়া ক্ষারীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং ফ্যাটকে ভাঙ্গিয়া ফ্যাটের অবদ্রব (Emulsion) তৈয়ারি করে। ফলে অন্যান্য উৎসেচকের কার্য করিতে সুবিধা দান করে। অগ্ন্যাশয় রসে অবস্থিত অ্যামাইলেজ কার্বোহাইড্রেটকে মলটোজে ও গ্লুকোজে, ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন প্রোটিন ও পেপটোনকে পেপটাইডে, লাইপেজ ফ্যাটকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে অবস্থিত অসংখ্য গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত আন্ত্রিক রস মলটোজ, ল্যাকটোজ, সুক্রোজকে সরল শর্করায়, পেপটাইডকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে এবং ফ্যাটকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

এইরূপ পরিণত সরল ও শোষণযোগ্য খাদ্যরস ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে অবস্থিত ভিলাই দ্বারা শোষিত হইয়া রক্তজালকের মাধ্যমে রক্তস্রোতে উপস্থিত হয়। খাদ্যের অপাচ্য অংশ মলরূপে পায়ুছিদ্রের মাধ্যমে দেহ হইতে নিষ্কাশিত হয়।

প্রশ্নাবলী

A. পার্থক্য লিখ :

(1) স্বভোজী পুষ্টি ও পরভোজী পুষ্টি।
(2) মৃতজীবীয় পুষ্টি ও মিথোজীবীয় পুষ্টি।
(3) ম্যাক্রোএলিমেন্ট ও মাইক্রোএলিমেন্ট।
(4) লিপিড ও পলিস্যাকারাইড।
(5) ভিটামিন ও অ্যান্টিভিটামিন।
(6) হোলোজোয়িক পুষ্টি ও হোলোফাইটিক পুষ্টি।
(7) বহিঃকোষীয় পরিপাক ও অন্তঃকোষীয় পরিপাক।
(8) রেচন ও বহিঃক্ষরণ।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(1) খাদ্য কাহাকে বলে ?
(2) দেহ পরিপোষক ও দেহ সংরক্ষক খাদ্য বলিতে কি বুঝ ?
(3) গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী কাহাকে বলে ?
(4) পেপটাইড বন্ধনী কাহাকে বলে ?
(5) নাইট্রোজেন ভারসাম্য কাহাকে বলে ?
(6) উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ, উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং প্রাণী ও প্রাণীর মধ্যে মিথোজীবীয় পুষ্টির উদাহরণ দাও।
(7) অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড কাহাকে বলে ? ইহাদের উদাহরণ দাও।
(8) সুষম খাদ্য কাহাকে বলে ?
(9) মৌল বিপাকীয় হার বলিতে কি বুঝ ?
(10) উইপোকা কিভাবে কাঠ পরিপাক করে ?
(11) কোন্ কোন্ ভিটামিন শরীরে তৈয়ার হইতে পারে ?
(12) এমন একটি প্রাণীর নাম কর যেখানে বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় পরিপাক দেখা যায়।
(13) ভিলাই কি ?
(14) ল্যাকটিয়াল কি ?
(15) কোপ্রোফ্যাগী কাহাকে বলে ?
(16) কোন্ ভিটামিনের অভাবে রক্ত তঞ্চন ব্যাহত হয় ?
(17) ভেলামেন কি ? ইহার কাজ উল্লেখ কর।

C. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :—

(1) পুষ্টি কাহাকে বলে ? উদ্ভিদের পুষ্টি পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(2) শর্করার শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করিয়া জীবদেহে উহার গুরুত্ব আলোচনা কর।
(3) উদ্ভিদের পুষ্টিতে বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থের গরুত্ব আলোচনা কর।
(4) নিম্নলিখিত ভিটামিনগুলির উৎস, কার্য ও অভাবজনিত রোগের কথা উল্লেখ কর।
(i) ভিটামিন A, (ii) ভিটামিন D, (iii) ভিটামিন K, (iv) ভিটামিন B, (v) ভিটামিন C।
(5) খাদ্যনালীতে কিভাবে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্যবস্তুর পরিপাক হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
(6) রোমন্থনকারী প্রাণীদের সেলুলোজ পরিপাক পদ্ধতি আলোচনা কর।
(7) রাতকানা, বেরিবেরি, পেলাগ্রা, স্কার্ভি, রিকেট কোন্ কোন্ ভিটামিনের অভাবে হয় ?

নবম অধ্যায়	সংবহন (Circulation)

যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তুসহ অন্যান্য পদার্থ তরলের মাধ্যমে জীবদেহের একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবাহিত হয় তাহাকে সংবহন বলে। জীবের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও অন্যান্য জৈবিক কার্যের জন্য বিভিন্ন পদার্থ, যথা—খাদ্যবস্তু, ভিটামিন, খনিজ লবণ, অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, হর্মোন, উৎসেচক, বর্জ্য পদার্থ প্রভৃতি দেহের এক অঙ্গ হইতে অপর অঙ্গে নীত হয়। উদ্ভিদ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের (যেমন—স্পঞ্জ, হাইড্রা, জেলিফিস, স্টারফিস প্রভৃতি) সংবহনের মাধ্যম হইল জল। অপরপক্ষে, উন্নত শ্রেণীর প্রাণী ও মানুষের ক্ষেত্রে রক্ত ও লসিকার মাধ্যমে সংবহন সম্পন্ন হয়। আবার উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিভিন্ন বস্তু সংবহনের জন্য নির্দিষ্ট তন্ত্র গঠিত হইয়াছে। ইহাকে সংবহন তন্ত্র (Circulatory system) বলে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সংবহনকে পরিবহণ বা কনডাকশন (Conduction) বা ট্রান্সলোকেশান (Translocation) নামে অভিহিত করা হয়।

সংবহনের গুরুত্ব (**Significance of Circulation**): সংবহনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কার্য সম্পন্ন হয়।

1. **পুষ্টি (Nutrition)**—পাচিত ও শোষিত খাদ্যরস প্রতিটি সজীব কোষে পৌঁছায়।

2. **শ্বসন (Respiration)**—শ্বসন অঙ্গ হইতে গৃহীত অক্সিজেন প্রতিটি কোষে পৌঁছায় ও প্রতিটি কোষ হইতে পরিত্যক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবেশে মুক্ত হয়।

3. **সঞ্চয় (Storage)**—উদ্বৃত্ত খাদ্য বিভিন্ন সঞ্চয়ী অঙ্গে পরিচালিত হয় এবং প্রয়োজনে সঞ্চয়ী অঙ্গ হইতে খাদ্য দেহের বিভিন্ন অংশে পৌঁছায়।

4. **হর্মোন, উৎসেচক ও ভিটামিন সংবহন (Circulation of hormones, enzymes and vitamins)**—সংবহনের মাধ্যমে হর্মোন, উৎসেচক ও ভিটামিন দেহের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছায়।

5. **রেচন (Excertion)**—বিপাকীয় কার্যের ফলে উদ্ভূত বর্জ্য পদার্থকে দেহের রেচন অঙ্গে পৌঁছাইয়া দেয় এবং তথা হইতে দেহের বাহিরে অপসারিত হয়।

6. **রোগ প্রতিরোধ (Immunity)**—রোগজীবাণু প্রতিরোধ বা ধ্বংসের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ সংবহনের মাধ্যমে যথাস্থানে পৌঁছায়।

7. **তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Regulation of temperature)**—শ্বসনে উদ্ভূত তাপমাত্রা জীবদেহের সর্বত্র সমানভাবে বজায় থাকে।

8. **অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ (Osmoregulation)**—দেহের অতিরিক্ত জল অপসারণ দ্বারা অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ করে।

উদ্ভিদের সংবহন (Conduction in plants) : এককোষী ও নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের সংবহন অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। এই সকল উদ্ভিদের সংবহন কলা বা শিরাত্মক কলা (Vascular tissue) না থাকায় কোষান্তর অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় সংবহন সম্পন্ন হয়।
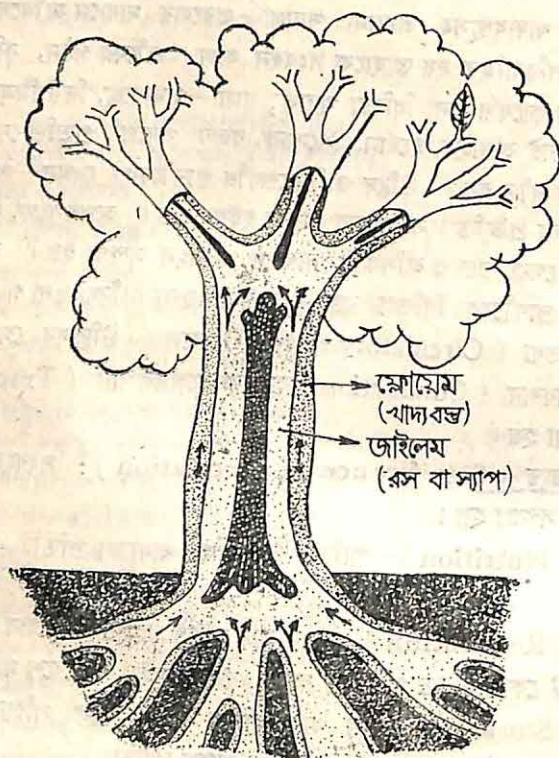
চিত্র 9.1 : উদ্ভিদদেহে সংবহন

উচ্চস্তরের উদ্ভিদের সংবহনের জন্য জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলা নির্মিত শিরাত্মক কলাতন্ত্র (Vascular tissue system) বিদ্যমান। এই সকল উদ্ভিদে খাদ্যরস, বর্জ্যপদার্থ, হর্মোন, ক্ষরিত পদার্থ প্রভৃতি জৈব বস্তুর অণুগুলি জলে দ্রবীভূত অবস্থায় ফ্লোয়েম কলার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। অপরপক্ষে, জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ বা রস (sap) জাইলেম কলার মাধ্যমে চলাচল করে। আবার উদ্ভিদের যে সকল অঙ্গে শিরাত্মক কলা নাই সেই সকল স্থানে প্লাসমোডেসমাটার (দুইটি কোষের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী সাইটোপ্লাজমীয় অংশ) মাধ্যমে কোষান্তর পরিবহণ সম্পন্ন হয়।

উচ্চস্তরের উদ্ভিদের সংবহন দুইটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়—রসের উৎস্রোত বা জল সংবহন এবং খাদ্যবস্তুর সংবহন।

1. **রসের উৎস্রোত (Ascent of sap)**—যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের মূলরোম দ্বারা শোষিত জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ কাণ্ডের মধ্য দিয়া পাতায় পৌঁছায় তাহাকে

রসের উৎস্রোত বলে। নিচ হইতে উপরের দিকে রসের প্রবাহ ঘটে বলিয়া ইহাকে ঊর্ধ্বমুখী সংবহন বলে।

এই প্রক্রিয়ায় মূলরোম দ্বারা শোষিত জল ও অজৈব লবণ কোষান্তর অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বহিস্ত্বকের মধ্য দিয়া কর্টেক্সে পৌঁছায়। কর্টেক্সের কোষগুলি রসস্ফীত হইলে জল অন্তস্ত্বকের মধ্য দিয়া অন্তস্ত্বক সংলগ্ন পারণ কোষের (Passage cell) মাধ্যমে জাইলেমবাহিকায় প্রবেশ করে। জাইলেমবাহিকার চারিপার্শ্বস্থ কর্টেক্সের রসস্ফীত প্যারেনকাইমা কোষগুলি যে বল প্রয়োগ করিয়া জলকে জাইলেমবাহিকায় প্রবেশে সাহায্য করে তাহাকে **মূলজ চাপ (Root pressure)** বলে। অতঃপর জল মূলের জাইলেম বাহিকা হইতে কাণ্ডের জাইলেমবাহিকার মাধ্যমে পাতায় পৌঁছায়।

রসের উৎস্রোত সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বিভিন্ন মতবাদ বিদ্যমান। উক্ত মতবাদগুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়—(i) মূলজ চাপ মতবাদ (Root pressure theory), (ii) অধিপ্রাণবাদ (Vitalistic theory), (iii) ভৌতবল মতবাদ (Physical force theory)। নিচে এই সকল মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :

(i) **মূলজ চাপ**—মূলজ চাপ বিশেষ পরিবেশে কতিপয় উদ্ভিদে জল পরিবহণে সমর্থ হইলেও সমস্ত উদ্ভিদে মুখ্যত এই চাপের দ্বারা জল পরিবাহিত হয় না। কারণ অধিকাংশ উদ্ভিদের জল পরিবহণের জন্য যে চাপের প্রয়োজন মূলজ চাপ সেই তুলনায় নগণ্য। তাই মূলজ চাপ জলকে জাইলেমবাহিকার মধ্য দিয়া মাত্র কিছুদূর পর্যন্ত ঠেলিয়া দিতে পারে। তাই এই মতবাদ বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃত নয়।

(ii) **অধিপ্রাণবাদ**—এই মতবাদের প্রবক্তা হইলেন বিজ্ঞানী গডলিউইস্কি (Godlewski, 1884) ও বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (J. C. Bose, 1923)। এই মতবাদ অনুযায়ী নির্জীব জাইলেম বাহিকার চারিপার্শ্বস্থ অন্তস্তকীয় প্যারেনকাইমা কোষের সর্বদা সংকোচন ও প্রসারণের ফলে জাইলেমের রসে একটি পাম্পিং ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ জল ঊর্ধ্বমুখে পরিবাহিত হয়। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে অন্তস্তকীয় সমস্ত সজীব কোষকে পিক্রিক্ অ্যাসিড দ্বারা নিষ্ক্রিয় করিলেও জলের ঊর্ধ্বমুখী সংবহন অব্যাহত থাকে। তাই এই মতবাদ বিজ্ঞানীমহলে আস্থা অর্জন করিতে পারে নাই।

(iii) **ভৌতবল মতবাদ**—ইহা নিম্নলিখিত কতিপয় মতবাদের সমন্বয়ে গঠিত। ইহারা হইল—

(ক) **কৈশিকত্ব (Capillarity)**—কোন তরলযুক্ত পাত্রের মধ্যে যদি একটি সমান ব্যাস ও সূক্ষ্ম রন্ধ্রযুক্ত (0·4 mm) সূক্ষ্ম নল বা কৈশিক নল রাখা হয় তাহা হইলে কৈশিক নল মধ্যস্থ তরলের উচ্চতা পাত্রের তরল অপেক্ষা বেশি হইবে। জাইলেমবাহিকাকে কতকগুলি কৈশিক নলের সমষ্টি ধরা হইলে কৈশিকত্ব দ্বারা জল মাত্র কয়েক ফুট উপরে উঠিতে পারে। অপরপক্ষে, অধিকাংশ ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে জাইলেমবাহিকা (Trachea) অনুপস্থিত হওয়ায় তাহাদের ক্ষেত্রে রসের সংবহন কৈশিকত্ব দ্বারা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই এই মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(খ) **বায়ুমণ্ডলীয় চাপ (Atmospheric pressure)**—বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভকে যেভাবে ধরিয়া রাখে, ঠিক সেইভাবে কাণ্ডের ক্ষীণ বায়বীয় চাপ জলকে জাইলেমবাহিকার মধ্য দিয়া উপরে ঠেলিয়া দেয়। কিন্তু এই চাপ কখনও জলকে 10 মিটারের ঊর্ধ্বে ধরিয়া রাখিতে পারে না। এই কারণে মতবাদটি গ্রহণযোগ্য নয়।

(গ) **ইমবাইবিশানবাদ (Imbibition theory)**—এই মতবাদের প্রবক্তা হইলেন বিজ্ঞানী স্যাকস্ (Sachs)। তাঁহার মতে জল জাইলেমবাহিকার প্রাচীর সংলগ্ন হইয়া বিশেষ চাপের সাহায্যে উপরের দিকে উঠিতে থাকে। এই চাপকে ইমবাইবিশানচাপ বলে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা এই মতবাদের যথার্থতা প্রমাণিত হয় নাই কারণ কৃত্রিমভাবে জাইলেমের গহ্বরকে বন্ধ করিয়া দিলে রসের উৎস্রোত বন্ধ হইয়া যায়।

চিত্র 9.2 : মূলের দ্বারা উদ্ভিদের মাটি হইতে জল শোষণ
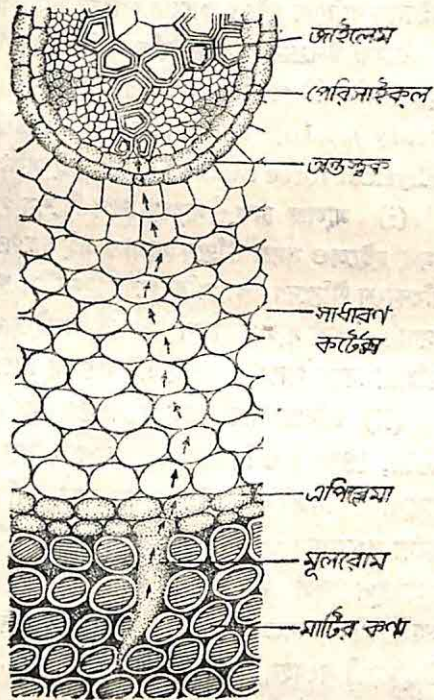
(ঘ) **বাষ্পমোচন সংসক্তি টানবাদ (Transpiration cohesion tension theory)**—এই মতবাদ বিজ্ঞানীমহলে সর্বাপেক্ষা স্বীকৃত ও উল্লেখযোগ্য। এই মতবাদের প্রবক্তা হইলেন বিজ্ঞানী ডিক্সন ও জলি (Dixon and Joly, 1894)। তাঁহাদের মতে জল অণুগুলি সমসংযোগ* জনিত বলের (Cohesive force) একে অপরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে এবং এই সংযুক্তির জন্য জলস্তম্ভ জাইলেম বাহিকার মধ্যে বুদ্‌বুদ্-হীন টানের অবস্থায় (State of tension) অবস্থান করে। অপরপক্ষে, জল অণু ও জাইলেম বাহিকার মধ্যে অসমসংযোগ** জনিত বল (Adhesive force) দ্বারা জাই-

---

* সমসংযোগ বল—যে বলের দ্বারা একই পদার্থের অণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহাকে সমসংযোগ বল বলে।

** অসমসংযোগ বল—যে বলের দ্বারা দুইটি ভিন্ন জাতীয় পদার্থের অণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে তাহাকে অসমসংযোগ বল বলে।

লেমের জলস্তম্ভটি টানের ফলে বিচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং উপর হইতে বাষ্পমোচন বা প্রস্বেদনের ফলে শূন্যতাঘটিত যে টানের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়া জল ঊর্ধ্বে পরিবাহিত হয়। ইহা ব্যতীত নিচ হইতে মূলজ চাপ ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপ জলস্তম্ভকে উপরে ঠেলিয়া দিতে সাহায্য করে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই সকল সম্মিলিত চাপের ফলে জল যে উচ্চতায় উঠিতে সমর্থ কোন উদ্ভিদ তত উচ্চ হয় না।

2. **খাদ্যসংবহন (Circulation of food)**—উদ্ভিদের পাতায় প্রস্তুত শর্করা দেহের বর্ধনশীল অঞ্চলে পরিবাহিত হয়। আবার প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যবস্তু মূল, কাণ্ড, পাতা, ফল প্রভৃতি ভাণ্ডার অঙ্গে জটিল অদ্রবণীয় পদার্থরূপে (প্রধানত শ্বেতসার) সঞ্চিত থাকে। বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণের জন্য যখন খাদ্যের প্রয়োজন হয় তখন ভাণ্ডার অঙ্গ হইতে সঞ্চিত খাদ্য সরলীকৃত হইয়া পাতা, মুকুল, ফল প্রভৃতি বর্ধনশীল অঞ্চলে সংবাহিত হয়। অর্থাৎ উদ্ভিদের প্রয়োজনে খাদ্যবস্তুর নিম্নমুখী ও ঊর্ধ্বমুখী পরিবহণ সম্পন্ন হইতে পারে। সাধারণত শ্বেতসার সরল শর্করারূপে, প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিডরূপে এবং স্নেহপদার্থ ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলরূপে জলে দ্রবীভূত অবস্থায় উদ্ভিদের বিভিন্ন কলা বা কোষে ফ্লোয়েম কলার মাধ্যমে সংবাহিত হয়। উদ্ভিদের যে সকল অঙ্গে ফ্লোয়েম কলা নাই, সেইখানে খাদ্যবস্তুর সংবহন কোষান্তর অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়।

খাদ্যসংবহন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান মতবাদ হইল—রসের সামগ্রিক প্রবাহ মতবাদ বা মুঞ্চ প্রকল্প ও সাইটোপ্লাজমীয় আবর্তন মতবাদ।

(1) **সামগ্রিক প্রবাহ মতবাদ বা মুঞ্চ প্রকল্প (Mass flow theory or Munch hypothesis)**—মুঞ্চের (Munch, 1930) মতানুসারে উদ্ভিদের রস সংবহন পদ্ধতির সঙ্গে প্রাণীদের রক্তসংবহন পদ্ধতির যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। তাঁহার মতে সালোক সংশ্লেষের সময় পাতার মেসোফিল কোষে শর্করার (বিশেষত সুক্রোজ) পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ঐ কোষগুলি কোষরসের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ, কোষের অভিস্রবণ চাপ বৃদ্ধি পায় এবং জাইলেমের মধ্য দিয়া জলের শোষণ ঘটে। জলশোষণের ফলে মেসোফিল কোষের রসস্ফীতি ঘটে। কিন্তু মেসোফিল কোষগুলি পরস্পরের সঙ্গে এবং ফ্লোয়েম কলার সীভ নলের সঙ্গে প্লাসমোডেসমাটা দ্বারা যুক্ত থাকে। তাই রসস্ফীত মেসোফিল কোষ হইতে রসস্ফীতি চাপের জন্য দ্রবণ সীভ নলের মধ্য দিয়া নিম্নমুখে প্রবাহিত হয়। মেসোফিল কোষ হইতে দ্রবণ বাহির হইবার জন্য দ্রবণের যে ঘাটতির সৃষ্টি হয় সালোক সংশ্লেষে উৎপন্ন শর্করা ও জাইলেমবাহিকার মধ্য দিয়া রসের ঊর্ধ্বমুখী স্রোত তাহা পূর্ণ করে।

অপরপক্ষে, মূলের কোষ হইতে ক্রমাগত শর্করা অপসৃত হয় বা অদ্রবণীয় শর্করায় রূপান্তরিত হয়। ইহার ফলে কোষের অভিস্রবণ চাপ ও রসস্ফীতি চাপ কমিয়া যায়। পাতার ও মূলের এই রসস্ফীতি চাপের পার্থক্যের জন্য ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়া দ্রবণ তথা দ্রবীভূত শর্করার সামগ্রিক প্রবাহ ঘটে। আবার মূলের অভিস্রবণ চাপ কমিয়া যাওয়ায়

মাটি হইতে জল মূলের কোষে প্রবেশ করে ও তথা হইতেজাইলেম বাহিকার মাধ্যমে পাতার মেসোফিল কোষে পৌঁছায়। এইভাবে ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়া ক্রমাগত খাদ্যবস্তুর নিম্নমুখী পরিবহণ ও জাইলেমের মধ্য দিয়া জলের ঊর্ধ্বমুখী পরিবহণ সম্পন্ন হয়
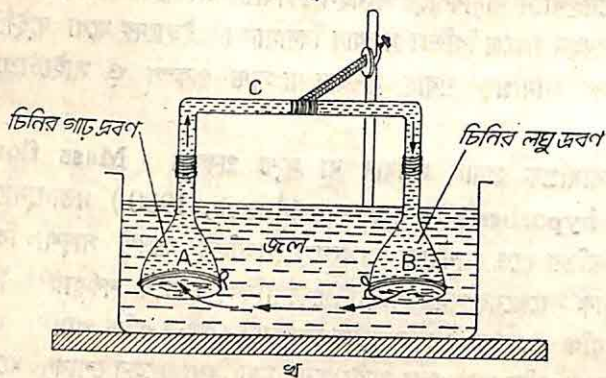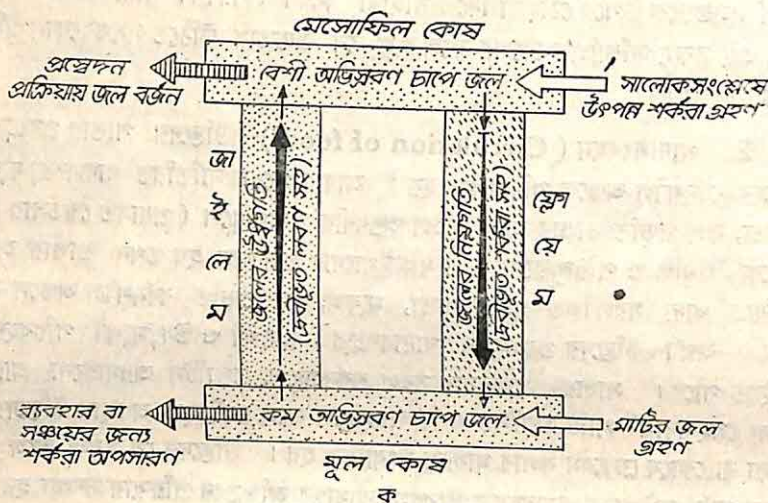
চিত্র 93 : মুঞ্চ প্রকল্প অনুযায়ী রসের সামগ্রিক পরিবহণ : ক = উদ্ভিদকোষের পরিবহণ, খ = পরীক্ষা

মুঞ্চের এই প্রক্রিয়াকে একটি সুন্দর নকশার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। জলভেদ্য পর্দাযুক্ত দুইটি ফানেল A ও B একটি কাচনল দ্বারা যুক্ত। 'A' চিহ্নিত ফানেল অধিক ঘনত্ব ও অভিস্রবণ চাপযুক্ত দ্রবণ দ্বারা পূর্ণ এবং 'B' ফানেল লঘু দ্রবণে পূর্ণ। এই ব্যবস্থাটি একটি জলপূর্ণ পাত্রে নিমজ্জিত করিলে 'A' ফানেলের মধ্যে জল প্রবেশ করিবে এবং উহার রসস্ফীতি চাপ বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে 'A' ফানেল হইতে দ্রবণ কাচনলের মধ্য দিয়া 'B' ফানেলে প্রবাহিত হইবে। এই পদ্ধতিটি দুইটি ফানেলের দ্রবণের ঘনত্ব সমান না হওয়া পর্যন্ত ঘটিতে থাকিবে। এই প্রক্রিয়ায় 'A' ফানেলকে মেসোফিল কলার সহিত এবং 'B' ফানেলকে মূলকোষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

সাইটোপ্লাজমীয় আবর্তন মতবাদ (**Cytoplasmic streaming movement**) : ফ্লোয়েম কলার খাদ্যবস্তুর সংবহনের মতবাদ ডি ভ্রিস (De Vries) 1885 খ্রীষ্টাব্দে ব্যক্ত করেন, এই মতবাদ অনুযায়ী মূল হইতে পাতা পর্যন্ত সকল ফ্লোয়েম কলার সীভ নল পরস্পরের সঙ্গে চালুনীচ্ছদার ছিদ্র বা প্লাসমোডেস্‌মাটা দ্বারা যুক্ত। প্রতিটি সীভ নলের সাইটোপ্লাজম সর্বদা আবর্তিত হইতে থাকে। এই আবর্তে খাদ্যবস্তু পড়িলে সীভ নলের উপর হইতে নিচে অথবা নিচ হইতে উপরের দিকে পরিচালিত হয়। এমনকি একটি সীভ নল হইতে অপর সীভ নলে খাদ্যবস্তুর প্রবাহ ঘটিতে পারে। এইভাবে সীভ নলের সাইটোপ্লাজমীয় আবর্তনের মাধ্যমে একই সময়ে খাদ্যবস্তুর ঊর্ধ্বমুখী অথবা নিম্নমুখী পরিবহণ সম্পন্ন হয়। 1935 সালে কার্টিস (Curtis) এই মতবাদ সমর্থন করেন এবং 1967 সালে এসরিখ (Eschrich) তেজস্ক্রিয় কার্বন (^{14}C) দ্বারা এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিজ্ঞানী থেইনের (Thaine, 1969) মতে সীভ নলের সাইটোপ্লাজমীয় উপাদান সূক্ষ্ম প্রোটিন তন্তু দ্বারা আবৃত এবং এই প্রোটিন তন্তুর সংকোচন ও প্রসারণের জন্য সীভ নলের মধ্য দিয়া খাদ্যবস্তুর ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী পরিবহণ সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞানী ফেনসমের (Fensom, 1971) মতানুসারে ফ্লোয়েম কলার প্রতিটি সীভ নলের মধ্যে সংকোচনশীল প্রোটিনের সূক্ষ্ম তন্তু বা মাইক্রোফাইব্রিলের (Microfibrils) জালিকা বিদ্যমান এবং এই জালিকা চালুনীচ্ছদার ছিদ্র দ্বারা অপর সীভ নলের সঙ্গে যুক্ত। যেহেতু মূল হইতে পাতা পর্যন্ত ফ্লোয়েম কলার সীভ নল পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত সেই হেতু সংকোচনশীল সূক্ষ্ম তন্তুর স্পন্দনের ফলে খাদ্যবস্তুর সংবহন পাতা হইতে মূলের দিকে অথবা মূল হইতে পাতার দিকে সম্পন্ন হইতে পারে।

প্রাণীদের সংবহন (Circulation in Animals) :

A. **এককোষী প্রাণীদের সংবহন** (Circulation in Unicelluar Animals) : এককোষী প্রাণীদের সংবহন পদ্ধতি খুবই সরল। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট সংবহন তন্ত্র নাই। অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম প্রভৃতি এককোষী প্রাণীরা সাধারণত জলজ পরিবেশে বসবাস করে। জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ, খনিজ লবণ, জৈব পদার্থসমূহ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষদেহে প্রবেশ করে এবং একই প্রক্রিয়ায় কোষদেহে বিপাকীয় ক্রিয়ায় উদ্ভূত বর্জ্য পদার্থ দেহ হইতে নির্গত হয়। ইহা ব্যতীত সাইটোপ্লাজমের আবর্তনের ফলে সংবহন পদ্ধতি সম্পন্ন হয়।

B. **বহুকোষী প্রাণীদের সংবহন** (Circulation in Multicellular Animals) : বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস এবং ভিন্ন গঠন বৈচিত্র্যের জন্য বহুকোষী প্রাণীদের উল্লেখযোগ্য সংবহন তন্ত্র দেখা যায়। জল এবং রক্ত এই দুইটি মাধ্যম সংবহন তন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত উচ্চ স্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সংবহনের অন্যতম মাধ্যম হইল লসিকা। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার সংবহন তন্ত্র আলোচিত হইল।

1. **নালী তন্ত্র** (Canal System): স্পঞ্জ জাতীয় পরিফেরা পর্বভুক্ত প্রাণীদের দেহে নালী তন্ত্রের মাধ্যমে সংবহন সম্পন্ন হয়। এই প্রকার সংবহন তন্ত্রে দেহস্থিত অস্টিয়া (Ostia) নামক ছিদ্রপথে জল দেহের অভ্যন্তরে (প্যারাগ্যাসট্রিক ক্যাভিটি— Paragastric cavity) প্রবেশ করে এবং দেহের নালিকাসমূহের মাধ্যমে অসকিউলাম নামক ছিদ্রপথে বাহির হইয়া যায়।

অস্টিয়া→ইনকারেণ্ট ক্যানাল→প্রোসোপাইল→রেডিয়াল ক্যানাল→অ্যাপোপাইল→স্পঞ্জোসিল→অসকিউলাম।
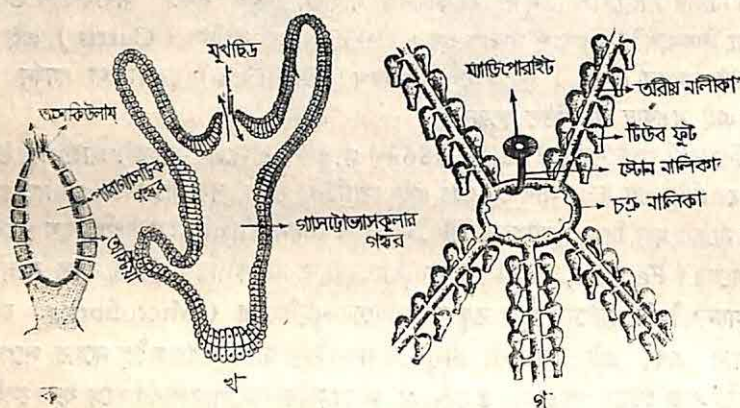
চিত্র 9.4 : বহুকোষী প্রাণীর সংবহন : ক=স্পঞ্জ, খ=হাইড্রা, গ=তারামাছ

2. **গ্যাসট্রোভাস্কুলার তন্ত্র** (Gastrovascular system): একনালীদেহী প্রাণীদের ক্ষেত্রে জল মুখছিদ্রের মাধ্যমে গ্যাসট্রোভাস্কুলার গহ্বর বা সিলেণ্টেরনে প্রবেশ করে এবং পুনরায় মুখছিদ্রের মাধ্যমে জল দেহ হইতে বাহির হইয়া সংবহন সম্পাদিত হয়।

3. **জল সংবহন তন্ত্র** (Water vascular system): তারামাছ, সমুদ্রশশা প্রভৃতি কণ্টকত্বক পর্বভুক্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রে জল সংবহন তন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত প্রাণিদেহে ম্যাড্রিপোরাইট, স্টোন নালিকা, অরীয় নালিকা এবং নালিকা পদ প্রভৃতির সাহায্যে জল দেহের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

ম্যাড্রিপোরাইট→স্টোন নালী→বলয় নালী→অরীয় নালী→পার্শ্বীয় নালী→নালিকা পদ।

4. **রক্ত সংবহন তন্ত্র** (Blood vascular system): সর্বপ্রথম নিমারটিনি পর্বভুক্ত প্রাণীদের মধ্যে রক্ত সংবহন তন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। এই ধরনের সংবহন তন্ত্রে পেশী তন্তু দ্বারা আবৃত নালিকা বিদ্যমান। একটি মাধ্যিক ও দুইটি পার্শ্বীয় নালিকা লইয়া ইহাদের সংবহন তন্ত্র গঠিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্ত বর্ণহীন কণিকাযুক্ত। কেঁচো, জোঁক, আরশোলা, চিংড়ি, শামুক জাতীয় ইত্যাদি অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং সমস্ত

মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে নির্দিষ্ট রক্ত সংবহন তন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রাণীর ক্রমবিবর্তন অনুযায়ী যেহেতু অমেরুদণ্ডী প্রাণী হইতে মেরুদণ্ডী প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে সেইজন্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী অপেক্ষা মেরুদণ্ডী প্রাণীর সংবহন তন্ত্রের ক্রমান্বয়িক জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সংবহন প্রক্রিয়া অপেক্ষা মেরুদণ্ডী প্রাণীর সংবহন প্রক্রিয়া জটিল।

রক্ত সংবহন তন্ত্র রক্ত, রক্তবাহ এবং হৃৎপিণ্ড লইয়া গঠিত। রক্তবাহের মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয় এবং দেহে রক্তপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পর্যায়-ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণশীল যে অঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহাকে হৃৎপিণ্ড বলে।

(ক) রক্ত (Blood) : রক্ত একপ্রকার তরল যোগ কলা। রক্তের মাধ্যমে খাদ্যরস, গ্যাসীয় পদার্থ, ভিটামিন, হর্মোন, বর্জ্য পদার্থ প্রভৃতি দ্রবীভূত অবস্থায় দেহের বিভিন্ন অঙ্গে প্রবাহিত হয়। রক্তরস এবং রক্তকণিকা লইয়া রক্ত গঠিত। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে তিনপ্রকার রক্ত কণিকা থাকে, যথা—লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তকণিকা সমস্ত একই প্রকারের এবং ইহাদের গঠন মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্বেত রক্ত কণিকার ন্যায়। রক্তের রঙ সাধারণত লাল কারণ ইহার মধ্যে হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) নামক লৌহঘটিত শ্বাসরঙ্গক পদার্থ থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিন লোহিত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে থাকে। কিন্তু কেঁচোর ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিন রক্তরসে থাকে। চিংড়ি, পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীদের রক্ত বর্ণহীন
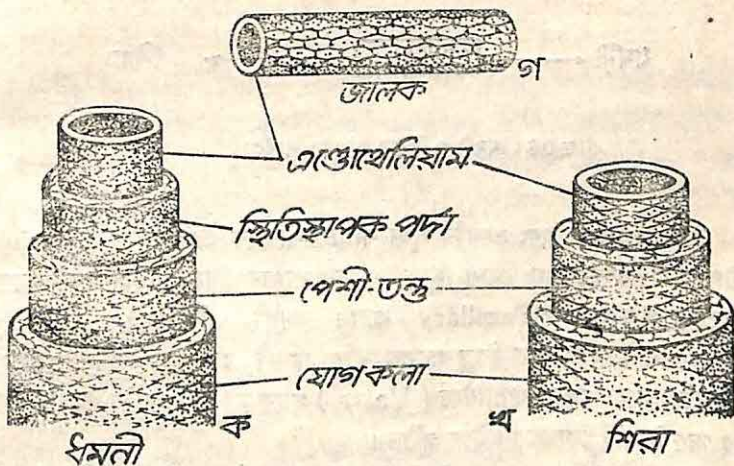
চিত্র 9.5 : বিভিন্ন প্রকার রক্তবাহ ; ক=ধমনী, খ=শিরা, গ=জালক

হয়। কারণ ইহাদের রক্তে হিমোগ্লোবিন নামক শ্বাসরঙ্গক পদার্থ থাকে না, পরিবর্তে তাম্রঘটিত হিমোসায়ানিন (Haemocyanin) থাকে। ইহা ব্যতীত পলিকিট (অঙ্গুরীমাল পর্বভুক্ত প্রাণী) জাতীয় প্রাণীদের লৌহঘটিত সবুজ রঙ্গক ক্লোরোক্রুওরিন

রক্তে বিদ্যমান। আবার বিভিন্ন কৃমি এবং কিছু পলিকিটের রক্তে লৌহঘটিত বেগুনী রঙ্গক পদার্থ হিমোএরিথ্রিন বিদ্যমান।

(খ) **রক্তবাহ** (Blood Vessel) : যে নালিকার মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন প্রান্তে বাহিত হয় তাহাকে **রক্তবাহ** বলে। রক্তবাহ তিনপ্রকার, যথা—ধমনী (Artery), শিরা (Vein) এবং জালক (Capillary)।

(i) **ধমনী** (Artery) : যে রক্তবাহের মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বাহিত হয় তাহাকে **ধমনী** বলে। হৃৎপিণ্ড সংলগ্ন ধমনী মোটা হয় এবং ইহাকে
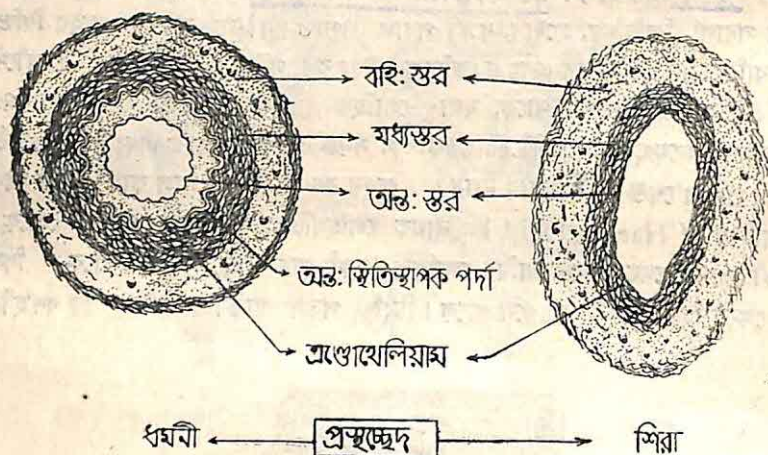
চিত্র 9.6 : ধমনী ও শিরার গঠনগত পার্থক্য

মহাধমনী (Aorta) বলে এবং ধমনীর সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখাকে **উপধমনী** (Arteriole) বলে। উপধমনী কলাকোষে ক্রমশ সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া যে রক্তবাহের সৃষ্টি করে তাহাকে **জালক** (Capillary) বলে। ধমনী অক্সিজেনযুক্ত রক্ত (Oxygenated blood) বহন করে কিন্তু **ফুসফুসীয় ধমনী অক্সিজেনবিহীন রক্ত বহন করে**। ধমনীর মধ্যে কোন কপাটিকা (Valve) থাকে না। ধমনীর প্রাচীর মোটা এবং ইহার গাত্র তিনটি কোষস্তর লইয়া গঠিত।

1. **বহিঃস্তর বা টিউনিকা অ্যাডভেণ্টিসিয়া** (Tunica adventitia) : ইহা ধমনী প্রাচীরের বাহিরের স্তর এবং এই স্তরটি বেশ পুরু। ইহা তন্তুময় যোগ কলা দ্বারা গঠিত। এই স্তরে চেষ্টীয় স্নায়ু থাকে যাহা ধমনীর সংকোচন ও প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে। উপধমনীতে এই স্তরটি থাকে না।

2. **মধ্যস্তর বা টিউনিকা মিডিয়া** (Tunica media) : এই স্তরটিও পুরু এবং স্থিতিস্থাপক। ইহা বৃত্তাকারে সজ্জিত মসৃণ পেশীতন্তু দ্বারা গঠিত।

3. **অন্তঃস্তর বা টিউনিকা ইণ্টিমা (Tunica intima)** : ইহা সর্বাপেক্ষা ভিতরের স্তর এবং ইহা আঁইশাকার আবরণী কলা দ্বারা গঠিত।

দেহের যে অঙ্গে ধমনী রক্ত সরবরাহ করে সেই অঙ্গের নাম অনুসারে ধমনীর নামকরণ হইয়া থাকে। যেমন—ফুসফুসে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীকে **ফুসফুসীয় ধমনী** (Pulmonary artery), বৃক্কে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীকে **বৃক্ক ধমনী** (Renal artery), যকৃতে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীকে **যকৃত ধমনী** (Hepatic artery) বলে ইত্যাদি।

(ii) **শিরা** (Vein) : যে রক্তবাহের মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে হৃৎপিণ্ডের দিকে বাহিত হয় তাহাকে **শিরা** বলে। কলাকোষে অবস্থিত বহুসংখ্যক শিরা জালক একত্রিত হইয়া উপশিরা (Venule) গঠন করে এবং পুনরায় উপশিরাগুলি একত্রিত হইয়া শিরা গঠিত হয়। শিরা অক্সিজেনবিহীন রক্ত (Deoxygenated blood) বহন করে কিন্তু **ফুসফুসীয় শিরা অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে**। শিরার মধ্যে কপাটিকা (Valve) থাকে যাহাতে রক্ত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে না পারে। শিরা দেহত্বকের নিচে অবস্থান করে। ধমনী প্রাচীরের ন্যায় **শিরা** প্রাচীরও তিনটি কোষস্তর লইয়া গঠিত। কিন্তু শিরার মধ্যস্তর বা টিউনিকা মিডিয়া স্তরটি পাতলা এবং অস্থিতিস্থাপক। এইজন্য কোন কারণে শিরায় রক্ত না থাকিলে ইহা চুপসাইয়া যায়।

কার্য অনুযায়ী শিরা প্রধানত দুইপ্রকার, যথা—**সিস্টেমিক শিরা** (Systemic Vein) এবং **পোর্টাল শিরা** (Portal Vein)। যে সকল শিরা জালক হইতে উৎপন্ন হইয়া সরাসরি হৃৎপিণ্ডের সহিত মিলিত হয় তাহাকে **সিস্টেমিক শিরা** বলে। অপরপক্ষে, যে সকল শিরা জালক হইতে উৎপন্ন হইয়া সরাসরি হৃৎপিণ্ডে মিলিত হওয়ার পরিবর্তে বৃক্ক অথবা যকৃতে প্রবেশ করে তাহাকে পোর্টাল শিরা বলে। যখন পোর্টাল শিরা অন্ত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া যকৃতে প্রবেশ করে তাহাকে **যকৃত পোর্টাল শিরা** (Hepatic portal Vein) বলে। অন্ত্র হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য ইহা পুষ্টিরস সমৃদ্ধ হয়। যখন পোর্টাল শিরা লেজ ও পশ্চাৎপদ হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃক্কে প্রবেশ করে তাহাকে **বৃক্ক পোর্টাল শিরা** (Renal portal Vein) বলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পোর্টাল শিরার দুই প্রান্তে জালক থাকে। সরীসৃপ, পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বৃক্ক পোর্টাল শিরা থাকে না।

দেহের যে অঙ্গ হইতে শিরা রক্ত সংগ্রহ করে সেই অঙ্গের নাম অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার শিরা দেখা যায়। যেমন, **ফুসফুসীয় শিরা** (Pulmonary Vein) ফুসফুস হইতে রক্ত সংগ্রহ করে, **যকৃত পোর্টাল শিরা** যকৃত হইতে রক্ত সংগ্রহ করে এবং **বৃক্ক পোর্টাল শিরা** বৃক্ক হইতে রক্ত সংগ্রহ করে।

ধমনী ও শিরার মধ্যে পার্থক্য (Differences between Artery and Vein)

ধমনী	শিরা
1. ধমনী প্রাচীর পুরু, পেশীবহুল এবং স্থিতিস্থাপক।	1. শিরা প্রাচীর পাতলা, স্বল্প পেশীযুক্ত এবং অস্থিতিস্থাপক।
2. ধমনীর গহ্বর ছোট।	2. শিরার গহ্বর বড়।
3. ধমনীর মধ্যে কপাটিকা নাই।	3. শিরার মধ্যে কপাটিকা আছে।
4. ধমনীর মধ্যে রক্ত না থাকিলে চুপসাইয়া যায় না।	4. শিরার মধ্যে রক্ত না থাকিলে চুপসাইয়া যায়।
5. ধমনী অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে (ফুসফুসীয় ধমনী ব্যতীত)।	5. শিরা অক্সিজেনবিহীন রক্ত বহন করে (ফুসফুসীয় শিরা ব্যতীত)।
6. ধমনী হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গে সংবাহিত করে।	6. শিরা দেহের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে রক্ত সংগ্রহ করিয়া হৃৎপিণ্ডের দিকে বাহিত করে।
7. ধমনীর রক্তচাপ বেশী।	7. শিরার রক্তচাপ কম।
8. ধমনীর মাধ্যমে রক্ত দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হয়।	8. শিরার মাধ্যমে রক্ত ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়।
9. ধমনীর মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের তালে তালে প্রবাহিত হয়।	9. শিরার মাধ্যমে রক্ত একই তালে প্রবাহিত হয়।
10. ধমনী দেহের গভীরে অবস্থিত।	10. শিরা দেহত্বকের নিচে অবস্থিত।

(ii) **রক্ত জালক** (Blood capillaries) : দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কলাকোষে উপধমনী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ধমনী জালক গঠন করে এবং উক্ত জালক পুনরায় মিলিত হইয়া উপশিরা গঠন করে। সুতরাং ধমনীর শেষ প্রান্ত এবং শিরার উৎপত্তিস্থলে সূক্ষ্মতম রক্তবাহগুলিকে **জালক** (Capillary) বলে। রক্ত জালক একটিমাত্র পাতলা কোষস্তর লইয়া গঠিত যাহা **এণ্ডোথেলিয়াম** (Endothelium) নামে পরিচিত।

রক্ত জালকের সহিত কোষ কলার বিভিন্ন পদার্থের আদান-প্রদান প্রত্যক্ষভাবে সংঘটিত না হইয়া পরোক্ষভাবে হইয়া থাকে। কলাস্থিত কোষগুলি কলারস (Tissue fluid) নামক তরল পদার্থে নিমজ্জিত থাকে। রক্ত জালকের ধমনীপ্রান্ত উচ্চ চাপযুক্ত হওয়ার ফলে ইহা হইতে অক্সিজেন, লবণ, গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রভৃতি পদার্থ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কলারসে পৌঁছায় এবং তথা হইতে কলাকোষে প্রবেশ করে। অন্যদিকে শিরাপ্রান্তে রক্ত জালকের চাপ কলারসের চাপ অপেক্ষা কম হওয়ার ফলে কলারস হইতে বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ রক্ত জালকে প্রবেশ করে।

(গ) **হৃৎপিণ্ড** (Heart): হৃৎপিণ্ড রক্ত সংবহন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। ইহা পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা আবরণী দ্বারা আবৃত। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর তিনটি স্তরযুক্ত

—বাহিরের যোগকলা নির্মিত স্তরকে এপিকার্ডিয়াম, হৃৎপেশী দ্বারা গঠিত মধ্যবর্তী স্তরকে মায়োকার্ডিয়াম এবং ভিতরের অনৈচ্ছিক পেশী ও যোগকলা নির্মিত স্তরকে এণ্ডোকার্ডিয়াম বলে। ইহা আবরণী কলার স্তর দ্বারা আবৃত। হৃৎপিণ্ডের পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ইহা বিভিন্ন অঙ্গ হইতে রক্ত সংগ্রহ করে এবং অন্যদিকে সংগৃহীত রক্তকে পুনরায় সমগ্র দেহে প্রবাহিত করিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং হৃৎপিণ্ড একটি পাম্পযন্ত্রবিশেষ, অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড খুবই সরল কিন্তু মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে ইহা ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর।

রক্ত সংবহন তন্ত্রের প্রকারভেদ (Types of Blood Vascular System): প্রাণিদেহে দুইপ্রকার রক্ত সংবহন তন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় :

1. মুক্ত রক্ত সংবহন তন্ত্র (Open Blood Vascular System) এবং
2. বন্ধ রক্ত সংবহন তন্ত্র (Closed Blood Vascular System)।

মুক্ত রক্ত সংবহন তন্ত্র :—যে সংবহন তন্ত্রে রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তবাহের মাধ্যমে প্রবাহিত হইবার পর সাইনাস নামক দেহগহ্বরে (Haemocoel) উন্মুক্ত হয় এবং তথা হইতে রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে তাহাকে মুক্ত রক্ত সংবহন তন্ত্র বলে। এইসব ক্ষেত্রে রক্ত সম্পূর্ণভাবে রক্তবাহের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। রক্তপ্রবাহ কিছুটা রক্তবাহের মাধ্যমে এবং কিছুটা দেহগহ্বরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এই জাতীয় রক্ত সংবহন আর্থ্রোপোডা পর্বভুক্ত প্রাণী এবং শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি শম্বুক জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। আর্থ্রোপোডা পর্বভুক্ত পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইলে রক্তবাহের মাধ্যমে রক্ত সাইনাস নামক দেহগহ্বরে উন্মুক্ত হয় এবং সেই স্থান হইতে রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। এইরূপ রক্তবাহী দেহগহ্বরকে হিমোসিল (Haemocoel) বলে।

বন্ধ রক্ত সংবহন তন্ত্র :—যে সংবহন তন্ত্রে রক্ত সর্বদা রক্তবাহের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয় এবং কখনও রক্তবাহের বাহিরে আসে না তাহাকে বন্ধ রক্ত সংবহন তন্ত্র বলে। কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং কর্ডাটা পর্বভুক্ত সমস্ত প্রাণিদেহে এই ধরনের রক্ত সংবহন পরিলক্ষিত হয়।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত সংবহন (Blood Circulation in Invertebrate Animals): পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অমেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড সরল। প্রাণীদের রক্ত সংবহন তন্ত্র পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, মেরুদণ্ডী প্রাণীর তুলনায় অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্ত সংবহন তন্ত্র অনুন্নত ধরনের। কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি প্রাণীদের বন্ধ রক্ত সংবহন তন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, আবার চিংড়ি, আরশোলা, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি প্রাণীদের মুক্ত রক্ত সংবহন পদ্ধতি দেখা যায়। নিম্নে কতিপয় অমেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত সংবহন তন্ত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

1. **কেঁচো** (Earthworm): কেঁচোর রক্ত সংবহন তন্ত্র কতকগুলি রক্তনালী দ্বারা সম্পাদিত হয়। উন্নত প্রাণীর মত কেঁচোর দেহে প্রকৃত হৃৎপিণ্ড নাই। দেহের ৭ম, ৯ম, ১২শ এবং ১৩শ দেহখণ্ডে গ্রাসনালীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত চারিজোড়া

স্পন্দনশীল স্ফীত রক্তবাহ হৃৎপিণ্ডের কার্য করে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলেসমস্ত দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কপাটিকা (Valve) থাকায়
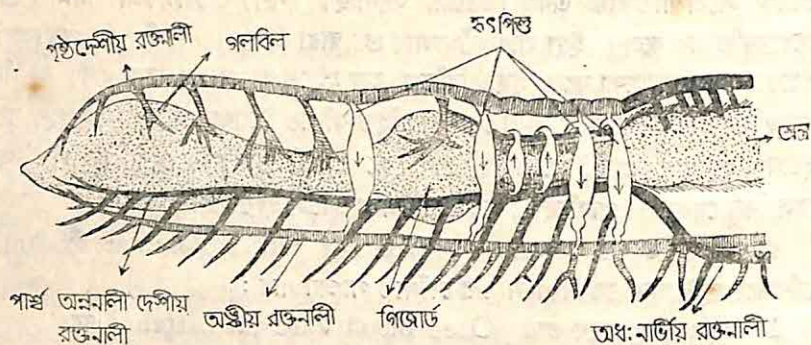
চিত্র 9.7 : কেঁচোর বদ্ধ রক্তসংবহন তন্ত্র

রক্ত নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়। রক্ত যখন ত্বকে অবস্থিত রক্তজালকে আসে তখন ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত হয় এবং অক্সিজেন গৃহীত হয়। রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে নালীপথে প্রবাহিত হয় এবং পুনরায় নালীপথে হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে এবং কখনও নালীর বাহিরে উন্মুক্ত হয় না। সুতরাং কেঁচোর ক্ষেত্রে বদ্ধ রক্ত সংবহন তন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

2. **আরশোলা** (Cockroach) : আরশোলা-সহ সমস্ত পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রে মুক্ত রক্ত সংবহন তন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। আরশোলার পৃষ্ঠদেশে মধ্যরেখা বরাবর ১৩টি প্রকোষ্ঠ লইয়া হৃৎপিণ্ড গঠিত। ইহাদের মধ্যে ৩টি প্রকোষ্ঠ বক্ষঃদেশে এবং বাকি ১০টি প্রকোষ্ঠ উদরদেশে অবস্থিত। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের দুই পার্শ্বে একটি করিয়া মোট দুইটি কপাটিকাযুক্ত ছিদ্র বিদ্যমান। এই

চিত্র 9.8 : আরশোলার মুক্ত রক্তসংবহন তন্ত্র

ছিদ্রগুলিকে **অস্টিয়া** (Ostia) বলে। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলি ছিদ্রের সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত এবং ইহাদের সংযোগস্থলে কপাটিকা থাকে। হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগে মহাধমনী

(Dorsal aorta) অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডটি পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস দ্বারা পরিবৃত থাকে এবং অস্টিয়ার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডটি পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে উন্মুক্ত হয়। পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসের প্রাচীরে ত্রিকোণাকৃতি অ্যালারী পেশী (Alary muscle) যুক্ত থাকে।
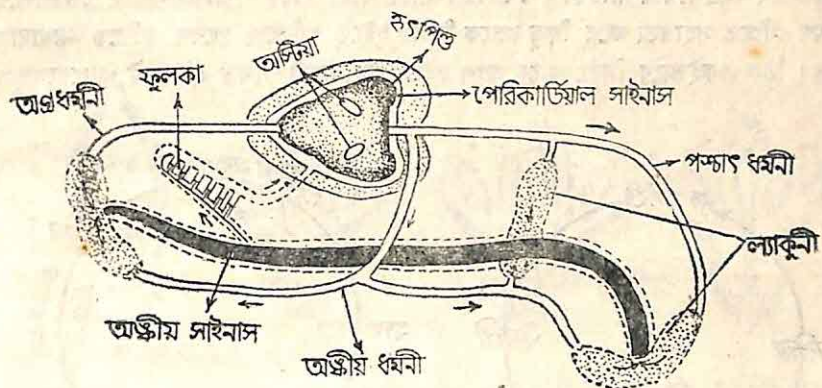
চিত্র 9.9 : চিংড়ির মুক্ত রক্ত সংবহন তন্ত্র

হৃৎপিণ্ড সংকোচনের ফলে রক্ত হৃৎপিণ্ডের সম্মুখ দিকে প্রবাহিত হইয়া মহাধমনীর মাধ্যমে হিমোসিল গহ্বরে উন্মুক্ত হয়। ইহার পর অ্যালারী পেশী সংকুচিত হইলে রক্ত পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে প্রবেশ করে এবং অস্টিয়ার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। যেহেতু রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে মহাধমনীর মাধ্যমে হিমোসিল গহ্বরে উন্মুক্ত হয় সেইজন্য ইহার ক্ষেত্রে মুক্ত রক্ত সংবহন তন্ত্র পরিলক্ষিত হয়।

3. চিংড়ি (Prawn): চিংড়ির শিরোবক্ষের (Cephalothorax) পৃষ্ঠীয় দেশে ত্রিকোণাকৃতি হৃৎপিণ্ড অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডে পাঁচ জোড়া কপাটিকাযুক্ত ছিদ্র বা অস্টিয়া (Ostia) থাকে। সমগ্র হৃৎপিণ্ডটি পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস নামক রক্তপূর্ণ গহ্বর দ্বারা পরিবৃত থাকে। হৃৎপিণ্ড সংকুচিত হইলে রক্ত ধমনীপথে **ল্যাকুনা** (Lacuna) নামক দেহগহ্বরে উন্মুক্ত হয় এবং তথা হইতে ফুলকাতে পৌঁছায়। রক্ত ফুলকাতে পরিস্রুত হইবার পর পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে।

আরশোলার ন্যায় চিংড়ির ক্ষেত্রেও মুক্ত রক্ত সংবহন পদ্ধতি দেখা যায়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত সংবহন (Blood Circulation in Vertebrate Animals): সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের মৌলিক গঠন প্রায়ই একই ধরনের। সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড বক্ষঃগহ্বরের অঙ্কীয়দেশে বক্ষপিঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত। ইহা পেরিকার্ডিয়াম (Pericardium) নামক একটি পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত। হৃৎপিণ্ড অলিন্দ ও নিলয় লইয়া গঠিত। দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে রক্ত শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের অলিন্দে (Auricle or Atrium) প্রবেশ করে। ইহার পর রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করে এবং নিলয় (Ventricle) হইতে রক্ত ধমনীর মাধ্যমে দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয়। অলিন্দের প্রকোষ্ঠ পাতলা প্রাচীরযুক্ত এবং নিলয়ের প্রাচীর পেশীবহুল ও স্থূল।

অলিন্দ ও নিলয় এই দুইটি প্রকোষ্ঠ একটি ছিদ্র দ্বারা যুক্ত থাকে এবং এই ছিদ্রটিকে **অরিকিউলো-ভেন্ট্রিকিউলার ছিদ্র** (Auriculo-ventricular aperture) বলে। এই ছিদ্রপথে কপাটিকা (Valve) থাকে যাহা রক্তকে সর্বদা অলিন্দ হইতে নিলয়ে প্রবেশ করিতে সহায়তা করে কিন্তু রক্তকে নিলয় হইতে অলিন্দে প্রবেশ করিতে বাধাদান করে। ঠিক একইভাবে নিলয়ের যে অংশ হইতে মহাধমনী উত্থিত হয় সেই সংযোগস্থল
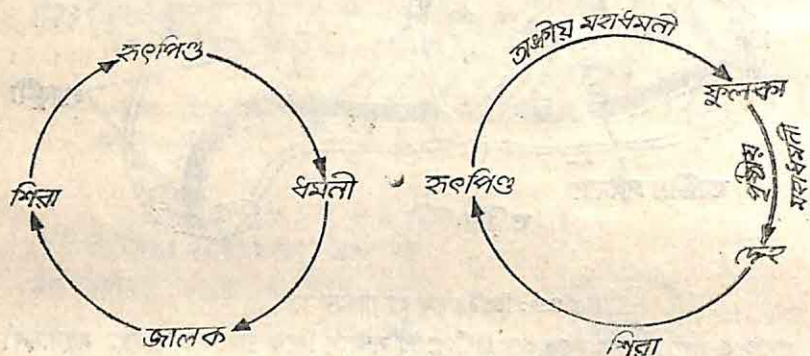
চিত্র 9.10 : (ক) মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত সংবহনের রূপরেখা ; (খ) একচক্রী রক্ত সংবহনের রূপরেখা

কপাটিকাযুক্ত হওয়ার ফলে রক্ত নিলয় হইতে মহাধমনীর দিকে প্রবাহিত হয় কিন্তু মহাধমনী হইতে রক্তকে নিলয়ে প্রবেশ করিতে দেয় না। সুতরাং রক্ত, শিরা→অলিন্দ→নিলয়→ধমনী এইরূপ পথে প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে দেহে রক্তপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে **সিস্টোল** (Systole) এবং প্রসারণকে **ডায়াস্টোল** (Diastole) বলে।

নিম্নে বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত সংবহন তন্ত্র আলোচনা করা হইল ঃ

1. **দ্বি-প্রকোষ্ঠ হৃৎপিণ্ড** (Two-chambered heart): **মাছ** : মাছের হৃৎপিণ্ড একটি অলিন্দ এবং একটি নিলয় লইয়া গঠিত। পৃষ্ঠদেশে একটি পাতলা প্রাকার বিশিষ্ট থলি থাকে, ইহাকে **সাইনাস ভেনোসাস** (Sinus venosus) বলে। সাইনাস ভেনোসাস সাইনু-অরিকিউলার নামক ছিদ্রের মাধ্যমে অলিন্দে উন্মুক্ত হয় দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত শিরার মাধ্যমে **সাইনাস ভেনোসাসে** প্রবেশ করে এবং তথা হইতে রক্ত অলিন্দে প্রবেশ করে। অলিন্দের সংকোচনের ফলে রক্ত অলিন্দ হইতে **নিলয়ে** যায়। নিলয় হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড-যুক্ত রক্ত বালবাস অ্যাওর্টা (Bulbus aorta)-র মাধ্যমে অঙ্কীয় মহাধমনীতে (Ventral aorta) প্রবাহিত হয়। ইহা হইতে রক্ত চারিজোড়া **অন্তর্বাহী ফুলকা ধমনী** (Afferent branchial arteries) দ্বারা ফুলকায় পৌঁছায়। ফুলকায় রক্ত পরিস্রুত হইবার পর অক্সিজেনযুক্ত রক্ত ফুলকা হইতে চারিজোড়া **বহির্বাহী ফুলকা**

ধমনীর (Efferent branchial arteries) মাধ্যমে পৃষ্ঠীয় মহাধমনীতে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে বিভিন্ন ধমনীর মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়। আবার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত শিরার মাধ্যমে সাইনাস ভেনোসাসে উন্মুক্ত হয়।
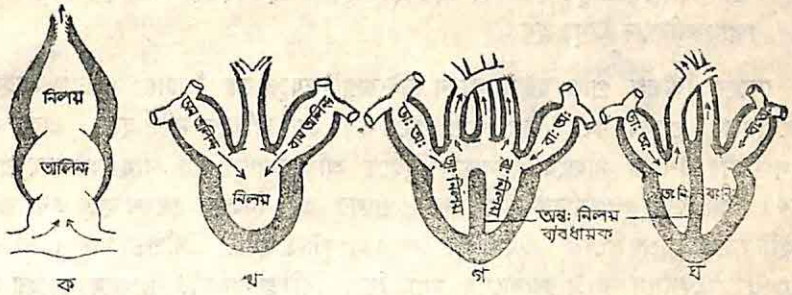
চিত্র 9.11 : বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের গঠন বৈচিত্র্য ; ক = মাছ, খ = উভচর, গ = সরীসৃপ, ঘ = পাখী ও স্তন্যপায়ী

মাছের ক্ষেত্রে রক্ত সংবহনকালে রক্ত হৃৎপিণ্ডে একবার মাত্র প্রবেশ করে বলিয়া এই ধরনের হৃৎপিণ্ডকে একচক্রী হৃৎপিণ্ড (Single-circuit heart) বলে এবং এই প্রকার সংবহনকে একচক্রী সংবহন বলে। আবার, মাছের হৃৎপিণ্ডের সমস্ত প্রকোষ্ঠের মাধ্যমে সর্বদা কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে **ভেনাস হৃৎপিণ্ড** (Venous heart) বলে।
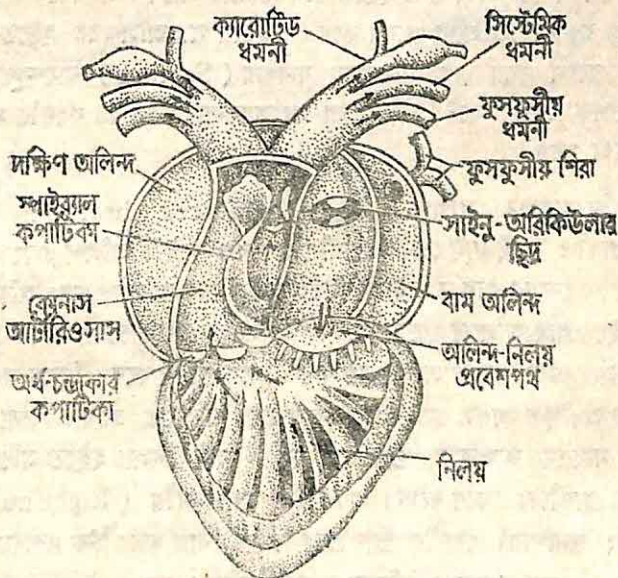
চিত্র 9.12 : কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ

2. **ত্রি-প্রকোষ্ঠ হৃৎপিণ্ড** (Three-chambered heart) : **উভচর প্রাণী** : উভচর প্রাণীর হৃৎপিণ্ড দুইটি অলিন্দ এবং একটি নিলয় লইয়া গঠিত। দুইটি অলিন্দের মধ্যে একটি ব্যবধায় থাকে, তাহাকে **আন্তর-অলিন্দ ব্যবধায়** (Inter-auricular septum) বলে। **সাইনাস** ভেনোসাস সাইনু-অরিকিউলার ছিদ্রের মাধ্যমে ডান অলিন্দে উন্মুক্ত হয় এবং ফুসফুস হইতে ফুসফুসীয় শিরা (Pulmonary vein) বাম অলিন্দে উন্মুক্ত হয়।

দেহের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত শিরার মাধ্যমে সাইনাস ভেনোসাসে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে রক্ত ডান অলিন্দে নীত হয়। একই সঙ্গে ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে ফুসফুস হইতে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। অলিন্দের সংকোচনের ফলে উভয় প্রকার রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করে এবং তথায় দুইটি রক্তের মিশ্রণ ঘটে। ইহার পর নিলয় সংকুচিত হইলে মিশ্রিত রক্ত (Mixed blood) কোনাস আর্টারিওসাসের মধ্য দিয়া বিভিন্ন ধমনীর মাধ্যমে দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয়।

3. **অসম্পূর্ণ চারি-প্রকোষ্ঠ হৃৎপিণ্ড** (Incomplete four-chambered heart) : **সরীসৃপ** : সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড দুইটি অলিন্দ এবং একটি অর্ধবিভক্ত নিলয় লইয়া গঠিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কুমীর জাতীয় প্রাণীদের নিলয় সম্পূর্ণভাবে বাম ও ডান নিলয়ে বিভক্ত।

দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত শিরার মাধ্যমে সাইনাস ভেনোসাসে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে ডান অলিন্দে আসে। অন্যদিকে ফুসফুস হইতে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। ইহার পর অলিন্দদ্বয় হইতে দুই ধরনের রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করে এবং নিলয়ের ব্যবধায় (Septum) অসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য রক্তের আংশিক মিশ্রণ ঘটে। নিলয়ের সংকোচনের ফলে রক্ত ধমনীর মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

4. **চারি-প্রকোষ্ঠ হৃৎপিণ্ড** (Four-chambered heart) : **পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী** : এই দুই শ্রেণীর প্রাণীর হৃৎপিণ্ড দুইটি অলিন্দ এবং দুইটি নিলয় লইয়া গঠিত। দেহের কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত ডান অলিন্দে এবং অক্সিজেনযুক্ত রক্ত ফুসফুস হইতে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। অলিন্দের সংকোচনের সময় ডান অলিন্দের রক্ত ডান নিলয়ে এবং বাম অলিন্দের রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। নিলয় সংকুচিত হইলে ডান নিলয়ে অবস্থিত কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত পরিস্রুত হইবার জন্য ফুসফুসীয় মহাধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবাহিত হয়। বাম নিলয় হইতে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত **পক্ষী** শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে **দক্ষিণ অ্যাওর্টিক মহাধমনীর** (Right aortic arch) মাধ্যমে এবং **স্তন্যপায়ী** শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে **বাম অ্যাওর্টিক মহাধমনীর** (Left aortic arch) মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয়।

উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের **দ্বি-চক্রী সংবহন** পরিলক্ষিত হয়। একটি চক্র হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনীর মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে
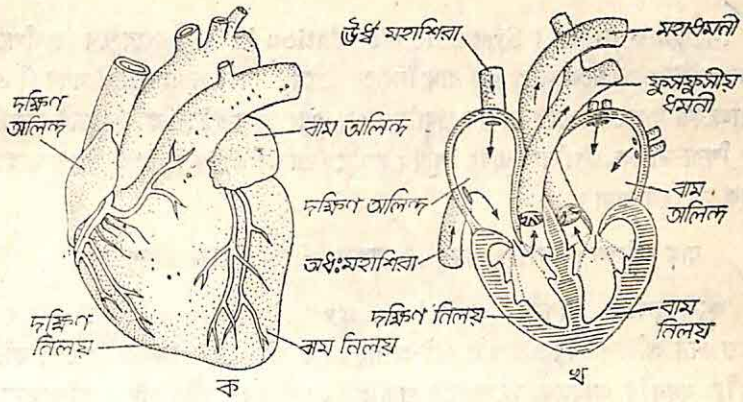
চিত্র 9.13 : ক = মানুষের হৃৎপিণ্ড, খ = হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ

এবং তথা হইতে শিরার মাধ্যমে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। অপর চক্রটি হৃৎপিণ্ড হইতে ফুসফুস এবং ফুসফুস হইতে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে আবর্তিত হয়। যে
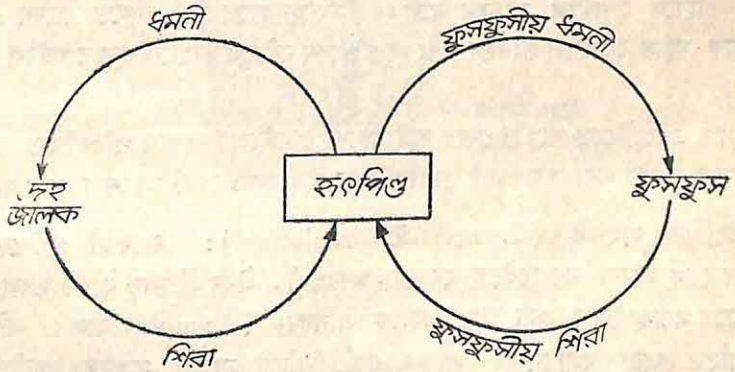
চিত্র 9.14 : দ্বি-চক্রী রক্ত সংবহনের রূপরেখা

হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া রক্ত চক্রাকারে দুইবার আবর্তিত হয় তাহাকে **দ্বি-চক্রী হৃৎপিণ্ড** (Double-circuit heart) বলে এবং এই ধরনের সংবহনকে **দ্বি-চক্রী সংবহন** বলে।

রক্ত সংবহনের প্রকারভেদ (Types of blood circulation) : প্রাণীদের রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া তিন প্রকার : যথা—**সিস্টেমিক সংবহন, ফুসফুসীয় সংবহন** এবং **পোর্টাল সংবহন**।

1. **সিস্টেমিক সংবহন** (Systemic circulation) : যে সংবহনে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দ হইতে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করিয়া ধমনী, উপধমনী এবং ধমনী-জালকের মাধ্যমে দেহের কোষে প্রবাহিত হয় এবং তথা হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড-যুক্ত রক্ত শিরা-জালক, উপশিরা এবং শিরার মাধ্যমে ডান অলিন্দে ফিরিয়া আসে তাহাকে **সিস্টেমিক সংবহন** বলে।

বাম অলিন্দ → নিলয় → ধমনী → জালক → শিরা → ডান অলিন্দ।

2. **ফুসফুসীয় সংবহন** (Pulmonary circulation) : যে সংবহনে হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত রক্ত ডান নিলয়ে প্রবেশ করিয়া ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবাহিত হয় এবং তথা হইতে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে বাম অলিন্দে ফিরিয়া আসে তাহাকে **ফুসফুসীয় সংবহন** বলে।

ডান অলিন্দ → নিলয় → ফুসফুসীয় ধমনী → ফুসফুস → ফুসফুসীয় শিরা → বাম অলিন্দ।

3. **পোর্টাল সংবহন** (Portal circulation) : যে সংবহনে শিরা (Vein) জালক হইতে উৎপন্ন হইয়া সরাসরি হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ না করিয়া যকৃতে বা বৃক্কে প্রবেশ করে তাহাকে **পোর্টাল** সংবহন বলে। সংবহনকালে রক্ত যকৃতে প্রবেশ করিলে তাহাকে **যকৃত পোর্টাল সংবহন** এবং বৃক্কে প্রবেশ করিলে তাহাকে **বৃক্ক পোর্টাল সংবহন** বলে।

মাছ এবং উভচর প্রাণীর ক্ষেত্রে দুই ধরনের পোর্টাল সংবহন পরিলক্ষিত হয় কিন্তু সরীসৃপ, পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে শুধু যকৃত পোর্টাল শিরা দেখা যায়।

লসিকা সংবহন (Lymphatic circulation) : মেরুদণ্ডী প্রাণিদেহে রক্ত জালক ভেদ করিয়া রক্ত হইতে যে স্বচ্ছ, ক্ষারধর্মী, ঈষৎ হরিদ্রাভ বর্ণের তরল পদার্থ কোষান্তর মধ্যস্থ স্থানে জমা হয় তাহাকে **লসিকা*** (Lymph) বলে। লসিকাকে পরিবর্তিত কলারস বলা চলে। লসিকা একটি নির্দিষ্ট নালীর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। রক্ত জালকের ন্যায় অসংখ্য সূক্ষ্ম লসিকা জালকের সমন্বয়ে লসিকা নালী গঠিত। লসিকা জালকের প্রাচীর এণ্ডোথেলিয়াম ও তন্তুময় যোগকলা দ্বারা গঠিত। লসিকা নালী পরস্পর মিলিত হইয়া বৃহদাকার লসিকা নালী সৃষ্টি করে। লসিকা নালী স্থানে স্থানে স্ফীত হইয়া লসিকা পর্ব (Lymph node) গঠন করে। লসিকা, লসিকা নালী,

---

* লসিকার উপাদান 4.38 পৃষ্ঠায় আছে।

লসিকা পর্ব এবং লসিকা জালকের সমন্বয়ে **লসিকা সংবহন** গঠিত। লসিকা নালীতে **কপাটিকা** (Valve) থাকায় লসিকা কেবলমাত্র একদিকে প্রবাহিত হয়।
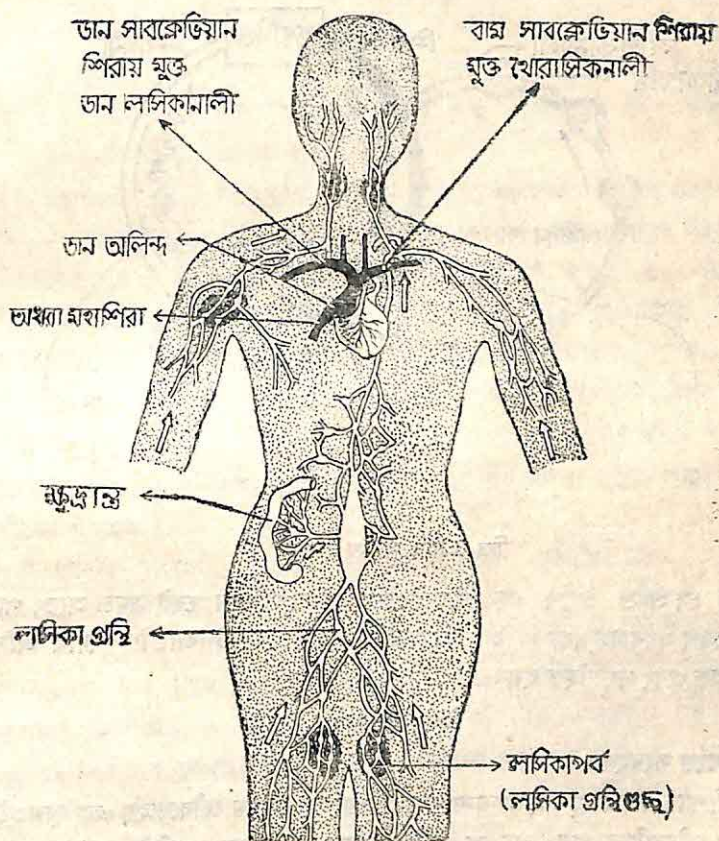
চিত্র 9.15 : মানুষের দেহে লসিকা সংবহন পদ্ধতি

দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে লসিকা বক্ষঃগহ্বরে অবস্থিত দুইটি প্রধান লসিকা নালীতে উন্মুক্ত হয়। দুইটি প্রধান লসিকা নালী হইল—**দক্ষিণ লসিকা নালী** (Right lymphatic duct) এবং **বক্ষ লসিকা নালী** (Thoracic duct)। দক্ষিণ লসিকা নালী দক্ষিণ সাবক্লেভিয়ান শিরা এবং বক্ষ লসিকা নালী বাম সাবক্লেভিয়ান শিরায় উন্মুক্ত হয় এবং শিরার মাধ্যমে লসিকা পুনরায় রক্তে ফিরিয়া আসে।

লসিকা নালী প্রধানত ত্বক, অধঃস্তবকীয় কলা, শ্বাসনালী, পাকস্থলী, অন্ত্র, জনন মূত্রনালী প্রভৃতির আস্তরণে (linings) অবস্থিত। অন্ত্রের ভিলাসে অবস্থিত লসিকা নালী দুগ্ধবাহ (Lacteals) নামে পরিচিত।
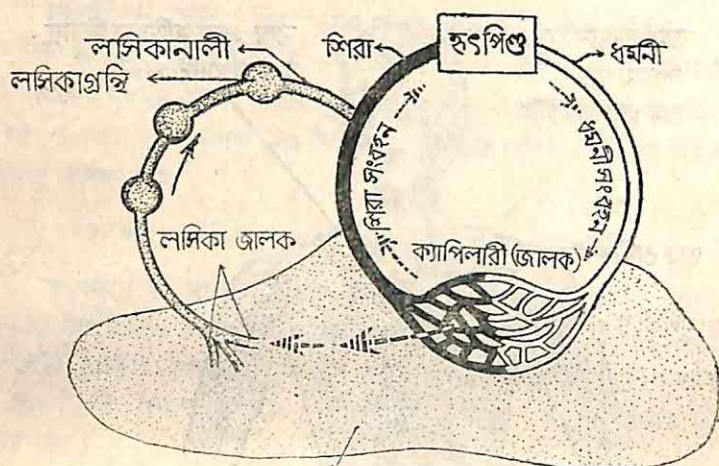
চিত্র 9.16 : লসিকা সংবহন

দেহের যে সমস্ত অংশে রক্ত পৌঁছাইতে পারে না লসিকা সেই সমস্ত অংশে পুষ্টি এবং অক্সিজেন সরবরাহ করে। লসিকা নালীর মাধ্যমে ফ্যাট জাতীয় পদার্থ লসিকা দ্বারা শোষিত এবং সংবাহিত হয়।

বিষয়-সংক্ষেপ

উদ্ভিদের সংবহন ঃ

যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু-সহ অন্যান্য পদার্থ তরলের মাধ্যমে জীবদেহের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিবাহিত হয় তাহাকে সংবহন বলে। জীবের পুষ্টি, শ্বসন, রেচন, হর্মোন, ভিটামিন ও উৎসেচকের স্থানান্তর ; রোগ প্রতিরোধ ; তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ; খাদ্যের সঞ্চয় প্রভৃতি কার্যে সংবহনের গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্ভিদ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের সংবহনের মাধ্যম জল এবং মানুষ-সহ উন্নত প্রাণীদের সংবহনের মাধ্যম হইল রক্ত ও লসিকা।

এককোষী ও নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের সংবহন অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় এবং উচ্চস্তরের উদ্ভিদের সংবহন জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলা নির্মিত শিরাত্মক কলাতন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। উদ্ভিদের সংবহন দুইটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়—জল সংবহন ও খাদ্যবস্তু সংবহন।

(i) **জল সংবহন** : যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের মূলরোম দ্বারা শোষিত জল ও জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ কাণ্ডের মধ্য দিয়া পাতায় পৌঁছায় তাহাকে রসের উৎস্রোত বলে।

রসের উৎস্রোত সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বিভিন্ন মতবাদ আছে। ইঁহাদের মধ্যে বিজ্ঞানী ডিক্সন ও জলির বাষ্পমোচন সংশক্তি টানবাদ উল্লেখযোগ্য। এই মতবাদ অনুযায়ী জল অণুগুলি পরস্পরের মধ্যে সমসংযোগজনিত বল এবং জল অণু ও জাইলেম বাহিকার মধ্যে অসমসংযোগজনিত বলের জন্য জলস্তম্ভ জাইলেম বাহিকার মধ্যে বুদ্বুদ্‌হীন অবিচ্ছিন্ন টানের অবস্থায় থাকে। উপর হইতে বাষ্পমোচনের ফলে জল নির্গমনে যে শূন্যতাজনিত টানের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে জল জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়া ঊর্ধ্বে পরিবাহিত হয়। ইহা ব্যতীত নিম্ন হইতে মূলজ চাপ ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপ জলস্তম্ভকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দিতে সাহায্য করে।

(2) **খাদ্যবস্তু সংবহন :** উদ্ভিদের পাতায় প্রস্তুত খাদ্যবস্তু বিভিন্ন কলা-কোষে ফ্লোয়েম কলার মাধ্যমে সংবাহিত হয়। উদ্ভিদের যে সকল অঙ্গে ফ্লোয়েম কলা নাই, সেইখানে খাদ্যবস্তুর সংবহন কোষান্তর অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞানী ডি-ভ্রিস (1885)-এর মতানুসারে মূল হইতে পাতা পর্যন্ত সকল ফ্লোয়েমের সীভনল প্লাসমোডেস্‌মাটা দ্বারা যুক্ত থাকে। যেহেতু সীভনলের সাইটোপ্লাজম সকল সময় আবর্তিত হইতে থাকে সেইহেতু এই আবর্তে খাদ্যবস্তু পড়িলে সীভনলের উপর হইতে নিচে অথবা নিচ হইতে উপরের দিকে পরিচালিত হয়। এমনকি একটি সীভনল হইতে অপর সীভনলে খাদ্যবস্তুর প্রবাহ প্লাসমোডেস্‌মাটার মাধ্যমে সম্পন্ন হইতে পারে।

প্রাণীদের সংবহন :

বিভিন্ন প্রাণীর সংবহন বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম, প্লাসমোডিয়াম প্রভৃতি এককোষী প্রাণীদের ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংবহন সম্পাদিত হয়। স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণীদের নালীতন্ত্র, হাইড্রার গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার তন্ত্র, তারামাছের জল সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে সংবহন সম্পন্ন হয়। উচ্চস্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে রক্ত সংবহন তন্ত্র দুই প্রকার—মুক্ত ও বদ্ধ রক্ত সংবহন। যখন রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তবাহের মাধ্যমে কিছুটা প্রবাহিত হইবার পর দেহগহ্বর বা হিমোসিলে মুক্ত হয় এবং তথা হইতে রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে তাহাকে মুক্ত রক্ত সংবহন বলে। অপরপক্ষে, রক্ত সর্বদা রক্তবাহের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হইলে তাহাকে বদ্ধ রক্ত সংবহন বলে। আরশোলা, চিংড়ি প্রভৃতি প্রাণীদের মুক্ত সংবহন এবং কেঁচো, জোঁক ও সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে বদ্ধ রক্ত সংবহন পদ্ধতি দেখা যায়।

রক্ত সংবহনে অংশগ্রহণকারী অঙ্গগুলি হইল—হৃৎপিণ্ড, ধমনী, শিরা এবং জালক। হৃৎপিণ্ড একটি মাংসল পাম্পিং যন্ত্র বিশেষ। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের গঠন সরল এবং পৌষ্টিক নালীর পৃষ্ঠীয় দেশে অবস্থিত। অপরপক্ষে, মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড জটিল এবং পৌষ্টিক নালীর অঙ্কীয় দেশে অবস্থিত। অলিন্দ এবং নিলয় নামক প্রকোষ্ঠ লইয়া হৃৎপিণ্ড গঠিত। মৎস্যের হৃৎপিণ্ডে একটি অলিন্দ ও একটি নিলয় ; উভচর প্রাণীদের দুইটি অলিন্দ ও একটি নিলয় ; সরীসৃপের দুইটি অলিন্দ এবং একটি অর্ধ-বিভক্ত নিলয় ; পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দুইটি অলিন্দ এবং দুইটি নিলয় বিদ্যমান। যে সমস্ত রক্তনালী হৃৎপিণ্ড হইতে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত লইয়া দেহের বিভিন্ন

অংশে পরিবাহিত করে তাহাদের ধমনী বলে। অপরপক্ষে, যে সকল রক্তনালী দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে অক্সিজেনবিহীন রক্ত হৃৎপিণ্ডে লইয়া আসে তাহাদের শিরা বলে। কিন্তু ফুসফুসীয় ধমনী অক্সিজেনবিহীন এবং ফুসফুসীয় শিরা অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে। ধমনীর শেষ প্রান্ত এবং শিরার উৎপত্তিস্থলে সূক্ষ্মতম রক্তবাহগুলি জালক নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, জালক এণ্ডোথেলিয়াম নামক একটি পাতলা স্তর দ্বারা গঠিত।

মৎস্যের রক্ত সংবহনকালে হৃৎপিণ্ডে রক্ত একবার প্রবেশ করে বলিয়া এই ধরনের সংবহনকে এক চক্রী রক্ত সংবহন বলে। অপরপক্ষে, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের রক্ত সংবহনকালে রক্ত হৃৎপিণ্ডে দুইবার প্রবেশ করে। এইজন্য এই প্রকার সংবহনকে দ্বি-চক্রী রক্ত সংবহন বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর সংবহন তিন প্রকার, যথা—সিস্টেমিক, ফুসফুসীয় এবং পোর্টাল সংবহন। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে রক্তের ন্যায় লসিকার মাধ্যমে বিভিন্ন পদার্থ দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে।

প্রশ্নাবলী

A. পার্থক্য লিখ :

(1) মুক্ত সংবহন ও বদ্ধ সংবহন।
(2) শিরা ও ধমনী।
(3) রক্ত ও লসিকা।
(4) এক-চক্রী ও দ্বি-চক্রী সংবহন।
(5) সিস্টেমিক শিরা ও পোর্টাল শিরা।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(1) রসের উৎস্রোত কাহাকে বলে?
(2) মূলজ চাপ কি?
(3) হিমোসিল ও হিমোলিম্ফ বলিতে কি বুঝ?
(4) ভেনাস হৃৎপিণ্ড কাহাকে বলে?
(5) হেপাটিক পোর্টাল শিরা ও রেনাল পোর্টাল শিরা কাহাকে বলে?
(6) সিস্টেমিক, ফুসফুসীয় ও করোনারী সংবহন কাহাকে বলে?
(7) হৃৎসঙ্কিকলা কাহাকে বলে?
(8) সিস্টোল ও ডায়াস্টোল বলিতে কি বুঝ?
(9) হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন কপাটিকার অবস্থান ও কাজ উল্লেখ কর।
(10) রক্তসংবহনে হৃৎপিণ্ডের গুরুত্ব কি?

C. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

(1) সংবহন কাহাকে বলে? জীবদেহে সংবহনের গুরুত্ব উল্লেখ কর।
(2) উদ্ভিদের জল সংবহন পদ্ধতির বিশদ বিবরণ দাও। জল সংবহনে যে সকল মতবাদ বিদ্যমান তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বীকৃত ও উল্লেখযোগ্য কোনটি?
(3) উদ্ভিদের খাদ্য সংবহনের পদ্ধতি উল্লেখ কর।
(4) এক-চক্রী ও দ্বি-চক্রী হৃৎপিণ্ডযুক্ত প্রাণীর রক্ত সংবহন বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায় | রেচন (Excretion)

জীবদেহে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার বিপাকীয় কার্য (Metabolism) চলিতে থাকে। গঠনমূলক বা উপচিতি (Anabolism) রূপ বিপাকীয় কার্যের ফলে একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় পদার্থ সংশ্লেষিত হয়, অন্যদিকে তেমনি ধ্বংসাত্মক বা অপচিতি (Catabolism) রূপ বিপাকীয় কার্যের ফলে এমন কতকগুলি উপজাত পদার্থ (By-products) সৃষ্টি হয় যাহা দেহের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক। এই সকল পদার্থ জীবদেহে ক্রমশ সঞ্চিত হইলে এবং নিয়মমাফিক অপসারিত না হইলে জীবকোষে বিষক্রিয়া শুরু হয়। ফলস্বরূপ, জীবদেহের মৃত্যু ঘটিতে পারে। বিপাকীয় ক্রিয়ায় সৃষ্ট দেহের পক্ষে ক্ষতিকর এই সকল পদার্থকে রেচন পদার্থ (Excretory products) বলে। রেচনে অংশগ্রহণকারীর অঙ্গকে রেচন অঙ্গ (Excretory organ) এবং যে তন্ত্রের মাধ্যমে রেচন পদার্থ বাহিরে নিষ্কাশিত হয় তাহাকে রেচনতন্ত্র (Excretory System) বলে।

যে পদ্ধতিতে জীবদেহে বিপাকীয় ক্রিয়ায় সৃষ্ট অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক বস্তুসমূহ দেহের বাহিরে অপসারিত হয় তাহাকে রেচন বলে।

উদ্ভিদের রেচন (Excretion in plants) :

উদ্ভিদের রেচন প্রক্রিয়া সহজ ও সরল হওয়ায় ইহাদের কোন রেচন অঙ্গ বা রেচনতন্ত্র নাই। ইহাদের রেচন পদার্থ তিন প্রকার—গ্যাসীয়, তরল ও কঠিন। ইহাদের মধ্যে গ্যাসীয় ও তরল পদার্থের রেচন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কঠিন পদার্থ অদ্রবণীয় পদার্থরূপে দেহের মধ্যে সঞ্চিত থাকে অথবা দেহ হইতে পাতা, ফল, বল্কল প্রভৃতি ত্যাগের মাধ্যমে দেহের বাহিরে অপসারিত হয়। উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে প্রধানত কার্বোহাইড্রেট ব্যবহার করে। কার্বোহাইড্রেট ভাঙ্গিয়া জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় যাহারা সহজে দেহ হইতে পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে অপসারিত হইতে পারে। কিন্তু এইভাবে সৃষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলকে উদ্ভিদ পুনরায় খাদ্য তৈয়ারীতে ব্যবহার করে। সুতরাং কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদের নিকট ক্ষতিকারক পদার্থের পরিবর্তে অমৃততুল্য। আবার প্রোটিন জাতীয় খাদ্যবস্তু ভাঙ্গিলে নাইট্রোজেন-ঘটিত ক্ষতিকারক রেচন পদার্থ বা বর্জ্য পদার্থের সৃষ্টি হয় যাহাদের দেহ হইতে অপসারণ একান্ত প্রয়োজনীয়। উদ্ভিদ এই সকল রেচন পদার্থকে কঠিন অদ্রবণীয় পদার্থরূপে দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত রাখে। নির্দিষ্ট রেচন অঙ্গ ও রেচনতন্ত্র ব্যতীত বর্জ্য পদার্থকে দেহে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সঞ্চিত করিয়া রাখা সরল রেচন পদ্ধতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। নিম্নে উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার রেচন পদ্ধতি আলোচনা করা হইল :

(1) বিপাকীয় ক্রিয়ায় সৃষ্ট জলকে উদ্ভিদ পত্ররন্ধ্র, লেণ্টিসেল অথবা হাইডাথোডের মাধ্যমে দেহ হইতে অপসারিত করে।

(2) রাত্রিবেলায় শ্বসনে পরিত্যক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে দেহের বাহিরে পরিত্যক্ত হয়।

(3) পত্র, ফল, বীজ প্রভৃতি চ্যুতির মাধ্যমে ঐ সকল অঙ্গে সঞ্চিত বর্জ্য পদার্থ দেহের বাহিরে পরিত্যক্ত হয়।

(4) বল্কল বা ছাল ত্যাগ দ্বারা সংশ্লিষ্ট অঙ্গে সঞ্চিত রেচন পদার্থ দেহের বাহিরে মুক্ত হয়।

(5) অনেক রেচন পদার্থ (সিস্টোলিথ, র‍্যাফাইড প্রভৃতি) অদ্রবণীয় ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় উদ্ভিদের কোষের মধ্যে অথবা কোষান্তর রন্ধ্রে আমৃত্যু সঞ্চিত থাকে কিন্তু দেহের কোন ক্ষতি হয় না।

(6) উপক্ষার, রজন, গঁদ, তরুক্ষীর প্রভৃতি রেচন পদার্থকে উদ্ভিদ বিশেষ বিশেষ অঙ্গে বা কোষে সঞ্চিত রাখে।

উদ্ভিদদেহে উৎপন্ন বিভিন্ন রেচন পদার্থ :

1. **উপক্ষার** (Alkaloid) : ইহা এক প্রকার নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ। প্রোটিন ভাঙিয়া এই প্রকার বর্জ্য পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইহা উদ্ভিদের বল্কল, কাণ্ড পাতা, মূল, বীজ প্রভৃতি অংশে সঞ্চিত থাকে। অধিকাংশ উপক্ষার বিষাক্ত এবং স্বাদে তিক্ত। এই উপক্ষার হইতে প্রয়োজনীয় ঔষধ তৈয়ারি করা হয়। উপক্ষার অ্যালকোহলে সহজ দ্রাব্য কিন্তু জলে দ্রবীভূত হয় না। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপক্ষার উল্লেখ করা হইল :

(i) **কুইনিন** (Quinine) : সিনকোনা (Cinchona) গাছের বল্কল হইতে কুইনিন প্রস্তুত করা হয়। ইহা ম্যালেরিয়া রোগের ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(ii) **মরফিন** (Morphin) : ইহা আফিং গাছের উপক্ষার।

(iii) **নিকোটিন** (Nicotin) : তামাক গাছের পাতা হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

(iv) **ক্যাফিন** (Caffein) : ইহা কফি গাছের বীজ হইতে প্রস্তুত হয়।

(v) **রেসারপিন** (Reserpine) : ইহা সর্পগন্ধা (*Rauwolfia serpentina*) নামক উদ্ভিদের উপক্ষার।

(vi) **ডেটুরিন** (Daturine) : ধুতরা গাছের ফল হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

ইহা ব্যতীত এফিড্রা গাছের উপক্ষার এফিড্রিন (Ephedrine), চা পাতার উপক্ষার থেইন (Thein) উল্লেখযোগ্য।

2. **গ্লুকোসাইড** (Glucosides) : কার্বোহাইড্রেট ভাঙ্গিয়া ইহার সৃষ্টি হয়। ইহা উপক্ষার সদৃশ হইলেও রাসায়নিক গঠনের দিক হইতে ভিন্ন। ইহা হইতে কতকগুলি ঔষধ যেমন **ডিজিটক্সিন** (Digitoxin), **ডিজিটালিস** (Digitalis) প্রস্তুত হয়।

3. **ট্যানিন** (Tannin) : ট্যানিন উদ্ভিদের কোষরসে ও কোষ প্রাচীরে সঞ্চিত থাকে। ইহা ব্যতীত উদ্ভিদের ফল, বীজ ও পাতায় প্রচুর পরিমাণে ইহার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

আমলকী, হরীতকী, পেয়ারা জাতীয় ফলে ; খয়ের গাছের কাষ্ঠল অংশে ; চা গাছের পাতায় ইহার আধিক্য দেখা যায়।

গরু, ছাগল, হরিণ প্রভৃতি প্রাণীর চামড়া ট্যান করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। নানাপ্রকার ঔষধ, কালি প্রস্তুত করিতে ট্যানিনের প্রয়োজন হয়।

4. **বান তৈল বা উদ্বায়ী তৈল** (Essential or Volatile oil) : অনেক উদ্ভিদের কান্ড, ফুল, ফল, পাতা প্রভৃতিতে অবস্থিত তৈল গ্রন্থি হইতে একপ্রকার সুগন্ধি উদ্বায়ী তৈল নিঃসৃত হয় যাহা বান তৈল নামে পরিচিত। ইউক্যালিপটাস, ভ্যালেরিনা, লেবু, তেজপাতা প্রভৃতি গাছের পাতায় প্রচুর পরিমাণে বান তৈল সঞ্চিত থাকে। দারুচিনি, কর্পূর গাছেও সুগন্ধি বান তৈল বিদ্যমান। এই সুগন্ধিযুক্ত বান তৈল পতঙ্গকে আকৃষ্ট করিয়া পরাগযোগে সহায়তা করে। ইহা হইতে সুগন্ধি সাবান, প্রসাধনী সামগ্রী তৈয়ারি হয়।

5. **রেজিন** (Resins) : ইহা একপ্রকার কঠিন ও ভঙ্গুর রেচন পদার্থ। উদ্ভিদ-দেহে বান তৈলের জারণের ফলে রেজিনের সৃষ্টি হয়। ইহা জলে অদ্রাব্য কিন্তু অ্যাল-কোহলে বা ইথারে সহজ দ্রাব্য। উদ্ভিদের কাণ্ডস্থিত রজন নালী হইতে ইহা নিঃসৃত হয়। কোন কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিঃসৃত হইবার সময় রেজিন রজন নালীস্থিত গঁদ বা বান তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। যখন গঁদের সহিত মিশ্রিত থাকে তখন ইহাকে **গঁদ-রজন** (Gum-resin) বলে। রজনের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হইল হিং। রেজিন বান তৈলের সহিত মিশ্রিত থাকিলে তাহাকে **ওলিও-রজন** (Oleo-resin) বলে। কানাডাবালসাম, তার্পিন প্রভৃতি ওলিও-রজনের উদাহরণ।
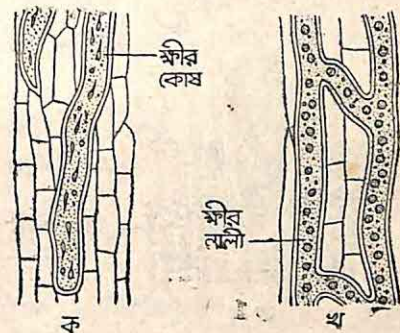
চিত্র 10.1 : তরুক্ষীর

6. **গঁদ** (Gum) : বাবলা, আম, সজিনা, আমড়া প্রভৃতি উদ্ভিদের সেলুলোজ-নির্মিত কোষপ্রাচীর বিনষ্ট হইলে গঁদের সৃষ্টি হয়। ইহা জলে দ্রবীভূত এবং আঠার কার্যে ব্যবহৃত হয়।

7. **তরুক্ষীর** (Latex) : উদ্ভিদের তরুক্ষীর নালী হইতে নিঃসৃত একপ্রকার তরল পদার্থকে তরুক্ষীর বলে। ইহা গঁদ, রজন, উপক্ষার ও প্রোটিনের সংমিশ্রণ। বট, কাঁঠাল, করবী, মনসা প্রভৃতি উদ্ভিদের তরুক্ষীর সাদা দুধের ন্যায় ; তামাক, কলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইহা জলের ন্যায় ; পেঁপে গাছের তরুক্ষীরে প্যাপাইন (Papine) নামক উৎসেচক থাকে যাহা প্রোটিন পাচনে সহায়তা করে ; হিভিয়া ব্রাজিলিয়েনসিস (*Hevea braziliensis*) নামক উদ্ভিদের তরুক্ষীর হইতে রবার উৎপন্ন হয়।

৪. **ধাতব কেলাস** (Mineral crystals) : অনেক উদ্ভিদকোষে বর্জ্য পদার্থ কেলাসিত অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ দ্বারা এই ধাতব কেলাস গঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে **ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, ক্যালসিয়াম অক্সালেট, সিলিকা** উল্লেখযোগ্য। রবার, বট প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতার ত্বকের কোষে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কেলাস আঙ্গুর ফলের ন্যায় গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। এই প্রকার কেলাসগুচ্ছকে **সিস্টোলিথ** (Cystolith) বলে এবং যে কোষের মধ্যে ইহা থাকে তাহাকে **লিথোসিস্ট** (Lithocyst) বলে।

কচু, ওল, কচুরিপানা প্রভৃতি উদ্ভিদের কোষে একগুচ্ছ সূচের ন্যায় ক্যালসিয়াম অক্সালেট কেলাসরূপে থাকে। ইহাদের **র‍্যাফাইড** (Raphides) বলে। কচুরিপানার পত্রবৃন্তে র‍্যাফাইডগুলি বড় তারকার ন্যায় দেখিতে হয়। ইহাদের **স্ফিরাফাইড** (Sphaeraphides) বলে।
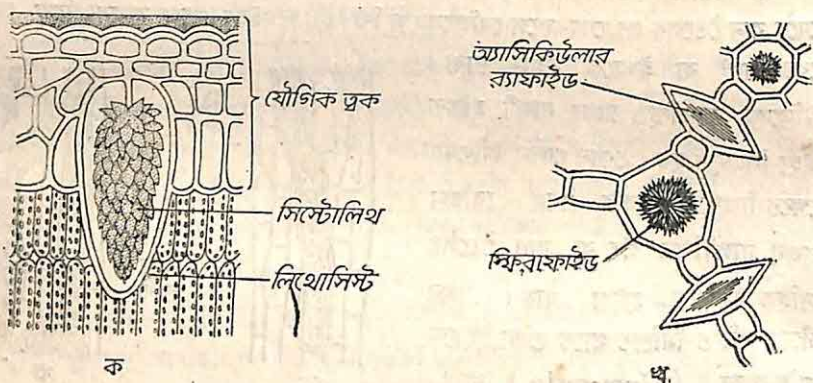
চিত্র 10.2 : উদ্ভিদের রেচন ; ক = সিস্টোলিথ, খ = র‍্যাফাইড

ইকুইজিটাম, বিভিন্ন ধরনের ঘাস প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতার কোষপ্রাচীরে সিলিকা নামক ধাতব কেলাস প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকে।

9. **জৈব অম্ল** (Organic acids) : অনেক উদ্ভিদের শ্বসনের সময় উপজাত বস্তুরূপে জৈব অম্লের সৃষ্টি হয় এবং কোষরসে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে বিষক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তেঁতুলে **টার্টারিক অ্যাসিড,** লেবুতে **সাইট্রিক অ্যাসিড,** আমরুলে **অক্সালিক অ্যাসিড,** আপেলে **ম্যালিক অ্যাসিড** ইত্যাদি।

প্রাণীদের রেচন (Excretion in animals) :

প্রাণিদেহে বিপাকের ফলে নানাবিধ বর্জ্য পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইহাদের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল এবং নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ অন্যতম। শ্বসনের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড সহজে দেহ হইতে নিষ্কাষিত হয়, জল বিভিন্ন প্রকারে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ প্রাণীদের নির্দিষ্ট রেচন অঙ্গের

মাধ্যমে অপসারিত হয়। নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থের মধ্যে অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি জৈব যৌগ উল্লেখযোগ্য। প্রাণিজগতে বিভিন্ন প্রকার রেচন অঙ্গ বর্তমান, ইহাদের মধ্যে আকৃতি ও গঠন ভিন্ন হইলেও কার্যাবলী প্রায় একই রকমের। উচ্চস্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেচন অঙ্গগুলি সম্মিলিতভাবে রেচন তন্ত্র গঠন করে। প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকার রেচন অঙ্গ নিম্নে আলোচনা করা হইল।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রেচন (Excretion in Invertebrates) :

1. **ব্যাপন প্রক্রিয়া (Diffusion) :** এককোষী, ছিদ্রাল, একনালীদেহী প্রাণীর বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থগুলি ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে সরাসরি জলে চলিয়া আসে।

2. **সংকোচনশীল গহ্বর (Contractile vacuole) : অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম** এবং অন্যান্য জলজ এককোষী প্রাণিদেহে এণ্ডোপ্লাজমে তরল পদার্থপূর্ণ একটি বৃহৎ গহ্বর বিদ্যমান। এই গহ্বরটিকে **সংকোচনশীল গহ্বর** বলে। সংকোচনশীল গহ্বর প্রথমে আকারে ছোট থাকে। ক্রমশ জল-সহ নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ গহ্বরে জমা হইতে থাকে। অবশেষে কোষ পর্দার নিকটে আসিয়া ফাটিয়া যায় এবং রেচন পদার্থ দেহের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়।

3. **ফ্লেম কোষ (Flame cell) : চ্যাপ্টাকৃমি, ফিতাকৃমি** প্রভৃতি প্রাণীদের বর্জ্য
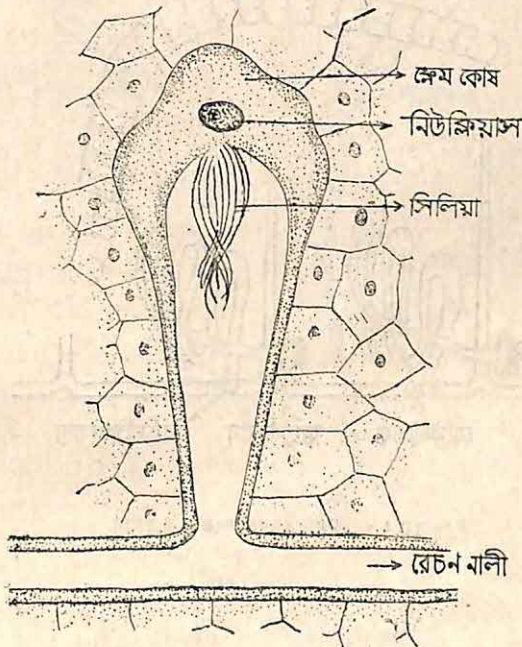
চিত্র 10.3 : চ্যাপ্টা কৃমির ফ্লেম কোষ

পদার্থ ফ্লেম কোষের মাধ্যমে দেহ থেকে অপসারিত হয়। ফ্লেম কোষগুলি সিলিয়াবিশিষ্ট

ও নিউক্লিয়াস সমন্বিত একটি বড় কোষ। ইহার মধ্যস্থল ফাঁপা। নিউক্লিয়াসের সন্নিহিত অঞ্চল হইতে একগুচ্ছ ফ্লাজেলা সৃষ্টি হইয়া কোষের ফানেলের ন্যায় অংশের মধ্যে প্রসারিত হয়। ফ্লেম কোষ দেহ হইতে তরল রেচন পদার্থ শোষণ করে এবং ফ্লাজেলার সঞ্চালনে রেচন নালীতে সংগৃহীত হয়। অবশেষে রেচন ছিদ্রপথে দেহের বাহিরে নিষ্কাশিত হয়। ফ্লেম কোষগুলিকে **আদিবৃক্ক** বা **প্রোটোনেফ্রিডিয়া** (Protonephridia)-ও বলা হয়।

4. **নেফ্রিডিয়া** (Nephridia) : কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি অঙ্গুরীমাল পর্বভুক্ত প্রাণী, অ্যাম্ফিঅক্সাস, শম্বুক জাতীয় প্রাণীদের দেহে একপ্রকার অসংখ্য প্যাঁচানো নালিকা দ্বারা বর্জ্য পদার্থসমূহ দেহ হইতে রেচিত হয়। এই প্যাঁচানো নালিকাগুলিকে **নেফ্রিডিয়া** বলে। প্রতিটি নেফ্রিডিয়ার মুক্ত প্রান্তটি সিলিয়াযুক্ত, ক্ষেত্রবিশেষে ইহা ফানেলের মত দেখিতে হয়। এই প্রান্তটিকে **নেফ্রোস্টোম** (Nephrostome) বলে। নেফ্রিডিয়ার অপর প্রান্তটি দেহপ্রাচীরের রেচন ছিদ্র দ্বারা বাহিরে উন্মুক্ত হয়। এই রেচন
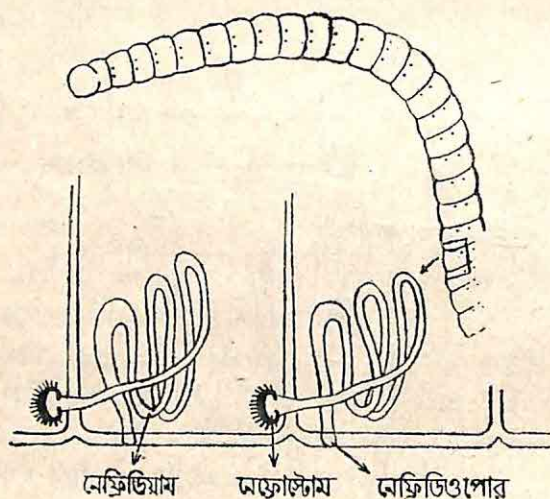
চিত্র 10.4 : কেঁচোর রেচন অঙ্গের অবস্থান

ছিদ্রটিকে **নেফ্রিডিওপোর** (Nephridiopore) বলে। নেফ্রোস্টোমে সিলিয়াগুলির সঞ্চালনের ফলে দেহগহ্বর হইতে তরল বর্জ্য পদার্থ সংগৃহীত হয় এবং ইহা নালী দ্বারা বাহিত হইয়া নেফ্রিডিওপোর দ্বারা দেহ হইতে নিষ্কাশিত হয়। প্রাণিদেহে

নেফ্রিডিয়ামের অবস্থান অনুযায়ী ইহা তিন প্রকার: যথা—**ত্বকীয় নেফ্রিডিয়া, সেপ্টাল নেফ্রিডিয়া** এবং **গলবিলীয় নেফ্রিডিয়া**।

5. **সবুজ গ্রন্থি** (Green gland) : চিংড়ি জাতীয় আর্থ্রোপোডা পর্বভুক্ত প্রাণীদের মস্তকের উভয় পার্শ্বে দ্বিতীয় শুঁড়ের গোড়ায় একটি করিয়া মোট দুইটি গ্রন্থি দেহের রেচন পদার্থ নিষ্কাশনে অংশগ্রহণ করে। এই গ্রন্থিদ্বয়কে **সবুজ গ্রন্থি** (Green gland) বলে। ইহা দ্বিতীয় শুঁড়ের গোড়ায় অবস্থিত বলিয়া ইহাকে শুঁড় সংলগ্ন গ্রন্থিও (Antennary gland) বলে। এই গ্রন্থিটি তিনটি অংশ লইয়া গঠিত : যথা—প্রান্তথলি (End sac), প্যাঁচানো ও শাখান্বিত ল্যাবাইরিন্থ (Labyrinth) এবং মূত্রথলি (Urinary bladder)। প্রান্তথলি রক্ত হইতে রেচন পদার্থ সংগ্রহ করিয়া মূত্রথলিতে সঞ্চিত করে। পরিশেষে, মূত্রনালীপথে রেচন ছিদ্রের মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ দেহ হইতে মুক্ত হয়।

চিংড়ির **দেহখোলক** বা **বহিঃকঙ্কালে** নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ সঞ্চিত থাকে
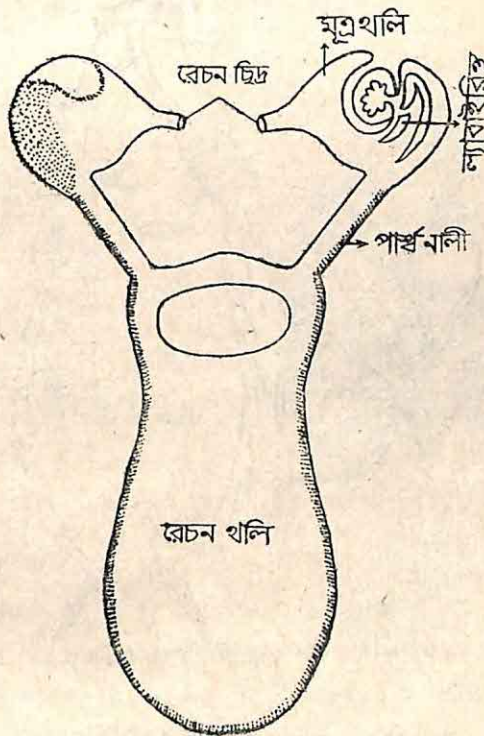
চিত্র 10.5 : চিংড়ির রেচন অঙ্গ

এবং খোলস ত্যাগের মাধ্যমে সঞ্চিত নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ দেহ হইতে অপসারিত হয়।

6. **ম্যালপিজিয়ান নালিকা (Malpighian tubules)** : আর্থ্রোপোডা পর্বের পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের পৌষ্টিক নালীর মধ্য ও পশ্চাৎ অন্ত্রের সংযোগস্থলে অসংখ্য সূক্ষ্ম পীতাভ নালিকা অবস্থিত। এই নালিকাগুলিকে **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** বলে। নালিকাগুলির মুক্ত প্রান্তটি দেহগহ্বরস্থ তরল পদার্থ বা রক্তে নিমজ্জিত থাকে এবং অপর প্রান্তটি পৌষ্টিক নালীর গহ্বরে উন্মুক্ত হয়। দেহগহ্বরস্থ তরল পদার্থ (haemocoelomic fluid) হইতে বিপাকজাত পদার্থসমূহ ম্যালপিজিয়ান নালিকা দ্বারা শোষিত হইয়া পৌষ্টিক নালীর গহ্বরে পরিত্যক্ত হয় এবং অবশেষে পায়ুছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাহিরে মুক্ত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রে মেদপুঞ্জ (Fat body) ইউরেট, ইউরিক অ্যাসিড রূপে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ সঞ্চয় করিয়া রেচনে অংশগ্রহণ করে। হৃৎপিণ্ডের নিকটে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে অবস্থিত নেফ্রোসাইট (Nephrocyte)
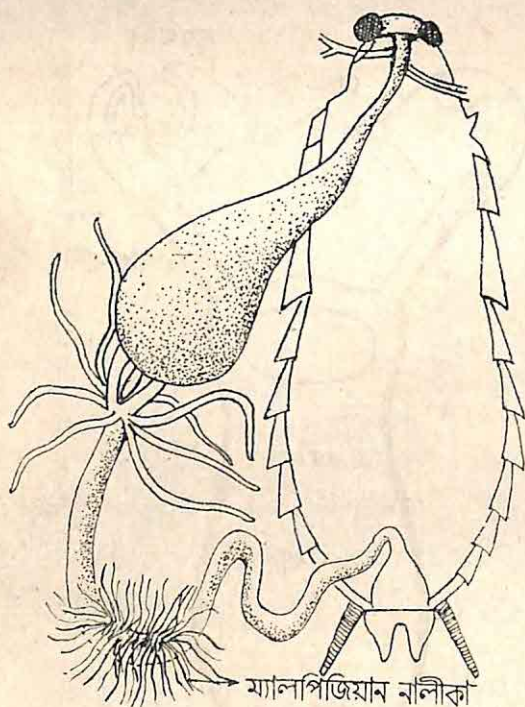
চিত্র 10.6 : আরশোলার ম্যালপিজিয়ান নালিকা

রেচন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। পতঙ্গের কৃত্তিকাবরণীতে (Cuticle) কাইটিন নামক রেচন পদার্থ সঞ্চিত থাকে যাহা খোলস ত্যাগের সময় দেহ হইতে অপসারিত হয়।

মনুষ্য-সহ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রেচন (Excretion in Vertebrates) :

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রধান রেচন অঙ্গ হইল বৃক্ক। বৃক্ক নালিকার উৎপত্তি অনুযায়ী বৃক্ক তিন প্রকার : যথা—**প্রোনেফ্রস** (Pronephros), **মেসোনেফ্রস** (Mesonephros) এবং **মেটানেফ্রস** (Metanephros)। নেফ্রনের উৎপত্তিস্থল প্রোনেফ্রসে বৃক্কের অগ্রভাগ, মেসোনেফ্রসে বৃক্কের মধ্যভাগ এবং মেটানেফ্রসে বৃক্কের পশ্চাদ্ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া যথাক্রমে প্রোনেফ্রিক নালী, মেসোনেফ্রিক নালী এবং মেটানেফ্রিক নালী গঠন করে। মাছের ক্ষেত্রে প্রোনেফ্রিক, উভচরের ক্ষেত্রে মেসোনেফ্রিক এবং সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে মেটানেফ্রিক বৃক্ক পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৃক্ক বিভিন্ন রকম : যথা—দীর্ঘাকার, গোলাকার, ডিম্বাকার, শীম বীজের মত দেখিতে হয়। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের উদরগহ্বরের পৃষ্ঠদেশে ও মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া মোট একজোড়া গাঢ় লাল বর্ণের খণ্ডায়িত বৃক্ক অবস্থিত। দেহের অধিকাংশ বর্জ্য পদার্থ বৃক্কের মাধ্যমে দেহ হইতে নির্গত হয়। দেহের সমস্ত রক্ত বৃক্ক ধমনীর মাধ্যমে বৃক্কে প্রবেশ করে এবং বৃক্কে রক্ত পরিস্রুত হইবার পর বৃক্ক শিরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়।
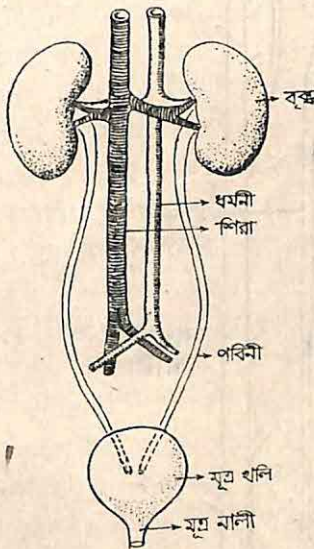
চিত্র 10.7 : মানুষের রেচনতন্ত্র
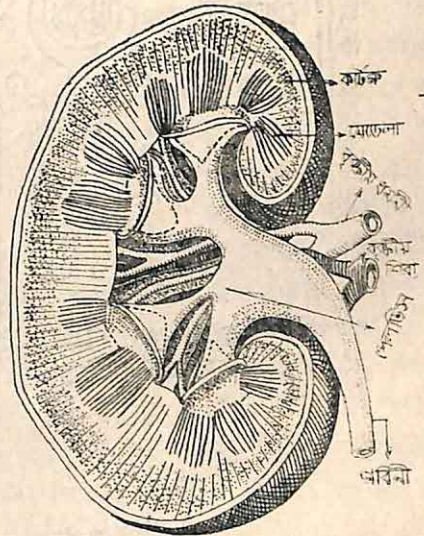
চিত্র 10.8 : বৃক্কের লম্বচ্ছেদ

বৃক্কের গঠন (Structure of Kidneys) : বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৃক্কের আকৃতি ও গঠন সামান্য ভিন্নরূপ হইলেও মৌলিক গঠন একই প্রকার। বৃক্ক লম্বচ্ছেদ করিলে প্রধান দুইটি স্তর দেখা যায়। বাহিরের স্তরটিকে **কর্টেক্স** (Cortex) এবং ভিতরের স্তরটিকে **মেডেলা** (Medulla) বলে। অসংখ্য ছোট ছোট বৃক্ক নালিকা লইয়া বৃক্ক গঠিত। বৃক্ক নালিকাগুলিকে **নেফ্রন** (Nephron) বলে। তাই

নেফ্রনকে বৃক্কের গঠনগত এবং কার্যগত একক বলে (Nephron is the structural and functional unit of kidneys)। প্রতিটি নেফ্রন দুইটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত : যথা—(1) ম্যালপিজিয়ান করপাস্‌ল্ এবং (2) বৃক্ক নালিকা।

1. **ম্যালপিজিয়ান করপাস্‌ল্** (Malpighian Corpuscle): ইহা নেফ্রনের অগ্রপ্রান্ত। ইহা **ব্যাওম্যান খ্যাত ক্যাপস্যুল** (Bowman's Capsule) এবং **গ্লোমেরিউলাস** (Glomerulus) লইয়া গঠিত। বাওম্যান বর্ণিত ক্যাপস্যুলটি বদ্ধ এবং দ্বি-স্তর বিশিষ্ট কাপের (Cup) ন্যায়। ইহার মধ্যাংশে একটি গহ্বর বিদ্যমান। এই গহ্বরে বৃক্ক ধমনীর **অন্তর্মুখী উপধমনী** (Afferent arteriole) সূক্ষ্ম রক্ত জালকে বিভক্ত হয়। উক্ত রক্ত জালকগুলি পুনর্মিলিত হইয়া বহির্মুখী উপধমনী (Efferent arteriole) সৃষ্টি করিয়া বাওম্যান খ্যাত ক্যাপস্যুল হইতে বাহির হইয়া যায়। বাওম্যান খ্যাত ক্যাপস্যুল মধ্যস্থ রক্ত জালককে একত্রে **গ্লোমেরিউলাস** বলে।
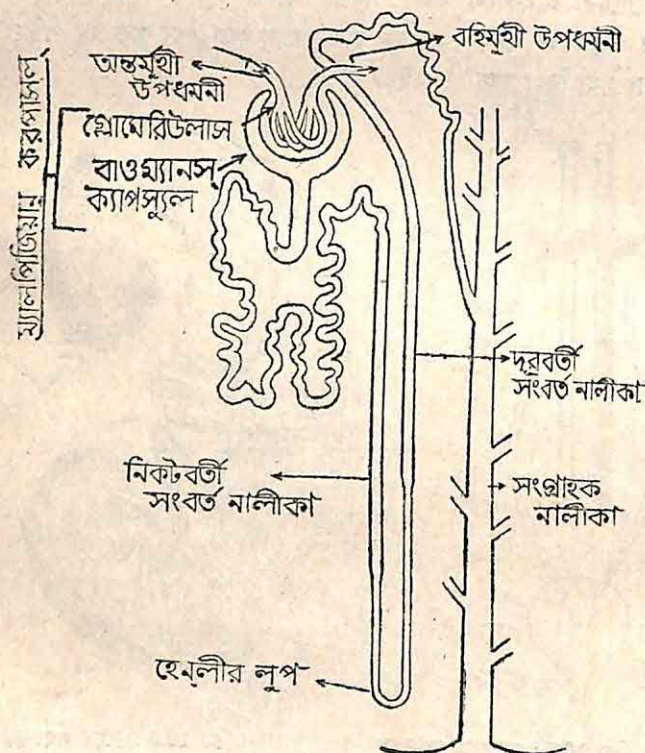
চিত্র 10.9 : একটি নেফ্রনের গঠন

2. **বৃক্ক নালিকা বা রিনাল টিউবিউল** (Renal tubule): বাওম্যান বর্ণিত ক্যাপস্যুলের পরবর্তী অংশ হইতে সংগ্রাহক নালিকা পর্যন্ত যে নালিকা বিস্তৃত তাহাকে **বৃক্ক নালিকা** বলে। মানুষের ক্ষেত্রে বৃক্ক নালিকা সুস্পষ্টভাবে তিনটি অংশে বিভক্ত : যথা—(i) প্রথম অংশ বা **নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা** (Proximal convoluted

tubule), (ii) মধ্যমাংশ ইংরাজী 'U' অক্ষরের ন্যায় **হেন্‌লী** খ্যাত **লুপ** (Henle's loop) এবং (iii) শেষ অংশ বা **দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা** (Distal convoluted tubule)। অবশেষে বৃক্ক নালিকা সংগ্রাহক নালিকার (Collecting tubules) সহিত যুক্ত হয়। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সংবর্ত নালিকাকে একত্রে বৃক্কীয় সংবর্ত নালিকা বা নালীকা বলা হয়।

উচ্চস্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বহির্মুখী উপধমনী (Efferent arteriole) গ্লোমেরিউলাস হইতে বাহির হইয়া বৃক্কীয় সংবর্ত নালিকার (Renal convoluted tubule) মধ্যে জালক গঠন করে। এই জালকগুলি বৃক্ক নালিকা হইতে দেহের প্রয়োজনীয় পদার্থ পুনঃশোষণে অংশগ্রহণ করে। পরিশেষে, জালকগুলি যুক্ত হইয়া বৃক্ক শিরা (Renal vein) গঠন করে।

মূত্র উৎপাদন (Urine formation): রক্ত বৃক্ক ধমনীর মধ্য দিয়া অন্তর্মুখী উপধমনীর মাধ্যমে গ্লোমেরিউলাসে প্রবেশ করে। অন্তর্মুখী উপধমনীর ব্যাস বহির্মুখী উপধমনী অপেক্ষা বেশি হওয়ায় রক্ত বেশিক্ষণ গ্লোমেরিউলাসে থাকিবার সুযোগ পায়। ফলে গ্লোমেরিউলাসে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। উচ্চ রক্তচাপের ফলে রক্ত হইতে জল, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, অ্যামাইনো অ্যাসিড, শর্করা, খনিজ লবণ প্রভৃতি পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে বাওম্যান খ্যাত ক্যাপস্যুলের প্রাচীর ভেদ করিয়া বৃক্ক নালিকার (Renal tubule) মধ্য দিয়া বাহিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরিস্রুত তরলের মধ্যে দেহের বহু প্রয়োজনীয় পদার্থ থাকে যাহা দেহ হইতে প্রতিদিন মূত্রের মাধ্যমে নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু দেহের সাম্যাবস্থা বজায় রাখিবার তাগিদে প্রয়োজনীয় পদার্থ বৃক্ক নালিকা দ্বারা পুনরায় শোষিত হইয়া রক্তে ফিরিয়া আসে। সুতরাং বৃক্ক নালিকার মধ্য দিয়া পরিস্রুত তরল পদার্থ পরিবহণের সময় শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড, খনিজ লবণ, উৎসেচক, ভিটামিন, লবণ, জল প্রভৃতি পদার্থ উহার কোষপ্রাচীর দ্বারা পুনঃশোষিত হইয়া জালকের রক্তে প্রবেশ করে। ইহার পর বৃক্ক শিরার মাধ্যমে দেহে বাহিত হয়। বৃক্ক নালিকা দ্বারা পুনঃশোষিত হইবার পর অবশিষ্ট তরল পদার্থ যাহা দেহের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক (ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিন, কিটোন বডি, আর্সেনিক, লেড প্রভৃতি) তাহা দূরবর্তী সংবর্ত নালিকাস্থিত ক্ষরিত পদার্থের (ফিনল রেড, পেনিসিলিন, হিপ্‌পিউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি) সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যে তরল পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহাকে **মূত্র** (Urine) বলে।

একটি প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ লোকের দেহে 24 ঘণ্টায় 170 লিটার তরল পদার্থ বাওম্যান খ্যাত ক্যাপস্যুলে পরিস্রুত হয়। কিন্তু 168·5 লিটার তরল পদার্থ বৃক্ক নালিকা দ্বারা পুনঃশোষিত হয় এবং প্রতিদিন 1,500 মিলিলিটার বা 1·5 লিটার তরল পদার্থ মূত্ররূপে দেহ হইতে নির্গত হয়।

মূত্র ত্যাগ (Micturition)—মৎস্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি বৃক্ক হইতে উৎপন্ন গবিনী অপর পার্শ্বের গবিনীর সহিত মিলিত হইয়া একটি সাধারণ নালী সৃষ্টি করে এবং মূত্রথলিতে উন্মুক্ত হয়। পরে মূত্রথলি হইতে একটি ছোট নালিপথে পায়ুর খাঁজে (Anal

depression) উন্মুক্ত হয়। মৎস্যের মূত্রে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থের মধ্যে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড উল্লেখযোগ্য। মূত্র গবিনী পথে বাহিত হইয়া সাময়িকভাবে মূত্রথলিতে জমা হয় এবং অবশেষে মূত্রছিদ্র দিয়া দেহ হইতে নিষ্কাশিত হয়। মৎস্যের রক্তে নাইট্রোজেনযুক্ত রেচন পদার্থ অ্যামোনিয়া ও ইউরিয়া রূপে ফুলকার মাধ্যমে অপসারিত হয়। ব্যাঙ, সরীসৃপ ও পাখীর মূত্র গবিনীর মধ্য দিয়া বাহিত হইয়া অবসারণীতে (cloaca) উন্মুক্ত হয় এবং পরিশেষে অবসারণী ছিদ্রপথে দেহের বাহিরে নির্গত হয়। ব্যাঙ ও কোন কোন সরীসৃপের অবসারণীর অঙ্কীয়দেশে একটি পাতলা মূত্রথলি অবস্থিত এবং ইহাতে মূত্র সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকিবার পর অবসারণী ছিদ্রপথে নির্গত হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে মূত্র গবিনী দ্বারা বাহিত হইয়া মূত্রথলিতে সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকিবার পর অবশেষে মূত্রনালী পথে দেহের বাহিরে মুক্ত হয়। সরীসৃপ ও পাখীর মূত্রে জলের পরিমাণ কম থাকে এবং ইউরিক অ্যাসিড থাকার ফলে সাদা অর্ধ-তরল রূপে মলের সহিত নিষ্কাশিত হয়।

মানুষের ক্ষেত্রে বৃক্ক হইতে উৎপন্ন মূত্র পেলভিসে আসে এবং গবিনীর মাধ্যমে বাহিত হইয়া মূত্রথলিতে (Urinary bladder) সঞ্চিত হয়। মূত্রথলিতে যখন 400 মিলিমিটার মূত্র জমা হয় তখন মূত্রথলির প্রাচীরের চাপে মূত্রনালীর নির্গমন মুখে অবস্থিত অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ পেশীবলয় উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং দেহ হইতে মূত্রত্যাগ ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

মনুষ্য-সহ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আনুষঙ্গিক রেচন অঙ্গ (Accessory Excretory Organs of Mammals including Man):

বৃক্ক ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা রেচন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার রেচন অঙ্গ এবং তাহাদের রেচন ক্রিয়া আলোচিত হইল :

1. **ত্বক** (Skin) : ত্বক রেচন অঙ্গ হিসাবে কার্য করে। ত্বকে অবস্থিত অসংখ্য স্বেদগ্রন্থি (Sweat gland) বা ঘর্মগ্রন্থি হইতে ঘর্মের মাধ্যমে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, জল, খনিজ লবণ প্রভৃতি দেহের বাহিরে নির্গত হয়।

2. **ফুসফুস** (Lungs) : শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জল ফুসফুস দ্বারা দেহের বাহিরে নির্গত হয়।

3. **ফুলকা** (Gills) : ফুলকাযুক্ত জলজ প্রাণীরা ফুলকার সাহায্যে রক্ত হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে নির্গত করে। সামুদ্রিক মাছের ক্ষেত্রে দেহের অতিরিক্ত লবণ ফুলকার মধ্য দিয়া জলে পরিত্যক্ত হয়।

4. **লালাগ্রন্থি** (Salivary gland) : লালাগ্রন্থির মাধ্যমে ইউরিয়া, আয়োডাইড, থায়োসায়ানেটস, অ্যালকালয়েড প্রভৃতি রেচন পদার্থ দেহ হইতে অপসারিত হয়

5. **যকৃত** (Liver) : যকৃতের কোষ অ্যামাইনো অ্যাসিডকে ভাঙিয়া ইউরিয়া উৎপন্ন করে এবং তাহা রক্তে প্রেরণ করিতে সহায়তা করে। পরে রক্ত হইতে বৃক্কের মাধ্যমে দেহ হইতে অপসারিত হয়। ইহা ব্যতীত যকৃত লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনকে

ভাঙিয়া বিলিরুবিন (Bilirubin) এবং বিলিভার্ডিন (Biliverdin) নামক পিত্ত রঞ্জক (Bile pigments) সৃষ্টি করে। ইহা পিত্তরসের মাধ্যমে অন্ত্রে নীত হয় এবং মলের সহিত দেহ হইতে নিষ্কাশিত হয়। কোলেস্টেরল (Cholesterol) নামক যৌগ যকৃতে সৃষ্টি হয় এবং অন্ত্রের মাধ্যমে মলের সহিত নির্গত হয়।

6. **অন্ত্র** (Intestine): অন্ত্রের অন্তঃগাত্রস্থিত আবরণী কোষগুলি ক্যালসিয়াম, লৌহঘটিত লবণ অন্ত্রের গহ্বরে পরিত্যক্ত করে যাহা মলের সহিত দেহের বাহিরে অপসারিত হয়।

7. **লবণ রেচন গ্রন্থি** (Salt excretory gland): সামুদ্রিক কচ্ছপের চক্ষু সংলগ্ন স্থানে এবং সামুদ্রিক পাখীর মস্তকে একপ্রকার ক্ষরণ গ্রন্থি বিদ্যমান যাহা দেহের অতিরিক্ত লবণ দেহ হইতে নিষ্কাশিত করে।

বিষয়-সংক্ষেপ

উদ্ভিদের রেচন :

যে পদ্ধতিতে জীবদেহের বিপাকীয় ক্রিয়ায় সৃষ্ট অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক বস্তুসমূহ দেহের বাহিরে অপসারিত হয় তাহাকে রেচন বলে। উদ্ভিদের কোন নির্দিষ্ট রেচন অঙ্গ বা তন্ত্র নাই। উদ্ভিদ প্রধানত কার্বোহাইড্রেটকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। সেইজন্য ইহাদের রেচন পদার্থ মূলত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল। আবার প্রোটিন জাতীয় খাদ্যবস্তু ভাঙ্গিলে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থের সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের রেচন পদার্থ পত্ররন্ধ্র, লেন্টিসেল অথবা হাইডাথোডের মাধ্যমে অপসারিত হয়। ইহা ব্যতীত পত্র, ফল, বীজের চ্যুতি বা বল্কল ত্যাগের মাধ্যমে রেচন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে রেচন পদার্থ অদ্রবণীয় এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সিস্টোলিথ, র‍্যাফাইড রূপে কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। উদ্ভিদের রেচন পদার্থগুলি হইল গঁদ, রজন, তরুক্ষীর, বান তৈল, ট্যানিন, গ্লুকোসাইড, ধাতব কেলাস, জৈব অম্ল প্রভৃতি।

প্রাণীদের রেচন :

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের রেচন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হয়। উচ্চস্তরের প্রাণীদের সুনির্দিষ্ট রেচন অঙ্গ বা রেচন তন্ত্র বিদ্যমান। অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম প্রভৃতির সংকোচনশীল গহ্বর ; চ্যাপ্টাকৃমি, ফিতাকৃমি প্রভৃতির ফ্লেম কোষ ; কেঁচো, জোঁক প্রভৃতির নেফ্রিডিয়া ; চিংড়ির সবুজ গ্রন্থি ; পতঙ্গজাতীয় প্রাণীদের ক্ষেত্রে ম্যালপিজিয়ান নালিকা ও সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৃক্ক রেচনে অংশগ্রহণ করে। ইহা ব্যতীত ত্বক, ফুলকা, ফুসফুস, লালাগ্রন্থি, যকৃত, অন্ত্র, লবণ রেচন গ্রন্থি রেচনে অংশগ্রহণ করে।

বৃক্কের গঠনগত ও কার্যগত একক হইল নেফ্রন। ইহা দুইটি অংশ লইয়া গঠিত—ম্যালপিজিয়ান করপাস্‌ল্ এবং বৃক্ক নালিকা বা রিনাল টিউবিউল। বাওম্যান ক্যাপস্যুল এবং গ্লোমেরিউলাস লইয়া ম্যালপিজিয়ান করপাস্‌ল্ গঠিত। রক্ত হইতে নাইট্রোজেন-ঘটিত বর্জ্য পদার্থ ম্যালপিজিয়ান করপাসলের মাধ্যমে পরিস্রুত হইয়া বৃক্ক নালিকায়

আসে এবং তথায় দেহের প্রয়োজনীয় পদার্থ পুনরায় শোষিত হইবার পর অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বৃক্কের পেলভিসে পৌঁছায় এবং মূত্ররূপে দেহের বাহিরে পরিত্যক্ত হয়। প্রাণীদের প্রধান রেচন পদার্থগুলি হইল কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি।

প্রশ্নাবলী

A. পার্থক্য লিখ :

1. উদ্ভিদের রেচন ও প্রাণীর রেচন।
2. ম্যালপিজিয়ান নালিকা ও ম্যালপিজিয়ান করপাস্‌ল্।
3. নেফ্রন ও নেফ্রিডিয়া।
4. র‍্যাফাইড ও সিস্টোলিথ।
5. রেচন ও ক্ষরণ।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

1. রেচন কাহাকে বলে?
2. রজন কি এবং ইহা কয় প্রকার?
3. তরুক্ষীর কাহাকে বলে?
4. উপক্ষার বলিতে কি বুঝ?
5. কর্পূর, তার্পিন, হিং, কুইনিন কি জাতীয় পদার্থ?
6. নিম্নলিখিত প্রাণীদের রেচন অঙ্গের নাম কর :

অ্যামিবা, চ্যাপ্টাকৃমি, ফিতাকৃমি, জোঁক, চিংড়ি, প্রজাপতি, মাকড়সা, শামুক, তারামাছ, অ্যাম্ফিঅক্সাস, মাছ, মানুষ।

7. রেচন ত্বকের ভূমিকা কি?
8. যকৃতের মাধ্যমে কিভাবে রেচন সম্পন্ন হয়?
9. নেফ্রন কাহাকে বলে?
10. প্রাণীদের রেচন পদার্থ প্রধানত কি কি?

C. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

1. উদ্ভিদ কিভাবে রেচন সম্পন্ন করে? উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার রেচন পদার্থের নাম কর।
2. উদ্ভিদের রেচন বস্তু কিভাবে মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয় তাহা উল্লেখ কর।
3. একটি নেফ্রনের গঠন বর্ণনা করিয়া মূত্র উৎপাদন ও নিষ্কাশন প্রণালীর বিবরণ দাও।

D. টীকা লিখ :

1. ম্যালপিজিয়ান নালিকা, 2. নেফ্রিডিয়া, 3. সবুজগ্রন্থি, 4. বৃক্ক।

একাদশ অধ্যায়	বৃদ্ধি (Growth)

বৃদ্ধি জীবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবদেহে প্রতিনিয়ত উপচিতি ও অপচিতিরূপ বিপাকীয় কার্য চলিতে থাকে। উপচিতি ও অপচিতির হার সমান হইলে জীবের বৃদ্ধি ঘটে না। আবার উপচিতি অপেক্ষা অপচিতি বেশি হইলে জীবদেহের ক্ষয় হইতে থাকে এবং অপচিতি অপেক্ষা উপচিতি বেশি হইলে জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে। বৃদ্ধির ফলস্বরূপ জীবের শুষ্ক ওজন* (Dry weight) বৃদ্ধি পায়।

জীবের আকার, আয়তন ও শুষ্ক ওজনের স্থায়ী পরিবর্তন বা বর্ধনকে বৃদ্ধি বলে।

বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ (Growth and Development): এককোষী জীবের বৃদ্ধি কোষের আয়তন বৃদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হয়, তবে বৃদ্ধির সীমা নির্দিষ্ট। বহুকোষী জীবের বৃদ্ধি কোষবিভাজন, কোষের বৃদ্ধি ও উক্ত কোষগুলি দ্বারা নূতন নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বৃদ্ধির যে পর্যায়ে জাইগোট হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত বহুকোষী জীবের সৃষ্টি হয় তাহাকে পরিস্ফুরণ বলে। জন্মের পর জীব বৃদ্ধির ফলে পূর্ণাঙ্গ বা পরিণত হইয়া প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে এবং জননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করিয়া অপত্য জীবের সৃষ্টি করে। পুনরায় অপত্য জীব বৃদ্ধি লাভ করিয়া পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়। সুতরাং বৃদ্ধি ও জনন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

বৃদ্ধির দশা (Phases of growth): জীবের বৃদ্ধি তিনটি দশার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

(1) **কোষ বিভাজন দশা (Phase of cell division)**—এই দশায় দেহকোষ ক্রমাগত মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া অসংখ্য অপত্যকোষ উৎপন্ন করে।

(2) **কোষ দীর্ঘিকরণ দশা (Phase of cell elongation)**—এই দশায় নবজাত কোষগুলি আয়তনে বৃদ্ধি লাভ করে।

(3) **কোষ পরিণতির দশা (Phase of cell maturation):** কোষগুলির বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইলে বিভিন্ন প্রকার কার্যের জন্য কোষগুলি রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হইয়া দলে বিভক্ত হয় এবং নানাপ্রকার কলা ও অঙ্গ-তন্ত্র সৃষ্টি করে।

বৃদ্ধির হার (Rate of growth)—কোন নির্দিষ্ট সময় ধরিয়া জীবদেহের বৃদ্ধির মাত্রাকে বৃদ্ধির হার বলে। জীবের বৃদ্ধি সারাজীবন সমহারে হয় না। সকল জীবের বৃদ্ধি প্রারম্ভে খুব কম হয় বা প্রায় হয়-ই না এবং এই অবস্থায় সকল জীব বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। বৃদ্ধির এই প্রারম্ভিক পর্বকে বিলম্ব কাল (Lag period) বলে।

---

* শুষ্ক ওজন—জীবদেহ হইতে জল অপসারণ করিলে যে ওজন পাওয়া যায় তাহাকে শুষ্ক ওজন বলে। সাধারণত জীবদেহকে 75°C উষ্ণতায় 24 ঘণ্টা রাখিবার পর এই ওজন পাওয়া যায়।

ঘটে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি দিনের বেলায় খুব কম হয়। ইহাদের বৃদ্ধি সাধারণত সন্ধ্যার সময় শুরু হয় এবং রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে ও ভোরবেলায় সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। প্রতি 24 ঘণ্টায় বৃদ্ধির এইরূপ পরিবর্তনকে দৈনিক বৃদ্ধির পরিবর্তন (Diurnal variation of growth) বলে। আবার শীতকালে উদ্ভিদের বৃদ্ধি খুব কম হয় এবং বসন্তকালে সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। ইহাকে বৃদ্ধির ঋতুগত পরিবর্তন (Seasonal variation of growth) বলে।

বৃদ্ধির প্রকৃতি (Nature of growth) : উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রকৃতি তিন প্রকার—

(i) **অঙ্গজ বা দৈহিক বৃদ্ধি (Vegetative or Somatic growth)**—উদ্ভিদের নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোট ক্রমাগত মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হইয়া ভ্রূণ গঠন করে। অনুকূল পরিবেশে বীজ মধ্যস্থ ভ্রূণ অঙ্কুরিত হয় এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া শিশু উদ্ভিদে পরিণত হয়। শিশু উদ্ভিদ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়। অধিকাংশ বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ড আজীবন অনির্দিষ্টভাবে বাড়িয়া চলে। এই ধরনের বৃদ্ধিকে অনির্দিষ্ট বৃদ্ধি (Indeterminate growth) বলে।

(ii) **জননগত বৃদ্ধি (Reproductive growth)**—শিশু উদ্ভিদ বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণতালাভ করিলে যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ পুষ্পমুকুল, ফুল ও ফল ধারণ করে। এই সকল জনন অঙ্গের আবির্ভাব ও উহাদের বৃদ্ধিকে জননগত বৃদ্ধি বলে। ইহাদের বৃদ্ধির সীমারেখা নির্দিষ্ট বলিয়া এই প্রকার বৃদ্ধিকে নির্দিষ্ট বৃদ্ধি (Determinate growth) বলে। উদ্ভিদের পাতায় ও অধিকাংশ প্রাণীর নির্দিষ্ট বৃদ্ধি দেখা যায়।

(iii) **ক্ষয়পূরণজাত বৃদ্ধি (Regenerative growth)**—উদ্ভিদদেহের কোন অংশে ক্ষত হইলে কোষবিভাজন দ্বারা বিনষ্ট অংশ পুনর্গঠিত হইতে পারে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে শুধু মূলতন্ত্র সজীব থাকিলে উদ্ভিদের অবশিষ্ট অংশ পুনর্গঠিত হইতে পারে। ফেলোজেন, ফেলোডার্ম প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

বৃদ্ধির পরিমাপ (Measurement of growth) : মূল ও কাণ্ডের বৃদ্ধি নানাভাবে পরিমাপ করা যায়।

(i) **সাধারণ স্কেলের সাহায্যে (With scale)**—যে কোন অঙ্কুরিত বীজ হইতে উৎপন্ন ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুলের রৈখিক বৃদ্ধি স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। যে কোন অঙ্গের প্রাথমিক দৈর্ঘ্য প্রথমে মাপ করিয়া নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুনরায় দৈর্ঘ্য মাপ করিলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির হার সহজে পরিমাপ করা যাইতে পারে।

চিত্র 11.2 : মূলের বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধির হার

(ii) আর্ক ইণ্ডিকেটারের সাহায্যে (With arc indicator)—আর্ক ইণ্ডিকেটার এমন একটি সরলতম যন্ত্র যাহার ত্রিভুজাকৃতি একটি কাঠের ফ্রেমের একদিকের আর্ক বরাবর একটি সাধারণ স্কেল আঁকা থাকে। অন্যদিকে দুই বাহুর মিলনস্থলে একটি ঘূর্ণায়মান চাকা বা পুলির সঙ্গে একটি নির্দেশক কাঁটা যুক্ত থাকে। স্কেলের উপর নির্দেশক কাঁটার অবস্থান বৃদ্ধির হার সূচিত করে। দ্রুত বর্ধিত একটি শিশু উদ্ভিদের আগায় সূতা বাঁধিয়া সূতাটি পুলির খাঁজের মধ্য দিয়া ঝুলাইয়া উহার প্রান্তে একটি ওজন বাঁধিয়া দেওয়া হয়। উদ্ভিদের কাণ্ড বৃদ্ধি পাইলে সূতার প্রান্তে ওজন থাকায় ঝুলিয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে পুলিসমেত নির্দেশক কাঁটাটি ঘুরিয়া যায়। পরীক্ষার প্রারম্ভে স্কেলের যেস্থানে কাঁটা থাকে, কয়েক ঘণ্টা পর কাঁটাটি সরিয়া নিচের দিকে নামিয়া যায়। নির্দেশক কাঁটার প্রথম ও শেষ অবস্থানের পার্থক্য নির্দিষ্ট সময়ে বৃদ্ধির হার সূচিত করে।

চিত্র 11.3 : আর্ক ইণ্ডিকেটার

স্কেল ও আর্ক ইণ্ডিকেটার ব্যতীত অক্সানোমিটার (Auxanometer) ও হোরাইজনটাল মাইক্রোস্কোপ (Horizontal microscope) সাহায্যে উদ্ভিদ অঙ্গের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি সহজে পরিমাপ করা যাইতে পারে।

প্রাণীর বৃদ্ধি

প্রাণিদেহের বৃদ্ধি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়িয়া হয়। উদ্ভিদের মত কোন নির্দিষ্ট কলা বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা ব্যতীত প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে এবং দেহের সর্বাঙ্গে বৃদ্ধি প্রায় সমহারে সম্পন্ন হয়। কতিপয় সরীসৃপ ও মৎস্য ব্যতীত সকল প্রাণীর বৃদ্ধি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ আজীবন ধরিয়া চলে না। প্রাণিদেহের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব প্রাপ্তির পর নূতন নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোজন ঘটে না।

বৃদ্ধির দশা (Phases of growth) : বহুকোষী প্রাণীদের বৃদ্ধি পরিস্ফুরণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। পরিস্ফুরণ তিনটি দশায় বিভক্ত :

(i) **ভ্রূণের পরিস্ফুরণ (Embryonic development)**—যৌন জননের ফলে উৎপন্ন জাইগোট ক্রমবিভক্ত হইয়া যে ক্ষুদ্র অপত্যের সৃষ্টি হয় তাহাকে ভ্রূণ বলে। মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীদের ভ্রূণ ডিমের মধ্যে ও স্তন্যপায়ীদের মাতৃদেহের মধ্যে বৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে। ভ্রূণের বৃদ্ধি বা পরিস্ফুরণ জাইগোটের ক্রমাগত বিভাজন দ্বারা সূত্রপাত। জাইগোট বিভক্ত হইয়া একস্তরবিশিষ্ট ফাঁপা গোলক গঠন করে, তাহাকে ব্লাস্টুলা (Blastula) বলে। পরে ব্লাস্টুলা দ্বিস্তর অথবা ত্রিস্তর

যেমন বীজ অঙ্কুরোদগমের সময় জল শোষণ করে এবং প্রাণীর ভ্রূণের গ্যাস্ট্রুলা দশা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত হয়। বিলম্বকালের পর বৃদ্ধি দ্রুত ঘটে এবং এই হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং পরিশেষে বন্ধ হইয়া যায়। বৃদ্ধির শুরু হইতে বন্ধ হইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়কে মুখ্য বৃদ্ধিকাল (Grand period of growth) বলে। মুখ্য বৃদ্ধিকাল চারিটি দশায় বিভক্ত—

প্রস্তুতি পর্ব, বৃদ্ধি পর্ব, বৃদ্ধিহ্রাস পর্ব ও বিরতি পর্ব। যে কোন জীবের মুখ্য বৃদ্ধিকাল তথা বৃদ্ধির হার ও সময় লইয়া লেখচিত্র বা গ্রাফ অঙ্কন করিলে উহা ইংরেজী 'S'-এর ন্যায় দেখিতে হয়। ইহাকে বৃদ্ধির সিগময়েড কার্ভ (Sigmoid curve) বলে।
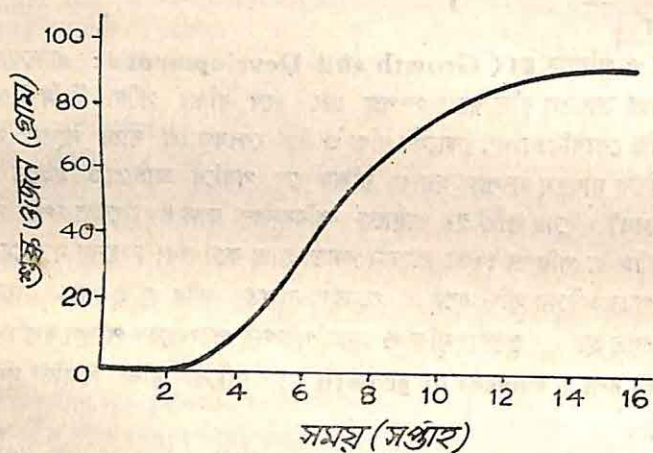
চিত্র 11.1 : সিগময়েড কার্ভ

বৃদ্ধির শর্ত (Factors affecting growth) : বৃদ্ধি কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বাহ্যিক ও কতকগুলি অভ্যন্তরীণ।

A. **বাহ্যিক শর্ত (External factors) :**

(i) **উষ্ণতা (Temperature)**—অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কার্যের ন্যায় বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট ও পরিমিত উষ্ণতার প্রয়োজন। 25°C হইতে 30°C উষ্ণতা জীবদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত।

(ii) **অক্সিজেন (O_2)**—বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি খাদ্যবস্তু হইতে আসে। তাই খাদ্যবস্তুকে ভাঙ্গিবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ আবশ্যক।

(iii) **কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)**—উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজন, কারণ কার্বন ডাই-অক্সাইড সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। প্রাণীর বৃদ্ধিতে CO_2-এর কোন ভূমিকা নাই।

(iv) **আলো (Light)**—সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে খাদ্য তৈয়ারি করিতে পারে। তাই পরিমিত আলোর অভাবে সালোকসংশ্লেষ

ব্যাহত হয় তথা স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে না। প্রাণীর বৃদ্ধির উপর সূর্যালোকের প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই।

(v) **ক্ষত (Abscission)**—জীবদেহের কোন অংশে ক্ষত হইলে সেই অংশের বৃদ্ধি অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশি হয়।

B. অভ্যন্তরীণ শর্ত (Internal factors) :

(i) **খাদ্য (Food)**—বৃদ্ধি তথা প্রোটোপ্লাজমের পুষ্টি বা প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তু সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যের সরবরাহ কম হইলে জীবদেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। প্রাণিদেহের বৃদ্ধিতে ভিটামিনের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বিদ্যমান।

(ii) **উৎসেচক (Enzyme)**—জীবের যে কোন বিপাকীয় ক্রিয়ার জন্য উৎসেচকের প্রয়োজন। বিপাকীয় ক্রিয়ার সামগ্রিক ফলস্বরূপ বৃদ্ধি হয় বলিয়া উৎসেচক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

(iii) **হর্মোন (Hormone)**—সুষম খাদ্য ও অন্যান্য শর্ত অনুকূল হইলেও বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার হর্মোনের প্রয়োজন। যেমন উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অক্সিন, জিববারেলিন, সাইটোকাইনিন প্রভৃতি হর্মোনের প্রয়োজন, তেমনি প্রাণীর বৃদ্ধির জন্য পিটুইটারী গ্রন্থি হইতে বৃদ্ধি হর্মোন, থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে থাইরক্সিন প্রভৃতি হর্মোন একান্ত প্রয়োজন।

(iv) **জল (Water)**—সকল প্রকার বিপাকীয় কার্যের জন্য জলের প্রয়োজন। এমনকি প্রোটোপ্লাজমের প্রধান উপাদান হইল জল। বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী তরল অবস্থায় শোষিত হয় বা ছড়াইয়া পড়ে। উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে জলের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি।

(v) **বংশগতি (Heredity)**—বংশগতির উপর জীবের বৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি

বহুকোষী উদ্ভিদের বৃদ্ধি ভাজক কলার বিভাজন, রূপান্তর ও পরিবর্তনের ফলে ঘটে। এইরূপ বৃদ্ধিকে প্রাথমিক বৃদ্ধি (Primary growth) বলে। আবার দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের গৌণ ভাজক কলা ক্যাম্বিয়াম বিভাজিত হইয়া মূল ও কাণ্ডের পরিধি বা প্রস্থে বৃদ্ধি ঘটায়। এইরূপ বৃদ্ধিকে গৌণ বৃদ্ধি (Secondary growth) বলে। ক্যাম্বিয়ামের বিভাজনের ফলে শাল, শিশু, আম, জাম প্রভৃতি দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে কতকগুলি গোলাকার দাগ দেখা যায়। এই দাগগুলি প্রতি বৎসর একটি করিয়া সৃষ্টি হয়। গোলাকার দাগগুলিকে বার্ষিক বলয় (Annual ring) বা বৃদ্ধি বলয় (Growth ring) বলে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি সকল অঙ্গে সমান হয় না এবং বিশেষ বিশেষ অঙ্গে আজীবন ধরিয়া চলিতে থাকে। উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে নূতন নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শাখা-প্রশাখার সংযোজন

ঘটে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি দিনের বেলায় খুব কম হয়। ইহাদের বৃদ্ধি সাধারণত সন্ধ্যার সময় শুরু হয় এবং রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে ও ভোরবেলায় সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। প্রতি 24 ঘণ্টায় বৃদ্ধির এইরূপ পরিবর্তনকে দৈনিক বৃদ্ধির পরিবর্তন (Diurnal variation of growth) বলে। আবার শীতকালে উদ্ভিদের বৃদ্ধি খুব কম হয় এবং বসন্তকালে সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। ইহাকে বৃদ্ধির ঋতুগত পরিবর্তন (Seasonal variation of growth) বলে।

বৃদ্ধির প্রকৃতি (Nature of growth) : উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রকৃতি তিন প্রকার—

(i) **অঙ্গজ বা দৈহিক বৃদ্ধি (Vegetative or Somatic growth)**—উদ্ভিদের নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোট ক্রমাগত মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হইয়া ভ্রূণ গঠন করে। অনুকূল পরিবেশে বীজ মধ্যস্থ ভ্রূণ অঙ্কুরিত হয় এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া শিশু উদ্ভিদে পরিণত হয়। শিশু উদ্ভিদ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়। অধিকাংশ বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ড আজীবন অনির্দিষ্টভাবে বাড়িয়া চলে। এই ধরনের বৃদ্ধিকে অনির্দিষ্ট বৃদ্ধি (Indeterminate growth) বলে।

(ii) **জননগত বৃদ্ধি (Reproductive growth)**—শিশু উদ্ভিদ বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণতালাভ করিলে যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ পুষ্পমুকুল, ফুল ও ফল ধারণ করে। এই সকল জনন অঙ্গের আবির্ভাব ও উহাদের বৃদ্ধিকে জননগত বৃদ্ধি বলে। ইহাদের বৃদ্ধির সীমারেখা নির্দিষ্ট বলিয়া এই প্রকার বৃদ্ধিকে নির্দিষ্ট বৃদ্ধি (Determinate growth) বলে। উদ্ভিদের পাতায় ও অধিকাংশ প্রাণীর নির্দিষ্ট বৃদ্ধি দেখা যায়।

(iii) **ক্ষয়পূরণজাত বৃদ্ধি (Regenerative growth)**—উদ্ভিদদেহের কোন অংশে ক্ষত হইলে কোষবিভাজন দ্বারা বিনষ্ট অংশ পুনর্গঠিত হইতে পারে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে শুধু মূলতন্ত্র সজীব থাকিলে উদ্ভিদের অবশিষ্ট অংশ পুনর্গঠিত হইতে পারে। ফেলোজেন, ফেলোডার্ম প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

বৃদ্ধির পরিমাপ (Measurement of growth) : মূল ও কাণ্ডের বৃদ্ধি নানাভাবে পরিমাপ করা যায়।

(i) **সাধারণ স্কেলের সাহায্যে (With scale)**—যে কোন অঙ্কুরিত বীজ হইতে উৎপন্ন ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুলের রৈখিক বৃদ্ধি স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। যে কোন অঙ্গের প্রাথমিক দৈর্ঘ্য প্রথমে মাপ করিয়া নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুনরায় দৈর্ঘ্য মাপ করিলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির হার সহজে পরিমাপ করা যাইতে পারে।

চিত্র 11.2 : মূলের বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধির হার

(ii) আর্ক ইণ্ডিকেটারের সাহায্যে (With arc indicator)—আর্ক ইণ্ডিকেটার এমন একটি সরলতম যন্ত্র যাহার ত্রিভুজাকৃতি একটি কাঠের ফ্রেমের একদিকের আর্ক বরাবর একটি সাধারণ স্কেল আঁকা থাকে। অন্যদিকে দুই বাহুর মিলনস্থলে একটি ঘূর্ণায়মান চাকা বা পুলির সঙ্গে একটি নির্দেশক কাঁটা যুক্ত থাকে। স্কেলের উপর নির্দেশক কাঁটার অবস্থান বৃদ্ধির হার সূচিত করে। দ্রুত বর্ধিত একটি শিশু উদ্ভিদের আগায় সূতা বাঁধিয়া সূতাটি পুলির খাঁজের মধ্য দিয়া ঝুলাইয়া উহার প্রান্তে একটি ওজন বাঁধিয়া দেওয়া হয়। উদ্ভিদের কাণ্ড বৃদ্ধি পাইলে সূতার প্রান্তে ওজন থাকায় ঝুলিয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে পুলিসমেত নির্দেশক কাঁটাটি ঘুরিয়া যায়। পরীক্ষার প্রারম্ভে স্কেলের যেস্থানে কাঁটা থাকে, কয়েক ঘণ্টা পর কাঁটাটি সরিয়া নিচের দিকে নামিয়া যায়। নির্দেশক কাঁটার প্রথম ও শেষ অবস্থানের পার্থক্য নির্দিষ্ট সময়ে বৃদ্ধির হার সূচিত করে।

চিত্র 11.3 : আর্ক ইণ্ডিকেটার

স্কেল ও আর্ক ইণ্ডিকেটার ব্যতীত অক্সানোমিটার (Auxanometer) ও হোরাইজনটাল মাইক্রোস্কোপ (Horizontal microscope) সাহায্যে উদ্ভিদ অঙ্গের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি সহজে পরিমাপ করা যাইতে পারে।

প্রাণীর বৃদ্ধি

প্রাণিদেহের বৃদ্ধি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়িয়া হয়। উদ্ভিদের মত কোন নির্দিষ্ট কলা বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা ব্যতীত প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে এবং দেহের সর্বাঙ্গে বৃদ্ধি প্রায় সমহারে সম্পন্ন হয়। কতিপয় সরীসৃপ ও মৎস্য ব্যতীত সকল প্রাণীর বৃদ্ধি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ আজীবন ধরিয়া চলে না। প্রাণিদেহের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব প্রাপ্তির পর নূতন নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোজন ঘটে না।

বৃদ্ধির দশা (Phases of growth) : বহুকোষী প্রাণীদের বৃদ্ধি পরিস্ফুরণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। পরিস্ফুরণ তিনটি দশায় বিভক্ত :

(i) **ভ্রূণের পরিস্ফুরণ (Embryonic development)**—যৌন জননের ফলে উৎপন্ন জাইগোট ক্রমবিভক্ত হইয়া যে ক্ষুদ্র অপত্যের সৃষ্টি হয় তাহাকে ভ্রূণ বলে। মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীদের ভ্রূণ ডিমের মধ্যে ও স্তন্যপায়ীদের মাতৃদেহের মধ্যে বৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে। ভ্রূণের বৃদ্ধি বা পরিস্ফুরণ জাইগোটের ক্রমাগত বিভাজন দ্বারা সূত্রপাত। জাইগোট বিভক্ত হইয়া একস্তরবিশিষ্ট ফাঁপা গোলক গঠন করে, তাহাকে ব্লাস্টুলা (Blastula) বলে। পরে ব্লাস্টুলা দ্বিস্তর অথবা ত্রিস্তর

যুক্ত গ্যাস্ট্রুলায় পরিণত হয়। পরে ঐ স্তরগুলি (এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এণ্ডোডার্ম) হইতে বিভিন্ন কলা, অঙ্গ ও তন্ত্র উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ প্রাণীর ভ্রূণ ডিমের মধ্যে
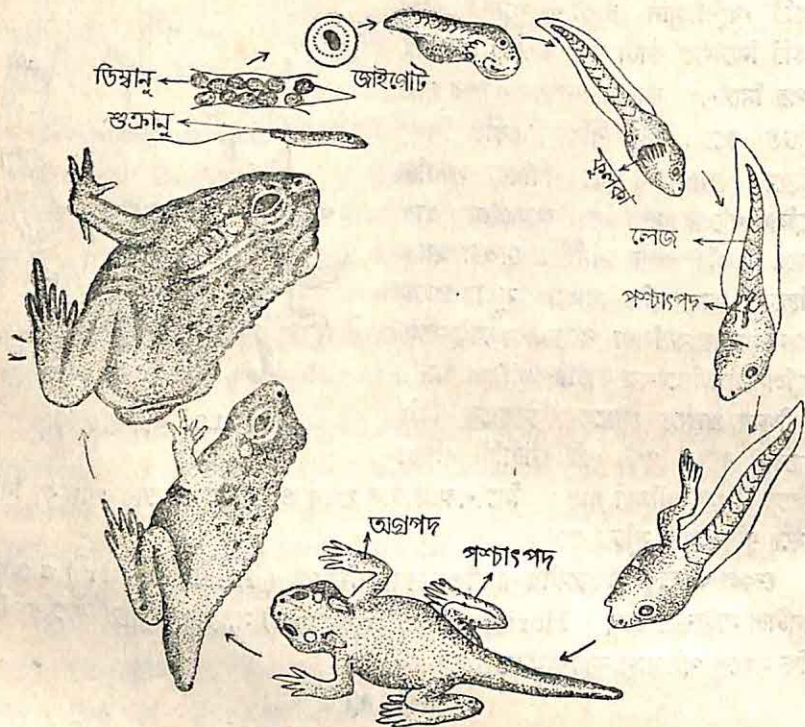
চিত্র 11.4 : ব্যাঙের পরোক্ষ ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুরণ

এবং স্তন্যপায়ীদের ভ্রূণ জরায়ুর মধ্যে বৃদ্ধিলাভ করে। জরায়ুর মধ্যে অবস্থিত ভ্রূণকে শিশু বা ফিটাস (Foetus) বলে।

(ii) ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুরণ (**Post-embryonic development**)—ভ্রূণের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইবার পর সরীসৃপ, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীদের ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয় এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীরা জরায়ু হইতে বাচ্চা প্রসব করে। এই সকল প্রাণীর বাচ্চা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও অবিকল পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মত দেখিতে হয়। যে পরিস্ফুরণে ভ্রূণ হইতে অবিকল পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর উদ্ভব হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ বলে। অপরপক্ষে ব্যাঙ এবং মৌমাছি, রেশমমথ, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীদের ডিম ফুটিয়া যে বাচ্চা বাহির হয় তাহাদের দেখিতে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মত নহে কিন্তু স্বাবলম্বী। পিতা-মাতার সহিত সাদৃশ্যবিহীন এইরূপ স্বাবলম্বী প্রাণীকে লার্ভা (Larva) বলে। লার্ভা পরে দ্রুত বৃদ্ধি ও রূপান্তরের মধ্য দিয়া পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। লার্ভার এইরূপ ক্রমাগত পরিবর্তনকে রূপান্তর (Metamorphosis) বলে। যে পরিস্ফুরণে ভ্রূণ

লার্ভার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় তাহাকে পরোক্ষ পরিস্ফুরণ (Indirect development) বলে। পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীদের পরিস্ফুরণ নিম্নলিখিত দশার মধ্য দিয়া সম্পন্ন হয় :

ডিম⇒লার্ভা⇒পিউপা⇒পূর্ণাঙ্গ।

(iii) **শিশু প্রাণীর বৃদ্ধি (Growth of the young animal)**—জন্মের পর শিশু প্রাণীর বৃদ্ধি চলিতে থাকে এবং পরিণত লাভ করিবার পর দেহের বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়।

পুনরুৎপাদন (Regeneration) : যে পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম কারণে বিনষ্ট দেহাংশ বা কর্তিত অংশ কোষ বিভাজনের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হয় তাহাকে
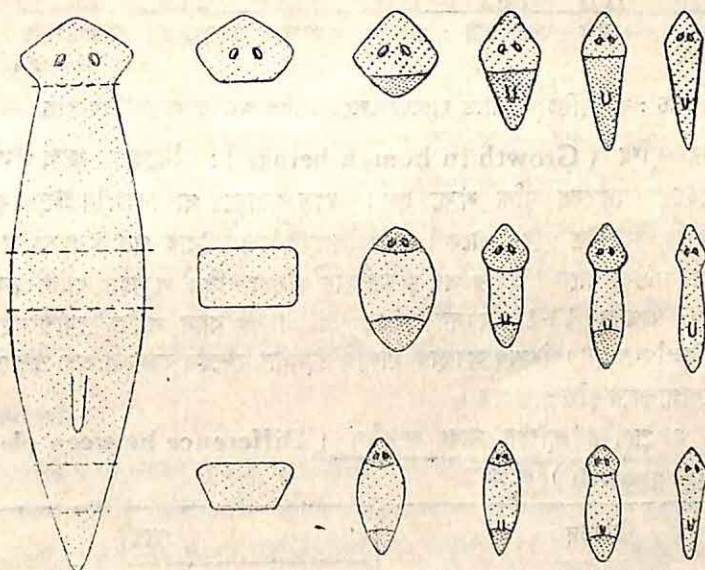
চিত্র 11.5 : প্লানেরিয়ার পুনরুৎপাদন

পুনরুৎপাদন বলে। অ্যামিবা, স্পঞ্জ, হাইড্রা, প্লানেরিয়া প্রভৃতি প্রাণিদেহের কোন অংশ বিনষ্ট হইলে কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে ঐ অঙ্গ পুনরায় নূতনভাবে সৃষ্টি হয়। হাইড্রা, প্লানেরিয়া প্রভৃতি প্রাণীদের খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলে বিচ্ছিন্ন প্রতিটি খণ্ড হইতে পুনরুৎপাদন পদ্ধতিতে নূতন জীব সৃষ্টি হয়। প্রাণীদের কোন বিশেষ অঙ্গের এইরূপ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পদ্ধতিকে অটোটোমি (Autotomy) বলে। কেঁচো, নেরিস প্রভৃতি প্রাণীদের এইরূপ পুনরুৎপাদন ক্ষমতা আছে। আবার টিকটিকির লেজ চাপিয়া ধরিলে লেজ খুলিয়া যায় এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গ অতি অল্প দিনের মধ্যেই পুনরায় গঠিত হয়। পুনরুৎপাদন ক্ষমতা কেবল নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের দেখা যায়। তবে নিম্নশ্রেণীর

প্রাণী-সহ উচ্চস্তরের (পক্ষী ও স্তন্যপায়ী) প্রাণীদের কলার পুনরুৎপাদন ক্ষমতা আছে। তাই আমাদের দেহের কোন অংশ কাটিয়া গেলে পুনরায় সেই স্থান জুড়িয়া যায়।
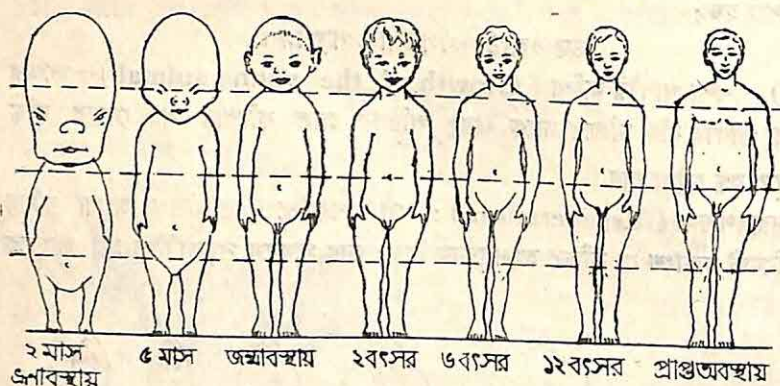
চিত্র 11.6 : বয়স বৃদ্ধির অনুপাতে মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশের আনুপাতিক বৃদ্ধি

মানুষের বৃদ্ধি (Growth in human beings) : নিষেকের ফলে উৎপন্ন জাইগোট হইতে মানুষের বৃদ্ধি শুরু হয়। মাতৃ জরায়ুতে থাকাকালীন দ্রূণের বৃদ্ধি অতি দ্রুত হারে সংঘটিত হইতে থাকে। মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর 3 বৎসর অবধি বৃদ্ধি দ্রুত হারে ঘটিয়া থাকে। ইহার পর বৃদ্ধির হার কমিয়া যায়। পুনরায় বয়ঃসন্ধিকাল (Puberty) অর্থাৎ 13-14 বৎসর হইতে 22 বৎসর বয়স পর্যন্ত সামগ্রিক হারে দ্রুত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। শৈশব অবস্থায় মাথার তুলনায় দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য (Difference between plant and animal growth)

উদ্ভিদ	প্রাণী
1. উদ্ভিদের বৃদ্ধি অসমঞ্জস অর্থাৎ বৃদ্ধি সকল অঙ্গে সমহারে ঘটে না।	1. প্রাণীর বৃদ্ধি সুসমঞ্জস অর্থাৎ বৃদ্ধি সকল অঙ্গে সমহারে ঘটে।
2. উদ্ভিদের বৃদ্ধি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চলিতে থাকে।	2. প্রাণীর বৃদ্ধি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত চলিতে থাকে।
3. উদ্ভিদের বৃদ্ধি ভাজক কলায় সীমাবদ্ধ।	3. প্রাণীর বৃদ্ধি সকল কলায় ঘটে।
4. উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে নূতন নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোজন ঘটে।	4. প্রাণীর পূর্ণাঙ্গ অবয়ব প্রাপ্তির পর নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোজন ঘটে না।
5. উদ্ভিদের নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট বৃদ্ধি দেখা যায়।	5. প্রাণীর কেবল নির্দিষ্ট বৃদ্ধি দেখা যায়।
6. অনেক উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধি ও বার্ষিক বলয় দেখা যায়।	6. প্রাণীর গৌণ বৃদ্ধি ও বার্ষিক বলয় দেখা যায় না।

বিষয়-সংক্ষেপ

জীবের আকার, আয়তন ও শুষ্ক ওজনের স্থায়ী পরিবর্তন বা বর্ধনকে বৃদ্ধি বলে। এককোষী জীবের বৃদ্ধি কোষের আয়তন বৃদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হয় কিন্তু বহুকোষী জীবের বৃদ্ধি কোষ বিভাজন, কোষের বৃদ্ধি ও উক্ত কোষগুলির দ্বারা নূতন নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। জীবের বৃদ্ধি তিনটি দশার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়—কোষ বিভাজন দশা, কোষ দীর্ঘিকরণ দশা ও কোষ পরিণতির দশা। সকল জীবের বৃদ্ধি প্রারম্ভে খুব কম হয় বা হয়ই না এবং ইহার পর বৃদ্ধি দ্রুত হারে ঘটিতে থাকে এবং পরিশেষে বন্ধ হইয়া যায়। বৃদ্ধির শুরু হইতে বন্ধ হইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়কে মুখ্য বৃদ্ধিকাল বলে। বৃদ্ধি কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল। শর্তগুলি হইল—উষ্ণতা, O_2, CO_2, আলো, ক্ষত, খাদ্য, উৎসেচক, হর্মোন, জল, বংশগতি প্রভৃতি।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি :

উদ্ভিদের প্রাথমিক বৃদ্ধি ভাজক কলার বিভাজন ও পরিবর্তন দ্বারা সম্পন্ন হয়। আবার দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের ক্যাম্বিয়াম বিভাজিত হইয়া মূল ও কাণ্ডের প্রস্থে বৃদ্ধি ঘটায়। এইরূপ বৃদ্ধিকে গৌণ বৃদ্ধি বলে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি সকল অঙ্গে সমান হয় না এবং আজীবন ধরিয়া চলিতে থাকে। উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে নূতন নূতন শাখা-প্রশাখার সংযোজন ঘটে। উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রকৃতি তিন প্রকার—অঙ্গজ বা দৈহিক বৃদ্ধি, জনন অঙ্গের বৃদ্ধি বা জননগত বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণজাত বৃদ্ধি। উদ্ভিদের বৃদ্ধি আর্ক ইণ্ডিকেটার, অক্সানোমিটার, হোরাইজনটাল মাইক্রোস্কোপ প্রভৃতির সাহায্যে করা যাইতে পারে।

প্রাণীদের বৃদ্ধি :

প্রাণীদের বৃদ্ধি দেহের সর্বাঙ্গে সমহারে সম্পন্ন হয়। কতিপয় মৎস্য ও সরীসৃপ ব্যতীত সকল প্রাণীর বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রাণীদের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব প্রাপ্তির পর নূতন নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোজন ঘটে না। বহুকোষী প্রাণীদের বৃদ্ধি পরিস্ফুরণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যে পরিস্ফুরণে ভ্রূণ হইতে উৎপন্ন প্রাণী দেখিতে অবিকল পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মত হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ বলে। সরীসৃপ, পক্ষী, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি প্রাণীদের এইরূপ পরিস্ফুরণ দেখা যায়। আবার যে পরিস্ফুরণে ভ্রূণ লার্ভার রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় তাহাকে পরোক্ষ পরিস্ফুরণ বলে। ব্যাঙ ও পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীদের এইরূপ পরিস্ফুরণ দেখা যায়।

প্রশ্নাবলী

A. পার্থক্য লিখ :

1. প্রাথমিক বৃদ্ধি ও গৌণ বৃদ্ধি।
2. নির্দিষ্ট বৃদ্ধি ও অনির্দিষ্ট বৃদ্ধি।
3. প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ ও পরোক্ষ পরিস্ফুরণ

4. ভ্রূণ ও লার্ভা।
5. উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও প্রাণীর বৃদ্ধি।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

1. বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ বলিতে কি বুঝ ?
2. বৃদ্ধি ও জননের সম্পর্ক কি ?
3. মুখ্য বৃদ্ধিকাল ও বিলম্বকাল কাহাকে বলে ?
4. সিগময়েড কার্ভ কি ?
5. রূপান্তর বলিতে কি বুঝ ?
6. অঙ্গজ বৃদ্ধি ও জননগত বৃদ্ধি কাহাকে বলে ?
7. পুনরুৎপাদন বলিতে কি বুঝ ?
8. ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুরণ কাহাকে বলে ?
9. উদ্ভিদের বৃদ্ধি কোন্ কলায় সীমাবদ্ধ ?
10. ব্লাষ্টুলা ও গ্যাষ্ট্রুলা কাহাকে বলে ?

C. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

1. উদ্ভিদের বৃদ্ধির বিশদ বিবরণ দাও।
2. বৃদ্ধির শর্তাবলী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

D. টীকা লিখ :

1. মুখ্য বৃদ্ধিকাল, 2. সিগময়েড কার্ভ, 3. গৌণ বৃদ্ধি, 4. পরোক্ষ পরিস্ফুরণ, 5. পুনরুৎপাদন।

দ্বাদশ অধ্যায় / চলন ও গমন (Movement and Locomotion)

জীবের সহজাত বৈশিষ্ট্যের বা জীবনীশক্তির অন্যতম বহিঃপ্রকাশই চলন। বাহ্যিক উত্তেজনায় সাড়া দিবার জন্য জীব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে অথবা প্রয়োজনে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে। **একই স্থানে থাকিয়া জীবদেহের যে কোন প্রকার নড়াচড়া বা অঙ্গ-সঞ্চালনকে চলন বলে। অপরপক্ষে, সমগ্র জীবদেহের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়াকে গমন বলে।** অর্থাৎ গমন মাত্রেই চলন কিন্তু সকল প্রকার চলন **গমন নয়।**

উচ্চস্তরের উদ্ভিদ মূল দ্বারা মাটির সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া গমন সম্পন্ন করিতে পারে না কিন্তু কয়েক প্রকার নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ (মিক্সোমাইসিটিস, স্লাইম ছত্রাক, ডায়াটোম, অসিলেটোরিয়া প্রভৃতি) গমন সম্পন্ন করিতে পারে। আবার অধিকাংশ প্রাণী গমন সম্পন্ন করিলেও কতিপয় নিম্নশ্রেণীর প্রাণী (স্পঞ্জ, ওবেলিয়া, সাগরকুসুম প্রভৃতি) গমন সম্পন্ন করিতে পারে না। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের চলন ও গমন উভয় প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হইলেও উদ্ভিদ ও প্রাণীর উক্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তাই উদ্ভিদ ও প্রাণীর চলন পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল।

চলন ও গমনের উদ্দেশ্য (Purpose of movement and locomotion) :

1. শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা।
2. গমনের মাধ্যমে প্রাণীরা খাদ্যসংগ্রহ করে।
3. নিরাপদ আশ্রয় ও প্রজননের নিমিত্ত চলন ও গমনের প্রয়োজন।
4. গমন দ্বারা জীব পরিবর্তিত পরিবেশে অভিযোজিত হইতে পারে।

উদ্ভিদের চলন (Movement in Plants)

উদ্ভিদের চলন প্রধানত দুইটি ভাগে বিভক্ত—সামগ্রিক চলন (Movement of locomotion) বা গমন এবং আংশিক চলন বা বক্রচলন (Movement of curvature)। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন উদ্ভিদকোষের কোষপ্রাচী দ্বারা আবদ্ধ প্রোটোপ্লাজমের প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। প্রোটোপ্লাজমের এই প্রবাহকে **আবর্তন** বা সাইক্লোসিস (Cyclosis) বলে। এই ধরনের চলন প্রোটোপ্লাজমীয় চলন (Protoplasmic movement) রূপে পরিচিত প্রোটোপ্লাজমের এইরূপ প্রবাহে উদ্দীপকের কোন ভূমিকা নাই এবং ইহার দ্বারা উদ্ভিদ অঙ্গের সঞ্চালন বা স্থানান্তর ঘটে না। তাই ইহাকে প্রকৃত চলন বলা যায় না।

আবর্তন বা সাইক্লোসিস দুই প্রকার :

(i) **আবর্ত (Rotation)**—এই ধরনের চলনে প্রোটোপ্লাজম একটি বড় কোষ-গহ্বরকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণাবর্ত অথবা বামাবর্ত প্রবাহ সৃষ্টি করে। তাই ইহাকে

একমুখী আবর্তন বলে। পাতা শেওলা, হাইড্রিলা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদকোষের প্রোটোপ্লাজমে এইরূপ চলন দেখা যায়।
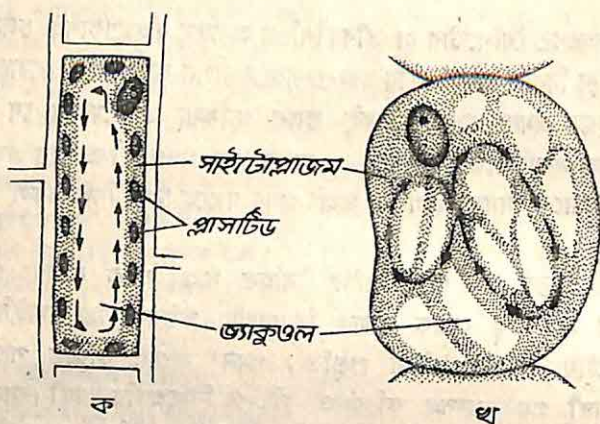
চিত্র 12.1 : সাইক্লোসিস : ক = আবর্ত, খ = সংবহন

(ii) সংবহন (Conduction/Circulation)—এই ধরনের চলনে প্রোটোপ্লাজম অনেকগুলি ছোট-বড় কোষগহ্বরকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। তাই ইহাকে বহুমুখী আবর্তন বলে। কুমড়ার কচিকাণ্ডের রোম, জটাকানশিরার পুংকেশরীয় রোমে এই ধরনের চলন দেখা যায়।

1. **সামগ্রিক চলন**—সামগ্রিক চলনে উদ্ভিদ স্থানান্তর গমন করে বা স্থান পরিবর্তন করে। এই ধরনের চলন কেবল নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে দেখা যায়। ইহা দুই প্রকার :

A. **স্বতঃস্ফূর্ত চলন (Autonomic movement)**—বাহ্যিক উদ্দীপক ব্যতীত প্রোটোপ্লাজমের সক্রিয়তায় চলনকে স্বতঃস্ফূর্ত চলন বলে। ইহা তিন প্রকার :

(i) **অ্যামিবয়েড চলন (Amoeboid movement)**—অ্যামিবার ন্যায় ক্ষণপদ বিস্তার করিয়া প্রোটোপ্লাজমের সাহায্যে চলনকে অ্যামিবয়েড চলন বলে। মিক্সোমাইসিটিস নামক নিম্নশ্রেণীর ছত্রাকে এই ধরনের চলন দেখা যায়।

(ii) **সিলিয়ারী চলন (Ciliary movement)**—উদ্ভিদদেহ হইতে সৃষ্ট সিলিয়া বা শুঙ্গের সাহায্যে চলনকে সিলিয়ারী চলন বলে। মস, ফার্ন প্রভৃতির শুক্রাণুতে এই ধরনের চলন দেখা যায়।

(iii) **ফ্লাজেলারী চলন (Flagellary movement)**—ক্ল্যামাইডোমোনাস, ভলভক্স প্রভৃতি শৈবালের ফ্লাজেলার সাহায্যে চলনকে ফ্লাজেলারী চলন বলে।

B. **আবিষ্ট চলন (Induced movement)**—এই প্রকার চলন আলো, জল, রাসায়নিক পদার্থ, তাপমাত্রা, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি বাহ্যিক উদ্দীপনার প্রভাবে সম্পন্ন হয়। উদ্দীপকের প্রকৃতি অনুযায়ী ইহা তিন প্রকার :

(i) ফোটোট্যাক্সিস (Phototaxis)—ব্যাকটিরিয়া বা শৈবালের স্বল্পালোকের দিকে চলন বা তীব্র আলো হইতে দূরে সরিয়া যাওয়াকে ফোটোট্যাক্সিস বলে।

(ii) হাইড্রোট্যাক্সিস (Hydrotaxis)—শৈবালের জলের দিকে চলনকে হাইড্রোট্যাক্সিস বলে।

(iii) কেমোট্যাক্সিস (Chemotaxis)—রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা প্রভাবিত চলনকে কেমোট্যাক্সিস বলে। যেমন মস জাতীয় উদ্ভিদের ডিম্বাণু কর্তৃক ম্যালিক অ্যাসিড নিঃসৃত হইলে শুক্রাণু ডিম্বাণুর দিকে অগ্রসর হয়।

(iv) থার্মোট্যাক্সিস (Thermotaxis)—তাপমাত্রার তারতম্যে শৈবালের দেহের উপযোগী তাপমাত্রার দিকে অগ্রসর হওয়াকে থার্মোট্যাক্সিস বলে।

(v) গ্যালভানোট্যাক্সিস (Galvanotaxis)—নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ বা শৈবালের বৈদ্যুতিক শক্তি বা বৈদ্যুতিক বিভব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চলনকে গ্যালভানোট্যাক্সিস বলে।

(vi) রিওট্যাক্সিস (Rheotaxis)—জলস্রোতের পার্থক্যের জন্য নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে যে চলন দেখা যায় তাহাকে রিওট্যাক্সিস বলে।

2. **বক্রচলন**—উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ মাটির সহিত দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকিলেও অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা চলন সম্পন্ন করে। ইহাকে বক্রচলন বলে। বক্রচলন দুই প্রকার— স্বতঃস্ফূর্ত চলন ও আবিষ্ট চলন।

A. **স্বতঃস্ফূর্ত চলন**—যখন উদ্ভিদ অঙ্গের বক্রচলন অভ্যন্তরীণ উদ্দীপক দ্বারা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সম্পন্ন হয় তাহাকে স্বতঃস্ফূর্ত চলন বলে। ইহা আবার দুই প্রকার —প্রকারণ চলন (Movement of variation) ও বৃদ্ধিজ চলন (Movement of growth)।

a. **প্রকারণ চলন :** উদ্ভিদের কোন বিশেষ অঙ্গের রসস্ফীতির হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ঐ অঙ্গের অবিরাম আন্দোলনকে প্রকারণ চলন বলে। রসস্ফীতির তারতম্যে এই ধরনের চলন সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহাকে রসস্ফীতি চলন (Turgor movement) বলে। যেমন, বনচাঁড়াল উদ্ভিদের (Indian telegraph plant বা Desmodium gyrans) ত্রিপত্রক যৌগপত্রের মধ্যবর্তী বৃহৎ পত্রকটি নিশ্চল থাকে, কিন্তু পার্শ্বীয় পত্রক দুইটি অবিরাম উপর-নিচে আন্দোলিত হইতে থাকে। আমরুলের পত্রকের ক্ষেত্রেও এইরূপ চলন পরিলক্ষিত হয়। প্রকারণ চলন কেবল দিনের বেলায় সম্পন্ন হয়
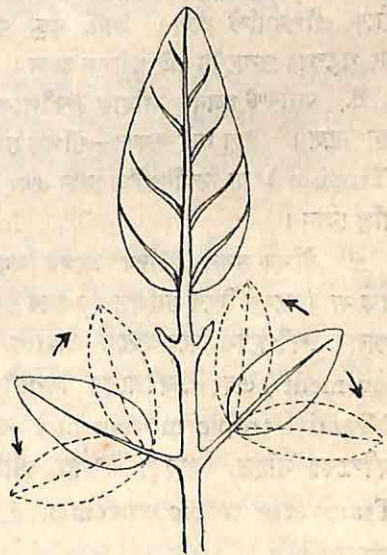
চিত্র 12.2 : প্রকারণ বক্রচলন

অর্থাৎ ইহা আলো প্রভাবিত। প্রকারণ চলনের সঙ্গে উদ্ভিদ অঙ্গের বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক নাই।

b. **বৃদ্ধিজ চলন** : উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গের বিভিন্ন পার্শ্বে অসম বৃদ্ধির জন্য যে বক্রচলন সম্পন্ন হয় তাহাকে বৃদ্ধিজ চলন বলে। ইহা চারি প্রকার

(i) **বলন (Nutation)**—যখন বর্ধনশীল অঙ্গের বৃদ্ধি পর্যায়ক্রমে এক পার্শ্বে বেশী ও অন্য পার্শ্বে কম হয় এবং পরের বার এক পার্শ্বে কম ও অন্য পার্শ্বে বেশী হয় অর্থাৎ অসম বৃদ্ধি সম্পন্ন হয় তখন তাহাকে বলন বলে। ইহার ফলে উদ্ভিদের অগ্রভাগ ডাইনে-বামে আঁকিয়া-বাঁকিয়া বৃদ্ধি পায়। বীরুৎ ও বল্লী জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ডের অগ্রভাগে এই ধরনের চলন দেখা যায়।

(ii) **পরিবলন (Circumnutation)**—কোন উদ্ভিদ অঙ্গের বৃদ্ধি ক্রমাগত একই দিকে সম্পন্ন হইলে তাহাকে পরিবলন বলে। এইরূপ বৃদ্ধিজ চলনে সংশ্লিষ্ট অঙ্গটি স্প্রিং-এর ন্যায় সর্পিলাকারে অগ্রসর হয়। কুমড়া, উচ্ছে, মটর প্রভৃতি উদ্ভিদের আকর্ষে এবং অপরাজিতা, শিম, খামালু ইত্যাদি উদ্ভিদের কাণ্ডে পরিবলন দেখা যায়।

(iii) **হাইপোন্যাস্টি (Hyponasty)**—উদ্ভিদের পাতার নিম্নত্বকের বৃদ্ধি ঊর্ধ্বত্বক বা উপরিপৃষ্ঠ অপেক্ষা দ্রুত হইলে পাতাটি প্রথম অবস্থায় গুটাইয়া থাকে বা কুণ্ডলীকৃত হয়। এইরূপ চলনকে হাইপোন্যাস্টি বলে। ফার্ন, কচু, কলা প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতায় এবং পুষ্পমুকুলের পুষ্পপত্রে এই ধরনের চলন দেখা যায়।

(iv) **এপিন্যাস্টি (Epinasty)**—হাইপোন্যাস্টির পরবর্তী পর্যায়ে পত্রের ঊর্ধ্বত্বকের বৃদ্ধি নিম্নত্বক অপেক্ষা দ্রুত হইলে পত্রফলক খুলিয়া সমান্তরাল হইয়া যায়। ইহাকে এপিন্যাস্টি বলে। ফার্ন, কচু, কলা প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতা খুলিয়া যাওয়া এবং পুষ্পের প্রস্ফুটন এই ধরনের চলন।

B. **আবিষ্ট চলন**—বাহ্যিক উদ্দীপকের প্রভাবে উদ্ভিদ অঙ্গের বক্র চলনকে আবিষ্ট চলন বলে। ইহা দুই প্রকার—ট্রপিক চলন (Tropic movement) বা ট্রপিজম (Tropism) বা দিগনির্ণীত চলন এবং ন্যাস্টিক চলন (Nastic movement) বা ব্যাপ্তি চলন।

a. **ট্রপিক চলন** : উদ্ভিদ অঙ্গের সঞ্চালনের গতিপথ যদি উদ্দীপকের গতিপথের দিকে বা উৎসের দিকে চালিত হয় তবে তাহাকে ট্রপিক চলন বলে। উদ্ভিদ অঙ্গের সঞ্চালন উদ্দীপকের দিকে হইলে তাহাকে অভিগ ট্রপিক চলন (Positive tropic movement) এবং উদ্দীপকের বিপরীত দিকে হইলে তাহাকে প্রতীপ ট্রপিক চলন (Negative tropic movement) বলে। আবার কোন উদ্ভিদ অঙ্গের সঞ্চালন উদ্দীপকের সহিত সমকোণ উৎপন্ন করিয়া চালিত হইলে তাহাকে তির্যক ট্রপিক চলন (Transverse tropic movement) বলে। উদ্দীপকের প্রকৃতি অনুযায়ী ইহা নিম্নপ্রকার

(i) **ফোটোট্রপিজম্ (Phototropism) বা আলোকবৃত্তি**—উদ্ভিদ অঙ্গের চলন আলোকের গতিপথ দ্বারা প্রভাবিত হইলে তাহাকে আলোকবৃত্তি বলে। উদ্ভিদের কাণ্ড

অভিগ আলোকবর্তী, মূল প্রতীপ আলোকবর্তী এবং পাতা তির্যক আলোকবর্তী অঙ্গ।

(ii) **জিওট্রপিজম্ (Geotropism) বা অভিকর্ষবৃত্তি**—উদ্ভিদ অঙ্গের চলন অভিকর্ষের গতিপথ বা অভিকর্ষ বল দ্বারা প্রভাবিত হইলে তাহাকে অভিকর্ষবৃত্তি বলে। উদ্ভিদের প্রধান মূল অভিগ অভিকর্ষী, কাণ্ড প্রতীপ অভিকর্ষী এবং পার্শ্বমূল ও শাখা তির্যক অভিকর্ষী অঙ্গ। উদ্ভিদের আলোকবৃত্তি ও অভিকর্ষবৃত্তি বা ট্রপিক চলন অক্সিন নামক হর্মোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিভাবে অক্সিন ট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রণ করে তাহার বিশদ বিবরণ হর্মোন অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(iii) **হাইড্রোট্রপিজম্ (Hydrotropism) বা জলবৃত্তি**—উদ্ভিদ অঙ্গের চলন জল দ্বারা প্রভাবিত হইলে তাহাকে জলবৃত্তি বলে। উদ্ভিদের মূল অভিগ জলবৃত্তি এবং কাণ্ড প্রতীপ জলবৃত্তি অঙ্গ।

(iv) **থিগমোট্রপিজম্ (Thigmotropism) বা স্পর্শবৃত্তি**—উদ্ভিদ অঙ্গের বক্রচলন কোন বস্তুর স্পর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইলে তাহাকে স্পর্শবৃত্তি বলে। বল্লী জাতীয় উদ্ভিদের কাণ্ড, আকর্ষ প্রভৃতি স্পর্শজনিত উদ্দীপনার প্রভাবে কোন অবলম্বনকে প্যাঁচাইয়া উপরে আরোহণ করে। তাই আকর্ষের অগ্রভাগ স্পর্শজনিত উদ্দীপনা না পাইলে উহার বৃদ্ধি দ্রুততর হয় না।

(v) **কেমোট্রপিজম্ (Chemotropism) বা রসায়নবৃত্তি**—ট্রপিক চলনের গতিপথ রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা প্রভাবিত হইলে তাহাকে রসায়নবৃত্তি বলে। যেমন ডিম্বক নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের আকর্ষণে গর্ভদণ্ডের মধ্য দিয়া পরাগ-নালিকা অগ্রসর হইতে থাকে।

b. **ন্যাস্টিক চলন**: যখন উদ্ভিদ অঙ্গের সঞ্চালন উদ্দীপকের গতিপথ দ্বারা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া উহার তীব্রতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাকে ন্যাস্টিক চলন বলে। উদ্দীপকের প্রকৃতি অনুযায়ী ন্যাস্টিক চলন বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। যেমন—

(i) **ফোটোন্যাস্টি (Photonasty) বা আলোকব্যাপ্তি**—যখন আলোকের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি উদ্ভিদ অঙ্গের সঞ্চালনকে প্রভাবিত করে তাহাকে ফোটোন্যাস্টি বলে। যেমন পদ্ম, সূর্যমুখী প্রভৃতি ফুল দিনের বেলায় প্রস্ফুটিত হয় এবং সূর্যাস্তের পর মুদ্রিত হয়। আবার সন্ধ্যামালতী, হাস্নুহানা, যূঁই, বেল প্রভৃতি ফুল সূর্যাস্তের পর প্রস্ফুটিত হয় এবং দিনের বেলায় মুদ্রিত হয়। তেঁতুল, আমরুল প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতা দিনের বেলায় খুলিয়া কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় বন্ধ হইয়া যায়।

(ii) **থার্মোন্যাস্টি (Thermonasty) বা তাপব্যাপ্তি**—তাপমাত্রার তারতম্যে উদ্ভিদ অঙ্গ সঞ্চালিত হইলে তাহাকে থার্মোন্যাস্টি বলে। শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের যৌগপত্র, টিউলিপ, শালুক প্রভৃতি ফুল স্বাভাবিক উষ্ণতায় বা তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে প্রস্ফুটিত হয় কিন্তু কম তাপমাত্রা বা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বন্ধ হইয়া যায়।

(iii) **কেমোন্যাস্টি (Chemonasty) বা রসায়নব্যাপ্তি**—রাসায়নিক পদার্থের তীব্রতার প্রভাবে উদ্ভিদ অঙ্গের সঞ্চালন ঘটিলে তাহাকে কেমোন্যাস্টি বলে। যেমন পতঙ্গ বা প্রোটিনের সংস্পর্শে সূর্যশিশিরের কর্ষিকাগুলি আসিবামাত্র ভিতরের দিকে বাঁকিয়া পতঙ্গকে আবদ্ধ করে। কর্ষিকার সঞ্চালন কঠিন বস্তু বা পতঙ্গের সংস্পর্শে হয় বলিয়া ইহাকে থিগমোন্যাস্টি (Thigmonasty) চলনও বলা হয়।

(iv) **নিক্‌টিন্যাস্টি (Nyctinasty) বা তাপ-আলোকব্যাপ্তি**—আলোক ও তাপমাত্রা উভয়ের প্রভাবে উদ্ভিদ অঙ্গের সঞ্চালন ঘটিলে তাহাকে নিক্‌টিন্যাস্টি বলে। বাবলা, সুষনি, আমরুল প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতা দিবালোকে উপযুক্ত তাপমাত্রায় খুলিয়া যায় কিন্তু রাত্রিবেলায় বন্ধ হইয়া যায়। রাত্রিবেলায় পাতাগুলি বন্ধ থাকে বলিয়া এই ধরনের চলনকে নিদ্রাচলন (Sleeping movement) বলে।

চিত্র 12.3 : ন্যাস্টিক চলন
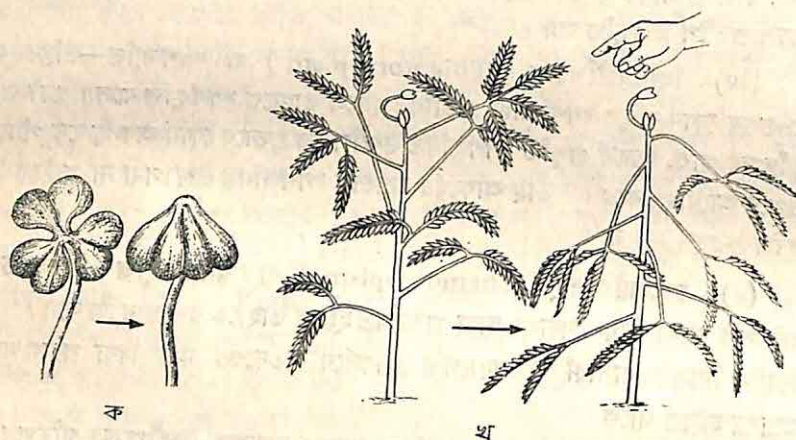
ক = আমরুলের ফোটোন্যাস্টি, খ = লজ্জাবতীর সিস্‌মোন্যাস্টি

(v) **সিস্‌মোন্যাস্টি (Seismonasty) বা স্পর্শব্যাপ্তি**—স্পর্শ বা আঘাত-জনিত উদ্দীপনার তীব্রতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চলনকে সিস্‌মোন্যাস্টি বলে। যেমন লজ্জাবতী (*Mimosa pudica*) উদ্ভিদের পাতাকে স্পর্শ করিলে পাতাগুলি মুড়িয়া যায়। কিন্তু কিভাবে লজ্জাবতী লতার পাতা বন্ধ হইয়া যায় ?

লজ্জাবতী উদ্ভিদের যৌগপত্র ও পত্রকের গোড়ায় ঈষৎ স্ফীত অঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের পালভিনি (Pulvini) বলে। প্রতিটি পালভিনাস পাতলা প্রাচীর ও কোষান্তর রন্ধ্রযুক্ত কতকগুলি কোষ দ্বারা গঠিত। উদ্দীপনার প্রভাবে পালভিনাসের নিম্নদিকের কোষগুলি হইতে জল সংলগ্ন কোষ ও কোষান্তর রন্ধ্রে চলিয়া যায়। ইহার ফলে কোষগুলির রসস্ফীতি চাপ কমিয়া চুপসাইয়া যায় এবং পাতাগুলি নুইয়া পড়ে। উদ্দীপনার প্রায় এক সেকেণ্ডের এক-দশমাংশ সময়ের মধ্যে লজ্জাবতীর পাতা মুড়িয়া যায় এবং প্রায় দশ মিনিট পরে পালভিনাসের কোষগুলি পুনরায় রসস্ফীত হয় এবং অবনমিত পাতাগুলি

পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। রসস্ফীতি চাপের তারতম্যে এই ধরনের চলন সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহাকে রসস্ফীতি চলন (Turgor movement) বলে।
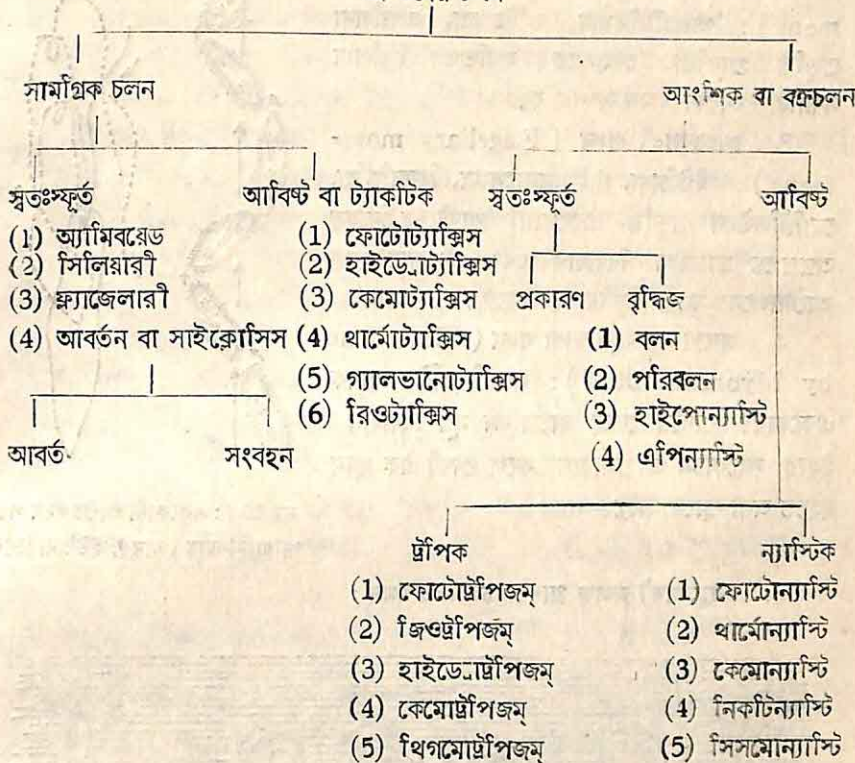
প্রাণীদের চলন ও গমন (Movement and Locomotion in Animals) : প্রাণীদের খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা, জনন প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কার্য সম্পাদনের জন্য স্থান হইতে স্থানান্তরে চলন ও গমনের প্রয়োজন হয়। প্রাণিজগতে কয়েকটি প্রাণী (স্পঞ্জ, সাগরকুসুম ইত্যাদি) ব্যতীত সমস্ত প্রাণী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে চলন ও গমন সম্পাদন করে। জলজ, স্থলজ ও বায়বীয় এই তিন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী বসবাস করে বলিয়া তাহাদের গমন ও চলনের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রাণীর চলন ও গমন সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। আলোচনার সুবিধার্থে সমস্ত প্রাণিজগতের চলন ও গমনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইল। যথা—জলচর, স্থলচর এবং বায়বীয় বা খেচর প্রাণীর চলন ও গমন।

I জলচর প্রাণীর চলন ও গমন :

A এককোষী প্রাণীর চলন ও গমন—এককোষী প্রাণীদের সাধারণত চারি প্রকার গমন পদ্ধতি দেখা যায়। যেমন—

1. **অ্যামিবয়েড গমন** (Amaeboid movement) : **অ্যামিবা**, এণ্টাঅ্যামিবা

প্রভৃতি এককোষী প্রাণীরা আঙ্গুলের ন্যায় দেহের ক্ষণপদ সৃষ্টি করিয়া স্থানান্তরে গমন করে।

2. **সিলিয়ারী গমন** (Ciliary movement): **প্যারামিসিয়াম, ভর্টিসেলা, ওপালিনা** প্রভৃতি প্রাণীরা দেহগাত্রে অবস্থিত সিলিয়া সঞ্চালিত করিয়া গমন সম্পন্ন করে।

3. **ফ্লাজেলারী গমন** (Flagellary movement): ইউগ্লিনা, ট্রাইপানোসোমা, জিয়ার্ডিয়া, **নোক্টিলিউকা** প্রভৃতি এককোষী প্রাণীদের দেহের অগ্রপ্রান্তে ফ্লাজেলা বিদ্যমান এবং এই ফ্লাজেলার আন্দোলনের ফলে প্রাণীরা স্থানান্তরে গমনে সমর্থ।

4. **মায়োনিম সূত্র দ্বারা গমন** (Movement by Myoneme fibre): **মনোসিসটিস** নামক এককোষী প্রাণীর দেহে মায়োনিম সূত্র বিদ্যমান। ইহার সংকোচন ও প্রসারণের ফলে প্রাণী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে।
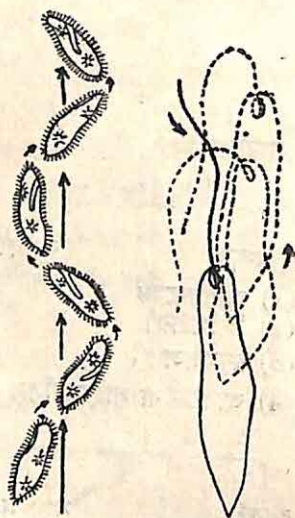
চিত্র 12.4 : এককোষী প্রাণীর গমন পদ্ধতি প্যারামিসিয়াম (বাম), ইউগ্লিনা (ডান)

B. বহুকোষী জলজ প্রাণীর চলন ও গমন :
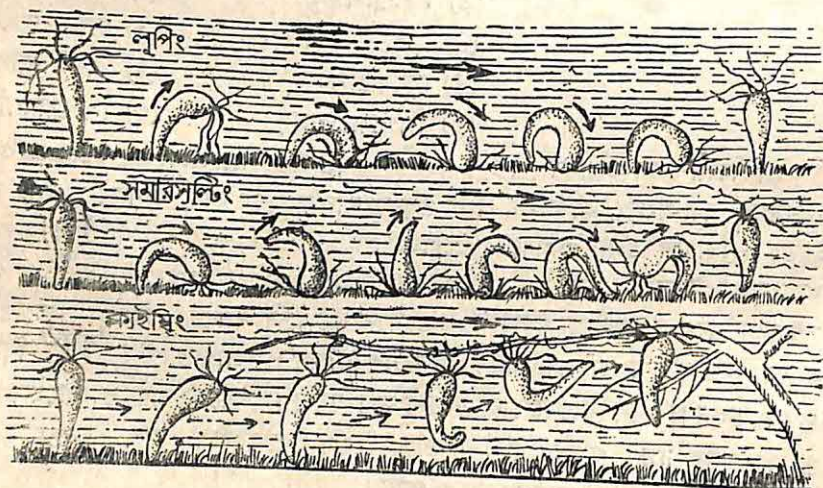
চিত্র 12,5 : হাইড্রার বিভিন্ন প্রকার গমন পদ্ধতি

1. হাইড্রার চলন : হাইড্রার দেহ প্রাচীরের কোষস্তরের পেশীগুলির সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে ইহারা স্থানান্তরে গমন করিতে পারে। দেহের অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত

কর্ষিকা (Tentacles) নিম্নপ্রান্তে অবস্থিত পাদচক্র (Basal disc) গমনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। হাইড্রার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গমন পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। যথা—

(ক) **লুপিং (Looping) :** হাইড্রা দেহটিকে সামনের দিকে বাঁকাইয়া কর্ষিকাগুলিকে গমনের পথে আবদ্ধ করে। ইহার পর পাদচক্রকে কর্ষিকার নিকটে লইয়া আসে। কর্ষিকাগুলিকে মুক্ত করিয়া পুনরায় সামনের জায়গায় আবদ্ধ করে। এইভাবে ধীরে ধীরে প্রাণী সামনের দিকে অগ্রসর হয়। **এই প্রকার গমনকে** হামাগুড়ি দিয়া গমন বা **লুপিং** বলে।

(খ) **ডিগবাজী গমন বা সমারসল্টিং** (Somersaulting) : এই প্রকার গমনে হাইড্রা দেহের অগ্রপ্রান্তকে বাঁকাইয়া কর্ষিকাগুলিকে গমনের পথে আবদ্ধ করে এবং পাদচক্রটিকে উপরের দিকে তুলিয়া দেয়। পরে পাদচক্রটি সামনের দিকে বাঁকাইয়া কিছুটা দূরে আবদ্ধ করিয়া কর্ষিকাগুলিকে সোজা উপরের দিকে তুলিয়া দেয়। এই প্রকার গমনকে **ডিগবাজী গমন** বলে।

(গ) **ক্লাইম্বিং (Climbing) :** হাইড্রার দেহের কর্ষিকাগুলি কোন কঠিন বস্তুর সহিত আবদ্ধ করিয়া এবং দেহকে সামনের দিকে বাঁকাইয়া আরোহণ সম্পন্ন করে।

(ঘ) **গ্লাইডিং** (Gliding) : কোন পিচ্ছিল জায়গার উপর হাইড্রা পাদচক্রের উপর ভর করিয়া ধীরে ধীরে হড়কাইয়া গমন করে। এই প্রকার গমন পদ্ধতিকে গ্লাইডিং বলে।

(ঙ) **সন্তরণ** (Swimming) : কর্ষিকার আন্দোলনের ফলে হাইড্রা জলের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে পারে।

2. **চ্যাপ্টাকৃমি ও গোলকৃমির গমন :** প্রাণিজগতের বিবর্তনে কৃমি জাতীয় প্রাণী হইতে প্রকৃত পেশীর আবির্ভাব দেখা যায়। ইহাদের অধিকাংশ প্রাণী পরজীবী হওয়ায় সক্রিয় গমনের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় না। যতটুকু গমনের প্রয়োজন তাহা দেহের অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্য পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

3. **জোঁকের গমন :** জোঁকের চলন হামাগুড়ি ও সন্তরণ এই দুই পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়।

(ক) **হামাগুড়ি :** এই প্রকার গমনে জোঁকের অগ্র ও পশ্চাৎ চোষকদ্বয় এবং দেহের অনুদৈর্ঘ্য ও বৃত্তীয় পেশী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। গমনের সময় জোঁকের দেহের পশ্চাৎ চোষক প্রথমে কোন কঠিন বস্তুর সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয়। ইহার পর অনুদৈর্ঘ্য পেশীর প্রসারণ এবং বৃত্তীয় পেশীর সংকোচনের ফলে দেহ দীর্ঘায়িত হয়। যথাসম্ভব দেহকে দীর্ঘায়িত করিয়া অগ্র চোষকটিকে সামনের দিকে নতুন জায়গায় আবদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ চোষকটিকে মুক্ত করে। এইবার অনুদৈর্ঘ্য পেশীর সংকোচন ও বৃত্তীয় পেশীর প্রসারণের ফলে দেহ ক্ষুদ্র হয় এবং পশ্চাৎ চোষকটিকে পুনরায় অগ্র চোষকের নিকটে আবদ্ধ করে। এই অবস্থায় দেহের মধ্যভাগ উল্টানো 'U'

অক্ষরের ন্যায় উঁচু হইয়া যায় এবং লুপের ন্যায় আকার ধারণ করে। এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়া জোঁক নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়।
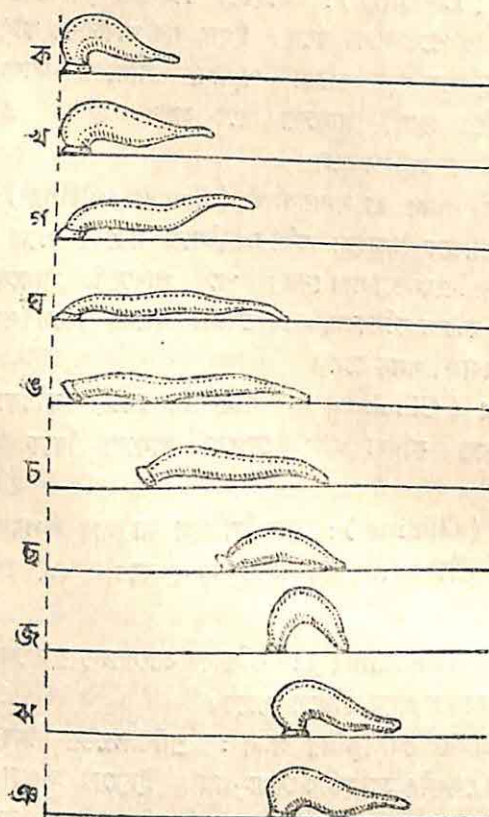
চিত্র 12.6 : জোঁকের গমন পদ্ধতি

(খ) **সন্তরণ :** এই পদ্ধতিতে দেহের অঙ্কীয় ও পৃষ্ঠীয় পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে দেহে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং সহজে জলে সাঁতার কাটিয়া স্থানান্তরে গমনাগমন করে।

4. **চিংড়ির গমন :** চিংড়ির শিরোবক্ষ সংলগ্ন উপাঙ্গগুলি মাটির উপরে হামাগুড়ি দিয়া গমনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু সন্তরণের সময় সন্তরণ উপাঙ্গ বা সুইমারেট (Swimmeret)-এর সহায়তায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে। সন্তরণ উপাঙ্গগুলির মধ্যে প্লিয়োপড (Pleopod) জল টানিবার কার্যে এবং ইউরোপড (Uropod) হালের ন্যায় কাজ করিয়া গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করে।

5. **শামুকের গমন :** ঝিনুক, শামুক প্রভৃতি প্রাণী গমনের সময় মাংসল পদটি খোলক হইতে বাহির করিয়া কোন কঠিন বস্তুর উপর আবদ্ধ করে অথবা নরম মাটির

মধ্যে প্রোথিত করে। মাংসল পদে অবস্থিত অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্য পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে সম্মুখদিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়।

সেপিয়া, লোলিগো, অক্টোপাস প্রভৃতি শম্বুক জাতীয় প্রাণীদের ম্যান্টেল গহ্বরে আবদ্ধ জলকে একটি ছিদ্র মধ্য দিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। ফলে একটি অর্জিত বলের সৃষ্টি হয় যাহা প্রাণীটিকে নিক্ষিপ্ত জলের গতির বিপরীত দিকে চালিত করিতে সহায়তা করে। এইভাবে প্রাণী সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়। এই প্রকার চলনকে **জেটগতি গমন** (Jet propulsion) বলে।
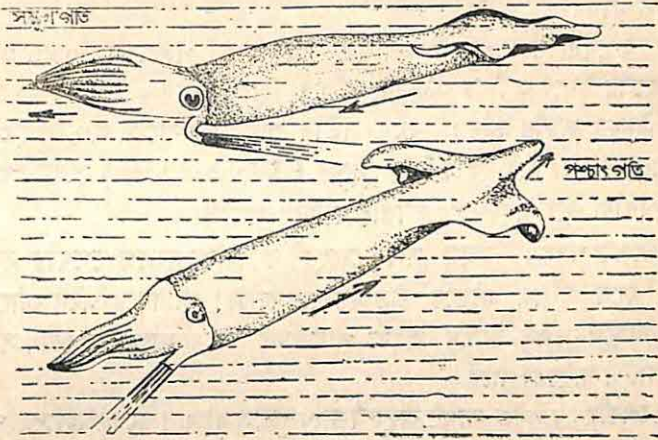
চিত্র 12.7 : লোলিগোর জেটগতি গমন

6. **তারামাছের গমন : তারামাছ** (Starfish) জাতীয় প্রাণীদের ক্ষেত্রে নালী পদ বা টিউব-ফিট (Tube-feet) সক্রিয়ভাবে গমনে অংশগ্রহণ করে। তারামাছের পাঁচটি বাহুর মধ্যস্থিত খাঁজের দুই পার্শ্বে টিউব-ফিট বিদ্যমান এবং টিউব-ফিটের অগ্রপ্রান্তে চোষক অবস্থিত। প্রতিটি টিউব-ফিটের সহিত একটি করিয়া পেশীবহুল অ্যাম্পুলা যুক্ত থাকে। গমনের সময় সম্মুখ দিকের বাহু সমুদ্রতল হইতে উঠাইয়া লয়, ইহার পর অ্যাম্পুলা পেশীর সংকোচনের ফলে জল অ্যাম্পুলা গহ্বর হইতে টিউব-ফিটের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় এবং ফলে টিউব-ফিটটি প্রসারিত হয়। এইবার টিউব-ফিটের অগ্রে অবস্থিত চোষক ভূমিসংলগ্ন হইলে টিউব-ফিটের সংকোচনের ফলে দেহ সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়। অবশেষে টিউব-ফিটগুলি মুক্ত হয় এবং একই পদ্ধতিতে ক্রমসংকোচন ও প্রসারণের ফলে গমন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

7. **মৎস্যের চলন :** মৎস্য স্থায়ীভাবে জলে বসবাস করে বলিয়া ইহারা মুখ্য জলজ প্রাণী এবং ইহাদের সন্তরণ পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(i) মৎস্যের দেহটি মাকুর মত এবং দুই পার্শ্ব চ্যাপ্টা হওয়ায় জলে সহজে সাঁতার কাটিতে পারে।

(ii) মৎস্যের মেরুদণ্ডটি নমনীয় এবং ইহার দুই পার্শ্বে **মায়োটোম** পেশীগুলি পর্যায়ক্রমে সজ্জিত থাকে। ইহাদের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে দেহ তরঙ্গায়িত হয় ফলে মৎস্য দ্রুত গতিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে গমন করিতে পারে। সেই সঙ্গে লেজ ও লেজের পাখনা দিক পরিবর্তনে ও দিক নির্ণয়ে হালের ভূমিকা গ্রহণ করে।

(iii) মাছেরা যখন জলে স্থিরভাবে ভাসিয়া বেড়ায় তখন যুগ্ম বক্ষ পাখনা দেহের ভারসাম্য বজায় রাখিতে সহায়তা করে এবং যুগ্ম শ্রোণী পাখনা মাছকে জলে ভাসিয়া উঠিতে সাহায্য করে। পৃষ্ঠ পাখনা দেহের আয়তন বৃদ্ধি করিতে এবং সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। এই সমস্ত পাখনার ছেদনে মাছ জলে সাঁতার কাটিতে পারে না ফলে মরিয়া যায়।

(iv) মৎস্যের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত গ্যাসপূর্ণ পটকা (Swim bladder) মৎস্যকে জলের উপরে ও নিচে ওঠানামা করিতে সহায়তা করে।

8. **উভচর প্রাণীর গমন :** ব্যাঙ জাতীয় প্রাণীদের পায়ের অঙ্গুলিগুলি পাতলা চামড়া দ্বারা পরস্পর যুক্ত হইয়া লিপ্ত পদের (Webbed foot) সৃষ্টি হয়। ইহার সাহায্যে প্রাণীরা জলে সহজভাবে সাঁতার কাটিতে পারে।

9. **সর্পের গমন :** জলজ সর্প দেহের কশেরুকা-সংলগ্ন পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে সর্পিল গতিতে দ্রুত সাঁতার কাটিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে পারে। সামুদ্রিক কচ্ছপের পদ চ্যাপ্টা হইয়া প্যাডেলের ন্যায় আকৃতি হওয়ায় সহজে জলে সাঁতার কাটিয়া যাইতে পারে।

পক্ষী শ্রেণীর যে সমস্ত পাখী অস্থায়ীভাবে জলে বসবাস করে তাহাদের পদ উভচর প্রাণীর ন্যায় লিপ্ত পদের সাহায্যে জলে সন্তরণের পটুতা নির্দেশ করে। পক্ষী শ্রেণীর
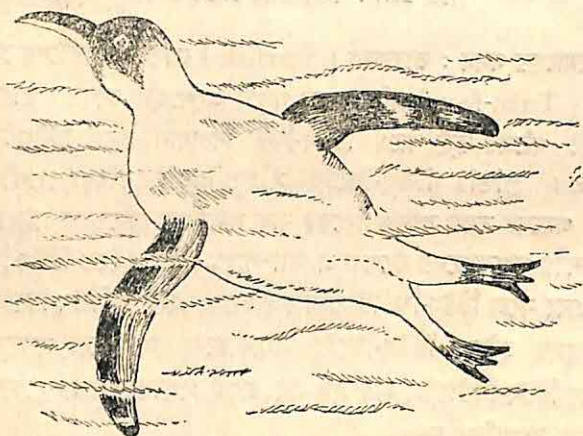
চিত্র 12.8 : ফ্লিপারের সাহায্যে পেঙ্গুইনের গমন

মধ্যে হাঁসের লিপ্ত পদ উল্লেখযোগ্য। **পেঙ্গুইনের** অগ্রপদ ফ্লিপারে পরিণত হইয়া জলে সাঁতার কাটিতে সহায়তা করে।

স্তন্যপায়ী শ্রেণীর **তিমি, শুশুক, ডলফিন** প্রভৃতি জলচর প্রাণীদের অগ্রপদদ্বয় ফ্লিপারে রূপান্তরিত হইয়া জলে সাঁতার কাটিতে সাহায্য করে।

II **স্থলচর প্রাণীর চলন ও গমন :** স্থলে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রকার প্রাণীদের বিভিন্ন রকম চলন ও গমন দেখা যায়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার গমন পদ্ধতি আলোচনা করা হইল·

1. **কেঁচোর গমন :** কেঁচোর দেহের পেশী এবং দেহের অঙ্কীয় দেশে অবস্থিত সিটা গমনাগমনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। দেহের বৃত্তাকার পেশীর সংকোচন ও অনুদৈর্ঘ্য পেশীগুলির প্রসারণের ফলে দেহ যথাসম্ভব লম্বা ও সরু হইয়া যায়। ইহার পর দেহের সিটাগুলি মাটির সহিত আবদ্ধ করে। পরবর্তী পর্যায়ে দেহের সম্মুখ অংশের
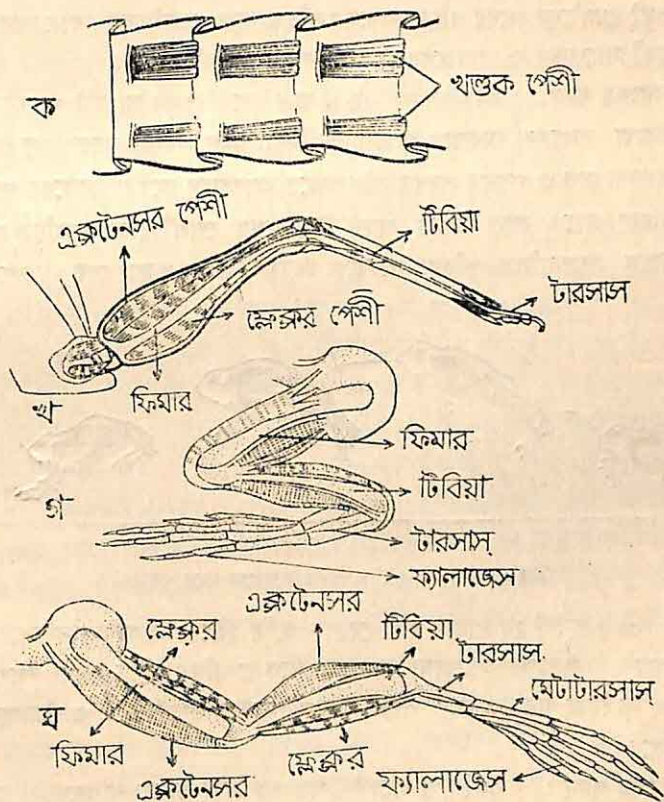
চিত্র 12.9 : গমনের সময় পেশীর বিন্যাস পদ্ধতি : ক = পতঙ্গের বহিঃকঙ্কাল সংলগ্ন খণ্ডক পেশী, খ = পতঙ্গের পদের পেশী, গ, ঘ = ব্যাঙের পশ্চাৎ পদের পেশীর বিন্যাস

সিটা মাটি হইতে মুক্ত হয় এবং পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে অগ্রসর হইয়া যায়। অতঃপর সামনের অংশের সিটা মাটির সহিত প্রতিস্থাপিত হয় এবং পশ্চাৎ অংশের সিটা

যুক্ত হয়। এইভাবে সিটা এবং পেশীর ক্রম সংকোচন ও প্রসারণের ফলে কেঁচো স্থানান্তরে গমন করে। এই প্রকার গমনকে **ক্রিপিং (Creeping)** বলে।

2. **সন্ধীপদী প্রাণীর গমন :** পিঁপড়া, উই, উচ্চিংড়া, কেন্নো, বিছা, কাঁকড়া এবং যে সমস্ত পতঙ্গ উড়িয়া বেড়াইলেও সমতল ভূমিতে হাঁটিয়া বেড়ায় সেই সমস্ত প্রাণী ছয় বা ছয়ের বেশী পদের সাহায্যে গমনাগমন করে। গমনের সময় তিনটি পদ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয় এবং বাকী তিনটি পদ দেহের ভূমির উপর সংলগ্ন থাকিয়া ভার বহন করে। ইহাদের পদের অগ্রভাগে শক্ত বক্র নখর থাকায় কোন কঠিন বস্তুকে আঁকড়াইয়া সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়। আবার আরশোলা-সহ অন্য কয়েকটি পতঙ্গের পদের শেষাংশে বক্র নখরের মধ্যবর্তী অংশে আঠালো প্যাড বা অ্যারোলিয়াম (Arolium) থাকায় মসৃণ জায়গায় সহজে চলাফেরা করিতে পারে।

সন্ধীপদী প্রাণীদের পদের বহিঃকঙ্কালের সহিত যুক্ত এক্সটেনসর এবং ফ্লেক্সর পেশীর বিপরীতমুখী সংকোচন ও প্রসারণের ফলে গমনাগমন সংঘটিত হয়।

3. **ব্যাঙের গমন :** ব্যাঙ যখন স্থলে বাস করে তখন চারিটি পায়ের সাহায্যে লাফাইয়া অথবা সাধারণ অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়া গমন সম্পন্ন করে। সুতরাং ব্যাঙ লাফ দিবার জন্য অগ্র ও পশ্চাৎ পদদ্বয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ব্যাঙের পশ্চাৎপদ্য পেশীবহুল এবং লম্বা। লাফ দিবার পূর্বে উরুদেশের পেশীগুলি সংকুচিত করে এবং পশ্চাৎপদদ্বয়কে সম্প্রসারিত করিয়া সজোরে ভূমির উপর ধাক্কা দেয়। ফলে একটি
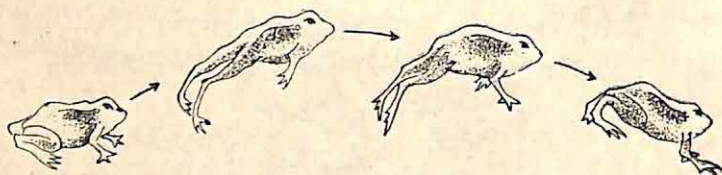
চিত্র 12.10 : ব্যাঙের লম্ফনের সাহায্যে গমন পদ্ধতি

বলের (Force) সৃষ্টি হয় যাহার দ্বারা দেহকে ভূমি হইতে উত্তোলিত করিয়া সম্মুখে আগাইয়া যায়। অতঃপর অগ্রপদদ্বয় সামনের দিকে প্রসারিত হইয়া ভূমি স্পর্শ করে। ব্যাঙ হামাগুড়ি দিয়া গমনের সময় পশ্চাৎপদদ্বয় ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত ও ভাঁজযুক্ত হইয়া চলাফেরা করে।

সরীসৃপের গমন : সরীসৃপ বুকের উপর ভর দিয়া চলাফেরা করে। কশেরুকা-যুক্ত পেশীর পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে সাপ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। ইহা ব্যতীত দেহের অঙ্কীয় দেশে অবস্থিত আঁইশ (Scale) গমনকে দ্রুত করিতে সহায়তা করে। গিরগিটি, টিকটিকি প্রভৃতি সর্পজাতীয় প্রাণী চারিটি পায়ের সাহায্যে চলাফেরা করে। গমনের সময় পায়ের এক্সটেনসর এবং ফ্লেক্সর পেশী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

পাখীর গমন : **এমু, উটপাখী, রিয়া, কিউ** প্রভৃতি পাখীর ডানা নিষ্ক্রিয় হওয়ায় সক্রিয়ভাবে উড়িতে পারে না। ফলে দুইটি লম্বা শক্তিশালী পদের সাহায্যে গমনাগমন সম্পন্ন করে। এই সমস্ত পাখীর পায়ের অস্থিযুক্ত পেশীর ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে গমন সংঘটিত হয়।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর গমন : **গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া** প্রভৃতি স্থলচর চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী প্রাণীরা চারিটি পদের সাহায্যে গমন সম্পন্ন করে। গমনের সময় সামনের যে কোন একটি পদ এবং উহার বিপরীত দিকের পশ্চাৎপদ প্রথমে আগাইয়া যায়। ঐ সময় অপর দুইটি পদ ভূমিসংলগ্ন থাকিয়া দেহের ভার বহন করে। অতঃপর আগাইয়া যাওয়া পদ ভূমি স্পর্শ করিবার পর উহার বিপরীত পার্শ্বের পদদ্বয় ভূমি ত্যাগ করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়। পদের অস্থিসংলগ্ন ফ্লেক্সর ও এক্সটেনসর পেশী সংকোচন ও প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

মানুষের চলন ও গমন (Movement and locomotion in Man) : মানুষের চলন ও গমনের সময় দেহের পেশী ও অস্থির ক্রিয়া সম্মিলিতভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। দেহের ঐচ্ছিক পেশীগুলি অস্থির সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। এই ঐচ্ছিক পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে গমন সম্ভবপর হয়। চলন ও গমনের সময় ফ্লেক্সর পেশীর সংকোচনে দুইটি অস্থি পরস্পরের নিকটবর্তী হয় এবং এক্সটেনসর পেশীর সংকোচনে অস্থিদ্বয় পরস্পরের দূরবর্তী হইয়া পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায়।

মানুষ দুইটি পদ দ্বারা গমন সম্পন্ন করে এবং এই প্রকার গমনকে দ্বি-পদী গমন (Bipedal locomotion) বলে। দ্বি-পদী গমনের সময় পদের অনেকগুলি পেশীর মধ্যে প্রধানত তিন প্রকার পেশী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, যথা—গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস, এক্সটেনসর ডিজিটোরিয়াম এবং বাইসেপস ফিমোরিস। চলনের সময় গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস পেশী যখন সংকুচিত হয় তখন কণ্ডরার মাধ্যমে গোড়ালীর অস্থির উপর চাপ পড়ে ফলে গোড়ালী ভূমি হইতে উপরে উঠিয়া আসে। অতঃপর এক্সটেনসর ডিজিটোরিয়াম সংকোচনের ফলে পদের সম্মুখভাগ ভূমির উপরে উঠিয়া আসে এবং বাইসেপস ফিমোরিস পেশীর সংকোচনে পদ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়। পদটি ভূমি হইতে উত্তোলিত ও সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইলে পদের সমস্ত পেশীর প্রসারণ ও মাধ্যাকর্ষণের ফলে পদটি ভূমিতে নামিয়া আসে। এইভাবে একবার বাম ও ডান পদের পেশীর ক্রিয়ার ফলে মানুষ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়। চলনের সময় হস্তযুগলের সঞ্চালন দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং চলনকে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করে। মানুষের হাঁটার সময় একটি পদ ভূমি সংলগ্ন এবং অন্য পদটি ভূমির উপরে থাকে। দৌড়ানোর সময় দুইটি পদ অতি অল্প সময়ের জন্য ভূমির উপরে থাকে এবং লাফানোর সময় দুইটি পদ ভূমি সংলগ্ন অথবা ভূমির উপর থাকে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর চলন ও গমনের সময় পেশী ও অস্থির ভূমিকা (Role of muscle and bone during the movement and locomotion of Vertebrates) : পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অমেরুদণ্ডী প্রাণীর গমন পেশীর সংকোচন

ও প্রসারণের ফলে সম্পাদিত হয়। কিন্তু মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে পেশী ও অস্থির ক্রিয়ার ফলে গমন ও চলন সংঘটিত হয়। পেশীগুলি অস্থির সহিত স্থিতিস্থাপক যোগকলা নির্মিত কণ্ডরার (Tendon) সাহায্যে যুক্ত থাকে। কোন একটি পেশী একটি অস্থিখণ্ডকে শুরু হইয়া পরবর্তী অস্থি খণ্ডকে শেষ হয়। ফলে অস্থিগুলি পরস্পর পেশী দ্বারা যুক্ত থাকে। দুইটি অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থি-সন্ধি (Joint) বলে। সংযোগস্থলের অস্থি দুইটি তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত এবং সন্ধিস্থল অস্থি-বন্ধনী (Ligament) দ্বারা আবৃত থাকে। অস্থি-বন্ধনীর ভিতর সাইনোভিয়াল তরল (Synovial fluid) নামক এক প্রকার তরল পদার্থ থাকে যাহা সঞ্চালনের সময় অস্থিশীর্ষের ঘর্ষণকে রোধ করে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার অস্থি-সন্ধি আলোচনা করা হইল।

1. **বল ও সকেট সন্ধি** (Ball and Socket joint) : একটি অস্থির বলের ন্যায় গোলাকৃতি মস্তক অংশ অন্য একটি অস্থির গহ্বরে বা সকেটে প্রতিস্থাপিত হয়। ফলে অঙ্গটিকে ইচ্ছামত সঞ্চালিত করা যায়। যেমন—স্কন্ধ সন্ধি, ঊরু সন্ধি।

2. **কব্জা সন্ধি** (Hinge joint) : অস্থিগুলি সন্ধিস্থলে এমনভাবে স্থাপিত থাকে যে দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে কেবল একদিকে সঞ্চালন করা যায়। যেমন—কনুই এবং হাঁটুর সন্ধি (Elbow and knee joints)।

3. **পিভট সন্ধি** (Pivot joint) : এই ধরনের অস্থি-সন্ধির সাহায্যে অঙ্গসঞ্চালন ইচ্ছামত করা যায়। যেমন—অগ্রপদ বা হাতের রেডিয়াস ও আলনার সংযোগস্থলের সন্ধি, মেরুদণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় কশেরুকার সংযোগস্থলের সন্ধি।

4. **স্যাডেল সন্ধি** (Saddle joint) : এই প্রকার অস্থি-সন্ধিতে দুইটি অস্থিই সঞ্চালন করে। যেমন—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের কারপাল ও মেটাকারপাল অস্থির সন্ধিস্থল।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর চলন ও গমনের সময় একটি অস্থির সঙ্গে যুক্ত পেশীগুলির ক্রিয়া বিপরীতমুখী কার্য (Antagonistic function) করে। অর্থাৎ একদিকের পেশী যখন সংকুচিত হয় অন্যদিকের পেশী তখন প্রসারিত হয়। ঐচ্ছিক পেশীর বিভিন্ন কার্যের উপর ভিত্তি করিয়া ইহাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পেশী আলোচনা করা হইল।

1. **ফ্লেক্সর পেশী** (Flexor muscle) : এই প্রকার পেশী দুইটি অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং ইহার সংকোচনে অস্থি দুইটি পরস্পরের নিকটবর্তী হয়। পেশীর এইরূপ কার্যকে ফ্লেক্সন (Flexion) বলে।

2. **এক্সটেনসর পেশী** (Extensor muscle) : এই প্রকার পেশীর সংকোচনে অস্থি দুইটি পরস্পরের দূরবর্তী হয় ফলে অস্থিদ্বয় তাহার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। অর্থাৎ ফ্লেক্সর পেশীর বিপরীতে কার্য করে। পেশীর এইরূপ কার্যকে এক্সটেনসন (Extension) বলে।

3. **অ্যাডাকটর পেশী** (Adductor muscle) : এই ধরনের পেশী দেহের অঙ্গকে দেহের মধ্যরেখার দিকে লইয়া আসে। পেশীর এই ধরনের কার্যকে অ্যাডাকসন (Adduction) বলে।

4. **অ্যাবডাক্টর পেশী** (Abductor muscle) : ইহার কার্য ঠিক অ্যাবডাক্টর পেশীর বিপরীত। অর্থাৎ এই পেশী ক্রিয়ার অঙ্গ দেহের মধ্যরেখা হইতে দূরে সরিয়া যায়। পেশীর এইরূপ কার্যকে অ্যাবডাক্সন (Abduction) বলে।

উপরি-উক্ত পেশীগুলি ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার পেশী দেহের বিভিন্ন অংশে যুক্ত থাকিয়া বিভিন্ন ধরনের কার্য করে। পেশীর কার্যের ভিত্তিতে তাহাদের প্রোনেটর, সুপিনেটর, ডাইলেটর, কনস্টিক্টর, ইনভার্টার, ইভার্টার, ডিপ্রেসর, এলিভেটর বলে। ইহাদের সাহায্যে সংকোচন, প্রসারণ, উত্তোলন, অবনমন, উৎক্রম, উদ্গীরণ প্রভৃতি কার্য সম্পাদিত হয়।

III. **বায়বীয় বা খেচর প্রাণীর চলন ও গমন** : যে সমস্ত প্রাণী স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বাতাসে উড়িয়া বেড়ায় তাহাদের **খেচর প্রাণী** (Volant Animal) বলে। প্রাণিজগতের মধ্যে যে সমস্ত প্রাণী আকাশ বিহার করে তাহাদের দুই প্রকার উড্ডয়ন দেখা যায়, যথা—**সক্রিয় উড্ডয়ন** এবং **নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন**।

A. **সক্রিয় উড্ডয়ন** (Active flight) : যে সকল খেচর প্রাণী আকৃতি ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে ও শক্তির সাহায্যে আকাশে ইচ্ছামত বিচরণ ও দিক পরিবর্তন করিতে পারে, এই রকম আকাশ বিহারকে **সক্রিয় উড্ডয়ন** বলে। প্রাণিজগতের মধ্যে পাখী, পতঙ্গ ও বাদুড়—এই তিন গোষ্ঠীর প্রাণী সক্রিয় উড্ডয়নে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি রাখে।

B. **নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন** (Passive flight) : যখন কোন প্রাণী উঁচু স্থান হইতে লম্ফ দিয়া কিছুক্ষণ বাতাসে ভাসিয়া থাকে এবং বাতাসে ভর দিয়া ধীরে ধীরে নিচে নামিয়া আসে, তখন এই প্রকার উড়িবার পদ্ধতিকে **নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন** বলে। উড়ুক্কু মাছ, উড়ুক্কু ব্যাঙ, উড়ুক্কু গিরগিটি, উড়ুক্কু কাঠবিড়ালী প্রভৃতি প্রাণীর নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন দেখা যায়। নিম্নে দুই প্রকার উড্ডয়ন আলোচনা করা হইল।

A. **সক্রিয় উড্ডয়ন** (Active or True flight)

1. **পতঙ্গের গমন** : মথ, প্রজাপতি, ফড়িং, মশা, মাছি প্রভৃতি পতঙ্গ দুইজোড়া
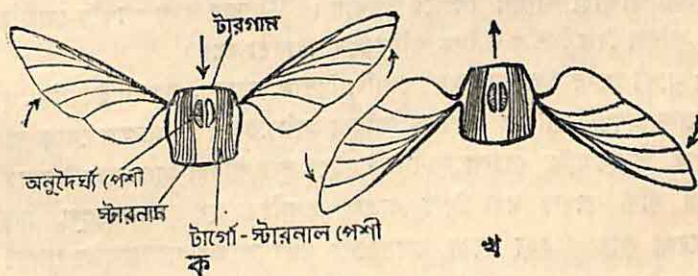
চিত্র 12.11 : পতঙ্গের উড্ডয়নকালে পেশী ও ডানার সঞ্চালন পদ্ধতি

বা একজোড়া (মাছি, মশা) ডানাকে সক্রিয়ভাবে সঞ্চালন করিয়া বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। পতঙ্গের ডানাতে কোন পেশী থাকে না কিন্তু ডানার মূলে বক্ষঃদেশে অবস্থিত টার্গোস্টারনাল

ও অনুদৈর্ঘ্য পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ডানা সঞ্চালিত হয়। ডানাগুলির মূলদেশ পেশীর সহিত যুক্ত থাকায় উহা **পেশী-লিভার** (Muscle-lever) পদ্ধতিতে উঠানামা করে। যখন টার্গোস্টারনাল পেশী সংকুচিত হয় তখন পতঙ্গের পৃষ্ঠদেশ বা টারগাম নিচে নামিয়া যায় এবং টারগাম সংলগ্ন ডানার মূলদেশও নিচের দিকে নামিয়া যায়। ফলে ডানা উপর দিকে উঠিয়া আসে। পরবর্তী পর্যায়ে অনুদৈর্ঘ্য পেশীর সংকোচনে টারগাম ও টারগাম সংলগ্ন ডানার মূলদেশ উপরে উঠিয়া আসে ফলে ডানা নিচের দিকে নামিয়া যায়। এইরূপ পেশীদ্বয়ের পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে পতঙ্গের ডানা আন্দোলিত হইয়া বাতাসে উড়িতে সহায়তা করে।

2. **পাখীর গমন :** পাখী আকাশে বিচরণ করিবার জন্য ইহার সম্মুখের পদজোড়া ডানায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এই ডানার সাহায্যে পাখী উড়িতে পারে। ডানা দুইটি পালক দ্বারা আবৃত। ডানার পালক ব্যতীত পুচ্ছ পালকও উড়ার কার্যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। ডানার পালককে **রেমিজেস** (Remiges) এবং লেজ বা পুচ্ছ পালককে **রেক্ট্রিসেস** (Rectrices) বলে। সুতরাং এই দুই প্রকার পালক উড্ডয়নে সহায়তা করে বলিয়া ইহাদের **উড্ডয়ন পালক** (Flight feathers) বলে। ডানার পালক বা রেমিজেসের কিছু পালক লম্বা যাহা মণিবন্ধ ও করতলে অবস্থিত তাহাদের **প্রাথমিক** বা **প্রাইমারিজ** (Primaries) পালক বলে। আবার কিছু ছোট পালক পুরোবাহুতে অবস্থিত তাহাদের **গৌণ** বা **সেকেণ্ডারিজ** (Secondaries) পালক বলে। ইহা ব্যতীত ডানার অগ্রপ্রান্তে একগুচ্ছ পালক বর্তমান তাহাদের **মেকিডানা** (Bastard wing) বলে। উড্ডয়নকালে ডানাদ্বয়ের এই সমস্ত পাখনা বিস্তৃত হয় এবং উপরে ও নিচে আন্দোলিত হয় ফলে পাখী উপরে ও সম্মুখে গমনাগমন করে। ডানার পালকগুলি পরস্পর এমনভাবে সজ্জিত থাকে যাহাতে ইহার মধ্য দিয়া কোন বায়ুপ্রবাহের পথ না থাকার জন্য পাখী বাতাসে উড়িতে পারে। উপরন্তু, ডানার গঠন বৈশিষ্ট্য এমন যে ডানার পৃষ্ঠদেশ উত্তল এবং অঙ্কীয় দেশ অবতল। ডানার এইরূপ গঠন বৈচিত্র্যের জন্য পাখীরা আকাশ বিহারে উপযুক্ত। উড়িবার সময় পাখীর লেজ হালের ন্যায় কাজ করিয়া দিক নির্ণয় ও দিক পরিবর্তনে সহায়তা করে।

যদিও পাখী প্রকৃত উড্ডয়নে সমর্থ তথাপি বিশ্রাম, আহার, প্রজনন ইত্যাদি জৈবনিক কার্যাদির জন্য অবশ্যই মাটিতে বা গাছে ফিরিয়া আসিতে হয়। আকাশ থেকে নামিবার সময় ডানার পালকগুলি পরস্পরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায় ফলে উহাদের মধ্যে যে ফাঁকের সৃষ্টি তাহার মধ্য দিয়া বাতাস প্রবাহিত হয়। ফলস্বরূপ, নিম্নমুখী অভিযান দেখা যায়। ইহা ছাড়া অবতরণের সময় লেজের পালকগুলি পাখার ন্যায় বিস্তার লাভ করিয়া ব্রেকের কাজ করিতে সহায়তা করে।

পাখীর উড্ডয়ন পেশীসমূহ (**Flight muscles of Bird**) **:** বক্ষের অঙ্কীয় দেশে এবং ডানায় সংলগ্ন যে পেশীগুলি পাখীর উড্ডয়নে সহায়তা করে তাহাদের **উড্ডয়ন পেশী** (**Flight muscle**) বলে। পেশীগুলি বক্ষের স্টার্নাম এবং অগ্রবাহুর হিউমারাস

নামক অস্থির সহিত যুক্ত থাকে। উড্ডয়নকালে অনেকগুলি পেশী অংশগ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে তিনটি পেশী উল্লেখ করা হইল।

1. **পেক্টোরালিস মেজর** (Pectoralis major)—ইহা ডানাকে নিম্নমুখী সঞ্চালনে সহায়তা করে।

2. **পেক্টোরালিস মাইনর** (Pectoralis minor)—ইহা ডানাকে উত্তোলিত করিতে সাহায্য করে।

3. **কোরাকো-ব্র্যাকিয়ালিস** (Coraco-brachialis)—ইহা ডানাকে নিম্নমুখী সঞ্চালনে সাহায্য করে।

উড্ডয়ন পদ্ধতি (Mechanism of flight) : পাখীর উড্ডয়ন পদ্ধতি দুই প্রকার, যথা—**ফ্ল্যাপিং** এবং **গ্লাইডিং**।

1. **ফ্ল্যাপিং** (Flapping) : পাখী ডানা জোড়াকে ঝাপটা মারিয়া ভূমি হইতে উপরে উঠা এবং সম্মুখ দিকে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতিকে ফ্ল্যাপিং বলে।

2. **গ্লাইডিং** (Gliding) : পাখী ডানা জোড়াকে প্রসারিত করিয়া বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইবার পদ্ধতিকে গ্লাইডিং বলে।

নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন (Passive flight) :

কিছু মেরুদণ্ডী প্রাণী পৃথিবীর মহাকর্ষীয় শক্তির প্রভাবে সাময়িকভাবে বাতাসে ভাসিয়া থাকিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারে কিন্তু ইচ্ছানুযায়ী দিক পরিবর্তন করিতে পারে না। এই ধরনের উড্ডয়নকে নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন বলে। এই প্রকার উড্ডয়নে প্রাণীরা দেহের বিভিন্ন পরিবর্তিত অঙ্গের সাহায্যে উঁচু স্থান হইতে লাফ দিয়া বাতাসে ভর করিয়া কিছু দূরত্ব অতিক্রম করিবার পর ধীরে ধীরে নিচে নামিয়া আসে।

উদাহরণস্বরূপ, উড়ুক্কু মাছ (*Exocoetus*) তাহার প্রসারিত বক্ষ পাখনার সাহায্যে সমুদ্র জলের উপরে লাফাইয়া প্রায় 200-300 গজ দূরত্ব বাতাসে ভাসিয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে জলে নামিয়া আসে। এই প্রকার নিষ্ক্রিয় উড্ডয়নকে **গ্লাইডিং** (Gliding) বলে।

উড়ুক্কু ব্যাঙ (*Rhacophorus*) লিপ্ত পদকে * (Webbed foot) বাতাসে বিস্তৃত করিয়া কিছুদূর অতিক্রম করিতে পারে। লিপ্ত পদ ব্যতীত দেহের উভয় পার্শ্বে অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের মধ্যবর্তী স্থানে প্রসারিত চর্ম থাকে। তাহাকে প্যাটাজিয়া** (Patagia) বলে। এই প্যাটাজিয়াকে প্যারাসুটের ন্যায় ব্যবহার করিয়া বাতাসে ভাসিয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে মাটিতে নামিয়া আসে। উড়ুক্কু টিকটিকি, উড়ুক্কু গিরগিটি, উড়ুক্কু সাপ প্রভৃতি সর্প জাতীয় প্রাণী অনুরূপ প্যাটাজিয়ার সাহায্যে নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন সম্পন্ন করে।

উড়ুক্কু কাঠবিড়ালী, উড়ুক্কু লেমুর প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণী সুবিস্তৃত প্যাটাজিয়ার সাহায্যে গৌণ আকাশ বিহার করিতে পারে। ইহাদের প্যাটাজিয়াম গলার দুই পার্শ্বে

---

* পদের অঙ্গুলীগুলির মধ্যবর্তী স্থানে চামড়ার ভাঁজকে লিপ্তপদ বলে।

** প্যাটাজিয়া (Plural) এবং প্যাটাজিয়াম (Singular)।

ও অগ্রপদের সম্মুখে, দেহের অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের মধ্যবর্তী স্থানে এবং পশ্চাৎ পদের পিছন হইতে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

বিষয়-সংক্ষেপ

একই স্থানে থাকিয়া জীবদেহের যে কোন প্রকার নড়াচড়া বা অঙ্গ সঞ্চালনকে চলন বলে। অপরপক্ষে সমগ্র জীবদেহের একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়াকে গমন বলে। অর্থাৎ গমন মাত্রেই চলন কিন্তু সকল প্রকার চলন গমন নহে। স্লাইম ছত্রাক, ক্ল্যামাই-ডোমোনাস প্রভৃতি উদ্ভিদ ব্যতীত কোন উদ্ভিদ গমন সম্পন্ন করিতে পারে না এবং স্পঞ্জ, সাগরকুসুম প্রভৃতি প্রাণী ব্যতীত সকল প্রাণী গমন সম্পন্ন করিতে পারে।

চলন ও গমনের উদ্দেশ্য হইল আত্মরক্ষা, খাদ্য অন্বেষণ, নিরাপদ আশ্রয় ও প্রজনন, অভিযোজন প্রভৃতি।

উদ্ভিদের চলন তিনটি ভাগে বিভক্ত—প্রোটোপ্লাজমীয় চলন, সামগ্রিক চলন ও বক্র-চলন। উদ্ভিদকোষের কোষ প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ প্রোটোপ্লাজমের প্রবাহকে প্রোটোপ্লাজমীয় চলন বলে। ইহা দুই প্রকার—আবর্ত (পাতা শাওলা) ও সংবহন (কুমড়ার কচি কাণ্ডের রোম)।

সামগ্রিক চলন : সামগ্রিক চলনে উদ্ভিদ স্থান পরিবর্তন করে। বাহ্যিক উদ্দীপনা ব্যতীত প্রোটোপ্লাজমের সক্রিয়তায় গমন সম্পন্ন হইলে ইহাকে স্বতঃস্ফূর্ত চলন বলে। এই ধরনের চলন ক্ষণপদ, সিলিয়া বা ফ্লাজেলার দ্বারা সম্পন্ন হইলে উহাদের যথাক্রমে অ্যামিবয়েড, সিলিয়ারী ও ফ্ল্যাজেলারী চলন বলে। অপরপক্ষে, বাহ্যিক উদ্দীপনার প্রভাবে চলন সম্পন্ন হইলে তাহাকে আবিষ্ট চলন বলে। উদ্দীপনাগুলি আলো, জল, রাসায়নিক পদার্থ, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎ বিভব, জলস্রোতের পার্থক্য হইলে ইহাদের যথাক্রমে ফোটোট্যাক্সিস, হাইড্রোট্যাক্সিস, কেমোট্যাক্সিস, থার্মোট্যাক্সিস, গ্যালভানো-ট্যাক্সিস ও রিওট্যাক্সিস বলে।

বক্রচলন : বক্রচলন অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যখন অভ্যন্তরীণ উদ্দীপক দ্বারা বক্রচলন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সম্পন্ন হয় তাহাকে স্বতঃস্ফূর্ত চলন বলে। রসস্ফীতির তারতম্যে স্বতঃস্ফূর্ত বক্রচলন হইলে তাহাকে প্রকারণ চলন ও বর্ধনশীল অঙ্গের অসম বৃদ্ধির জন্য স্বতঃস্ফূর্ত বক্রচলন হইলে তাহাকে বৃদ্ধিজ চলন বলে। বৃদ্ধিজ চলন চারি প্রকার—বলন (বীরুতের কাণ্ডের অগ্রভাগ), পরিবলন (কুমড়ার আকর্ষ), হাইপোন্যাস্টি ও এপিন্যাস্টি (কচু, কলার পাতা)।

বাহ্যিক উদ্দীপকের প্রভাবে উদ্ভিদ অঙ্গের বক্রচলনকে আবিষ্ট চলন বলে। উদ্ভিদ অঙ্গের সঞ্চালনের গতিপথ উদ্দীপকের গতিপথের দিকে হইলে তাহাকে ট্রপিক চলন বলে। উদ্দীপকগুলি আলো, অভিকর্ষ, জল, স্পর্শ, রাসায়নিক পদার্থ হইলে ইহাদের যথাক্রমে আলোকবৃত্তি, অভিকর্ষবৃত্তি, জলবৃত্তি, স্পর্শবৃত্তি ও রসায়নবৃত্তি বলে। আবার উদ্ভিদ অঙ্গের সঞ্চালন উদ্দীপকের তীব্রতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহাকে ন্যাস্টিক বা ব্যাপ্ত চলন বলে। উদ্দীপক আলো, তাপমাত্রা, রাসায়নিক পদার্থ, তাপ ও আলো এবং স্পর্শ

হইলে উহাদের যথাক্রমে আলোকব্যাপ্তি, তাপব্যাপ্তি, রসায়নব্যাপ্তি, তাপ-আলোকব্যাপ্তি ও স্পর্শব্যাপ্তি বলে।

প্রাণীর চলন ও গমন

উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের চলনের তুলনায় প্রাণীদের চলন ও গমন সুস্পষ্ট। প্রাণীরা জলে, স্থলে ও বায়বীয় পরিবেশে চলন ও গমন সম্পন্ন করে। অ্যামিবা, এণ্টামিবা সিউডোপোডিয়ার সাহায্যে : প্যারামিসিয়াম, ভর্টিসেলা সিলিয়ার সাহায্যে ; ইউগ্লিনা, ট্রাইপানোসোমা ফ্লাজেলার সাহায্যে ; মনোসিস্টিস মায়োনিম সূত্রের সাহায্যে জলীয় পরিবেশে গমন সম্পন্ন করে। স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণী কোন কঠিন বস্তুর সঙ্গে আবদ্ধ থাকার জন্য স্থানত্যাগ করিতে পারে না। হাইড্রার দেহের পেশীগুলির সংকোচন ও প্রসারণের ফলে লুপিং, সমারসল্টিং, গ্লাইডিং, ক্লাইম্বিং প্রভৃতি পদ্ধতিতে গমন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। কেঁচো পেশী ও সিটার সাহায্যে ; জোঁক চোষক ও পেশীর সাহায্যে ; চিংড়ি সন্তরণ উপাঙ্গের সাহায্যে ; শামুক, ঝিনুক মাংসল পদের সাহায্যে ; সেপিয়া, লোলিগো, অক্টোপাস প্রভৃতি প্রাণী ম্যাণ্টেল গহ্বরে আবদ্ধ জলকে ছিদ্রের মধ্য দিয়া সজোরে নিক্ষেপের মাধ্যমে ; তারামাছ টিউব-ফিটের সাহায্যে ; মৎস্য পাখনা, লেজ ও পেশীর সাহায্যে ; জলজ উভচর প্রাণী, হাঁস লিপ্তপদের সাহায্যে ; কচ্ছপ প্যাডেলের সাহায্যে ; পেঙ্গুইন, তিমি, শুশুক, ডলফিন ফ্লিপারের সাহায্যে গমন সমাধা করে।

স্থলচর প্রাণী—যথা সন্ধীপদী প্রাণী, উভচর প্রাণী, গিরগিটি, টিকটিকি জাতীয় সরীসৃপ প্রাণী ; এমু, উটপাখী, কিউ প্রভৃতি পক্ষী জাতীয় প্রাণী এবং অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণী পদের সাহায্যে স্থানান্তরে গমন করে। স্থলচর প্রাণীরা পদের প্রধানত এক্সটেন্সর ও ফ্লেক্সর নামক পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা গমনকার্য সম্পন্ন করে।

পাখী, বাদুড় ও সকল পতঙ্গ জাতীয় প্রাণী ডানার সাহায্যে আকাশ বিহার করে। বাতাসে সক্রিয়ভাবে উড়িয়া বেড়াইবার জন্য ডানা ও বক্ষ পেশী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কিছু মেরুদণ্ডী প্রাণী প্রসারিত বক্ষ পাখনা, লিপ্তপদ এবং প্যাটাজিয়ার সাহায্যে নিষ্ক্রিয় উড্ডয়ন সম্পন্ন করে।

প্রশ্নাবলী

A. পার্থক্য লিখ :

(1) সামগ্রিক চলন ও আংশিক চলন।
(2) স্বতঃস্ফূর্ত চলন ও আবিষ্ট চলন
(3) বৃদ্ধিজ চলন ও প্রকারণ চলন।
(4) হাইপোন্যাস্টি ও এপিন্যাস্টি।
(5) ট্রপিক চলন ও ন্যাস্টিক চলন।
(6) কেমোট্রপিক চলন ও কেমোন্যাস্টিক চলন।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(1) চলন ও গমনের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

(2) অ্যামিবয়েড চলন কাহাকে বলে ?

(3) রসস্ফীতি চলন বলিতে কি বুঝ ?

(4) উদ্ভিদের কাণ্ড আলোর দিকে ধাবিত হয় ও মূল মাটির দিকে যায়—ইহা কি ধরনের চলন ? উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের চলনকে গমন বলা হয় না কেন ?

(5) নিকটিন্যাস্টি চলন বলিতে কি বুঝ ?

(6) সিলিয়ারী ও ফ্লাজেলারী গমন কাহাকে বলে ?

(7) কোন্ হরমোনের প্রভাবে ট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রিত হয় ?

(8) অ্যামিবা, মনোসিস্টিস, কেঁচো, চিংড়ি, হাইড্রা, শামুক, তারামাছ, মাছ, ব্যাঙ, তিমির গমন অঙ্গের নাম লিখ।

(9) লাফাইয়া চলার সময় ব্যাঙের অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের ভূমিকা কি ?

(10) জেটগতি চলন কাহাকে বলে ?

(11) পাখীর উড্ডয়নে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান পেশীর নাম কি ?

(12) হাঁটা, লাফানো ও দৌড়ানোর মধ্যে পার্থক্য কি ?

(13) ফ্ল্যাপিং ও গ্লাইডিং কাহাকে বলে ?

(14) অনেকক্ষণ ধরিয়া পাখী আকাশে উড়িলেও সহজে উহারা ক্লান্ত হয় না কেন ?

C. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

(1) চলন ও গমনের উদ্দেশ্য কি ?

(2) উদ্ভিদের সামগ্রিক চলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(3) বিভিন্ন প্রকার বৃদ্ধির চলন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(4) কিভাবে লজ্জাবতী লতা চলন সম্পন্ন করে ?

(5) পাখীর উড্ডয়ন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও

(6) মানুষ কিভাবে গমন সম্পন্ন করে ?

যে প্রক্রিয়ায় জীব নিজের অনুরূপ জীব তথা বংশধর সৃষ্টি করিয়া প্রজাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে তাহাকে জনন বলে। জনন জীবের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। বংশগতির ধারা অব্যাহত রাখা ও বংশবৃদ্ধি করাই জননের মুখ্য উদ্দেশ্য।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর জননের উদ্দেশ্য এক হইলেও উহাদের জনন পদ্ধতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর জনন পদ্ধতির যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই সকল কারণে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জনন পদ্ধতি পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হইল।

উদ্ভিদের জনন

উদ্ভিদের জনন পদ্ধতি তিন প্রকার—অঙ্গজ জনন, অযৌন জনন, যৌন জনন।

(A) **অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction)**—যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন কোন অংশ বৃদ্ধি পাইয়া নূতন জীব সৃষ্টি করে তাহাকে অঙ্গজ জনন বলে। যে সকল সপুষ্পক উদ্ভিদের বীজ হয় না তাহাদের অঙ্গজ জননই বংশবিস্তারের একমাত্র পদ্ধতি। প্রকৃতির আনুকূল্যে উদ্ভিদ নিম্নলিখিত উপায়ে অঙ্গজ জনন সম্পন্ন করে :
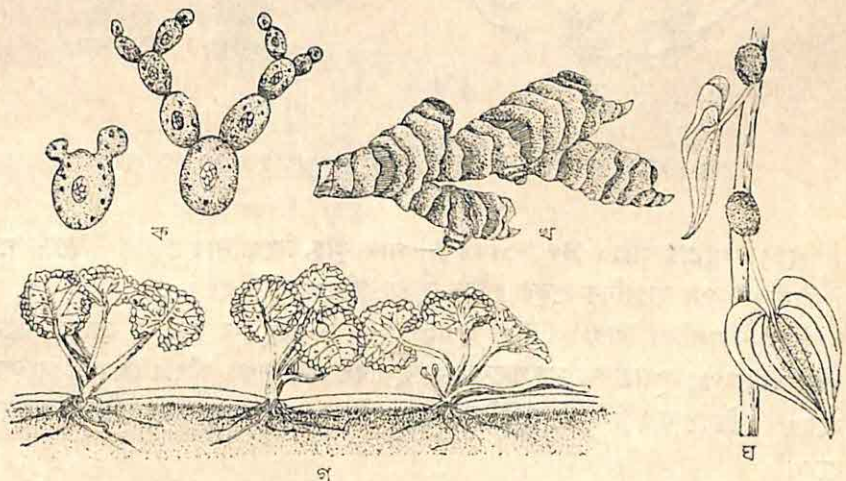
চিত্র 13.1 : উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার অঙ্গজ জনন : ক=ঈষ্ট, খ=আদা, গ=থানকুনি, ঘ=থাম-আলু

(1) **খণ্ডীভবন (Fragmentation)**—স্পাইরোগাইরা, অসিলেটোরিয়া প্রভৃতি সূত্রাকৃতি শৈবাল ও কতিপয় ছত্রাক খণ্ডাংশে বিভক্ত হইলে প্রতিটি খণ্ড হইতে নূতন জীব সৃষ্টি হয়।

(2) **মুকুলোদ্গম (Budding)**—অনুকূল পরিবেশে ঈষ্টে মুকুলোদগমের সময় কোষের এক বা একাধিক স্থান স্ফীত হইয়া মুকুল উৎপাদন করে। অতঃপর নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হইয়া উহার একটি অংশ স্ফীত খণ্ডে প্রবেশ করে এবং অপর অংশটি কোষের মধ্যে থাকিয়া যায়। পরে স্ফীত খণ্ড বা মুকুল বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন ঈষ্টের জন্মদান করে।

(3) **মূল দ্বারা (By root)**—রাঙাআলু, পটল, ডালিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদ উহাদের মূল হইতে উৎপন্ন অস্থানিক মুকুল দ্বারা বংশবিস্তার করে।

(4) **কাণ্ড দ্বারা (By stem)**—আলু, আদা, ওল, পিঁয়াজ প্রভৃতি উদ্ভিদের ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের মুকুল হইতে নূতন গাছ জন্মাইয়া থাকে।

আমরুল, থানকুনি, শুষনি প্রভৃতির ধাবক ; বড়পানা, কচুরিপানা প্রভৃতির খর্বধাবক ; চন্দ্রমল্লিকা, পুদিনা প্রভৃতির ঊর্ধ্বধাবক রূপে অর্ধবায়ব কাণ্ডের অগ্রভাগে উৎপন্ন মুকুল হইতে বিটপ সৃষ্টি হয় এবং উক্ত বিটপগুলি প্রধান উদ্ভিদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন উদ্ভিদের জন্মদান করে।
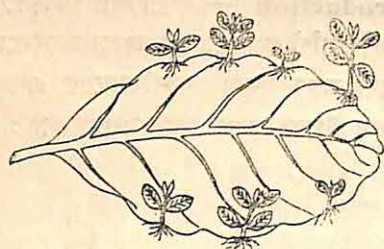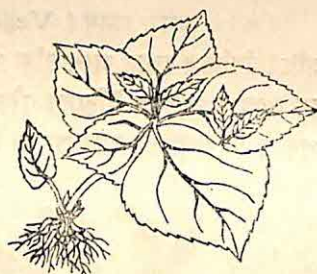
চিত্র 13.2 : পত্র মুকুল দ্বারা অঙ্গজ জনন : ক=পাথরকুচি, খ=বিগোনিয়া

(5) **পাতার দ্বারা (By leaves)**—পাথরকুচি, বিগোনিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদের পত্র-কিনারায় উৎপন্ন অস্থানিক মুকুল হইতে নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

(6) **বুলবিল দ্বারা (By bulbil)**—খাম-আলু বা চুপড়ি আলু উদ্ভিদের পত্রকক্ষে উৎপন্ন রূপান্তরিত পুষ্পমুকুল বা বুলবিল খাদ্য সঞ্চয় করিয়া গোলাকৃতি লাভ করে। পরিণত বুলবিল জনিতৃ উদ্ভিদ হইতে খসিয়া পড়ে এবং নূতন উদ্ভিদের জন্মদান করে।

আবার মানুষ তাহার নিজস্ব প্রয়োজনে কৃত্রিমভাবে কলম সৃষ্টির দ্বারা উদ্ভিদের অঙ্গজ জনন ঘটাইয়া থাকে। **যে প্রক্রিয়ায় ফুল ও ফলের গুণমান বজায় রাখিবার জন্য উদ্ভিদের কোন অংশকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়া প্রজননে প্রবৃত্ত করা হয় তাহাকে কলম বলে।** কলম নিম্নলিখিত প্রকারের :

(1) **শাখাকলম (Cutting)**—জবা, গোলাপ, আখ প্রভৃতি উদ্ভিদের পরিণত কাণ্ডের বা শাখার কিছুটা অংশ কাটিয়া মাটিতে পুঁতিয়া দিলে কর্তিত অংশ নূতন গাছে পরিণত হয়।
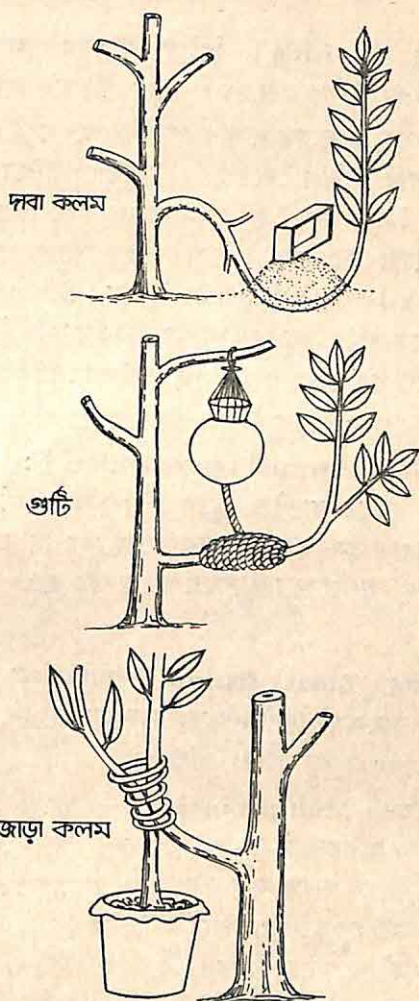
চিত্র 13.3 : বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম অঙ্গজ জনন

(2) **দাবাকলম (Layering)**—লেবু, যুঁই প্রভৃতি উদ্ভিদের শাখাকে বাঁকাইয়া মাটির সহিত আটকানো হইয়া থাকে এবং ইহার উপর কিছু মাটি চাপা দিয়া সার ও জল দিলে যথাসময়ে উহার পর্ব হইতে অস্থানিক মূল বাহির হয়। তখন মূলসমেত শাখাকে কাটিয়া অন্য স্থানে রোপণ করিলে নূতন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

(3) **গুটিকলম (Gootee)**—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি উদ্ভিদের শাখার ছাল

চাঁছিয়া সেই স্থানে মাটি, গোবর ও সারের প্রলেপ দিয়া খড় দ্বারা আবৃত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। নিয়মিত জলসিঞ্চন ও পরিচর্যা করিলে যথাসময়ে ঐ স্থানে মূল বাহির হয়। অতঃপর মূলসমেত শাখাটি বিচ্ছিন্ন করিয়া মাটিতে বসাইলে নূতন গাছের সৃষ্টি হয়।

(4) **জোড়কলম** (**Grafting**)—বিভিন্ন উদ্ভিদের ফুল ও ফলের মান উন্নত রাখিবার জন্য জোড়কলম তৈয়ার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি উদ্ভিদের কোন সবল, সুস্থ ও সতেজ শাখার একটি অংশকে সেই জাতীয় কোন উদ্ভিদের কাণ্ডের সহিত ভালভাবে বাঁধিয়া দিতে হয়। এইভাবে বাঁধিয়া দিবার কিছুদিনের পরে যখন শাখা ও কাণ্ডের মিলন সম্পূর্ণ হয় তখন কাণ্ডের উপরের অংশটি এবং শাখার বা কলমের নিম্নভাগ কাটিয়া দিতে হয়। যাহার সহিত বিচ্ছিন্ন শাখাটি জোড় দেওয়া হয় তাহাকে স্টক (Stock) এবং বিচ্ছিন্ন শাখাকে সিয়ন (Scion) বলে। স্টক যে কোন নিম্নমানের উদ্ভিদ হইতে পারে কিন্তু সিয়ন সর্বদা উচ্চমানের উদ্ভিদ হইয়া থাকে। কি ধরনের ফুল বা ফল উৎপন্ন হইবে তাহা সিয়নের উপর নির্ভর করে, স্টকের উপর নহে ; কারণ স্টক কেবল রস শোষণ করিয়া উপরে পাঠাইয়া দেয়।

B. **অযৌন জনন** (**Asexual reproduction**) : দুইটি ভিন্নধর্মী জনন-কোষ বা গ্যামেটের মিলন ব্যতীত নূতন জীব সৃষ্টির পদ্ধতিকে অযৌন জনন বলে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্গজ জননও একপ্রকার বিশেষ অযৌন জনন। উদ্ভিদের অযৌন জনন সাধারণত রেণু বা স্পোরের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। অযৌন জনন বিভিন্ন প্রকারের :

(1) **দ্বি-বিভাজন** (**Binary fission**)—ব্যাকটিরিয়া, ঈস্ট এবং প্রোটোকক্কাস, কসমেরিয়াম প্রভৃতি এককোষী শৈবালের দেহকোষ মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হইয়া দুইটি পৃথক কোষ তথা নূতন জীবের সৃষ্টি করে।

(2) **বহুবিভাজন** (**Multiple fission**)—সাধারণত প্রতিকূল অবস্থায় অর্থাৎ পরিবেশে জল, বায়ু ও খাদ্যবস্তুর অভাব হইলে রেণু উৎপাদনের মাধ্যমে উদ্ভিদ বংশ-বিস্তার করে। রেণুগুলি যে থলির মধ্যে উৎপন্ন হয় তাহাকে রেণুস্থলী (Sporangium) বলে। রেণুস্থলীর মধ্যে রেণুমাতৃকোষ ক্রমাগত বিভক্ত হইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র রেণু উৎপন্ন করে। রেণু এককোষী, শুঙ্গযুক্ত ও সচল এবং শুঙ্গবিহীন ও অচল হইতে পারে। সচল রেণু অনেক শৈবাল (ক্ল্যামাইডোমোনাস, ভলভক্স, ইডোগোনিয়াম প্রভৃতি) এবং স্যাপ্রোলেগনিয়া, পাইথিয়াম প্রভৃতি ছত্রাকে দেখা যায়। মিউকর, পেনিসিলিয়াম প্রভৃতি ছত্রাক এবং মস, ফার্ন প্রভৃতি উদ্ভিদে অচল রেণু দেখা যায়।

C. **যৌন জনন** (**Sexual reproduction**)—দুইটি ভিন্নধর্মী অথচ সম বা অসম আকৃতির জননকোষের মিলনের মাধ্যমে নূতন জীব সৃষ্টির পদ্ধতিকে যৌন জনন বলে। যৌন জননে অংশগ্রহণকারী জননকোষ বা গ্যামেট সর্বদা হ্যাপ্লয়েড এবং এই হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটদ্বয় মিলিত হইয়া ডিপ্লয়েড জাইগোট সৃষ্টি করে। অতঃপর জাইগোট

বৃদ্ধি পাইয়া অপত্য উদ্ভিদে পরিণত হয়। যৌন জনন দুই প্রকার—সংশ্লেষ (Conjugation) ও সিনগ্যামি (Syngamy)।

(1) **সংশ্লেষ**—নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের সরলতম যৌন জননকে সংশ্লেষ বলে। স্পাইরোগাইরা নামক শৈবালে এই ধরনের জনন দেখা যায়। সংশ্লেষের সময় দুইটি স্পাইরোগাইরা পাশাপাশি অবস্থান করে এবং উহাদের পরস্পরের মুখোমুখি প্রত্যেক কোষ হইতে উপবৃদ্ধির সৃষ্টি হয়। উপবৃদ্ধি দুইটি মিলিত হইলে উহাদের সংযোগপ্রাচীর গলিয়া সংশ্লেষ নলের (Conjugation tube) সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে কোষগুলির
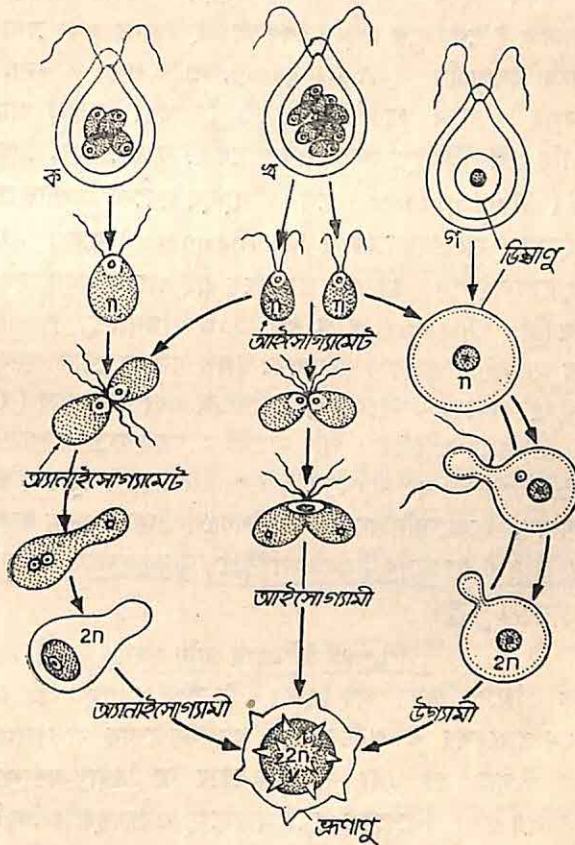
চিত্র 13.4 : ক্ল্যামাইডোমোনাসের আইসোগ্যামি, অ্যানাইসোগামি ও উগ্যামি।

প্রোটোপ্লাস্ট সংকুচিত হইয়া গ্যামেটে পরিণত হয় এবং পরে একটি গ্যামেট সংশ্লেষ নলের মধ্য দিয়া অপর কোষে প্রবেশ করিয়া অপর গ্যামেটের সহিত মিলিত হয় এবং জাইগোস্পোর উৎপন্ন করে। জাইগোস্পোরের নিউক্লিয়াস মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হইয়া চারিটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যে তিনটি বিনষ্ট হয়এবং

চতুর্থটি সাইটোপ্লাজম দ্বারা আবৃত হইয়া সক্রিয় কোষ গঠন করে। অনুকূল পরিবেশে এইরূপ জাইগোস্পোরের অঙ্কুরোদগম ঘটে এবং নূতন স্পাইরোগাইরার জন্মদান করে।

(2) **সিনগ্যামি**—বহুকোষী জীবের সাধারণ যৌন জননের পদ্ধতিকে সিনগ্যামি বলে। গ্যামেটের আকার ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহা তিন প্রকার—

(ক) **আইসোগ্যামি (Isogamy, গ্রীক শব্দ Iso = সদৃশ, gamos = বিবাহ)**—সম আকৃতির ও সম আয়তন যুক্ত দুইটি গ্যামেটের মিলনকে আইসোগ্যামি বলে এবং এইরূপ গ্যামেটকে আইসোগ্যামেট বলে। বাহ্যিক আকৃতির দিক হইতে গ্যামেট দুইটি একই রকম হইলেও চরিত্রগতভাবে ইহাদের যৌন স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। ক্ল্যামাইডোমোনাস, ইউলোথ্রিক্স প্রভৃতি শৈবালে এই ধরনের জনন দেখা যায়।

(খ) **অ্যানাইসোগ্যামি (Anisogamy, গ্রীক শব্দ A = না, isos = সমান, gamos = বিবাহ)**—অসম আকৃতিবিশিষ্ট ও ভিন্নধর্মী দুইটি গ্যামেটের মিলনকে অ্যানাইসোগ্যামি বলে। এইরূপ জননে স্ত্রী গ্যামেটটি আকারে বড়, নিশ্চল এবং ইহাকে ম্যাক্রোগ্যামেট (Macrogamete) বলে। পুরুষ গ্যামেট আকারে ছোট ও সক্রিয় বা সচল এবং ইহাকে মাইক্রোগ্যামেট (Microgamete) বলে। ক্ল্যামাইডোমোনাস (শৈবাল), অ্যালোমাইসিজ (ছত্রাক) প্রভৃতিতে এই ধরনের জনন দেখা যায়।

(গ) **উগ্যামি (Oogamy, গ্রীক শব্দ Oon = ডিম্বাণু, gamos = বিবাহ)**—ইহা একপ্রকার অ্যানাইসোগ্যামি ও সর্বাপেক্ষা উন্নত ধরনের যৌন জনন পদ্ধতি। এই ধরনের জননে স্ত্রী গ্যামেট আকারে বৃহৎ ও নিশ্চল এবং উস্ফিয়ার (Oosphere) বা ডিম্বাণু (Ovum) নামে পরিচিত। পুং গ্যামেট আকারে ক্ষুদ্র ও সচল এবং পুং জনন-কোষ (Antherozoid) বা শুক্রাণু (Spermatozoid) রূপে পরিচিত। ভলভক্স, ক্ল্যামাইডোমোনাস, ইডোগোনিয়াম প্রভৃতি শৈবালে উগ্যামি দেখা যায়। ইহা ব্যতীত উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীদের উগ্যামি পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন হয় এবং ইহাকে নিষেক (Fertilisation) বলে।

সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন

সপুষ্পক উদ্ভিদের জনন অঙ্গ ফুল। ইহাদের পুংজনন অঙ্গ এবং স্ত্রীজনন অঙ্গ হইল যথাক্রমে পুংকেশর ও গর্ভকেশর। পুংজনন কোষ বা পরাগরেণু পুংকেশরের পরাগধানীতে উৎপন্ন হয় এবং স্ত্রীজনন কোষ বা ডিম্বাণু গর্ভাশয়ের ডিম্বক মধ্যস্থ ভ্রূণস্থলীতে উৎপন্ন হয়। নিষেকের পূর্বে পরাগরেণু ও ভ্রূণস্থলীর নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটে।

(i) **পরাগরেণুর পরিবর্তন**—পরাগরেণু রেণুবহিস্ত্বক (Exine) ও রেণুঅন্তস্ত্বক (Intine) দ্বারা আবৃত। নিষেকের পূর্বে পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। গর্ভমুণ্ড নিঃসৃত রস শোষণ করিয়া পরাগরেণু স্ফীত হইলে উহার গায়ে অবস্থিত রেণুরন্ধ্র (germ pore) মধ্য দিয়া অন্তস্ত্বক পরাগনালিকা রূপে বাহির হইয়া আসে। পরাগরেণুর মধ্যে দুইটি নিউক্লিয়াস থাকে—বড়টিকে নালিকা নিউক্লিয়াস (Tube

nucleus) ও ছোটটিকে জনন নিউক্লিয়াস (Generative nucleus) বলে। পরাগ-নালিকার অগ্রভাগে নালিকা নিউক্লিয়াস ও পশ্চাদ্ভাগে জনন নিউক্লিয়াস থাকে।
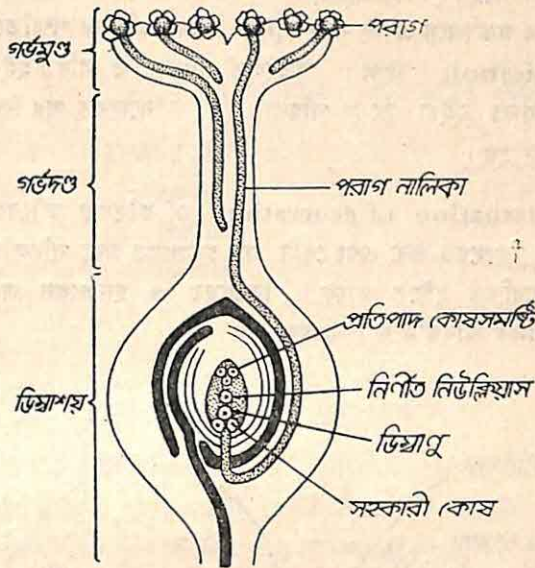
চিত্র 13.5 : সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেক

এইরূপ অবস্থায় পরাগনালিকা গর্ভদণ্ড ভেদ করিয়া ডিম্বাশয়ের ডিম্বক মধ্যস্থ ভ্রূণস্থলীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইতিমধ্যে পুংজনন নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হইয়া দুইটি পুংজনন কোষ (Male gamete) উৎপন্ন করে এবং নালিকা নিউক্লিয়াসটি বিলুপ্ত হইয়া যায়।

(ii) **ভ্রূণস্থলীর পরিবর্তন**—নিষেকের পূর্বে ভ্রূণস্থলীর নিউক্লিয়াস পরপর তিনবার বিভক্ত হইয়া আটটি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস তথা কোষ উৎপন্ন করে। উক্ত নিউক্লিয়াসগুলির তিনটি ডিম্বকরন্ধ্রের দিকে, তিনটি উহার বিপরীত দিকে এবং দুইটি মধ্যস্থলে থাকে। ডিম্বকরন্ধ্র সংলগ্ন তিনটি কোষকে গর্ভযন্ত্র (Egg apparatus) বলে। গর্ভযন্ত্র মধ্যস্থ বড় কোষকে ডিম্বাণু (Egg) এবং পার্শ্বীয় ছোট কোষদ্বয়কে সহকারী কোষ (Synergids) বলে। ডিম্বকরন্ধ্রের বিপরীত পার্শ্বে তিনটি কোষকে একত্রে প্রতিপাদ কোষসমষ্টি (Antipodal cell) বলে। মধ্যস্থ দুইটি নিউক্লিয়াস পোলার নিউক্লিয়াস নামে পরিচিত এবং ইহারা মিলিত হইয়া ডিপ্লয়েড নির্ণীত নিউক্লিয়াস (Definitive nucleus) গঠন করে।

(iii) **নিষেক—পুংজনন কোষ ও স্ত্রীজন কোষের মিলনকে নিষেক বলে**। পরাগ-নালিকা ভ্রূণস্থলীর প্রাচীর ভেদ করিলে উহার দুইটি পুংজনন কোষ মুক্ত হয়। একটি

পুংজনন কোষ স্ত্রীজনন কোষ বা ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হইয়া ডিপ্লয়েড (Diploid) জাইগোট গঠন করে। অপর পুংজনন কোষটি নির্ণীত বা ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়াসের সহিত মিলিত হইয়া ট্রিপ্লয়েড (Triploid) সস্য নিউক্লিয়াস (Endosperm nucleus) গঠন করে। **এইভাবে গর্ভাশয়ে একই সঙ্গে দুইটি নিষেক ঘটিবার পদ্ধতিকে দ্বিনিষেক (Double fertilisation) বলে।** জাইগোট বিভক্ত ও বর্ধিত হইয়া ভ্রূণে এবং সস্য নিউক্লিয়াস বিভক্ত হইয়া সস্যে পরিণত হয়। নিষেকের পর ডিম্বক বীজে ও গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়।

জনুঃক্রম (Alternation of generation) : কতিপয় জীবের জীবনচক্রে সুস্পষ্ট অযৌন বা ডিপ্লয়েড জনু এবং যৌন বা হ্যাপ্লয়েড জনু পরিলক্ষিত হয় এবং ইহারা চক্রাকারে আবর্তিত হইতে থাকে। **ডিপ্লয়েড ও হ্যাপ্লয়েড জনুর এইরূপ চক্রাকার ও পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে জনুঃক্রম বলে।**
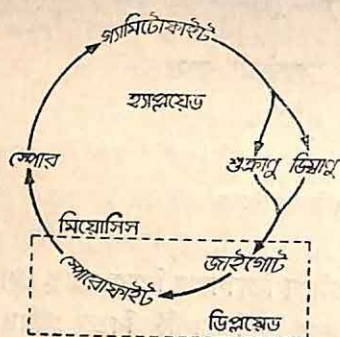
চিত্র 13.6 : উদ্ভিদের জনুঃক্রম
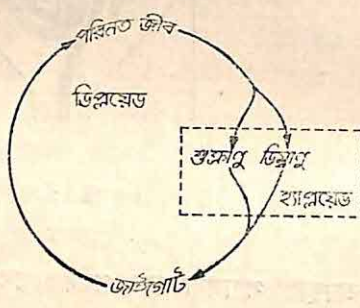
চিত্র 13.7 : উন্নত জীবের জনুঃক্রম

মস, ফার্ন প্রভৃতি উদ্ভিদের জীবনচক্রে সুস্পষ্ট জনুঃক্রম দেখা যায়। এই সকল উদ্ভিদের জীবনচক্রে ডিপ্লয়েড রেণুধর (Sporophyte) দশা ও হ্যাপ্লয়েড লিঙ্গধর (Gametophyte) দশা দেখা যায়। রেণুধর উদ্ভিদ অযৌন জননের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড লিঙ্গধর উদ্ভিদের উৎপত্তি ঘটায় এবং লিঙ্গধর উদ্ভিদ যৌন জননের মাধ্যমে রেণুধর উদ্ভিদের উৎপত্তি ঘটায়।

মানুষ-সহ সকল প্রাণী ও সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবনচক্রে জনুঃক্রম দেখা গেলেও ইহা সুস্পষ্ট নয়। কারণ, পুংজনন কোষ বা শুক্রাণু এবং স্ত্রীজনন কোষ বা ডিম্বাণু হ্যাপ্লয়েড হইলেও ইহারা ক্ষণস্থায়ী এবং ডিপ্লয়েড পরিণত জীব হইল স্থায়ী জনু। তবে সকল ক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড জীব হইতে হ্যাপ্লয়েড জীব সৃষ্টির পূর্বে মিয়োসিস ঘটিয়া থাকে এবং হ্যাপ্লয়েড জননকোষদ্বয়ের মিলনে পুনরায় ডিপ্লয়েড জনুর আবির্ভাব ঘটে।

প্রাণীদের জনন (Reproduction in Animals) :

প্রাণিজগতে **দুই** প্রকার জনন দেখা যায়, যথা—1. অযৌন জনন, 2. যৌন জনন।

1. **অযৌন জনন** (Asexual Reproduction) : এই প্রকার জনন নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। অযৌন জননে জনন কোষের মিলন ছাড়া নূতন অপত্য জীবের সৃষ্টি হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার অযৌন জনন আলোচনা করা হইল।

(i) **দ্বি-বিভাজন** (Binary fission)—যখন একটি জনিতা জীব বিভক্ত হইয়া দুইটি নূতন জীবের উৎপত্তি হয় তখন তাহাকে **দ্বি-বিভাজন** বলে। এই ধরনের বিভাজনে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জনিতা জীবের নিউক্লিয়াস প্রথমে বিভক্ত হয় এবং পরে সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হইয়া দুইটি নূতন কোষের সৃষ্টি হয়। অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম, ইউগ্লিনা, হাইড্রা প্রভৃতি প্রাণী দ্বি-বিভাজন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে। অ্যামিবা দ্বি-বিভাজন পদ্ধতিতে বিভাজন করিবার পূর্বে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিয়া আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরে ক্ষণপদগুলি গুটাইয়া লইয়া গোলাকার দেহাকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহার পর নিউক্লিয়াসটি লম্বা হয় এবং ইহার মধ্যবর্তী অঞ্চল সরু হইয়া ডাম্বেলের আকার ধারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে সাইটোপ্লাজমও নিউক্লিয়াস বরাবর দ্বিধাবিভক্ত হইতে থাকে। অবশেষে মধ্যবর্তী অঞ্চল সংকুচিত হইয়া দুইটি অপত্য অ্যামিবায় ভাগ হইয়া যায়। অ্যামিবার মত প্যারামিসিয়ামও আড়াআড়িভাবে বিভাজিত হইয়া দুইটি অপত্য প্রাণীতে পরিণত হয়। হাইড্রা দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর লম্বালম্বিভাবে বিভাজিত হইয়া দুইটি নূতন অপত্য হাইড্রায় পরিণত হয়। এইরূপ দৈর্ঘ্য বরাবর দ্বি-বিভাজনকে **অনুদৈর্ঘ্য দ্বি-বিভাজন** (Longitudinal binary fission) বলে।

(ii) **বহুবিভাজন** (Multiple fission) : যখন একটি জনিতা জীব বারবার বিভক্ত হইয়া বহুসংখ্যক অপত্য জীবের সৃষ্টি করে তখন তাহাকে **বহুবিভাজন** বলে। এই প্রকার বিভাজন সাধারণত প্রতিকূল অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। অ্যামিবা,

প্লাসমোডিয়াম, মনোসিস্টিস্ প্রভৃতি এককোষী প্রাণী বহুবিভাজন পদ্ধতিতে বংশ-বিস্তার করে। যখন খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ের জল শুকাইয়া যায় তখন
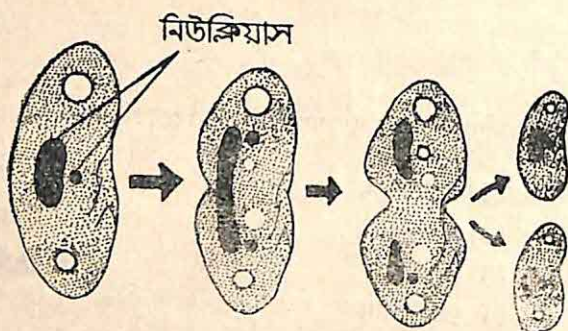
চিত্র 13.8 : প্যারামিসিয়ামের অযৌন জনন

অ্যামিবা ক্ষণপদগুলি গুটাইয়া লয়। পরে সাইটোপ্লাজম হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া দেহকে তিন-স্তরবিশিষ্ট আবরণে আবৃত করে। এই আবরণটিকে সিস্ট (Cyst)
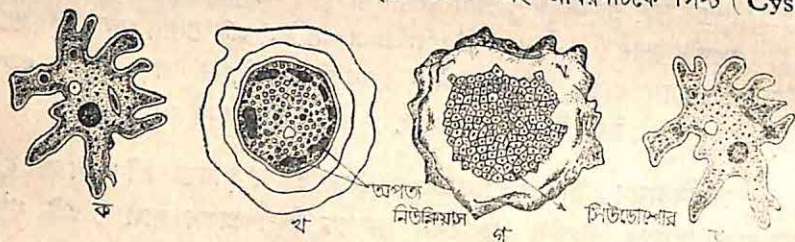
চিত্র 13.9 : অ্যামিবার বহুবিভাজন পদ্ধতি

বলে। এই আবরণের বাহিরের দিক হইতে ভিতরের দিকের স্তরগুলিকে এপিসিস্ট (epicyst), মেসোসিস্ট (mesocyst), এণ্ডোসিস্ট (endocyst) বলে। এই অবস্থার আবরণীর মধ্যে নিউক্লিয়াসটি বারবার বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। অবশেষে প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াস অল্প পরিমাণ সাইটোপ্লাজম দ্বারা আবৃত হইয়া শিশু অ্যামিবা বা সিউডোপোডিওস্পোর (Pseudopodiospore)-এ পরিণত হয়। অনুকূল অবস্থায় আবরণগুলি বিদীর্ণ হইয়া স্পোরগুলি বাহির হইয়া আসে এবং খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এইরূপ বহুবিভাজনের এই পদ্ধতিকে **স্পোরুলেশন** (Sporulation) বলে। বিজ্ঞানী টেলর (Taylor)-এর মতানুযায়ী অ্যামিবা প্রোটিয়াস (*Amoeba proteus*)-এর স্পোরুলেশন হয় না। কিন্তু অন্যান্য প্রজাতিভুক্ত অ্যামিবার স্পোরুলেশন প্রক্রিয়ায় বহুবিভাজন পরিলক্ষিত হয়।

(iii) **কোরোকোদগম** (Budding)—স্পঞ্জ, হাইড্রা, ওবেলিয়া প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীদের দেহের নিম্নাংশ হইতে একটি প্রবর্ধক বাহির হইতে দেখা যায়। এই প্রবর্ধকটি ক্রমে জনিতা জীবদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে। এই

প্রবর্ধকটিকে মুকুল বা **কোরক** (Bud) বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোরকটি প্রাণিদেহে সংযুক্ত থাকিয়া একত্রে কলোনী (Colony) গঠন করে। যখন কোরকটি প্রাণিদেহের বহিঃস্তরে উৎপন্ন হয় তখন এই কোরকটিকে **বহিঃকোরক** (Exogenous bud) এবং যখন কোরকটি দেহাভ্যন্তর হইতে উৎপন্ন হয় তখন **অন্তঃকোরক** (Endogenous bud) বলে। স্পঞ্জের ক্ষেত্রে অন্তঃকোরকোদগমকে **গেমিউল** (Gemmule) বলে।

(iv) **পুনরুৎপাদন** (Regeneration)—এককোষী প্রাণী, স্পঞ্জ, একনালীদেহী প্রাণী, প্লানেরিয়া, চ্যাপ্টাকৃমি প্রভৃতি প্রাণীদের দেহ দুই বা ততোধিক খণ্ডে খণ্ডিত হইলে বা করিলে দ্রুতহারে কোষ বিভাজন দ্বারা প্রত্যেকটি খণ্ডাংশ একটি নূতন অপত্য প্রাণীতে পরিণত হয়। এই পদ্ধতিকে **পুনরুৎপাদন** বলে।

2. **যৌন জনন** (Sexual Reproduction) : অধিকাংশ উচ্চ স্তরের প্রাণীদের মধ্যে যৌন জনন বা সিনগ্যামি (Syngamy) পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকার জননে সাধারণত দুইটি অসম আকৃতির জননকোষের (পুং গ্যামেট এবং স্ত্রী গ্যামেট) প্রয়োজন হয় যাহারা পরিশেষে মিলিত হইয়া জাইগোট সৃষ্টি করে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এককোষী প্রাণীদের মধ্যে যৌন জনন সম্পাদিত হয়। যেমন, দুইটি **প্যারামিসিয়াম** (এককোষী প্রাণী) পাশাপাশি অবস্থান করিয়া উহাদের মাইক্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের মধ্যে নিউক্লিয় বস্তুর বিনিময় সংঘটিত হয়। এই পদ্ধতিকে **সংশ্লেষ** বা **কনজুগেশন** (Conjugation) বলে। ইহার পর প্রাণী দুইটি পৃথক হইয়া বিভাজন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে। আবার, **প্লাসমোডিয়াম** (এককোষী প্রাণী) পরজীবীর ক্ষেত্রে অসম আকৃতির পুরুষ গ্যামেট ও স্ত্রী গ্যামেটের মিলন হইয়া জাইগোট সৃষ্টি করে। এই পদ্ধতিকে **গ্যামেটোগোনী** (Gametogony) বলে। ইহার পর জাইগোট হইতে স্পোরোজয়েট রূপে অপত্য প্লাসমোডিয়ামের সৃষ্টি হয়।
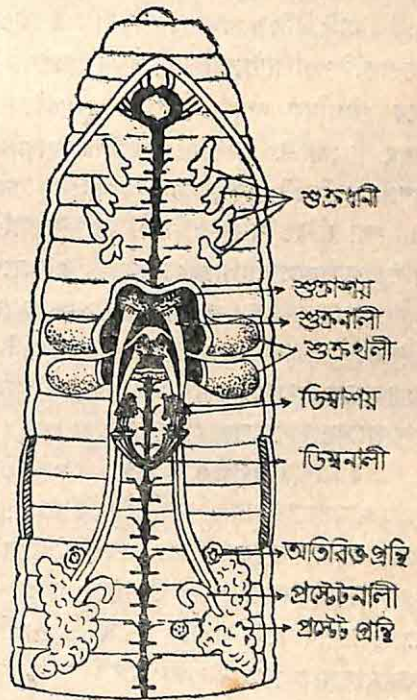
চিত্র 13.10 : কেঁচোর জননতন্ত্র

উচ্চ স্তরের প্রাণীদের জনন অঙ্গ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। পুরুষ প্রাণীর জনন অঙ্গকে **শুক্রাশয়** (Testis) এবং স্ত্রী প্রাণীর জনন অঙ্গকে **ডিম্বাশয়** (Ovary) বলে। দেহের বাহ্যিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া প্রাণীরা উভয় লিঙ্গ

এবং একলিঙ্গ হইতে পারে। কেঁচো, জোঁক, হাইড্রা, ফিতাকৃমি প্রভৃতি প্রাণীর একই দেহে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় থাকে। এইজন্য এই সমস্ত প্রাণীকে **উভয় লিঙ্গ** (Bisexual or Hermaphrodite) বলে। অপরপক্ষে, যখন পৃথক পৃথক প্রাণিদেহে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় থাকে তখন তাহাকে **একলিঙ্গ** (Unisexual) বলে। যেমন—আরশোলা, ব্যাঙ, সাপ, পাখী, স্তন্যপায়ী প্রাণী প্রভৃতি।

পুরুষের দেহে শুক্রাশয় হইতে শুক্রাণু বা পুরুষ গ্যামেট এবং স্ত্রীদেহে ডিম্বাশয় হইতে ডিম্বাণু বা স্ত্রী গ্যামেট উৎপন্ন হয়। যে প্রক্রিয়ায় শুক্রাশয়ের জনন মাতৃকোষ (Primordial germ cells) হইতে শুক্রাণু উৎপন্ন হয় তাহাকে **শুক্রোৎপাদন** (Spermatogenesis) বলে। অনুরূপভাবে, যে প্রক্রিয়ায় স্ত্রীদেহে ডিম্বাশয়ের জনন মাতৃকোষ হইতে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় তাহাকে **ডিম্বোৎপাদন** (Oogenesis) বলে।

শুক্রাণুর উৎপত্তি ও গঠন (Development and structure of sperm) : শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস টিউবিউলের মধ্যে জনন মাতৃকোষ (Primordial germ cell) মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হইয়া অসংখ্য স্পার্মাটোগোনিয়াতে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি স্পার্মাটোগোনিয়ার মধ্যে ডিপ্লয়েড সংখ্যক (2n) ক্রোমোজোম থাকে এবং ইহা ক্রমে প্রাথমিক স্পার্মাটোসাইটে রূপান্তরিত হয়। প্রতিটি প্রাথমিক স্পার্মাটোসাইট প্রথম মায়োটিক বিভাজনে দুইটি মাধ্যমিক স্পার্মাটোসাইটে পরিণত হয় এবং ইহা অবশেষে দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজনে চারিটি সম-আকৃতিবিশিষ্ট হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক (n) স্পার্মাটিডে পরিণত হয়। এই স্পার্মাটিডগুলি স্পার্মিওজেনেসিস পদ্ধতির মাধ্যমে সক্রিয় শুক্রাণুতে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে শুক্রাশয়ে অসংখ্য শুক্রাণু সৃষ্টি হয়।

শুক্রাণুর দেহ মস্তক, মধ্যম অংশ ও লেজ অংশ লইয়া গঠিত। মস্তকে বৃহৎ নিউ-ক্লিয়াস বিদ্যমান এবং ইহার অগ্রভাগে টুপির ন্যায় অ্যাক্রোসোম অবস্থিত। শুক্রাণুর মধ্যমাংশে মাইটোকন্ড্রিয়া অবস্থিত যাহা প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়। শুক্রাণুকে সঞ্চালনের জন্য লেজ অংশ সহায়তা করে।

ডিম্বাণুর উৎপত্তি ও গঠন (Development and structure of ovum) :

শুক্রাশয়ের ন্যায় ডিম্বাশয়ের ভিতরে মাতৃকোষ জার্মকোষগুলি মাইটোসিস বিভাজন দ্বারা সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া অসংখ্য উগোনিয়ায় (Oogonia) রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে ইহারা প্রাথমিক উসাইটে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে ডিপ্লয়েড সংখ্যক (2n) ক্রোমোসোম বর্তমান থাকে। এইবার প্রাথমিক উসাইট প্রথম মায়োটিক বিভাজনে দুইটি অসমআকৃতি কোষ উৎপন্ন করে। তাহাদের মধ্যে বড় কোষটিকে মাধ্যমিক **উসাইট** এবং ছোট কোষটিকে **প্রথম পোলার বডি** (First polar body or polocyte) বলে। পুনরায় দ্বিতীয় মায়োটিক বিভাজনের ফলে মাধ্যমিক উসাইট হইতে দুইটি অসমান কোষ উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত কোষটির মধ্যে বড়টিকে ডিম্বাণু (ovum) এবং ছোট কোষটিকে **দ্বিতীয় পোলার বডি** বলে। একই সঙ্গে প্রথম পোলার বডিটিও বিভাজিত হইয়া দুইটি সম-আকৃতির পোলার বডি উৎপন্ন হয়। সুতরাং উজেনেসিস প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত চারিটি হ্যাপ্লয়েড কোষের মধ্যে কেবল ডিম্বাণুটি সক্রিয় হয় এবং তিনটি পোলার বডি ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। এইভাবে ডিম্বাশয়ে অসংখ্য ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়।

ডিম্বাণুর বাহিরে চারিপার্শ্বে একটি পাতলা প্লাজমা মেমব্রেন থাকে। ইহার মধ্যে সাইটোপ্লাজম এবং হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস বিদ্যমান। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে মাইটোকন্ডিয়া, গল্গি বডি, এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম প্রভৃতি সজীব অঙ্গাণু থাকে। ইহা ব্যতীত সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কুসুম (Yolk) থাকে যাহা ভবিষ্যৎ ভ্রূণকে খাদ্য সরবরাহ করে।

নিষেক (Fertilization) : **যে পদ্ধতিতে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলনের ফলে জাইগোট উৎপন্ন হয় সেই পদ্ধতিকে নিষেক বলে।** নিষেকের সময় শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলনকে **অ্যাম্ফিমিক্সিস** (Amphimixis) বলে। ইহার ফলে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যাবলী নূতন অপত্য প্রাণীতে সঞ্চারিত হয়। নিষেক পদ্ধতি সব সময় জলজ মাধ্যমে সংঘটিত হইয়া থাকে।

নিষেকের প্রকারভেদ (Types of fertilization) : নিষেক সাধারণত চারি প্রকারের হয়। যথা—

1. **বহিঃনিষেক** (External fertilization) : নিষেক যখন কোন জলজ মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রী দেহের বাহিরে সম্পন্ন হয় তখন তাহাকে **বহিঃনিষেক** বলে। যেমন—মাছ, উভচর, জলজ প্রাণী প্রভৃতি।

2 **আন্তঃনিষেক** (Internal fertilization) : নিষেক যখন কোন পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে সংঘটিত হইয়া থাকে তখন তাহাকে **আন্তঃনিষেক** বলা হয়। যেমন—কেঁচো, আরশোলা, সরীসৃপ, পাখী, স্তন্যপায়ী প্রাণী প্রভৃতি।

3. **স্ব-নিষেক** (Self-fertilization) : যে প্রক্রিয়ায় একই জীবদেহে উৎপন্ন শুক্রাণু ও ডিম্বাণু ঐ জীবদেহে মিলিত হয় তাহাকে **স্ব-নিষেক** বলে। যেমন—ফিতাকৃমি।

4. **পর-নিষেক** (Cross fertilization) : যখন পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণিদেহে উৎপন্ন শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন হয় তখন তাহাকে **পর-নিষেক** বলে। যেমন—হাইড্রা, কেঁচো, আরশোলা, মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে পর-নিষেক পরিলক্ষিত হয়।

অণ্ডজ, জরায়ুজ এবং অণ্ড-জরায়ুজ প্রাণী (Oviparous, Viviparous and Ovo-viviparous Animals) :

1. **অণ্ডজ প্রাণী** (Oviparous Animal) : যখন প্রাণীদের নিষিক্ত বা অনিষিক্ত ডিম্বাণুর বৃদ্ধি মাতৃদেহের বাহিরে সংঘটিত হইয়া অপত্যের সৃষ্টি হয় তখন তাহাকে **অণ্ডজ প্রাণী** বলে। যেমন—আরশোলা, শামুক, মাছ, ব্যাঙ, পাখী প্রভৃতি।

2. **জরায়ুজ প্রাণী** (Viviparous Animal) : যে সমস্ত প্রাণীর আন্তঃনিষিক্ত ডিম্বাণু মাতৃ জরায়ুতে থাকিয়া মাতৃরক্ত হইতে পুষ্টিলাভ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় তাহাকে **জরায়ুজ প্রাণী** বলে। যেমন—হংসচঞ্চু (Platypus) ব্যতীত সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী।

3. **অণ্ড-জরায়ুজ প্রাণী** (Ovo-viviparous Animal) : যে সমস্ত প্রাণীর আন্তঃনিষিক্ত ডিম্বাণু মাতৃদেহের জরায়ুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কিন্তু মাতা হইতে কোন পুষ্টিদ্রব্য

গ্রহণ করে না তাহাদিগকে **অণ্ড-জরায়ুজ প্রাণী** বলে। এইরূপ ক্ষেত্রে ডিম্বাণুর কুসুম হইতে ভ্রূণ প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। যেমন—হাঙ্গর, কিছু সরীসৃপ ও কিছু মাছি জাতীয় পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীদের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর জনন অঙ্গ ও তন্ত্র (Reproductive organs and system of Vertebrates) :

সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী যৌন দ্বিরূপতাবিশিষ্ট একলিঙ্গ (Unisexual) অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ দেহের সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নির্দেশকারী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মেরুদণ্ডী প্রাণীর পুং ও স্ত্রী জনন তন্ত্রের মৌলিক গঠন ও কার্য একই প্রকার কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের জনন অঙ্গের অবস্থান ভিন্ন। নিম্নে বিভিন্ন প্রাণীর জনন অঙ্গ ও তন্ত্র আলোচনা করা হইল।

পুংজনন তন্ত্র (Male Reproductive System): একজোড়া শুক্রাশয় (Testes), অসংখ্য সূক্ষ্ম শুক্রনালিকা (Vasa efferentia), একজোড়া শুক্রনালী (Vas deferens), শুক্রথলী (Seminal vesicle), ইউরেথ্রা (Urethra), পুংজনন শিশ্ন বা লিঙ্গ (Penis) এবং অতিরিক্ত গ্রন্থি (Accessory glands) লইয়া পুংজনন তন্ত্র গঠিত।

হস্তী, ম্যানাটি, হংসচঞ্চু, মরুবাসী হাইরেক্স, তিমি, শুশুক প্রভৃতি কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণী-সহ সমস্ত পুরুষ প্রাণীর একজোড়া শুক্রাশয় উদর গহ্বরে এবং বৃক্কের সন্নিকটে অবস্থিত। অন্যান্য স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে ইহা উদরের পশ্চাদ্ভাগের অঙ্কীয়দেশ হইতে উদ্ভূত একটি বিশেষ থলির মধ্যে নামিয়া আসে। এই থলিটিকে শুক্রাশয় থলি (Scrotum) বলে। শুক্রাশয় মেসরকিয়াম (Mesorchium) নামক একটি পাতলা পেরিটোনিয়াম পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে এবং উদর গহ্বরের প্রাচীরের সহিত দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। সরীসৃপ, পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণীদের শুক্রাশয় গোলাকার বা ডিম্বাকার কিন্তু মৎস্য, উভচর শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রে ইহার আকৃতি ছোট দণ্ডের ন্যায় এবং বৃক্কের সহিত যুক্ত থাকে।

প্রতিটি শুক্রাশয় হইতে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুক্রনালিকা (Vasa efferentia) মিলিত হইয়া একটি শুক্রনালী (Vas deferens) গঠন করে। মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের একজোড়া শুক্রনালী শুক্রাশয় হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথকভাবে অবসারণী বা ক্লোয়াকাতে মিলিত হয়। উভচর প্রাণীর ক্ষেত্রে শুক্রনালিকা বৃক্কের গবিনীর সহিত মিলিত হইয়া রেচন-জনন নালী গঠন করে। এই রেচন-জনন নালীর মাধ্যমে মূত্র ও শুক্রাণু বাহিত হয়। অতঃপর উভয় পার্শ্বের রেচন-জনন নালী একত্রিত হইয়া একটি সাধারণ নালী গঠন করে যাহা ক্লোয়াকাতে উন্মুক্ত হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে একজোড়া শুক্রনালী মূত্রথলির উপর দিয়া ঘুরিয়া নিচে নামিয়া আসে এবং মূত্রথলী হইতে আগত ইউরেথ্রার সহিত মিলিত হয়। ইহার পর ইউরেথ্রা শিশ্নের মাধ্যমে পুংজনন ছিদ্র পথে বাহিরে উন্মুক্ত হয়। উৎপন্ন শুক্রাণু সাময়িকভাবে

শুক্রথলিতে সঞ্চিত থাকে। শিশ্ন বা লিঙ্গ বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে একটি বা দুইটি হইতে পারে। হাঙ্গরের ক্ষেত্রে দুইটি শিশ্ন থাকে ইহাকে ক্লাসপার বলে। সরীসৃপের একটি ছোট শিশ্ন থাকে যাহা হেমিপেনিস নামে পরিচিত এবং মনোট্রিমাটা নামক স্তন্যপায়ী প্রাণী ব্যতীত অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটি শিশ্ন থাকে। উভচর এবং পক্ষী শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের কোন শিশ্ন থাকে না। বিভিন্ন অতিরিক্ত গ্রন্থি, যথা—প্রস্টেট গ্রন্থি,
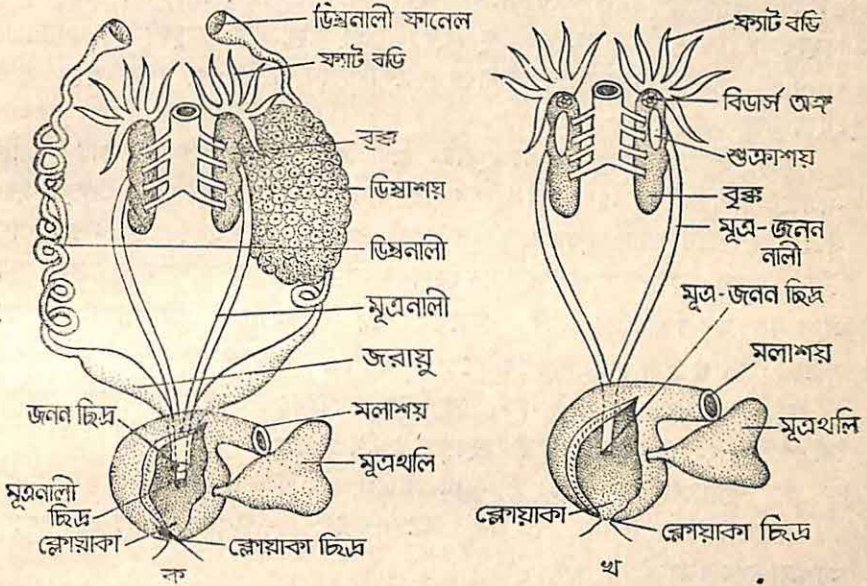
চিত্র 13.11 : কুনো ব্যাঙের জনন যন্ত্র
ক=স্ত্রী, খ=পুরুষ

কাউপার গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত তরল পদার্থ শুক্রের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া শুক্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং পুষ্টি যোগায়। ইহাদের একত্রে বীর্য (Semen) বলে।

সরীসৃপ, স্তন্যপায়ীদের পুরুষ ও স্ত্রীর মিলনকালে পুরুষের শিশ্ন স্ত্রী প্রাণীর যোনীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। এই সময় পুরুষ হইতে শুক্রাণু স্ত্রীদেহে ফ্যালোপিয়ান নালীর মধ্যে ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হইয়া অন্তঃনিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

পাখীদের মিলনকালে পুরুষ ও স্ত্রীর অবসারণীদ্বয় পরস্পরের সহিত যুক্ত হয়। এই পদ্ধতিকে অবসারণী চুম্বন (Cloacal kiss) বলে এবং এইরূপ পদ্ধতির মাধ্যমে শুক্রাণু স্ত্রী দেহে অবসারণীতে প্রবেশ করিয়া অন্তঃনিষেক সম্পন্ন করে। মৎস্য, উভচর প্রাণীদের শিশ্ন থাকে না। ইহাদের জননকালে পুরুষ ও স্ত্রী হইতে যথাক্রমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু জলে নির্গত হইয়া বহিঃনিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

স্ত্রীজনন তন্ত্র (Female Reproductive System) : একজোড়া ডিম্বাশয় (Ovary), একজোড়া ডিম্বনালী (Oviduct), জরায়ু (Uterus), যোনি (Vagina) এবং অতিরিক্ত গ্রন্থি (Accessory glands) লইয়া স্ত্রী জনন তন্ত্র গঠিত।

স্ত্রী মেরুদণ্ডী প্রাণীদের একজোড়া ডিম্বাশয় উদরস্থিত মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে শ্রোণীগহ্বরের পশ্চাদ্‌দেশে অবস্থিত। ডিম্বাশয় মেসোভেরিয়াম (Mesovarium) নামক পাতলা পেরিটোনিয়াম পর্দা দ্বারা আবৃত। এই পর্দার সাহায্যে ডিম্বাশয় দেহগহ্বরের প্রাচীরের সহিত যুক্ত থাকে।

প্রতিটি ডিম্বাশয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি করিয়া মোট দুইটি ডিম্বনালী বিদ্যমান। প্রতিটি ডিম্বনালীর তিনটি অংশ থাকে। ইহার অগ্রাংশটি ফানেলের ন্যায় এবং ইহা ডিম্বাশয়ের নিকটবর্তী দেহগহ্বরে উন্মুক্ত হয়। এই অংশটিকে ডিম্বচুঙ্গী (Oviducal funnel) বলে। ডিম্বনালীর মধ্যমাংশ ফ্যালোপিয়ান নালী এবং পশ্চাৎ অংশ স্ফীত হইয়া জরায়ু গঠন করে।

হাঙ্গর ও উভচর প্রাণীর ক্ষেত্রে দুইটি জরায়ু একত্রে মিলিত হইয়া একটি সাধারণ নালীতে পরিণত হয় এবং স্ত্রী জনন ছিদ্রপথে অবসারণী প্রকোষ্ঠে উন্মুক্ত হয়। সরীসৃপের ক্ষেত্রে জরায়ু পৃথকভাবে অবসারণী প্রকোষ্ঠে মুক্ত হয়। যে সমস্ত পাখী উড়িতে পারে তাহাদের সাধারণত ডান ডিম্বাশয় থাকে না কিন্তু নিষ্ক্রিয় ও ছোট অর্থাৎ লুপ্তপ্রায় ডিম্বনালী অবসারণী প্রকোষ্ঠের সঙ্গে যুক্ত থাকে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জরায়ুর নিম্নাংশ প্রসারিত হইয়া যোনিতে (Vagina) পরিণত হইয়াছে।

মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ ও পক্ষী শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের ডিম্বনালীর গাত্রে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত পদার্থ ডিম্বাণুকে সুরক্ষিত রাখে।

মানুষের জনন তন্ত্র (Reproductive System of Man)

মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী। বহিঃজনন অঙ্গের দ্বারা পুরুষ এবং স্ত্রীকে সহজেই আলাদা করা যায়।

পুংজনন তন্ত্র (Male Reproductive System): মানুষের পুংজনন তন্ত্র একজোড়া শুক্রাশয়, একজোড়া শুক্রনালী, শুক্রথলি, ক্ষেপণ নালী, প্রস্টেট গ্রন্থি, কাউপারের গ্রন্থি (Cowper's gland) এবং পুংজননেন্দ্রিয় (Penis) লইয়া গঠিত।

মানুষের **শুক্রাশয়** দুইটি ডিম্বাকৃতি এবং ইহা শুক্ররজ্জু দ্বারা শুক্রাশয় থলিতে (Scrotum) প্রলম্বিত থাকে। শুক্রাশয়ের মধ্যে অসংখ্য সেমিনিফেরাস টিউবিউল বর্তমান এবং ইহারা একত্রিত হইয়া **এপিডিডাইমিস** (Epididymis) গঠন করে। পরে ইহা **শুক্রনালীর** সহিত যুক্ত হয়। শুক্রনালী মূত্রাশয়ের উপর দিয়া নিচে নামিবার সময় শুক্রথলির (Seminal vesicle) সহিত মিলিত হয় এবং ইহার পর ক্ষেপণ নালী রূপে প্রস্টেট গ্রন্থির মধ্য দিয়া মূত্রনালীর (Urethra) সহিত যুক্ত হয়। কাউপারের গ্রন্থি পরে মূত্রনালীর সহিত মিলিত হয় এবং অবশেষে ইহা পুংজননেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাহিরে উন্মুক্ত হয়।

স্ত্রীজনন তন্ত্র (Female Reproductive System): একজোড়া ডিম্বাশয়, একজোড়া ডিম্বনালী, একটি জরায়ু, ব্যারথোলিন গ্রন্থি, যোনি এবং জনন ছিদ্র লইয়া স্ত্রীজনন তন্ত্র গঠিত। দেহের উভয় পার্শ্বে প্রতিটি ডিম্বাশয় শ্রোণীগহ্বরের পশ্চাদ্‌প্রাচীরে

অবস্থিত। ডিম্বাশয়টি পেরিটোনিয়ামের প্রশস্ত যোজকের ডিম্বাশয় বন্ধনী এবং ডিম্বাশয় ঝিল্লী দ্বারা সঠিক স্থানে প্রলম্বিত থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয়ের অতি নিকটে ডিম্বনালীর ফানেলের মত মুখটি অবস্থিত এবং ইহা জরায়ুতে প্রবেশ করে। জরায়ুর দুইটি অংশ— উপরের অংশকে জরায়ুদেহ এবং নিচের অংশকে জরায়ুকণ্ঠ (Cervix)। এই জরায়ুকণ্ঠটি প্রলম্বিত হইয়া যোনিতে (Vagina) পরিণত হইয়াছে। যোনিদ্বার হইতে জরায়ুকণ্ঠ পর্যন্ত যোনিপথের দূরত্ব প্রায় 10 cm। যোনিদ্বার দুইটি ত্বক স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। উপরের স্তরকে লেবিয়া মেজোরা (Labia majora) এবং ভিতরের স্তরকে লেবিয়া মাইনোরা (Labia minora) বলে। এই দুইটি স্তরের ঊর্ধ্ব সংযোগস্থলে ক্লিটোরিস (Clitoris) অবস্থিত। ব্যারথোলিন গ্রন্থি (Bartholin gland) যোনিদ্বারের পশ্চাতে অবস্থিত যোনিপথে উন্মুক্ত হয়।

বিশেষ জনন পদ্ধতি (Special types of reproduction):

A. **অ্যাপোমিক্সিস** (Apomixis): নিষেক ব্যতীত ভ্রূণের সৃষ্টিকে **অ্যাপোমিক্সিস** বলে। ইহা তিন প্রকার, যথা—

1. **অ্যাপোস্পোরি** (Apospory): যখন স্বাভাবিক ডিপ্লয়েড রেণুধর উদ্ভিদের কোষ মায়োসিস প্রক্রিয়ায় রেণু উৎপন্ন না করিয়া লিঙ্গধর উদ্ভিদের সৃষ্টি করে তাহাকে **অ্যাপোস্পোরী** বলে। মস, ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদে এই ধরনের জনন দেখা যায়।

2. **অ্যাপোগ্যামি** (Apogamy): যখন লিঙ্গধর উদ্ভিদের কোষ ভ্রূণ গঠনের মাধ্যমে সরাসরি রেণুধর উদ্ভিদের সৃষ্টি করে তাহাকে **অ্যাপোগ্যামী** বলে। এই ধরনের জনন ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদে দেখা যায়।

3. **অপুংজনি** (Parthenogenesis, গ্রীক শব্দ Partheno=unmarried (অবিবাহিত) এবং genesis=জন্ম) : সাধারণত উচ্চস্তরের জীবদের নিষিক্ত ডিম্বাণুর ক্রমবিভাজন ও ক্রমবর্ধন হইয়া ভ্রূণ সৃষ্টি করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ডিম্বাণু নিষিক্ত না হইয়াও ভ্রূণ উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত পদ্ধতিতে ভ্রূণ সৃষ্টিকে **অপুংজনি** বলে।

সংজ্ঞা (Definition): **যে পদ্ধতিতে অনিষিক্ত ডিম্বাণু হইতে অপত্য জীব সৃষ্টি হয় তাহাকে অপুংজনি (Parthenogenesis) বলে।**

অপুংজনি দুই প্রকার, যথা—প্রাকৃতিক অপুংজনি এবং কৃত্রিম অপুংজনি।

(i) **প্রাকৃতিক অপুংজনি** (Natural parthenogenesis)—যখন প্রাকৃতিক নিয়মে জীবের অপুংজনি সংঘটিত হয় তাহাকে **প্রাকৃতিক অপুংজনি** বলে। অ্যাফিড, মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়া প্রভৃতি পতঙ্গের ক্ষেত্রে এইরূপ অপুংজনি দেখা যায়। আবার উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মিউকর, স্পাইরোগাইরা, কারা (Chara), সেলাজিনেল্লা প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক অপুংজনি পরিলক্ষিত হয়।

অনিষিক্ত ডিম্বাণুতে ক্রোমোসোম সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া ইহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

(a) **হ্যাপ্লয়েড অপুংজনি** (Haploid parthenogenesis): প্রকৃতিতে অনিষিক্ত হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু ক্রমাগত বিভাজনের ফলে নূতন অপত্যের সৃষ্টি হয় তাহাকে

হ্যাপ্লয়েড অপুংজনি বলে। মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতি পতঙ্গের ক্ষেত্রে এই জাতীয় অপুংজনি দেখা যায়। হ্যাপ্লয়েড অপুংজনির মাধ্যমে পুরুষ মৌমাছির সৃষ্টি হয়। তামাক, কাকমাছি প্রভৃতি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অপুংজনি দেখা যায়।

(b) **ডিপ্লয়েড অপুংজনি** (Diploid parthenogenesis) : যখন অস্বাভাবিক মায়োসিসের ফলে উৎপন্ন অনিষিক্ত ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু হইতে অপত্যের সৃষ্টি হয় তাহাকে **ডিপ্লয়েড অপুংজনি** বলে। যেমন—অ্যাফিড, ডাফনিয়া, আর্টিমিয়া প্রভৃতি সন্ধীপদ প্রাণী, নিমাটিনি প্রাণীদের ক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড অপুংজনি দেখা যায়।

(ii) **কৃত্রিম অপুংজনি** (Artificial parthenogenesis) : স্বাভাবিক নিষেক ব্যতীত ভৌত প্রক্রিয়ায় (তাপ, সুঁচ ফোটানো, রাসায়নিক পদার্থ, অতিবেগুনী রশ্মি প্রভৃতি) অনিষিক্ত ডিম্বাণুকে উত্তেজিত করিলে উহারা পরিস্ফুটিত (Hatching) এবং পরিস্ফুরিত (Development) হইয়া অপত্যের সৃষ্টি করে তাহাকে **কৃত্রিম অপুংজনি** বলে। যেমন—অঙ্গুরীমাল পর্বভুক্ত প্রাণী, তারামাছ, উভচর প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ধরনের অপুংজনি পরিলক্ষিত হয়।

B. **নিওটেনি ও পিডোজেনেসিস** (Neoteny and Paedogenesis) : কোন কোন উভচর শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের লার্ভা দশা কখনও কখনও অস্থায়ী বা স্থায়ী হয়। এই অবস্থাকে **নিওটেনি** বলে। যে প্রক্রিয়ায় এই সমস্ত প্রাণী লার্ভা দশায় জনন ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকে **পিডোজেনেসিস** বলে। যেমন—অ্যাক্সোলোট্‌ল্ লার্ভার ক্ষেত্রে নিওটেনি ও পিডোজেনেসিস দেখা যায়।

অযৌন জনন ও যৌন জননের পার্থক্য (Differences between Asexual and Sexual Reproduction) :

অযৌন জনন	যৌন জনন
(1) অযৌন জনন একটি সরল জনন পদ্ধতি এবং সাধারণত নিম্নশ্রেণীর জীবে ইহা দেখা যায়।	(1) যৌন জনন একটি জটিল জনন পদ্ধতি এবং উন্নত শ্রেণীর জীবে ইহা দেখা যায়।
(2) অযৌন জননে একটি জীবের প্রয়োজন।	(2) যৌন জননে সাধারণত পুরুষ ও স্ত্রী জীবের প্রয়োজন অথবা পুংজনন অঙ্গ এবং স্ত্রীজনন অঙ্গের উপস্থিতি প্রয়োজন।
(3) অযৌন জননে উৎপন্ন অপত্য জীবের সংখ্যা বেশী।	(3) যৌন জননে উৎপন্ন জীবের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।
(4) উৎপন্ন জীবে নূতন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।	(4) উৎপন্ন জীবে নূতন নূতন বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটে।
(5) এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন জীব অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ায় ইহাদের অভিযোজন ক্ষমতা কম।	(5) এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন জীব সুস্থ, সবল ও সতেজ হওয়ায় ইহাদের অভিযোজন ক্ষমতা বেশী।

অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন জননের সুবিধা ও অসুবিধা :

অঙ্গজ জননের সুবিধা (Advantages of Vegetative Reproduction) :

(1) অঙ্গজ জনন অতি সরল জনন পদ্ধতি, কোন বিশেষ অঙ্গ বা কৌশলের প্রয়োজন হয় না।

(2) অল্প সময়ের মধ্যে ফুল ও ফল ধরে।

(3) মাতৃ উদ্ভিদের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ফুল ও ফলের সৃষ্টি হয়।

(4) যে সকল উদ্ভিদের বীজ উৎপন্ন হয় না, তাহাদের অঙ্গজ জনন একমাত্র বংশবিস্তারের পদ্ধতি।

অঙ্গজ জননের অসুবিধা (Disadvantages of Vegetative Reproduction) :

(1) নূতন বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টি হইতে পারে না।

(2) এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন উদ্ভিদের অভিযোজন ক্ষমতা কম।

(3) বহুদিন ধরিয়া জনন সম্পন্ন হইলেও ফুল ও ফলের গুণগত মান লোপ পাইতে থাকে।

অযৌন জননের সুবিধা (Advantages of Asexual Reproduction) :

(1) এই পদ্ধতিতে একটিমাত্র জীব মাইটোসিস পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করে এবং যৌন মিলনের প্রয়োজন হয় না।

(2) অসংখ্য জীবের সৃষ্টি হয়।

অযৌন জননের অসুবিধা (Disadvantages of Asexual Reproduction) :

(1) এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন জীবের মধ্যে বৈচিত্র্য বা প্রকরণ বা নূতন বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনা নাই।

(2) অভিযোজন ক্ষমতা কম হওয়ায় উৎপন্ন জীব ক্রমশ ক্ষীণকায় হইয়া পড়ে।

যৌন জননের সুবিধা (Advantages of Sexual Reproduction) :

(1) যৌন জননে উৎপন্ন জীবে নূতন নূতন গুণ বা বৈচিত্র্য আসে।

(2) উৎপন্ন জীব সুস্থ, সবল ও রোগ প্রতিরোধক্ষম হয়।

(3) উৎপন্ন জীবের অভিযোজন ক্ষমতা বেশী।

(4) যৌন জনন অভিব্যক্তির প্রধান হাতিয়ার।

যৌন জননের অসুবিধা (Disadvantages of Sexual Reproduction) :

(1) গ্যামেটের মিলনের প্রয়োজন আবশ্যক এবং মিলন পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল।

(2) উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যৌন জননের নিমিত্ত পরাগমিলনের জন্য বাহকের প্রয়োজন।

(3) নবজাত জীব পূর্ণাঙ্গ হইতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়।

(4) উন্নত প্রাণীদের যৌন মিলনে পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণীর প্রয়োজন হয়।

বিষয়-সংক্ষেপ

যে প্রক্রিয়ায় জীব নিজের অনুরূপ জীব তথা বংশধর সৃষ্টি করিয়া প্রজাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে তাহাকে জনন বলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জননের উদ্দেশ্য একই হইলেও উহাদের জনন পদ্ধতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

উদ্ভিদের জনন পদ্ধতি তিন প্রকার—অঙ্গজ জনন, অযৌন জনন ও যৌন জনন। যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন কোন অংশ বৃদ্ধি পাইয়া নূতন জীব সৃষ্টি করে তাহাকে অঙ্গজ জনন বলে। ইহা খণ্ডীভবন (স্পাইরোগাইরা); মুকুলোদগম (ঈস্ট), মূল দ্বারা (রাঙা আলু), কাণ্ড দ্বারা (আলু), পাতার দ্বারা (পাথরকুচি), বুলবিল (খামালু) দ্বারা সম্পন্ন করে। মানুষ তাহার প্রয়োজনে শাখাকলম, দাবাকলম, গুটি-কলম, জোড়কলম প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্ভিদের অঙ্গজ জনন ঘটাইয়া থাকে। দুইটি ভিন্নধর্মী জননকোষের মিলন ব্যতীত নূতন জীব সৃষ্টির পদ্ধতিকে অযৌন জনন বলে। অযৌন জনন সাধারণত রেণু বা স্পোরের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। অযৌন জনন দ্বি-বিভাজন (ব্যাকটিরিয়া) ও বহুবিভাজন (মিউকর) পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়।

দুইটি ভিন্নধর্মী জননকোষের মিলনের মাধ্যমে নূতন জীব সৃষ্টির পদ্ধতিকে যৌন জনন বলে। ইহা দুই প্রকার—সংশ্লেষ ও সিনগ্যামি। সরলতম যৌন জননের পদ্ধতিকে সংশ্লেষ বলে। স্পাইরোগাইরায় এই ধরনের জনন দেখা যায়। উন্নত জীবের যৌন জননের পদ্ধতিকে সিনগ্যামি বলে। সিনগ্যামি তিন প্রকার :

(i) আইসোগ্যামি—যেখানে সম আকৃতির দুইটি গ্যামেটের মিলন সম্পন্ন হয়। ক্ল্যামাইডোমোনাসে ইহা দেখা যায়।

(ii) অ্যানাইসোগ্যামি—যেখানে দুইটি অসম আকৃতিযুক্ত ও ভিন্নধর্মী গ্যামেটের মিলন সম্পন্ন হয়। ক্ল্যামাইডোমোনাসে ইহা দেখা যায়।

(iii) উগ্যামি—যেখানে পুংজনন কোষ বা শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন সম্পন্ন হয়। যেমন—উন্নত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের এইরূপ জনন দেখা যায়।

প্রাণিজগতে দুই প্রকার জনন দেখা যায়, যথা—অযৌন জনন ও যৌন জনন। অযৌন জনন দ্বি-বিভাজন (অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম প্রভৃতি), বহুবিভাজন (অ্যামিবা, প্লাসমোডিয়াম প্রভৃতি), কোরকোদগম (স্পঞ্জ, হাইড্রা, ওবেলিয়া প্রভৃতি), পুনরুৎপাদন (স্পঞ্জ, হাইড্রা, প্লানেরিয়া প্রভৃতি) ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। উচ্চ স্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে কেবল যৌন জনন পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকার জনন পুরুষের শুক্রাণু এবং স্ত্রীর ডিম্বাণুর মিলন বা নিষেকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। নিষেক প্রক্রিয়া চারি প্রকার—বহিঃনিষেক, আন্তঃনিষেক, স্বনিষেক এবং পর-নিষেক। সন্তান উৎপাদনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রাণীদের তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। যথা—অণ্ডজ (আরশোলা, মাছ, ব্যাঙ, পাখী প্রভৃতি), জরায়ুজ (স্তন্যপায়ী) এবং অণ্ড জরায়ুজ (হাঙ্গর, কিছু সরীসৃপ)।

উপরি-উক্ত দুই প্রকার জনন ব্যতীত প্রাণীদের বিশেষ জনন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। অ্যাপোমিক্সিস, অ্যাপোস্পোরি, অপুংজনি এবং পিডোজেনেসিস উল্লেখযোগ্য।

যে প্রক্রিয়ায় অনিষিক্ত ডিম্বাণু হইতে অপত্য জীবের সৃষ্টি হয় তাহাকে অপুংজনি বলে। এই ধরনের জনন প্রক্রিয়া মিউকর, স্পাইরোগাইরা, কারা প্রভৃতি উদ্ভিদে এবং বোলতা, মৌমাছি, পিঁপড়া, অ্যাফিড প্রভৃতি প্রাণীদের দেখা যায়।

প্রশ্নাবলী

A. পার্থক্য নির্দেশ কর :

1. যৌন জনন ও অযৌন জনন।
2. দ্বি-বিভাজন ও কোরকোদ্গম।
3. আইসোগ্যামি ও অ্যানাইসোগ্যামি।
4. স্বনিষেক ও ইতর নিষেক।
5. অণ্ডজ ও অণ্ডজরায়ুজ প্রাণী।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

1. অঙ্গজ জনন কাহাকে বলে ?
2. বুলবিল কি ?
3. কনজুগেশান বা সংশ্লেষ এবং সিনগামির পার্থক্য কি ?
4. দ্বিনিষেক কাহাকে বলে ?
5. জনুঃক্রম কাহাকে বলে ?
6. বহিঃনিষেক ও আন্তঃনিষেক বলিতে কি বুঝ ?
7. অপুংজনি কাহাকে বলে ?
8. নিওটেনি ও পিডোজেনেসিস বলিতে কি বুঝ ?
9. যৌন দ্বিরূপতা কাহাকে বলে ?
10. উভলিঙ্গ প্রাণীদের সবসময় স্বনিষেক ঘটেনা কেন ?

C. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

1. উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার অঙ্গজ জননের বর্ণনা দাও।
2. কলম কাহাকে বলে ? বিভিন্ন প্রকার কলমের বর্ণনা দাও।
3. সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেকের কৌশল বর্ণনা কর।
4. অঙ্গজ জনন, অযৌন জনন ও যৌন জননের দোষ ও গুণ উল্লেখ কর।
5. একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর জননতন্ত্রের বর্ণনা দাও।

চতুর্দশ অধ্যায় / হর্মোন (Hormone)

14.1 1902 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বেলিস (Bayliss) লক্ষ্য করেন যে জীবদেহের স্বাভাবিক ও সুসংহত বৃদ্ধি এবং জননের জন্য প্রধান খাদ্যোপাদান (শর্করা, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল) ব্যতীত এক প্রকার জৈব পদার্থ অতি অল্প পরিমাণ প্রয়োজন হয়। 1905 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বেলিস ও স্টার্লিং (Bayliss & Starling) এই অজানা বস্তুর নামকরণ করেন হর্মোন। কিন্তু হর্মোন শব্দটি সর্বপ্রথম হার্ডি (Hardy) ব্যবহার করেন। গ্রীক শব্দ হর্মাও (Hormao=to excite বা উত্তেজনা সৃষ্টি করা) হইতে ইংরেজী শব্দ হর্মোনের উৎপত্তি।

হর্মোন অতি অল্পমাত্রায় প্রয়োজন হইলেও জীবদেহে সংশ্লেষিত হয় এবং জীবদেহের বিভিন্ন জৈবনিক ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে। প্রাণিদেহে স্নায়ুতন্ত্র যেমন বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়সাধন করে তেমনি হর্মোন জীবদেহের বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার সমন্বয়সাধন করে। এই প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক সমন্বয় (Chemical co-ordination) বলে। তবে স্নায়ুর প্রভাব আকস্মিক ও স্বল্পস্থায়ী কিন্তু হর্মোনের কাজ ধীর, ক্রমান্বয়িক ও সুদূরপ্রসারী। তাই স্নায়ুতন্ত্রকে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ও হর্মোনকে ডাক-ব্যবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

যে সকল জৈব রাসায়নিক পদার্থ জীবদেহের নির্দিষ্ট কতকগুলি কোষ বা গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হইয়া সাধারণত সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে দূরে বাহিত হয় এবং সেই স্থানের কোষসমূহের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে তাহাকে হর্মোন উদ্বোধক বলে। হর্মোন উৎপত্তিস্থল হইতে দূরে বার্তা বহন করে এবং জীবদেহের বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে বলিয়া ইহাকে রাসায়নিক দূত (Chemical messenger) বলে।

14.2. হর্মোনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of hormone) :

(a) হর্মোন একপ্রকার জটিল জৈব যৌগ যাহা খুব অল্পমাত্রায় কার্য করে।

(b) ইহা কোষ বা নালীবিহীন গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হয়।

(c) সাধারণত উৎপত্তিস্থল হইতে সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে দূরে বাহিত হয়।

(d) ইহাদের কার্য সমাপ্ত হইলে ইহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় অথবা দেহ হইতে অপসারিত হয়।

(e) উৎস গ্রন্থির বাহিরে ইহারা কখনও ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকে না।

(f) সাধারণত ইহারা জলে দ্রাব্য ও নিম্ন আণবিক ভরযুক্ত।

(g) ইহারা যে কোন জৈবনিক ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে কিন্তু কোন বিক্রিয়া আরম্ভ করাইতে পারে না।

(h) ইহাদের কার্য ধীর, ক্রমান্বয়িক ও সুদূরপ্রসারী।

14.3 হর্মোনের কার্যপদ্ধতি (Mechanism of hormone action) :

হর্মোন কিভাবে শারীরবৃত্তীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জীবের অঙ্গ পরিস্ফুরণে সাহায্য করে সে-সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বিভিন্ন মতবাদ আছে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হর্মোনের কার্যপদ্ধতি বিভিন্ন। তবে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতানুযায়ী অক্সিন হর্মোন দুইটি পদ্ধতিতে কোষের বৃদ্ধি ঘটায়। প্রথমত, অক্সিন কোষের সংস্পর্শে আসিলে সাইটোপ্লাজম হইতে প্রোটন (H^+) কোষের বাহিরে আসিবে এবং একটি আম্লিক মাধ্যমের সৃষ্টি করে। এই আম্লিক মাধ্যমে হর্মোনের প্রভাবে কোষস্থ উৎসেচক সক্রিয় হইয়া কোষপ্রাচীরকে নমনীয় করিয়া তোলে, ফলস্বরূপ কোষের দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি ঘটে। এই ঘটনাটি কোষের মধ্যে খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয়ত, হর্মোন কোষ মধ্যস্থ কোন গ্রাহক প্রোটিনের (Receptor protein) সঙ্গে যুক্ত হইয়া কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কোষের বিশেষ একটি জীন বা DNA-র কার্যকর স্থান সক্রিয় করে। ফলস্বরূপ প্রয়োজনীয় প্রোটিন বা উৎসেচক তৈয়ারি হয় যাহা বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অক্সিন ব্যতীত জিব্বেরেলিন, সাইটোকাইনিন প্রভৃতি উদ্ভিদ হর্মোনও এইভাবে ক্রিয়া করে।

প্রাণীদের হর্মোনের কার্যপ্রকৃতি ভিন্ন প্রকৃতির। বিজ্ঞানী সুথারল্যাণ্ড (Sutherland) ও জেঙ্কের (Zenk) মতে প্রাণী হর্মোনগুলি কোষপর্দায় উপস্থিত অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ (Adenyl cyclase) নামক উৎসেচককে সক্রিয় করিলে কোষের মধ্যে ATP-র উপস্থিতিতে cAMP (সাইক্লিক অ্যাডিনোসিন মনোফসফেট) প্রস্তুত হয়। এই cAMP বিভিন্ন উৎসেচককে সক্রিয় করিয়া অথবা একটি নির্দিষ্ট জীনকে প্রভাবিত করিয়া বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্য পরিচালনা করে। এই প্রক্রিয়ায় হর্মোনগুলি প্রাথমিক বার্তাবহ (First messenger) ও cAMP দ্বিতীয় বার্তাবহের (Second messenger) কাজ করে।

অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে হর্মোন এই পদ্ধতিতে বিক্রিয়া করিলেও কতিপয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হর্মোন এই পদ্ধতিতে বিক্রিয়া করে বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে অধিকাংশ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই ধরনের বিক্রিয়া ঘটে কিনা তাহা আজও পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই।

14.4 উদ্ভিদ হর্মোন (Plant hormones)

পুষ্টি পদার্থ (Nutrients) ব্যতীত উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কার্যে সাহায্যকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী জৈব যৌগকে সমষ্টিগতভাবে উদ্ভিদ হর্মোন বা ফাইটো-হর্মোন (Phytohormones) বলে। ইহারা মূল, কাণ্ড, পাতা, মুকুল, পুষ্প, পুষ্পমঞ্জরী প্রভৃতি অঙ্গে সংশ্লেষিত হইয়া সাধারণত সংবহন কলার মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয়। উদ্ভিদদেহে হর্মোন সামগ্রিক বৃদ্ধি, পরিস্ফুরণ, কোষ বিভাজন, মুকুল গঠন, বীজের অংকুরোদগম, ফুলের প্রস্ফুটন, ফলোৎপাদন প্রভৃতি কার্য নিয়ন্ত্রণ করে।

1880 খ্রীষ্টাব্দে চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) সর্বপ্রথম উদ্ভিদদেহে বৃদ্ধিসহায়ক পদার্থ বা হর্মোনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। তিনি একপ্রকার ঘাস জাতীয়

উদ্ভিদের ভ্রূণমুকুলাবরণীর* (coleoptile) উপর আলোকের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে উদ্ভিদের কাণ্ডের অগ্রভাগে এমন এক উত্তেজক পদার্থ থাকে যাহা বৃদ্ধি ও আলোকবৃত্তি চলন নিয়ন্ত্রণ করে। পরবর্তীকালে স্যাকস্ (Sachs), বয়সেন-জেনসেন (Boysen-Jensen), ওয়েণ্ট (Went), কোগল্ (Kogl), থিমান (Thimann) প্রমুখ বিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে ডারউইনের মতবাদকে সমর্থন করেন।

ওয়েণ্টের পরীক্ষা (Went's experiment) : 1928 খ্রীষ্টাব্দে ওয়েণ্ট জই (Oat)-এর ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগ কর্তন করিয়া দেখান যে কর্তিত অংশ ব্যতীত ভ্রূণকাণ্ডের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ঐ কর্তিত অংশ পুনরায় যথাস্থানে বসাইলে বৃদ্ধি পুনরায় শুরু হয়। আবার কর্তিত অংশকে আগার (Agar) খণ্ডের [একপ্রকার জেলি জাতীয় পদার্থ] উপর কয়েক ঘণ্টা রাখিবার পর শুধু আগার খণ্ডটিকে ঐ কর্তিত
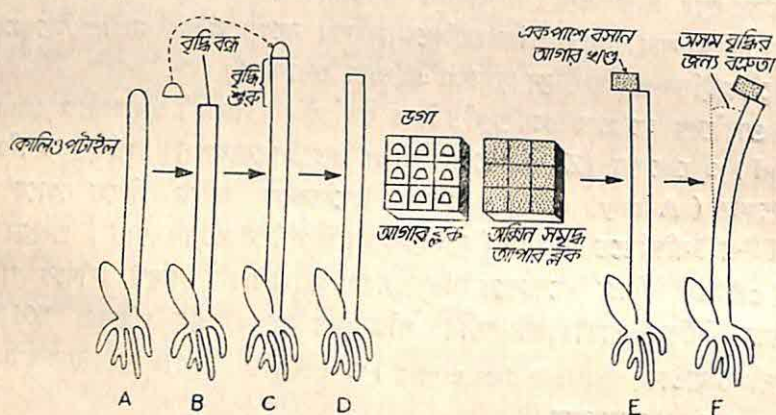
14.1 : ওয়েণ্টের পরীক্ষা (A-F = পরীক্ষার বিভিন্ন পর্যায়)

ভ্রূণকাণ্ডের উপর স্থাপন করিলে ভ্রূণকাণ্ডের বৃদ্ধি পুনরায় শুরু হয়। আবার আগার খণ্ডটি কর্তিত ভ্রূণকাণ্ড বা ভ্রূণমুকুলাবরণীর একপার্শ্বে স্থাপন করিলে ভ্রূণকাণ্ডের একপার্শ্বীয় বৃদ্ধি দেখা যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে ভ্রূণকাণ্ডের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় হর্মোন ভ্রূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগের কোষ হইতে নিঃসৃত হয়। ওয়েণ্ট বৃদ্ধিসহায়ক এই হর্মোনের নাম দেন অক্সিন।

14.5 **উদ্ভিদ হর্মোনের শ্রেণীবিভাগ** (Classification of plant hormones) : উদ্ভিদ হর্মোনকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—

(i) **প্রাকৃতিক** (Natural)—উদ্ভিদদেহে সংশ্লেষিত হর্মোনকে প্রাকৃতিক হর্মোন বলে। উদ্ভিদদেহ হইতে ইহাদের অন্তরিত বা পৃথকীকরণ (Isolated) করিয়া

* ভ্রূণমুকুলাবরণী (Coleoptile)—একবীজপত্রী উদ্ভিদের ভ্রূণমুকুল যে আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে তাহাকে ভ্রূণমুকুলাবরণী বা কলিওপটাইল বলে।

ইহাদের রাসায়নিক গঠন বা শারীরবৃত্তীয় কার্য সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব হইয়াছে। যেমন—অক্সিন (Auxin), জিব্বেরেলিন (Gibberellin), সাইটোকাইনিন (Cytokinin), অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (Abscissic acid)।

(ii) **কৃত্রিম** (Artificial)—প্রাকৃতিক হর্মোনের ন্যায় কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিদ অঙ্গের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণে সাহায্য করে। ইহারা জীবদেহে সংশ্লেষিত হয় না বলিয়া ইহাদের কৃত্রিম হর্মোন বলে। রসায়নাগারে ইহাদের প্রস্তুত করা হয়। যেমন—ইনডোল বিউটারিক অ্যাসিড (IBA), ইনডোল প্রোপায়োনিক অ্যাসিড (IPA), ন্যাপথক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড (NAA), 2,4-ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড (2,4D) প্রভৃতি।

(iii) **প্রকল্পিত** (Postulated)—এই জাতীয় হর্মোন উদ্ভিদদেহে সংশ্লেষিত হইলেও ইহাদের রাসায়নিক গঠন ও কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায় নাই। যেমন—ফ্লোরিজেন (Florigen), রাইজোকলাইন (Rhizocaline), ফাইলোকলাইন (Phyllocaline), কলোকলাইন (Caulocaline)।

14.6 অক্সিন

অক্সিনই প্রথম আবিষ্কৃত উদ্ভিদ হর্মোন। 1934 খ্রীষ্টাব্দে কোগ্‌ল (Kogl) ও তাঁহার অন্যান্য সহকর্মী সর্বপ্রথম উদ্ভিদদেহ হইতে অক্সিন পৃথকীকরণ করিয়া ইহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন। ইহা সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়। অক্সিন দুইটি অবস্থায় থাকে—মুক্ত অক্সিন (Free auxin) ও বদ্ধ অক্সিন (Bound auxin)। মুক্ত অক্সিন সহজেই ব্যাপন প্রক্রিয়ায় স্থানান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু বদ্ধ অক্সিন প্রোটিনের সহিত অক্সিন-প্রোটিন যৌগ অবস্থায় থাকে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ঘনত্বের অক্সিনের প্রয়োজন হয়। যেমন বেশী ঘনত্বের অক্সিন কাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটায়, কিন্তু কম ঘনত্বের অক্সিন মূলের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। অক্সিন উদ্ভিদের অগ্রস্থ ভাজক কলা ও বর্ধনশীল কোষ হইতে নিঃসৃত হয়। সকল অক্সিন ট্রিপটোফ্যান (Tryptophan) নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড হইতে সংশ্লেষিত হয়।

অক্সিনের প্রকারভেদ (Types of auxin): অক্সিন তিন প্রকার। যথা—

(i) **অক্সিন** a বা অক্সিনোট্রায়োলিক অ্যাসিড (Auxenotriolic acid—$C_{18}H_{32}O_5$)

(ii) অক্সিন b বা অক্সিনোলোনিক অ্যাসিড (Auxenolonic acid—$C_{18}H_{30}O_4$)

(iii) হেটারো অক্সিন বা ইনডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (Heteroauxin or Indole acetic acid বা IAA—$C_{10}H_9O_2N$)

অক্সিনের কার্য (Functions of auxin)

1. **বৃদ্ধি** (Role in growth): অক্সিন নিম্নলিখিত উপায়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, তাই ইহাকে বৃদ্ধি সহায়ক হর্মোন (Growth hormone) বলে।

(i) **কোষ বিভাজন** (Cell division)—অক্সিন কোষ বিভাজনে সাহায্য করে। অক্সিনের অভাবে মাইটোসিস ব্যাহত হয়।

(ii) **কোষ বৃদ্ধি** (Cell elongation)—অক্সিনের প্রভাবে কোষপ্রাচীর নমনীয় হয়। ফলস্বরূপ কোষ প্রসারিত হয় বা কোষের আয়তন বৃদ্ধি পায়।

(iii) **অগ্রস্থ প্রভাব বা অগ্রমুকুলের প্রাধান্য** (Apical dominance)—অক্সিন পার্শ্বমুকুলের বৃদ্ধি ব্যাহত করিয়া অগ্রমুকুলের বৃদ্ধি ঘটায়, ফলে কাণ্ডের সামগ্রিক দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি ঘটে।

(iv) **মূলের বৃদ্ধি ও মূলোদ্গম** (Growth of root and root initiation)—কম ঘনত্বের অক্সিনের প্রভাবে মূলের দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু বেশী ঘনত্বের অক্সিন অসংখ্য শাখামূল সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

(v) **ক্যাম্বিয়ামের সক্রিয়তা** (Activity of Cambium)—উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধির সময় অক্সিনের প্রভাবে ক্যাম্বিয়াম ক্রমাগত বিভক্ত হইয়া জাইলেম ও ফ্লোয়েম গঠন করে।

(vi) **ক্যালাস গঠন** (Callus formation)—অক্সিনের প্রভাবে বহির্মজ্জা ও মজ্জার প্যারেনকাইমা কোষের দ্রুত বিভাজন ঘটে। ইহার ফলে উদ্ভিদের সংশ্লিষ্ট অঙ্গের যে স্ফীতি (swelling) ঘটে তাহাকে ক্যালাস বলে।

2. **চলন** (Role in movement) : উদ্ভিদের আলোকবৃত্তি (Phototropic movement) ও অভিকর্ষবৃত্তি (Geotropic movement) চলনে অক্সিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান।

(i) **আলোকবৃত্তি**—আলোর প্রভাবে অক্সিন আলোর বিপরীত পার্শ্বে অর্থাৎ অন্ধকার স্থানে অধিক সঞ্চিত হয়। সুতরাং কাণ্ডের আলোক পার্শ্ব অপেক্ষা অন্ধকার পার্শ্বের অধিক বৃদ্ধি ঘটে এবং আলোর দিকে কাণ্ড ধাবিত হয়।
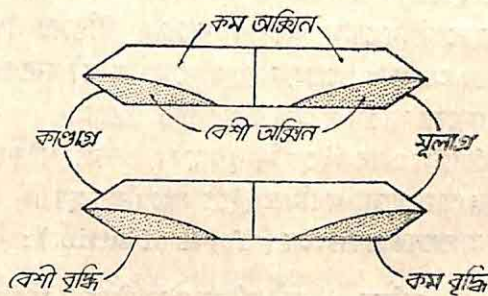
(ii) **অভিকর্ষবৃত্তি**—অভিকর্ষ বলের প্রভাবে কাণ্ডের নিচের দিকে বেশী অক্সিন সঞ্চিত হয়। ফলে কাণ্ডের নিম্নভাগের কোষগুলি দ্রুত বিভাজিত হয় এবং কাণ্ড উর্ধ্বমুখী হয়। অপরপক্ষে, একই বলের প্রভাবে মূলাগ্রে বেশী পরিমাণ অক্সিন সঞ্চিত হয়।
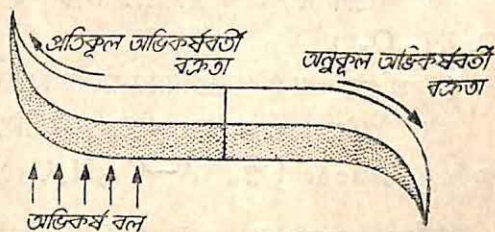
চিত্র 14.2 : অভিকর্ষবৃত্তিতে অক্সিনের ভূমিকা

মূলাগ্রে বেশী পরিমাণ অক্সিন ঐ অংশের কোষ বিভাজন ক্ষমতা হ্রাস করে এবং

মূলাগ্রের উপরের দিকে কোষগুলি দ্রুত বিভাজিত হইলে মূল উপরের দিকে বাঁকিয়া যায় বা অভিকর্ষের বলের দিকে গমন করে।

3. **অঙ্গ পরিস্ফুরণ** (Organ differentiation) : স্বল্প ঘনত্বের অক্সিনের প্রভাবে মূল, কাণ্ড, মুকুল ও পুষ্পের পরিস্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়।

4. **ফল গঠন** (Fruit development) : পরাগসংযোগ (Pollination) ও নিষেকের পর ডিম্বাশয়ে অক্সিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে ডিম্বাশয় ফলে ও ডিম্বক বীজে পরিণত হয়। প্রাকৃতিক অবস্থায় নিষেক না ঘটিলে অথবা ফল বিকাশে অসুবিধা ঘটিলে বাহ্যিক অক্সিন প্রয়োগ করিয়া ডিম্বাশয়কে ফলে পরিণত করা সম্ভব হয়। ফলস্বরূপ বীজহীন ফল উৎপাদিত হয়। পরাগসংযোগ ও নিষেক ব্যতীত এইরূপ বীজহীন ফল উৎপাদনকে **পার্থেনোকার্পি** (Parthenocarpy) বলে। পেঁপে, আঙ্গুর, কলা, টমাটো প্রভৃতি উদ্ভিদের এইরূপ ফল উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। বীজহীন ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশী।

5. **পত্র ও ফলমোচন** (Leaf and fruit abscission) : পত্র ও ফলমোচন পদ্ধতির সময় বৃন্তের অগ্রপ্রান্তে মোচন স্তর (Abscission layer) সৃষ্ট হয়। পরিণত অবস্থায় অক্সিনের পরিমাণ হ্রাস পাইলে মোচন স্তর হইতে পত্র অথবা ফলের পতন ঘটে। তাই নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিনের বাহ্যিক প্রয়োগ করিয়া অপরিণত অবস্থায় পত্র ও ফলের পতন রোধ করা সম্ভব।

6. **শ্বসন** (Respiration) : অধিক পরিমাণ অক্সিন পরোক্ষভাবে শ্বসন হারের (Rate of respiration) বৃদ্ধি ঘটায়।

14.7 কৃষিকার্যে অক্সিন তথা হর্মোনের ভূমিকা (Role of auxin and other hormones in agriculture) :

1. **শাখাকলমের মূলোদ্গম** (Rooting of cuttings) : গোলাপ, জবা প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিদের বীজ উৎপন্ন হয় না তাহাদের শাখাকলম দ্বারা বংশবিস্তারের সময় অক্সিন (IAA), IBA, NAA প্রভৃতি হর্মোন প্রয়োগ করিয়া মূলোদ্গম ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

2. **আগাছা নির্মূলকরণ** (Weed control) : বীরুৎনাশক (Herbicide) রূপে যে সমস্ত হর্মোন ব্যবহৃত হয় তাহারা কৃষিক্ষেত্রের ঘাস জাতীয় শস্যের কোন ক্ষতি করে না, কেবল অধিকাংশ আগাছাকে (দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ) বিনষ্ট করিতে পারে। এই হর্মোন জলে গুলিয়া মৃত্তিকায় প্রয়োগ করা হয় অথবা পাতায় স্প্রে করা হয়। হর্মোনগুলির মধ্যে 2, 4D ; MCPA (2 মিথাইল, 4 ক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড) প্রধান। আগাছা নির্মূলে ব্যবহৃত হর্মোনের পরিমাণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন।

3. **মোচন** (Abscission) বাগানে আপেল, কমলা, নাসপাতি প্রভৃতি উদ্ভিদের ফলগুলি পাকিলে একইসঙ্গে চয়ন না করিয়া 2,4D ; NAA প্রভৃতি হর্মোন প্রয়োগ করিয়া ফলমোচন ব্যাহত করা সম্ভব।

4. **ফলবৃদ্ধি ও পরিপক্কতা** (Growth and maturation of fruit): IBA ; 2,4D প্রভৃতি হর্মোন প্রয়োগ করিয়া ফলের আয়তন বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

5. **অকাল পতন রোধ** (Inhibition of shedding of immature organs): IAA প্রয়োগ করিয়া পত্র, পুষ্প ও ফলের অকাল পতন রোধ করা যায়।

6. **মুকুলোদ্গম নিবারণ** (Prevention of bud formation): IAA প্রয়োগে আলুর অকাল মুকুলোদগম রোধ করা হয়।

7. **বীজহীন ফল উৎপাদন** (Parthenocarpy): IAA, IBA প্রভৃতি হর্মোন প্রয়োগ করিয়া আঙুর, পেঁপে, তরমুজ, কলা, টমাটো প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজহীন ফল উৎপাদন করা সম্ভব। পরাগযোগ ও নিষেকের পূর্বে হর্মোন প্রয়োগ করিলে ডিম্বাশয় বীজহীন ফলে পরিণত হয়।

8. **পুষ্পোদ্গম** (Flowering): জিবেবরেলিন পুষ্পমুকুলের দ্রুত পরিবর্তন ঘটাইয়া উহার প্রস্ফুটন ত্বরান্বিত করে। আবার NAA, ইথিলীন প্রয়োগ করিলে আনারসের অঙ্গজ মুকুল পুষ্পমুকুলে রূপান্তরিত হইতে পারে।

9. **ক্ষত সারানো** (Healing of wounds): উদ্ভিদ গাত্রে ক্ষত হইলে অথবা কর্তন করা হইলে IAA, IBA প্রয়োগ করিয়া ক্যালাস গঠনের দ্বারা ক্ষতস্থান পূরণ করা হয়।

14.8 জিবেবরেলিন (Gibberellin):

1926 খ্রীষ্টাব্দে জাপানী বিজ্ঞানী কুরোসাওয়া (Kurosawa) প্রথম প্রমাণ করেন যে জিব্বারেলা ফুজিকুরই (*Gibberella fujikuroi*) নামক ছত্রাক নিঃসৃত পদার্থ ধানগাছের অতিকায় বৃদ্ধি ঘটায়। 1938 খ্রীষ্টাব্দে য়াবুটা (Yabuta) ও সুমিকি (Sumiki) ঐ ছত্রাক হইতে প্রথম হর্মোন কেলাসিত করেন এবং নামকরণ করেন জিবেবরেলিন।

অদ্যাবধি প্রায় 50টির বেশী জিবেবরেলিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের সাংকেতিক চিহ্ন GA দ্বারা ও উহাদের নিম্নে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন—GA_1, GA_2, GA_3, ··· ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে জিবেবরেলিক অ্যাসিড (GA_3—$C_{19}H_{22}O_6$) উদ্ভিদদেহে বেশী পাওয়া যায়। জিবেবরেলিন 5 কার্বনযুক্ত আইসোপ্রীন একক (Isoprene unit) দ্বারা গঠিত একপ্রকার টারপিনয়েড (Terpenoids)। পরিপক্ক বীজ, বীজপত্র, অঙ্কুরিত চারাগাছ, পত্রাগ্র প্রভৃতিতে জিবেবরেলিন উৎপন্ন হয়।

কার্যাবলী (Functions):

(1) জিবেবরেলিন কোষ বিভাজন ও কোষের আয়তন বৃদ্ধির দ্বারা কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটায়, ইহার ফলে খর্বগাছ খুব দীর্ঘ হয়।

(2) ইহার প্রভাবে গাছের পাতা, ফুল ও ফলের আয়তন বৃদ্ধি পায়।

(3) বীজ ও মুকুলের সুপ্ত দশা (Dormancy) ভাঙ্গিতে এবং বীজকে অঙ্কুরিত করিতে সাহায্য করে।

(4) জিবেবরেলিন অনেক ক্ষেত্রে ফুল ফোটাইতে সাহায্য করে।
(5) উদ্ভিদের মূলের বৃদ্ধিতে জিবেবরেলিন বাধাদান করে।
(6) জিবেবরেলিনের অল্প ঘনত্বে পুরুষ উদ্ভিদ ও স্বল্প ঘনত্বে স্ত্রী পুষ্প সৃষ্ট হয়।
(7) অক্সিনের ন্যায় ইহার প্রভাবে বীজহীন ফল সৃষ্টি হয়।

14.9 সাইটোকাইনিন (Cytokinin) :

1956 খ্রীষ্টাব্দে মিলার (Miller) ও তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ ঈষ্ট DNA হইতে কোষ বিভাজনের সক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেন এবং এই পদার্থের নাম দেন সাইটো-কাইনিন। অধিকাংশ সাইটোকাইনিন অ্যাডিনিন জাতীয় নাইট্রোজেনযুক্ত পিউরিন বা 6-ফুরফুরাইল অ্যামিনো পিউরিন (6, Furfuryl amino purine)। নারিকেলের দুধ (তরল সস্য), ভুট্টা, কলা, আপেল প্রভৃতি ফলে সাইটোকাইনিন পাওয়া যায়।

কার্যাবলী (Function) :

(1) **কোষ বিভাজন** (Cell division)—অক্সিনের সহযোগিতায় সাইটোকাইনিন কোষ বিভাজনে সাহায্য করে।

(2) **কোষের আয়তন বৃদ্ধি** (Cell enlargement)—সাইটোকাইনিনের প্রভাবে কোষের আয়তন বৃদ্ধি পায়।

(3) ইহার প্রভাবে কাণ্ডের পার্শ্বমুকুল উদ্দীপিত হইয়া বৃদ্ধিলাভ করে।

(4) সাইটোকাইনিন বিচ্ছিন্ন পত্রের (Detached leaves) ক্লোরোফিল ভাঙ্গন বিলম্বিত করে।

অক্সিন, জিবেবরেলিন ও সাইটোকাইনিন ব্যতীত কতকগুলি হর্মোন উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন কার্যে সাহায্য করে। নিম্নে এই সকল হর্মোনের নাম, উৎপত্তিস্থল ও কার্য সংক্ষেপে ছকের আকারে উল্লেখ করা হইল।

নাম	উৎপত্তিস্থল	কার্য
(1) রাইজোকলাইন	পাতা	মূল গঠনে সাহায্য করে।
(2) কলোকলাইন	মূল	কাণ্ডকে দীর্ঘ করে।
(3) ফাইলোকলাইন	বীজপত্র	পাতার বৃদ্ধি ঘটায়।
(4) অ্যাবিসিসিক অ্যাসিড বা ডরমিন	পত্র, ফল	পত্র ও ফলমোচন, বীজের সুপ্তাবস্থা বর্ধন।
(5) ইথিলিন (গ্যাসীয় হর্মোন)	পরিপক্ক ফল, কাণ্ড, পত্র	ফলের পরিপক্কতা ও পত্রমোচন।
(6) ফ্লোরিজেন	পাতা	ফুলের প্রস্ফুটন, পত্র-মুকুলের পুষ্পমুকুলে রূপান্তর।

14.10 প্রাণী হর্মোন (Animal Hormones)

জৈব অভিব্যক্তি বা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে এককোষী জীব হইতে বহুকোষী জীবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বহুকোষী জীবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন দেখা দেয় দেহের আভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা এবং বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের সমন্বয়সাধন। এই দুইটি প্রয়োজনীয়তার অভাবে প্রাণীর বিকাশের বিপর্যয় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। দেখা গিয়াছে, প্রাণীর দেহের স্নায়ুতন্ত্র ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি সম্মিলিতভাবে উপরি-উক্ত কার্যাবলীর বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে সমর্থ। প্রাণীর দেহে বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থি বর্তমান। ইহাদের মধ্যে একপ্রকার গ্রন্থি আছে যাহাদের ক্ষরিত পদার্থ নালীর মাধ্যমে বাহিত হয়। ইহাদের বহিঃস্রাবী গ্রন্থি (Exocrine glands) বলে। যেমন—লালাগ্রন্থি, যকৃত, আন্ত্রিক গ্রন্থি প্রভৃতি। আবার অন্য একপ্রকার গ্রন্থি আছে যাহাদের ক্ষরিত পদার্থ সরাসরি রক্ত প্রবাহে মিশ্রিত হয়। ইহাদের কোন নালী থাকে না। এইজন্য এই গ্রন্থিগুলিকে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি বা অনালগ্রন্থি (Endocrine glands) বলে। যেমন—পিটুইটারী গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ইত্যাদি। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত পদার্থ হর্মোন নামে পরিচিত।

14.11 নিউরোহর্মোন (Neurohormone) : প্রাণীর দেহে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির ক্ষরণ ব্যতীত স্নায়ুতন্ত্রের কিছু কিছু স্নায়ুকোষ বিশেষভাবে গঠিত হয় এবং ইহা হইতেও একপ্রকার হর্মোন নিঃসৃত হয়। এই প্রকার হর্মোনকে **নিউরোহর্মোন** বলে এবং এই বিশেষ প্রকারের স্নায়ুকোষগুলিকে **নিউরোসিক্রেটারী কোষ** (Neurosecretory cells) বলে। স্নায়ুকোষ কর্তৃক হর্মোন ক্ষরণকে **নিউরোসিক্রিশান** (Neurosecretion) বলে। স্নায়ুকোষ নিঃসৃত ক্ষরিত পদার্থ বা হর্মোন অ্যাক্সন দ্বারা বাহিত হইয়া ইহার স্ফীত শেষ প্রান্তে সঞ্চিত হয় অথবা রক্তপ্রবাহে মিশ্রিত হইয়া ক্রিয়াশীল কোষে উপস্থিত হয়। এই প্রকার স্নায়ুকোষের অ্যাক্সন অন্য স্নায়ুকোষের সহিত প্রান্তসন্নিকর্ষ (Synapse) গঠন করে না। মস্তিষ্কে অবস্থিত হাইপোথ্যালামাসে (Hypothalamus) নিউরোসিক্রেটারী কোষ বর্তমান। ইহার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ক্ষরিত পদার্থ অ্যাক্সন দ্বারা বাহিত হইয়া রক্তপ্রবাহে মিশ্রিত হয় যাহা অগ্র পিটুইটারী গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হর্মোনগুলির ক্ষরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রিত করে। হাইপোথ্যালামাস নিঃসৃত নিউরোহর্মোনকে হাইপোথ্যালমিক রিলিজিং ফ্যাক্টর (Hypothalamic releasing factor) নামে অভিহিত করা হয়। ইহা ছাড়া পিটুইটারীর পশ্চাৎখণ্ড হইতে নিঃসৃত অক্সিটোসিন (Oxytocin) এবং ভাসোপ্রেসিন (Vasopressin) প্রকৃতপক্ষে হাইপোথ্যালামাসের নিউরোসিক্রেটারী কোষে তৈয়ারি হয় এবং পিটুইটারীর পশ্চাদ্‌খণ্ডে সঞ্চিত থাকে। প্রয়োজনের সময় ইহা হইতে সঞ্চিত হর্মোন রক্তে প্রবেশ করে। অ্যাড্রিন্যাল মেডেলার নিঃসরণ সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হাইপোথ্যালামাস হইতে নিঃসৃত অধিকাংশ নিউরোহর্মোন পলিপেপটাইড জাতীয় প্রোটিন পদার্থ।

14.12 অমেরুদণ্ডী প্রাণীর হর্মোন (Hormones in invertebrates) :
অমেরুদণ্ডী প্রাণীর হর্মোন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য খুব কম জানা গিয়াছে। তবুও ইহাদের মধ্যে চ্যাপটাকৃমি, অঙ্গুরীমাল, আর্থ্রোপোডা, শম্বুক, একাইনোডার্মাটা প্রভৃতি প্রাণীর হর্মোন সম্বন্ধে কিছু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের পারস্পরিক সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার জন্য স্নায়ুতন্ত্র ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি সম্মিলিতভাবে নিউরোহর্মোন নিঃসৃত করে। ইহাদের গঠন ও কার্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর হর্মোন হইতে আলাদা। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের হর্মোন বৃদ্ধি, পরিণতি, পুনরুৎপাদন, জনন, নির্মোচন, রূপান্তর, বিপাক প্রভৃতি কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। নিম্নে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বিভিন্ন ধরনের হর্মোন আলোচনা করা হইল।

1. **ক্রোমাটোফোরোট্রোফিন** (Chromatophorotrophin): চিংড়ি জাতীয় প্রাণীর চক্ষুবৃন্তে অবস্থিত সাইনাস গ্রন্থি (Sinus gland) এবং X অঙ্গ (চক্ষুবৃন্তের
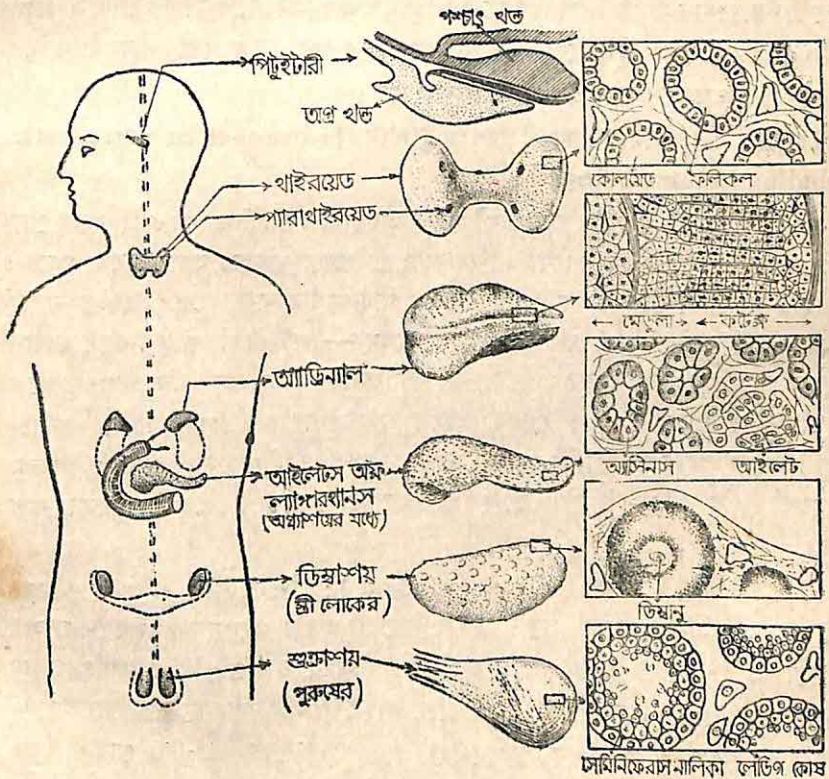
চিত্র 14.8 : মানুষের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও তাহাদের আণুবীক্ষণিক গঠন

কাছে অবস্থিত গ্যাংলিয়া) হইতে স্নায়ুক্ষরণ (Neurosecretion) দেহের এবং চক্ষুর রঞ্জক কোষগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই প্রকার হর্মোনকে ক্রোমাটোফোরোট্রোফিন হর্মোন বলে।

2. **জুভেনাইল হর্মোন** (Juvenile hormone or Neotenin) : পতঙ্গ জাতীয় অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের শূককীট দশা গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় জুভেনাইল হর্মোন। মস্তিষ্কের পিছনে **কর্পোরা কার্ডিয়াকা** (Corpora cardiaca) এবং **কর্পোরা অ্যালাটা** (Corpora allata) নামক দুইটি হর্মোন উৎপাদনকারী গ্রন্থি অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে **কর্পোরা অ্যালাটা** হইতে নিঃসৃত হয় জুভেনাইল হর্মোন যাহা শূককীট গঠন ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কিন্তু মূককীট অথবা পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্তিতে বাধা দেয়। অঙ্গুরীমাল পর্বভুক্ত প্রাণীদের (কেঁচো, জোঁক, নেরিস প্রভৃতি) ক্ষেত্রে এই হর্মোন জননতন্ত্রকে প্রভাবিত করে।

3. **একডাইসোন** (Ecdysone or Moulting hormone) : পতঙ্গের মস্তিষ্ক হইতে নিঃসৃত নিউরোসিক্রেটারী হর্মোন রক্ত দ্বারা বাহিত হইয়া বক্ষে অবস্থিত **প্রোথোরাসিক গ্রন্থিকে** (Prothoracic gland) উদ্দীপিত করে। ফলে এই গ্রন্থি হইতে **একডাইসোন** নামক নির্মোচন হর্মোন নিঃসৃত হয় যাহা শূককীটের খোলস ত্যাগ (Moulting) এবং রূপান্তরে সহায়তা করে। ইহার ফলে পতঙ্গ শূককীট হইতে মূককীট এবং অবশেষে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয়।

14.13. মানুষ-সহ মেরুদণ্ডী প্রাণীর হর্মোন (Hormones in vertebrates including human beings) :

সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির অবস্থান, গঠন, নিঃসরণ এবং কার্য প্রায় এক প্রকারের। কারণ, এক প্রাণীর হর্মোন অন্য প্রাণিদেহে ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি পৃথক পৃথক কার্যের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সংহতি বজায় রাখিয়া শারীরবৃত্তীয় কার্য সুসম্পন্ন করে। যেমন—পিটুইটারী গ্রন্থি নিঃসৃত হর্মোন দেহের অন্যান্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির (থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল, জনন অঙ্গ) নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত করে কিন্তু ইহাদের নিঃসরণ বেশী হইলে পিটুইটারীর উপর ক্রিয়া করিয়া ইহার নিঃসরণ ক্ষমতা বন্ধ করিয়া দেয়। মানুষ-সহ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হর্মোন ও তাহাদের কার্যাবলী নিম্নে আলোচনা করা হইল।

1. **পিটুইটারী গ্রন্থি** (Pituitary gland) : পিটুইটারী গ্রন্থি আকৃতিতে খুবই ছোট, একটি মটরদানার মত। ইহা মস্তিষ্কের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের তলদেশে সেল্লা টার্সিকা ও স্ফিনয়েড অস্থির মধ্যে অবস্থিত। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিটি **ইনফাণ্ডিবুলাম** (Infundibulum) নামক একটি ছোট বৃন্তের সাহায্যে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের সহিত যুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে ইহার গড় ওজন প্রায় 0·5-0·6 গ্রাম। তবে স্ত্রীলোকের পিটুইটারী পুরুষ লোকের পিটুইটারী অপেক্ষা ওজনে সামান্য ভারী।

কলাস্থান অনুযায়ী পিটুইটারী গ্রন্থিকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয় —(A) **অগ্রখণ্ড** (Anterior lobe), (B) **অন্তর্বর্তী খণ্ড** (Intermediate lobe) এবং (C) **পশ্চাৎ খণ্ড** (Posterior lobe).

পিটুইটারী গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত পদার্থকে পিটুইটারী হর্মোন বলে। এই হর্মোন দেহের অন্যান্য সমস্ত অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির নিঃসরণকে নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া ইহাকে **প্রধান গ্রন্থি** বা **মাস্টার গ্ল্যান্ড** (Master gland) বলে।

I. পিটুইটারীর অগ্রখণ্ড নিঃসৃত হর্মোনসমূহ এবং তাহাদের কার্যাবলী :

পিটুইটারীর অগ্রখণ্ড হইতে ছয়টি হর্মোন নিঃসৃত হয়। যথা—

অগ্র পিটুইটারী

GH	TSH	ACTH	FSH	LH	LTH
(বৃদ্ধি হর্মোন)	(থাইরয়েড উদ্দীপক হর্মোন)	(অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স নিয়ন্ত্রিত হর্মোন)	(ডিম্বথলি উদ্দীপক হর্মোন)	(পীতথলি উদ্দীপক হর্মোন)	(স্তনবৃদ্ধি ও দুগ্ধক্ষরণ হর্মোন)

1. **বৃদ্ধি হর্মোন** (Growth hormone or Somatotrophic hormone or GH or STH) : এই প্রকার হর্মোন দেহের সকল প্রকার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

কার্যাবলী (Functions) :

(i) **অস্থিবৃদ্ধি** (Skeletal growth)—বৃদ্ধি হর্মোন এপিফাইসিয়াল তরুণাস্থি কোষের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায়, ফলে তরুণাস্থি কোষ দীর্ঘায়িত হয়। সক্রিয় অস্টিওব্লাস্ট কোষের সৃষ্টিতে সমগ্র অস্থিফলকের বৃদ্ধি ঘটে।

(ii) **সামগ্রিক দেহবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ**—বৃদ্ধি হর্মোনের প্রভাবে দেহের পেশী, পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃত, বৃক্ক, যোগ কলা প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ অঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে। ইহা ছাড়া এই হর্মোন থাইমাস গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে, স্তন্যদাত্রীদের দুগ্ধক্ষরণ বৃদ্ধি করে।

(iii) **বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ**—ইহা দেহে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন ও খনিজ লবণ বিপাকে সহায়তা করে। বৃদ্ধি হর্মোনের ক্ষরণ বেশী হইলে দেহে রক্ত শর্করার বৃদ্ধি ঘটে ফলে হাইপারগ্লাইসিমিয়া ও গ্লাইকোসুরিয়া দেখা দেয়। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেশী হইলে অগ্ন্যাশয়ের β-কোষ হইতে অতিমাত্রায় ইনসুলিন ক্ষরিত হইতে থাকে। অবশেষে β-কোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

(iv) শৈশবাবস্থায় এই হর্মোন অধিকমাত্রায় ক্ষরিত হইলে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ হয়। পেশী, মুখ, নাক, চোয়াল প্রভৃতি বৃদ্ধির ফলে দানবীয় দশা পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থাকে **অতিকায়ত্ব** (Giagantism) বলে। আবার প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই হর্মোন বেশীমাত্রায় ক্ষরিত হইলে চোয়াল, কপাল, নাক, অক্ষিকোটরের উপরের অস্থি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় ফলে **গরিলার** (Gorilla) মত দেখিতে হয়। এই অবস্থায় ফুসফুস, হৃদ্পিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। হাত, পা, মুখের চামড়া পুরু ও খসখসে হয়। এই অবস্থাকে **অ্যাক্রোমেগালি** (Acromegaly) বলে।

(খ) অপরপক্ষে, এই হর্মোন শৈশবাবস্থায় কমমাত্রায় ক্ষরিত হইলে অস্থির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ফলে দেহ খর্বাকৃতি হয়। এই অবস্থাকে বামনত্ব (Dwarfism) বলে।

2. **থাইরয়েড উদ্দীপক হর্মোন** (Thyroid stimulating hormone or TSH) : ইহা অগ্র পিটুইটারীর ক্ষারাসক্ত থাইরোট্রফ কোষ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা থাইরয়েড গ্রন্থির উপর কার্য করিয়া থাইরক্সিন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।
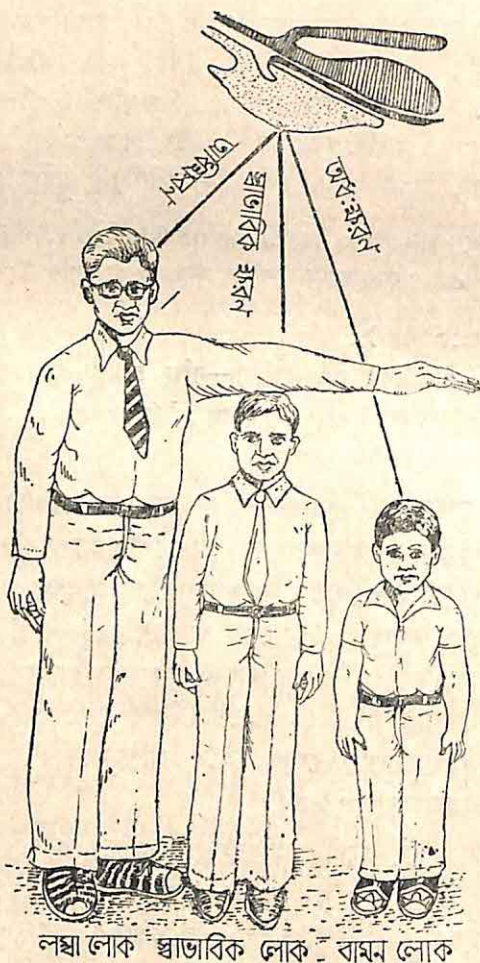
চিত্র 14.4 : পিটুইটারীর অগ্রখণ্ড নিঃসৃত হর্মোনের প্রভাব

3. **অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রফিক হর্মোন** (Adrenocorticotrophic hormone or ACTH): ইহা অগ্র পিটুইটারীর ক্ষারাসক্ত কর্টিকোট্রফ কোষ হইতে ক্ষরিত হয়।

ইহা অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের বৃদ্ধি এবং ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই হর্মোনের ক্ষরণ বেশী মাত্রায় হইলে কুশিং-বর্ণিত রোগ (Cushing's syndrome) পরিলক্ষিত হয়।

4. **ডিম্বথলি উদ্দীপক হর্মোন** (Follicle stimulating hormone or FSH) : এই হর্মোন স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ঋতুচক্রের প্রারম্ভে ডিম্বথলির বৃদ্ধি **ঘটায়** এবং ডিম্ব-নিঃসরণে (Ovulation) সহায়তা করে। পুরুষের ক্ষেত্রে **শুক্রোৎপাদক** নালীর (Seminiferous tubules) বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে এবং শুক্রাণু উৎপাদনে সহায়তা করে।

5. **পীতথলি উদ্দীপক হর্মোন** (Luteinising hormone or LH or Interstitial cell-stimulating hormone or ICSH) : স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয়ে ডিম্বপাতের পর এই হর্মোন পীতথলি বা করপাস লুটিয়ামের (Corpus luteum) সৃষ্টি, বৃদ্ধি এবং স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে সহায়তা করে। ইহা ছাড়া এই হর্মোন করপাস লুটিয়াম হইতে **প্রোজেস্টেরন** নামক স্ত্রী যৌন হর্মোন ক্ষরণে সাহায্য করে।

পুরুষের ক্ষেত্রে এই হর্মোন শুক্রাশয়ের লেডিগ-খ্যাত কোষ বা ইণ্টারস্টিসিয়াল কোষকে উদ্দীপিত করে। ইহার ফলে উক্ত কোষ হইতে **টেস্টোস্টেরন** হর্মোন নিঃসৃত হয়। এই জন্য লুটিনাইজিং হর্মোনকে **ইণ্টারস্টিসিয়াল সেল স্টিমুলেটিং হর্মোন বা ICSH বলে।**

6. **দুগ্ধক্ষরণ উদ্দীপক হর্মোন বা লুটিওট্রফিক হর্মোন বা প্রোলাক্‌টিন** (Luteotrophic hormone or LTH or Prolactin) : স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি **এবং** স্তনের পূর্ণবিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। স্তনদাত্রীদের মাতৃস্তনে দুগ্ধক্ষরণে সহায়তা করে। এই হর্মোন করপাস লিউটিয়াম হইতে প্রোজেস্টেরন হর্মোন ক্ষরণে অংশগ্রহণ করে। পায়রার ক্রপে দুগ্ধ উৎপাদনে উদ্দীপনা যোগায় এবং ডিমে তা দিতে সহায়তা করে।

FSH, LH এবং LTH এই তিনটি হর্মোনকে একত্রে **গোনাডোট্রফিক হর্মোন** (Gonadotrophic hormones or GTH) বলে।

II. **অন্তর্বর্তী খণ্ড** (Intermediate lobe) : মানুষের ক্ষেত্রে পিট্যুইটারীর অন্তর্বর্তী খণ্ড হইতে কোন হর্মোন নিঃসৃত হয় না। কিন্তু মৎস্য, উভচর ও সরীসৃপ প্রাণীর এই খণ্ড হইতে ইণ্টারমেডিন বা মেলানোসাইট উদ্দীপক হর্মোন (Intermedin or Melanocyte stimulating hormone or MSH) নিঃসৃত হয়। এই হর্মোনের প্রভাবে ত্বকে অবস্থিত **মেলানিন** (Melanin) নামক রঞ্জক পদার্থের সংশ্লেষণ হয় এবং ত্বকের বর্ণ নিয়ন্ত্রিত করে।

III. **পশ্চাদ্‌খণ্ড** (Posterior lobe) : পিট্যুইটারীর পশ্চাদ্‌খণ্ড হইতে দুইটি হর্মোন উৎপন্ন হয়। যথা—(i) **ভাসোপ্রেসিন** এবং (ii) **অক্সিটোসিন।**

(i) **ভাসোপ্রেসিন** (Vasopressin or Antidiuretic hormone or ADH) : এই হর্মোন দেহের রক্তচাপ ও জলের সাম্যাবস্থা বজায় রাখিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই হর্মোন ধমনীস্থিত অনৈচ্ছিক পেশীকে সংকুচিত করিয়া

রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। এই হর্মোন বৃক্কের রেচন নালীর উপর কার্য করিয়া জলের পুনর্বিশোষণ ঘটাইতে সহায়তা করে, ফলে মূত্র উৎপাদন হ্রাস পায়। এই হর্মোনের অভাবে অধিক পরিমাণ জল মূত্রের সাহায্যে দেহ হইতে নির্গত হয় ফলে বারবার প্রস্রাব পায়। এই প্রকার বহুমূত্র রোগকে **ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস** (Diabetes insipidus) বলে।

(ii) **অক্সিটোসিন** (Oxytocin) : সন্তান প্রসবের সময় এই হর্মোন তীব্রভাবে সক্রিয় হয় ফলে জরায়ুর পেশীস্তরের সংকোচন ঘটে এবং সন্তান প্রসব সহজতর হয়।

14.14 থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland) :

শ্বাসনালীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তরুণাস্থি বলয়ের উভয় পার্শ্বে একজোড়া খণ্ডের সমন্বয়ে থাইরয়েড গ্রন্থি অবস্থিত। এই খণ্ডদ্বয় একটি যোজক (Isthmus) দ্বারা যুক্ত থাকে। ইহার স্বাভাবিক ওজন 20-40 গ্রাম। সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র থাইরয়েড ধমনী এই গ্রন্থিকে রক্ত সরবরাহ করে। থাইরয়েডের কলাস্থানিক গঠন (Histology) পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে ইহা অসংখ্য ছোট ছোট গ্রন্থিথলির (Follicles) সমন্বয়ে গঠিত। গ্রন্থিথলির অন্তরভাগ থাইরোগ্লোবিউলিন নামক প্রোটিন জাতীয় কোলয়েড পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে।

থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে তিন প্রকার হর্মোন নিঃসৃত হয়, যথা—(i) থাইরক্সিন, (ii) ট্রাই-আয়োডো-থাইরোনিন এবং (iii) ক্যালসিটোনিন।

থাইরয়েডের গ্রন্থিথলিতে প্রথম দুইটি হর্মোন থাইরয়েড কোলয়েডে সংশ্লেষিত হয় এবং থাইরোগ্লোবিউলিন যৌগ রূপে সঞ্চিত থাকে। **টাইরোসিন** (অ্যামাইনো অ্যাসিড) এবং আয়োডিনের সমন্বয়ে এই হর্মোন সংশ্লেষিত হয়। ইহাদের কার্যাবলী একই প্রকার। অপরপক্ষে, থাইরয়েডের প্যারাফলিকুলার কোষ হইতে ক্যালসিটোনিন হর্মোন নিঃসৃত হয়।

থাইরয়েড হর্মোনের কার্যাবলী (Functions of Thyroid hormones) :

1. **থাইরক্সিন** (Thyroxine) এবং **ট্রাই-আয়োডো-থাইরোনিন** (Tri-iodo-thyronine) :

(i) **মৌল বিপাকীয় হারের পরিবর্তন** : এই হর্মোনের প্রভাবে দেহের কলা-কোষের অক্সিজেন ব্যবহার বা দহন শক্তি বৃদ্ধি পায়। দেহে অধিক শক্তি উৎপন্ন হয় ফলে মৌল বিপাকীয় হারের বৃদ্ধি ঘটে। সেইজন্য এই হর্মোনকে **ক্যালোরি উৎপাদক হর্মোনও** (Calorigenic hormone) **বলে**।

(ii) **বিপাকীয় কার্য নিয়ন্ত্রণ** : ইহা কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, খনিজ লবণের বিপাকীয় কার্যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই হর্মোন অন্ত্র হইতে গ্লুকোজ শোষণ বৃদ্ধি করে এবং কোষে শর্করা ব্যবহার বৃদ্ধি করে। ইহার প্রভাবে যকৃৎ এবং পেশীতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে পরিণত হয় এবং যকৃতে প্রোটিন হইতে গ্লুকোনিওজেনেসিস পদ্ধতিতে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়।

ইহা প্রোটিন সংশ্লেষ ও অপচিতি (Catabolism) উভয় প্রকার কার্য নিয়ন্ত্রণ করে।

এই হর্মোন বেশী মাত্রায় ক্ষরিত হইলে অস্থির ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস মূত্র ও মলের মাধ্যমে দেহ হইতে নির্গত হয়।

(iii) **বৃদ্ধি ও রূপান্তর :** দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ, অস্থি, পেশী, যৌনাঙ্গ প্রভৃতির বৃদ্ধি এই হর্মোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই হর্মোনের প্রভাবে ব্যাঙাচি দ্রুত পরিণত ব্যাঙে রূপান্তরিত হয়। ইহা ব্যতীত এই হর্মোনের প্রভাবে হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পায়, লোহিত রক্তকণিকার ক্রমবৃদ্ধি হয়, স্ত্রী লোকের স্তন্যদানকালে দুগ্ধ ক্ষরণ উদ্দীপিত করে।

থাইরোক্যালসিটোনিন (Thyrocalcitonin) : এই হর্মোন রক্তে ক্যালসিয়ামের হ্রাস ঘটায়, ইহা অস্থিতে ক্যালসিয়াম সিঞ্চিত করতে সহায়তা করে।

চিত্র 14.5 : গ্রেভস্ খ্যাত রোগ

চিত্র 14.6 : ক্রেটিনিজম

থাইরয়েড হর্মোনের অতিক্রিয়া (Hyperfunction of thyroid hormone or hyperthyroidism) : এই হর্মোন বৃদ্ধি পাইলে **গ্রেভস খ্যাত রোগ** (Graves's disease) বা **এক্সপথ্যালমিক গয়টার** (Exophthalmic goitre) দেখা দেয়। এই রোগে চোখ দুইটি যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে, চোখের পাতা ওঠা-নামা হ্রাস হয়। ইহা ছাড়া মেজাজ খিটখিটে হয়, চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হার, রক্ত শর্করা প্রভৃতি বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি।

থাইরয়েড হর্মোনের স্বল্পক্রিয়া (Hypofunction of thyroid hormone or hypothyroidism) : শিশুর ক্ষেত্রে এই হর্মোন কম মাত্রায় ক্ষরিত হইলে **ক্রেটিনিজম** (Cretinism) এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে **মিক্সিডিমা** (Myxoedema) নামক রোগ পরিলক্ষিত হয়।

(i) **ক্রেটিনিজম** (Cretinism)—শিশুদের ক্ষেত্রে ক্রেটিনিজম রোগ জন্মের ছয় মাস পর্যন্ত দেখা যায় না, কারণ মাতৃদুগ্ধে যথেষ্ট পরিমাণ থাইরক্সিন হর্মোন থাকে। সাধারণত এই রোগ জন্মের ছয় মাস পর হইতে দেখা যায়। এই রোগে (i) বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, হাতের আঙ্গুল মোটা ও ছোট হয়, (ii) ঠোঁট মোটা হয়, জিহ্বা বড় হয়, মুখ থেকে অনবরত লালা ঝরে ; (iii) দেহত্বক শুষ্ক, পুরু, কর্কশ হয় ; (iv) মানসিক-ভাবে জড় বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রায় বোকা ও বোবা হয় ; (iv) প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবে রোগ জীবাণু দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয়।

(ii) **মিক্সিডিমা** (Myxoedema or Gull's disease)—প্রাপ্তবয়স্কে এই হর্মোনের ক্ষরণ কম হইলে **মিক্সিডিমা** রোগ হয়। এই রোগের প্রধান উপসর্গগুলি হইল—(i) মুখ, হাত ফোলা ফোলা, মঙ্গোলীয় মুখ, ত্বক ফুলিয়া যায়। বগল, শ্রোণী অঞ্চলও মাথার চুল উঠিয়া যায়, ভুরুর অধিকাংশ চুল থাকে না। জিহ্বা এবং স্বরযন্ত্র স্ফীত হওয়ার জন্য কণ্ঠস্বর কর্কশ ও মন্থর হয়। ত্বকের নিচে অস্বাভাবিক চর্বি জমে। (ii) মানসিক ভারসাম্য ঠিক থাকে না ; জড় বুদ্ধি-সম্পন্ন স্মৃতি, ক্রমান্বয়ে লোপ পাইতে থাকে।

চিত্র 14.7 : মিক্সিডিমা

চিত্র 14.8 : গলগণ্ড রোগাক্রান্ত পুরুষ

গলগণ্ড (Goitre) : দেহে আয়োডিনের অভাব হইলে থাইরয়েড গ্রন্থি অস্বাভাবিক-ভাবে ফুলিয়া যায় তখন এই অবস্থাকে **গলগণ্ড** বলে। পার্বত্য অঞ্চলে আহার্য সামগ্রী ও জলে আয়োডিনের অভাবে এসব অঞ্চলের লোকদের এই রোগ প্রকাশ পায়। সাধারণত থাইরয়েডের ক্ষরণ কম বা বেশী হইলে গলগণ্ড রোগ হয় না। শুধুমাত্র থাইরয়েড গ্রন্থি স্ফীত হওয়ার জন্য এই রোগ দেখা যায়।

14.15 প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland) :

থাইরয়েড গ্রন্থির পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত চারিটি ডিম্বাকৃতি গ্রন্থিকে একত্রে প্যারা

থাইরয়েড গ্রন্থি বলে। এই গ্রন্থি হইতে **প্যারাথর্মোন** (Parathormone or PTH) নিঃসৃত হয়।

প্যারাথর্মোনের কার্যাবলী (Functions of Parathormone):

(i) এই হর্মোন রক্তের ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়ামের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

(ii) ইহার অভাবে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা হ্রাস পায়, ফলে **টিটানী** (Tetany) নামক রোগের সৃষ্টি হয়। এই রোগে আক্ষেপ বা খেঁচুনি (Spasm) দেখা দেয়।
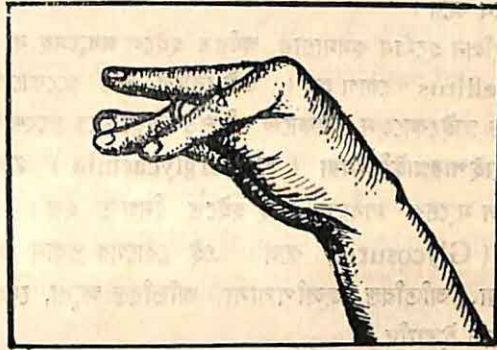
চিত্র 14.9 : টিটানি

পায়ের পাতা প্রসারিত হয় এবং আঙ্গুলগুলি বাঁকিয়া যায়। ইহা ছাড়া হাতের আঙ্গুল বাঁকিয়া একত্রে করতলে আঁটিয়া যায়।

14.16. অগ্ন্যাশয় (Pancreas):

অগ্ন্যাশয় ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডিনাম হইতে প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা একটি মিশ্র-গ্রন্থি। কারণ খাদ্যের পাচনের সময় ইহা হইতে যেমন উৎসেচক বাহির হয় তেমনি ইহা হইতেও হর্মোন নিঃসৃত হয়। অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে অসংখ্য বিশেষ কোষগুচ্ছ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো থাকে। 1869 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ল্যাঙ্গারহ্যান্‌স্ সর্বপ্রথম দ্বীপের মত ছড়িয়ে থাকা কোষগুচ্ছকে আবিষ্কার করেন এবং তাঁহার নামানুসারে ইহাদের "ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপপুঞ্জ" বা আইলেট্‌স্ অব্ ল্যাঙ্গারহ্যান্‌স্ (Islets of Langerhans) বলে।

এইসব কোষগুচ্ছে প্রধানত তিন প্রকারের কোষ থাকে, যথা—α-কোষ, β-কোষ এবং δ-কোষ। α-কোষ হইতে গ্লুকাগন, β-কোষ হইতে ইনসুলিন এবং δ-কোষ হইতে সোমাটোস্টেটিন (Somatostatin) নামক হর্মোন নিঃসৃত হয়।

অগ্ন্যাশয়-সৃষ্ট হর্মোনের কার্যাবলী (Functions of Pancreatic hormones):

ইনসুলিন (Insulin):

(i) **কার্বোহাইড্রেটের বিপাক**: এই হর্মোনের প্রভাবে কোষ ঝিল্লির ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায় ফলে বেশি পরিমাণ গ্লুকোজ কোষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহে অধিক পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত করে। ইহা ছাড়া রক্তের গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনেসিস পদ্ধতিতে

গ্লাইকোজেন হিসাবে যকৃৎ ও পেশীতে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে এবং গ্লাইকোজেন হইতে গ্লুকোজ তৈয়ারিতে বাধা সৃষ্টি করে। ইহার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং এই হর্মোন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(ii) **ফ্যাটের বিপাক**—এই হর্মোনের প্রভাবে চর্বিকোষে গ্লুকোজ ও ল্যাকটিক অ্যাসিড হইতে ফ্যাট প্রস্তুতিতে সহায়তা করে। ইহা ফ্যাটের জারণ রোধ করিয়া কিটোন বস্তু (Ketone bodies) উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে অর্থাৎ কিটোসিস (Ketosis) রোধ করে।

(iii) ইনসুলিন হর্মোন কমমাত্রায় ক্ষরিত হইলে **মধুমেহ** বা ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes mellitus) রোগ হয়। এই রোগে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যকৃত ও পেশীতে গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে পরিণত হইয়া রক্তে প্রবেশ করে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধিকে **হাইপারগ্লাইসিমিয়া** (Hyperglycaemia) বলে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে মূত্রের মাধ্যমে দেহ হইতে নির্গত হয়। তখন এই অবস্থাকে **গ্লাইকোসুরিয়া** (Glycosuria) বলে। এই রোগের প্রধান লক্ষণগুলি হইল বার বার প্রস্রাব পাওয়া, অতিরিক্ত জলপিপাসা, অতিরিক্ত ক্ষুধা, দেহ দুর্বল হইয়া যাওয়া, দৈহিক ওজন হ্রাস ইত্যাদি।

2. **গ্লুকাগন** (Glucagon) : এই হর্মোন ইনসুলিনের বিপরীত কার্য সম্পন্ন করে। ইহা যকৃতের গ্লাইকোজেনকে গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজে পরিণত করে। ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পেশীস্থিত গ্লাইকোজেনের উপর গ্লুকাগনের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। এই হর্মোন প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় পদার্থকে নিওগ্লুকোজেনেসিস পদ্ধতিতে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করে।

3. **সোমাটোস্টেটিন** (Stamatostatin) : ইহা অগ্ন্যাশয়ের δ-কোষ হইতে নিঃসৃত হয়। অনুমান করা হয়, এই হর্মোন α-কোষ এবং β কোষের নিঃসরণে বাধা দেয়।

14.17 অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি (Adrenal glands) :

দুইটি বৃক্কের উপরিতলে ত্রিকোণাকৃতি টুপির মত অংশকে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি বলে। বৃক্কের উপরিতলে অবস্থিত বলিয়া এই গ্রন্থিদ্বয় **সুপ্রারেনাল গ্রন্থি** (Suprarenal glands) নামেও পরিচিত। গ্রন্থিদ্বয়ের একত্রে ওজন প্রায় 5-9 গ্রাম।

প্রতিটি অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি দুইটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। বাহিরের অংশকে **কর্টেক্স** (Cortex) এবং ভিতরের অংশকে **মজ্জা** (Medulla) বলে। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির এই দুইটি অংশের কলাস্থানিক গঠন আলাদা এবং ইহারা পৃথক পৃথক হর্মোন ক্ষরণ করে।

1. **অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স** (Adrenal cortex) : গ্রন্থির এই বাহিরের অংশ হইতে তিন প্রকার হর্মোন নিঃসৃত হয়। যথা—(i) গ্লুকোকর্টিকয়েড, (ii) মিনারেলোকর্টিকয়েড এবং (iii) যৌন কর্টিকয়েড।

অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সস্থিত হর্মোনের কার্যাবলী :

(i **গ্লুকোকর্টিকয়েড** (Glucocorticoids) : কর্টিসল, কর্টিসন এবং ডিহাইড্রোকর্টিকোস্টেরন হর্মোনগুলি উল্লেখযোগ্য।

এই হর্মোন অন্ত্র হইতে গ্লুকোজ ও লিপিড শোষণে সহায়তা করে, প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হইয়া অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং দেহে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও জলের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(ii) **মিনারেলোকর্টিকয়েড** (Meneralocorticoids)—ইহার মধ্যে অ্যালডোস্টেরণ, ডিঅক্সিকর্টিকোস্টেরন উল্লেখযোগ্য। এই হর্মোন খনিজ পদার্থের বিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে, বৃক্ক নালিকায় জল পুনঃশোষণ করিয়া দেহে জলসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে।

(iii) **যৌন কর্টিকয়েড** (Sex Corticoid)—এই হর্মোনগুলির মধ্যে অ্যান্ড্রোজেন, ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন উল্লেখযোগ্য। এই হর্মোনের প্রভাবে যৌন গ্রন্থি ও গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স হর্মোনের অতিক্রিয়া (Hyperfunction of Adrenocortical hormones) : অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স হইতে অধিকমাত্রায় হর্মোন নিঃসৃত হইলে **কুসিং-বর্ণিত রোগ** (Cushing's syndrome) দেখা যায়। এই রোগে ত্বক ও ধড় অংশে অস্বাভাবিক চর্বি সঞ্চিত হয়। মুখে চর্বি জমিয়া মুখ গোল ও চন্দ্রাকৃতি হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে দেহে অত্যধিক রোম দেখা যায়। ইহা ব্যতীত এই হর্মোন অধিক মাত্রায় ক্ষরণে কন্-বর্ণিত রোগ (Conn's disease) দেখা দেয়।

চিত্র 16.10 : কুসিং-বর্ণিত রোগ

অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স হর্মোনের স্বল্পক্রিয়া (Hypofunction of Adreno-cortical hormones) : অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স হইতে কমমাত্রায় হর্মোন নিঃসৃত হইলে **অ্যাডিসন খ্যাত রোগ** (Addison's disease) দেখা যায়। এই রোগে পেশী দুর্বল হইয়া পড়ে, আন্ত্রিক গণ্ডগোল দেখা যায়, রক্তচাপ কমিয়া যায়, বৃক্কে কার্য বন্ধ হইয়া যায় প্রভৃতি।

2. **অ্যাড্রিনাল মজ্জা** (Adrenal medulla) : অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির মজ্জা অংশ হইতে অ্যাড্রিনালিন এবং নরঅ্যাড্রিনালিন নামক দুইটি হর্মোন নিঃসৃত হয়।

অ্যাড্রিনালিন ও নরঅ্যাড্রিনালিন হর্মোনের কার্যাবলী :

দেহ অঙ্গ ও তন্ত্র	অ্যাড্রিনালিন	নরঅ্যাড্রিনালিন
1. হৃৎপিণ্ড		
(i) স্পন্দনের হার	বৃদ্ধি পায়।	খুব কম বৃদ্ধি পায়।
(ii) হার্দউৎপাদ	বৃদ্ধি পায়।	কোন পরিবর্তন দেখা যায় না।
(iii) রক্ত চাপ	বৃদ্ধি পায়।	বৃদ্ধি পায়।
2. রক্তনালী	পেশী রক্তনালী প্রসারিত হয়, অন্যান্য রক্তনালী সংকুচিত হয়।	সম্পূর্ণভাবে সংকুচিত হয়।
3. শ্বাসকার্য	বৃদ্ধি পায়।	বৃদ্ধি পায়।
4. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র	মানসিক অস্থিরতা অনুভূত হয়।	কোন পরিবর্তন হয় না।
5. বিপাক	বৃদ্ধি পায়।	বৃদ্ধি পায়।

14.18 যৌন গ্রন্থি (Gonads) : পুরুষ এবং স্ত্রী দেহে যৌন গ্রন্থি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিরূপে কার্য করে। পুরুষদেহে দুইটি শুক্রাশয় (Testes) এবং স্ত্রীদেহে দুইটি ডিম্বাশয় (Ovaries) বর্তমান।

14.18.1 শুক্রাশয় (Testis) :

শুক্রাশয় দুইটি শুক্ররজ্জুর (Spermatic cord) দ্বারা শুক্রাশয় থলিতে (Scrotum) ঝুলিয়া থাকে। প্রত্যেকটি শুক্রাশয়ের ওজন প্রায় 10-20 গ্রাম। শুক্রাশয় হইতে নিঃসৃত হর্মোনকে অ্যান্ড্রোজেন (Androgen) বলে। দুইটি অ্যান্ড্রোজেন হর্মোন শুক্রাশয়ের লেডিগ-খ্যাত কোষ (Leydig's cell) হইতে উৎপাদিত হয়, যথা—**টেস্টোস্টেরন** (Testosterone) এবং **অ্যান্ড্রোস্টেরন** (Androsterone)।

অ্যান্ড্রোজেনের কার্যাবলী :

(i) **যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ**—এই হর্মোনের প্রভাবে পুরুষের শুক্রাশয়, শুক্রাশয় থলি, লিঙ্গ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পায়। ইহা ব্যতীত শুক্রসঞ্চয়ী থলি (Seminal Vesicle), শুক্রাশয় নালী (Epididymis), প্রস্টেট গ্রন্থি (Prostate gland), কাউপার গ্রন্থি (Cowper's gland) প্রভৃতি সহযৌনাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে।

(ii) **গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ :** গোঁফ, দাড়ির বিকাশ, বক্ষ অঞ্চলে কেশোদ্গম, পুরুষোচিত কণ্ঠস্বর, পেশীবহুল দেহ, পুরুষোচিত ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যাবলী এই হর্মোনের প্রভাবে বিকশিত হয়।

14.18. ডিম্বাশয় (Ovary) :

দুইটি ডিম্বাশয় শ্রোণীগহ্বরের পশ্চাৎ প্রাচীরের দিকে পেরিটোনিয়ামের প্রশস্ত যোজকের ডিম্বাশয় বন্ধনী এবং ডিম্বাশয় ঝিল্লি দ্বারা সঠিক স্থানে প্রলম্বিত থাকে। একটি পরিণত ডিম্বাণুর ওজন প্রায় 5 গ্রাম। ডিম্বাশয় হইতে প্রধানত হর্মোন নিঃসৃত হয়। যথা—1. ইস্ট্রোজেন, 2. প্রোজেস্টেরন, 3. রিলাক্সিন।

হর্মোনের কার্যাবলী :

1. **ইস্ট্রোজেন** (Oestrogen) :

(i) **যৌন বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রণ**—এই হর্মোনের প্রভাবে বয়ঃসন্ধিকালে ডিম্বনালী, জরায়ু, যোনিপথ প্রভৃতি আকৃতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বালিকা পূর্ণ যুবতীতে বিকশিত হয়।

(ii) **গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ**—ইহার প্রভাবে স্তনযুগল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, দেহত্বক মসৃণ ও নরম হয়। দেহের বিভিন্ন স্থানে সুষমভাবে মেদ সঞ্চিত হয়। মাথায় কেশের আধিক্য ঘটে। নারীসুলভ দেহ গঠনে বিকাশলাভ করে।

(iii) **মাসিক চক্র নিয়ন্ত্রণ**—ইহার প্রভাবে মাসিক চক্র নিয়মানুসারে ঘটে।

2. **প্রোজেস্টেরন** (Progesterone) : ইহার প্রভাবে গর্ভাবস্থায় ডিম্বাশয় হইতে ডিম্ব উৎপাদন এবং ঋতুচক্র বন্ধ থাকে, অমরা (Placenta) গঠনে সহায়তা করে, গর্ভাবস্থায় স্তনগ্রন্থি ও স্তনথলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

3. **রিলাক্সিন** (Relaxin) : এই হর্মোন গর্ভাবস্থায় শ্রোণীবন্ধনী (Pelvic ligament) শিথিলে অংশগ্রহণ করে এবং জরায়ু কণ্ঠের প্রসারতা বৃদ্ধি করে।

14.19. উপরি-উক্ত হর্মোন ব্যতীত আরও বহুপ্রকার হর্মোন দেহের বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হয়। নিম্নে এই হর্মোনগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :

1. **পিনিয়াল বডি** (Pineal body) : এই অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের উপরিতলে একটি ফাঁপা বৃন্ত দ্বারা যুক্ত থাকে। ইহা হইতে **মেলাটোনিন** (Melatonin) হর্মোন নিঃসৃত হয়। এই হর্মোনের প্রভাবে ফসফরাসের বিপাক দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়, গ্লুকোজের ব্যবহার বৃদ্ধি করে (ছাগলের ক্ষেত্রে), দেহ বৃদ্ধিতে বাধাদান করে ইত্যাদি।

2. **থাইমাস গ্রন্থি** (Thymus gland) : এই গ্রন্থিটি শ্বাসনালীর সম্মুখে এবং থাইরয়েড গ্রন্থির নিম্নে অবস্থিত। ইহা হইতে **থাইমোসিন** (Thymosin) বা **থাইমিন** (Thymin) হর্মোন নিঃসৃত হয়। এই হর্মোন অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সরাসরি অংশ গ্রহণ না করিয়া দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। এই হর্মোনের প্রভাবে অস্থিতে খনিজ লবণ সঞ্চিত হয়, গর্ভধারণের দ্বিতীয়ার্ধে গর্ভবতীর স্বাস্থ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

3. **অমরা** (Placenta) : জরায়ুর যে ঝিল্লিময় পর্দা গর্ভস্থ ভ্রূণকে জরায়ুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রাখে তাহাকে **অমরা** বলে। ইহা হইতে ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন ও রিলাক্সিন হর্মোন নিঃসৃত হয়। ইহারা ডিম্বাশয় কর্তৃক নিঃসৃত হর্মোনের ন্যায় কাজ করে।

এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি নিঃসৃত হর্মোন, তাহাদের কার্য এবং অনিয়মিত ক্ষরণের ফল

গ্রন্থির নাম	হর্মোন	কার্য	অত্যধিক ক্ষরণের ফল	কম ক্ষরণের ফল
পিটুইটারীর অগ্রখণ্ড	সোমাটোট্রফিক হর্মোন বা STH	দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।	অপরিণত বয়সে অতিকায়ত্ব রোগ হয়। পরিণত বয়সে এক্রোমেগালী রোগ হয়।	বামনত্ব রোগ হয়।
	থাইরয়েড উদ্দীপক হর্মোন বা TSH	থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি ও ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।	থাইরয়েড গ্রন্থি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং নিঃসৃত হর্মোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।	থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি ও ক্ষরণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।
	অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রফিক হর্মোন বা ACTH	অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সকে উদ্দীপিত করিয়া হর্মোন ক্ষরণে সাহায্য করে।		কুসিং-খ্যাত রোগ হয়।
	গোনাডোট্রফিক হর্মোন বা GTH	শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।		
	ল্যাক্টোজেনিক হর্মোন বা LTH	স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি এবং দুগ্ধ ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।		
পিটুইটারীর মধ্যখণ্ড	মেলানোসাইট উদ্দীপক হর্মোন বা MSH	নিম্নশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ত্বকের রঙকে নিয়ন্ত্রণ করে।	ত্বকের রঙ গাঢ় হয়।	ত্বকের রঙ হাল্কা হয়।
পিটুইটারীর পশ্চাৎখণ্ড	ভাসোপ্রেসিন বা ADH	বৃক্ক নালিকায় জল শোষণে সহায়তা করে, রক্তনালীকে সংকুচিত করে।	রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।	মূত্রের সহিত অধিক পরিমাণ জল দেহ হইতে বাহির হইয়া যায় ফলে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস রোগ হয়।

	অক্সিটোসিন	প্রসবের সময় জরায়ু গাত্রের অনৈচ্ছিক পেশীর সংকোচন ঘটায় ফলে প্রসব সহজ হয়।		
থাইরয়েড	থাইরক্সিন	মৌল বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।	গ্রেভস্-খ্যাত রোগ হয়।	শিশুদের ক্রেটিনিজম এবং বয়স্কদের মিক্সিডিমা রোগ হয়।
প্যারাথাইরয়েড	প্যারাথর্মোন	ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।	অস্থি ভঙ্গুর হয়।	টিটানী রোগ হয়।
অগ্ন্যাশয়	ইনসুলিন	রক্তে গ্লুকোজের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।		ডায়াবেটিস মেলিটাস বা মধুমেহ রোগ হয়।
	গ্লুকাগন	ইনসুলিনের বিপরীত কার্য করিয়া রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়।		
অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স	গ্লুকোকর্টিকয়েড	শর্করা, খনিজ লবণ বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।	বালকদের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যাবলী শীঘ্র দেখা যায়, স্ত্রীলোকের মুখে লোম গজায়।	অ্যাডিসন-খ্যাত রোগ হয়।
	মিনারেলোকর্টিকয়েড বা অ্যালডোস্টেরন	দেহে তড়িৎ বিশ্লেষ্যের সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে।		
	গোনাডোকর্টিকয়েড	যৌন গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং গৌণ যৌন লক্ষণ প্রকাশে সাহায্য করে।	স্ত্রীলোকের দেহে পুরুষালী লক্ষণ দেখা যায়।	

এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি নিঃসৃত হর্মোন, তাহাদের কার্য এবং অনিয়মিত ক্ষরণের ফল

গ্রন্থির নাম	হর্মোন	কার্য	অত্যধিক ক্ষরণের ফল	কম ক্ষরণের ফল
অ্যাড্রিনাল মেডেলা	এপিনেফ্রিন	সংকটজনক পরিস্থিতিতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হার, রক্ত চাপ, শ্বসনের হার বৃদ্ধি করে। এইজন্য এই হর্মোনকে জরুরীকালীন হর্মোন বলে।		
শুক্রাশয়	টেস্টোস্টেরন	পুরুষের মুখ্য যৌন অঙ্গের বৃদ্ধি এবং গৌণ যৌন লক্ষণ প্রকাশে সাহায্য করে।		
ডিম্বাশয়	ইস্ট্রোজেন	স্ত্রীদেহের মুখ্য যৌন অঙ্গের বৃদ্ধি এবং গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে।		
	প্রোজেস্টেরন	গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের পরিস্ফুরণ, জরায়ুর পরিবর্তন, স্তনগ্রন্থির পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে।		
পাকস্থলীর মিউকাস পর্দা	গ্যাসট্রিন	Hcl ক্ষরণে সাহায্যে করে।		
ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকাস পর্দা	সিক্রেটিন	অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে সাহায্য করে।		

4. পাকস্থলী (Stomach): পাকস্থলীর শ্লেষ্মাঝিল্লিস্তর হইতে গ্যাসট্রিন (Gastrin) নামক হর্মোন নিঃসৃত হয় যাহা গ্রহণী ও অগ্ন্যাশয়কে উদ্দীপিত করিয়া উৎসেচক ক্ষরণে সহায়তা করে।

5. **গ্রহণী** (Duodenum): নিম্নলিখিত হর্মোন গ্রহণীর শ্লেষ্মাস্তর হইতে নিঃসৃত হয়।

(i) **সিক্রেটিন** (Secretin)—ইহার প্রভাবে অগ্ন্যাশয়স্থিত উৎসেচক ক্ষরণে সহায়তা করে।

(ii) **এণ্টারোগ্যাস্ট্রোন** (Enterogastrone)—এই হর্মোনের প্রভাবে পাকস্থলীর নিঃসরণ বন্ধ হয়।

(iii) **কোলেসিস্টোকাইনিন** (Cholecystokinin)—ইহা পিত্তরস নিঃসরণে সাহায্য করে।

(iv) **প্যাংক্রিয়োজাইমিন** (Pancreozymin)—ইহা অগ্ন্যাশয়কে উদ্দীপিত করিয়া অগ্ন্যাশয়স্থিত উৎসেচক ক্ষরণে সহায়তা করে।

6. **ক্ষুদ্রান্ত্র** (Small Intestine): ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্র হইতে নিম্নলিখিত হর্মোন নিঃসৃত হয়।

(i) **ভিল্লিকাইনিন** (Villikinin)—ইহা ভিলাইকে উদ্দীপিত করে।

(ii) **এন্টারোক্রিনিন** (Enterocrinin)—ইহা আন্ত্রিক রস নিঃসরণে সহায়তা করে।

বিষয়-সংক্ষেপ

যে সকল জৈব রাসায়নিক পদার্থ জীবদেহের নির্দিষ্ট কতকগুলি কোষ বা গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হইয়া সাধারণত সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে দূরে বাহিত হয় এবং সেই স্থানের কোষসমূহের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে তাহাকে হরমোন বলে।

হরমোন নালীবিহীন গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হয়, অল্পমাত্রায় কার্য করে, কার্য শেষ হইলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে দূরে বাহিত হয়, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকে না।

উদ্ভিদ হর্মোন :

বিভিন্ন উদ্ভিদের কার্যপদ্ধতি বিভিন্ন। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতানুযায়ী অক্সিন কোষ প্রাচীরকে নমনীয় করিয়া অথবা কোষের DNA বা জীনকে সক্রিয় করিয়া দেহের বৃদ্ধি ঘটায় এবং শারীরবৃত্তীয় কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। অপরপক্ষে, প্রাণীদের ক্ষেত্রে হর্মোনগুলি কোষপর্দায় উপস্থিত অ্যাডিনাইল সাইক্লেজ নামক উৎসেচককে সক্রিয় করিয়া বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্য পরিচালনা করে।

পুষ্টি পদার্থ ব্যতীত উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কার্যে সাহায্যকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী জৈব যৌগকে সমষ্টিগতভাবে উদ্ভিদ হর্মোন বা ফাইটোহর্মোন বলে। ফাইটোহর্মোন প্রধানত তিন প্রকার—অক্সিন, জিব্বেরেলিন ও সাইটোকাইনিন।

অক্সিনই প্রথম আবিষ্কৃত উদ্ভিদ হর্মোন। অক্সিন অগ্রস্থ ভাজক কলা ও বর্ধনশীল কোষ হইতে নিঃসৃত হয় এবং মূল, কাণ্ড প্রভৃতি অঙ্গের বৃদ্ধি ঘটায়। অক্সিন কোষ বিভাজন, কোষের বৃদ্ধি, অগ্রমুকুলের বৃদ্ধি, ক্যাম্বিয়ামের বিভাজন, ক্যালাস গঠন, আলোকবৃত্তি ও অভিকর্ষবৃত্তি চলন, মূল-কাণ্ড-মুকুল প্রভৃতির পরিস্ফুরণ, ফল গঠন, পত্র ও ফলমোচন প্রভৃতি কার্যে অংশগ্রহণ করে। কৃষিকার্যে অক্সিন প্রয়োগ করিয়া আগাছা নির্মূলকরণ, পত্র-পুষ্প-ফলের অকালপতনরোধ, বীজহীন ফল উৎপাদন, মুকুলোদগম নিবারণ, শাখাকলমের মূলোদগম প্রভৃতি কার্য সম্ভব হইয়াছে।

জিব্বেরেলিন বীজপত্র, পরিপক্ব বীজ, অঙ্কুরিত চারাগাছ প্রভৃতিতে উৎপন্ন হয়। জিব্বেরেলিন কাণ্ডের দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি ঘটায়, পাতা-ফুল ও ফলের আয়তন বৃদ্ধি করে, বীজের অঙ্কুরোদগমে সাহায্য করে, মূলের বৃদ্ধিতে বাধাদান প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করে।

সাইটোকাইনিন নারিকেলের দুধ, ভুট্টা, আপেল, কলা প্রভৃতি ফলে পাওয়া যায়। ইহা কোষ বিভাজন, কোষের আয়তন বৃদ্ধি, পার্শ্বমুকুলের বৃদ্ধি, ক্লোরোফিলের ভাঙ্গনরোধ প্রভৃতি কার্যে অংশগ্রহণ করে।

ইহা ব্যতীত কতিপয় উদ্ভিদ হর্মোন বিভিন্ন কার্যে অংশগ্রহণ করে। যেমন রাইজোকলাইন মূল গঠনে, কলোকলাইন কাণ্ডের দীর্ঘিকরণে, ফাইলোকলাইন পাতার বৃদ্ধিতে, ফ্লোরিজেন পুষ্পের প্রস্ফুটনে, ইথিলিন ফলের পরিপক্বতায় সাহায্য করে।

প্রাণী হর্মোন :

উদ্ভিদ হর্মোনের ন্যায় প্রাণী হর্মোন দেহের সকল স্থান হইতে ক্ষরিত হয় না। বহুকোষী প্রাণীর দেহে নির্দিষ্ট ক্ষরণ কোষ বা কয়েকটি নির্দিষ্ট এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি হইতে হর্মোন ক্ষরিত হয়। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রের কিছু কিছু স্নায়ুকোষ হইতে হর্মোন নিঃসৃত হয়। এই ধরনের হর্মোনকে নিউরোহর্মোন এবং ক্ষরণকারী কোষগুলিকে নিউরোসিক্রেটারী কোষ বলে।

মানুষ-সহ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর হর্মোনগুলি প্রধানত পিটুইটারী, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অ্যাড্রিন্যাল, অগ্ন্যাশয়ের আইলেট্স্ অব্ ল্যাঙ্গারহ্যান্স, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয় প্রভৃতি এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি হইতে হর্মোন ক্ষরিত হয়। ইহা ব্যতীত থাইমাস, পাকস্থলীর মিউকাস পর্দা, ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডিনামের মিউকাস পর্দা এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাকার হইতে বিভিন্ন প্রকার হর্মোন নিঃসৃত হয়।

পিটুইটারী গ্রন্থির সম্মুখ খণ্ড হইতে সোমাটোট্রফিক হর্মোন, থাইরয়েড উদ্দীপক হর্মোন, অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রফিক হর্মোন, গোনাডোট্রফিক হর্মোন, লেক্টোজেনিক হর্মোন ; মধ্যখণ্ড হইতে মেলানোসাইট উদ্দীপক হর্মোন ; পশ্চাৎখণ্ড হইতে ভাসোপ্রেসিন, অক্সিটোসিন নামক প্রভৃতি হর্মোন ক্ষরিত হয়। পিটুইটারী গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত

হর্মোনগুলি দেহের অন্যান্য এণ্ডোক্রিন গ্রন্থির উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং দেহের সামগ্রিক বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া ইহা মাস্টার গ্ল্যাণ্ড বা মুখ্য গ্রন্থি (Master gland) নামে পরিচিত।

থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে থাইরক্সিন, ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন ও থাইরোক্যালসিটোনিন নিঃসৃত হয়। প্যারাথাইরয়েড হইতে প্যারাথর্মোন ক্ষরিত হয়।

বৃক্কের উপরে অবস্থিত অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির বহির্ভাগ কর্টেক্স এবং অন্তর্ভাগ মেডেলা লইয়া গঠিত। কর্টেক্স অংশ হইতে গ্লুকোকর্টিকয়েড, মিনারেলোকর্টিকয়েড এবং গোনাডোকর্টিকয়েড নিঃসৃত হয়। মেডেলা অংশ হইতে এপিনেফ্রিন বা অ্যাড্রিনালিন এবং নর-এপিনেফ্রিন বা নর-অ্যাড্রিনালিন ক্ষরিত হয়।

অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় কোষসমষ্টি থাকে যাহা আইলেট্স্ অব্ ল্যাঙ্গারহ্যান্স্ নামে পরিচিত। ইহা একপ্রকার এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি এবং ইহা হইতে ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন হর্মোন নিঃসৃত হয়। এই দুইটি হর্মোন রক্তে গ্লুকোজ বিপাকে বিপরীতধর্মী কার্য করে। ইনসুলিন হর্মোন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেহকে মধুমেহ রোগ হইতে রক্ষা করে। অপরপক্ষে, গ্লুকাগন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া মধুমেহ রোগের সৃষ্টি করে।

শুক্রাশয় হইতে টেস্টোস্টেরন এবং ডিম্বাশয় হইতে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন নামক হর্মোন নিঃসৃত হয়।

উপরি-উক্ত কিছু কিছু হর্মোন বেশী বা কম ক্ষরণের ফলে দেহে বিভিন্ন প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়।

পাকস্থলীর মিউকাস পর্দা হইতে গ্যাসট্রিন ; গ্রহণীর মিউকাস পর্দা হইতে সিক্রেটিন, প্যানক্রিওজাইমিন, কোলেসিস্টোকাইনিন, এণ্টারোগ্যাসট্রোন ; ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাকার হইতে ভিলিকাইনিন, এণ্টারোক্রাইনিন প্রভৃতি হর্মোন নিঃসৃত হইয়া বিভিন্ন বহিঃক্ষরা গ্রন্থির নিঃসরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রশ্নাবলী

A. পার্থক্য নির্দেশ কর :

1. হর্মোন ও নিউরোহর্মোন।
2. অক্সিন ও থাইরক্সিন।
3. অ্যাড্রিনালিন ও নর-অ্যাড্রিনালিন।
4. ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন।
5. ইনসুলিন ও গ্লুকাগন।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

1. হর্মোন কাহাকে বলে, ইহার নামকরণ কে করেন ?
2. সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত উদ্ভিদ হর্মোনের নাম কি ?

3. মুক্ত অক্সিন ও বদ্ধ অক্সিন বলিতে কি বুঝ ?
4. পার্থেনোকার্পি কাহাকে বলে ?
5. নিউরোহর্মোন কি ?
6. বামনত্ব ও অতিকায়ত্ব কি ?
7. ক্রেটিনিজম্ কি ?
8. মিশ্র গ্রন্থি কাহাকে বলে ?
9. একডাইসোন ও জুভেনাইল কোথা হইতে নিঃসৃত হয় এবং ইহাদের কাজ কি ?
10. পিটুইটারী গ্রন্থিকে এণ্ডোক্রিন গ্রন্থিসমূহের পরিচালক বলা হয় কেন ?
11. ডায়াবিটিস মিলিটাস ও ডায়াবিটিস ইনসিপিডাস বলিতে কি বুঝ ?
12. স্থানীয় হর্মোন কাহাকে বলে ?
13. STH, TSH, ACTH, FSH, LTH, LH, ICSH, MSH, ADH এর পুরো নাম কি ?
14. নিউরোহিউমার কাহাকে বলে ?

C. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

1. হর্মোনের বৈশিষ্ট্য ও কার্যপদ্ধতি উল্লেখ কর।
2. ফাইটোহর্মোন কাহাকে বলে ? অক্সিন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ও ইহার কাজ উল্লেখ কর।
3. জিব্বেরেলিন ও কাইনিন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
4. কৃষিকার্যে হর্মোনের ভূমিকা উল্লেখ কর।
5. রাইজোকলিন, কলোকলিন, ফাইলোকলিন, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড, ইথিলিন, ফ্লোরিজেন কোথা হইতে নিঃসৃত হয় এবং ইহাদের কাজ কি ?
6. নিম্নলিখিত হর্মোনগুলির উৎপত্তিস্থল, কার্য ও অজাবজনিত রোগের নাম কর। STH, থাইরক্সিন, ইনসুলিন, অ্যাড্রিনালিন, ইস্ট্রোজেন, টেস্টোস্টেরন।
7. পিটুইটারী গ্রন্থি নিঃসৃত হর্মোন ও উহাদের কার্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।
8. অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের হর্মোন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায় — বংশগতি (Heredity)

15.1. ইংরেজীতে একটি কথা আছে 'Like begets like'। প্রচলিত বাংলায় যাহাকে বলা হয় 'বাপকা ব্যাটা' যাহার মূল অর্থ সমান হইতে সমানের জন্ম। তাই ধানগাছ হইতে সর্বদা ধানগাছ, আমগাছ হইতে আমগাছ, গরু হইতে গরু, মানুষ হইতে মানুষ জন্মাইয়া থাকে। উপরি-উক্ত কথা হইতে প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যগুলি জনু হইতে জনুতে সঞ্চারিত হইবার মৌলিক সূত্রগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীববিজ্ঞানের এক নবদিগন্তের সূচনা হইয়াছিল।

যে প্রক্রিয়ায় পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয় তাহাকে বংশগতি বলে। বিজ্ঞানের যে শাখায় বংশগতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয় তাহাকে সুপ্রজননবিদ্যা বা জেনেটিক্স (Genetics) বলে। 1906 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী বেটসন (Bateson) জেনেটিক্স কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন।

15.2. সুপ্রজননবিদ্যার অগ্রগতি (Advancement of Genetics) :

অস্ট্রিয়ার ধর্মযাজক গ্রেগর জোহান মেণ্ডেলকে (Gregor Johann Mendel) প্রজননবিদ্যার জনক বলা হয়। ধর্মযাজক হইলেও মেণ্ডেল জীববিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র ভালভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাই তিনি বংশগতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং উহার ফলাফলের গাণিতিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া সহজে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষার ফলাফল, বিশ্লেষণ ও সূত্রগুলিকে একত্রে মেণ্ডেলতত্ত্ব বা মেণ্ডেলিজম (Mendelism) বলে। 1866 খ্রীষ্টাব্দে তিনিই প্রথম বংশগতির সূত্রগুলির আবিষ্কার, বিশ্লেষণ ও প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

চিত্র 15.1 : গ্রেগর জোহান মেণ্ডেল

প্রকৃতপক্ষে 1866 খ্রীষ্টাব্দে মেণ্ডেলতত্ত্ব ব্রুনের একটি অখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় (Journal of History Society) প্রকাশিত হইয়াছিল এবং প্রায় 35 বৎসর ধরিয়া তাঁহার তত্ত্ব অবহেলিত ও অপ্রকাশিত ছিল। আবিষ্কারকের প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি

না পাওয়ায় গভীর হতাশার মধ্য দিয়া তাঁহার শেষজীবন অতিবাহিত হয় এবং অবশেষে 1884 খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর 1900 খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের ডি. ভ্রিস (de Vries), জার্মানীর কোরেন্স (Correns) ও অস্ট্রিয়ার সেরম্যাক্ (Tschermak) পৃথক পৃথকভাবে বংশগতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে গিয়া মেণ্ডেলের ন্যায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ, উল্লিখিত তিনজন বিজ্ঞানী 1900 খ্রীষ্টাব্দে মেণ্ডেল তত্ত্বকে পুনরাবিষ্কৃত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার পর বংশগতিবিদ্যা এক নূতন ধারায় অগ্রসর হইতে থাকে। মেণ্ডেলের পরবর্তীকালে স্ট্রাসবার্গার (Strasburger), সাটন (Sutton), মর্গান (Morgan), মুলার (Muller), বিড্ল (Beadle), ট্যাটাম (Tatum), লেডারবার্গ (Lederberg), ওয়াটসন (Watson), ক্রিক (Crick), উইলকিন্স (Wilkins) প্রমুখ বরেণ্য বিজ্ঞানী বংশগতিবিদ্যার বিভিন্ন মূল্যবান তথ্য সংযোজন করায় বংশগতিবিদ্যার নূতন নূতন দিক উন্মোচিত হইতে থাকে। 1968 খ্রীষ্টাব্দে নিরেনবার্গ ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানা (Horgobind Khorana) জেনেটিক কোড* আবিষ্কার করিয়া শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে (Physiology and Medicine) নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

15.3. বংশগতিবিদ্যার কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা :

1. **জীন** (Gene)—ক্রোমোজোমের বংশগতির নির্ধারক অংশকেই জীন বলে। ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান DNAই জীনের রাসায়নিক রূপ।

2. **লোকাস** (Locus)—প্রতিটি জীন ক্রোমোজোমের যে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে তাহাকে লোকাস বলে।

3. **অ্যালীল** (Allele)—একই লোকাসে অবস্থানকারী তুলনামূলক বিপরীত-ধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহনকারী যুগ্ম জীনকে অ্যালীল বা অ্যালীলোমর্ফ (Allelomorph) বলে। যেমন—মটরগাছের দীর্ঘ ও খর্ব কাণ্ড বৈশিষ্ট্যের জন্য যথাক্রমে T ও d জীন হইল পরস্পরের অ্যালীল।

4. **প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য** (Dominant and Recessive Characters)—দুইটি বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের মধ্যে নিষেক ঘটাইলে প্রথম অপত্য বংশে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় তাহাকে প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং যে বৈশিষ্ট্য

---

* **জেনেটিক কোড** (Genetic Code) : কোষের মধ্যে কি ধরনের প্রোটিন সংশ্লেষিত হইবে তাহা DNA হইতে সৃষ্ট *m*RNA মাধ্যমে কয়েকটি বিশেষ সংকেতের দ্বারা পরিবেশিত হয়। এই সংকেতকে জীনতত্ত্বে জেনেটিক কোড বলে। আরও সূক্ষ্মভাবে বলা যায়, 'যে পদ্ধতিতে *m*RNA-এর চারিটি বেস (A, U, C, G) বিভিন্ন রীতিতে সজ্জিত হইয়া 20টি অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরীর সংকেত বহন করে তাহাকে জেনটিক কোড বলে'।

অপ্রকাশিত থাকে বা আপাত সুপ্ত বলিয়া মনে হয় তাহাকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন—মটরগাছের দীর্ঘ বৈশিষ্ট্য প্রকট ও খর্ব বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন।

5. **ফেনোটাইপ ও জেনোটাইপ** (Phenotype and Genotype)—বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা নির্ধারিত শ্রেণীকে ফেনোটাইপ ও জীনগত সংযুতির দ্বারা নির্ধারিত শ্রেণীকে জেনোটাইপ বলে। যেমন—মটরগাছের ফেনোটাইপ দীর্ঘ কিন্তু উহার জেনোটাইপ TT বা Td হইতে পারে।

6. **হোমোজাইগাস ও হেটারোজাইগাস** (Homozygous and Heterozygous)—জীবের সমসংস্থ ক্রোমোজোমে একই গুণবাহী ফ্যাক্টর বা জীন (TT, dd) থাকিলে তাহাকে হোমোজাইগাস এবং বিপরীত বা অসদৃশ জীন (Td) থাকিলে তাহাকে হেটারোজাইগাস বলে।

7. **বিশুদ্ধ বা খাঁটি ও সংকর** (Pure and Hybrid)—যে সকল জীব বংশানুক্রমে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব সৃষ্টি করে অর্থাৎ তাহাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখে তাহাদের বিশুদ্ধ জীব বলে এবং বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্য বলে। এই সকল জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একইরকম যুগ্ম ফ্যাক্টর বা জীন (TT, dd) বিদ্যমান।

অপরপক্ষে, দুইটি বিপরীতধর্মী বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের মিলনে প্রথম অপত্য জনুতে প্রাপ্ত জীবকে সংকর বলে এবং ইহাদের বৈশিষ্ট্যকে সংকর বৈশিষ্ট্য বলে। এই সকল জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য অসদৃশ জীন (যেমন Td) বিদ্যমান। বিশুদ্ধ জীব সর্বদা হোমোজাইগাস এবং সংকর জীব সর্বদা হেটারোজাইগাস হইবে।

8. **প্রথম ও দ্বিতীয় অপত্য বংশ** (First and Second filial generation)—সংকরায়ণের ফলে প্রথম উৎপন্ন জীবগুলিকে প্রথম অপত্য বংশ (F_1) বা প্রথম ফিলিয়্যাল (ল্যাটিন Filium—সন্তান) জেনারেশান বলে। অপরপক্ষে, প্রথম অপত্য বংশধরদের মিলনে সৃষ্ট অপত্য জীবগুলিকে দ্বিতীয় অপত্য বংশ (F_2) বা দ্বিতীয় ফিলিয়্যাল জেনারেশান বলে।

9. **একসংকর ও দ্বিসংকর জনন** (Monohybrid and Dihybrid Cross)—একজোড়া বিপরীতধর্মী (যেমন, দীর্ঘ ও খর্ব মটরগাছ) চারিত্রিক লক্ষণযুক্ত জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইলে তাহাকে একসংকর জনন বলে। আবার দুইজোড়া বিপরীতধর্মী (যেমন, গোলাকার হলুদ বর্ণ এবং কুঞ্চিত সবুজ বর্ণের বীজযুক্ত মটরগাছ) চারিত্রিক লক্ষণযুক্ত জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইলে তাহাকে দ্বিসংকর জনন বলে।

10. **লিংকেজ** (Linkage)—একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত জীনগুলি একত্রে একটি অবিচ্ছেদ্য একক হিসাবে জনু হইতে জনুতে সঞ্চারিত হইবার প্রবণতাকে লিংকেজ বলে এবং জীনগুলিকে লিংকড জীন বলে। জীনগুলি পরস্পরের যত নিকটে অবস্থিত তাহাদের মধ্যে লিংকেজ তত বেশী, যত দূরে অবস্থিত তাহাদের মধ্যে লিংকেজ তত কম।

11. **ব্যাক ক্রস ও টেস্ট ক্রস (Back Cross and Test Cross)**—প্রথম অপত্য জনুর যে কোন জীব বা সংকরের সঙ্গে উহাদের পিতা-মাতার যে কোন একজনের সংকরায়ণ ঘটানোকে ব্যাক ক্রস বলে।

পরীক্ষণীয় জীবের সঙ্গে ঐ বৈশিষ্ট্যের প্রচ্ছন্ন লক্ষণযুক্ত জীবের সংকরায়ণ ঘটানো হইলে তাহাকে টেস্ট ক্রস বলে। টেস্ট ক্রস দ্বারা পরীক্ষণীয় জীবটি **কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশুদ্ধ অথবা সংকর জানা যায়।** তাই টেস্ট ক্রস মাত্রেই ব্যাক ক্রস কিন্তু সকল ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস নহে। জীবটি বিশুদ্ধ হইলে টেস্ট ক্রসে উৎপন্ন সকল জীব প্রকট এবং সংকর হইলে অর্ধেক জীব প্রকট ও অর্ধেক জীব প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হইবে।

12. **জীনপুল ও জীনোম (Gene pool and genome)**—একটি জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশানের সকল জীনের সমষ্টিগত নামই জিনপুল। অপরপক্ষে, একটি প্রজাতির প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমের হ্যাপ্লয়েড দল বা সেটকে (Set $= n$) জিনোম বলে।

15.4. মেণ্ডেলের মটরগাছকে পরীক্ষণীয় বস্তুরূপে নির্বাচনের কারণ :

(1) মটরগাছকে সহজে বাগানে ফলানো যায়।

(2) মটরফুল স্বপরাগযোগী কিন্তু ইহাদের মধ্যে সহজে পরনিষেক ঘটানো যায়।

(3) পুংকেশর ও গর্ভকেশর তুলনামূলক বড় হওয়ায় ইহাদের সহজেই নাড়াচাড়া করা সম্ভব।

(4) মটরগাছের আয়ুষ্কাল স্বল্প, তাই অল্প সময়ের মধ্যে কয়েক পুরুষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব।

(5) ইহাদের লক্ষণের অনেক প্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং প্রতিটি লক্ষণ স্পষ্ট।

(6) সংকরগুলি প্রজননক্ষম।

15.5. মটরগাছের সাতজোড়া বৈশিষ্ট্য :

মেণ্ডেল মটরগাছের নিম্নোক্ত সাতজোড়া বৈশিষ্ট্য লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছিলেন :

প্রকট	প্রচ্ছন্ন
(1) কাণ্ডের দৈর্ঘ্য—দীর্ঘ	খর্ব
(2) বীজের আকার—গোলাকার বা মসৃণ	কুঞ্চিত
(3) বীজপত্রের বর্ণ—হলুদ	সবুজ
(4) পুষ্পের অবস্থান—কাক্ষিক	শীর্ষ
(5) পুষ্পের রঙ—লাল	সাদা
(6) ফল বা শিমের আকার—স্ফীত	খাঁজযুক্ত
(7) শিমের বর্ণ—সবুজ	হলুদ

15.6. **কয়েকটি জীবের প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য :**

জীবের নাম	প্রকট	প্রচ্ছন্ন
(1) গিনিপিগ	কালো রঙ	সাদা রঙ
	অমসৃণ লোম	মসৃণ লোম
(2) মানুষ	দীর্ঘ	খর্ব
	কালো চুল	হালকা রঙের চুল
	বাদামী চোখ	নীল চোখ
(3) ড্রসোফিলা	ধূসর দেহ	কালো দেহ
	লম্বা ডানা	ক্ষয়প্রাপ্ত ডানা
(4) ভুট্টা	হলুদ রঙের দানা	সাদা দানা
	পুষ্ট সস্য	কোঁচকানো

15.7. **মেণ্ডেলের পরীক্ষা :** মটরফুল উভলিঙ্গ এবং ইহাদের স্বপরাগযোগ হইয়া থাকে। তাই পরীক্ষাকালে মেণ্ডেল একটি উদ্ভিদের ফুল প্রস্ফুটিত হইবার পূর্বে অতি সতর্কতার সহিত উহার পুংকেশর অপসারণ করিয়া ফুলটিকে স্বপরাগযোগে বিরত করেন। এইবার অপর একটি উদ্ভিদের ফুলের পরাগরেণু লইয়া পূর্বের ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থাপন করিয়া ইতর পরাগযোগ ঘটান। ইহার পর একটি থলি দ্বারা ফুলটিকে সুন্দরভাবে আবৃত করিয়া রাখিলেন যাহাতে পতঙ্গ অথবা অন্য কোন উৎস হইতে পরাগরেণু আসিয়া ফুলের উপর পতিত না হয়। এইভাবে মেণ্ডেল তাঁহার নির্বাচিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত (প্রকট ও প্রচ্ছন্ন) মটরগাছের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইয়াছিলেন।

15.8. **মটরগাছের একসংকর জনন** (Monohybrid cross in Pea plant) : একজোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক লক্ষণকে ভিত্তি করিয়া যে সংকরায়ণ করা হয় তাহাকে একসংকর জনন বলে। মেণ্ডেল সাতজোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক লক্ষণযুক্ত মটরগাছের প্রতি জোড়ার মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে সংকরায়ণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক পরীক্ষার ফলাফল একই ধরনের হইয়াছিল। বর্তমান আলোচনায় কেবল উচ্চতা-নির্ভর বিপরীতধর্মী (দীর্ঘ ও খর্ব) চারিত্রিক লক্ষণের মধ্যে সংকরায়ণের পরীক্ষা ও উহার ফলাফল উল্লেখ করা হইল।

পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মেণ্ডেল প্রথমে বিশুদ্ধ দীর্ঘ (6-7 ফুট) ও বিশুদ্ধ খর্ব (9-18 ইঞ্চি) মটরগাছ নির্বাচন করিলেন। লম্বা ও খর্ব গাছগুলি বিশুদ্ধ, কারণ উহাদের মধ্যে স্বপরাগযোগ ঘটাইলে উহারা যথাক্রমে দীর্ঘ ও খর্ব উদ্ভিদ উৎপন্ন করিবে। বিশুদ্ধ দীর্ঘ ও বিশুদ্ধ খর্ব উদ্ভিদকে জনিতৃ জনু (Parental generation) বলে এবং ইহাকে P_1 সংকেত দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এইবার মেণ্ডেল এই দুইটি উদ্ভিদের

মধ্যে ইতর পরাগযোগ ঘটাইলেন। নিষেকের ফলে যে সকল বীজ উৎপন্ন হইল সেইগুলি অঙ্কুরিত হইয়া কেবল দীর্ঘাকৃতি উদ্ভিদ উৎপন্ন করিল। এইরূপ
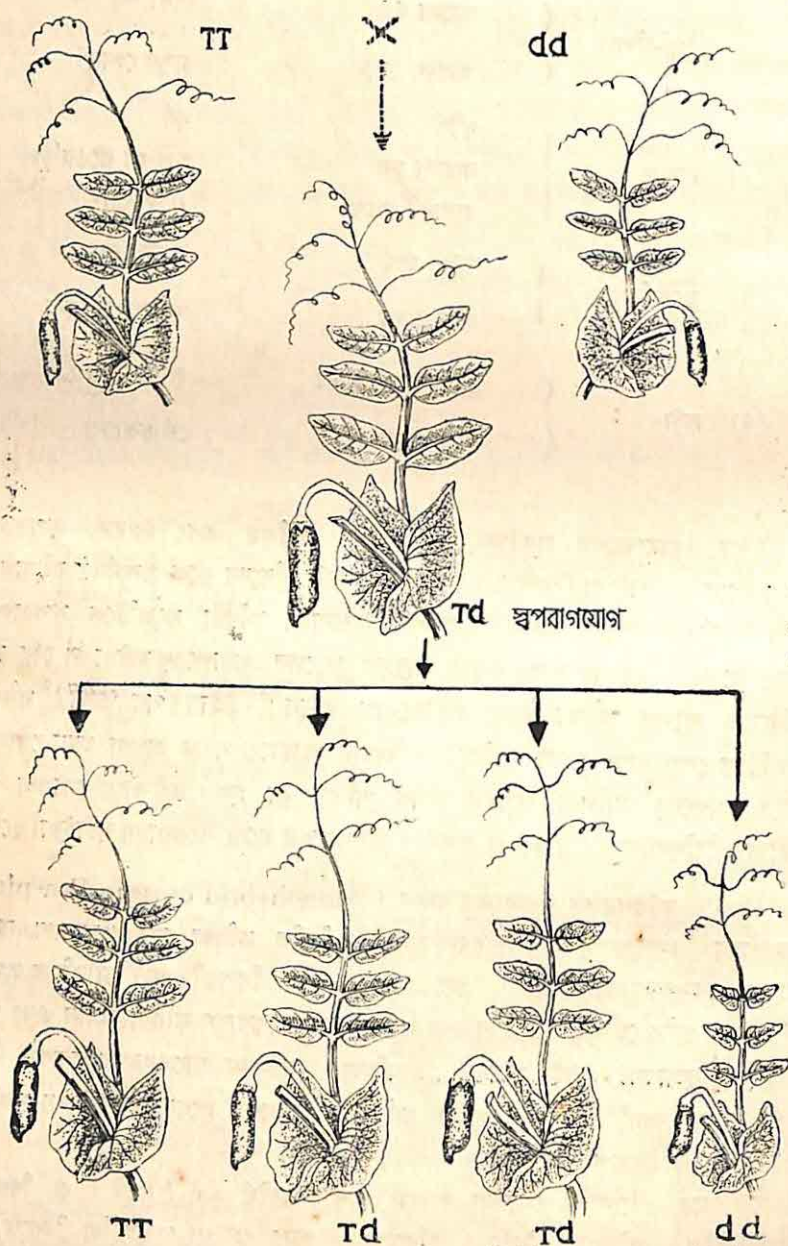
চিত্র 15.2 : মটরগাছের একসংকর জনন

সংকরায়ণের ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদকে সংকর বলে ও সংকর উদ্ভিদগুলিকে একত্রে প্রথম অপত্য জনু বা বংশ বলে এবং ইহাকে F_1 সংকেত দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। স্বভাবতই

প্রশ্ন জাগে খর্ব বৈশিষ্ট্য কি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া গেল না F_1 জনুর অপত্যের দেহে সুপ্ত অবস্থায় থাকিল ? এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে মেণ্ডেল F_1 জনুর উৎপন্ন দীর্ঘাকৃতি উদ্ভিদগুলির মধ্যে স্বপরাগযোগ ঘটাইলেন। স্বপরাগযোগের ফলে যে সকল বীজ উৎপন্ন হইল সেইগুলি অঙ্কুরিত হইয়া 787টি দীর্ঘাকৃতি ও 277টি খর্বাকৃতি মটরগাছ উৎপন্ন করিল। অর্থাৎ দীর্ঘ ও খর্ব গাছের অনুপাত হইল 3 : 1। ইহা হইতে বুঝা যায় খর্ব বৈশিষ্ট্যটি F_1 জনুতে সুপ্ত অবস্থায় ছিল যাহা F_2 জনুতে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। F_1 জনুর উদ্ভিদের মধ্যে স্বপরাগযোগে সৃষ্ট উদ্ভিদগুলিকে একত্রে দ্বিতীয় অপত্য জনু বলে এবং ইহাকে F_2 সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আবার F_2 জনুতে উৎপন্ন উদ্ভিদগুলির মধ্যে মেণ্ডেল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাইলেন। F_2 জনুর খর্ব উদ্ভিদগুলি যেমন স্বনিষেকের ফলে কেবল খর্ব উদ্ভিদ উৎপন্ন করে, তেমনি এক-তৃতীয়াংশ ($\frac{1}{3}$) দীর্ঘ গাছ স্বনিষেকের ফলে কেবল দীর্ঘ উদ্ভিদ উৎপন্ন করে অর্থাৎ খর্ব ও $\frac{1}{3}$ দীর্ঘ উদ্ভিদগুলি বিশুদ্ধ। কিন্তু F_2 জনুর অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ ($\frac{2}{3}$) দীর্ঘ গাছ স্বনিষেকের ফলে 3 : 1 অনুপাতে দীর্ঘ ও খর্ব উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ $\frac{2}{3}$ দীর্ঘ উদ্ভিদ ঐ বৈশিষ্ট্যের জন্য সংকর।

পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ (Analysis of experimental results) : মেণ্ডেল পরীক্ষালব্ধ ফলের বিশ্লেষণ নিম্নলিখিতরূপে করেন

1. দুইটি বিপরীতধর্মী চারিত্রিক লক্ষণের প্রতিটির জন্য একটি করিয়া উপাদান বা নির্ধারক বা ফ্যাক্টর (Factor) থাকে। বর্তমানে এই উপাদানগুলিকে জীন বলা হয়।

2. F_1 জনুতে উপরি-উক্ত দুইটি উপাদানের একটি প্রকাশিত হয় এবং অপরটি অপ্রকাশিত থাকে। প্রকাশিত উপাদান বা নির্ধারককে প্রকট (Dominant) নির্ধারক ও অপ্রকাশিত উপাদান বা নির্ধারককে প্রচ্ছন্ন (Recessive) নির্ধারক বলে। যেমন উপরি-উক্ত পরীক্ষায় F_1 জনুতে দীর্ঘ প্রকট ও খর্ব প্রচ্ছন্ন নির্ধারক।

3. F_1 জনুর অপত্য উদ্ভিদে উপাদান বা নির্ধারক দুইটি অবিকৃত অবস্থায় পাশাপাশি অবস্থান করে এবং পরবর্তী বা F_2 জনুতে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে বা পৃথক হইয়া যায়। যেমন খর্ব বৈশিষ্ট্যটি উৎপন্ন বীজের এক-চতুর্থাংশে ($\frac{1}{4}$) দেখা যায়।

সিদ্ধান্ত (Inference) : একসংকর পরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া মেণ্ডেল বংশগতি সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত দুইটি সূত্রে লিপিবদ্ধ করেন

1. **প্রকটতা ও প্রচ্ছন্নতার সূত্র (Law of dominance and recessive) :** একজোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইলে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় তাহাকে প্রকট লক্ষণ (Dominant character) এবং অপরটি অপ্রকাশিত থাকে তাহাকে প্রচ্ছন্ন লক্ষণ (Recessive character) বলে।

2. **পৃথগ্ভবনের সূত্র (Law of segregation) :** একজোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপাদান বা ফ্যাক্টর জনিতৃ হইতে অপত্য জনুতে মিলিত হইলে উহারা কখনও মিশ্রিত হয় না, পরন্তু জননকোষ সৃষ্টির সময় উহারা অপরিবর্তিত অবস্থায় পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া যায়।

অনেক বিজ্ঞানী মেণ্ডেলের প্রকটতা ও প্রচ্ছন্নতার ঘটনাকে প্রথম সূত্ররূপে স্বীকার করেন না, কারণ অনেক ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। তাঁহাদের মতে পৃথগ্‌ভবনের সূত্রটিই প্রথম সূত্র।

15.9. প্রকট ও প্রচ্ছন্ন লক্ষণ সম্পর্কীয় আলোচনা : মেণ্ডেলের পৃথগ্‌ভবনের সূত্র সর্বত্র প্রযোজ্য হইলেও প্রকটতা ও প্রচ্ছন্নতার ঘটনা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। কারণ মেণ্ডেল তাঁহার সংকরায়ণ পরীক্ষায় কেবল পূর্ণ প্রকটতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহার অসংখ্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। নিম্নে কয়েকটি বিভিন্ন মানের প্রকটতার কথা উল্লেখ করা হইল :

1. অসম্পূর্ণ প্রকটতা (Incomplete dominance) : বিশুদ্ধ লাল (RR) ও
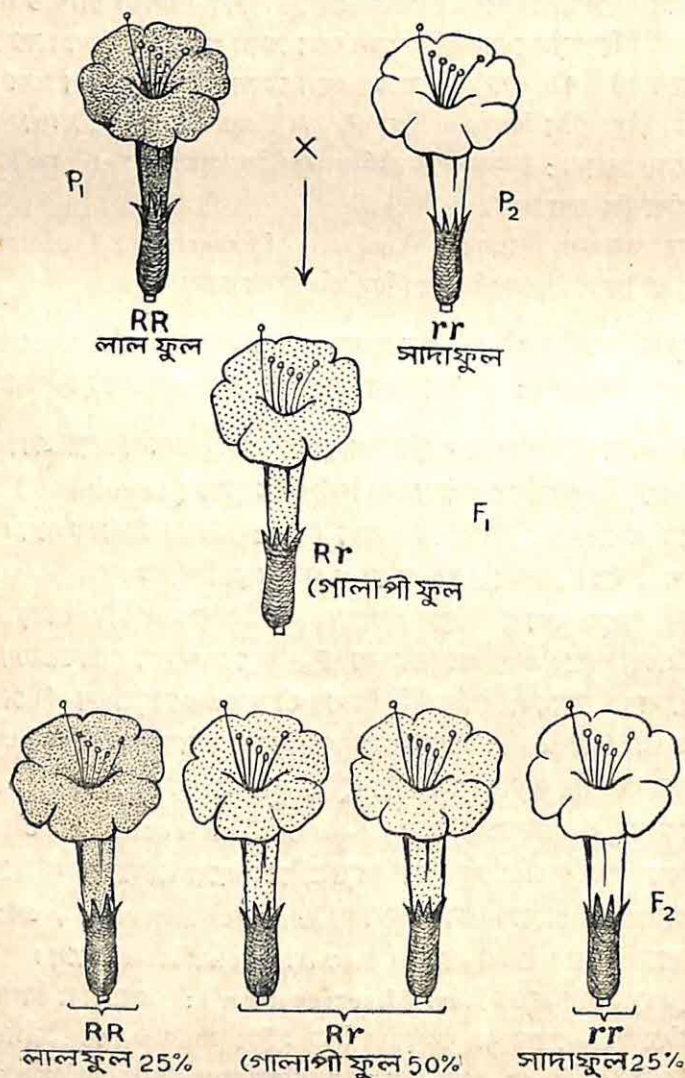
চিত্র 15.3 : অসম্পূর্ণ প্রকটতা

সাদা (ww) ফুলযুক্ত সন্ধ্যামালতী (*Mirabilis jalapa*) উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইলে F_1 জনুতে উৎপন্ন সংকর উদ্ভিদগুলির (Rw) ফুল লাল বা সাদা রঙের না হইয়া গোলাপী হয়। এইরূপ অবস্থাকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলে। কিন্তু F_1 উদ্ভিদের স্বনিষেকের ফলে 1টি লাল (RR) : 2টি গোলাপী (Rw) : 1টি সাদা (ww) উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।
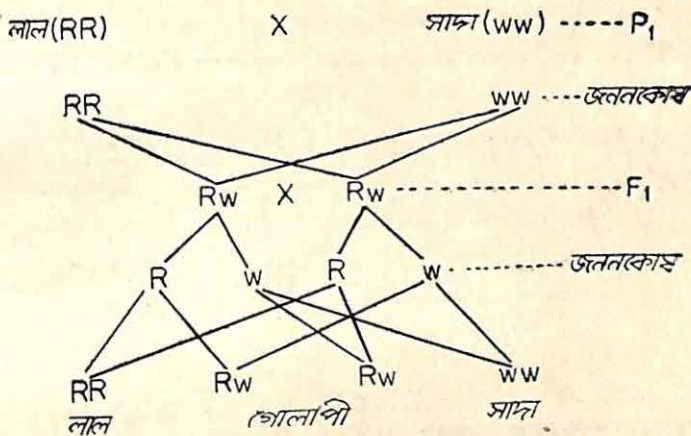
চিত্র 15.4

2. **বিলম্বিত প্রকটতা (Delayed dominance)** : অনেক সময় প্রকট বৈশিষ্ট্য বিলম্বে প্রকাশিত হয়। এই অবস্থাকে বিলম্বিত প্রকটতা বলে। যেমন লিমনিয়া (Limnaea) নামক এক প্রকার মিষ্টি জলে বসবাসকারী শামুকের খোলকের দক্ষিণাবর্ত (Dextral) প্যাঁচ বামাবর্ত (Sinistral) প্যাঁচের উপর প্রকট। কিন্তু দক্ষিণাবর্ত এবং বামাবর্ত খোলকযুক্ত শামুকের সংকরায়ণের ফলে উৎপন্ন জীবে কেবল বামাবর্ত প্যাঁচ দেখা যায়। আবার ঐ সংকরগুলি যে সকল অপত্য উৎপন্ন করে তাহাদের সকলের দক্ষিণাবর্ত প্যাঁচ দেখা যায়। অর্থাৎ প্রকট বৈশিষ্ট্য দেরিতে প্রকাশিত হয় যাহা সংকরের অপত্যের মধ্যে দেখা যায়।

3. **পরিবর্তনীয় প্রকটতা (Reverse dominance)** : প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য কখনও কখনও প্রকটতা লাভ করে। যেমন হেলিক্স (Helix) শামুকের খোলকের লাল রঙ প্রকট ও হলুদ রঙ প্রচ্ছন্ন। কিন্তু লাল ও হলুদ খোলকযুক্ত শামুকের সংকরায়ণের ফলে অনেক ক্ষেত্রে F_1 জনুতে হলুদ খোলকযুক্ত শামুক দেখা যায়।

15.10. ক্রোমোজোম ও জীনের পরিপ্রেক্ষিতে একসংকর জননের ব্যাখ্যা :

মেণ্ডেলের একসংকর জননের পরীক্ষা ও উহার ফলাফলকে ক্রোমোজোম ও জীনের সাহায্যে ছক বা চেকারবোর্ডের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মটরগাছ ডিপ্লয়েড হওয়ায় উহার সমসংস্থ ক্রোমোজোমের উপর বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারক জীন (অ্যালীল) জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। তাই বিশুদ্ধ দীর্ঘ ও বিশুদ্ধ খর্ব মটরগাছের জীনগত সংযুতি হইল যথাক্রমে TT (Pure tall) ও dd (Pure dwarf)।
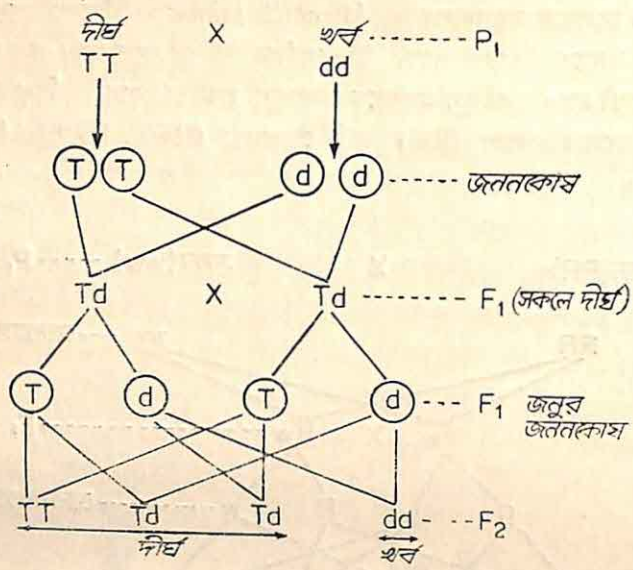
চিত্র 15.5

চেকারবোর্ডের সাহায্যে ব্যাখ্যা :
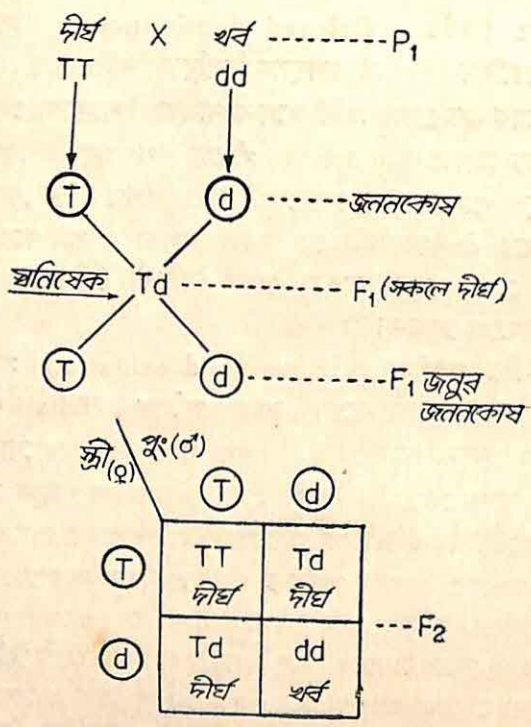
চিত্র 15.6

উল্লিখিত ছক বা চেকারবোর্ড হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে বিশুদ্ধ দীর্ঘ (TT) ও বিশুদ্ধ খর্ব (dd) মটরগাছের মধ্যে সংকরায়ণের ফলে উৎপন্ন F_1 জনুর সকল উদ্ভিদ বা সংকরের জীনগত সংযুতি Td এবং উহারা সকলেই দীর্ঘ হয় কারণ T জীন d জীনের উপর সম্পূর্ণভাবে প্রকট। F_1 জনুর অপত্যের স্বনিষেকের ফলে 3 : 1 অনুপাতে দীর্ঘ ও খর্ব গাছযুক্ত F_2 জনু উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ F_1 জনুর অপত্যের মধ্যে
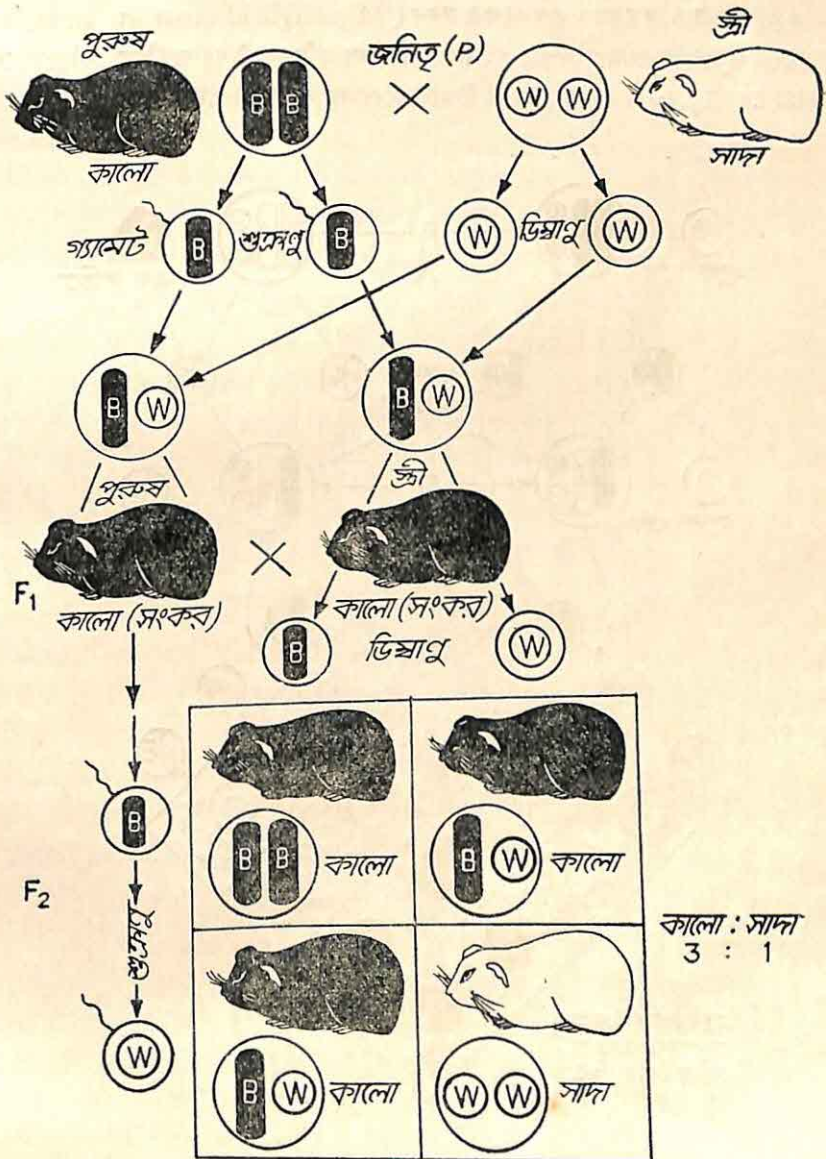
চিত্র 15.7 : মেণ্ডেলের একসংকর জননের পরীক্ষা (গিনিপিগ)

T ও d জীন দুইটি মিশ্রিত না হইয়া কেবল পাশাপাশি অবস্থান করে এবং জননকোষ গঠনের সময় উহারা পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া যায়। কিন্তু F_2 জনুর দীর্ঘ গাছগুলির এক-তৃতীয়াংশ অংশ TT জীনযুক্ত অর্থাৎ বিশুদ্ধ বা হোমোজাইগাস ও অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ Td জীনযুক্ত অর্থাৎ সংকর বা হেটারোজাইগাস। অর্থাৎ F_2 জনুর অপত্যের বহিঃলক্ষণ বা ফেনোটাইপের অনুপাত 3 দীর্ঘ : 1 খর্ব এবং জীনগত লক্ষণ বা জেনোটাইপের অনুপাত 1TT : 2Td : 1dd।

15.11. প্রাণীর ক্ষেত্রে একসংকর জনন (Monohybrid cross in animals) : মেণ্ডেলের সূত্রগুলি পুনরাবিষ্কৃত হইবার পর নানা জীবের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মানুষ-সহ সকল প্রাণীর উপর মেণ্ডেলের সূত্রগুলি সমভাবে প্রযোজ্য।
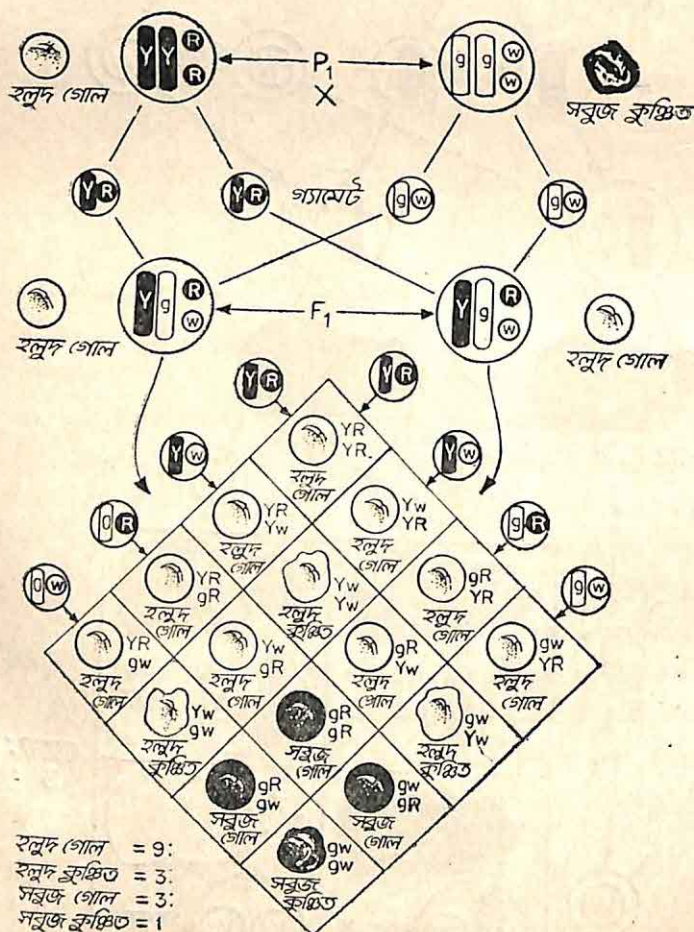
চিত্র 15.8 : মটরগাছের দ্বিসংকর জননের পরীক্ষা

যেমন গিনিপিগের কালো রঙ সাদা রঙের উপর সম্পূর্ণভাবে প্রকট। তাই বিশুদ্ধ কালো ও বিশুদ্ধ সাদা রঙের গিনিপিগের জীনগত সংযুতি হইল যথাক্রমে BB (Black) ও ww (white)। একটি কালো রঙের গিনিপিগের সহিত একটি সাদা রঙের গিনিপিগের সংকরায়ণ ঘটাইলে F_1 জনুতে উৎপন্ন প্রতিটি গিনিপিগ কালো (Bw) রঙের হয়। কিন্তু F_1 জনুর অপত্য বা সংকরের মধ্যে নিষেক ঘটাইলে 3টি কালো ও 1টি সাদা রঙের গিনিপিগ উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ ইহাদের ফেনোটাইপের অনুপাত হইবে 3 কালো : 1 সাদা। কিন্তু কালো রঙের গিনিপিগের জীনগত সংযুতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে উহার একভাগ বিশুদ্ধ কালো (BB), 2 ভাগ সংকর কালো (Bw) ও একভাগ বিশুদ্ধ সাদা (ww)। অর্থাৎ জেনোটাইপের অনুপাত 1BB : 2Bw : 1ww।

15.12. দ্বিসংকর জনন (Dihybrid Cross): দুইজোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক লক্ষণকে ভিত্তি করিয়া সংকরায়ণকে দ্বিসংকর জনন বলে। এই পরীক্ষায় মেণ্ডেল হলুদ বর্ণ ও গোলাকার এবং সবুজ বর্ণ ও কুঞ্চিত বীজযুক্ত বিশুদ্ধ মটরগাছ নির্বাচন করেন। হলুদ বর্ণ ও গোলাকার হইল প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং সবুজ বর্ণ ও কুঞ্চিত হইল প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। মেণ্ডেল উপরি-উক্ত দুইটি উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইয়া দেখিলেন যে F_1 জনুর সকল উদ্ভিদ হলুদ বর্ণ ও গোলাকার বীজযুক্ত। F_1 জনুর উদ্ভিদের মধ্যে স্বনিষেক ঘটাইলে F_2 জনুতে চারিপ্রকার বীজযুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। ইহাদের মধ্যে 315টি হলুদ ও গোলাকার, 101টি হলুদ ও কুঞ্চিত, 108টি সবুজ ও গোলাকার এবং 32টি সবুজ ও কুঞ্চিত। অর্থাৎ হলুদ গোলাকার, হলুদ কুঞ্চিত, সবুজ গোলাকার ও সবুজ কুঞ্চিত বীজযুক্ত উদ্ভিদের অনুপাত হইল 9 : 3 : 3 : 1। F_2 জনুতে উৎপন্ন উদ্ভিদের মধ্যে পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য ব্যতীত (হলুদ গোলাকার ও সবুজ কুঞ্চিত দুই প্রকার নূতন বৈশিষ্ট্যযুক্ত (হলুদ কুঞ্চিত ও সবুজ গোলাকার) উদ্ভিদের
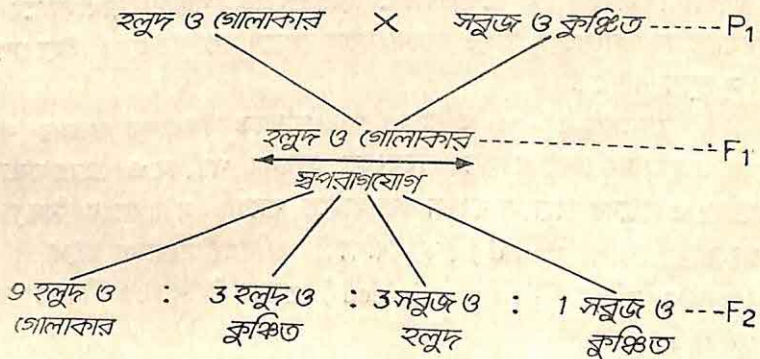
চিত্র 15.9

সৃষ্টি হইয়াছে। F_1 জনুর অপত্য দুইজোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক লক্ষণের জন্য সংকর বলিয়া ইহাদের দ্বিসংকর (Dihybrid) বলে। এই পরীক্ষার ফলাফল হইতে

মেণ্ডেল ধারণা করিলেন যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরস্পর হইতে পৃথক হয় তাহাই নহে, ইহারা স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হইতে পারে।

পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ (Analysis of experimental results): মেণ্ডেলের দ্বিসংকর জননের ফলাফল দুইটি পৃথক একসংকর জননের যোগফল বলা যাইতে পারে। কারণ পৃথকভাবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জোড়াগুলি যদি পৃথগ্‌ভবন সূত্র অনুযায়ী জনুতে সঞ্চারিত হয় তাহা হইলে দুইটি একসংকর জননের গুণফল দ্বিসংকর জননের ফলাফলের সমান হইবে। যেমন একসংকর জনন অনুযায়ী F_2 জনুতে উৎপন্ন অপত্যের অনুপাত হইবে—

(i) হলুদ × সবুজ—3 হলুদ : 1 সবুজ

(ii) গোলাকার × কুঞ্চিত—3 গোলাকার : 1 কুঞ্চিত

এইবার দুইটি একসংকর জননের ফলাফলকে গুণ (3 : 1 × 3 : 1) করিলে দ্বিসংকর জননের ফলাফল পাওয়া যাইবে।

(i) হলুদ ও গোলাকার হইবে—$3 \times 3 = 9$

(ii) হলুদ ও কুঞ্চিত হইবে—$3 \times 1 = 3$

(iii) সবুজ ও গোলাকার হইবে—$1 \times 3 = 3$

(iv) সবুজ ও কুঞ্চিত হইবে—$1 \times 1 = 1$

অর্থাৎ দ্বিসংকর জননে F_2 জনুতে উৎপন্ন উদ্ভিদের অনুপাত 9 : 3 : 3 : 1।

সিদ্ধান্ত (Inference): দ্বিসংকর জননের ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া মেণ্ডেল বংশগতি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত সূত্রে লিপিবদ্ধ করেন:

স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র (Law of independent assortment): দুইজোড়া বা ততোধিক বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইলে উক্ত লক্ষণগুলির উপাদান বা ফ্যাক্টর জোড়াগুলি জননকোষ গঠনকালে পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং F_2 জনুতে একটি জোড়ার প্রতিটি উপাদান স্বাধীনভাবে অপর জোড়ার যে কোন উপাদানের সহিত সম্ভাব্য সকল সমন্বয়ে সঞ্চারিত হয়। ইহা মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্ররূপে পরিচিত।

15.13. ক্রোমোজোম ও জীনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিসংকর জননের ব্যাখ্যা: মেণ্ডেলের একসংকর জননের ন্যায় দ্বিসংকর জননের পরীক্ষা ও উহার ফলাফলকে ক্রোমোজোম ও জীনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মটরগাছের বিশুদ্ধ হলুদ ও গোলাকার (yellow round) প্রকট বৈশিষ্ট্যের জীনগত সংযুতি হইল YYRR এবং সবুজ ও কুঞ্চিত (Green wrinkled) প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের জীনগত সংযুতি হইল wwgg।

একটি বিশুদ্ধ হলুদ ও গোলাকার বীজযুক্ত মটরগাছের সহিত বিশুদ্ধ সবুজ ও কুঞ্চিত বীজযুক্ত মটরগাছের সংকরায়ণের ফলে F_1 জনুর সকল উদ্ভিদ হলুদ বর্ণের ও গোলাকার বীজযুক্ত হয় কারণ হলুদ ও গোলাকার বৈশিষ্ট্য প্রকট। অতঃপর F_1 জনুর অপত্যের স্বনিষেকের ফলে F_2 জনুতে যে সকল অপত্যের সৃষ্টি হয় তাহাদের

অনেকের মধ্যে পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য (হলুদ গোলাকার এবং সবুজ কুঞ্চিত) ব্যতীত দুই প্রকার নূতন বৈশিষ্ট্য (হলুদ কুঞ্চিত এবং সবুজ গোলাকার) দেখা যায়। ইহার কারণ F_1 জনুর অপত্য জননকোষ সৃষ্টির সময় পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য বা পুরানো সমন্বয় ব্যতীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জীনগুলি (YgRw) সকল সম্ভাব্য সমন্বয়ে স্বাধীন-ভাবে জননকোষে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তাই F_1 জনুতে হলুদ ও গোলাকার, হলুদ ও কুঞ্চিত, সবুজ ও গোলাকার এবং সবুজ কুঞ্চিত বীজযুক্ত উদ্ভিদের অনুপাত হয় 9 : 3 : 3 : 1। F_2 জনুতে চারিপ্রকার ফেনোটাইপ উৎপন্ন হইলেও জীনগত সংযুতির দিক হইতে ইহারা 9 প্রকার জেনোটাইপের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে ইহাদের ফেনোটাইপ ও জেনোটাইপ উল্লেখ করা হইল :

ফেনোটাইপ	জেনোটাইপ	জেনোটাইপের অনুপাত	ফেনোটাইপের অনুপাত
(i) হলুদ ও গোলাকার	YYRR ···	1	9
	YgRR ···	2	
	YYRw ···	2	
	ggww ···	4	
(ii) হলুদ ও কুঞ্চিত	YYww ···	1	3
	Ygww ···	2	
(iii) সবুজ ও গোলাকার	ygRR ···	1	3
	ggRw ···	2	
(iv) সবুজ ও কুঞ্চিত	ggww ···	1	1

15.14. প্রাণীর ক্ষেত্রে দ্বিসংকর জনন (Dihybrid cross in animals) :

মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। গিনিপিগের কালো রঙ সাদা রঙের উপর এবং কর্কশ বা অবিন্যস্ত লোম মসৃণ বা বিন্যস্ত লোমের উপর সম্পূর্ণভাবে প্রকট। একটি বিশুদ্ধ কালো ও অবিন্যস্ত লোমযুক্ত গিনিপিগের (Black and Rough) জীনগত সংযুতি হইবে BBRR এবং সাদা ও মসৃণ লোমযুক্ত গিনিপিগের (white and smooth) জীনগত সংযুতি হইবে wwss।

একটি বিশুদ্ধ কালো রঙ ও অমসৃণ লোমযুক্ত গিনিপিগের সহিত বিশুদ্ধ সাদা রঙ ও মসৃণ লোমযুক্ত গিনিপিগের সংকরায়ণ ঘটাইলে F_1 জনুর সকল অপত্য কালো রঙের ও অবিন্যস্ত লোমযুক্ত হয় কারণ কালো রঙ ও অবিন্যস্ত লোম প্রকট বৈশিষ্ট্য। F_1 জনুর দুইটি গিনিপিগের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইলে F_2 জনুতে 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাতে যথাক্রমে কালো অবিন্যস্ত, কালো মসৃণ, সাদা অবিন্যস্ত এবং সাদা মসৃণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত গিনিপিগের সৃষ্টি হয়। F_2 জনুতে চারি প্রকার ফেনোটাইপ উৎপন্ন

হইলেও জীনগত সংযুতির দিক হইতে ইহারা 9 প্রকার জেনোটাইপের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে ইহাদের ফেনোটাইপ ও জেনোটাইপ উল্লেখ করা হইল :

চিত্র 15.10 মেণ্ডেলের দ্বিসংকর জননের (গিনিপিগ) পরীক্ষা
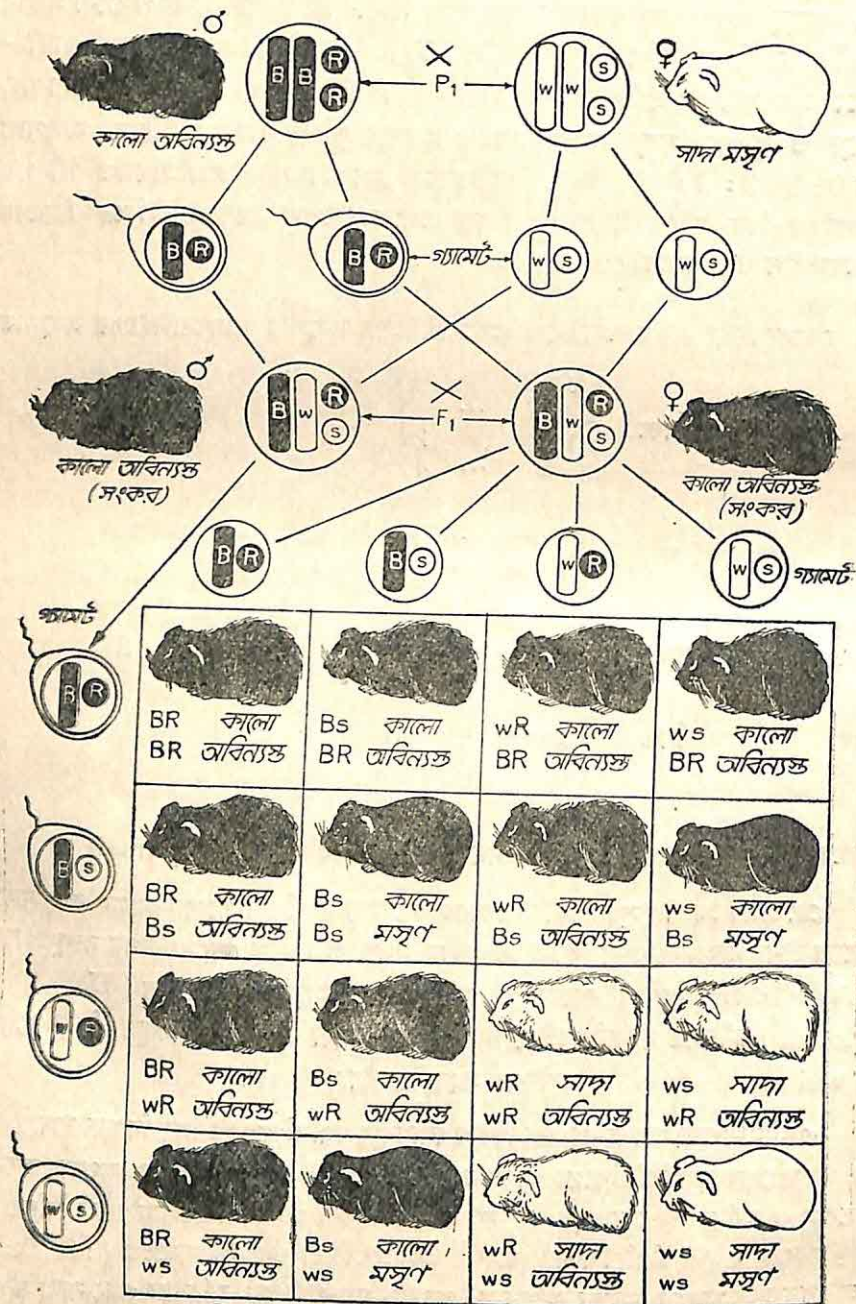
ফেনোটাইপ	জেনোটাইপ	জেনোটাইপের অনুপাত	ফেনোটাইপের অনুপাত
(i) কালো অবিন্যস্ত	BBRR BwRR BBRs BwRs	... 1 ... 2 ... 2 ... 4	9
(ii) কালো মসৃণ	BBss Bwss	... 1 ... 2	3
(iii) সাদা অবিন্যস্ত	wwRR wwRs	... 1 ... 2	3
(iv) সাদা মসৃণ	wwss	... 1	1

15.15. **দ্বিসংকর জননের ব্যতিক্রম** (Deviations of Dihybrid cross) :

(1) **জীনের পারস্পরিক ক্রিয়া** (Interaction of genes)—অনেক সময় দ্বিসংকর জননে দু'জোড়া জীনের পারস্পরিক ক্রিয়ায় F_2 জনুতে ফেনোটাইপের অনুপাত 9 : 3 : 3 : 1 এর পরিবর্তে 9 : 7, 9 : 3 : 4 (মটরগাছে) ; 13 : 1 (মুরগীতে) দেখা যায়।

(2) **লিংকেজ** (Linkage)—লিংকেজ স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্রের একটি ব্যতিক্রম কারণ লিংকেজের ক্ষেত্রে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জীনের জোড়াগুলি (লিংকড্ জীনগুলি) একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত। অপরপক্ষে, স্বাধীন সঞ্চারণের ক্ষেত্রে দুই জোড়া বা ততোধিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারক জীন পৃথক পৃথক ক্রোমোজোম জোড়ায় অবস্থিত। কখনও কখনও ক্রসিং-ওভারের ফলে লিংকড্ জীনগুলি পৃথক হইয়া বিভিন্ন জননকোষে প্রবেশ করে।

(3) **বহুজীন নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ** (Multiple factor inheritence)—অনেক সময় একটি বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ও সঞ্চারণ অনেকগুলি জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন মানুষের দেহের রঙ।

মেণ্ডেলের একসংকর জননের ফলাফল

P_1 জনু	F_1 জনু	F জনু		F_2 জনুর মোট অপত্য সংখ্যা	F_2 জনুর অনুপাত
		প্রকট	প্রচ্ছন্ন		
(1) দীর্ঘ × দীর্ঘ / কাণ্ড	দীর্ঘ	দীর্ঘ 787	খর্ব 277	1064	2·84 : 1
(2) গোলাকার × কুঞ্চিত / বীজের আকার	গোলাকার	গোল 5474	কুঞ্চিত 1850	7324	2·96 : 1
3) হলুদ × সবুজ / বীজপত্র	হলুদ	হলুদ 6022	সবুজ 2001	8023	3·01 : 1
(4 কাক্ষিক × শীর্ষ / পুষ্পের অবস্থান	কাক্ষিক	কাক্ষিক 651	শীর্ষ 207	858	3·14 : 1
(5) লাল × সাদা / পুষ্পের রঙ	লাল	লাল 705	সাদা 224	929	3·15 : 1
(6) স্ফীত × সঙ্কুচিত / শিম্বের আকার	স্ফীত	স্ফীত 882	সঙ্কুচিত 299	1181	2·95 : 1
(7) সবুজ × হলুদ / শিম্বের বর্ণ	সবুজ	সবুজ 428	হলু 152	580	2·82 : 1

সংকরায়ণ পরীক্ষায় F_1 জনুর জননকোষের শ্রেণীসংখ্যা, F_2 জনুর বিন্যাসের শ্রেণীসংখ্যা, F_2 জনুর জেনোটাইপ ও ফেনোটাইপের শ্রেণীসংখ্যার ছক : :

অ্যালীলের সংখ্যা	F_1 জনুর জননকোষের শ্রেণীসংখ্যা	F_2 জনুর বিন্যাসের শ্রেণীসংখ্যা	জেনোটাইপ শ্রেণীসংখ্যা	ফেনোটাইপ শ্রেণীসংখ্যা
n	2^n	4^n	3^n	2^n
1 জোড়া	$2^1=2$	$4^1=4$	$3^1=3$	$2^1=2$
2 জোড়া	$2^2=4$	$4^2=16$	$3^2=9$	$2^2=4$
3 জোড়া	$2^3=8$	$4^3=64$	$3^3=27$	$2^3=8$
4 জোড়া	$2^4=16$	$4^4=256$	$3^4=81$	$2^4=16$
5 জোড়া	$2^5=32$	$4^5=1024$	$3^5=243$	$2^5=32$

15.16. মেণ্ডেলের সাফল্যলাভের কারণ :

(1) পরীক্ষাকালে মেণ্ডেল কেবল একজোড়া বা দুইজোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (দীর্ঘ ও খর্ব, হলুদ ও সবুজ প্রভৃতি) লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সযত্নে পরিহার করেন।

(2) অধিক সংখ্যক অপত্য লইয়া তাহাদের সৃষ্টির গাণিতিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করেন।

(3) মেণ্ডেল পরীক্ষালব্ধ ফলাফল পরপর তিনটি জনু পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন।

(4) জটিলতা পরিত্যাগ করিয়া শুধু সংকরায়ণ পদ্ধতিতে সৃষ্ট অপত্যের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিয়া ফলাফল বিশ্লেষণ করেন।

(5) তিনি যে সাতজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছিলেন সেইগুলি সাতজোড়া পৃথক পৃথক ক্রোমোজোম জোড়ার উপর অবস্থিত ছিল বলিয়া বৈশিষ্ট্যগুলি F_2 জনুতে স্বাধীনভাবে সকল সম্ভাব্য সমন্বয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। অর্থাৎ পৃথক পৃথক ক্রোমোজোম জোড়ায় বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী ফ্যাক্টর বা জীনগুলি অবস্থিত ছিল বলিয়া জীনগুলির মধ্যে লিংকেজ ছিল না।

15.17. বংশগতিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা :

(1) সংকরায়ণ পদ্ধতিতে রোগ প্রতিরোধক্ষম ও অধিক ফলনশীল ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য সৃষ্টির মাধ্যমে খাদ্য-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইয়াছে।

(2) দেশী ও বিদেশী গরু, মহিষ, হাঁস, মুরগী প্রভৃতির মধ্যে সংকরায়ণের ফলে উন্নত মানের পশু-পাখী সৃষ্টি হইয়াছে যাহারা প্রভূত পরিমাণে দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদন করিতে পারে।

(3) সুপ্রজননবিদ্যায় আধুনিক জ্ঞান উদ্যানবিদ্যায় প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বৃহৎ উন্নত মানের ফুল-ফল সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে।

(4) হিমোফিলিয়া, বর্ণান্ধতা, ডায়াবেটিস, বিভিন্ন ধরনের রক্তাল্পতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার বংশগত রোগের কারণ ও উহাদের বংশগতি সুপ্রজননবিদ্যার দ্বারা জানা সম্ভব হইয়াছে।

(5) জেনেটিক কোড আবিষ্কৃত হওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের টেস্ট-টিউবে হয়ত প্রাণ সৃষ্টি করাও অসম্ভব নয়।

(6) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং*-এর সাহায্যে মানুষের বিভিন্ন ধরনের সহজাত বা জীনঘটিত দূরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

15.18. সংকরায়ণের প্রকারভেদ (Types of crosses) : বংশগতির মূল তথ্য ও বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানের জন্য নিম্নে পৃষ্ঠা 15.20—15.21 ছয় প্রকার সংকরায়ণের পরীক্ষা ছকের আকারে দেওয়া হইল। এই পরীক্ষায় কেবল মটরগাছের উচ্চতানির্ভর বৈশিষ্ট্য (দীর্ঘ ও খর্ব) লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।

***জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering) :** কোন জীবন্ত কোষের জীনপুঞ্জের মধ্যে বাহিরে সৃষ্ট DNA প্রবেশ করাইয়া উক্ত কোষের জীনপুঞ্জের পরিবর্তন, নূতন সংযোজন ইত্যাদির মাধ্যমে নূতন জীনপুঞ্জ সৃষ্টি করাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। তবে বিজ্ঞানের এই শাখা এখন অগ্রগতির পথে এবং ইহার ফল সুদূরপ্রসারী।

(1) দুইটি বিশুদ্ধ প্রকটের মধ্যে সংকরায়ণ :
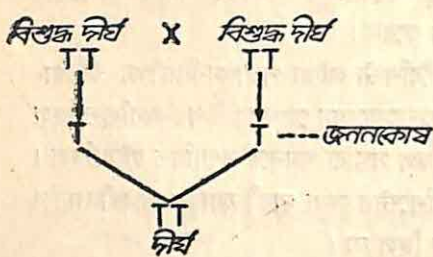
এই সংকরায়ণে সকল উদ্ভিদ বিশুদ্ধ দীর্ঘ হয়।

(2) দুইটি বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্নের মধ্যে সংকরায়ণ :
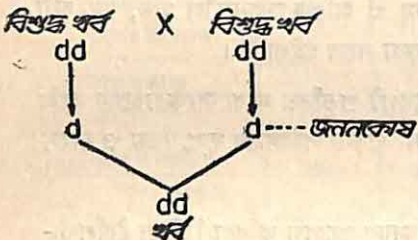
এই সংকরায়ণে সকল উদ্ভিদ বিশুদ্ধ খর্ব হয়।

(3) বিশুদ্ধ প্রকট ও বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্নের মধ্যে সংকরায়ণ :
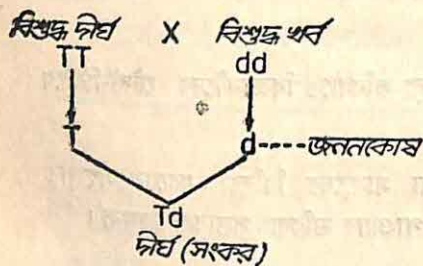
এই সংকরায়ণে সকল উদ্ভিদ দীর্ঘ হয় কিন্তু ইহারা সংকর বা হেটারোজাইগাস।

(4) বিশুদ্ধ প্রকট ও সংকরের মধ্যে সংকরায়ণ :
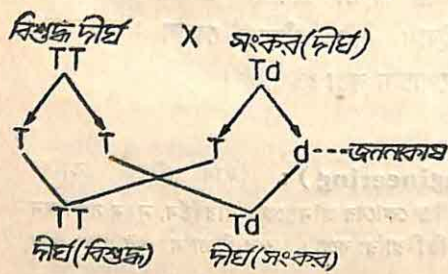
এই সংকরায়ণে উৎপন্ন সকল উদ্ভিদ দীর্ঘ হয় কিন্তু ইহাদের মধ্যে অর্ধেক বিশুদ্ধ ও অর্ধেক সংকর।

5) **সংকর ও বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্নের মধ্যে সংকরায়ণ :**
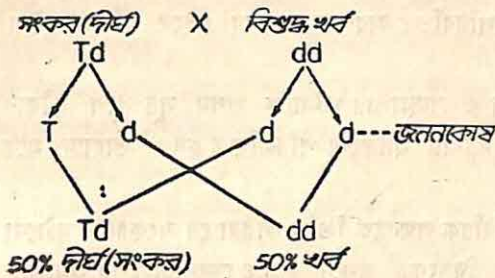
এই সংকরায়ণে উৎপন্ন উদ্ভিদের অর্ধেক দীর্ঘ (সংকর) ও অর্ধেক খর্ব হয়। ইহাদের ফেনোটাইপ ও জেনোটাইপের অনুপাত 1 : 1.

(6) **দুইটি সংকরের মধ্যে সংকরায়ণ :**
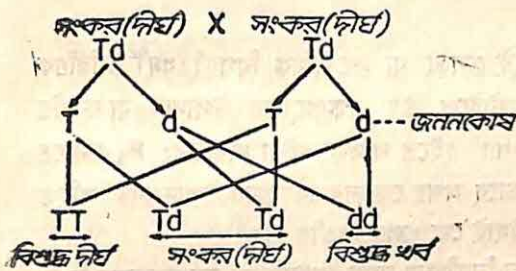
এই সংকরায়ণে উৎপন্ন উদ্ভিদের $\frac{3}{4}$ দীর্ঘ ও $\frac{1}{4}$ খর্ব উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ফেনোটাইপের অনুপাত 3 : 1। কিন্তু দীর্ঘ উদ্ভিদ $\frac{1}{3}$ বিশুদ্ধ ও $\frac{2}{3}$ সংকর। তাই জেনোটাইপের অনুপাত 1 : 2 : 1.

বিষয়-সংক্ষেপ

1. যে প্রক্রিয়ায় পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয় তাহাকে বংশগতি বলে। বিজ্ঞানের যে শাখায় বংশগতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয় তাহাকে সুপ্রজননবিদ্যা বা জেনেটিক্স বলে।

2. 18 6 খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার ধর্মযাজক মেণ্ডেল প্রথম বংশগতির সূত্রগুলির আবিষ্কার, বিশ্লেষণ ও প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষার ফলাফল, বিশ্লেষণ ও সূত্রগুলিকে একত্রে মেণ্ডেলতত্ত্ব বা মেণ্ডেলিজম্ বলে।

3. একজোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক লক্ষণকে ভিত্তি করিয়া যে সংকরায়ণ ঘটানো হয় তাহাকে একসংকর জনন বলে। একসংকর জননে F_2 জনুতে ফেনোটাইপের অনুপাত 3 : 1 ও জেনোটাইপের অনুপাত 1 : 2 : 1। মেণ্ডেল একসংকর জননের পরীক্ষা হইতে তাঁহার বংশগতি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত সূত্রে লিপিবদ্ধ করেন।

(i) **প্রকটতা ও প্রচ্ছন্নতার সূত্র**—একজোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইলে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় তাহাকে প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং যাহা অপ্রকাশিত থাকে বা আপাত সুপ্ত থাকে বলিয়া মনে হয় তাহাকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে।

(ii) **পৃথগ্‌ভবনের সূত্র**—একজোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপাদান বা ফ্যাক্টর জনিতৃ হইতে অপত্য জনুতে একত্রিত হইলে উহারা কখনও মিশ্রিত হয় না পরন্তু জননকোষ সৃষ্টির সময় উহারা অপরিবর্তিত অবস্থায় পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া যায়।

অনেক বিজ্ঞানী মেণ্ডেলের প্রকটতা ও প্রচ্ছন্নতার ঘটনাকে প্রথম সূত্র রূপে স্বীকার করেন না, কারণ অনেক ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। তাঁহাদের মতে পৃথগ্‌ভবনের সূত্রটিই প্রথম সূত্র।

4. দুই জোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক লক্ষণকে ভিত্তি করিয়া যে সংকরায়ণ ঘটানো হয় তাহাকে দ্বিসংকর জনন বলে। দ্বিসংকর জননে F_2তে ফেনোটাইপের অনুপাত 9 : 3 : 3 : 1 এবং জেনোটাইপের অনুপাত 1 : 2 : 2 : 4 : 1 : 2 : 1 : 2 : 1। মেণ্ডেল দ্বিসংকর জননের পরীক্ষা হইতে তাঁহার বংশগতি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত সূত্রে লিপিবদ্ধ করেন।

(iii) **স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র**—দুই জোড়া বা ততোধিক বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইলে উক্ত লক্ষণগুলির উপাদান বা ফ্যাক্টর জোড়াগুলি জননকোষ গঠনকালে পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং F_2 জনুতে একটি জোড়ার প্রতিটি উপাদান স্বাধীনভাবে অপর জোড়ার যে কোন উপাদানের সহিত সম্ভাব্য সকল সমন্বয়ে সঞ্চারিত হয়। ইহাই মেণ্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র।

5. মেণ্ডেল পরবর্তী যুগে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে মেণ্ডেলতত্ত্বের কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে। তবে তাঁহার মৌলিক সূত্রগুলি অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলিয়া স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। নিম্নে কয়েকটি ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা হইল।

(i) **অসম্পূর্ণ প্রকটতা**—বিশুদ্ধ লাল ও সাদা ফুলযুক্ত সন্ধ্যামালতী (*Mitabilis jalapa*) উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিলে F_1 জনুর সকল উদ্ভিদের ফুল লাল বা সাদা রঙের না হইয়া গোলাপী রঙের হয়। এইরূপ অবস্থাকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলে।

(ii) **লিংকেজ ও ক্রসিং-ওভার**—মেণ্ডেলের স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্রটি অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ দুই জোড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক জীন দুই জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোমে থাকিলে স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র প্রযোজ্য হয়। অপরপক্ষে, জীনগুলি এক জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোমে থাকিলে একই জননকোষে সঞ্চারিত হইবার প্রবণতা থাকে। ইহাকে লিংকেজ বলে এবং এই জীনগুলিকে লিংকড জীন বলে। অনেক সময় ক্রসিং-ওভারের ফলে লিংকড্ জীনগুলি পৃথক হইয়া বিভিন্ন জননকোষে প্রবেশ করে।

(*iii*) দ্বিসংকর জননে জীনের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে F_2 জনুতে কোন কোন ক্ষেত্রে 9 : 3 : 3 : 1 অনুপাতের পরিবর্তে 9 : 7, 9 : 3 : 4 প্রভৃতি অনুপাত পাওয়া যায়।

6. বর্তমানে জানা গিয়াছে ক্রোমোজোমের উপর জীনগুলি রৈখিক আকারে সজ্জিত এবং এই জীনগুলি জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা বংশগতির ক্রোমোজোমতত্ত্ব রূপে পরিচিত।

7. সংকরায়ণ পদ্ধতিতে রোগ প্রতিরোধক্ষম ও অধিক ফলনশীল ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য ; গরু, মহিষ, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি উন্নত মানের পশু-পাখী ও উন্নত মানের ফুল-ফল সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। হিমোফিলিয়া, বর্ণান্ধতা প্রভৃতি বংশগত রোগের কারণ ও উহাদের বংশগতি সুপ্রজননবিদ্যা দ্বারা জানা সম্ভব হইয়াছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে মানুষের বিভিন্ন দূরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

প্রশ্নাবলী

A. পার্থক্য লিখ :

1. প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য।
2. ফেনোটাইপ ও জেনোটাইপ।
3. হোমোজাইগাস ও হেটারোজাইগাস।
4. বিশুদ্ধ ও সংকর।
5. একসংকর ও দ্বিসংকর জনন।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

1. মেণ্ডেলতত্ত্ব কাহাকে বলে ?
2. অ্যালীল কাহাকে বলে ?
3. প্রথম ও দ্বিতীয় অপত্য বংশ বলিতে কি বুঝ ?
4. লিংকেজ কাহাকে বলে ?
5. জীনোম ও জীনপুল কাহাকে বলে ?
6. টেস্টক্রস ও ব্যাকক্রস বলিতে কি বুঝ ?
7. অসম্পূর্ণ প্রকটতা কাহাকে বলে ?
8. লোকাস বলিতে কি বুঝ ?
9. জেনেটিক কোড কাহাকে বলে ?
10 জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলিতে কি বুঝায় ?

C. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

1. মেণ্ডেল কে ? পরীক্ষার জন্য কেন তিনি মটরগাছ নির্বাচন করেন ?
2. মটরগাছের সাত জোড়া বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
3. বংশগতিবিদ্যায় মেণ্ডেলের সাফল্যলাভের কারণ কি ?
4. বংশগতিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা কি ?

5. মেণ্ডেলের একসংকর পরীক্ষার বংশধরগুলির সংখ্যা, অনুপাত এবং তাহাদের জেনোটাইপ ও ফেনোটাইপ দেখাও। পরীক্ষার ফলাফল হইতে মেণ্ডেল কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ?

6. চেকার বোর্ডের সাহায্যে মেণ্ডেলের দ্বিসংকর জননের ফল নির্ণয় করিয়া বংশধরগুলির সংখ্যা এবং ফেনোটাইপ ও জেনোটাইপের অনুপাত দেখাও। দ্বিসংকর জননের পরীক্ষার ফল হইতে মেণ্ডেল যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহা উল্লেখ কর।

7. একটি বিশুদ্ধ কালো রঙের গিনিপিগের সহিত একটি বিশুদ্ধ সাদা রঙের গিনিপিগের সংকরায়ণের ফলে সমস্ত গিনিপিগ কালো রঙের হইল। শেষোক্ত কালো রঙের গিনিপিগকে (i) পরস্পরের সহিত (ii) কালো রঙের পিতা বা মাতার সহিত (iii) সাদা রঙের পিতা বা মাতার সহিত সংকরায়ণ করিলে কি ঘটিবে তাহা ব্যাখ্যা কর।

8. সন্ধ্যামণি উদ্ভিদের ফুলের লাল রঙ সাদা রঙের উপর অসম্পূর্ণভাবে প্রকট ও মধ্যবর্তী রঙ গোলাপী যদি একটি বিশুদ্ধ লাল রঙের ফুলযুক্ত উদ্ভিদের সহিত সাদা রঙের ফুলযুক্ত উদ্ভিদের সংকরায়ণ ঘটানো হয় তাহা হইলে তাহাদের F_1 ও F_2 জনুর অপত্যের জেনোটাইপ ও ফেনোটাইপ এবং তাহাদের অনুপাত উল্লেখ কর।

ষোড়শ অধ্যায়

জৈব অভিব্যক্তি
(Organic Evolution)

16.1 সূচনা (Introduction): মানুষের সভ্যতা ও চিন্তাশক্তির উন্মেষ যেইদিন হইতে সূত্রপাত সেইদিন হইতে মনে এক অনন্ত জিজ্ঞাসা—কখন, কোথায় এবং কি করিয়া পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়াছিল। বর্তমান পৃথিবীতে যে বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ বিরাজমান তাহা কি করিয়া সৃষ্টি হইল? অথবা মানুষের সৃষ্টি হইল কিরূপে? জীবের এই অলৌকিক সৃষ্টির রহস্য এবং তাহার পরিবর্তন হাজার হাজার বৎসর পূর্বে ইউরোপীয় দার্শনিক ও পণ্ডিতদের মনে প্রথম আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। অতীতে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং তিনিই পৃথিবীর সকল জীবের স্রষ্টা। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী তাঁহাদের আবিষ্কার এবং যুক্তির মাধ্যমে অতীতের কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন আজ হইতে প্রায় 500 কোটি বৎসর পূর্বে যখন পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছিল তখন পৃথিবীতে প্রাণের কোন চিহ্ন ছিল না। তাঁহাদের মতে কেবল জীব হইতে জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। অতীতের কুসংস্কারকে স্বীকার না করিবার জন্য অনেক বিজ্ঞানীকে ধর্মযাজক ও পণ্ডিতদের অত্যাচার ও শাসনের শিকার হইতে হইয়াছিল।

তখনকার দিনে পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ জীবসৃষ্টি এবং তাহার পরিবর্তন সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করিতেন তাহার কিছু তথ্য পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার (Anaximander) নামক একজন গ্রীক দার্শনিক বলেন যে, বহু বৎসর ধরিয়া মাছের বিবর্তনের ফলে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ শতাব্দীর আর একজন গ্রীক দার্শনিক এমপেডোক্লিস (Empedocles) বলেন যে, পৃথিবীতে প্রাণী সৃষ্টির পূর্বে উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে জেনোফেনিস (Xenophanes) নামক এক বিজ্ঞানী স্থলে সামুদ্রিক প্রাণীর জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন এবং মন্তব্য করেন যে, ঐ স্থল কোন এক সময় সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল। জেনোফেনিসের ধারণার সহিত বর্তমান বিবর্তন সম্পর্কিত ধারণার যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক ও জীববিদ অ্যারিস্টটল (Aristotle) জীবের বিবর্তন সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেন। তাঁহার মতে, অজৈব পদার্থ হইতে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে এবং জীবজগতের ক্রমান্বয়িক উন্নতির সোপানে তিনটি স্তর বিদ্যমান। নিচের স্তরে উদ্ভিদ, মাঝের স্তরে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমন্বয়কারী জীব এবং উপরের স্তরে প্রাণী অবস্থিত। তাঁহার মতে, মানুষ জীবজগতের সর্বাপেক্ষা উন্নত জীব।

16.2 পৃথিবী ও জীবসৃষ্টির রহস্য :

পৃথিবী ও জীবসৃষ্টির রহস্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, আজ হইতে প্রায় 500 কোটি বৎসর পূর্বে একটি বিরাট নক্ষত্রের প্রভাবে সূর্যের জ্বলন্ত বাষ্পময় দেহ হইতে একটি গ্যাসীয় পিণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া বহুখণ্ডে বিভক্ত হয়। এই খণ্ডগুলি হইল বিভিন্ন গ্রহ এবং উপগ্রহ। ইহাদের মধ্যে পৃথিবী হইল একটি অন্যতম গ্রহ। সৃষ্টির সময় পৃথিবী ছিল একটি জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড। বহু কোটি বৎসর ধরিয়া এই গ্যাসীয় পিণ্ড তাপ বিকিরণের মাধ্যমে শীতল ও ঘনীভূত হইতে থাকে এবং উত্তপ্ত তরল পদার্থে পরিণত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত তরল পদার্থ ক্রমশ তাপ বিকিরণ করিয়া কঠিন ভূ-ত্বকের সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে তাপ বিকিরণের সময় উদ্ভূত বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ ভূ-ত্বকের বহির্ভাগে অবস্থান করিয়া বায়ুমণ্ডলের রচনা করে। ভূ-রাসায়নিক তথ্য হইতে জানা যায়, আজ হইতে প্রায় 300 কোটি বৎসর পূর্বে বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন, মিথেন, অ্যামোনিয়া ও জলীয় বাষ্প এই চারি প্রকার গ্যাস ছিল। তখন বায়ুমণ্ডল অত্যধিক উত্তপ্ত থাকায় উহার মধ্যে মুক্ত অক্সিজেনের অস্তিত্ব ছিল না। বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া মেঘের সৃষ্টি হয় এবং মেঘ হইতে বৃষ্টিপাতের ফলে বিরাট জলভাগ তথা সমুদ্রের সৃষ্টি হয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুক্তির মাধ্যমে জানা গিয়াছে যে, সমুদ্রের জলে প্রথম প্রাণের স্পন্দন ঘটিয়াছিল।

বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী ওপারিন (A. I. Oparin, 1922)-এর মতে পৃথিবীতে প্রথম কার্বন ঘটিত যৌগ ছিল একমাত্র হাইড্রোকার্বন। এই হাইড্রোকার্বন অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন, জলীয় বাষ্পের সহিত বিক্রিয়া করিয়া বিভিন্ন প্রকার যৌগের সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার মধ্যে অন্যতম হইল অ্যামাইনো অ্যাসিড। অতঃপর অনেক অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত হইয়া প্রোটিনের সৃষ্টি করে। এই প্রোটিন হইতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এমন একটি পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা প্রতিলিপি গঠনে সমর্থ। এই বস্তুকে প্রোটোপ্লাজম রূপে অভিহিত করা হয়। তিনি মনে করেন পৃথিবীতে হয়ত এইভাবে নির্জীব পদার্থ হইতে প্রোটোপ্লাজম তথা প্রথম প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়াছিল।

বিজ্ঞানী মিলার (Miller, 1953) পরীক্ষাগারে মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন ও জলীয় বাষ্পের মধ্যে বৈদ্যুতিক ঝলক (Electric spark) প্রয়োগ করিয়া প্রায় 15 রকম অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষ করিয়াছিলেন। এই সকল অ্যামাইনো অ্যাসিড হইতে প্রোটিন অণু সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণের সবুজ সংকেত পাওয়া যায়। পরীক্ষালব্ধ ফল হইতে মনে করা হয় আজ হইতে প্রায় 300 কোটি বৎসর পূর্বে বায়ুমণ্ডলে উপরি-উক্ত ঘটনার মাধ্যমে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সমুদ্রজলে পতিত হইয়া প্রথম প্রাণের সঞ্চার ঘটাইয়াছিল।

বিবর্তন বা অভিব্যক্তি কাহাকে বলে ? (What is Evolution ?) : ইংরাজীতে ইভোলিউশন কথাটির অর্থ হইল পরিবর্তন। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর সমস্ত অজৈব ও জৈব পদার্থ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। বর্তমান পৃথিবীর জলবায়ু, ভৌগোলিক গঠন, জীবজগৎ ইত্যাদি যে অবস্থায় আমরা দেখিতেছি তাহা সৃষ্টির আদি অবস্থায় ঠিক এই রকম ছিল না। উহারা নানান পরিবর্তনের ফলে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এই পরিবর্তন চলিতেছে এবং সুদূর ভবিষ্যতে চলিতে থাকিবে। সুতরাং ইহা হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বর্তমান জীবজগৎ অতীতের জীবজগতের বংশধর।

কোটি কোটি বৎসর পূর্বে সমুদ্র জলে যে সকল জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাদের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে আজিকার বৈচিত্র্যময় জীবজগতের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। জীবজগতের এই মন্থর এবং পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন অভিব্যক্তির মূল বিষয়। এই পরিবর্তন যেমন জীবজগতের মধ্যে হইতে পারে তেমনই নির্জীব পদার্থের মধ্যেও হইতে পারে। যখন জীবজগতের মধ্যে পরিবর্তন হয় তাহাকে জৈব অভিব্যক্তি (Organic Evolution) বলে। অপরপক্ষে, নির্জীব পদার্থের মধ্যে পরিবর্তন হইলে তাহাকে অজৈব অভিব্যক্তি (Inorganic Evolution) বলে। যেমন, পূর্বে যে সমস্ত জাহাজ, সাইকেল, নৌকা প্রভৃতি ছিল তাহা বহু পরিবর্তনের ফলে আধুনিক ও উন্নত ধরনের জাহাজ, সাইকেল বা নৌকার সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রকার পরিবর্তন নিঃসন্দেহে অজৈব অভিব্যক্তির নিদর্শন।

জৈব অভিব্যক্তির সংজ্ঞা : **কোন সত্তার বিকাশ যখন মন্থর অথচ ক্রমাগত ও পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে হইয়া থাকে এবং ইহার ফলে সত্তা সরল হইতে জটিলতর অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন এই পরিবর্তনকে জৈব অভিব্যক্তি বলে।**

16.3 জীবের উৎপত্তির মতবাদ (Theories of Origin of Life) :

জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে। নিম্নে কয়েকটি বিশেষ মতবাদ উল্লেখ করা হইল :

1. **স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব তত্ত্ব (Theory of Spontaneous Origin) :** সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করিতেন, অজীবীয় পদার্থ হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবনের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা মনে করিতেন পচা কাদা হইতে কীট ও ব্যাঙাচির জন্ম হয় এবং পচনশীল মাংস হইতে মাছির জন্ম হয়। কিন্তু বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ফ্রানসেসকো রেডি প্রমাণ করেন যে, পচনশীল মাংস হইতে মাছির সৃষ্টি হয় যদি কোন জীবন্ত মাছি উহার উপর ডিম পাড়ে। পরবর্তী পর্যায়ে লুই পাস্তুর (1822-1895) তাঁহার জীবজনি মতবাদে (Theory of Biogenesis) দৃঢ়তার সঙ্গে প্রমাণ করেন যে, জীব হইতে নতুন জীবের সৃষ্টি হইয়াছে।

2. **বিশেষ সৃষ্টিবাদ বা বিসৃষ্টিবাদ (Theory of Special Creation) :** ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মপ্রাণ মানুষের ধারণা ছিল, ঈশ্বর ছয়দিনে পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহাও মনে করিতেন যে, বর্তমান জীবজগতের যে

রূপ দেখা যায় তাহা আদি সৃষ্টির রূপ। কোন নৈসর্গিক শক্তির দ্বারা যে জীব-জগতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মানুষেরা বিশ্বাস করিত। বুফন (Buffon) এই প্রকার সৃষ্টিবাদকে প্রথম বাতিল করেন।

3. **অন্যগ্রহ হইতে জীবের উদ্ভব তত্ত্ব (Cosmozoic Theory):** এই মতবাদে মানুষের ধারণা ছিল, অন্য কোন গ্রহের জীব পৃথিবীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে।

4. **প্রাকৃতিক বিপর্যয়বাদ (Theory of Catastrophism):** বিখ্যাত প্রত্নজীববিদ কুভিয়ার (Cuvier) জীবাশ্ম পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পৃথিবীতে একাধিকবার জীবজগতের সৃষ্টি হইয়াছে। এক-একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জীবজগৎ ধ্বংস হইয়া যায় এবং আবার নতুন করিয়া জীবজগতের সৃষ্টি হয়।

5. **ভাইরাস তত্ত্ব (Virus Theory):** ভাইরাস হইল জড় ও জীবের মধ্যবর্তী অবস্থা। ইহা যখন জীবকোষের বাহিরে অবস্থান করে তখন জড় বস্তুর ন্যায় আচরণ করে। আবার যখন জীবকোষের ভিতরে অবস্থান করে তখন ইহার মধ্যে প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেক বিবর্তনবিদগণ মনে করেন পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ভাইরাসের আবির্ভাব হয় এবং ইহা হইতে বর্তমান জীবজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

6. **জৈব অভিব্যক্তিবাদ (Theory of Organic Evolution):** জীব বিবর্তনের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে জৈব অভিব্যক্তিবাদ হইল সর্বজনস্বীকৃত মতবাদ। পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানী একবাক্যে স্বীকার করেন যে, পৃথিবীর ভৌত পরিবেশ যথা—ভৌগোলিক অবস্থা, জলবায়ু প্রভৃতি সর্বদা পরিবর্তনশীল। প্রতিটি জীব তাহার ভৌত পরিবেশের সহিত নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। পরিবর্তিত পরিবেশে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জীবদেহের গঠনগত ও শারীরগত পরিবর্তন আবশ্যক। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে সরল জীব হইতে উন্নত ও জটিল জীবের সৃষ্টিকে **জৈব অভিব্যক্তি** (Organic Evolution) বলে।

বর্তমানে এই মতবাদ সর্বজনগ্রাহ্য। জীবের বিবর্তন কি করিয়া হইয়াছে তাহার স্বপক্ষে প্রমাণ ও মতবাদ আলোচনা করা হইল।

16.4 জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণসমূহ (Evidences of Organic Evolution): জৈব অভিব্যক্তি বা বিবর্তন একটি অতি মন্থর ও গতিশীল প্রক্রিয়া যাহার ফলে নানান পরিবর্তনের মাধ্যমে সরলতম জীব হইতে বর্তমানে জটিলতম জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। বহু কোটি বৎসর ধরিয়া জীবজগতের যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহার স্বপক্ষে বিবর্তনবিদরা একাধিক প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিবর্তনের স্বপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল :

1. **তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান সম্পর্কিত প্রমাণ** (*Evidences from Comparative Morphology*)

2. **তুলনামূলক শারীরসংস্থানিক প্রমাণ** (*Evidences from Comparative Anatomy*)

3. ভ্রূণতত্ত্বঘটিত প্রমাণ (*Embryological Evidences*)
4. জীবাশ্মঘটিত প্রমাণ (*Palaeontological Evidences*)
5. রক্তের সম্বন্ধ সম্পর্কীয় প্রমাণ (*Serological Evidences*)
6. শারীরবৃত্তীয় প্রমাণ (*Physiological Evidences*)
7. শ্রেণীবিন্যাসজনিত প্রমাণ (*Taxonomical Evidences*)
8. ভৌগোলিক বিস্তারজনিত প্রমাণ (*Biogeographical Evidences*)

16.5 তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান সম্পর্কিত প্রমাণ (Evidences from Comparative Morphology) : বিভিন্ন জীবের বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের আলোচনাকে তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান (Comparative Morphology) বলে। বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, নিম্নস্তরের জীব পরিবর্তিত পরিবেশে বসবাস করিবার জন্য উহাদের অঙ্গের গঠনগত জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলস্বরূপ, উচ্চ শ্রেণীর জীবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নিম্নলিখিত আলোচনাগুলি জৈব অভিব্যক্তির এই প্রমাণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

A. সমসংস্থ অঙ্গ (Homologous Organ)

সংজ্ঞা (Definition) : **যে সকল অঙ্গের উৎপত্তিস্থল এবং গঠন কাঠামো এক কিন্তু কার্য ভিন্ন সেই সকল অঙ্গকে সমসংস্থ অঙ্গ (*Homologous organ*) বলে।**
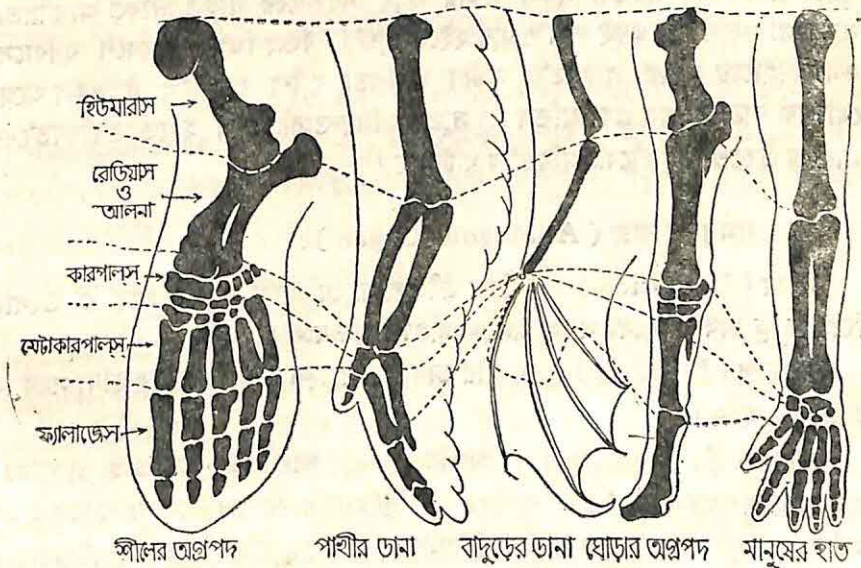
চিত্র 16.1 : বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর সমসংস্থ অঙ্গের গঠন

উদাহরণ (Example) : প্রাণীদের মধ্যে ব্যাঙের অগ্রপদ, সরীসৃপের অগ্রপদ, পাখীর ডানা, বাদুড়ের ডানা, তিমির অগ্রপদ, ঘোড়ার অগ্রপদ, মানুষের হাত প্রভৃতি

সমসংস্থ অঙ্গ। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফণিমনসার পর্ণকাণ্ড, আলুর স্ফীতকন্দ, বেলগাছের শাখাকণ্টক প্রভৃতি সমসংস্থের উদাহরণ।

ব্যাখ্যা (Explanation): ব্যাঙের অগ্রপদ, সরীসৃপের অগ্রপদ, পাখী ও বাদুড়ের ডানা, তিমির অগ্রপদ, ঘোড়ার অগ্রপদ, মানুষের হাত প্রভৃতি অঙ্গের গঠন ভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও ইহাদের মৌলিক কাঠামো একই ধরনের। কারণ উপরি-উক্ত অঙ্গগুলি হিউমারাস, রেডিয়াস ও আলনা, কারপাল্, মেটাকারপাল্ ও ফ্যালাঞ্জেস অস্থির সমন্বয়ে গঠিত। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাসের জন্য উপরি-উক্ত অঙ্গগুলির ব্যবহার ভিন্ন হয়, ফলস্বরূপ ঐ সকল অঙ্গের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। মানুষের হাত কাজ করিবার, ঘোড়ার অগ্রপদ দৌড়াইবার, তিমির অগ্রপদ সাঁতার কাটিবার, বাদুড় ও পাখীর ডানা উড়িবার, সরীসৃপের ও ব্যাঙের অগ্রপদ গমন প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে এই সকল অঙ্গের বহিরাকৃতি ও কার্যের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও ইহাদের গঠনগত কাঠামোয় এত মিল কেন ? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ইহাদের উৎপত্তি একই পূর্বপুরুষ হইতে হওয়ায় সমসংস্থ অঙ্গগুলির মধ্যে এত মিল দেখা যায়।

উদ্ভিদজগতেও এই ধরনের সমসংস্থ অঙ্গ অনেক দেখা যায়। যেমন ফণিমনসার পর্ণকাণ্ড, আলুর স্ফীতকন্দ, আদার গ্রন্থিকাণ্ড, ঝুমকো লতার শাখা-আকর্ষ, বেলগাছের শাখাকণ্টক প্রভৃতির আকৃতি ও কার্য ভিন্ন হইলেও ইহারা প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তিত কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়, অর্থাৎ ইহারা সমসংস্থ অঙ্গ। সমসংস্থ অঙ্গ হইতে প্রমাণ করা যায় যে, সকল প্রকার জীব পরস্পরের সহিত নিবিড় আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ অর্থাৎ একই পূর্বপুরুষ হইতে সৃষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাসের জন্য তাহাদের অঙ্গের পরিবর্তন ঘটিয়া জটিলতা বৃদ্ধি পাইলেও ঐ সকল অঙ্গের মৌলিক কাঠামো এক এবং অভিন্ন। সুতরাং নিম্নস্তরের জীব হইতে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে উচ্চশ্রেণীর জীবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

B. সমবৃত্তি অঙ্গ (Analogous Organ):

সংজ্ঞা (Definition): বিভিন্ন জীবদেহের যে সকল অঙ্গের গঠন ও উৎপত্তি ভিন্ন কিন্তু কার্য এক সেই সকল অঙ্গকে সমবৃত্তি অঙ্গ বলে।

উদাহরণ (Example): পাখীর ডানা, বাদুড়ের ডানা, পতঙ্গের ডানা সমবৃত্তি অঙ্গের উদাহরণ।

ব্যাখ্যা (Explanation): পাখীর ডানা পাখীদের অগ্রপদের রূপান্তর। কারণ ইহাদের ডানার অগ্রপদের অস্থিসমূহ (হিউমারাস, রেডিও আলনা, কারপাল্‌স্, মেটাকারপাল্‌স্, ফ্যালাঞ্জেস প্রভৃতি) বিদ্যমান এবং উহার সহিত বিভিন্ন পেশী ও পালক যুক্ত। কিন্তু পতঙ্গের ডানা পতঙ্গের বক্ষ অংশের পৃষ্ঠদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা বহিঃকঙ্কালের পাতার ন্যায় বর্ধিত অংশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাখীর ডানা এবং পতঙ্গের ডানা গঠনগত ও উৎপত্তিগত ভিন্ন কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে ডানা উড্ডয়নে সহায়তা করে। এইভাবে সমবৃত্তি অঙ্গ দুই বা ততোধিক ভিন্ন

জীবগোষ্ঠীর মধ্যে অভিসারী বিবর্তনের (Convergent Evolution) সংকেত নির্দেশ করে।
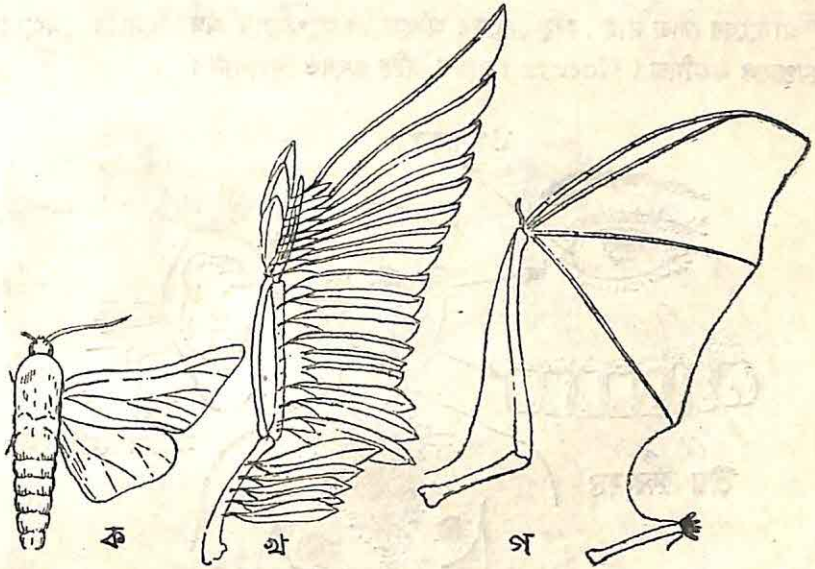
চিত্র 16.2 : বিভিন্ন প্রাণীর সমবৃত্তি অঙ্গের গঠন। ক=পতঙ্গ, খ=পাখী, গ=বাদুড়

উদ্ভিদজগতেও সমবৃত্তি অঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ঝুমকো লতার শাখা আকর্ষ, মটর গাছের পত্র আকর্ষ, কুমড়োর আকর্ষ প্রভৃতি আরোহণে সাহায্য করে; বেলগাছের শাখাকণ্টক, ফণিমনসার পত্রকণ্টক, কুলের কণ্টক আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

C. লুপ্তপ্রায় অঙ্গ (Vestigial Organs) ?

জীবদেহে এক বা একাধিক অঙ্গ দেখা যায় যাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষের দেহে সক্রিয় ছিল কিন্তু বর্তমানে কার্যকারিতা না থাকার ফলে উহারা নিষ্ক্রিয় ও ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান। তাহাদের লুপ্তপ্রায় বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে। এই সকল লুপ্তপ্রায় অঙ্গের উপস্থিতি জৈব অভিব্যক্তির স্বপক্ষে সাক্ষ্য বহন করে। কোন একটি নির্দিষ্ট প্রাণীর দেহে একটি বিশেষ অঙ্গের কোন কার্য বা ব্যবহার না থাকিলেও ঐ শ্রেণীভুক্ত অন্য আর একটি প্রাণীর দেহে ঐ বিশেষ অঙ্গের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। পরিবেশে বসবাসের প্রয়োজনে এবং শারীরবৃত্তীয় কার্য সমাধার জন্য এই অঙ্গগুলির অব্যবহারের ফলে ক্রমশঃ আকারে ছোট হয় এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলের সিকামে (Caecum) ছোট অ্যাপেনডিক্স (Appendix)। এই অঙ্গটি কোন কার্যে

ব্যবহৃত হয় না বলিয়া ইহা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ হিসাবে পরিচিত। কিন্তু তৃণভোজী প্রাণীর দেহে সিকাম সংলগ্ন অ্যাপেনডিক্সটি আকারে বড় এবং সক্রিয় অঙ্গ হিসাবে পরিপাকের সহিত সংশ্লিষ্ট।

মানুষের লেজ নাই কিন্তু লেজের অস্থিগুলি লুপ্তপ্রায় অঙ্গ হিসাবে মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে ককসিক্স (Coccyx) নামক অস্থি এখনও বিদ্যমান।
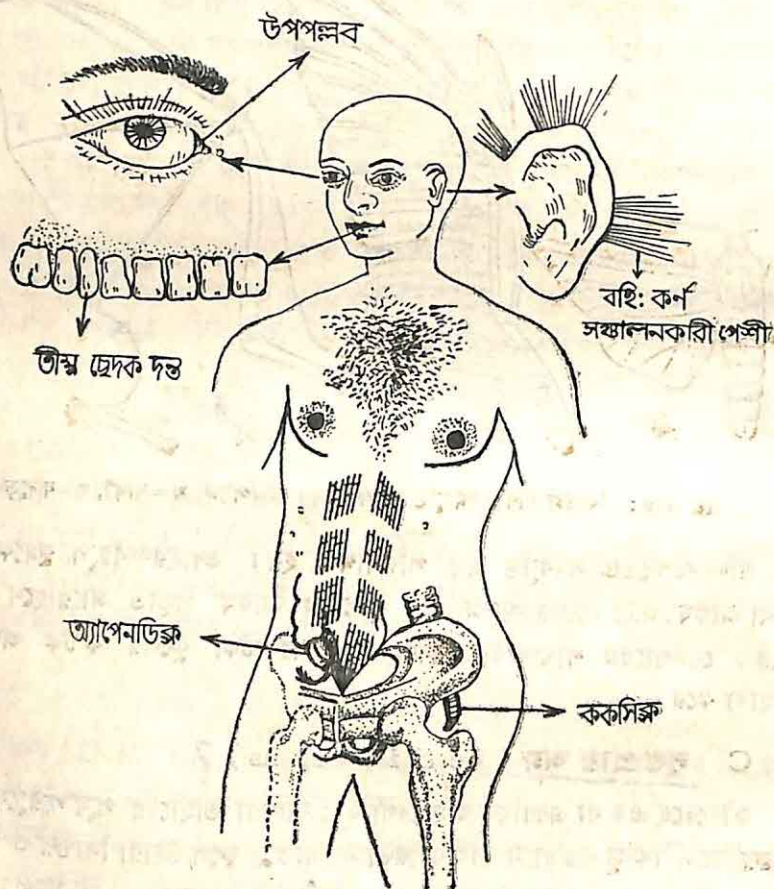
চিত্র 16.3 : মানুষের দেহে লুপ্তপ্রায় অঙ্গ

তিমির (স্তন্যপায়ী প্রাণী) পশ্চাদ্ পদের প্রয়োজন হয় না বলিয়া উক্ত অঙ্গটি অনুপস্থিত কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে পশ্চাদ্ পদ গঠনকারী অস্থিগুলি শ্রোণীচক্রদেশে (Pelvic girdle) বর্তমান। ইহা ছাড়া মানুষের দেহে অনেক লুপ্তপ্রায় অঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—নিক্‌টিটেটিং মেমব্রেন (মানুষের চোখের কোণে অবস্থিত ক্ষুদ্র লাল রঙের নিষ্ক্রিয় অঙ্গ), কর্ণপেশী, ছেদক দন্ত ইত্যাদি।

পক্ষী শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও লুপ্তপ্রায় অঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন—পাখী আকাশে উড়িতে পারে বলিয়া ইহাদের ডানা সুগঠিত কিন্তু কিউই এবং এমু পাখী উড়িতে পারে না বলিয়া ইহাদের ডানা আকারে ছোট এবং নিষ্ক্রিয় অঙ্গ হিসাবে পরিচিত। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী পাইথনের পশ্চাদ্ পদ নিষ্ক্রিয় অঙ্গ হিসাবে দেখা যায়।
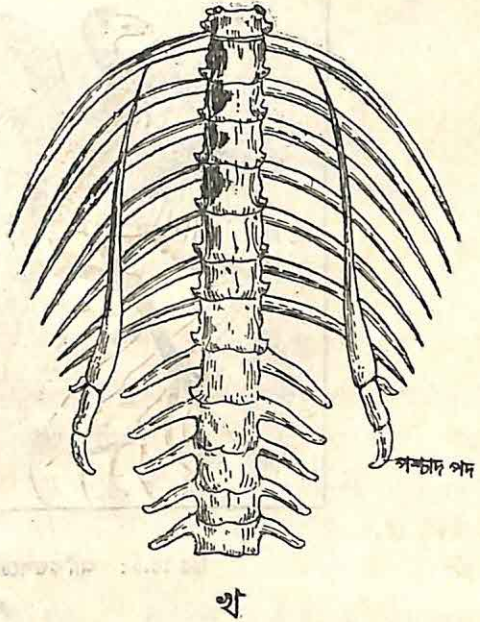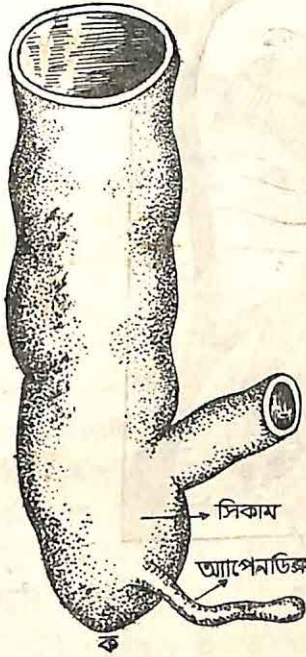
চিত্র 16.4 : লুপ্তপ্রায় অঙ্গ
ক=মানুষের সিকাম ও অ্যাপেনডিক্স
খ=পাইথন সাপের পশ্চাদ্ পদ

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কালকাসুন্দার স্ট্যামিনোড, ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের শল্কপত্র লুপ্তপ্রায় অঙ্গের উদাহরণ।

সুতরাং লুপ্তপ্রায় অঙ্গ হইতে প্রমাণ করা যায় যে, জীবগুলির পূর্বপুরুষের দেহের মধ্যে যে অঙ্গগুলি সক্রিয় ছিল তাহা পরবর্তী বংশধরদের দেহে অব্যবহারের ফলে লুপ্তপ্রায় ও নিষ্ক্রিয় অঙ্গ হিসাবে বিদ্যমান।

D. সংযোগকারী যোগসূত্র (Connecting links) :

জীবজগতের মধ্যে কিছু কিছু প্রাণী বা উদ্ভিদ নিকটবর্তী পর্ব বা শ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। সেই সকল জীবদের সংযোগরক্ষাকারী জীব বলে। এই সংযোগরক্ষাকারী জীব বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। নিম্নে কয়েকটি সংযোগ-রক্ষাকারী প্রাণী ও উদ্ভিদের উল্লেখ করা হইল।

চিত্র 16.5 : আর্কিওপটেরিক্স
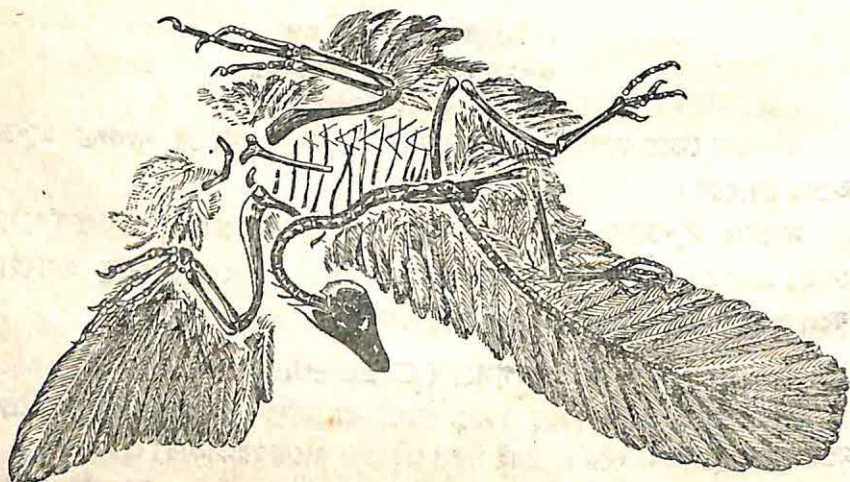
চিত্র 16.6 : আর্কিওপটেরিক্সের জীবাশ্ম

I. প্রাণীর মধ্যে :

(i) সরীসৃপ ও পাখীর মধ্যে : আর্কিওপটেরিক্স (*Archaeopteryx*) নামক প্রাণীর জীবাশ্ম দেখিয়া বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, সরীসৃপের ক্রমবিবর্তনের ফলে
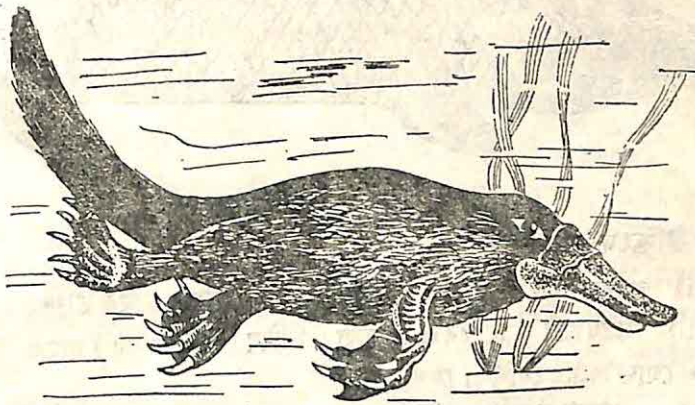
চিত্র 16.7 : হংসচঞ্চু

পাখীর উৎপত্তি হইয়াছে। আর্কিওপটেরিক্স দেখিতে কাকের ন্যায় হইলেও ইহার গঠনের মধ্যে স্পষ্টতঃ সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের সরীসৃপের ন্যায় কশেরুকাযুক্ত লম্বা লেজ, উভয় চোয়ালে এনামেলযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত বিদ্যমান। আবার পাখীর ন্যায় লেজ, পালকযুক্ত একজোড়া ডানা প্রভৃতি বিদ্যমান।

(ii) সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর মধ্যে : মনোট্রিমাটা (*Monotremata*) বা হংসচঞ্চু (Platypus) সরীসৃপের ন্যায় ডিম পাড়ে এবং রেচন-জননতন্ত্র বিদ্যমান। কিন্তু স্তন্যপায়ীর ন্যায় দেহ লোম দ্বারা আবৃত, স্তনগ্রন্থি ও মধ্যচ্ছদা বর্তমান।

(iii) অ্যানিলিডা ও আর্থ্রোপোডার মধ্যে : পেরিপেটাস (*Peripatus*) নামক প্রাণীর দেহ নরম, নলাকার, দেহত্বক কোঁচকানো প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য অ্যানিলিডা পর্বভুক্ত

চিত্র 16.8 : পেরিপেটাস

প্রাণীর ন্যায়। আবার ইহারা দেখিতে সন্ধিপদ পর্বভুক্ত শুঁয়োপোকার ন্যায় এবং ইহাদের একজোড়া শুঁড় ও একজোড়া চোয়াল বিদ্যমান।

(iv) মৎস্য ও উভচরের মধ্যে : লাংফিস (Lung fish) নামক প্রাণী মৎস্য ও উভচরের সংযোগরক্ষাকারী প্রাণী।
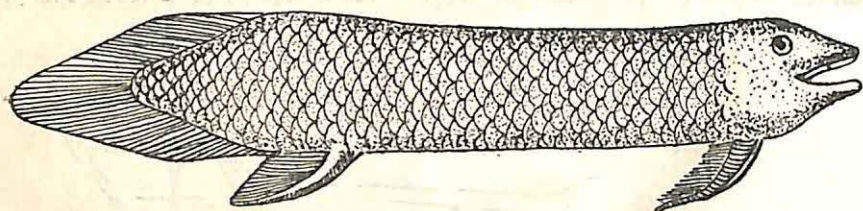
চিত্র 16.9 : লাংফিস

II. উদ্ভিদের মধ্যে :

(i) ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটার মধ্যে : রাইনিয়া নামক উদ্ভিদ।

(ii) ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজীর মধ্যে : নিটাম (Gnetum) নামক উদ্ভিদে উক্ত উদ্ভিদ গোষ্ঠীদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

16.6 তুলনামূলক শারীরসংস্থানিক প্রমাণ (Evidences from Comparative Anatomy) : বিভিন্ন প্রাণিদেহের ভিতরের অঙ্গের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের আলোচনাকে তুলনামূলক শারীরসংস্থান (Comparative Anatomy) বলে। নিম্নে মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের গঠনগত প্রমাণ আলোচনা করা হইল।

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের তুলনা করিলে দেখা যায়, প্রত্যেকের হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের মৌলিক গঠন কাঠামো একই প্রকার। কিন্তু
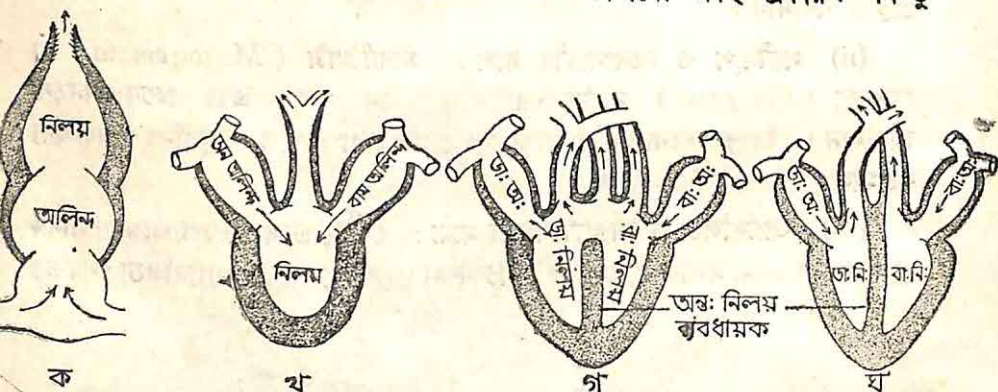
চিত্র 16.10 : মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের গঠন বৈচিত্র্য
ক = মৎস্য, খ = উভচর, গ = সরীসৃপ, ঘ = পাখী ও স্তন্যপায়ী

ক্রমবিবর্তনের ফলে নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণী হইতে যতই উচ্চস্তরের প্রাণীর দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই তাহাদের হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের উন্নয়ন ঘটে এবং জটিলতা বৃদ্ধি পায়। মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড

অলিন্দ এবং নিলয় নামক দুই প্রকার প্রকোষ্ঠ লইয়া গঠিত। দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে অক্সিজেনবিহীন রক্ত শিরার মাধ্যমে অলিন্দে জমা হয় এবং নিলয় হইতে ধমনীর মাধ্যমে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে। মৎস্যের হৃৎপিণ্ডে একটি অলিন্দ ও একটি নিলয় বর্তমান। উভচর প্রাণীর হৃৎপিণ্ডে দুইটি অলিন্দ ও একটি নিলয়; সরীসৃপের দুইটি অলিন্দ ও একটি অসম্পূর্ণ দ্বিধাবিভক্ত নিলয় থাকে। কিন্তু পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডে দুইটি অলিন্দ ও দুইটি নিলয় বিদ্যমান। বিবর্তনের সোপানে মৎস্য→উভচর→সরীসৃপ ↗পাখী ↘স্তন্যপায়ী ধাপে ধাপে সজ্জিত হওয়ায় উহাদের বিপাকীয় কার্যের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেইজন্য উহাদের বেশি পরিমাণ অক্সিজেনযুক্ত রক্তের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন মিটাইবার তাগিদে অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যে বিভেদপ্রাচীর সৃষ্টি হয় এবং চার প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ডের ক্রমান্বয়ে আবির্ভাব ঘটে। ইহার ফলে অক্সিজেনযুক্ত ও

দুই প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ড (মৎস্য) → তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ড (উভচর) → অসম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ড (সরীসৃপ) → চার প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ড (পাখী ও স্তন্যপায়ী)

অক্সিজেনবিহীন রক্তের মিশ্রণ কখনও ঘটে না। এইরূপে দুই প্রকোষ্ঠযুক্ত সরল হৃৎপিণ্ড হইতে চার প্রকোষ্ঠযুক্ত জটিল হৃৎপিণ্ডের উদ্ভব জীবজগতের বিবর্তন সূচিত করে।
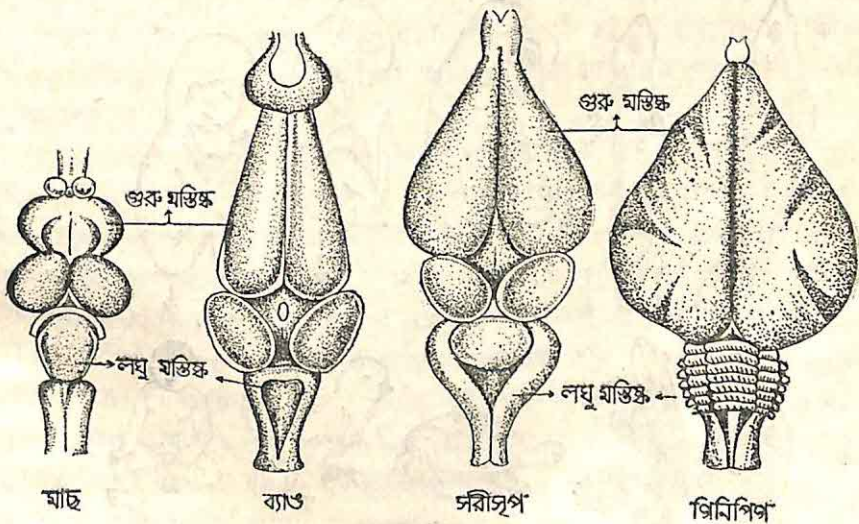
চিত্র 16 11 : মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের তুলনামূলক সাদৃশ্য

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের গঠন তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উহাদের মূল কাঠামো একই প্রকার। কিন্তু নিম্নস্তরের প্রাণী হইতে
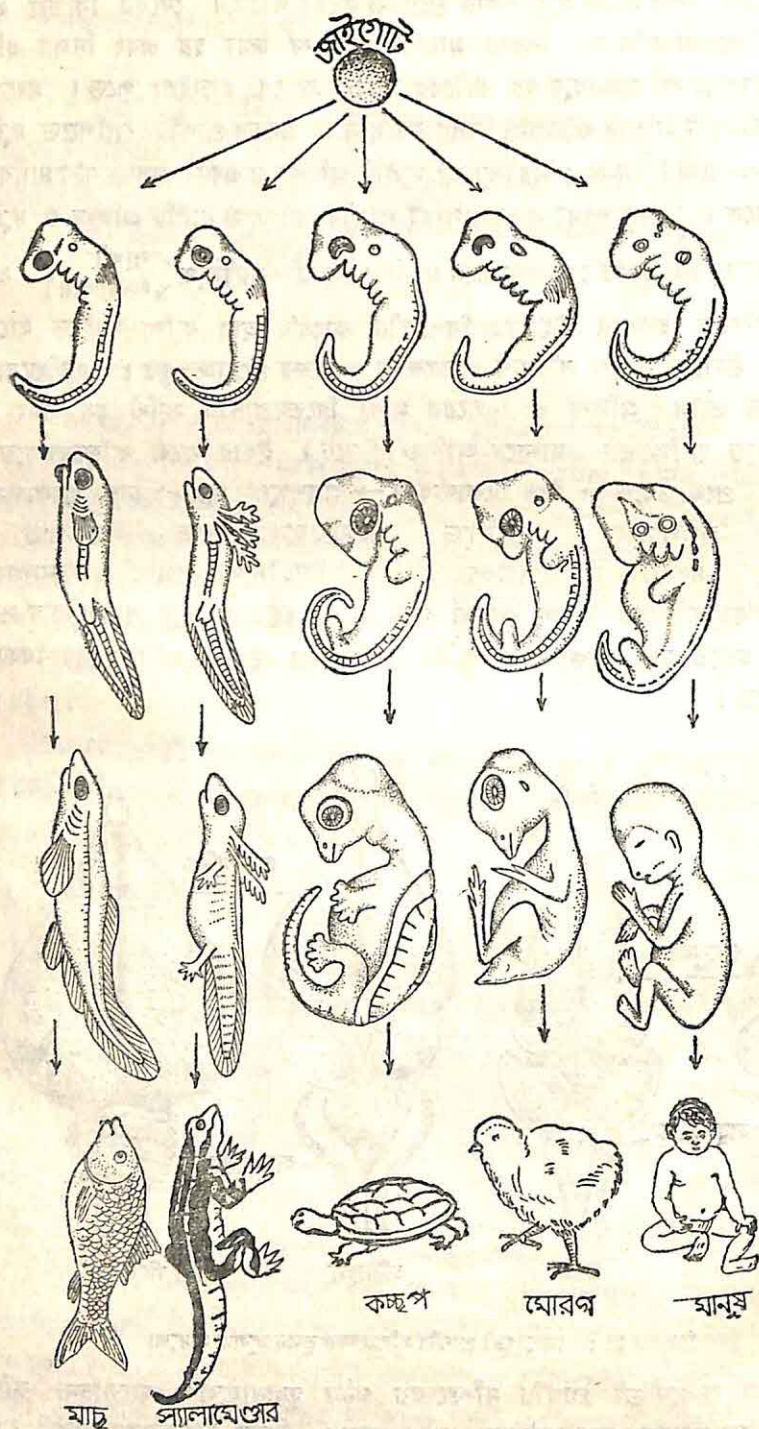
চিত্র 16.12 : বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণের পরিস্ফুরণের ক্রমপর্যায়

যতই উচ্চস্তরের দিকে যাওয়া যায় ততই উহাদের বিচারবুদ্ধি ধাপে ধাপে উন্নত হয়। এইজন্য গুরুমস্তিষ্ক ও লঘু মস্তিষ্কের জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

16.7 ভ্রূণতত্ত্বঘটিত প্রমাণ (**Embryological Evidences**): জীবের নিষিক্ত ডিম্বাণু হইতে শুরু করিয়া ভ্রূণ অবস্থার মধ্য দিয়া পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক আলোচনাকে ভ্রূণতত্ত্ব বা ভ্রূণবিদ্যা (Embryology) বলে। বিভিন্ন ভ্রূণের মধ্যে সাদৃশ্য ও পরস্পরের সম্বন্ধ দেখিয়া বিবর্তনবিদগণ মনে করেন পৃথিবীতে নিম্নশ্রেণীর জীব হইতে উন্নততর জীবের সৃষ্টি হইয়াছে।

মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ীর ভ্রূণগুলির বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি প্রাণীর ভ্রূণ জাইগোট (Zygote) নামক একপ্রকার কোষ হইতে শুরু হয়। জাইগোটটি পরে পুনঃ পুনঃ বিভাজিত হইয়া ব্লাস্টুলা দশা, ব্লাস্টুলা হইতে গ্যাস্ট্রুলা দশা এবং অবশেষে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সৃষ্টি করে। সুতরাং জাইগোট বিভিন্ন দশা ধাপে ধাপে অতিক্রম করিয়া পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় উন্নীত হয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের (মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী) ভ্রূণের প্রাথমিক দশায় এত বেশী সাদৃশ্য থাকে যে বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণগুলিকে পৃথকভাবে সনাক্তকরণ করা যায় না। পরবর্তীকালে, উক্ত প্রাণীদের ভ্রূণগুলি পরিস্ফুরণের মাধ্যমে তাহাদের নির্দিষ্ট পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। যেমন—মৎস্যের ভ্রূণ মৎস্যে, ব্যাঙের ভ্রূণ ব্যাঙে, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ীর ভ্রূণ যথাক্রমে সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীতে পরিণত হয়। সুতরাং ভ্রূণগত সাদৃশ্য হইতে মনে করা যাইতে পারে যে সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর উৎপত্তিস্থল কোন একটি পূর্বসূরী হইতে ঘটিয়াছে। কেবল বিভিন্ন পরিবেশে বা অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বিভিন্ন ভ্রূণের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় সাদৃশ্য পর্যবেক্ষণ করিয়া ভন বেয়ার (von Baer, 1792-1876) বলিয়াছেন যে প্রাথমিক অবস্থায় সমস্ত ভ্রূণের একই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইলেও পর্যায়ক্রমে ভ্রূণের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতির নিজস্ব লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইতে থাকে। পরবর্তীকালে জার্মান বিজ্ঞানী হেকেল (Ernst Haeckel, 1843-1919) এই সমস্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া পুনরাবৃত্তি তত্ত্ব (Theory of recapitulation) বা বায়োজেনেটিক সূত্র (Biogenetic law) প্রকাশ করেন। হেকেলের মতে, প্রতিটি জীব বৃদ্ধির সময় ভ্রূণ অবস্থার মধ্য দিয়া তাহার সকল পূর্বপুরুষের জীবন বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশাকে পুনরাবৃত্তি করিয়া পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ উভচর, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ভ্রূণগুলিতে প্রাথমিক অবস্থায় মাছের ফুলকা ছিদ্রের (Gill slits) আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়, যদিও পরবর্তী পর্যায়ে ঐ বৈশিষ্ট্যের অবলুপ্তি ঘটে। সুতরাং কোন উন্নত প্রাণীর ভ্রূণের পরিস্ফুরণের সময় (Ontogeny) তাহার পূর্বপুরুষের (Phylogeny) বৈশিষ্ট্যগুলিকে পুনরাবৃত্তি বা স্মরণ করে

(Ontogeny repeats phylogeny)। অন্য কথায়, 'ব্যক্তিজনি (Ontogeny) জাতিজনিকে (Phylogeny) স্মরণ করে।'

সুতরাং ভ্রূণতত্ত্বঘটিত প্রমাণ হইতে আমরা বলিতে পারি মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে মৎস্য হইতে উভচর, উভচর হইতে সরীসৃপ, সরীসৃপ হইতে পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যভাবে বলা যাইতে পারে, স্তন্যপায়ী প্রাণীর পূর্বপুরুষ মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ প্রভৃতি প্রাণী।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও ভ্রূণ সম্পর্কিত প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন—অঙ্কুর অবস্থায় বাবলা গাছের দ্বিপক্ষল (Bipinnate) যৌগিক পত্র থাকে কিন্তু পরিণত অবস্থায় ইহা ঝরিয়া যায় এবং পত্র অক্ষটি পর্ণবৃন্তে (Phyllode) পরিণত হয়। মস, ফার্ন প্রভৃতি লিঙ্গধর উদ্ভিদের গঠন প্রাথমিক অবস্থায় সূত্রাকার শৈবালের মত একই আকৃতি-বিশিষ্ট হয়। সেইজন্য অনুমান করা হয় সূত্রাকার শৈবাল থেকে মস ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে।

16.8. জীবাশ্মঘটিত প্রমাণ (Palaeontological Evidences) : প্রাগৈতিহাসিক যুগে জীবদের দেহ বা দেহের অংশবিশেষ ভূগর্ভের শিলাস্তরে চাপা পড়িয়া এবং বহুকাল ধরিয়া নানারূপ ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে যে অবস্থায় প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত হয় তাহাকে জীবাশ্ম (Fossil) বলে। যে পদ্ধতিতে জীবাশ্ম সৃষ্টি হয় তাহাকে জীবাশ্মকরণ (Fossilisation) বলে।

জীবাশ্মের প্রকারভেদ (Types of fossils) :

(i) সম্পূর্ণ দেহের জীবাশ্ম (Fossil of complete body) : যখন জীবের দেহ সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত অবস্থায় শিলাস্তর, বরফ ও অ্যামবারে পাওয়া যায় তখন তাহাদের সম্পূর্ণ জীবাশ্ম বলে। যেমন, সাইবেরিয়ার বরফের নিচে প্রাপ্ত ম্যামথ (Mammoth) হস্তীর সম্পূর্ণ দেহের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ জীবাশ্ম খুব কম পাওয়া যায়।

(ii) মোল্ড ও কাস্ট (Moulds and Casts) : জীবদেহ কোন কারণে আগ্নেয়গিরির ভস্মরাশিতে আবৃত হইয়া শিলাস্তরে চাপা পড়িলে উহার উপর একটি শক্ত আবরণীর সৃষ্টি হয়। উক্ত আবরণীর মধ্যে জীবদেহ ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইয়া একটি গহ্বর উৎপন্ন করে যাহার মধ্যে জীবের হুবহু বহিরাকৃতি বজায় থাকে। উহাকে মোল্ড (Moulds) বলে। এই গহ্বর খনিজ পদার্থ দ্বারা পূর্ণ হইয়া জীবাশ্মের সৃষ্টি করিলে উহাকে কাস্ট (Casts) বলে। ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির ভস্মরাশিতে পম্পেয়ী (Pompeii) শহরের বহু মানুষ ও গৃহপালিত পশুর মোল্ড ও কাস্ট পাওয়া গিয়াছিল।

(iii) ছাপ (Impression) : নরম মাটিতে দেহের ও পায়ের ছাপ অনেক সময় শিলায় রূপান্তরিত হইয়া একটি আকৃতি প্রদান করে এবং জীবাশ্মে পরিণত হয়। এইভাবে গাছের পাতা, পাখীর পালক ইত্যাদির ছাপ পাওয়া যায়।

(iv) অস্থির জীবাশ্ম : মেরুদণ্ডী প্রাণীর অস্থির ছাপ শিলায় রূপান্তরিত হইয়া জীবাশ্মে পরিণত হয়।

(v) উদ্ভিদের জীবাশ্ম : প্রচণ্ড চাপে (Compression) উদ্ভিদের দেহ কয়লায় পরিণত হইলে উহাকে উদ্ভিদের জীবাশ্ম বলে।

কিভাবে জীবাশ্ম গঠিত হয় ? : জীবদেহ ভূগর্ভের শিলাস্তরে চাপা পড়িলে উহার নরম অংশগুলি ধীরে ধীরে পচন ঘটে। অতঃপর পারিপার্শ্বিক শিলাস্তর হইতে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ জমা হইয়া প্রস্তরীভূত হয় এবং জীবাশ্ম গঠন করে।

বিবর্তনে জীবাশ্মের গুরুত্ব :

(i) ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরের জীবাশ্ম হইতে জানা যায়, কোন্ জীবগোষ্ঠী কখন উৎপত্তি হইয়াছে এবং কখন উক্ত জীবগোষ্ঠী পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

(ii) জীবাশ্ম হইতে ঐ সমস্ত জীবের আকৃতি, গঠন, স্বভাব প্রভৃতি কিছু মাত্রায় ধারণা করা সম্ভব।

(iii) জীবদের ভৌগোলিক বিস্তার সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

(iv) জীবাশ্ম দেখিয়া মেরুদণ্ডী প্রাণীদের উৎপত্তি ও তাহাদের ক্রমবিবর্তন ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ : যে শিলাস্তরে জীবাশ্ম পাওয়া যায় তাহার বয়স নির্ধারণ করিতে পারিলে ঐ স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মের বয়স সহজে জানা যায়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ করা যায়। যেমন—

(i) তেজস্ক্রিয় ঘড়ি পদ্ধতি (Radioactive clock method) : এই পদ্ধতিতে শিলাস্তরে প্রাপ্ত ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিশ্লিষ্টের হার পরিমাপ করিয়া জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ করা হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্দিষ্ট হারে ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট হইয়া স্থায়ী পদার্থ সীসায় ও হিলিয়ামে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইউরেনিয়াম (^{238}U) পরমাণুর মোট সংখ্যার অর্ধেক বিশ্লিষ্ট হইয়া সীসায় (^{206}Pb) পরিণত হইতে 4·5 লক্ষ বৎসর লাগে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট শিলাস্তরে প্রাপ্ত ইউরেনিয়াম ও সীসার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করিয়া জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ করা যায়।

(ii) কার্বন পদ্ধতি (Carbon method) : এই পদ্ধতিতে জীবাশ্মে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় কার্বনের পরিমাপ করিয়া উহার বয়স নির্ণয় করা হয়। প্রতিটি জীবিত বস্তুর দেহে অল্প পরিমাণ তেজস্ক্রিয় কার্বন (^{14}C) থাকে। জীবের মৃত্যু ঘটিলে ঐ তেজস্ক্রিয় কার্বন নির্দিষ্ট হারে ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট হইয়া সাধারণ কার্বনে (^{12}C) পরিণত হয়। যে কোন কার্বনের অর্ধাংশ বিশ্লিষ্ট হইতে প্রায় 5,568 বৎসর লাগে। সুতরাং জীবাশ্মে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় কার্বন ও সাধারণ কার্বনের পরিমাপ করিয়া সহজেই উহার বয়স নির্ধারণ করা যায়।

জীবাশ্ম কিভাবে জীবজগতের ক্রমবিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে সহজে উপলব্ধি করা যায়।

ঘোড়ার বিবর্তন (Evolution of horse) : বর্তমানকাল পর্যন্ত যে সমস্ত জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ঘোড়ার জীবাশ্ম হইতে বিবর্তনের
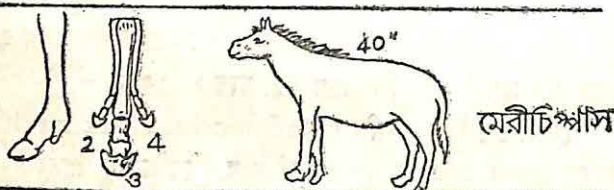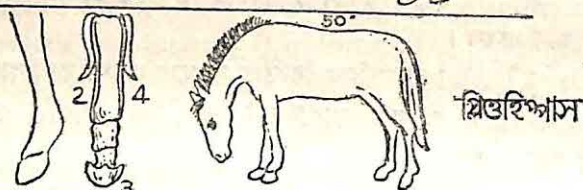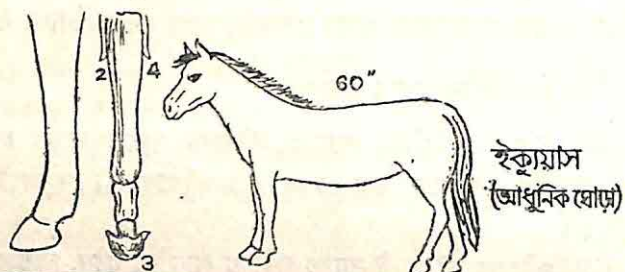
চিত্র 16.13 : ঘোড়ার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়

ক্রমপর্যায় সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করা যায়। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে উত্তর-পশ্চিম আমেরিকায় ইওহিপ্পাস নামক প্রাণী ঘোড়ার আদি পুরুষ ছিল। উহার উচ্চতা প্রায় 11 ইঞ্চি, সামনের পায়ে চারিটি এবং পিছনের পায়ে তিনটি আঙ্গুল ছিল। ইহা ব্যতীত শরীরের অনুপাতে মাথা ও গলা ছিল ছোট। ক্রমবিবর্তনের ফলে ইওহিপ্পাস হইতে

প্রতি পায়ে তিন অঙ্গুলিবিশিষ্ট মেসোহিপ্পাস ও পরে মেরীচিপ্পাসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মেরীচিপ্পাসের তিনটি আঙ্গুলের মধ্যে কেবল মধ্যবর্তী আঙ্গুলটি ছিল কর্মক্ষম। পরবর্তী পর্যায়ে মেরীচিপ্পাস হইতে অঙ্গুলিবিহীন, লম্বা ও শক্ত পদবিশিষ্ট প্লিওহিপ্পাস এবং পরে ইহা হইতে আধুনিক ঘোড়া বা ইক্যুয়াসের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে এইরূপ অঙ্গুলিবিহীন পদবিশিষ্ট ঘোড়ার উদ্ভব হইবার কারণ কি? বিবর্তনবিদগণ মনে করেন পরিবর্তিত পরিবেশে আত্মরক্ষার তাগিদে দ্রুত দৌড়ানোর জন্য পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলিগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতে শুরু করে এবং শেষ পর্যায়ে অঙ্গুলিবিহীন আধুনিক ঘোড়ার সৃষ্টি হইয়াছে।

পদের পরিবর্তন ব্যতীত নরম ঘাস ও পাতা খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করিয়া কেবল ঘাস খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বহুখাঁজযুক্ত (Cusp) পেষক দন্তের সৃষ্টি হইয়াছে।

জীবন্ত জীবাশ্ম (Living fossil): কোন কোন জীবগোষ্ঠীর দুই-একটি প্রজাতির জীব সুদূর অতীতে সৃষ্টি হইয়া আজ অবধি বাঁচিয়া আছে এবং যাহাদের গঠনগত ও শারীরগত পরিবর্তন হয় নাই কিন্তু তাহাদের সমসাময়িক ও সমগোত্রীয় জীবেরা বহু পূর্বে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের **জীবন্ত জীবাশ্ম** বলে। উদাহরণ—পেরিপেটাস, স্ফেনোডন, লিমুলাস, সিলাকান্থ প্রভৃতি প্রাণী এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে গিংকো, ইকুইজিটাম, নিটাম, সাইকাস প্রভৃতি।
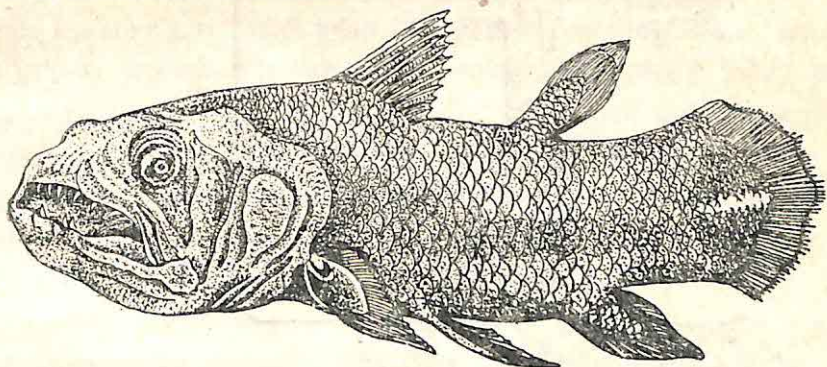
চিত্র 16.14 : সিলাকান্থ।

16.9 রক্তের সম্বন্ধ সম্পর্কীয় প্রমাণ (Serological evidences): জীবন-বিজ্ঞানের যে শাখায় রক্তের সম্বন্ধ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয় তাহাকে সেরোলোজি (Serology) বলে। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণী বিশেষ করিয়া স্তন্যপায়ী প্রাণীর রক্তের রাসায়নিক সংগঠন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে রক্তের সাদৃশ্য বর্তমান।

দেহের কোন জায়গা যদি কাটিয়া যায় তাহা হইলে কাটা স্থান হইতে রক্ত বাহির হইবে এবং ইহার পর রক্ত জমাট বাঁধিয়া যাইবে। ইহার কিছুক্ষণ পর উক্ত জায়গা হইতে

হরিদ্রাভ তরল পদার্থ বাহির হইয়া আসে তাহাকে সিরাম (Serum) বলে। একটি খরগোসের দেহে যদি মানুষের সিরাম ইন্‌জেকসান করা হয় তাহা হইলে খরগোসের রক্তে প্রতিরক্ষাবাহিনী গড়িয়া উঠে যাহা অ্যাণ্টিবডি (Antibody) নামে পরিচিত। এখানে মানুষের সিরাম খরগোসের দেহে অ্যাণ্টিজেন (Antigen) রূপে কাজ করে।
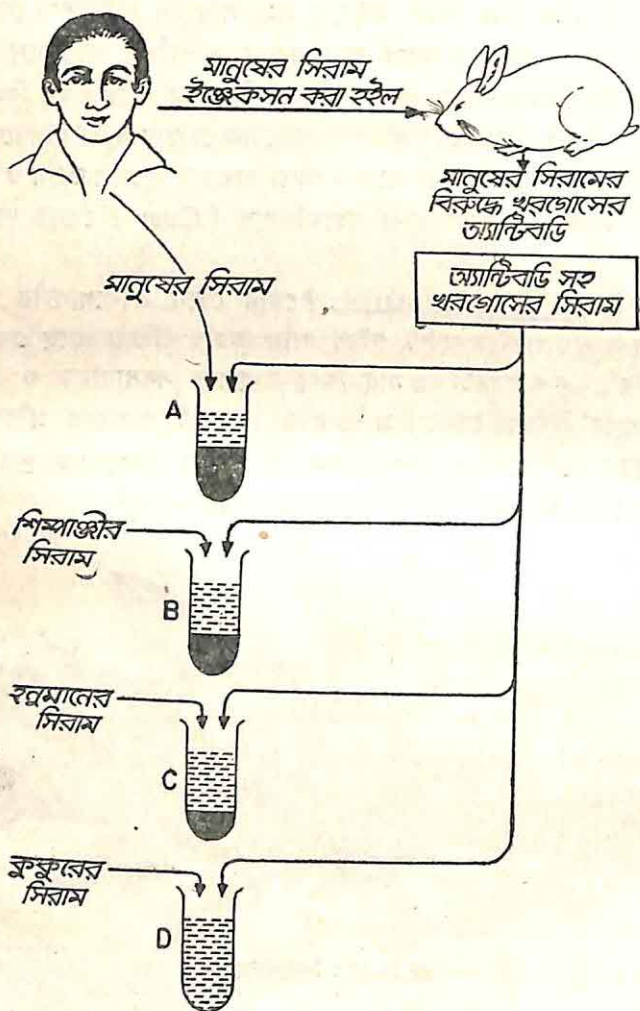
চিত্র 16.15 : অধঃক্ষেপণ পরীক্ষা দ্বারা স্তন্যপায়ী প্রাণীর সম্পর্ক দেখানো হইয়াছে।

সুতরাং খরগোসের রক্তে মানুষের সিরামের বিরুদ্ধাচারী অ্যাণ্টিবডি বর্তমান। ঐ অ্যাণ্টিবডিকে মানুষের সিরামের অ্যাণ্টিসিরাম (Antiserum) বলে।

এখন A, B, C, D নামক চারিটি টেস্ট টিউব লওয়া হইল। প্রত্যেকটি টেস্ট টিউবে অল্প পরিমাণ খরগোসের রক্ত তথা মানুষের সিরামের অ্যাণ্টিসিরাম রাখা

হইল। ইহার পর A টিউবে মানুষের সিরাম যোগ করা হইলে দেখা যাইবে যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে টিউবের নিচে অধঃক্ষেপণ (Precipitation) পড়িবে। এইরূপ B টিউবে শিম্পাঞ্জীর সিরাম, C টিউবে হনুমান এবং D টিউবে কুকুরের সিরাম যোগ করা হইল। এখন দেখা যাইবে যে, A টিউবের ন্যায় B টিউবে প্রায় সমপরিমাণ অধঃক্ষেপণ পড়িবে। C টিউবে অধঃক্ষেপণের পরিমাণ A এবং B টিউবের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ কিন্তু D টিউবে কোন অধঃক্ষেপণ পড়িবে না।

উপরের পরীক্ষা হইতে প্রমাণিত হয় যে, A এবং B টিউবে অধঃক্ষেপণের পরিমাণ সমান হওয়ায় মানুষ এবং সিম্পাঞ্জীর মধ্যে সিরামের রাসায়নিক গঠনের সাদৃশ্য রহিয়াছে। A এবং B অপেক্ষা C টিউবে অধঃক্ষেপণের পরিমাণ কম হওয়ায় ইহা প্রমাণ করে যে মানুষ এবং সিম্পাঞ্জীর সিরামের সহিত হনুমানের সিরামের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। এই বৈসাদৃশ্যের জন্য অধঃক্ষেপণের পরিমাণ কিছুটা কম। D টিউবে কোন অধঃক্ষেপণ না থাকায় প্রমাণিত হয় যে উপরি-উক্ত তিনটি প্রাণীর সিরামের সহিত কুকুরের সিরামের মধ্যে কোন মিল নাই।

সুতরাং উপরি-উক্ত চারিটি প্রাণীর সিরামের তুলনামূলক আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, উহারা একই পূর্বপুরুষ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাদের সিরামের উপাদানের মধ্যে যত সাদৃশ্য বেশী ততই তাহারা নিকট সম্পর্কযুক্ত এবং যতই সাদৃশ্য কম ততই তাহারা দূর সম্পর্কীয়।

16.10 শারীরবৃত্তীয় প্রমাণ (Physiological evidences): বিভিন্ন প্রাণীর শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের সমন্বয়ে কার্বোহাইড্রেট, লিপিড এবং প্রোটিন গঠিত হয়। আবার কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, প্রোটিন, জল এবং অন্যান্য কয়েকটি মৌলিক পদার্থ যুক্ত হইয়া প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) সৃষ্টি করে। প্রত্যেক জীবের প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক গঠন প্রায় একই রকমের এবং ইহার মৌলিক কার্যাবলীও একই প্রকার। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, একই পূর্বপুরুষ হইতে সৃষ্ট হওয়ার জন্য প্রোটোপ্লাজমের এত বেশী সাদৃশ্য দেখা যায়।

অ্যামিবা হইতে শুরু করিয়া মানুষ পর্যন্ত সকল প্রাণীর পাচন কার্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার উৎসেচকের (Enzyme) প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে ট্রিপসিন (Trypsin) নামক প্রোটিন বিশ্লিষ্টকারী উৎসেচক সমস্ত প্রাণিদেহে পাওয়া যায়। এই প্রকার উৎসেচকের উপস্থিতি এবং কার্য হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, উহারা একই পূর্বপুরুষ হইতে বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত হইয়াছে।

একইভাবে বিভিন্ন প্রকার হর্মোনের (Hormones) কার্যাবলীর মাধ্যমে ক্রমবিবর্তন ব্যাখ্যা করা যায়। সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণিদেহে যে বিভিন্ন প্রকার হর্মোন পাওয়া যায় তাহাদের রাসায়নিক গঠন এবং কার্যাবলী প্রায় একই প্রকার। মানুষের দেহে ইনসুলিন (Insulin) হর্মোনের অভাব দেখা দিলে অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর ইনসুলিন প্রয়োগে মধুমেহ রোগের সুফল পাওয়া যায়। থাইরয়েড নামক অন্তঃস্রাবী

গ্রন্হি (Endocrine gland) হইতে থাইরক্সিন হর্মোন উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর থাইরক্সিন হর্মোনের রাসায়নিক সাদৃশ্য এত বেশী যে এক প্রাণীর হর্মোন অন্য প্রাণীতে প্রয়োগ করা যায়। ব্যাঙাচির থাইরয়েড গ্রন্হি কাটিয়া বাদ দিলে উহার রূপান্তর (Metamorphosis) বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু অন্য প্রাণী হইতে থাইরক্সিন হর্মোন প্রয়োগে পুনরায় রূপান্তর ক্রিয়া ঘটানো যায়। ইহা ব্যতীত উদ্ভিদের দেহনিঃসৃত অক্সিন (Auxin) এবং প্রাণিদেহে থাইরক্সিন হর্মোন একই প্রকার কার্য করে।

সুতরাং শারীরবৃত্তীয় আলোচনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, উন্নত প্রাণী এবং উদ্ভিদ একই পূর্বপুরুষ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে।

16.11 শ্রেণীবিন্যাসজনিত প্রমাণ (Taxonomical evidences): বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে উদ্ভিদরাজ্য এবং প্রাণিরাজ্য লইয়া জীবজগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস (1707-1778) উদ্ভিদ ও প্রাণিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জীবদের চরিত্রগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রেণীবিন্যাস করিয়াছেন। এই শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিতে প্রতিটি রাজ্যের জীবদের পর্ব (Phylum), শ্রেণী (Class), বর্গ (Order), গোত্র (Family), গণ (Genus), প্রজাতি (Species) প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। নিকট সম্পর্কিত চরিত্রবিশিষ্ট জীবদের প্রজাতিতে অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করে। অনেকগুলি প্রজাতি মিলিয়া একটি গণ, একাধিক গণ লইয়া গোত্র, অনেকগুলি গোত্র মিলিয়া বর্গ, এইভাবে বর্গ হইতে শ্রেণী এবং পর্ব গঠিত হয়। আবার সমস্ত পর্ব লইয়া প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রাণিরাজ্য এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উদ্ভিদরাজ্য গঠিত হইয়াছে। সুতরাং প্রজাতি হইতে যতই পর্বের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই উহাদের মধ্যে সাদৃশ্যযুক্ত বৈশিষ্ট্য হ্রাস পাইতে থাকে। পক্ষান্তরে, পর্ব হইতে প্রজাতির দিকে যতই যাওয়া যায় ততই তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য দেখা যায়।

যে সকল জীবের মধ্যে যতই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য দেখা যায় বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা ততই নিকট সম্পর্কযুক্ত এবং একই পূর্বপুরুষ হইতে সৃষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের সঙ্গে বনমানুষের যত মিল আছে, বানরের সঙ্গে তত মিল নাই।

16.12 ভৌগোলিক বিস্তারজনিত প্রমাণ (Evidences from geographical distribution): পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের প্রাণী ও উদ্ভিদের বিস্তার লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর সর্বত্র প্রাণী ও উদ্ভিদের বিস্তার সমভাবে সংঘটিত হয় নাই। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের ভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হইবার ফলে জীবের আকৃতিগত ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে আবির্ভাব হয়। ইহার ফলে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় এবং এইজন্য বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় এক রকমের জীব দেখিতে পাওয়া যায় না। বিবর্তনের স্বপক্ষে বিজ্ঞানীদের অভিমত যে, জীব একটি সৃষ্টি কেন্দ্র হইতে উৎপত্তি হইয়া বিভিন্ন কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তারলাভ করিয়াছে এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে অভিযোজিত হইবার ফলে তাহাদের মধ্যে পরিবর্তন আসিয়াছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে জীবের উৎপত্তি এবং বিস্তারের ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, বহু কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবী ছিল একটি অখণ্ড ভূ-পৃষ্ঠ। পরে ইহা উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ভাগ হইয়া যায় এবং এই দুইটি গোলার্ধ ক্রমশ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছয়টি মহাদেশের সৃষ্টি হয়। মূল ভূ-খণ্ড হইতে বিভিন্ন মহাদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে উহাদের মধ্যে ভৌগোলিক গঠন ও জলবায়ুর তারতম্য দেখা যায়। এই পরিবর্তিত জলবায়ু এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা জীবের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ফলে পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়। ইহা ব্যতীত মহাদেশগুলি পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যাইবার ফলে জীবের বিস্তারে বাধা (Barrier) (বিস্তীর্ণ জলরাশি, বিস্তীর্ণ স্থলভূমি, জলবায়ু এবং জৈবিক বাধা ইত্যাদি) দেখা যায়। তবু কিছু কিছু প্রাণী এই বাধা অতিক্রম করিয়া নতুন পরিবেশে অভিযোজিত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। ফলস্বরূপ ঐ সকল জীবের আকৃতিগত, গঠনগত, শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের ফলে নতুন অঙ্গের আবির্ভাব তথা নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ভৌগোলিক বিস্তার হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত মহাদেশের বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ হইতে সৃষ্টি হইয়া বিভিন্ন মহাদেশের ভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হইবার ফলে জীবের ক্রমবিবর্তন হইয়াছে।

16.13 জৈব অভিব্যক্তির মতবাদ (Theories of Organic Evolution): পৃথিবীতে সরল জীব হইতে জটিলতম জীবের সৃষ্টি কিভাবে হইয়াছে তাহা জৈব অভিব্যক্তির বিভিন্ন প্রমাণ হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কিভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে জীবজগতে নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় সেই সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ল্যামার্ক, ডারউইন, ডি ভ্রিসের মতবাদ উল্লেখযোগ্য।

16.14 ল্যামার্কের মতবাদ (Theory of Lamarck or Lamarckism): জাঁ ব্যাপটিস্ট দ্য মনেট ল্যামার্ক (Jean Baptiste de Monet Lamarck, 1744-1829) নামক ফরাসী বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম জৈব অভিব্যক্তির মতবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি 1809 খ্রীষ্টাব্দে বিবর্তন সম্পর্কিত 'ফিলোজফিক জুওলজিক' (Philosophic Zoologique) নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ইহা ল্যামার্কবাদ হিসাবে অভিহিত করা হয়। জৈব অভিব্যক্তির মাধ্যমে নতুন প্রজাতির সৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া ল্যামার্ক কয়েকটি সূত্র প্রবর্তন করেন। ইহাদের মধ্যে "অর্জিত গুণাবলী বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়"—সূত্রটি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে ল্যামার্কের সূত্রগুলি আলোচনা করা হইল :

চিত্র 16.16 : ল্যামার্ক

1. **পরিবেশের প্রভাব** (Influence of the Environment) : ল্যামার্ক মনে করিতেন, বিভিন্ন জীব যে পরিবেশে বসবাস করে তাহাদের চরিত্রগত এবং আকৃতিগত লক্ষণ পরিবেশের উপর নির্ভর করে।

মন্তব্য (Remark) : ল্যামার্কের এই তথ্যটি নিঃসন্দেহে সত্য। কারণ দেখা গিয়াছে, কোন একটি প্রজাতির জীব বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস করিবার ফলে দেহের বা অঙ্গের পরিবর্তন হয়। ভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হইবার জন্য জীবের এইরূপ চরিত্রগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

2. **সজ্ঞান প্রচেষ্টা** (Conscious efforts) : ল্যামার্ক মনে করিতেন জীবের কোন অঙ্গের প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইলে তাহা জীবের নিজের প্রচেষ্টায় সম্ভব হইয়া থাকে। এই সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ল্যামার্ক মনে করিতেন, জিরাফের পূর্বপুরুষের গলা ছোট ছিল। কিন্তু যখন গাছের নিচের দিকে পাতা কমিয়া যাইতে থাকে তখন উপরের পাতা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য গলার বৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলস্বরূপ, লম্বা গলাযুক্ত জিরাফের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এইরূপ পরিবর্তন জীবের সজ্ঞান প্রচেষ্টা দ্বারা সম্ভবপর হয়।

মন্তব্য (Remarks) : পরবর্তী পর্যায়ে বিবর্তনবিদগণ ল্যামার্কের এই ধারণার সত্যতা সম্পর্কে কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কারণ এই ধারণা যদি সত্য হইত তাহা হইলে মানুষ নিজের ইচ্ছানুযায়ী দেহের পরিবর্তন করিয়া কল্পনার রাজ্যে বসবাস করিত। সুতরাং ল্যামার্কের তথ্যটি সম্পূর্ণভাবে বর্জনযোগ্য।

3. **অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার** (Use and disuse of organs) : ল্যামার্কের মতে জীবের যে সমস্ত অঙ্গ দৈনন্দিন ব্যবহৃত হয় সেই সমস্ত অঙ্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও সুগঠিত হয়। অপরপক্ষে, যে সমস্ত অঙ্গের কোন ব্যবহার হয় না তাহা ক্রমান্বয়ে ছোট হইতে থাকে এবং অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ল্যামার্ক একাধিক উদাহরণ ও তাহার ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

উদাহরণ : ব্যবহার (Use) : (i) বর্তমান জিরাফের যে লম্বা গলা দেখা যায় তাহা পূর্বে ছোট ছিল। জিরাফের পূর্বপুরুষ ছোট ছোট গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিত। ক্রমশ ছোট ছোট গাছের পাতা শেষ হইবার ফলে উঁচু গাছের পাতা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে থাকে। ফলস্বরূপ, জিরাফের গলা ক্রমশ লম্বা হইতে থাকে এবং কয়েক জন্ম পর লম্বা গলাযুক্ত জিরাফের উদ্ভব হইয়াছে।

(ii) হাঁস জাতীয় পাখীদের জলে বসবাস করিবার জন্য পায়ের আঙ্গুলগুলি লিপ্তপদ দ্বারা যুক্ত থাকে। ল্যামার্ক মনে করিতেন হাঁসের পূর্বপুরুষের ঐরূপ কোন পাতলা চর্মবিশিষ্ট লিপ্তপদ ছিল না। কিন্তু জলে সাঁতার কাটিবার জন্য পায়ের আঙ্গুলগুলি প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হইতে থাকে ফলে আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থানে পাতলা চামড়ার সৃষ্টি হয়।

(iii) কর্মকার, ব্যায়ামবিদ এবং দৌড়বাজ ব্যক্তিদের দৈনন্দিন পেশীর ব্যবহারের ফলে দেহের পেশী সবল ও সুগঠিত হয়।

অব্যবহার (Disuse): (i) উটপাখীর পূর্বপুরুষের দেহে সুগঠিত একজোড়া ডানা থাকায় উড়িতে পারিত কিন্তু ডানা ক্রমাগত ব্যবহৃত না হইবার ফলে ইহাদের আকার ক্ষুদ্র হইয়াছে।

(ii) সাপের পূর্বপুরুষের অগ্র ও পশ্চাৎ পদ ছিল কিন্তু গর্তের মধ্য দিয়া গমনের জন্য দুই জোড়া পদ বাধার সৃষ্টি করিত। সেইজন্য কয়েক পুরুষ ধরিয়া উক্ত পদের ব্যবহার ক্রমশঃ কমিতে থাকে ফলে বর্তমান পদ বিলুপ্ত হইয়াছে।

(iii) মানুষের পূর্বপুরুষের দেহে মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে লেজ অংশ ছিল। কিন্তু উত্তরপুরুষের ক্ষেত্রে লেজের ব্যবহার না থাকায় ইহা ক্রমশ ছোট হইয়া লুপ্তপ্রায় অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ মানুষের মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে ককসিক্স নামক অস্থিটি আজও বর্তমান।

(iv) গুহাবাসী প্রাণীরা গুহাতে বসবাস করে বলিয়া দেহত্বকে কোন রঞ্জক কণিকা পরিলক্ষিত হয় না এবং গুহার মধ্যে অল্প আলো থাকে বলিয়া চোখের দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মন্তব্য (Remarks): সুতরাং উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, দেহের যে সমস্ত অঙ্গ ব্যবহৃত হয় তাহা সবল ও সুগঠিত হইবে এবং যে সকল অঙ্গ ব্যবহৃত হইবে না তাহা ক্রমশ ছোট হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে।

4. অর্জিত গুণাবলীর উত্তরাধিকার (Inheritance of Acquired Characters): ল্যামার্কের মতে জীবের কোন এক পুরুষ তাহার জীবনকালে পরিবেশ হইতে যে সব গুণ বা চরিত্র অর্জন করে তাহা বংশগতির অবিচ্ছিন্ন ধারায় সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

ব্যাখ্যা (Explanation): ল্যামার্ক মনে করিতেন, কোন জীব তাহার জীবদ্দশায় যে সমস্ত চরিত্র পরিবেশ হইতে অর্জন করে সেইগুলি তাহার সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। আবার এই সন্তান-সন্ততি তাহার জীবদ্দশায় পরিবেশের প্রভাবে কিছু চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, সম্মিলিতভাবে তাহাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে বাহিত হয়। এইভাবে অর্জিত গুণ একপুরুষ হইতে বংশ পরম্পরায় উত্তর-পুরুষের দেহে ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হইয়া নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করে।

উদাহরণ : ল্যামার্কের মতে জিরাফের গলা লম্বা হওয়া একটি অর্জিত গুণ। এই অর্জিত গুণ উত্তরাধিকার সূত্রে পরের পুরুষে বাহিত হয় এবং এইভাবে বর্তমান লম্বাগলাযুক্ত জিরাফের সৃষ্টি হইয়াছে।

উপরি-উক্ত সূত্রগুলির মধ্যে এই সূত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বহু বিতর্কিত তত্ত্ব। ল্যামার্কবাদ প্রকাশিত হইবার পর হইতে এই তত্ত্বের উপর স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে বহু সমালোচনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে। নিম্নে ল্যামার্কবাদের সমালোচনা সবিস্তারে আলোচনা করা হইল।

ল্যামার্কবাদের সমালোচনা (Criticism of Lamarckism)

16.15 ল্যামার্কবাদের স্বপক্ষে সমালোচনা :

ল্যামার্কের সমসাময়িক এবং তাঁহার পরবর্তী কয়েকজন বিজ্ঞানী ল্যামার্কের তত্ত্বকে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন।

1. **পল ক্যামারারের পরীক্ষা :** পল ক্যামারার কয়েকটি বিভিন্ন রংয়ের (লাল, নীল, হলুদ) বাক্সে সালামান্ডার নামক উভচর প্রাণী রাখিয়া প্রতিপালন করেন। কয়েকদিন পর তিনি দেখেন যে বাক্সের রংঙের ন্যায় স্যালামান্ডারের গায়ের রঙ হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ল্যামার্কের সূত্রানুযায়ী জীব পরিবেশ হইতে গুণ অর্জন করে। কিন্তু পরে বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা এই ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই।

2. **ম্যাকডুগালের পরীক্ষা :** ম্যাকডুগাল দুইটি নির্গমন পথযুক্ত একটি বাক্সের মধ্যে কয়েকটি ইঁদুর রাখিয়া দেন। বাক্সটির একটি নির্গমন পথ আলোকিত এবং অন্যটি অন্ধকার। দুইটি নির্গমন পথে এমন ব্যবস্থা করা হয় যখন ইঁদুরগুলি আলোকিত পথ দ্বারা গমন করে তখন সামান্য বিদ্যুৎস্পৃষ্ট এবং যখন অন্ধকার পথ দ্বারা গমন করে তখন কোন অসুবিধা হয় না। কালক্রমে দেখা যায় যে ইঁদুরগুলি আলোকিত পথ ত্যাগ করিয়া অন্ধকার পথের মাধ্যমে গমন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, ইঁদুরের পরবর্তী বংশধর ঐ একই পথে চলাচল করিতেছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় অর্জিত গুণাবলী বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

3. **লাইসেংকোর পরীক্ষা :** রাশিয়ার বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ লাইসেঙ্কো (Lysenko) পরীক্ষার মাধ্যমে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাইয়া গাছের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা যায় এবং যাহা বংশগতির মাধ্যমে পরবর্তী জনুতে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু এই ধারণা বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃতি লাভ করে নাই।

16.16 ল্যামার্কবাদের বিপক্ষে সমালোচনা

1. ভাইসম্যান (Weissman) একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী ইঁদুরের লেজ কাটিয়া তাহাদের মধ্যে প্রজনন সংঘটিত করেন। প্রজননের পর তিনি দেখিলেন, উক্ত ইঁদুরের সন্তান-সন্ততির প্রত্যেকের লেজ ছিল। এইভাবে 22 জনু পর্যন্ত ইঁদুরের লেজ কাটিয়াও কোন লেজবিহীন ইঁদুর পান নাই। এই প্রসঙ্গে ভাইসম্যান জার্মপ্লাজম নামক একটি সূত্র প্রবর্তন করেন। তাঁহার মতে জীবদেহে দুইপ্রকার কোষীয় উপাদান বর্তমান। এইগুলি হইল (১) জার্মপ্লাজম (জননকোষের সাইটোপ্লাজম) এবং (২) সোমাটোপ্লাজম (দেহকোষের সাইটোপ্লাজম)। ভাইসম্যানের মতে জার্মপ্লাজমে কোনরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইলে তাহা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইবে কিন্তু সোমাটোপ্লাজমে কোনরূপ পরিবর্তন হইলে তাহা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইবে না।

2. অন্ধকার পরীক্ষাগারে ড্রসোফিলাকে 60 জন্ম অন্ধকারে লালন পালন করিলেও অন্ধ ড্রসোফিলা পাওয়া যায় নাই।

মন্তব্য (Remarks): উপরের পরীক্ষা হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে ল্যামার্কের মতবাদ অনুযায়ী অর্জিত গুণাবলী বংশ পরম্পরায় এক পুরুষ হইতে পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত হয় তাহা ভিত্তিহীন। কারণ বর্তমানে জানা গিয়াছে যে জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ক্রোমোজোমে অবস্থিত জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সহজে ইহাদের পরিবর্তন করা যায় না।

নয়া-ল্যামার্কবাদ (Neo-Lamarckism): কোপ (Cope), গিয়ার্ড (Giard), প্যাকার্ড (Packard), স্পেনসার (Spencer), ম্যাকব্রাইড (McBride) প্রভৃতি বিজ্ঞানীর সংশোধিত ল্যামার্কবাদকে নয়া-ল্যামার্কবাদ বলে। এই মতবাদ অনুযায়ী পরিবেশে অভিযোজিত হইবার জন্য জীবের নতুন নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয় যাহার ফলে উহাদের মধ্যে প্রকরণ দেখা যায়। এই প্রকরণ বংশগতিতে বাহিত হওয়ায় নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে, নয়া-ল্যামার্কবাদও দেহকোষের প্রকরণ এবং উহার বংশগতির উপর গুরুত্ব আরোপ করায় বিজ্ঞানীমহলে আস্থা অর্জন করিতে পারে নাই।

16.17 প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ বা ডারউইনিজম (Theory of Natural Selection or Darwinism):

ল্যামার্কবাদ প্রকাশিত হইবার প্রায় 50 বৎসর পর অভিব্যক্তিবাদের আর এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। নতুন অধ্যায়ের বহু বির্তকিত ও সর্বজনগ্রাহ্য মতবাদটির নাম প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ (Theory of Natural Selection)। প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের প্রবক্তা হইলেন চার্লস ডারউইন (Charles Darwin, 1809-1882)। 1809 খ্রীষ্টাব্দের 12ই ফেব্রুয়ারী ইংল্যাণ্ডের শ্রুসবেরীতে ডারউইন জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকে প্রকৃতির বৈচিত্র্য তাঁহার মনে অহরহ সাড়া দিতে থাকে। যাহার জন্য পিতার ইচ্ছানুযায়ী চিকিৎসাবিদ্যা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইহার পর 1831 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে H. M. S. Beagle নামক জাহাজে প্রকৃতিবিদ হিসাবে বিশ্ব ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল আটলাণ্টিক মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলবর্তী অঞ্চল, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে 1836 খ্রীষ্টাব্দে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন

চিত্র 16.17: চার্লস ডারউইন

করেন। জাহাজে পরিভ্রমণ কালে বিভিন্ন দ্বীপের প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন, আচার-ব্যবহার, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী প্রভৃতি তাঁহাকে আকৃষ্ট করে। বিশেষ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ড হইতে প্রায় 600 কিলোমিটার দূরে গ্যালাপোগাস দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর বিশেষত ফিঞ্চ পাখী গঠন বৈচিত্র্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এই সময় তিনি অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করেন।

প্রত্যাবর্তনের পর দীর্ঘ কয়েক বৎসর তাঁহার ভ্রমণকালীন অভিজ্ঞতা ও সংগৃহীত নমুনার বিশ্লেষণ তাঁহাকে বিশেষভাবে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময় তিনি ম্যালথাস-রচিত 'Principle of Population' প্রবন্ধটি তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করে এবং ইহার ফলে প্রকৃতির গবেষণায় তিনি আরো মনোনিবেশ করেন। 1858 খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন তাঁহার গবেষণার ফলাফল প্রকাশে ব্যস্ত তখন আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace) নামক একজন ইংরাজ প্রকৃতিবিদ মালয় আর্কিপেলাগোর প্রাণী ও উদ্ভিদের গবেষণার বিষয়বস্তু তাঁহার কাছে প্রেরণ করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, ওয়ালেসের প্রেরিত তথ্যগুলি ডারউইন তথ্যের অনুরূপ।

পরিশেষে 1858 খ্রীষ্টাব্দের 1লা জুলাই লিনিয়ান সোসাইটি অব্ লন্ডন-এর অধিবেশনে ডারউইন এবং ওয়ালেসের যৌথ নামে লিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। ইহার এক বৎসর পর অর্থাৎ 1859 খ্রীষ্টাব্দের 24শে নভেম্বর বহু তথ্য সম্বলিত 'On the Origin of Species by means of Natural Selection' নামক পুস্তকটি প্রকাশিত হয়।

জীবের বিবর্তনে প্রকৃতি কোন্ কোন্ জীবকে প্রতিপালন করে এবং কিভাবে নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় তাহার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ডারউইন এই পুস্তকটিতে লিপিবদ্ধ করেন। নিম্নে ডারউইনের তথ্যগুলি আলোচনা করা হইল।

1. অত্যধিক জন্মহার (Prodigality of reproduction): প্রতিটি জীবের প্রধান ধর্ম হইল প্রজননের মাধ্যমে নিজের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি করা। দেখা গিয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত জীব জ্যামিতিক হারে বংশ বৃদ্ধি করে। এই হারে যে সংখ্যক সন্তান-সন্ততির জন্ম হয় এবং তাহারা যদি সবাই বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে অল্প দিনে পৃথিবীর সমস্ত জায়গা কয়েকটি প্রজাতির জীব দ্বারা ভরিয়া যাইত। উদাহরণস্বরূপ, প্রজননকালে একটি স্ত্রী স্যালমন মাছ প্রায় 28 মিলিয়ন ডিম পাড়ে। কিছু পতঙ্গ ছয় মাসের মধ্যে প্রায় 20 মিলিয়ন ডিম উৎপাদন করিতে পারে। একটি পেঁপে গাছ হইতে যে সংখ্যক পেঁপে পাওয়া যায় তাহার সমস্ত বীজ হইতে যদি গাছ জন্মায় তাহা হইলে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এক বছরে কয়েকশত একর জায়গা জুড়িয়া পেঁপে গাছের জঙ্গল হইয়া যাইত। প্রাণিকুলের মধ্যে হাতীর প্রজনন হার সর্বাপেক্ষা কম। হাতী প্রায় 100 বৎসর বাঁচিয়া থাকে এবং 30 বৎসর বয়সে প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করিয়া তাহার আয়ুষ্কালে গড়ে ছয়টি হাতীর জন্ম দিতে

পারে। ডারউইন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই জন্মহারে যদি সমস্ত হাতী বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে 750 বৎসরে 19 মিলিয়ন হাতী উৎপন্ন হইবে।

উপরি-উক্ত উদাহরণগুলি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জীবের এই হারে যদি বংশবৃদ্ধি অব্যাহত থাকিত তাহা হইলে যে কয়েকটি প্রজাতির জীব কয়েক বৎসরে পৃথিবীর সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া ফেলিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা হয় না।

2. **সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান** (Constancy of food and space): পৃথিবীতে সবুজ উদ্ভিদেরা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু প্রাণিজগৎ খাদ্যের জন্য উদ্ভিদজগতের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পৃথিবীতে খাদ্যবস্তুর উৎপাদনহার সীমিত। অনুরূপভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে বাসস্থানও সীমিত।

3. **জীবনসংগ্রাম** (Struggle for existence): ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী জীবের অপরিমিত সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সীমিত খাদ্য ও বাসস্থানের ফলে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং জীবের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে সংগ্রাম শুরু হয় ডারউইন তাহাকে জীবনসংগ্রাম আখ্যা দিয়াছেন।

এই জীবন সংগ্রাম তিন ধরনের, যথা—

(i) **অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম** (Intraspecific struggle): খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য যখন একই প্রজাতির মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয় তখন তাহাকে অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম বলে। উদাহরণস্বরূপ, এক টুকরা রুটির জন্য যখন দুই বা ততোধিক কাকের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলে তাহাই অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম।

(ii) **আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম** (Interspecific struggle): সীমিত খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য যখন দুই বা ততোধিক প্রজাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় তাহাকে আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম বলা হয়। যেমন এক টুকরা রুটির জন্য একদিকে কাক এবং অন্যদিকে কুকুরের মধ্যে যে সংগ্রাম চলে তাহা আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম নামে পরিচিত।

(iii) **পরিবেশের সহিত সংগ্রাম** (Environmental struggle): জীবকুলকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রতিনিয়ত প্রতিকূল পরিবেশের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। প্রচণ্ড গরম বা ঠাণ্ডা, বন্যা, খরা, ঝড়, ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি প্রতিকূল পরিবেশ জীবের ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং জীবকুলকে এইরূপ পরিবেশে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অহরহ সংগ্রাম করিতে হয়।

4. **প্রকরণ** (Variation): পৃথিবীতে কোনও দুইটি জীব একেবারে অনুরূপ নয়। এমনকি একই প্রজাতিভুক্ত বিভিন্ন জীবের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকিবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একই পিতামাতার যদি পাঁচটি সন্তান থাকে তাহা হইলে

তাহাদের মধ্যে গঠন, আকৃতি, গায়ের রঙ, দেহের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য কখনও এক হয় না। জীবের এই রূপ পার্থক্যকে প্রকরণ বলে। সুতরাং দৈহিক পরিবর্তনের ফলে প্রকরণের সৃষ্টি। কিছু কিছু প্রকরণ জৈব অভিব্যক্তির সহায়ক। এইগুলিকে সহায়ক প্রকরণ (Favourable variation) বলে এবং এই সহায়ক প্রকরণগুলি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়।

5. **যোগ্যতমের উদ্বর্তন** (Survival of the fittest) : পরিবর্তিত পরিবেশে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জীবন সংগ্রামে যাহারা জয়ী হয় তাহারা যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে অনুকূল বা সহায়ক প্রকরণ থাকে। এই সহায়ক প্রকরণ নতুন প্রজাতির সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। যাহাদের মধ্যে অনুকূল প্রকরণ থাকে না তাহারা জীবন সংগ্রামে অনুপযুক্ত, অযোগ্য, দুর্বল। ফলে প্রকৃতি হইতে তাহারা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং জীবন সংগ্রামের পর যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটিয়া থাকে।

6. **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (Natural Selection) : অনুকূল প্রকরণ সম্পন্ন জীবেরা প্রকৃতির আনুকূল্য লাভ করে এবং তাহাদের যোগ্যতম জীব হিসাবে নির্বাচিত করে। ডারউইনের মতানুযায়ী ইহাই প্রাকৃতিক নির্বাচন।

7. **নতুন প্রজাতির সৃষ্টি** (Origin of new species) : যাহারা জীবন সংগ্রামে জয়ী হয় তাহাদের অনুকূল প্রকরণ বংশপরম্পরায় পরবর্তী জনুতে বাহিত হইতে থাকে। এইভাবে সহায়ক প্রকরণগুলি জীবদেহে ক্রমশ পুঞ্জীভূত হয় এবং সেই সমস্ত জীবের প্রতিকূল বা পরিবর্তিত পরিবেশে অভিযোজিত হইবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ অভিযোজনের ফলে নতুন নতুন ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য হইতে পৃথক। এইভাবে প্রকৃতিতে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের তথ্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করা যায়।

তথ্য	সিদ্ধান্ত
1. অত্যধিক জন্মহার 2. সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান	জীবনসংগ্রাম
3. জীবনসংগ্রাম 4. প্রকরণ	যোগ্যতমের উদ্বর্তন
5. যোগ্যতমের উদ্বর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন 6. অনুকূল প্রকরণের পুঞ্জীভবন এবং বংশপরম্পরায় সঞ্চারণ	নতুন প্রজাতির সৃষ্টি

16.18 ডারউইনবাদের সমালোচনা (Criticism of Darwinism)

1. ডারউইন প্রকরণের কথা বলিয়াছেন কিন্তু কি করিয়া প্রকরণের সৃষ্টি তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

2. ডারউইন যোগ্যতমের উদ্‌বর্তনের কথা বলিয়াছেন কিন্তু কিভাবে যোগ্যতমের উদ্ভব হইল সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন নাই।

3. প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে সৃষ্ট অত্যধিক বৈশিষ্ট্য (overspecialisation): অতীতে অনেক জীবের অবলুপ্তির কারণ হইয়াছে। যেমন—এলক্ হরিণের শিং অতি বিশেষিত হইয়া জটিল আকার ধারণ করার ফলে প্রাণীরা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

4. ডারউইন ল্যামার্কবাদের অর্জিত গুণাবলীর উত্তরাধিকার সমর্থন ও বিশ্বাস করিতেন।

5. ডারউইন জীবদেহে নিষ্ক্রিয় অঙ্গের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

16.19 ডারউইনের মতানুসারে জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণ

ডারউইনের মতে জিরাফের পূর্বপুরুষের গলা ছিল বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের। কালক্রমে সমতলভূমি এবং নিচু গাছের পাতা নিঃশেষিত হওয়ায় কেবল দীর্ঘ গলাযুক্ত জিরাফরা উঁচু গাছের পাতা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া জীবন সংগ্রামে নিজেদের যোগ্যতম রূপে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যাহাদের স্বল্প দীর্ঘযুক্ত গলা ছিল তাহারা ধীরে ধীরে খাদ্যের অভাবে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে সকল জিরাফ জীবনসংগ্রামে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহারা বেশী কর্মক্ষম এবং সুপ্রজননক্ষম। তাহাদের দীর্ঘ গলা ও দীর্ঘ অগ্রপদ হওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত ও পুঞ্জীভূত হইয়া আধুনিক লম্বা গলাযুক্ত জিরাফের উদ্ভব হইয়াছে।

16.20 নয়া-ডারউইনবাদ (Neo-Darwinism):

জীব বিজ্ঞানের আধুনিক জ্ঞানের আলোকে সংশোধিত ডারউইন তত্ত্বকে নয়া-ডারউইনবাদ বলে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, বিবর্তনে আধুনিক সংশ্লেষ মতবাদটি প্রকৃতপক্ষে নয়া-ডারউইনবাদ। কিন্তু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সিমসন (Simson)-এর মতানুযায়ী ভাইসম্যান (Weissman) ও তাঁহার সহকর্মীগণ কর্তৃক সংশোধিত ডারউইন তত্ত্বই নয়া-ডারউইনবাদ। তাঁহাদের মতে একাধিক কারণের সামগ্রিক প্রভাবের ফলে জীবের অভিযোজন সম্ভবপর হয় এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি অন্যতম। ইহা ব্যতীত বিবর্তনে পরিব্যক্তির গুরুত্ব কি তাহা নয়া-ডারউইনবাদে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয় নাই। তাই তাঁহাদের প্রবর্তিত নয়া-ডারউইনবাদ নিজেই অসম্পূর্ণ এবং আংশিক।
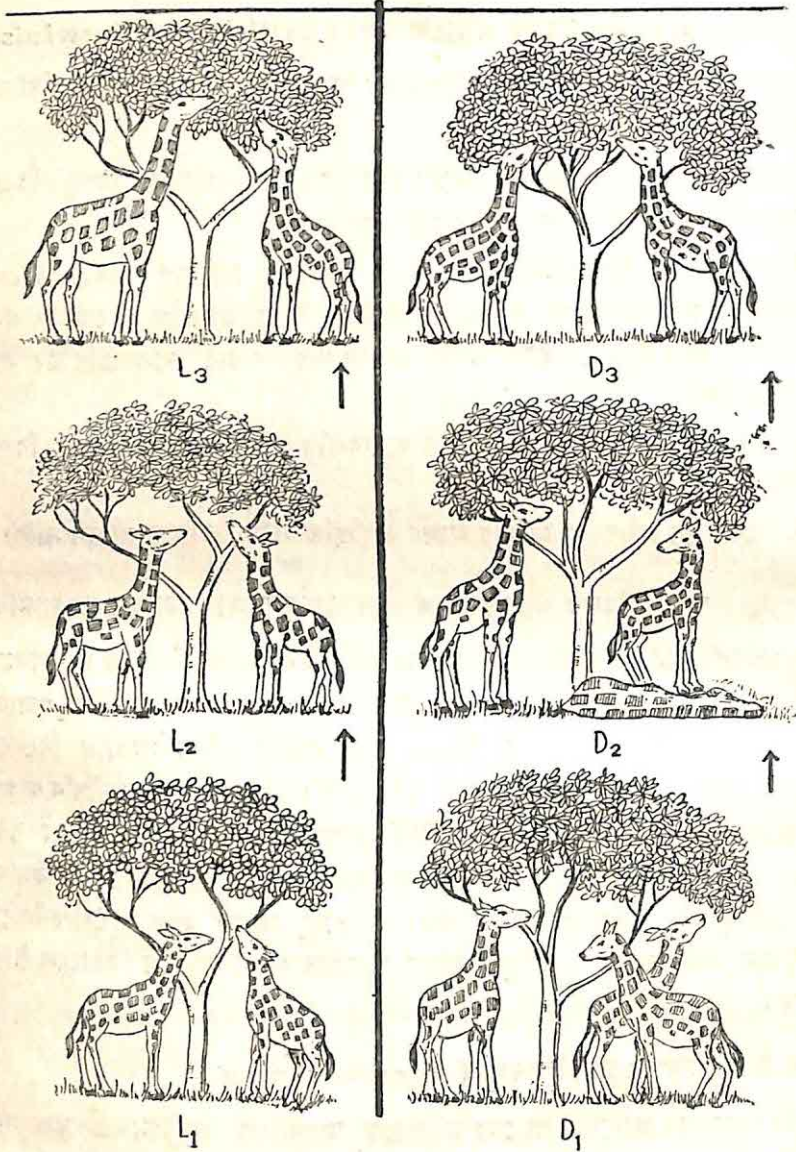
চিত্র 16.18 : ল্যামার্কবাদ ও ডারউইনবাদ অনুসারে জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণ।

ল্যামার্কের মতবাদ	ডারউইনের মতবাদ
L_1 = জিরাফের পূর্বপুরুষের গ্রীবা ক্ষুদ্র ছিল। উঁচু গাছের পাতার নাগাল পাইবার জন্য তাহারা গ্রীবাকে প্রসারণ করিতে লাগিল।	D_1 = বিভিন্ন দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট জিরাফের পূর্বপুরুষদের মধ্যে বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম।
L_2 = উপরি-উক্ত কারণের ফলে জিরাফের গলা ক্রমশ লম্বা হইতে লাগিল।	D_2 = প্রাকৃতিক নির্বাচন লম্বা গলাযুক্ত জিরাফকে নির্বাচন করে।
L_3 = গ্রীবার প্রসারণের ফলে আধুনিক লম্বা গলা জিরাফের আবির্ভাব হইয়াছে।	D_3 = যোগ্যতম হিসাবে লম্বা গলাযুক্ত জিরাফের স্থায়ীত্বলাভ।

সংশ্লেষ তত্ত্ব (Synthetic Theory) : বিংশ শতাব্দীতে বংশগতিবিদ্যা ও জীনতত্ত্বের আধুনিক জ্ঞানের আলোকে ডারউইনবাদের নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই বিবর্তনের সংশ্লেষ তত্ত্বরূপে পরিচিত। এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ হইলেন—ডবঝান্স্কি (Dobzhansky), হ্যালডেন (Haldane), হাক্সলে (Huxley) ফিশার (Fisher), মায়ার (Mayr), স্টেবিন্স (Stebbins), হোয়াইট (White) প্রমুখ বরেণ্য বিজ্ঞানী। স্টেবিন্স (1971) এর মতানুসারে বিবর্তনের জন্য পাঁচটি কারণ দায়ী। কারণগুলি হইল—

(i) ক্রোমোজোমে অবস্থিত জীনের পরিব্যক্তি,
(ii) ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও গঠনের পরিবর্তন,
(iii) জীনের পুনর্বিন্যাস,
(iv) প্রাকৃতিক নির্বাচন,
(v) প্রজননের পৃথকীকরণ।

তাঁহার মতে প্রথমোক্ত তিনটি কারণ বিবর্তনের মালমশলা বা জীনের প্রকরণের জন্য দায়ী এবং শেষোক্ত দুইটি কারণ বিবর্তনের গতিপথ নির্দেশ করে। এই মতবাদ অনুযায়ী প্রকৃতি অনুকূল প্রকরণযুক্ত প্রাণীদের নির্বাচন করে যাহারা পরিবর্তিত পরিবেশে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য উপযুক্ত এবং যাহাদের অধিক সংখ্যক সন্তান উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা আছে। এই নতুন প্রকরণ বংশগতি প্রাপ্ত হয় এবং নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রজাতির উদ্ভব হয়। এইভাবে সংশ্লেষ তত্ত্ব জীবের বিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করে।

16.21 পরিব্যক্তিবাদ (Mutation Theory)

ডি ভ্রিসের পরিব্যক্তিবাদ (Mutation Theory of de Vries) : উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী হুগো ডি ভ্রিস 1848 খ্রীষ্টাব্দে নেদারল্যান্ডসের হারলেম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে নতুন প্রজাতির সৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া 1901 খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক যুগান্তকারী মতবাদ প্রকাশ করেন যাহা পরিব্যক্তিবাদ (Theory of Mutation) নামে পরিচিত।

চিত্র 16.19 : হুগো ডি ভ্রিস

ডি ভ্রিস সন্ধ্যামণি উদ্ভিদের (Evening Primrose, বৈজ্ঞানিক নাম *Oenothera lamarckiana*) উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হইতে কিছু কিছু উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য আলাদা। তিনি এই নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদগুলিকে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পূর্বোক্ত উদ্ভিদের পরিবর্তনের জন্য নতুন বৈশিষ্ট্যের

সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি এই পরিবর্তিত উদ্ভিদগুলিকে মিউট্যাণ্ট (Mutant) বা পরিবর্তনশীল উদ্ভিদ এবং পরিবর্তনগুলিকে মিউটেশন (Mutation) বা পরিব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, জীবের বৈশিষ্ট্য হঠাৎ পরিবর্তিত হইয়া বংশগতির মাধ্যমে পরবর্তী জনুতে বাহিত হয় ফলে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

ডি ভ্রিসের মতে মিউট্যাণ্ট বিভিন্ন ধরনের, যেমন—

1. ডিগ্রেসিভ প্রজাতি (Degressive species): এই সকল প্রজাতি অত্যন্ত দুর্বল হইবার ফলে অবলুপ্তির সম্মুখীন।

2. রেট্রোগ্রেসিভ প্রজাতি (Retrogressive species): এই সকল প্রজাতি উহাদের কিছু কিছু পূর্বতন বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

3. প্রোগ্রেসিভ প্রজাতি (Progressive species): এই সকল প্রজাতি নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয় ও প্রজাতির জন্ম দান করে।

4. ইনকনস্ট্যাণ্ট প্রজাতি (Inconstant species): এই সকল প্রজাতি জনিতার ন্যায় জীবের জন্ম দান করে।

ডি ভ্রিস ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির সৃষ্টির মতবাদকে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার মতে নতুন প্রজাতির সৃষ্টির মূল কারণ হইল পরিব্যক্তি।

ডি ভ্রিসের মতবাদের সমালোচনা (Criticism of de Vries's theory)

ডি ভ্রিসের পরিব্যক্তিবাদ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়, কারণ প্রকৃতিতে প্রকাশিত পরিব্যক্তি খুবই কম—দশ লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র। কিন্তু মুলার (Muller) কৃত্রিম উপায়ে পরিব্যক্তি ঘটাইয়া দেখিয়াছেন যে ইহার ফল জীবের পক্ষে খুবই মারাত্মক এমন কি জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, দেহকোষে পরিব্যক্তি হইলে জৈব বিবর্তনে কোন মূল্য নাই। শুধু জননকোষে পরিব্যক্তি হইলে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত হইয়া নতুন প্রাণীর সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে। কি কারণে পরিব্যক্তি হয় তাহা ডি ভ্রিসের ধারণা ছিল না। বর্তমানে জানা গিয়াছে ক্রোমোজোমের সাংগঠনিক পরিবর্তন বা ক্রোমোজোমে অবস্থিত জীনের পরিবর্তনের ফলে পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়।

বিষয়-সংক্ষেপ

মন্থর ও পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সরলতম জীব হইতে জটিলতম জীবের সৃষ্টিকে জৈব অভিব্যক্তি বা বিবর্তন বলে। পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়াছিল আজ থেকে প্রায় 200 কোটি বৎসর পূর্বে। পৃথিবীতে সেই প্রথম জীব হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে বর্তমান জটিল ও উন্নত বৈচিত্র্যময় জীব-জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। জীব সৃষ্টির ব্যাপারে অনেক ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন মতবাদ প্রচলিত আছে কিন্তু তাহার মধ্যে জৈব অভিব্যক্তিবাদ বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত মতবাদ।

সরল জীব হইতে জটিল জীবের উৎপত্তির কারণ হিসাবে বলা যায়, আমাদের চতুষ্পার্শে যে পরিবেশ বর্তমান তাহা সর্বদা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তিত পরিবেশে অভিযোজিত হইবার জন্য জীবের বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন আবশ্যক। দেহের এই পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে নতুন ও জটিল জীবের উৎপত্তি হয়। জীবের পরিবর্তনের ফলে যেমন জটিল জীবের সৃষ্টি হয় অনুরূপভাবে নির্জীব পদার্থের পরিবর্তনের ফলেও আধুনিক নির্জীব পদার্থের সৃষ্টি হয়। প্রথমোক্ত বিষয়টি জৈব অভিব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি এবং শেষোক্ত বিষয়টি অজৈব অভিব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করা যায়। যাই হোক, জৈব অভিব্যক্তি মতবাদটি বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য। ইহার স্বপক্ষে বিবর্তনবাদীরা যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

1. **তুলনামূলক অঙ্গ সংস্থানিক প্রমাণ**—বিভিন্ন জীবের বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের আলোচনাকে তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ বলে। এই প্রমাণের মূল বিষয় হইল নিম্নস্তরের জীব পরিবর্তিত পরিবেশে বসবাসের ফলে অঙ্গের গঠনগত জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া উচ্চ স্তরের জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। এই প্রমাণকে সু প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কয়েকটি অঙ্গের উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেমন, সমসংস্থ অঙ্গ ও সমবৃত্তি অঙ্গ—যে সকল অঙ্গের উৎপত্তিস্থল ও গঠন কাঠামো এক কিন্তু কার্য ভিন্ন সেই সকল অঙ্গকে সমসংস্থ অঙ্গ বলে। অপরপক্ষে, বিভিন্ন জীবদেহের যে সকল অঙ্গের উৎপত্তি ও গঠন ভিন্ন কিন্তু কার্য এক তাহাদের সমবৃত্তি অঙ্গ বলে। সমসংস্থ অঙ্গের উদাহরণে—বলা যায়, ব্যাঙ, সরীসৃপ, ঘোড়া প্রভৃতির অগ্রপদ; পাখী ও বাদুড়ের ডানা, মানুষের হাত ইত্যাদি। অঙ্গের উৎপত্তি এক এবং মৌলিক গঠন কাঠামো একই ধরনের কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বাস করিবার জন্য ইহাদের আকৃতি এবং কার্যের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মনে একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে, উক্ত প্রাণীদের কার্যের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কেন গঠনগত মিল দেখা যায়। ইহার উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলেন ইহাদের উৎপত্তি একই পূর্বপুরুষ হইতে হইবার জন্য গঠনগত সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রাণিজগতের ন্যায় উদ্ভিদজগতেও একাধিক সমসংস্থের উদাহরণ পাওয়া যায়। সমবৃত্তি অঙ্গের উদাহরণে বলা যায়—পতঙ্গের ডানা, পাখীর ডানা ও বাদুড়ের ডানা প্রভৃতির গঠন বিভিন্ন কিন্তু সমস্ত ডানা উড়িবার কার্যে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে সমবৃত্তি অঙ্গ দুই বা ততোধিক জীবগোষ্ঠীর মধ্যে অভিসারী বিবর্তনের সংকেত নির্দেশ করে।

এই প্রমাণের অন্য একটি সমর্থনপুষ্ট দিক হইল লুপ্তপ্রায় বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ। এই অঙ্গের ব্যাখ্যায় বলা যায়, জীবদেহে কিছু কিছু অঙ্গ তাহাদের পূর্বপুরুষের দেহে সক্রিয় ছিল কিন্তু বর্তমানে কার্যকারিতা না থাকার ফলে উহারা নিষ্ক্রিয় এবং লুপ্তপ্রায় অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের দেহে অবস্থিত অ্যাপেনডিক্স, ককসিক্স, নিকটিটেটিং মেমব্রেন, কর্ণপেশী, ছেদক দন্ত; তিমির ক্ষেত্রে শ্রোণীচক্রদেশে অবস্থিত অস্থি, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কালকাসুন্দার স্ট্যামিনোড, ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের শল্কপত্র ইত্যাদি লুপ্তপ্রায় অঙ্গের উদাহরণ।

উপরি-উক্ত অঙ্গ ব্যতীত এই প্রমাণের স্বপক্ষে আর একটি দিক হইল—সংযোগকারী যোগসূত্র। জীবজগতের মধ্যে কিছু জীব তাহাদের নিকটবর্তী পর্ব বা শ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। এই অন্তর্বর্তী জীবের সাহায্যে বলা যায় বিবর্তন পর্যায়ক্রমিক-ভাবে সংঘটিত হইয়াছে। প্রাণীদের মধ্যে আর্কিওপটেরিক্স, মোনোট্রিমাটা, পেরিপেটাস, প্রভৃতি; উদ্ভিদের ক্ষেত্রে রাইনিয়া, নিটাম ইত্যাদি সংযোগরক্ষাকারী জীবের উদাহরণ।

2. **তুলনামূলক শারীর সংস্থানিক প্রমাণ**: বিভিন্ন প্রাণিদেহের ভিতরের অঙ্গের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের আলোচনাকে তুলনামূলক শারীর সংস্থান বলে। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক তুলনা করিলে দেখা যায় ইহাদের মৌলিক গঠন একই প্রকার কিন্তু যতই নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণী হইতে উচ্চ স্তরের দিকে যাওয়া যায় ততই ইহাদের জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

3. **ভ্রূণতত্ত্বঘটিত প্রমাণ**: মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, প্রতিটি জীব বৃদ্ধির সময় তাহার পূর্বপুরুষের জীবনবৃত্তান্তের দশাগুলিকে পুনরাবৃত্তি করিয়া পূর্ণাঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। অন্য কথায়, ব্যক্তিজনি জাতিজনিকে স্মরণ করে।

4. **জীবাশ্মঘটিত প্রমাণ**: ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরের জীবাশ্ম হইতে জানা যায়, কোন জীবগোষ্ঠী কখন সৃষ্টি হইয়াছে অথবা কখন বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত জীবাশ্মের সাহায্যে পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়। জীবাশ্ম না হইলেও কোন কোন জীবগোষ্ঠীর দুই-একটি প্রজাতির জীব সুদূর অতীতে সৃষ্টি হইয়া আজ অবধি বাঁচিয়া আছে এবং যাহাদের গঠনগত ও শারীরগত কোন পরিবর্তন হয় নাই কিন্তু তাহাদের সমসাময়িক জীব পৃথিবী হইতে বহু পূর্বে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহাদের জীবন্ত জীবাশ্ম বলে। পেরিপেটাস, স্ফেনোডন, লিমুলাস, সিলাকান্থ ইত্যাদি প্রাণীদের ক্ষেত্রে এবং গিংকো, সাইকাস উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জীবন্ত জীবাশ্মের উদাহরণ।

উপরি-উক্ত প্রমাণ ব্যতীত রক্তের সম্বন্ধ সম্পর্কীয় প্রমাণ, শারীরবৃত্তীয় প্রমাণ, শ্রেণীবিন্যাসজনিত প্রমাণ, ভৌগোলিক বিস্তারজনিত প্রমাণ বিবর্তনের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দান করে।

পৃথিবীতে সরল জীব হইতে কিভাবে জটিল জীবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা জৈব অভিব্যক্তির বিভিন্ন প্রমাণ হইতে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিবর্তনের মাধ্যমে কিভাবে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা বিভিন্ন মতবাদ হইতে জানা যায়। এই মতবাদগুলির মধ্যে ল্যামার্কবাদ, ডারউইনবাদ এবং ডি ভ্রিসের মতবাদ উল্লেখযোগ্য।

জাঁ ব্যাপটিস্ট ডি মনেট ল্যামার্ক বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির সৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া নিম্নলিখিত চারিটি সূত্র প্রবর্তন করেন:

1. পরিবেশের প্রভাব, 2. সজ্ঞান প্রচেষ্টা, 3. ব্যবহার ও অব্যবহার সূত্র, 4. অর্জিত গুণাবলীর উত্তরাধিকার। পরবর্তী কালে ল্যামার্কবাদের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে

সমালোচনার ঝড় বহিয়া যায়। ইহার মধ্যে পরিবেশের প্রভাব এবং ব্যবহার ও অব্যবহার সূত্রটি সত্য হইলেও বাকী দুইটি সূত্র বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। ল্যামার্কবাদের পরে বিবর্তনে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ শুরু হয় প্রকৃতিবিদ চার্লস ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের মাধ্যমে। প্রকৃতি কোন্ কোন্ জীবকে লালন পালন করে এবং কিভাবে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় তাহার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ডারউইনকৃত 'On the Origin of Species by means of Natural Selection' নামক পুস্তকটি হইতে জানা যায়। ডারউইনবাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি হইল—1. অত্যধিক জন্মহার, 2. সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান, 3. জীবনসংগ্রাম, 4. প্রকরণ, 5. যোগ্যতমের উদ্বর্তন, 6. প্রাকৃতিক নির্বাচন, 7. নতুন প্রজাতির সৃষ্টি। ডারউইনবাদও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। এই তত্ত্বের অনেকগুলি দুর্বল অংশের মধ্যে প্রকরণ সৃষ্টির ব্যাখ্যার অভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে জীব বিজ্ঞানের আধুনিক জ্ঞানের আলোকে ডারউইনবাদের ত্রুটিগুলিকে বাদ দিয়া যে সংশোধিত ডারউইন তত্ত্ব প্রচলিত হয়, তাহা নয়া-ডারউইনবাদ নামে খ্যাতি অর্জন করে। পরবর্তী পর্যায়ে ডবঝানস্কি, ফিশার, হ্যালডেন, ডি ভ্রিস প্রভৃতি বিজ্ঞানী নয়া-ডারউইনবাদকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা সংশ্লেষবাদ নামে পরিচিত।

পরবর্তী কালে বিবর্তনে নতুন প্রজাতির সৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া যে যুগান্তকারী মতবাদ প্রকাশিত হয়। তাহা পরিব্যক্তি নামে পরিচিত। ডাচ উদ্ভিদবিজ্ঞানী হুগো ডি ভ্রিস এই মতবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে জীবের বৈশিষ্ট্যের হঠাৎ পরিবর্তন হইয়া বংশগতির ধারায় প্রসারলাভ করিলে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ নতুন প্রজাতির সৃষ্টির মূল কারণ হইল পরিব্যক্তি।

প্রশ্নাবলী

A. পার্থক্য লিখ :

1. সমসংস্থ অঙ্গ ও সমবৃত্তি অঙ্গ।
2. জীবাশ্ম ও জীবন্ত জীবাশ্ম।
3. অনুকূল ও প্রতিকূল প্রকরণ।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

1. বিবর্তন কাহাকে বলে ?
2. বিশেষ সৃষ্টিবাদ বাতিল হইয়াছিল কেন ?
3. লুপ্তপ্রায় অঙ্গ বলিতে কি বুঝ ?
4. সংযোগ রক্ষাকারী যোগসূত্র কাহাকে বলে ?
5. প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ বলিতে কি বুঝ ?
6. অভিসারী বিবর্তন কাহাকে বলে ?
7. জীবন সংগ্রাম কি ?
8. নতুন প্রজাতির উদ্ভব বলিতে কি বুঝ ?
9. অর্জিত গুণাবলী বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় বলিতে কি বুঝ ?

10. মিউটেশান কাহাকে বলে ? এই তত্ত্বের প্রবক্তা কে ?
11. ব্যক্তিজনি বা ওন্টোজেনি এবং জাতিজনি বা ফাইলোজেনি বলিতে কি বুঝ ?
12. প্রকরণ কাহাকে বলে ? অনুকূল প্রকরণ বলিতে কি বুঝ ?

C. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

1. সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গ কিভাবে জীবজগতের বিবর্তন প্রমাণ করে ?
2. বিবর্তনের স্বপক্ষে জীবাশ্ম ও ভ্রূণবিদ্যা ঘটিত প্রমাণ উল্লেখ কর।
3. ল্যামার্কবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া উহার ত্রুটিগুলি উল্লেখ কর।
4. ডারউইনের মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত কর এবং উহার সমালোচনা কর।
5. ডি ভ্রিসের মিউটেশান তত্ত্বের একটি বিশদ বিবরণ দাও। এই তত্ত্ব অনুযায়ী নূতন প্রজাতির উদ্ভব কিভাবে হইয়াছে ?
6. ল্যামার্ক ও ডারউইনের মতানুযায়ী জিরাফের গলা ও অগ্রপদ লম্বা হইবার কারণ কি ?

সপ্তদশ অধ্যায়

ট্যাক্সোনোমি
(Taxonomy)

17.1 সূচনা (Introduction) : বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে উদ্ভিদরাজ্য ও প্রাণিরাজ্য উভয়ের সমন্বয়ে জীবজগত গঠিত। জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে বিরাজমান অগনন প্রাণী ও উদ্ভিদ যাহার পরিসংখ্যান করা যেমন দুরূহ ব্যাপার তেমনি একটি সমস্যা তাহাদের সুশৃংখলভাবে বিন্যস্ত করা। এই সুশৃংখলভাবে বিন্যস্ত করার প্রয়োজন তখনই হয় যখন অজস্রের মধ্য থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জীবের আবশ্যক হয়। সুবিশাল জীবজগৎকে একটি বৃহৎ লাইব্রেরীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। একটি লাইব্রেরীতে বহুসংখ্যক বই থাকে। বইগুলি এমন একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সাজানো থাকে যাহাতে যখন কোন বিশেষ বইয়ের প্রয়োজন তখন খুঁজিয়া নেওয়া সম্ভব হয়। তাহা না হইলে একটি বিশৃংখলার সৃষ্টি হইবে এবং বিশেষ বইটি খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব হইবে না। অনুরূপভাবে, এই বিশাল প্রাণী ও উদ্ভিদ রাজ্যের অন্তর্গত লক্ষ লক্ষ প্রাণী ও উদ্ভিদকে সহজভাবে চিনিবার জন্য শ্রেণীবিন্যাসের একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং উদ্ভিদ ও প্রাণিরাজ্যের অন্তর্গত সমস্ত প্রজাতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজন। শ্রেণী-বিন্যাসের পর জীবের সনাক্তকরণ এবং উহার পর নামকরণের প্রয়োজন হয়। সুতরাং জীববিজ্ঞানে শ্রেণীবিন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম অনুসারে জীবজগতের অন্তর্গত সকল প্রজাতির জীবদের সুশৃংখলভাবে সজ্জিত করা।

বিভিন্ন জীবের গোষ্ঠীভুক্ত করণ সম্পর্কীয় আলোচনায় **ট্যাক্সোনোমি, সিস্টেমেটিক্স** এবং **শ্রেণীবিন্যাস**—এই তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই তিনটি শব্দের পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম হওয়ায় উহাদের পরস্পর হইতে পৃথক করা কষ্টসাধ্য। এই শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উহাদের প্রয়োগ সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারণা ছিল না। 1953 খ্রীষ্টাব্দে মায়ার, লিণ্ডস্লে ও আসিঞ্জার (Mayr, Lindslay and Usinger) উহাদের সম্বন্ধে আলোকপাত করিলেও 1961 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী সিম্পসন (Simpson) উপরি-উক্ত তিনটি শব্দের বিশ্লেষণ এবং উহাদের পৃথকীকরণ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

ট্যাক্সোনোমি (Taxonomy) : ট্যাক্সোনোমি কথাটি উদ্ভূত হইয়াছে গ্রীক শব্দ হইতে, Taxis = Arrangement = বিন্যাস, nomos = law = আইন। যাহার প্রকৃত অর্থ হইল আইন অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি। ফরাসী উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী এ. পি. দ্য ক্যানডোল্ (A. P. de Candolle) 1813 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম তাঁহার প্রকাশিত 'Theorie of elementarie de la botanique' বইটিতে ট্যাক্সোনোমি কথাটি ব্যবহার করেন।

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিজ্ঞানসম্মত আইন অনুযায়ী জীবজগতের শ্রেণী-বিন্যাস, নামকরণ ও সনাক্তকরণ করা হয় তাহাকে ট্যাক্সোনোমি (Taxonomy) বলে। বিজ্ঞানী মায়ার (Mayr, 1969)-এর মতানুসারে "শ্রেণীবিন্যাসের তত্ত্ব

ও ব্যবহারকে ট্যাক্সোনোমি বলে"—'*Taxonomy is the theory and practice of classifying organism.*'

সিস্টেমেটিক্স (Systematics) : [সিস্টেমেটিক্স একটি গ্রীক শব্দ। ইহার অর্থ Systema = to put together = একত্রীকরণ] বিজ্ঞানী সিম্পসন (Simpson, 1961)-এর মতে "জীবের প্রকারভেদ ও বৈচিত্র্য এবং উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করিবার পদ্ধতিকে সিস্টেমেটিক্স বলে।" "*Systematics is the scientific study of the kinds and diversity of organisms and of any and all relationships among them.*"

শ্রেণীবিন্যাস (Classification) : পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নিয়মে জীবকে গোষ্ঠীভুক্তকরণের পদ্ধতিকে শ্রেণী বিন্যাস বলে। বিজ্ঞানী সিম্পসনের মতে "পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া জীবজগতকে গোষ্ঠীভুক্ত করার পদ্ধতিকে শ্রেণীবিন্যাস বলে।"

শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্য (Object of Classification) : শ্রেণীবিন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জীবের সনাক্তকরণ এবং জীবটিকে অন্যান্য জীবের সহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে যথোপযুক্ত শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা।

সনাক্তকরণ (Identification) : অপরিচিত জীবের সহিত কোন পরিচিত গোষ্ঠীভুক্ত জীবের সাদৃশ্য আছে কি নাই এবং অপরিচিত হইলে সম্ভাব্য নতুন কোন জীব কিনা তাহা নির্ণয় করাকে সনাক্তকরণ বলে।

17.2 শ্রেণীবিন্যাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Brief history of Classification) :

জীবজগতের শ্রেণীবিন্যাস বস্তুত গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের (Aristotle, 384-322 B. C.) সময় হইতে সূত্রপাত। তিনি কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া প্রাণিরাজ্যকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—অ্যানাইমা (Aaima) —লাল রক্তবিহীন প্রাণী (স্পঞ্জ, একনালীদেহী, সন্ধীপদ ও কম্বোজ জাতীয় প্রাণী) এবং ইনাইমা (Enaima)—লাল রক্তযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী। অপরদিকে অ্যারিস্টটলের অন্যতম শিষ্য থিওফ্রেস্টাস (Theophrastus, 370-287 B. C.) উদ্ভিদ জগৎকে বিরুৎ (Herb), গুল্ম (Shrub) এবং বৃক্ষ (Tree) এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন। পরবর্তীকালে ইংরাজ বিজ্ঞানী জন রে (John Ray, 1627-1705) প্রজাতির আধুনিক ধারণা সম্পর্কে আলোকপাত এবং প্রাণিজগতের শ্রেণীবিন্যাস করেন। প্রকৃতপক্ষে, সুইডিস বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস

চিত্র 17.1 : ক্যারোলাস লিনিয়াস

(Carolus Linnaeus, 1707-1778) হইলেন আধুনিক শ্রেণীবিন্যাসের জনক। তিনি সমগ্র জীবজগতের সম্পূর্ণ শ্রেণীবিন্যাস এবং দ্বি-পদ নামকরণের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ল্যামার্ক (Lamarck, 1744-1829), কুভিয়ার (Cuvier, 1769-1832), হেকেল (Haeckel, 1834-1911), রে ল্যাংকাস্টার (Ray Lanckestar 1847-1922) প্রমুখ বিজ্ঞানী শ্রেণীবিন্যাসের উপর আলোকপাত করেন। লিনিয়াসের পরবর্তীকালে যে সমস্ত বিজ্ঞানী উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাসের জন্য বিখ্যাত তাঁহারা হইলেন ক্যানডোল (Candolle, 1778-1841), জর্জ বেন্থাম (George Bentham, 1800-1884), জোসেফ ডালটন হুকার (Joseph Dalton Hooker, 1817-1911), এঙলার (Engler, 1844-1930), জন হাচিনসন (John Hutchinson, 1884)।

শ্রেণীবিন্যাসের প্রণালী

শ্রেণীবিন্যাসের প্রণালী প্রধানত তিন প্রকার। যথা—

1. কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস (Artificial Classification) : জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রেণীবিভাগ করা হইলে তাহাকে কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস বলে। কেবল বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রেণীবিন্যাসের জন্য নিকট আত্মীয় জীব অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর ভিন্ন ও একে অন্যের দূরবর্তী কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। থিওফ্রেসটাস হইতে শুরু করিয়া লিনিয়াস পর্যন্ত সকল বিজ্ঞানী এই শ্রেণীবিন্যাস প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন।

2. স্বাভাবিক শ্রেণীবিন্যাস (Natural Classification) : যখন স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া জীবের শ্রেণীবিন্যাস করা হয় তাহাকে স্বাভাবিক শ্রেণীবিন্যাস বলে। এই শ্রেণীবিন্যাসে কতকগুলি স্বাভাবিক লক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা ব্যতীত তাহাদের গঠনগত সম্পর্ক বিবেচনা করা হয়। তাই এইরূপ শ্রেণীবিন্যাসে জীবকে সনাক্ত করা ও জীবদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার আভাস পাওয়া যায়। জন রে হইতে বেন্থাম হুকার পর্যন্ত প্রত্যেক বিজ্ঞানী স্বাভাবিক শ্রেণীবিন্যাস প্রণালী অনুসরণ করেন।

3. জাতিজনি নির্দেশক শ্রেণীবিন্যাস (Phylogenetic Classification) : ইহা প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক পদ্ধতির অনুরূপ। যখন অভিব্যক্তিবাদের অনুক্রম (Sequence of Evolution) ও জাতিজনির উপর ভিত্তি করিয়া শ্রেণীবিন্যাস করা হয় তাহাকে জাতিজনি নির্দেশক শ্রেণীবিন্যাস বলে। এই প্রকার শ্রেণীবিন্যাসে জীবদের মধ্যে যে শুধু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার আভাস পাওয়া যায় তাহা নহে কিন্তু তাহাদের অভিব্যক্তির ধারা বা পারস্পরিক আত্মীয়তার যোগসূত্র সহজেই নির্দেশিত হয়।

শ্রেণীবিন্যাসের একক (Units of Classification): জীবজগতে জীবের স্থান নিরূপণের জন্য কতকগুলি একক ব্যবহৃত হয়। নামকরণের আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাসের প্রতিটি একককে ট্যাক্সন (Taxon) বলে। লিনিয়াস প্রবর্তিত শ্রেণীবিন্যাসে সাতটি ট্যাক্সা আছে। যথা—প্রজাতি, গণ, গোত্র, বর্গ, শ্রেণী, পর্ব ও রাজ্য। ইহাদের মধ্যে সর্বনিম্ন একক হইল প্রজাতি এবং সর্বোচ্চ একক হইল রাজ্য। নিম্নে ইহাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

প্রজাতি (Species): শ্রেণীবিন্যাসের মৌলিক একক হইল প্রজাতি। একটি প্রজাতি কেবল নিজেদের মধ্যে যৌন জননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। কিন্তু কখনও ইহারা অন্য প্রজাতির সহিত জননের জন্য মিলিত হয় না। মায়ার (Mayr, 1966)-এর মতে "প্রজাতি হইল এমন একটি প্রকৃত বা সম্ভাব্য অন্তঃপ্রজনন গুণ-সম্পন্ন (Interbreeding) প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠী যাহা অনুরূপ জীবগোষ্ঠী হইতে জননগতভাবে পৃথক।" *"Species are groups of actually or potentially interbreeding natural populations that are reproductively isolated from other such groups."* সুতরাং প্রজাতি এমন একটি প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠী যাহা কেবল নিজেদের মধ্যে প্রজনন কার্য করিতে পারে কিন্তু অন্য একটি প্রজাতির সহিত প্রজনন সম্পন্ন করিতে পারে না। কতিপয় ক্ষেত্রে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য উহার সীমা লঙ্ঘন করিয়া অন্য প্রজাতির সহিত যৌন জননে মিলিত হয়। যেমন—প্রাণীদের ক্ষেত্রে গাধা এবং ঘোটকীর যৌন মিলনে খচ্চর (Mule) জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ইহারা নির্বীজ (Sterile) এবং যৌন জনন সম্পন্ন করিতে পারে না বলিয়া প্রজাতি রূপে আখ্যা দেওয়া যায় না। অনুরূপভাবে, বাঘিনী এবং সিংহের যৌন মিলনে টাইগনের (Tigon) সৃষ্টি হইয়াছে। এইভাবে সৃষ্ট প্রাণীকে সংকর (Hybrid) বলে। প্রাণীর মত উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও এইরূপ অসংখ্য সংকর সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন—মূলা (*Raphanus sativum*) এবং বাঁধাকপির (*Brassica oleracea*) মিলনের ফলে র‍্যাফানোব্রাসিকা (Raphanobrassica) নামক সংকরের সৃষ্টি হয়। এই সংকর সাধারণত নির্বীজ হয়।

একই প্রজাতি ভুক্ত কিছু কিছু জীবের মধ্যে যদি কিছু বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তখন তাহাকে উপ-প্রজাতি (Sub-species) বলে।

আবার উপ-প্রজাতির কিছু জীবের বৈশিষ্ট্য পৃথক হইলে সেই জীবকে উক্ত উপ-প্রজাতির অধীনস্থ ভ্যারাইটি (Variety) হিসাবে অভিহিত করা হয়। উদাহরণ-স্বরূপ, সোনা ব্যাঙের (*Rana*) অধীনস্থ বিভিন্ন প্রজাতি হইল *pipiens, tigrina, fuscosa* প্রভৃতি। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। যেমন—অশ্বত্থ গাছের প্রজাতি *religiosa*, রবার গাছের প্রজাতি *elastica* ও বট গাছের প্রজাতি *benghalensis* দেখিতে আলাদা হইলেও উহাদের ফুলের গঠন এবং

প্রজননের বৈশিষ্ট্য মোটামুটি একই ধরনের হওয়ায় উহারা *Ficus* নামক একটি গণের অন্তর্ভুক্ত।

গণ (Genus): কতকগুলি প্রজাতি একত্রে মিলিয়া একটি গণের সৃষ্টি করে। কোন গণের অন্তর্ভুক্ত এক বা একাধিক প্রজাতি নিঃসন্দেহে একই বংশোদ্ভূত। উদাহরণস্বরূপ, সোনা ব্যাঙের উল্লিখিত প্রজাতিগুলি একত্রে মিলিয়া *Rana* নামক একটি গণের সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে, উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও *Ficus* গণের সৃষ্টি হইয়াছে।

গোত্র (Family): শ্রেণীবিন্যাসে কতকগুলি গণ মিলিয়া একটি গোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে এবং একটি গোত্র অপর একটি গোত্র হইতে বৈশিষ্ট্যগতভাবে পৃথক। যেমন—*Rana* গণ, *Xenopus* গণ, *Liopelma* গণ প্রভৃতি একত্রিত হইয়া Ranidae নামক একটি গোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও *Ficus* গণ, *Artocarpus* গণ, *Morus* গণ মিলিয়া Moraceae নামক একটি গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

বর্গ (Order): কতকগুলি গোত্র মিলিয়া একটি বর্গের সৃষ্টি হয়। প্রাণি-রাজ্যে Ranidae গোত্রের ন্যায় Bufonidae, Rhacophoridae প্রভৃতি গোত্র মিলিয়া Anura নামক বর্গ গঠন করে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও Moraceae গোত্রের ন্যায় Ulmaceae, Urticaceae প্রভৃতি গোত্র মিলিত হইয়া Urticales নামক বর্গের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রেণী (Class): কতকগুলি বর্গ মিলিয়া একটি শ্রেণীর সৃষ্টিহয়। উল্লিখিত Anura বর্গের ন্যায় Urodela বর্গ, Gymnophiona বর্গ একত্রিত হইয়া Amphibia বা উভচর শ্রেণী গঠিত হয়। তেমনি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে Urticales, Malvales, Anacardiales প্রভৃতি বর্গ লইয়া দ্বি-বীজপত্রী বা Dicotyledonae নামক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

পর্ব (Phylum): কতকগুলি শ্রেণী একত্রে একটি পর্ব গঠন করে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পর্ব না বলিয়া বিভাগ (Division) বলা হয়। যেমন—প্রাণীদের ক্ষেত্রে Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia প্রভৃতি শ্রেণী মিলিত হইয়া Chordata নামক পর্ব গঠন করে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দ্বি-বীজপত্রী বা Dicotyledons, একবীজপত্রী বা Monocotyledons লইয়া গুপ্তবীজী বা Angiosperms নামক বিভাগ (Division) গঠন করে।

রাজ্য (Kingdom): প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্ব লইয়া প্রাণিরাজ্য এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগ লইয়া উদ্ভিদরাজ্য গঠিত।

প্রজাতি	গণ	গোত্র	বর্গ	শ্রেণী	পর্ব
tigrina	*Xenopus*	Bufonidae	Urodela	Amphibia	
pipiens	*Rana*	Ranidae	Anura	Reptilia	Chordata
fuscosa	*Liopelma*	Rhacophoridae	Gymnophiona	Aves	
				Mammalia	

প্রাণিরাজ্যের এককগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের রূপরেখা

প্রজাতি	গণ	গোত্র	বর্গ	শ্রেণী	বিভাগ
religiosa	*Artocarpus*	Ulmaceae	Malvales	Monocotyledons	
elastica	*Ficus*	Moraceae	Urticales	Dicotyledons	Angiosperms
benghalensis	*Morus*	Urticaceae	Anacardiales		
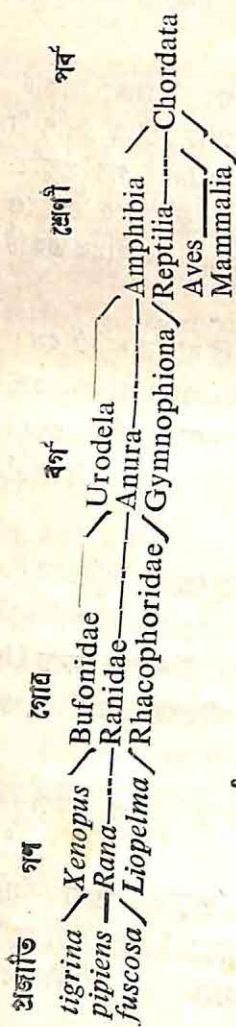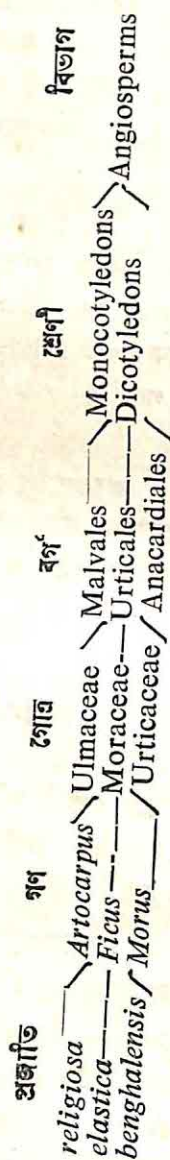
উদ্ভিদরাজ্যের এককগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের রূপরেখা

লিনিয়াস প্রবর্তিত শ্রেণীবিন্যাসের সাতটি ট্যাক্সা (Taxa) ব্যতীত জীবজগতে বহুল প্রচলিত শ্রেণীবিন্যাসে আরও কতকগুলি একক ব্যবহার করা হয় এই এককগুলির পারস্পরিক স্থান ও সম্বন্ধ নিম্নে ছকের আকারে উপস্থাপিত করা হইল।

অবরোহণ ↓ আরোহণ ↑

রাজ্য (Kingdom)
পর্ব/বিভাগ (Phylum/Division)
উপপর্ব/উপবিভাগ (Subphylum/Sub Division)
শ্রেণী (Class)
উপশ্রেণী (Sub class)
বর্গ (Order)
উপবর্গ (Sub order)
গোত্র (Family)
উপগোত্র (Sub family)
গণ (Genus)
উপগণ (Sub genus)
প্রজাতি (Species)
উপপ্রজাতি (Sub species)
ভ্যারাইটি (Variety)
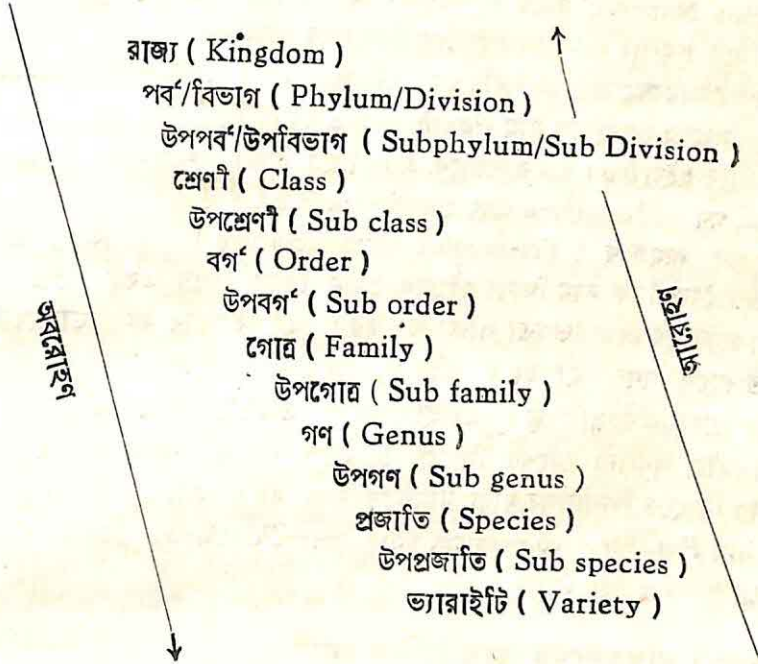
নামকরণ (Nomenclature) : গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিটি জীবকে পৃথক পৃথক নাম আরোপ করিয়া উহাদের প্রত্যেককে পরস্পর হইতে পৃথক করিবার রীতিকে **নামকরণ** বলে। উদ্ভিদরাজ্য ও প্রাণিরাজ্যের প্রতিটি প্রজাতির একটি করিয়া বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একটি উদ্ভিদ বা প্রাণীর নাম বিভিন্ন। এমন কি একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একই প্রজাতিকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে প্রাণীটি বাংলা ভাষায় 'বাঘ' নামে পরিচিত তাহা বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি হিন্দিভাষী এলাকায় 'শের' নামে পরিচিত। আবার ইহাকে ইংরাজী ভাষায় 'টাইগার' বলে। এই সব কারণে প্রত্যেকটি প্রজাতির জীবদের একটি নাম দেওয়া হয় যাহার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সেই বিশেষ নাম দ্বারা জীবটিকে চিনিতে পারে। সনাক্তকরণের সুবিধার জন্য এবং নামকরণের জটিলতা দূর করিবার জন্য প্রতিটি জীবের বিজ্ঞান সম্মত বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name) দেওয়া হইয়াছে। ল্যাটিন ভাষায় লিখিত এই নাম দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী তথা বিজ্ঞান অনুরাগীরা ঐ নির্দিষ্ট জীবটিকে সনাক্ত করিতে পারিবে।

দ্বি-পদ নামকরণ (Bi-nomial Nomenclature) : দুইটি পদ দ্বারা কোন জীবের বৈজ্ঞানিক নামকরণের রীতিকে দ্বি-পদ নামকরণ বলে। এই নাম ল্যাটিন ভাষায় লিখিতে হয়। দ্বি-পদ নামকরণের গুরুত্ব সর্বপ্রথম লিনিয়াস তাঁহার বিখ্যাত 'Systema Naturae' নামক পুস্তকের দশম সংস্করণে প্রকাশ করেন। সেইজন্য লিনিয়াসকে দ্বি-পদ নামকরণ তথা শ্রেণীবিন্যাসের জনক বলা হয়।

দ্বি-পদ নামকরণের প্রথম পদটি গণ (Genus) এবং দ্বিতীয় পদটি (Species)। যেমন—সিংহের বৈজ্ঞানিক নাম *Panthera leo*, ইহার মধ্যে গণ হইল *Panthera* এবং প্রজাতি হইল *leo*। অনুরূপভাবে, আমগাছের বিজ্ঞান সম্মত নাম—*Mangifera indica*, গণ—*Mangifera* এবং প্রজাতি—*indica*।

ত্রি-পদ নামকরণ (Tri-nomial Nomenclature) : অধিকাংশ প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম দ্বি-পদ হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে একই গণের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই ভিন্নতার জন্য তাহাদের উপ-প্রজাতি রূপে গণ্য করা হয়। এইজন্য তাহাদের নামকরণ তিনটি পদ দ্বারা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ—ভারতীয় সিংহের সহিত আফ্রিকার বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সিংহের চারিত্রিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই ভারতীয় সিংহকে তিনটি পদ দ্বারা নামকরণ করা হয়। ভারতীয় সিংহের বিজ্ঞান সম্মত নাম *Panthera leo persica*, ইহার গণ—*Panthera*, প্রজাতি—*leo* এবং উপ-প্রজাতি—*persica*।

জীবের নামকরণের আন্তর্জাতিক নিয়ম :

জীবজগতে প্রচুর সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণী বর্তমান এবং তাহাদের নামকরণ যদি আঞ্চলিক ভাষায় নামকরণ করা হয় তাহা হইলে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হবে। উপরন্তু বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী দ্বারা একই জীবের বিভিন্ন বিজ্ঞানসম্মত নাম অথবা বিভিন্ন জীবের একই বিজ্ঞানসম্মত নাম ব্যবহৃত হইতে থাকিলে যে সমস্যার সৃষ্টি হইবে তাহা কোন রকমে সমাধান হইবে না, যদি না সারা বিশ্বে একটি আন্তর্জাতিক নিয়ম প্রবর্তন করা যায়। এই জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য 1842 খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জীববিজ্ঞানীদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, 1901 খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাণিবিদ্যা মহাসভা (International Congress of Zoology)-র পঞ্চম অধিবেশনে প্রাণীদের বিজ্ঞানসম্মত নামকরণের জন্য নিয়মাবলী ঠিক করা হয়। ইহার পর বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে ছোট ছোট অনেক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অবশেষে 1958 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে লণ্ডনে পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক প্রাণিবিদ্যা মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত মহাসভা হইতে গৃহীত প্রামাণ্য দলিল 1961 খ্রীষ্টাব্দের 6ই নভেম্বর প্রকাশিত হয়। এই মহাসভায় প্রকাশিত নিয়মাবলী পরিশেষে 1963 খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠদশ অধিবেশনে সংশোধিত করা হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী প্রাণীদের নামকরণ

করা হয়। অনুরূপভাবে, উদ্ভিদবিদ্যার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উদ্ভিদবিদ্যা মহাসভা (International Commission of Botanical Nomenclature) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন।

নিয়মাবলীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

1. ক্যারোলাস লিনিয়াস কর্তৃক 'সিস্টেমা ন্যাচুরী' (Systema Naturae) দশম সংস্করণের প্রকাশ কাল 1758 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ব্যবহৃত কোন নাম গ্রাহ্য হইবে না।

2. উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী সম্পূর্ণ পৃথক। সেইজন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম এক হইতে কোন অসুবিধা নাই কিন্তু ব্যবহার না করাই বিধেয়।

3. দ্বি-পদ নামকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া জীবের নামকরণ সর্বদা দ্বি-পদ যুক্ত এবং উপ-প্রজাতি থাকিলে তাহা ত্রি-পদযুক্ত হইবে।

4. বিজ্ঞানসম্মত নাম সব সময় ল্যাটিন ভাষায় লিখিতে হইবে; ছাপা অবস্থায় বাঁকা অক্ষরে (Italics) এবং লেখার সময় নামটিকে নিম্নরেখ করা আবশ্যক।

5. গণ নামের প্রথম অক্ষর বড় হরফ দিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। প্রজাতি এবং উপপ্রজাতির নাম সর্বদা ছোট হরফে লিখিতে হইবে।

6. বিজ্ঞান সম্মত নামের শেষে বিজ্ঞানীর নাম লিখিত হইবে।

7. গণের নাম বিশেষ্য এবং প্রজাতির নাম বিশেষণ পদ হইবে।

8. দুইটি গণের নাম এক হইবে না অথবা একই গণের অন্তর্ভুক্ত দুইটি প্রজাতির নাম এক হইবে না।

9. যদি একটি জীবের নাম বিভিন্ন বিজ্ঞানী কর্তৃক ভিন্ন নামকরণ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে যিনি প্রথম নামকরণ করিয়াছেন তাঁহার দেওয়া নাম গৃহীত হইবে। এই আইনটিকে অগ্রাধিকার আইন (Law of Priority) বলে।

10. নামকরণের সময় জীবটির সম্পূর্ণ বা আংশিক চিত্রসহ বিশদ বর্ণনা কোন এক বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হইবে। যিনি ইহা প্রকাশ করিবেন তিনি নামকরণের স্রষ্টা হইবেন।

11. কয়েকটি জীবের মধ্যে যে জীবটির উপর চিত্র ও বর্ণনা দেওয়া হয় তাহা টাইপ স্পেসিমেন (Type Specimen) হিসাবে সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

নিম্নে কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম লিপিবদ্ধ করা হইল।

উদ্ভিদ

1. ধান—*Oryza sativa*
2. জবা—*Hibiscus rosa-sinensis*
3. বট—*Ficus benghalensis*
4. অশ্বত্থ—*Ficus religiosa*

প্রাণী

1. অ্যামিবা—*Amoeba proteus*
2. আরশোলা—*Periplaneta americana*
3. কুনো ব্যাঙ—*Bufo melanostictus*
4. চিংড়ি—*Palaemon carcinus*
5. শামুক—*Pila globosa*
6. রুইমাছ—*Labeo rohita*
7. কাতলা মাছ—*Catla catla*
8. মানুষ—*Homo sapiens*

বিষয়-সংক্ষেপ

বৈচিত্র্যময় জীবজগতে প্রচুর সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণীকে নির্দিষ্ট ও সহজ ভাবে চিনিবার জন্য ট্যাক্সোনোমি একান্ত প্রয়োজন। ট্যাক্সোনোমির মুল উদ্দেশ্য হইল বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে জীবের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে সনাক্তকরণ ও পরে নামকরণ করিয়া উহাদের উদ্ভিদ বা প্রাণিজগতের যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং জীব বিজ্ঞানের যে শাখায় বিজ্ঞানসম্মত আইন অনুযায়ী জীব জগতের শ্রেণীবিন্যাস, নামকরণ ও সনাক্তকরণ করা হয় তাহাকে ট্যাক্সোনোমি বলে। জীবের গোষ্ঠীভুক্ত করণের জন্য সিস্টেমেটিক্স ও শ্রেণীবিন্যাস—এই দুইটি পরিভাষা বা শব্দপ্রয়োগ করা হয়। জীবজগতের সমস্ত জীবের প্রকার ভেদ ও বৈচিত্র্য এবং উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করিবার পদ্ধতিকে সিস্টেমেটিক্স বলে। পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নিয়মে জীবকে গোষ্ঠীভুক্ত করণের পদ্ধতিকে শ্রেণীবিন্যাস বলে। এই তিনটি সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য এতই সূক্ষ্ম যে ইহাদের খুব সহজে পৃথক করা যায় না।

জীবজগতের শ্রেণীবিন্যাস বস্তুতপক্ষে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের সময় হইতে সুত্রপাত। তাঁহার পর অনেক জীববিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে জীব জগতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জীবের বিন্যস্ত করেন। তাঁহাদের মধ্যে সুইডিস বিজ্ঞান ক্যারোলাস লিনিয়াস হইলেন শ্রেণীবিন্যাসের জনক। শ্রেণীবিন্যাস প্রধানত তিন প্রকার পদ্ধতিতে করা হয়, যথা—কৃত্রিম, স্বাভাবিক এবং জাতিজনি নির্দেশক শ্রেণীবিন্যাস।

জীবজগতে জীবের স্থান নিরূপণের জন্য প্রজাতি হইল শ্রেণীবিন্যাসের একক। লিনিয়াস প্রবর্তিত শ্রেণী বিন্যাসে সাতটি ট্যাক্সা বিদ্যমান। ইহারা হইল প্রজাতি, গণ, গোত্র, বর্গ, শ্রেণী, পর্ব ও রাজ্য। ইহাদের মধ্যে সর্বনিম্ন একক হইল প্রজাতি এবং সর্বোচ্চ একক হইল রাজ্য। মায়ারের মতে প্রজাতি হইল এমন একটি প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠী যাহা অন্তঃপ্রজনন গুণ সম্পন্ন এবং অনুরূপ জীবগোষ্ঠী হইতে জননগতভাবে পৃথক।

লিনিয়াস সর্বপ্রথম ট্যাক্সোনোমিতে দ্বি-পদ নামকরণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। প্রতিটি জীবকে দুইটি পদের দ্বারা নামকরণ করিতে হয়। ইহার মধ্যে প্রথম পদটি হইল গণ এবং দ্বিতীয় পদটি হইল প্রজাতি। কিন্তু অধিকাংশ জীবের নাম দ্বি-পদযুক্ত হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে একই গণের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। এই ভিন্নতার জন্য তাহাদের উপ-প্রজাতিরূপে গণ্য করা হয়। এইজন্য তাহাদের নামকরণ তিনটি পদের দ্বারা করা হয়। এইরূপ নামকরণকে ত্রি-পদ নামকরণ বলে। জীবজগতে প্রচুর সংখ্যক জীবকে যদি আঞ্চলিক ভাষায় নামকরণ করা হয় তাহা হইলে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সারা বিশ্বে একটি আন্তর্জাতিক নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নামকরণ ও শ্রেণীবিন্যাস করা হয়।

প্রশ্নাবলী

A. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

1. ট্যাক্সোনমি, সিস্টেমেটিক্স, নামকরণ ও সনাক্তকরণ বলিতে কি বুঝ ?
2. শ্রেণীবিন্যাস কাহাকে বলে ? শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা কি ?
3. লিনিয়াসের শ্রেণীবিভাগে কয়টি ট্যাক্সা আছে এবং উহাদের নাম কি ?
4. প্রজাতির সংজ্ঞা দাও।
5. নিম্নলিখিত জীবের বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখ—
ধান, আম, জবা, আরশোলা, ব্যাঙ, চিংড়ি ও মানুষ।

B. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :—

1. শ্রেণীবিন্যাসের প্রধান এককগুলি কি কি ? শ্রেণীবিন্যাসের বিভিন্ন প্রণালী বর্ণনা কর।
2. দ্বি-পদ নামকরণ কাহাকে বলে ? এই ধরনের নামকরণের গুরুত্ব কি ? দ্বি-পদ নামকরণের আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী উল্লেখ কর।

অষ্টাদশ অধ্যায় / বাস্তুতন্ত্র, সংরক্ষণ, দূষণ (Ecosystem, Conservation, Pollution)

18.1 সূচনা (Introduction): কোন বসতিস্থানে প্রাণী ও উদ্ভিদের পারস্পরিক এবং তাহাদের সহিত পরিবেশের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনাকে বাস্তুসংস্থান বা ইকোলজি বলে। ইকোলজি (Ecology) শব্দটি গ্রীক শব্দ Oikos=house=বাসস্থান, logos=knowledge=জ্ঞান অর্থাৎ ইকোলজির অর্থ হইল বাসস্থান সম্পর্কে জ্ঞান। 1869 খ্রীষ্টাব্দে হেকেল (E. Haeckel) ইকোলজি কথাটি প্রথম প্রণয়ন ও তাহার ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার মতে পরিবেশে অজৈব ও জৈব বস্তুর সহিত জীবজগতের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সম্পর্কের ফলে পরিবেশে একটি বসতিস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ইহাই ইকোলজির প্রতিপাদ্য বিষয়।

পরিবেশ জড় ও জীবজগৎ লইয়া গঠিত। আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক দেখিতে না পাইলেও উভয় জগতের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

তাই একটি নির্দিষ্ট স্থানের বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর সহিত জড় বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে একটি বসতিস্থান গড়িয়া উঠে। ইহার কোন একটি উপাদানের অভাব হইলে ঐ নির্দিষ্ট স্থানের প্রাকৃতিক সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহার ফল হয় মারাত্মক। ইহাতে জীবের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে।

18.2 বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Ecosystem):

ট্যান্সলে (Tansley) 1935 খ্রীষ্টাব্দে বাস্তুতন্ত্র শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন এবং সেই সঙ্গে বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা ও তাহার ব্যাখ্যা বিশদভাবে প্রকাশ করেন। ইহার পরবর্তী পর্যায়ে টেলর (Taylor, 1936), এলটন (Elton, 1946), ক্লার্ক (Clark, 1954), উডবারি (Woodbury, 1954), এন্ড্রুওয়ার্থা (Andrewartha, 1961), কেনডাই (Kendeigh, 1961), ওডাম (Odum, 1963) প্রভৃতি বাস্তব্য বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা করেন।

কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের জীবগোষ্ঠীর বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক এবং ঐ স্থানের জড় উপাদানগুলির সহিত মিথঃক্রিয়ায় যে অনুকূল বাসস্থান গড়িয়া উঠে তাহাকে বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) বলে।

বিজ্ঞানী ওডামের মতানুসারে "বাস্তুতন্ত্র হইল বাস্তুসংস্থানের একটি প্রাথমিক একক যাহা জীব ও জড় পরিবেশ লইয়া গঠিত এবং একে অপরের উপর প্রভাবশীল ও উভয়েই জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক।"

বাস্তুতন্ত্র

↗ ↖

জীবগোষ্ঠী ⇌ অজৈব পরিবেশ

18.3 বাস্তুতন্ত্রের কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা :

1. **পরিবেশ (Environment) :** কোন জীবের পারিপার্শ্বিক ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থা এবং সজীব উপাদানসমূহকে সামগ্রিকভাবে **পরিবেশ** বলে।

2. **বাসস্থান (Habitat) :** কোন জীবের বা জীবগোষ্ঠীর পারিপার্শ্বিক ভৌত ও রাসায়নিক পরিবেশ বা অবস্থাকে তাহার **বাসস্থান** বলে।

3. **জীবমণ্ডল (Biosphere) :** পৃথিবীর জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে যেখানে জীব বসবাস করিতে পারে তাহাকে **জীবমণ্ডল** বলে। জীবমণ্ডল তিনটি মণ্ডল লইয়া গঠিত। যথা—জলমণ্ডল, অশ্বমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডল।

4. **জলমণ্ডল (Hydrosphere) :** সমুদ্র, নদ-নদী বা ভূপৃষ্ঠ হইতে নিচের দিকে যে গভীরতা পর্যন্ত জল বিদ্যমান তাহাকে **জলমণ্ডল** বলে।

5. **অশ্বমণ্ডল (Lithosphere) :** ভূপৃষ্ঠ হইতে নিচের দিকে খনিজ পদার্থপূর্ণ যে স্তর বিদ্যমান তাহাকে **অশ্বমণ্ডল** বলে।

6 **বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) :** সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় 1,600 কিলোমিটার ঊর্ধ্বে যে গ্যাসীয় মণ্ডল বিরাজমান তাহাকে **বায়ুমণ্ডল** বলে।

7. **বাস্তব্য মণ্ডল (Ecosphere) :** বায়ুমণ্ডল, জলমণ্ডল এবং অশ্বমণ্ডল স্থিত বিভিন্ন জড় পদার্থের আদান প্রদান এবং জীবদের সহিত পারস্পরিক সম্পর্ককে **বাস্তব্যমণ্ডল** বলে।

8. **বায়োম (Biome) :** বাস্তব্যমণ্ডলের প্রত্যেকটি জীবমণ্ডল বিভিন্ন জলবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জীবমণ্ডলকে **বায়োম** বলে।

9. **জীবভর বা বায়োমাস (Biomass) :** কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীবিত উদ্ভিদ ও প্রাণীর মোট ওজনকে **জীবভর** (Biomass = living weight) বলে।

10. **পপুলেশন (Population) :** কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে একই প্রজাতিভুক্ত জীবের সমষ্টিকে **পপুলেশন** বলে।

11. **কমিউনিটি (Community) :** কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন প্রকারের পপুলেশন থাকিতে পারে। এই সম্মিলিত পপুলেশনকে একত্রে **কমিউনিটি** বলে। এই কমিউনিটিতে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর পপুলেশন থাকিতে পারে। যখন উদ্ভিদ পপুলেশন থাকে তখন **উদ্ভিদ কমিউনিটি** বলে। আবার যখন প্রাণী পপুলেশন থাকে তখন **প্রাণী কমিউনিটি** বলে।

12. **বায়োটিক কমিউনিটি (Biotic Community) :** কোন নির্দিষ্ট স্থানে উদ্ভিদ ও প্রাণী কমিউনিটির একত্রিত বাসস্থানকে **বায়োটিক কমিউনিটি** বলে।

13. **অট্ইকোলজি (Autecology) :** একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির ইকোলজি আলোচনাকে **অট্ইকোলজি** বলে। উদাহরণস্বরূপ, কুনো ব্যাঙ কোন্ পরিবেশে বসবাস করে, কি খায়, ইহাদের খাদ্যরূপে কাহারা ভক্ষণ করে, ঐ পরিবেশে অন্যান্য জীবের সহিত কিরূপ সম্পর্ক প্রভৃতি আলোচনা অট্ইকোলজির অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করে।

14. সিন্ইকোলজি (Synecology): একটি নির্দিষ্ট স্থানে সকল জীব-গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করাকে সিন্ইকোলজি বলে। যেমন—একটি পুষ্করিণী, একটি অরণ্যের ইকোলজির পর্যালোচনাই সিন্ইকোলজির কাজ।

15. নিস্ (Niche): ইকোসিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত কোন জীবের কার্যকরী ভূমিকাকে নিস্ বলে। অর্থাৎ ইকোসিস্টেমে কোন একটি জীব কোন্ পুষ্টিস্তরে অন্তর্ভুক্ত তাহা 'নিস'-এর আলোচনার বিষয়বস্তু।

বাস্তুতন্ত্রের উপাদান (Components of Ecosystem)
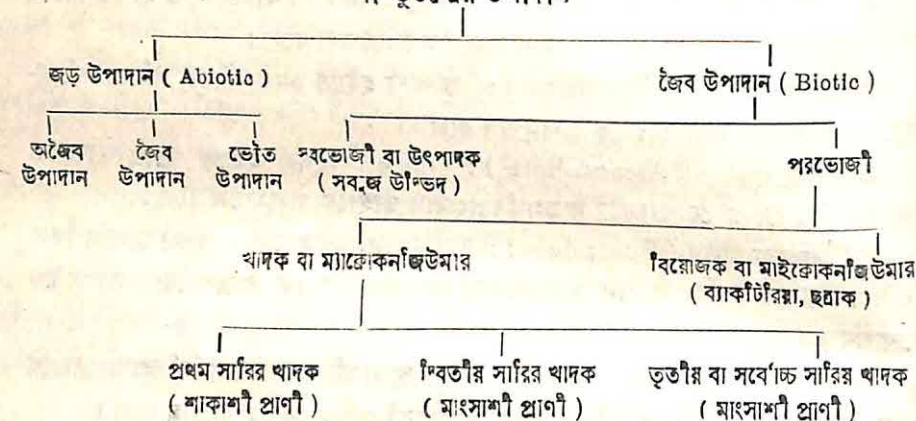
বাস্তুতন্ত্র জড় ও জৈব উপাদান লইয়া গঠিত। ইহারা আবার নিম্নলিখিত উপাদান লইয়া গঠিত।

A. জড় উপাদান (Abiotic Components): প্রকৃতিতে জড় উপাদানের মধ্যে কোন জীবনের লক্ষণ নাই। ইহা নিম্নরূপ :—

(i) অজৈব (Inorganic): মাটি, জল, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং বিভিন্ন খনিজ লবণ যথা ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতির লবণ অজৈব বা জড় উপাদান। সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করিবার সময় ইহাদের ব্যবহার করে।

(ii) জৈব (Organic): প্রাণিজাত কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ইউরিয়া, হিউমাস প্রভৃতি জৈব উপাদান। ছত্রাক প্রভৃতি আণুবীক্ষণিক জীব মৃত জীবদেহের উপর ক্রিয়া করিয়া এই সমস্ত জৈব উপাদান উৎপন্ন হয়। সুতরাং সজীব উপাদান এবং জড় উপাদানের মধ্যে জৈব পদার্থ যোগসূত্র স্থাপিত করে।

(iii) ভৌত (Physical): বাস্তুতন্ত্রে প্রধান ভৌত উপাদান হইল সৌরশক্তি। পৃথিবীর সমস্ত জীবগোষ্ঠীর শক্তির উৎস এই সৌরশক্তি। ইহা ছাড়া তাপ, আলো, বাতাস প্রভৃতি ভৌত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত।

B. জৈব উপাদান (Biotic Components) : পরিবেশে জীব সম্প্রদায়কে জৈব উপাদানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

1. স্বভোজী বা উৎপাদক (Producers) : যে সমস্ত সবুজ উদ্ভিদ প্রকৃতির অজৈব উপাদান এবং সৌরশক্তির সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেরা খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে তাহাদের স্বভোজী বা উৎপাদক বলে। সুতরাং সমস্ত সবুজ উদ্ভিদকেই উৎপাদক বলে। আকৃতি অনুযায়ী উৎপাদক দুইভাগে বিভক্ত।

(a) ফাইটোপ্ল্যাংকটন : জলে একপ্রকার আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ জন্মায় যাহারা জলের স্রোতে একস্থান হইতে অন্যস্থানে ভাসিয়া বেড়ায় তাহাদের ফাইটোপ্ল্যাংকটন* (Phytoplankton) বলে। জলের যে স্তর পর্যন্ত সূর্যালোক প্রবেশ করে সেই স্তর পর্যন্ত ফাইটোপ্ল্যাংকটন দেখা যায়।

(b) দ্বিতীয় প্রকার উৎপাদকগুলি হইল স্থলের এবং জলাশয়ের বড় আকৃতির উদ্ভিদ।

2. পরভোজী (Heterotroph) : ইহা খাদক বা ম্যাক্রোকনজিউমার এবং বিয়োজক বা মাইক্রোকনজিউমার লইয়া গঠিত।

(ক) খাদক (Macro-consumer) : যে সমস্ত জৈব সম্প্রদায় উৎপাদককে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়া বাঁচিয়া থাকে তাহাদের খাদক বলে। সুতরাং খাদককে পরভোজী জীবগোষ্ঠী হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়। প্রধানত প্রাণিকুল খাদক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল খাদক স্থলে বসবাস করে তাহাদের স্থলজ খাদক এবং যাহারা জলে বসবাস করে তাহাদের জলজ খাদক বলে। জীবন যাপনের প্রকৃতি অনুযায়ী জলজ খাদককে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

(a) জুপ্ল্যাংকটন (Zooplankton) : জলে ভাসমান একপ্রকার আণুবীক্ষণিক প্রাণীকে জুপ্ল্যাংকটন বলে। জুপ্ল্যাংকটন ফাইটোপ্ল্যাংকটনকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। যেমন—ডাফনিয়া, সাইক্লপস্, কবচী প্রাণীর লার্ভা প্রভৃতি।

(b) নেকটন (Nekton) : যে সমস্ত জলজ প্রাণী সাঁতার কাটিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের নেকটন বলে। যেমন—মাছ, হাঙ্গর, উভচর, তিমি, জলজ পতঙ্গ ইত্যাদি।

(c) নিউস্টন (Neuston) : যে সমস্ত জলজ প্রাণী জলের উপরিতলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায় অথবা শরীরের কিছু অংশ জলের উপরিস্তরে এবং কিছু অংশ জলের নিম্নস্তরে রাখিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের নিউসটন বলে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু মাকড়সা, স্প্রিং টেল, জলজ বিট্‌ল, জলজ পতঙ্গ প্রভৃতি।

---

* Plankton গ্রীক শব্দ—ইহার অর্থ হইল ঘুরিয়া বেড়ান।

(d) **বেন্থস** (Benthos): যে সমস্ত জীব জলাশয়ের নিম্নতলে বসবাস করে তাহাদের বেন্থস বলে। যেমন—শামুক, ঝিনুক, স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণী।

খাদ্য স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া খাদককে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(i) **প্রথম সারির খাদক** (Primary Consumers): যে সকল খাদক জৈব খাদ্যের জন্য উৎপাদকদের প্রত্যক্ষভাবে ভক্ষণ করিয়া জৈব খাদ্য সংগ্রহ করে তাহাদের প্রথম সারির খাদক বলে। যেহেতু এই সমস্ত প্রাণী প্রত্যক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদকে ভক্ষণ করে সেইজন্য ইহাদের শাকাশী (Herbivores) প্রাণি বলে। উদাহরণস্বরূপ গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, খরগোস বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ ইত্যাদি স্থলের প্রথম সারির খাদক। অন্যদিকে ডাফনিয়া সাইক্লপস্, শামুক প্রভৃতি জলের প্রথম সারির খাদক।

(ii) **দ্বিতীয় সারির খাদক** (Secondary Consumers): প্রাণিকুলের মধ্যে যে সমস্ত প্রাণী জীবন ধারণের জন্য প্রথম সারির খাদককে ভক্ষণ করে তাহাদের দ্বিতীয় সারির খাদক বলে। সুতরাং ইহাদের মাংসাশী (Carnivores) প্রাণী বলে। কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, নেকড়ে, ব্যাঙ, কাক ইত্যাদি স্থলের দ্বিতীয় সারির খাদক ; ছোট ছোট মাছ, জলজ পতঙ্গ, জলজ চিংড়ি প্রভৃতি জলের দ্বিতীয় সারির খাদক।

(iii) **তৃতীয় সারির খাদক** (Tertiary Consumers) : অনুরূপভাবে দ্বিতীয় সারির খাদককে যে সকল প্রাণী ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে তাহাদের তৃতীয় সারির খাদক বলে। উদাহরণস্বরূপ বাঘ, সিংহ, বাজপাখী, শকুন, সাপ ইত্যাদি স্থলের খাদক ; আবার বড় মাছ, সাপ, বক প্রভৃতি জলের তৃতীয় সারির খাদক। এই সারির খাদককে সর্বোচ্চ সারির খাদক বলা যাইতে পারে।

(iv) **বিয়োজক বা পরিবর্তক** (Decomposers or Transformers): যে সকল আণুবীক্ষণিক জীব উৎপাদক ও খাদকের মৃত জীবদেহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া জটিল জৈব উপাদানকে সরল জৈব এবং অজৈব পদার্থে বিয়োজিত করে তাহাদের বিয়োজক বা পরিবর্তক বলে। সাধারণত ব্যাক্‌টিরিয়া, ছত্রাক এবং আণুবীক্ষণিক জীব বিয়োজককারী হিসাবে পরিচিত। এই বিয়োজক উৎপাদকের খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials) সরবরাহ করে বলিয়া বাস্তুতন্ত্রে ইহারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। মৃত জীবদেহে পচন ক্রিয়ায় বিশ্লিষ্ট কিছু কিছু উপাদান বিয়োজকরা নিজেদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে এবং অবশিষ্ট জটিল জৈব যৌগগুলিকে সরলীকৃত করিয়া স্বভোজী উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য সরবরাহ করে। অবশেষে এই সকল পদার্থ বিভিন্ন উৎপাদক কর্তৃক গৃহীত হয় এবং উক্ত পদার্থসমূহ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

18.4 **বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদ** (Types of Ecosystem): প্রকৃতির পরিবেশ অনুসারে বাস্তুতন্ত্র প্রধানত দুই প্রকার। যথা—1. **জলজ বাস্তুতন্ত্র** (Aquatic Ecosystem) এবং 2. **স্থলজ বাস্তুতন্ত্র** (Terrestrial Ecosystem)।

নিম্নে একটি জলজ এবং একটি স্থলজ বাস্তুতন্ত্র আলোচিত হইল।

1 জলজ বাস্তুতন্ত্র (Aquatic Ecosystem): জলের প্রকৃতি অনুযায়ী ইহা দুই প্রকার। স্বাদুজলের বাস্তুতন্ত্র (পুষ্করিণী, নদী, হ্রদ প্রভৃতি) এবং সামুদ্রিক জলের বাস্তুতন্ত্র।
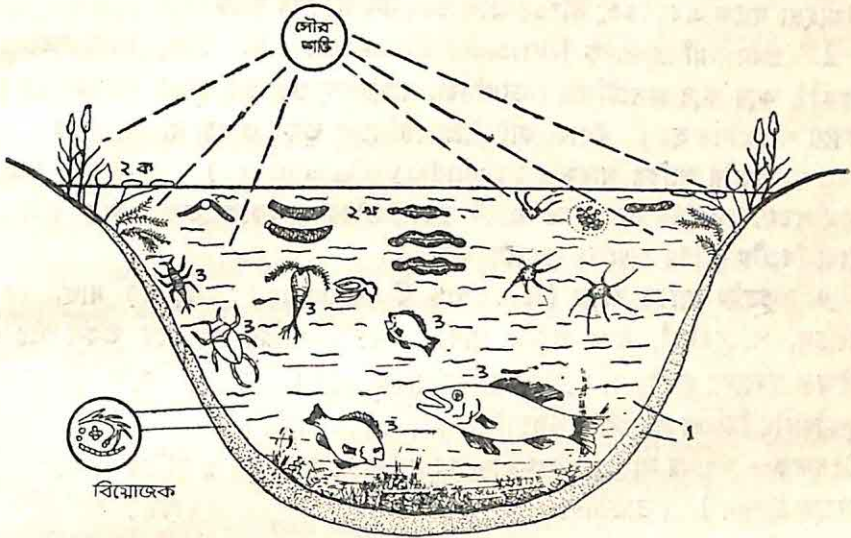
চিত্র 18.1: একটি পুষ্করিণীর বাস্তুতন্ত্র, ১ = জল এবং পঙ্ক, ২ক = জলজ উদ্ভিদ, ২খ = ভাসমান উদ্ভিদ, ৩ = বিভিন্ন প্রকার খাদক

পুষ্করিণীর বাস্তুতন্ত্র (Pond Ecosystem): একটি পুষ্করিণীর বাস্তুতন্ত্র নিম্নলিখিত উপাদান লইয়া গঠিত।

A **অজৈব উপাদান** (Abiotic Components): পুষ্করিণীর বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন অজৈব (Inorganic) এবং জৈব (Organic) যৌগের সমন্বয়ে অজৈব উপাদান গঠিত। সূর্যালোক, জল, মাটি, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, হিউমিক অ্যাসিড প্রভৃতি জড় পদার্থ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত জড় পদার্থগুলি জলজ উদ্ভিদের পুষ্টি যোগায়।

B. **জৈব উপাদান** (Biotic Components): পুষ্করিণীর বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার জৈব উপাদান থাকে। যেমন—

I উৎপাদক (Producers): জলের অজৈব উপাদান এবং সূর্যালোকের সহায়তায় ইহারা খাদ্যপ্রস্তুত করে। পুষ্করিণীর জলে দুই প্রকার উৎপাদক দেখিতে পাওয়া যায়।

(i) জলে একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ভাসিয়া বেড়ায় যাহা ফাইটোপ্ল্যাংকটন (Phytoplankton) নামে পরিচিত। ভাসমান আণুবীক্ষণিক

শৈবাল ইহার অন্তর্ভুক্ত। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জলের যে গভীরতা পর্যন্ত সূর্যালোক প্রবেশ করিতে পারে সেই গভীরতা পর্যন্ত ফাইটোপ্ল্যাংকটন পাওয়া যায়।

(ii) বৃহদাকার উদ্ভিদগুলি অপেক্ষাকৃত কম জলের নিচে মাটিতে মূল দ্বারা আটকাইয়া থাকে এবং কিছু উদ্ভিদ জলে ভাসমান অবস্থায় থাকে।

2. **প্রথম সারির খাদক** (Primary Consumers) : কিছু জলজ পতঙ্গের শূককীট, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রাসটেসিয়া (ডাফনিয়া, সাইক্লপস্ প্রভৃতি) প্রথম সারির খাদক পর্যায়ে পরিগণিত হয়। ইহারা ফাইটোপ্ল্যাংকটনদের ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে।

3 **দ্বিতীয় সারির খাদক** (Secondary Consumers) : ছোট ছোট মাছ, জলজ পতঙ্গ, জলজ চিংড়ি প্রভৃতি প্রাণী প্রথম সারির খাদককে ভক্ষণ করে বলিয়া ইহারা দ্বিতীয় সারির খাদকের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত।

4. **তৃতীয় সারির খাদক** (Tertiary Consumers) : বড় বড় মাছ, বক, গাংচিল, পানকৌড়ী, সাপ প্রভৃতি প্রাণীরা দ্বিতীয় সারির খাদককে ভক্ষণ করে। সেইজন্য ইহাদের তৃতীয় বা সর্বোচ্চ সারির খাদক বলে। সুতরাং নিম্নলিখিত ছকে পুষ্করিণীর বিভিন্ন খাদকদের উপস্থাপিত করা যাইতে পারে।

উৎপাদক → প্রথম সারির খাদক → দ্বিতীয় সারির খাদক → তৃতীয় সারির খাদক
(সবুজ উদ্ভিদ) (ডাফনিয়া) (ছোট মাছ) (বক)

5. **বিয়োজক** (Decomposers) : সাধারণত জলের মধ্যে বা মাটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি আণুবীক্ষণিক জীব বিদ্যমান। উদ্ভিদ বা প্রাণীর মৃতদেহ জলের নিচে পতিত হইলে এই সমস্ত ব্যাক্‌টিরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি বিয়োজক হিসাবে কার্য করে। উহারা মৃত জীবদেহের পচনক্রিয়া সংঘটিত করিয়া বিভিন্ন প্রকার জৈব ও অজৈব পদার্থ মুক্ত করে যাহা পুনরায় জলজ উদ্ভিদ এবং ফাইটোপ্ল্যাংকটন খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

II. **স্থলজ বাস্তুতন্ত্র** (Terrestrial Ecosystem) :

স্থলজ বাস্তুতন্ত্র বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন—অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র (Forest Ecosystem), তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র (Grassland Ecosystem), মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র (Desert Ecosystem), কৃত্রিম বাস্তুতন্ত্র (Artificial Ecosystem), কৃত্রিম বাস্তুতন্ত্র সাধারণত শস্যক্ষেত্র এবং উদ্যান প্রভৃতি।

নিম্নে একটি অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র আলোচনা করা হইল।

অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র (Forest Ecosystem) : অন্যান্য বাস্তুতন্ত্রের ন্যায় ইহাও অজৈব এবং জৈব উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত।

A **অজৈব উপাদান** (Abiotic Components) : সূর্যালোক, মৃত্তিকাস্থিত জৈব ও অজৈব পদার্থ, বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন প্রভৃতি অজৈব উপাদানের অন্তর্ভুক্ত।

B. জৈব উপাদান (Biotic Components): একটি অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র বিভিন্ন প্রকার জৈব উপাদান লইয়া গঠিত।

(i) উৎপাদক (Producers): অরণ্যের সমস্ত রকমের সবুজ উদ্ভিদ উৎপাদকের ভূমিকা গ্রহণ করে। অরণ্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ জন্মায়। তাহাদের মধ্যে বৃহদাকার উদ্ভিদ, বিরুৎ জাতীয় গুল্ম শ্রেণীর উদ্ভিদ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতির অজৈব উপাদান ও সৌরশক্তির সহায়তায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করে।

(i) প্রথম সারির খাদক (Primary Consumers): বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, খরগোস, জিরাফ প্রভৃতি প্রাণী জীবনধারণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এইজন্য ইহারা প্রথম সারির খাদক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত।

(iii) দ্বিতীয় সারির খাদক (Secondary Consumers): দ্বিতীয় সারির খাদক প্রথম সারির খাদককে ভক্ষণ করে। ইহাদের মধ্যে নেকড়ে, শৃগাল, সাপ, বন্যশূকর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(iv) তৃতীয় সারির খাদক (Tertiary Consumers): তৃতীয় বা সর্বোচ্চ সারির ভক্ষক হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চ শ্রেণীর মাংসাশী প্রাণীদের দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বাঘ, সিংহ, বাজপাখী, শকুন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার খাদককে নিম্নলিখিত ছকে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে।

উৎপাদক → প্রথম সারির খাদক → দ্বিতীয় সারির খাদক → তৃতীয় সারির খাদক
(উদ্ভিদ) (হরিণ) (নেকড়ে) (সিংহ)

(v) বিয়োজক (Decomposers): বিভিন্ন প্রকার ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক অরণ্যের মাটিতে বর্তমান। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ মাটিতে পতিত হইলে এই বিয়োজকগুলি শটনে সহায়তা করে এবং বিয়োজন ঘটায়।

18.5 খাদ্য শৃঙ্খল (Food chain): উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যেক বাস্তুতন্ত্রে স্বভোজী (Autotrophs) এবং পরভোজী (Hetero trophs) জীব বসবাস করে। স্বভোজী জীব বসতিস্থানের কাঁচামালের (Raw materials) উপর নির্ভরশীল। এই কাঁচামাল এবং সূর্যালোকের সহায়তায় স্বভোজী উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে নিজেরা খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সূর্যালোক জীব সম্প্রদায়ের একমাত্র শক্তির উৎস। পুষ্টির জন্য পরভোজী জীব স্বভোজী উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এইপ্রকার সম্বন্ধ হইতে সৃষ্টি হয় খাদ্য খাদক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্ক হইতে পুনরায় সৃষ্টি হয় খাদ্য শৃঙ্খলের। সুতরাং উৎপাদক হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন সারির খাদকের মধ্যে যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক এবং ক্রমিক পর্যায়ে শক্তি প্রবাহিত হয় তাহাকে খাদ্য শৃঙ্খল (Food chain) বলে। প্রতিটি বাস্তুতন্ত্রে জৈবখাদ্য উৎপাদক হইতে বিভিন্ন সারির খাদকে ক্রমপর্যায়ে চালিত হয়। পক্ষান্তরে,

সারির খাদকের সংখ্যা অনেক কম হয় কিন্তু আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত বড় হয়। এইভাবে উৎপাদক হইতে তৃতীয় সারির খাদক পর্যন্ত যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই
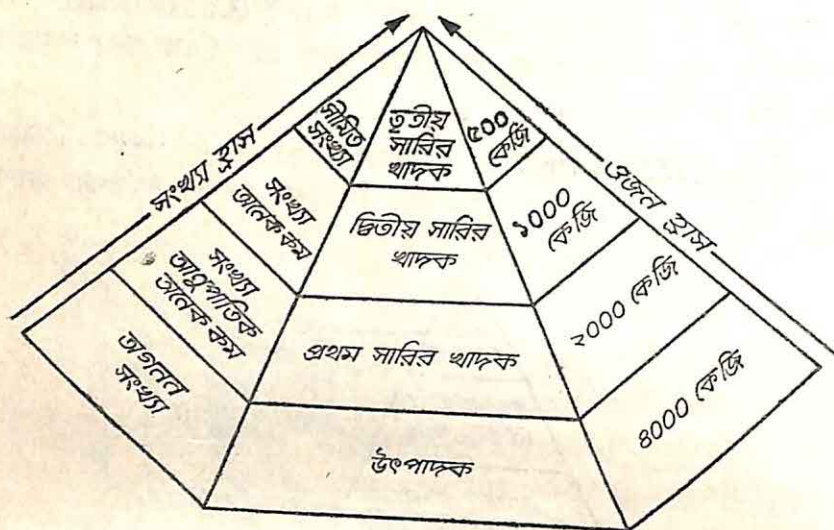
চিত্র 18.4 : বাস্তুসংস্থানের পিরামিড

ইহাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতে থাকে কিন্তু আকৃতি পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

2. **শক্তির পিরামিড** (Pyramid of energy) : সংখ্যার পিরামিডের ন্যায় শক্তির পিরামিডেও সর্বনিম্ন হইতে সর্বশীর্ষে অবস্থিত যথাক্রমে উৎপাদক, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সারির খাদক পর্যন্ত শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

স্বভোজী উদ্ভিদেরা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৌরশক্তি সংগ্রহ করিয়া রাসায়নিক যৌগের মধ্যে স্থিতিশক্তি হিসাবে সঞ্চিত করিয়া রাখে। এই শক্তির কিছু পরিমাণ উদ্ভিদের বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ায় ব্যয়িত হয় এবং তাপশক্তিরূপে নির্গত হয়। অবশিষ্ট শক্তি উৎপাদকের মধ্যে সঞ্চিত থাকে এবং যখন উৎপাদককে প্রথম সারির খাদক ভক্ষণ করে তখন এই অবশিষ্ট শক্তি প্রথম সারির খাদকের দেহে পরিবাহিত হয়। এই শক্তির কিছু অংশ প্রথম সারির খাদকের বিপাকীয় ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় এবং তাপশক্তি রূপে নির্গত হয়। অবশিষ্ট শক্তি দ্বিতীয় সারির খাদকের দেহে পরিবাহিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদকের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি থাকে তাহার কম পরিমাণ শক্তি প্রথম সারির খাদকে পরিবাহিত হয় এবং আরও কম পরিমাণ শক্তি দ্বিতীয় সারির খাদকে পরিবাহিত হয়। এইভাবে সর্বোচ্চ সারির খাদকে খুব সামান্য পরিমাণ শক্তি পরিবাহিত হইবে।

অতএব খাদ্য শৃঙ্খলের উৎপাদক হইতে সর্বোচ্চ সারির খাদক পর্যন্ত প্রতি খাদ্যস্তরে শক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতে থাকে।

3. জীবভরের পিরামিড (Pyramid of biomass) : কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীবিত উদ্ভিদ ও প্রাণীর মোট ওজনকে **জীবভর** (Biomass = living weight) বলে। উপরি-উক্ত দুইটি পিরামিডের ন্যায় **জীবভরের পিরামিডেও** উৎপাদক হইতে সর্বোচ্চ সারির খাদক পর্যন্ত প্রতিটি খাদ্যস্তরের জীবভর ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতে থাকে।

18.7 বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ (Energy flow in Ecosystem) : সূর্য বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন পুষ্টিস্তরে বসবাসকারী জীবদেহে একমাত্র শক্তির উৎস। সমস্ত সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে স্থৈতিক শক্তিরূপে জৈব খাদ্যে আবদ্ধ করিয়া
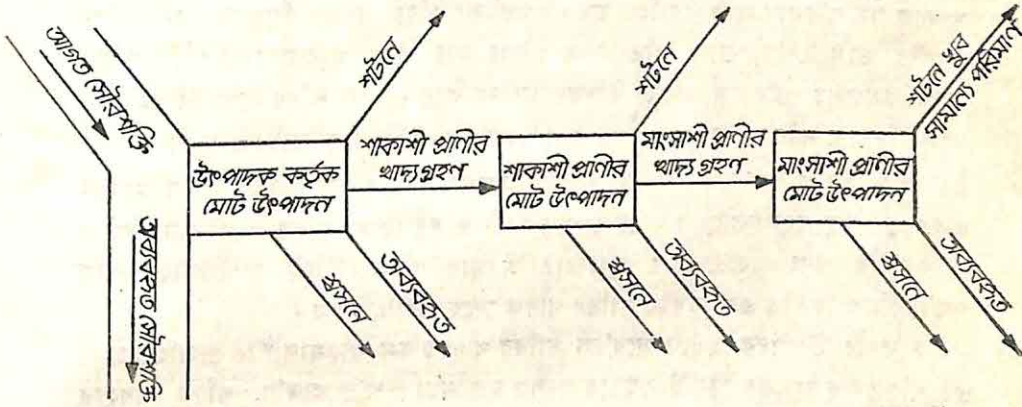
চিত্র 18.5 : বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ

রাখে। বাস্তুতন্ত্রে প্রথম সারির খাদক হইতে সর্বোচ্চ সারির খাদক পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এক পুষ্টিস্তর হইতে পরবর্তী পুষ্টিস্তরে শক্তি স্থানান্তরিত হয়। পরিশেষে মৃত উৎপাদক ও খাদকের দেহ পচনের ফলে সৃষ্ট জৈব পদার্থ বিয়োজকের দেহে স্থানান্তরিত হয় এবং বিয়োজকের দেহে এই শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। অর্থাৎ উৎপাদকের দেহে আবদ্ধ শক্তি বাস্তুতন্ত্রে চক্রাকারে আবর্তিত হইতে পারে না। সুতরাং বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন পুষ্টিস্তরে বসবাসকারী জীবদেহে সৌরশক্তির এইরূপ অনাবর্তক স্থানান্তরকে **শক্তিপ্রবাহ** (Energy flow) বলে। উৎপাদক সৌরশক্তি বা আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করিবার সময় এবং এক পুষ্টিস্তর হইতে পরবর্তী পুষ্টিস্তরে শক্তির স্থানান্তরের সময় কিছু শক্তি বিনষ্ট হয়।

বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ তাপগতিবিদ্যার (Thermodynamics) প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রটি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। প্রথম সূত্রটি হইল "শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না কিন্তু শক্তিকে এক রূপ হইতে অন্য রূপে রূপান্তরিত করা যায়।" এই সূত্রানুযায়ী সবুজ উদ্ভিদ সূর্য হইতে আলোক শক্তিকে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে রাসায়নিক শক্তিরূপে রূপান্তরিত করে। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি হইল "এক শক্তি যখন অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তখন রূপান্তরিত হইবার প্রয়োজনে কিছু শক্তির অপচয় ঘটিয়া

থাকে।" বাস্তুতন্ত্রে এই সূত্রটিও সমভাবে প্রযোজ্য কারণ সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে সবুজ উদ্ভিদ যে পরিমাণ আলোক শক্তি গ্রহণ করে সেই পরিমাণ রাসায়নিক শক্তি সৃষ্টি হয় না। কারণ উহার কিছু অংশ তাপশক্তিরূপে নির্গত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উৎপাদক যে পরিমাণ সৌরশক্তি সঞ্চয় করে তাহা সর্বোচ্চ সারির খাদক পর্যন্ত প্রতিটি খাদ্যস্তরে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতে থাকে। বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক হইতে সর্বোচ্চ সারির খাদক পর্যন্ত প্রত্যেকটি খাদ্যস্তরে শক্তি একই দিকে প্রবাহিত হয়। ইহার অধিকাংশ শক্তি বিপাকীয় কার্যে ব্যবহৃত হয় এবং তাপশক্তিরূপে নির্গত হয়। এইরূপ শক্তির ক্রমিক অপচয়ের ফলে সর্বোচ্চ সারির খাদকে কম পরিমাণ শক্তি প্রবাহিত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সৌরশক্তির বেশীর ভাগ সৌরমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া যায় এবং খুব সামান্য পরিমাণ শক্তি সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ আবদ্ধ করে। এই শক্তির মধ্যে উৎপাদকদের শ্বসন ক্রিয়ায়, পচনে শক্তি অপচয় হয় এবং কিয়দংশ শক্তি অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে। উৎপাদক কর্তৃক মোট উৎপাদিত শক্তির অবশিষ্টাংশ ভক্ষণের সময় প্রথম সারির খাদকের দেহে প্রবাহিত হয়। এই আগত মোট শক্তির কিছু পরিমাণ শ্বসনে, পচনে ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্টাংশ অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে। এই অবশিষ্টাংশ শক্তি পর্যায়ক্রমিক দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারির খাদক দেহে প্রবাহিত হয়।

সুতরাং উৎপাদক হইতে সর্বোচ্চ সারির খাদকে কম পরিমাণ শক্তি প্রবাহিত হয়। এই শক্তিপ্রবাহ প্রধানত তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যথা—শক্তি অর্জন, শক্তির ব্যবহার এবং শক্তির স্থানান্তর।

1. শক্তি অর্জন (Acquisition of energy): সূর্য হইতে পৃথিবীতে যে পরিমাণ আলোক শক্তি আসে তাহার সবটাই ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায় না। সৌরশক্তির অধিকাংশ মহাশূন্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং কিছু অংশ জল ও স্থলভাগকে গরম করিতে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট আলোকশক্তির কিছু অংশ প্রতিফলিত হয় এবং বাকী অংশ সবুজ উদ্ভিদের ক্লোরোফিল দ্বারা শোষিত হয়। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদের পাতায় আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিবর্তিত হইয়া স্থৈতিক শক্তিরূপে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যে সঞ্চিত থাকে। সালোকসংশ্লেষের সমীকরণের সাহায্যে উদ্ভিদ কর্তৃক শক্তি স্থাপনের (Energy fixation) পরিমাণ ও হার (Rate) সহজেই নির্ণয় করা যায়।

$$6CO_2+12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{673 Kcal সৌরশক্তি}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6}+6O_2+6H_2O$$
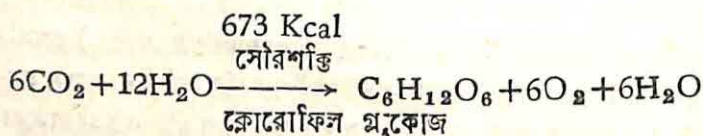
সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুত হয় তাহাকে প্রাথমিক উৎপাদন (Primary production) বলে এবং যে পরিমাণ শক্তি উৎপাদকের ক্লোরোফিলে স্থাপিত হয় তাহাকে মোট উৎপাদন (Gross production) বলে।

শ্বসনে ব্যবহৃত হইবার পর যে পরিমাণ শক্তি অবশিষ্ট থাকে তাহাকে আসল উৎপাদনে (Net production) বলে।

2. **শক্তির ব্যবহার** (Utilization of energy) : উৎপাদকের সংশ্লেষিত খাদ্যে যে পরিমাণ শক্তি আবদ্ধ হয় উহার কিছু অংশ নিজের শারীরবৃত্তীয় কার্যে ব্যবহৃত হয় এবং কিছু অংশ অপাচ্য ও রেচন পদার্থরূপে পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়। অবশিষ্টাংশ প্রথম সারির খাদকে এবং পর্যায়ক্রমিক দ্বিতীয় সারির ও সর্বোচ্চ সারির খাদকের দেহে প্রবাহিত হয়।

একটি খাদ্যস্তর হইতে পরবর্তী খাদ্যস্তরে কত শতাংশ পরিমাণ শক্তি প্রবাহিত হয় সে সম্পর্কে রেমন্ড লিন্ডেম্যান (Raymond Lindemann) 1942 খ্রীষ্টাব্দে **10 শতাংশের সূত্র** (10 per cent law) সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এই সূত্রানুযায়ী উৎপাদকের দেহে যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত থাকে তাহার 10% শক্তি প্রথম সারির খাদকের দেহ গঠনে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে, পরবর্তী সারির খাদকের বিপাকীয় ও শারীরবৃত্তীয় কার্যাদির জন্য একই অনুপাতে শক্তি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক সারির খাদকের দেহে শক্তি স্থানান্তরের সময় 10% শক্তি ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট 90% শক্তির বিকিরণ হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি হরিণ যদি 100 কিলোগ্রাম সবুজ উদ্ভিদ ভক্ষণ করে তাহা হইলে ঐ খাদ্যবস্তুর 10% অর্থাৎ $\frac{100}{10}$ কিলোগ্রাম বা 10 কিলোগ্রাম হরিণের দেহ গঠনে ব্যবহৃত হইবে। আবার একটি বাঘ ঐ 10 কিলোগ্রাম হরিণের মাংস ভক্ষণ করিলে উহার 10% অর্থাৎ 1 কিলোগ্রাম বাঘের দেহ গঠনে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং জীব যে পরিমাণ শক্তি গ্রহণ করে তাহার অধিকাংশ বিপাকীয় কার্যে এবং কিছু পরিমাণ শক্তি তাপশক্তিরূপে ব্যয়িত হয়। সামগ্রিকভাবে এই শক্তিকে **শ্বসন শক্তি** (Respiratory energy) বলে।

3. **শক্তির স্থানান্তর** (Transference of Energy) :

উৎপাদকের দেহে আবদ্ধ সৌরশক্তি বিভিন্ন পুষ্টিস্তরে বসবাসকারী খাদকদের দেহে স্থানান্তরিত হয় এবং লক্ষ্যণীয় প্রতিটি পুষ্টিস্তরে আবদ্ধ শক্তির পরিমাণ পর্যায়ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে। উৎপাদক বা খাদকদের দেহ হইতে বিয়োজকেরা এই শক্তি সরাসরি সংগ্রহ করিতে পারে না। মৃত উৎপাদক ও খাদকদের দেহ বা দেহের অংশ পচনের ফলে সরল জৈব পদার্থে পরিণত হয়। বিয়োজকেরা এই শক্তি সংগ্রহ করিয়া নিজেদের বিপাকীয় কার্যে ব্যবহার করে। তাহাদের বিপাকীয় কার্যে এই শক্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়া যায়। ফলে এই শক্তি পুনরায় উৎপাদকের দেহে বা পরিবেশের নির্জীব অংশে ফিরিয়া আসে না।

18.8 শক্তিপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of energy flow) :

1. **শক্তিপ্রবাহের উৎস সৌরশক্তি** : বাস্তুতন্ত্রে প্রত্যেকটি জীবের কার্য করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত শক্তির একমাত্র উৎস সূর্যালোক।

2. **শক্তিপ্রবাহ একমুখী :** উৎপাদক কর্তৃক সংগৃহীত আলোক শক্তি কখনও সৌরশক্তিতে ফিরিয়া যায় না। উৎপাদকের নিকট হইতে প্রথম সারির খাদক যে পরিমাণ শক্তি সংগ্রহ করে তাহা কখনও উৎপাদকে ফিরিয়া যায় না। একইভাবে দ্বিতীয় সারির খাদকের দেহে আবদ্ধ শক্তি প্রথম সারির খাদকে ফিরিয়া যায় না। অর্থাৎ শক্তি সর্বদাই এক খাদ্যস্তর হইতে পরবর্তী খাদ্যস্তরে প্রবাহিত হয় কিন্তু পূর্বের খাদ্যস্তরে ফিরিয়া যায় না।

3. **শক্তিপ্রবাহের পর্যায়ক্রমিক অবনতি :** উৎপাদক যে পরিমাণ শক্তি সৌরশক্তি হইতে সংগ্রহ করে তাহার কিছু অংশ প্রথম সারির খাদকে প্রবাহিত হয় এবং অধিকাংশ শক্তি বিপাকীয় কার্যে ব্যবহৃত হয় ও কিঞ্চিৎ পরিমাণ তাপশক্তিরূপে নির্গত হয়। একইভাবে প্রথম সারির খাদক হইতে সর্বোচ্চ সারির খাদক পর্যন্ত প্রতি খাদ্যস্তরে শক্তিপ্রবাহ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতে থাকে।

4. **লিণ্ডম্যানের দশ শতাংশ সূত্র ঃ** প্রথম সারির খাদক যে পরিমাণ উৎপাদক খায় তাহার দশ শতাংশ প্রথম সারির খাদকের দেহ গঠনে ব্যবহৃত হয়।

সংরক্ষণ (Conservation)

18.9 পৃথিবী প্রাকৃতিক সম্পদের এক বিশাল ভাণ্ডার হইলেও অফুরন্ত নহে। কিন্তু মানুষ লোভের বশবর্তী হইয়া ঐ সম্পদ যথেচ্ছ অপব্যবহার করার ফলে আধুনিক সভ্যজগৎ এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন। অপরিমিত খনিজ পদার্থ আহরণ ও ব্যবহার, নির্বিচারে বন্যপ্রাণী হত্যা, বন জঙ্গল কাটা প্রভৃতি অসাধু ও অদূরদর্শিতা কার্যের ফলে মানুষ আজ খরা, বন্যা, ভূমিক্ষয় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন। প্রাকৃতিক সম্পদের এইরূপ অপচয় ও অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারের ফলস্বরূপ ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য বিঘ্নিত হইবে এবং মানবজাতি অচিরেই ধ্বংসের সম্মুখীন হইবে। তাই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণসাধনের জন্য উক্ত সম্পদের বিবেচনাপূর্ণ ব্যবহার, অপচয়রোধ ও ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থা তথা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

সংরক্ষণ কথাটির আক্ষরিক অর্থ বিশেষভাবে রক্ষণ বা সঞ্চয়। সংক্ষেপে, প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার, রক্ষণ, অপচয়-রোধ ও ক্ষয়পূরণের পদ্ধতিকে সংরক্ষণ বলে।

সংরক্ষণের উদ্দেশ্য (Aims of conservation) :

(1) মানুষকে নির্মল আনন্দ দান।
(2) প্রাকৃতিক সম্পদের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার, অপচয়রোধ ও ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থা।
(3) বিরল ও মূল্যবান উদ্ভিদ এবং প্রাণীর অস্তিত্ব বজায় রাখা।
(4) মানবকল্যাণ ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার।

প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of natural resources)— প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

(1) **পুনর্গঠনযোগ্য** (Renewable) : যে সকল সম্পদ একবার ব্যবহারে শেষ হইয়া যায় না এবং পুনরায় গঠিত হইতে পারে তাহাদের পুনর্গঠনযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন—ভূমি বা মৃত্তিকা, বন, বন্যপ্রাণী, জল, শস্য প্রভৃতি।

(2) **পুনর্গঠন-অযোগ্য** (Non-renewable) : যে সকল সম্পদ একবার ব্যবহারেই সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায় তাহাদের পুনর্গঠন-অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন – কয়লা, তৈল, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি।

18.10 জল সংরক্ষণ (Conservation of water) :

জল ব্যতীত জীবনধারণ সম্ভব নয়। কৃষিকার্য, মৎস্যচাষ, শিল্পোৎপাদন প্রভৃতিতে জলের প্রয়োজন। তাই মানুষের নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী, মৃত্তিকামধ্যস্থ মিষ্টি জল অপরিহার্য। খরা, বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য মানুষের ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নহে, মানুষ এই ব্যাপারে আংশিক দায়ী। বৃক্ষচ্ছেদন, ভূমিক্ষয়, নদীগর্ভে মাটি জমা হওয়া প্রভৃতি মনুষ্যসৃষ্ট কারণের জন্য উক্ত দুর্যোগগুলি তীব্রতর আকার ধারণ করে।

বন্যার ফলে একদিকে যেমন ভূমিক্ষয় হয়, অন্যদিকে তেমনি প্রচণ্ড খরার ফলে মৃত্তিকা জলহীন হইতে থাকে। ইহার ফলে প্রধানত উদ্ভিদজগতের মৃত্যু ঘটে এবং ইকোসিস্টেমের বা প্রকৃতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। ইহার প্রতিষেধক হিসাবে জলসংরক্ষণের প্রয়োজন। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে জল সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

(1) বিভিন্ন স্থানে ক্যাচমেণ্ট অঞ্চল* (catchment area) গঠন করিয়া জল ধরিয়া রাখা।

(2) বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ করা ও বৃক্ষরোপণ করা।

(3) বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দিয়া জলাধার সৃষ্টি করিয়া বন্যারোধ করা এবং গ্রীষ্মের সময় ঐ সকল জলাধার হইতে জল সরবরাহ করা।

(4) জমি কর্ষণ করিয়া মৃত্তিকাস্থ জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

(5) চাষের প্রয়োজনাতিরিক্ত জল ব্যবহার না করিয়া জলের অপচয় রোধ করা।

(6) চাষের জমির আগাছা উৎপাটন করিয়া অতিরিক্ত জলশোষণ বন্ধ করা।

18.11 ভূমি সংরক্ষণ (Conservation of soil) :

শিশুর সহিত মাতার সম্পর্ক যেমন অবিচ্ছেদ্য, ঠিক তেমনই ভূমি বা মৃত্তিকার সহিত উদ্ভিদের সম্পর্ক খুবই গভীর। মৃত্তিকাকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভিদ বাঁচিয়া থাকে অর্থাৎ উদ্ভিদের জীবন মৃত্তিকানির্ভর। মৃত্তিকা ব্যতীত উদ্ভিদ যেমন বাঁচিতে পারে না, সেইরূপ উদ্ভিদ ব্যতীত প্রাণিজগৎ বাঁচিতে পারে না। এককথায় জীব-

* ক্যাচমেণ্ট অঞ্চল—যে অঞ্চল হইতে বৃষ্টিপাতের দরুন নদীতে বা জলাধারে জল সরবরাহ হয় তাহাকে ক্যাচমেণ্ট অঞ্চল বলে।

জগৎকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মৃত্তিকা খাদ্যবস্তু যোগান দেয়। ইহা ব্যতীত অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল মৃত্তিকা। তাই আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হইল ভূমির উর্বরতা বজায় রাখা ও ভূমিক্ষয় রোধ করা, অর্থাৎ ভূমি সংরক্ষণ করা। আবার ভূমি-মধ্যস্থ জলের পরিমাণ হ্রাস পাইলে ভূমির উর্বরতা হ্রাস পাইয়া থাকে। সুতরাং ভূমি ও জল সংরক্ষণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিম্নলিখিত উপায়ে ভূমি সংরক্ষণ করা যাইতে পারে—

(1) উদ্ভিদহীন উন্মুক্ত মৃত্তিকা বা ভূমির উপরের স্তর অতি সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাই নগ্ন মৃত্তিকার উপর বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও ঘাস রোপণ করিলে উহাদের মূল ভূমিকে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখিয়া আংশিক ভূমিক্ষয় রোধ করে।

(2) সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঝাউ, পাইন প্রভৃতি বৃহৎ বৃক্ষ রোপণ করিয়া ভূমিক্ষয় আংশিকভাবে রোধ করা হয়।

(3) পাথরের পাড় বাঁধিয়া সমুদ্র বা নদীর তীরের ভূমি সংরক্ষণ করা হয়।

(4) শস্যক্ষেত্রের চারিদিকে আল দিয়া জলস্রোত রোধের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ করা হয়।

(5) ঢালু পাহাড়ী জমিতে বিভিন্ন ধাপ তৈয়ারী করিয়া জলস্রোত ও বৃষ্টিধারা নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়।

(6) পশুচারণ বন্ধ করিয়া মৃত্তিকার উপরের স্তরের ক্ষয়রোধ করা যায়।

(7) বড় বড় জলাধার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জলসঞ্চয় করিয়া অবাধ্য জলস্রোত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়।

(8) গভীর কর্ষণের ফলে মৃত্তিকা বেশী আলগা হইয়া যায় এবং বেশী বৃষ্টিপাতে আলগা মাটি সহজে ধুইয়া যাইতে পারে। তাই অগভীর কর্ষণের দ্বারা ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়।

(9) খড়-কুটা, ঘাস-পাতা, পলিথিনের কাগজ প্রভৃতির আচ্ছাদন দ্বারা ক্ষুদ্র বীজতলা বা গবেষণা ক্ষেত্রের ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়।

(10) শস্য পর্যায়* দ্বারা ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ করা হয়।

(11) শিম্ব গোত্রীয় উদ্ভিদের চাষের দ্বারা জলের উর্বরতা বৃদ্ধি করা হয়।

(12) অজৈব ও জৈব বা কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়।

18.12 বন সংরক্ষণ (Conservation of forest) :

বনভূমি যে শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধন করে তাহাই নহে, ইহা পৃথিবীর একটি অমূল্য সম্পদ। উদ্ভিদ তথা বনভূমি প্রাণিজগৎকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

* শস্য পর্যায়—প্রত্যেক বৎসর একটি জমিতে একই শস্য বপন না করিয়া যদি বিভিন্ন বৎসর বিভিন্ন শস্য বপন করা হয় তাহা হইলে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, কারণ বিভিন্ন শস্য মাটি হইতে বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করে।

খাদ্যবস্তু সরবরাহ করে। পরিবেশে O_2 ও CO_2 গ্যাসের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া পরিবেশকে সুস্থ রাখে। ইহা ব্যতীত জ্বালানী, কাগজ, বস্ত্র, ঔষধ, গৃহনির্মাণ ও নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের প্রধান উৎস উদ্ভিদ তথা বনজ সম্পদ। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বন, সুতরাং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বন সংরক্ষণ অপরিহার্য। কেবল তাহাই নহে, পর্যাপ্ত বনভূমির অভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য কমিয়া যায়। বনভূমি পরোক্ষভাবে ভূমি ও জল সংরক্ষণে সাহায্য করে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে বনাঞ্চল কাটিয়া শহর ও শিল্পাঞ্চল গড়িয়া তোলার জন্য মানুষ নিজের বিপর্যয় নিজেই ডাকিয়া আনিতেছে। ইহার ফলস্বরূপ অদূরে ভবিষ্যতে মানুষসহ প্রাণিজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা খুব বেশি। এই সকল গুরুত্বের জন্য পৃথিবীর প্রতিটি দেশে বন সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। বন সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি বিশেষ সহায়ক :

(1) পরিণত উদ্ভিদ ব্যতীত অপরিণত উদ্ভিদ কাটা বন্ধ করা ও কাটা স্থানগুলিতে নূতন চারাগাছ রোপণ করা।

(2) বন মহোৎসবের মাধ্যমে প্রতি বৎসর নূতন নূতন চারাগাছ বসানো।

(3) অগ্নিকাণ্ডের হাত হইতে বনভূমি রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

(4) পরজীবী, ছত্রাক ও কীটপতঙ্গের হাত হইতে বনভূমি রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(5) দেশের শতকরা 34 ভাগ বনাঞ্চল সৃষ্টি করা।

(6) চোরা চালানকারীদের হাত হইতে বনাঞ্চল রক্ষা করা।

(7) 'একটি উদ্ভিদ—একটি প্রাণ'—কথাটি সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি গণমাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত ও সচেতন করা।

(8) সর্বোপরি বনজ সম্পদের অপচয়রোধ ও সংরক্ষণের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া।

18.13 বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (Conservation of wild life) :

গৃহপালিত প্রাণী ব্যতীত যে সকল প্রাণী বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে, সমতল-ভূমিতে, নদী বা সমুদ্রে সার্থকভাবে অভিযোজিত হইয়া বসবাস করে তাহাদের বন্যপ্রাণী বলে। সাধারণত এই সকল প্রাণী আকারে বৃহৎ, বিরল ও দৃষ্টি আকর্ষণকারী। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বন বা অরণ্য। মনের আনন্দে তাহারা ইচ্ছামত বনভূমির মধ্যে বিচরণ করে ও জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। কিন্তু বন কাটিয়া একদিকে যেমন শস্যক্ষেত্র, রাস্তাঘাট, শহর বা শহরতলী গড়িয়া উঠিতেছে, অপরদিকে তেমনি বন্যপ্রাণিকুল শিকারী কর্তৃক নিধন হওয়ায় ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যাইতেছে। ইহা ব্যতীত চোরা শিকারীরা মাংস, চামড়া, চর্বি, শিং, পালক প্রভৃতির জন্য বন্যপ্রাণীকে নির্বিচারে হত্যা করিয়া নিজেদের প্রয়োজন মিটাইতেছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের এই অতুলনীয় সম্পদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা :

(1) বন্যপ্রাণী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ধন করে বা মানুষের নির্মল আনন্দ দান বা অবসর বিনোদনে সাহায্য করে।

(2) বন ও বন্যপ্রাণীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং ইহারা প্রকৃতি তথা ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য রক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

(3) বন্যপ্রাণী বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধি সম্ভব।

(4) পর্যটণ ব্যবসায়ের মাধ্যমে আর্থিক উপার্জন সম্ভব।

(5) প্রাণিবিজ্ঞান অধ্যয়ন ও গবেষণায় বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব অপরিসীম।

18.14 বন্যপ্রাণীর ক্রমিক অবলুপ্তি :

সভ্য মানুষ খাদ্যের প্রয়োজনে, নিছক শিকারের আনন্দে, খেলার ছলে, আবার কখনও কখনও চামড়া, শিং, চর্বি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জনের লোভে নির্মমভাবে অসংখ্য বন্যপ্রাণী হত্যা করিতেছে। 'বন্যপ্রাণীর বাঁচিবার অধিকার নাই'—ইহাই যেন মানুষের কাছে চরম সত্য। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে 1600 খ্রীষ্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত প্রায় 349টি প্রজাতির প্রাণী পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বিগত 2000 বৎসরে 100টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

অনুমান করা হয় যে এখনও অসংখ্য বন্যপ্রাণী বিলুপ্তির সম্মুখীন। সুষ্ঠু সংরক্ষণের শীঘ্রই ব্যবস্থা না করিলে আগামী একশত বৎসরের মধ্যে ইহাদের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

সাম্প্রতিককালে অবলুপ্ত প্রাণীদের মধ্যে মরিসাসের ডোডো (Dodo) পাখী, আটলান্টিক মহাসাগরের হেব্রাইডিস ও আইসল্যাণ্ডের আউক পাখী, আমেরিকার প্যাসেঞ্জার পায়রা,. উত্তর আমেরিকার বাইসন, তানজানিয়ার সিংহ উল্লেখযোগ্য। বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের মধ্যে অ্যাণ্টিলোপ, জেব্রা, চিতাবাঘ, একশৃঙ্গ গণ্ডার, চিতল হরিণ, সিংহ, বাঘ, সাদা বাঘ, বাইসন, কস্তুরীমৃগ, কুমীর, পাইথন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ।

18.15 বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রচেষ্টা :

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীববিজ্ঞানী ও পশুপ্রেমী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ব্যতীত মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে। ইহার ফলস্বরূপ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য নূতন করিয়া চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় এবং 1948 খ্রীষ্টাব্দে 33টি দেশের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'International Union for the Conservation of Nature and Natural resources' বা IUCN নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। পরবর্তীকালে 1961 খ্রীষ্টাব্দে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অর্থ সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিল (World Wild Life Fund বা সংক্ষেপে WWF) গঠিত হয়। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হইল—

(1) বিশ্বব্যাপী বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য অর্থসংগ্রহ।

(2) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য আর্থিক সাহায্য ও বিশেষজ্ঞ প্রেরণ।

(3) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উহাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে গণচেতনা ও প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করিয়া তোলা।

(4) চোরাশিকারীর হাত হইতে বন্যপ্রাণী রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা (সশস্ত্র জঙ্গলরক্ষী, উন্নত যানবাহন ও যন্ত্রাদি) করা।

(5) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের শিক্ষণ ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 1952 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম ভারতীয় পক্ষী সংরক্ষণ সমিতি ও পরে ভারতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদ গঠিত হয়। এই পর্ষদের উপদেশ অনুসারে ভারতের প্রতিটি প্রদেশে রাজ্য বন্যপ্রাণী পর্ষদ স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদ রাজ্য পর্ষদগুলিকে কেবল পরামর্শ দান করে কিন্তু রাজ্য পর্ষদগুলি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। পশ্চিমবঙ্গে বন্যপ্রাণী পর্ষদ 1955 খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হইয়াছে। 1972 সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন বলবৎ করিয়া ভারত সরকার ঘোষণা করেন যে 43 প্রকার প্রাণী ও 18 প্রকার পাখী সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত প্রাণী এবং ইহাদের ধরা বা হত্যা করা আইনত দণ্ডনীয়। বর্তমানে WWF এর তত্ত্বাবধানে 77টি দেশে 840 প্রকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজ চলিতেছে।

18.16 বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের শর্ত :

(1) বন্যপ্রাণীর স্বভাব, বাসস্থান ও খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞান।

(2) প্রজনন ঋতু সম্বন্ধে জ্ঞান।

(3) প্রাণীদের সংখ্যা ও উহাদের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান।

(4) জলপানের ব্যবস্থা করা, নিরাপদ আশ্রয় ও আচ্ছাদন সম্বন্ধে জ্ঞান।

(5) বন্যপ্রাণীর পরিমাণ সম্বন্ধে জ্ঞান ও অন্যান্য প্রজাতির সহিত সম্পর্ক।

(6) এখন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আওতার মধ্যে মাছকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই প্রজনন ঋতুতে ইহাদের ধরা বা অপরিণত অবস্থায় শিকার করা উচিত নয়। কিন্তু মাছ সংরক্ষণ সম্বন্ধে আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত কোন আইন বলবৎ হয় নাই।

18.17 সংরক্ষণের পদ্ধতি :

(1) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য প্রথমেই বন সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার।

(2) বনাঞ্চলগুলিকে গুরুত্ব অনুযায়ী জাতীয় পার্ক বা উদ্যান, বন্যপ্রাণী স্যাংচুয়ারি, অভয়ারণ্য বা সংরক্ষিত অরণ্য হিসাবে ঘোষণা করিয়া উহাদের মধ্যে প্রাণী সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করা।

18.20 ব্যাঘ্র-প্রকল্প (Tiger Project) : দেশের উন্নয়ন ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে বাঘের সংরক্ষণ, চোরা শিকারীদের হাত হইতে রক্ষা ও বংশবিস্তারের জন্য যে সরকারী প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাকে ব্যাঘ্র-প্রকল্প বলে। শিকারীদের শখ, অসাধু ব্যবসায়ীদের অতি লোভের হাত হইতে বাঘকে রক্ষা করিবার জন্য বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিলের (WWF) 6 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় 1973 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের 7টি অঞ্চলে 6 বছরের জন্য ভারতীয় ব্যাঘ্র-প্রকল্প চালু করা হইয়াছে। অঞ্চলগুলি হইল পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন, আসামের মানস, বিহারের পালামৌ, ওড়িশার সিমলিপাল, কর্ণাটকের বন্দীপুর, মহারাষ্ট্রের মেলঘাট, মধ্যপ্রদেশের কানহা, রাজস্থানের রনথম্ভোর, উত্তরপ্রদেশের করবেট। 1965 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বনাঞ্চলে যেখানে বাঘের সংখ্যা ছিল 4,000, সেখানে প্রকল্পের শুরুতে বাঘের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় 1,800। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে বাঘের সংখ্যা কিরূপ আশঙ্কাজনকভাবে কমিতে শুরু করিয়াছিল। ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ফলে বাঘের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাইয়া 1985 খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়াইয়াছে প্রায় 3,500। ভারতের সকল ব্যাঘ্র-প্রকল্পের মধ্যে সুন্দরবনের প্রকল্প সর্ববৃহৎ এবং এই বনাঞ্চলে বাঘের সংখ্যাবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য ও উৎসাহজনক। সুপরিকল্পিত উপায়ে এই প্রকল্প সার্থকভাবে রূপায়িত হইলে ব্যাঘ্র-প্রকল্প রূপায়ণ সত্যই সার্থক হইবে এবং বিনিময়, বিক্রয় ও পর্যটকদের চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জিত হইয়া দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হইবে।

ব্যাঘ্র-প্রকল্পের শর্ত : (1) বাঘের জন্য পৃথক এলাকা চিহ্নিত করা। (2) পানীয় জলের জন্য জলাশয়ের ব্যবস্থা করা। (3) বাঘের বসবাস ও শিকার ধরার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা ও খাদ্যের সুবন্দোবস্ত করা। (4) আইন করে বাঘ শিকার বন্ধ করা এবং চোরা শিকারীদের হাত হইতে বাঘকে বাঁচানো। (5) বাঘ যে অমূল্য জাতীয় সম্পদ তাহা বিভিন্ন গণমাধ্যমে জনসাধারণকে জানানো।

18.21 গণ্ডার-প্রকল্প (Rhinoceros Project) : ভারতের কেবল পশ্চিমবঙ্গের জলদাপাড়ায় ও আসামের কাজিরাঙ্গায় গণ্ডার পাওয়া যায়। স্থলবাসী প্রাণীদের মধ্যে আকৃতিগত দিক হইতে হাতীর পরেই গণ্ডারের স্থান। ভারতীয় গণ্ডার একশৃঙ্গযুক্ত। ইহার বিজ্ঞানসম্মত নাম *Rhinoceros unicornis*। ইহাদের গড় আয়ুষ্কাল 50-70 বৎসর। গণ্ডারের শৃঙ্গ বা খড়্গ অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু, তাই চোরা শিকারীরা প্রধানত খড়্গের জন্য এই প্রাণীকে হত্যা করে। গণ্ডারের শৃঙ্গ প্রকৃতপক্ষে শিং নহে, উহা একপ্রকার আঠালো পদার্থে আবৃত অসংখ্য লোম দ্বারা গঠিত একপ্রকার শক্ত শৃঙ্গের ন্যায় অঙ্গবিশেষ। গণ্ডারের শৃঙ্গ সম্বন্ধে মানুষের অনেক সংস্কার ও প্রবাদ প্রচলিত আছে। যেমন উহা বিষ প্রতিষেধক, উৎকৃষ্ট ঔষধ, জীবনীশক্তি দায়ক, প্রসববেদনা উপশমকারী ইত্যাদি। এই সকল কারণে গণ্ডারের

শৃঙ্গের বাজার মূল্য অত্যন্ত বেশী যাহার ফলস্বরূপ চোরা শিকারীদের হাতে গণ্ডার নির্বিচারে নিধন হইতে থাকে ও ইহাদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পায়। গণ্ডার সংরক্ষণের মাধ্যমে এই সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। 1962 সালের হিসাব অনুযায়ী যেখানে গণ্ডারের সংখ্যা ছিল 423-442টি, সেক্ষেত্রে 1976 সালে বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় 500তে পেঁছাইয়াছে।

ভারতে ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ন্যায় এখনও পর্যন্ত গণ্ডার সংরক্ষণের জন্য গণ্ডার-প্রকল্প গঠিত হয় নাই। তথাপি পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সরকার 1932 সালে গণ্ডার সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করিয়া নিজ নিজ রাজ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে গণ্ডার সংরক্ষণ করিতেছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ন্যায় কেন্দ্রীয় গণ্ডার-প্রকল্প চালু হইলে অদূর ভবিষ্যতে ইহাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবে ও এই প্রকল্প রূপায়ণ সার্থক হইয়া দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিবে।

গণ্ডার-প্রকল্পের শর্ত : (1) যে সকল বনাঞ্চলে গণ্ডার বাস করে সেই সকল অঞ্চলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত জনসাধারণ বা পর্যটকদের প্রবেশ নিষেধ।

(2) আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া ঐ অঞ্চলে প্রবেশ নিষেধ এবং আইন অমান্য করিলে জরিমানা, কারাদণ্ড প্রভৃতি শাস্তি পাইতে হইবে।

(3) চোরা শিকারীদের হাত হইতে বন্যপ্রাণী রক্ষা করিবার জন্য অসংখ্য সশস্ত্র পাহারাদার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

(4) গণ্ডারের শৃঙ্গে কোন ভেষজ গুণ নাই—জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে।

(5) গণ্ডার একটি অমূল্য জাতীয় সম্পদ এবং ইহাদের হত্যা করা যে দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক তাহা রেডিও, সংবাদপত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমে প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে বোঝানো হইতেছে।

18.22 কুমীর খামার (Crocodile farm) : ব্যাঘ্র ও গণ্ডার প্রকল্পের ন্যায় সুন্দরবন এলাকার ভগবতীপুরে কুমীর খামার গঠিত হইয়াছে। নদী হইতে কুমীরের ডিম সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে বাচ্চা ফুটাইয়া উহাদের বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা এই খামারে করা হইয়াছে। কুমীরের চামড়ার মূল্য অত্যন্ত বেশী ও চাহিদা প্রচুর হওয়ায় উহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।

দূষণ (Pollution) ?

18.23 দূষণ (Pollution) : পরিবেশে কোন অবাঞ্ছিত পদার্থের অনুপ্রবেশের ফলে যখন ইহার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় তখন তাহাকে দূষণ বলে। বর্তমান মানুষের নিকট পরিবেশ দূষণ একটি অন্যতম সমস্যা।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ তাহার নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতেছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন উন্নতি সাধিত হইতেছে ঠিক অন্যদিকে প্রকৃতিকে ইচ্ছামত ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইতেছে। অত্যধিক জনসংখ্যা, শিল্প প্রসারণ, যথেচ্ছ বনভূমি ধ্বংসের ফলে বায়ু, জল ও স্থলের পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হইয়া উঠিতেছে। ফলস্বরূপ, পরিবেশ হইয়া উঠিতেছে মানুষের বসবাসের অনুপযুক্ত। সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে পরিবেশ কি করিয়া দূষণমুক্ত রাখা যায় তাহার জন্য সর্বস্তরে চলিতেছে বিরাট কর্মযজ্ঞ।

সংজ্ঞা (Definition) : ওডাম (Odum, 1971)-এর মতানুসারে **পরিবেশের জল, স্থল ও বায়ুর মধ্যে কোন অনভিপ্রেত পদার্থের অনুপ্রবেশের ফলে ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনে যখন কোন জীবের বা প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয় তখন তাহাকে দূষণ বলে।**

দূষণকারী পদার্থ (Pollutants) : ব্যবহারের পর পরিত্যক্ত পদার্থকে দূষণকারী পদার্থ বলে। ইহা সাধারণত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এবং ইহার ফলে পরিবেশ নানাভাবে দূষিত হয়। পরিবেশে কয়েকটি দূষণকারী পদার্থ নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

(i) **সঞ্চিত পদার্থ** : ধুলো-বালি, ময়লা, ঝুল-কালি, ধোঁয়া, ধোঁয়াশা, আলকাতরা প্রভৃতি।

(ii) **গ্যাসীয় পদার্থ** : কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ফ্লোরিন ও ফ্লোরাইড, ক্লোরিন, ব্রোমিন আইয়োডিন প্রভৃতি।

(iii) **ধাতু** : সীসা, লৌহ, তামা, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি।

(iv) **রাসায়নিক পদার্থ** : কীটনাশক (Insecticides), আগাছানাশক (Herbicides), ছত্রাকনাশক (Fungicides), রাসায়নিক সার (Chemical Fertiliser) প্রভৃতি।

(v) **শিল্পজাত জটিল জৈব যৌগ** : ইথার, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, বেঞ্জিন, বেঞ্জপাইরিনস্ ইত্যাদি।

(vi) **রাসায়নিক যৌগ** : ইথিলিন, অ্যালডিহাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, পারক্সি-অ্যাসিটাইল নাইট্রেট প্রভৃতি।

(vii) বিভিন্ন প্রকার তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

দূষণকারী পদার্থের প্রকারভেদ (Types of pollutants) :

ওডাম 1971 খ্রীষ্টাব্দে বাস্তুতন্ত্রে দূষণকারী পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করেন, যেমন—

(ক) **অভঙ্গুর** (Non-degradable) : সাধারণ প্রাকৃতিক অবস্থায় যে সকল ধাতু বা বিষাক্ত পদার্থ ভাঙ্গে না বা ধীরে ধীরে ভাঙ্গে তাহাদের **অভঙ্গুর দূষণকারী পদার্থ** বলে।

বাস্তুতন্ত্রে এই সমস্ত পদার্থ চক্রাকারে আবর্তিত হয় না। যেমন—অ্যালুমিনিয়াম, মারকিউরিক লবণ, দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত ফিনল যৌগ, DDT (Dichloro Diphenyl Trichloroethane) প্রভৃতি।

(খ) **ভঙ্গুর** (Degradable) : প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সকল জৈব পদার্থ সহজে ভাঙ্গিয়া যায় এবং বাস্তুতন্ত্রে চক্রাকারে আবর্তিত হয় তাহাদের ভঙ্গুর দূষণকারী পদার্থ বলে। সাধারণত গৃহস্থের পরিত্যক্ত বর্জ্য পদার্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশে ইহাদের আধিক্য ঘটিলে বহু সমস্যা দেখা দেয়।

দূষণের প্রতিক্রিয়া (Effects of pollution) :

1. ফুসফুসে ক্যান্সার, যক্ষ্মা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি।
2. মনুষ্যশক্তি ও অর্থের অপচয়।
3. অযথা অপচয়ের ফলে সম্পদের ক্ষতি।

18.24 বায়ু দূষণ (Air pollution) : বায়ু জীবজগতের একটি অপরিহার্য উপাদান। মানুষের কার্যের ফলে বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে যখন বায়ুমণ্ডলে অবাঞ্ছিত গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী হয় তখন ঐ বায়ুকে দূষিত বায়ু বলে এবং যে পদ্ধতিতে বায়ু দূষিত হয় তাহাকে **বায়ু দূষণ** বলে। নির্মল বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় ৪০ শতাংশ। যদি কোন কারণে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়া যায় তাহা হইলে জীবকুলের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে।

মানুষের দেহে বায়ু দূষণের প্রভাব কি ভয়ংকর রূপ সৃষ্টি করিতে পারে তাহা ভূপালের মারাত্মক গ্যাসীয় দুর্ঘটনা হইতে জানা যায়।

1984 সালের 3রা ডিসেম্বর ভূপালের অভিশপ্ত ইউনিয়ন কারবাইড নামক কীটনাশক রাসায়নিক কারখানা হইতে নির্গত মিথাইল আইসোসায়ানেট বা মিক্ গ্যাস (MIC) বায়ুতে পরিত্যক্ত হইবার ফলে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে প্রায় 2,500 মানুষের প্রাণহানি হইয়াছে। ইহা ব্যতীত গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত, শিশুদের বিকলাঙ্গতা, অসংখ্য মানুষ অন্ধ ও মানসিক ভারসাম্যহীন হইয়াছে।

1985 সালের মে মাসে হলদিয়ায় অ্যামোনিয়া ট্যাংক বিপর্যয়ের ফলে উহার বিস্ফোরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, যাহার পরিণতি ভূপালের দুর্ঘটনার ন্যায় ভয়ংকর রূপ ধারণ করিত।

বায়ু বিভিন্ন কারণে দূষিত হইতে পারে। ইহার কারণগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

1. ধোঁয়া (Smoke): বায়ুমণ্ডলের 10-15 শতাংশ বায়ু ধোঁয়ার দ্বারা দূষিত হয়। প্রধানত কলকারখানায় চিমনি হইতে নির্গত ধোঁয়া, কয়লা এবং খনিজ তৈল দহনের ফলে নির্গত ধোঁয়া, যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া প্রভৃতি প্রতিনিয়ত বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসীয় পদার্থ বায়ুকে দূষিত করে। বায়ুমণ্ডলের সালফার ডাই অক্সাইড জারিত হইয়া সালফাইট এবং পরে সালফিউরিক অ্যাসিডের সূক্ষ্ম কণিকাতে পরিণত হইয়া বায়ুতে ভাসিয়া বেড়ায়। বাড়ীর জ্বালানীর অসম্পূর্ণ দহনে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়।

বায়ুতে কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসীয় পদার্থের উপস্থিতিতে মানুষের ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস, হাঁপানী, শ্বাসকষ্ট, মাথাধরা প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। ইহা ছাড়া বায়ুতে 3-4 বেঞ্জপাইরিন থাকিলে প্রধানত ফুসফুসে ক্যান্সার দেখা দেয়। কার্বন মনোক্সাইড রক্তের অক্সিজেন পরিবহণ ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দেয়।

2. ধোঁয়াশা (Smog): রাসায়নিক বাষ্প এবং বিভিন্ন ধোঁয়া মিশ্রিত হইয়া বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ভারী ও কালো কুয়াশার ন্যায় স্তর সৃষ্টি করে তাহাকে ধোঁয়াশা বলে। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। সূর্যরশ্মি হইতে আগত অতি বেগুনী রশ্মির (ultra-violet Radiation) প্রভাবে বায়ুমণ্ডলস্থিত হাইড্রোকার্বন ও নাইট্রোজেন অক্সাইড মিলিত হইয়া আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা ও ওজোন গ্যাস তৈয়ারী করে।

$$\text{হাইড্রোকার্বন} + \text{নাইট্রোজেন অক্সাইড} \xrightarrow[\text{সূর্যরশ্মি}]{\text{অতিবেগুনী রশ্মি}} \text{পারঅক্সিঅ্যাসিটাইল নাইট্রেট (PAN)} + \text{ওজোন} (O_3)$$

এই ধোঁয়াশার ফলে চোখ জ্বালা করে এবং চোখ থেকে জল পড়ে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ইহা গাছের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। খুব বেশী PAN-এর উপস্থিতিতে গাছের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সময় "হিল বিক্রিয়া" (Hill Reaction) বন্ধ হইয়া যায়।

বায়ুমণ্ডলস্থিত ধোঁয়াশা, ধুলো-বালি, ময়লা প্রভৃতি সূর্যরশ্মি শোষণ করে যাহা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। বায়ুমণ্ডলে খুব ঘন ধোঁয়া থাকিলে সূর্যরশ্মি পুরাপুরি আসিতে পারে না ফলে মানুষ, গৃহপালিত পশুর

স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং কৃষিজাত দ্রব্যের বহুলাংশে ক্ষতি হয়। ইহা ব্যতীত ঘর-বাড়ীর ক্ষয় ; জামা, কাপড়, চামড়া, কাগজ ইত্যাদি দ্রব্য বিবর্ণ হইয়া যায়।

1952 সালে ধোঁয়াশা মহামারীরূপে লণ্ডন শহরে দেখা দিয়াছিল যাহার ফলে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় 500 লোক মারা গিয়াছিল। মৃত্যুর প্রধান কারণ বাতাসে SO_2-এর আধিক্য। 1953 সালে আমেরিকার লস্ এঞ্জেলসে ধোঁয়াশার জন্য শহরবাসীর চোখ অসম্ভব জ্বালা করিতে থাকে। কারণ বাতাসে নাইট্রিক অক্সাইড অধিক পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 1970 সালে জাপানের টোকিওতে ধোঁয়াশার জন্য হাজার হাজার লোক মাথাধরা, কাশি ও শ্বাসকষ্টের জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হইয়াছিল। বর্তমানে পৃথিবীর পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ধোঁয়াশার ভবিষ্যৎ সংকেত জানানো হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি জনবহুল শহরগুলি অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ মহামারী বায়ু দূষণের শিকার হইতে পারে যদি না এখনও পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে আমরা সচেতন না হই।

3. যানবাহনের পরিত্যক্ত ধোঁয়া : বাস, মোটর, লরী প্রভৃতি যানবাহনের পেট্রল, ডিজেল, কয়লা ইত্যাদি দহনের ফলে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় যাহা বায়ু দূষণের 30 শতাংশ দায়ী। যানবাহন হইতে যে সমস্ত বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ বাহির হয় তাহার মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন, নাইট্রোজেন অক্সাইড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের মাত্রা বেশী হইলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় ফলে মাথাধরা, শ্বাসকষ্ট, চোখ জ্বালা প্রভৃতি রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। কার্বন মনোক্সাইড রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে মিশিয়া রক্তের অক্সিজেন পরিবহণ ক্ষমতা কমাইয়া দেয়। হাইড্রোকার্বনের অসম্পূর্ণ দহনের ফলে 3-4 বেঞ্জপাইরিন উদ্গত হয় ফলে ফুসফুসের ক্যান্সার দেখা দেয়। ইহা ব্যতীত নাইট্রোজেন অক্সাইডের ফলে চোখ-নাক জ্বালা করে।

4. কীটনাশক (Insecticides): শস্যক্ষেত্রের ক্ষতিক্ষারক বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ দমনের জন্য বর্তমানে ব্যাপক হারে DDT, বিভিন্ন ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এইসব পদার্থ গাছের পাতায় স্প্রে বা ডাস্ট করিবার সময় ইহাদের সূক্ষ্ম কণা বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়। এই সকল রাসায়নিক পদার্থের অধিকাংশ মাটির সংগে মিশিয়া যায় এবং ইহা বিনষ্ট না হইয়া উদ্ভিদের দেহকোষের ভিতর ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতে থাকে। বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে ইহা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর দেহে সঞ্চারিত হয় যাহা প্রাণীর দেহের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। এইসব কীটনাশকের উপস্থিতিতে প্রাণীর হর্মোন নিঃসরনের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে ক্যান্সারও হইতে পারে। ইহা ব্যতীত পাখীদের জনন অঙ্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

5. আগাছানাশক (Herbicides): শস্যক্ষেত্রের ধারে বা রাস্তার ধারে আগাছাগুলিকে দমন করিবার জন্য অনেকগুলি আগাছানাশক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। ইহাদের মধ্যে মনিউরোন (Monuron), সিমাজিন (Simazin)

নামক রাসায়নিক পদার্থ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করিয়া উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটায়। 2, 4-D এবং 2, 4, 5-T (Chlorinated phenoxyacetic acid) উদ্ভিদের ফ্লোয়েমের ভিতর কার্য করিয়া উহার কোষকে দীর্ঘায়িত করে। ফলে গাছের খাদ্য সরবরাহ ব্যাহত হয়। এই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতিতে বাস্তুতন্ত্রে শাকাশী ও মাংসাশী প্রাণীদের উপর পরোক্ষ প্রভাব দেখা যায়। ইহা ব্যতীত প্রাণীদের নানারকম ত্বকের রোগ পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিকারের উপায় (Control measures) :

(i) ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটরের (Electrostatic precipitator) সাহায্যে বায়ু হইতে ধোঁয়া, ধূলো-বালি, ময়লা প্রভৃতি অপসারণ করা উচিত।

(ii) ইঞ্জিন-চালিত যানবাহন হইতে যে ধোঁয়া বাহির হয় তাহা বিশেষ কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়া পরিস্রুত করা উচিত।

(iii) সুস্থ পরিবেশ রাখিতে হইলে শিল্পাঞ্চলগুলিকে যথাসম্ভব জনবহুল এলাকা হইতে অপসারণ করিতে হইবে। যে সকল অঞ্চলে দশ হাজারের বসতি সেই অঞ্চলসমূহে কলকারখানার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

(iv) কলকারখানার ধোঁয়া নির্গত চিমনিতে আবশ্যিকভাবে ফিলটার ব্যবহার করা উচিত।

(v) কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিবার পরিবর্তে জৈবিক পদ্ধতিতে (Biological methods) অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ দমন করা উচিত।

(vi) বিভিন্ন হর্মোন প্রয়োগ করিয়া ক্ষতিকারী কীট-পতঙ্গের জীবনচক্র যাহাতে অসম্পূর্ণ থাকে তাহা ব্যবস্থা করা উচিত।

(vii) পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করা প্রয়োজন।

18.25 জল দূষণ (Water pollution) : জীবনধারণের জন্য বিশুদ্ধ জল একটি অপরিহার্য উপাদান। সাধারণত কৃষিকার্য, মৎস্যচাষ, শিল্প, কারখানা, যানবাহন প্রভৃতির জন্য জলের প্রয়োজন। জলের প্রধান উৎসগুলি হইল সমুদ্র, নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী প্রভৃতি। কিন্তু মনুষ্য কার্যের ফলে অহরহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে জল নানাভাবে দূষিত হইতেছে। বিভিন্ন প্রকার জল দূষণ নিম্নে আলোচনা করা হইল।

1. সিউয়েজ দ্বারা দূষণ (Sewage pollution): শহরের শৌচাগার, ধৌতাগার, নর্দমা প্রভৃতির পরিত্যক্ত জল এবং পয়ঃপ্রণালীর আবর্জনা পুকুর, নদী, সমুদ্রের জলকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। এই সমস্ত আবর্জনায় মিশ্রিত থাকে মানুষের মলমূত্র, পচিত-গলিত জীবদেহ, অজৈব লবণ এবং জৈব পদার্থ ইত্যাদি। এই আবর্জনার সংমিশ্রণে লেক বা পুষ্করিণীর জলে শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি করে এবং জলের অধিকাংশ অক্সিজেন এই সমস্ত উদ্ভিদের শ্বসন কার্যে ব্যবহৃত হয়। ফলস্বরূপ, জলে অক্সিজেনের অভাবে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারণের জন্য প্রতিকূল অবস্থা গড়িয়া উঠে, মৎস্য চাষ বিঘ্নিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে

জলও বিষাক্ত হইয়া যায়। লণ্ড্রী হইতে কাপড় কাচার পরিত্যক্ত জলে মিশ্রিত থাকে সালফেট, নাইট্রাইট, ক্লোরাইড প্রভৃতি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ যাহা জলাশয়ের জলকে প্রতিনিয়ত দূষিত করে। ইহার ফলে টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয়, এণ্টারাটাইটিস, হিপাটাইটিস প্রভৃতি সংক্রামক রোগ দ্রুতহারে ছড়াইয়া মহামারীর আকার ধারণ করে।

2. শিল্পঘটিত দূষণ (Industrial pollution) : অধুনা প্রতিষ্ঠিত পেট্রো-ক্যামিকেল কমপ্লেক্স, সার তৈয়ারির কারখানা, তৈল শোধনাগার, কাগজকল, কাপড়ের কল, চিনিকল, ঔষধ কারখানা, প্লাস্টিক ও রবার তৈয়ারির কলকারখানা হইতে বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাশনে নদী বা সমুদ্রের জলকে প্রতিনিয়ত দূষিত করে। এই সমস্ত নিষ্কাশিত বর্জ্য পদার্থে ফিনল, সায়ানাইড, অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকে। অটোমোবাইল, যানবাহন তৈয়ারির কারখানা হইতে পরিত্যক্ত সীসা নদীর জলকে দূষিত করে। কস্টিক সোডা ও ক্লোরিন কারখানা হইতে নির্গত আবর্জনার মধ্যে পারদের পরিমাণ খুব বেশী থাকে যাহার উপস্থিতিতে জলজ প্রাণীর নার্ভের বৈকলতা দেখা যায়। বিভিন্ন কলকারখানা হইতে নির্গত পারদ, সীসা, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি ধাতু জলের সঙ্গে মিশিয়া জলাশয়স্থিত বাস্তুতন্ত্রের সাম্যাবস্থা নষ্ট করিয়া দেয়, ফলে জলজ প্রাণীর বসবাসের অনুপযোগী হইয়া পড়ে।

3. কীটনাশক ও আগাছানাশক পদার্থ দ্বারা দূষণ (Pollution by Insecticides and Herbicides) : শস্যক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক ও আগাছানাশক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। ইহার কিছু অংশ বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া নদী বা জলাশয়ের জলে মিশ্রিত হয়।

4. কচুরিপানা, আগাছা, জলাশয়ের ধারে অবস্থিত বিভিন্ন গাছের পাতা পচিয়া জলাশয়ের জলকে নানাভাবে দূষিত করে।

5. তৈলবাহী জাহাজ হইতে নির্গত তৈলের দ্বারা সমুদ্রের জল দূষিত হয়।

প্রতিকারের উপায় (Control measures) :

(i) নর্দমার জল নদী বা জলাশয়ে পতিত হইবার পূর্বে শোধন করা উচিত।

(ii) কলকারখানা হইতে নির্গত বর্জ্য পদার্থ সরাসরি নদী বা সমুদ্রের জলে পতিত না হয় তাহা অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে দূষিত জলকে শোধন করা প্রয়োজন।

(iii) জলাশয় সর্বদা আবর্জনামুক্ত রাখা বিধেয়।

(iv) তৈলবাহী জাহাজ থেকে খনিজ তৈল যাহাতে সমুদ্রের জলে মিশ্রিত না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

18.26 মৃত্তিকা দূষণ (Soil pollution) : গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে মৃত্তিকা বেশী পরিমাণে দূষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য পদার্থ ও রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে মৃত্তিকা নানাভাবে দূষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার কলকারখানা হইতে উদ্ভূত বর্জ্য পদার্থ প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃতদেহ, ভগ্নবাড়ীর আবর্জনাসমূহ সঞ্চিত হইবার ফলে মৃত্তিকা দূষিত হয়। ইহা ব্যতীত শহর ও নগর পত্তনের ফলে নদীনালা সমতলভূমিতে পরিণত হইয়া উহার স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তনে ভৌগোলিক পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। ফলস্বরূপ, বহুপ্রাণীর বসবাসের সমস্যা সৃষ্টি হইতেছে। বৃহৎ অরণ্য, তৃণভূমি ধ্বংসের ফলে মৃত্তিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, শুধু তাহাই নহে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। কারণ উদ্ভিদজগতের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় 30 শতাংশ অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হয়।

কঠিন ও অভঙ্গুর পদার্থ মৃত্তিকাতে মিশ্রিত হইয়া বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে এবং ইহার ফলে মানুষ-সহ গৃহপালিত পশুমৃত্যুমুখে হয়।

প্রতিকারের উপায় (Control measures) :

(i) স্থলভাগ হইতে কঠিন আবর্জনাগুলিকে অপসারিত করিয়া একটি নিরাপদ জায়গায় স্তূপীকৃত করিয়া কম্পোস্ট সার তৈয়ারি করা উচিত।

(ii) যথেচ্ছভাবে নগর বা শহর পত্তন করা উচিত নয়।

(iii) প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃতদেহ একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা করিয়া নষ্ট করা উচিত।

18.27 তেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা দূষণ (Pollution by Radioactive Elements)

আণবিক এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলি আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের ফলে আলফা ও বিটা কণিকায় ভাঙ্গিয়া পরিবেশে অনুপ্রবেশ করে। আণবিক চুল্লী হইতে নির্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থ, ঔষধ নির্মাণ এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি জীবদেহের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক ও সেই সঙ্গে বাতাস, জল, খাদ্য ও অন্যান্য জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে প্রতিনিয়ত দূষিত করে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করিয়া জীবদেহের প্রভূত ক্ষতি করে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় যে, খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে প্রাণিদেহের অস্থিতে স্ট্রোনসিয়াম (Strontium), পেশীতে সেসিয়াম (Cesium), থাইরয়েড গ্রন্থিতে আয়োডিন (Iodine) সঞ্চিত হয়। ইহার ফলে প্রাণিদেহে বিভিন্ন মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয় এমন কি সমগ্র জীবজগৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সুতরাং সর্বাগ্রে বায়ু, জল এবং মৃত্তিকাকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন এবং মানব জাতির স্বার্থে পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বস্তরের নাগরিককে সোচ্চার হইতে হইবে।

দূষণকে শব্দ দূষণ বলে। শহরের প্রায় সমস্ত রাস্তাতে যান-বাহনের প্রচণ্ড শব্দ বা গাড়ীর হর্ণের আওয়াজ পথচারীদের কাছে এক সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। রাস্তার ধারে অবস্থিত হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ প্রভৃতি যানবাহনের প্রচণ্ড শব্দে রোগী অথবা ছাত্রছাত্রীদের অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। শিল্পাঞ্চলগুলির কাছে অবস্থিত এলাকাগুলিতে অনবরত প্রচণ্ড শব্দের জন্য মানুষের এক জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইহা ব্যতীত সর্বদা মাইকের বিরক্তিকর শব্দ মানুষের অসহনীয় যন্ত্রণার সৃষ্টি করে।

তরঙ্গের আকারে শব্দ বাহিত হয় এবং এই তরঙ্গ মানুষের কানে পোঁছাইলে মানুষ শুনিতে পায়। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত ও তীব্র শব্দ মানুষের যন্ত্রণার অসহ্য কারণ। শব্দের তীব্রতার পরিমাপকে ডেসিবেল (Decibel or dB) বলে। সাধারণত 85 dB পর্যন্ত শব্দের তীব্রতা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, কিন্তু ইহা অপেক্ষা বেশি হইলে শব্দ দূষণ ঘটায়।

এই বিকট শব্দ মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে, হৃৎপিণ্ডে, সংবেদন অঙ্গের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলস্বরূপ, মানুষের স্নায়বিক বৈকল্য, হৃদ্‌রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, অনিদ্রা, মাথাধরা, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় এবং দৈনন্দিন কার্যকারিতা ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

প্রতিকারের উপায় (Control measures) :

(i) আমাদের সভ্য সমাজে অপরের কোন অসুবিধা না হয় সেই সম্পর্কে সুসভ্য নাগরিক হিসাবে যথাযোগ্য সচেতন হওয়া উচিত।

(ii) রাস্তায় বিশেষ করিয়া হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং বিকট শব্দে গাড়ীর হর্ণ বাজানো বন্ধ করা উচিত।

(iii) মাইক, গ্রামোফোন, রেডিও, টেপ রেকর্ডার প্রভৃতি আস্তে চালানো উচিত।

(iv) জনবসতি এলাকা হইতে শিল্পাঞ্চল স্থাপন নিষিদ্ধ করা উচিত।

বিষয়-সংক্ষেপ

কোন নির্দিষ্ট স্থানের জীবগোষ্ঠীর বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক এবং ঐ স্থানের জড় উপাদানগুলির সহিত মিথঃক্রিয়ায় যে বসবাস নীতি গড়িয়া উঠে তাহাকে বাস্তুতন্ত্র বলে। একটি বাস্তুতন্ত্রের দুইটি উপাদান থাকে, যথা—জড় ও জৈব উপাদান। জড় উপাদান অজৈব, জৈব এবং ভৌত উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। আবার, জৈব উপাদান স্বভোজী বা উৎপাদক এবং পরভোজী লইয়া গঠিত। খাদক এবং বিয়োজকের সমন্বয়ে পরভোজী গঠিত। খাদকের মধ্যে কয়েকটি সারি বা শ্রেণী দেখা যায়, যেমন—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা সর্বোচ্চ সারির খাদক। ইহার মধ্যে প্রথম সারির খাদক যেহেতু উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল এইজন্য ইহারা সবাই

শাকাশী প্রাণী। অপরপক্ষে, অন্যান্য সারির খাদক সবাই মাংসাশী প্রাণী। বিয়োজকের মধ্যে ব্যাক্‌টিরিয়া, ছত্রাক অন্তর্ভুক্ত।

যে সমস্ত সবুজ উদ্ভিদ প্রকৃতির অজৈব উপাদান এবং সৌর শক্তির সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে তাহাদের উৎপাদক বলে। উৎপাদকগুলি দুই প্রকার, যথা—জলে একপ্রকার আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ থাকে যাহারা ফাইটোপ্ল্যাংকটন নামে পরিচিত। দ্বিতীয় প্রকার উৎপাদকগুলি হইল স্থলের এবং জলাশয়ের বড় আকৃতির উদ্ভিদ।

উদ্ভিদ প্রকৃতি হইতে জড়বস্তুর সহায়তায় নিজেরা খাদ্য প্রস্তুত করে। সেই খাদ্য শাকাশী প্রাণীরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। আবার শাকাশী প্রাণীরা মাংসাশী প্রাণীদের দ্বারা ভক্ষিত হয়। পরিশেষে উৎপাদক এবং খাদকের মৃত্যু হইলে মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার বিয়োজক উক্ত জীবদেহকে পচন ঘটাইয়া জৈব ও অজৈব পদার্থে বিশ্লিষ্ট করে। পুনরায় এই সমস্ত পদার্থ সবুজ উদ্ভিদেরা খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য গ্রহণ করে।

প্রকৃতির পরিবেশ অনুসারে বাস্তুতন্ত্র প্রধানত দুই প্রকার, যথা—জলজ ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্র। একটি জলজ বাস্তুতন্ত্র পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, একটি পুকুরে অজৈব বা জড় উপাদানের মধ্যে জল, মাটি, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সূর্যালোক প্রভৃতি বর্তমান। জৈব উপাদানের মধ্যে আণুবীক্ষণিক শৈবাল এবং বৃহদাকার উদ্ভিদ বিদ্যমান। ইহারা পুকুরে উৎপাদকের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে। পুকুরে যে সমস্ত জলজ পতঙ্গ এবং সন্ধিপদী প্রাণী থাকে তাহারা ঐ সমস্ত উৎপাদককে ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহারা হইল প্রথম সারির খাদক। এইভাবে ইহাদের খাদ্য হিসাবে ভক্ষণ করে দ্বিতীয় সারির খাদক (ছোট ছোট মাছ, চিংড়ি প্রভৃতি) এবং ইহাদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তৃতীয় বা সর্বোচ্চ সারির খাদক (বড় মাছ, বক, সাপ প্রভৃতি প্রাণী)। অবশেষে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু হইলে পুকুরের মাটিতে অবস্থিত ব্যাক্‌টিরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি বিয়োজক মৃত জীবদেহের পচনক্রিয়া সংঘটিত করিয়া জৈব বা অজৈব পদার্থ মুক্ত করে যাহা পুনরায় উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত হয়। সুতরাং উৎপাদক হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন সারির খাদকের মধ্যে যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান তাহাকে খাদ্য শৃঙ্খল বলে। যদি স্থলের বাস্তুতন্ত্র পর্যালোচনা করা যায় তাহা হইলে সবুজ উদ্ভিদকে ছাগল, হরিণ, গরু প্রভৃতি শাকাশী প্রাণী ভক্ষণ করে। ইহাদের ভক্ষণ করে কুকুর, শৃগাল, নেকড়ে প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী। আবার ইহাদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে বাঘ, সিংহ, বাজপাখী, শকুন ইত্যাদি মাংসাশী প্রাণী। বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য শৃঙ্খল বিদ্যমান এবং ইহারা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। এই বিভিন্ন প্রকার খাদ্য শৃঙ্খলের সুবিন্যাসকে খাদ্যজাল বলে।

বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক হইতে শুরু করিয়া সর্বোচ্চ সারির খাদক পর্যন্ত যতই উপরের দিকে যাওয়া যায় ততই দেখা যায় ইহাদের সংখ্যা, শক্তি ও ওজন ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে এবং ইহাদের যদি কাল্পনিক রেখার দ্বারা যোগ করা হয় তাহা হইলে পিরামিডের আকৃতি ধারণ করে। ইহাকে বাস্তুসংস্থানগত পিরামিড বলে। ইহা তিন প্রকার,

যথা—সংখ্যার, শক্তির এবং জীবভরের পিরামিড। বাস্তুতন্ত্রে শক্তির উৎস হইল সূর্য। সমস্ত সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় স্থৈতিক শক্তিরূপে জৈবখাদ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। বাস্তুতন্ত্রে এই শক্তি পর্যায়ক্রমিক প্রথম সারির খাদক হইতে সর্বোচ্চ সারির খাদকে স্থানান্তরিত হয়। পরিশেষে মৃত উৎপাদক ও খাদকের দেহ পচনের ফলে বিয়োজকের দেহে স্থানান্তরিত হয় এবং ইহার দেহে প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়, এইরূপ সৌরশক্তির স্থানান্তরকে শক্তিপ্রবাহ বলে। এই শক্তিপ্রবাহ একমুখী। শক্তিপ্রবাহ তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যথা—শক্তি অর্জন, শক্তির ব্যবহার এবং শক্তির স্থানান্তর।

সংরক্ষণ

প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার, রক্ষণ, অপচয়রোধ ও ক্ষয়পূরণের পদ্ধতিকে সংরক্ষণ বলে।

সংরক্ষণের উদ্দেশ্য: 1. মানুষকে নির্মল আনন্দ দান। 2. প্রাকৃতিক সম্পদের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার, অপচয় রোধ ও ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থা। 3. বিরল ও মূল্যবান উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব বজায় রাখা। 4. প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার।

জল সংরক্ষণ: নিম্নলিখিত উপায়ে জল সংরক্ষণ করা যাইতে পারে—

1. বিভিন্ন স্থানে ক্যাচমেন্ট অঞ্চল গঠন করিয়া জল ধরিয়া রাখা।

2. বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দিয়া জলাধার সৃষ্টি করিয়া বন্যারোধ করা এবং গ্রীষ্মের সময় ঐসকল জলাধার হইতে জলসরবরাহ করা।

3. জমি কর্ষণ করিয়া জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও চাষের প্রয়োজনাতিরিক্ত জল ব্যবহার না করা।

4. বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ করা ও বৃক্ষরোপণ করা ও চাষের জমির আগাছা উৎপাটন করা।

ভূমি সংরক্ষণ: ভূমি সংরক্ষণে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে—

1. নগ্ন মৃত্তিকার উপর ঘাস ও বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ রোপণ করা।

2. সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঝাউ, পাইন প্রভৃতি বৃহৎ বৃক্ষ রোপণ করা।

3. সমুদ্র বা নদীর তীরে পাথরের পাড় বাঁধিয়া।

4. শস্যক্ষেত্রের চারিদিকে আল কিংবা ঢালু পাহাড়ী জমিতে বিভিন্ন ধাপ তৈয়ারি করিয়া।

5. পশুচারণ বন্ধ করা, মৃত্তিকার অগভীর কর্ষণ করা।

6. খড়-কুটা, ঘাস-পাতা, পলিথিনের কাগজ প্রভৃতির আচ্ছাদন দ্বারা।

7. শস্য পর্যায়, শিম্ব গোত্রীয় উদ্ভিদের চাষ, জৈব বা কম্পোস্ট এবং অজৈব সার প্রয়োগ করিয়া।

বন সংরক্ষণ: বন সংরক্ষণে নিম্নলিখিত উপায়গুলি বিশেষ সহায়ক—

1. অপরিণত উদ্ভিদ কাটা বন্ধ করা ও কাটা স্থানগুলিতে নূতন চারাগাছ রোপণ করা।

2. প্রতি বৎসর নূতন নূতন চারাগাছ বসানো।

3. অগ্নিকাণ্ড, পরজীবী, ছত্রাক ও কীটপতঙ্গের হাত হইতে বনভূমি রক্ষার ব্যবস্থা করা।

4 চোরাচালানকারী হাত হইতে বনাঞ্চল রক্ষা করা।

5. বনজ সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত ও সচেতন করা।

6. বনজ সম্পদের অপচয়রোধ ও রক্ষণের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ: বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকে—

1. বন সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং বনাঞ্চলের গুরুত্ব অনুযায়ী জাতীয় পার্ক, বন্যপ্রাণী স্যাংচুয়ারি, অভয়ারণ্য বা সংরক্ষিত অরণ্য হিসাবে ঘোষণা করা।

2. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য আইন চালু করিয়া,

3. চোরাশিকারীদের দমন করিবার জন্য সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা।

4. বণ্যপ্রাণী অবলুপ্তি যে দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক তাহা রেডিও, সংবাদপত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমে প্রচার দ্বারা জনমত গঠন করা।

দূষণ

পরিবেশে কোন অবাঞ্ছিত পদার্থের অনুপ্রবেশের ফলে যখন জীবের বা প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয় তখন তাহাকে দূষণ বলে। দূষণকারী পদার্থের মধ্যে ধূলো-বালি, ধোঁয়া, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ফ্লোরিন ও ফ্লোরাইড, কীটনাশক, আগাছানাশক, ছত্রাকনাশক প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ; ইথার, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, বেনজিন, ইথিলিন, অ্যালডিহাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং বিভিন্ন প্রকার তেজস্ক্রিয় পদার্থ উল্লেখযোগ্য। এই দূষণকারী বিষাক্ত পদার্থ সহজে ভাঙিয়া যাইতে পারে অথবা না ভাঙিয়া অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে। প্রথমোক্ত পদার্থকে ভঙ্গুর এবং শেষোক্ত পদার্থকে অভঙ্গুর দূষণকারী পদার্থ বলে। আমাদের পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার দূষণ দেখা যায়, যথা—বায়ু দূষণ, জল দূষণ, মৃত্তিক দূষণ, তেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা দূষণ এবং শব্দ দূষণ। বায়ুতে যখন অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়া যায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাসের মাত্রা বাড়িয়া যায় তখন বায়ু দূষিত হয়। ফলে মানুষের ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস, হাঁপানী, শ্বাসকষ্ট, মাথাধরা, বিভিন্ন প্রকার ত্বকের রোগ দেখা যায়। ইহা ব্যতীত প্রাণী ও উদ্ভিদের বিভিন্ন উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়। জীবন ধারণের জন্য জল অপরিহার্য উপাদান। সমুদ্র, নদী, পুষ্করিণী বা জলাশয়ের জল বিভিন্ন প্রকারে দূষিত হইতে পারে, যথা—সিউয়েজের ময়লা জল দ্বারা বিভিন্ন কলকারখানা হইতে নিষ্কাশিত বর্জ্য পদার্থ দ্বারা, কীটনাশক ও আগাছানাশক রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা প্রভৃতি। মৃত্তিকায় বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য পদার্থ ও রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে

মৃত্তিকা নানাভাবে দূষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পরিবেশে অনুপ্রবেশের ফলে ইহা কলুষিত হয়। ইহা ব্যতীত আমাদের পরিবেশ বিকট শব্দের জন্যও দূষিত হয়। এই বিকট শব্দ মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে, হৃৎপিণ্ডে, সংবেদন অঙ্গের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া স্নায়বিক বৈকল্য, হৃদ্‌রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, অনিদ্রা, মাথাধরা প্রভৃতি রোগের লক্ষণ দেখা যায়।

প্রশ্নাবলী

A. পার্থক্য নির্দেশ কর :

1. সিনইকোলজি ও অটইকোলজি।
2. বায়োস্ফিয়ার ও ইকোস্ফিয়ার।
3. উৎপাদক ও খাদক।
4. নেকটন ও নিউস্টন।
5. ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও জুপ্ল্যাংকটন।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

1. ইকোসিস্টেম কাহাকে বলে?
2. বায়োটিক কমিউনিটি বলিতে কি বুঝ?
3. পপুলেশান কথাটির অর্থ কি?
4. বিয়োজক কাহাকে বলে?
5. খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্য জাল কাহাকে বলে?
6. ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলিতে কি বুঝ?
7. প্ল্যাংকটন, নেকটন ও বেনথস কাহাকে বলে?
8. সংরক্ষণ কাহাকে বলে? ইহার প্রয়োজনীয়তা কি?
9. অভয়ারণ্য ও সংরক্ষিত অরণ্য বলিতে কি বুঝ?
10. দূষণ কাহাকে বলে?
11. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করার পরিণতি কি?

C. রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

1. ইকোসিস্টেমের উপাদানগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
2. একটি পুকুরের ইকোসিস্টেম বর্ণনা কর।
3. ইকোসিস্টেমের শক্তিপ্রবাহ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
4. মাটি ও জল সংরক্ষণের পদ্ধতি উল্লেখ কর।
5. বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের পদ্ধতি এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।
6. জাতীয় পার্ক, স্যাংচুয়ারি, অভয়ারণ্য ও সংরক্ষিত অরণ্য বলিতে কি বুঝ? চারিটি উল্লেখযোগ্য বনাঞ্চলের নাম উল্লেখ করিয়া উহাদের মধ্যে সংরক্ষিত প্রাণীগুলির নাম লিখ।
7. গণ্ডার-প্রকল্প কাহাকে বলে? গণ্ডার-প্রকল্পের শর্ত কি কি?
8. ব্যাঘ্র-প্রকল্প সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
9. বায়ু, জল ও শব্দ কিভাবে দূষিত হয়।
10. বায়ু দূষণ, জল দূষণ ও শব্দ দূষণের প্রতিকার কিভাবে সম্ভব তাহা উল্লেখ কর।
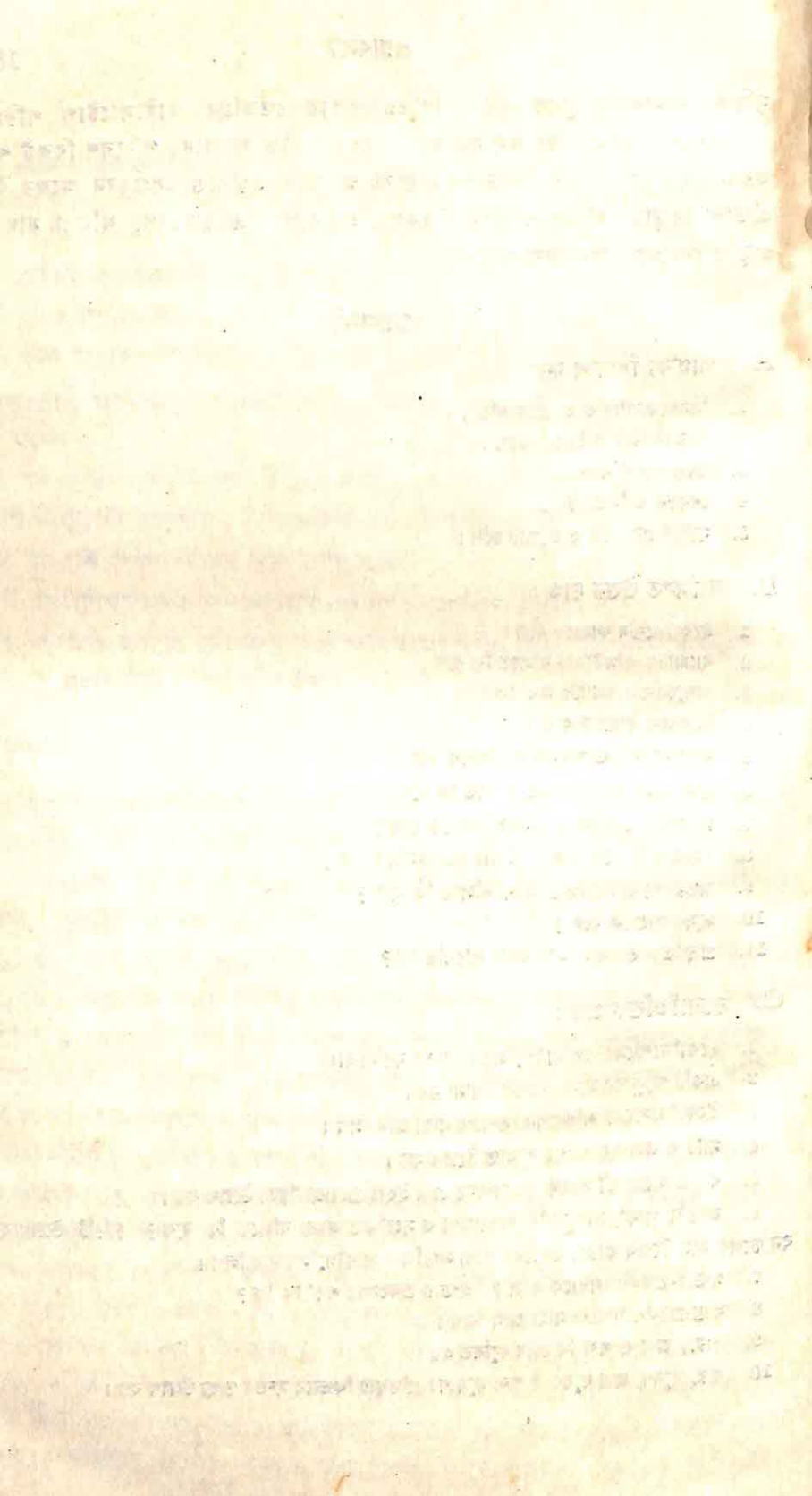
জীবনবিজ্ঞানের কতিপয় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য

কোষপ্রাচীর	কোষপর্দা
1. উদ্ভিদকোষের বাহিরে দৃঢ়, পুরু ও জড় বস্তুর আবরণকে কোষপ্রাচীর বলে।	1. উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্রোটোপ্লাজমের বাহিরে স্থিতিস্থাপক, পাতলা সজীব আবরণকে কোষপর্দা বলে।
2. ইহা ভেদ্য এবং প্রধানত সেলুলোজ ও পেকটিন জাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত।	2. ইহা অর্ধভেদ্য এবং প্রোটিন ও লিপিড দ্বারা গঠিত।
3. কোষীয় অঙ্গাণু গঠনে অংশগ্রহণ করে না।	3. কোষীয় পর্দাবৃত অঙ্গাণু গঠনে অংশগ্রহণ করে।
4. পিনোসাইটোসিস ও ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না।	4. পিনোসাইটোসিস ও ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে তরল ও কঠিন পদার্থ গ্রহণ করে।
5. কোষপ্রাচীরের গায়ে অলঙ্করণ দেখা যায়।	5. কোষপর্দার গায়ে অলঙ্করণ দেখা যায় না।

রাইবোজোম	লাইসোজোম
1. পর্দাবিহীন সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু।	1. পর্দাবৃত সাইটোপ্লাজমীয় থলি বিশেষ।
2. উদ্ভিদকোষে ও প্রাণিকোষে বিদ্যমান।	2. কেবল প্রাণিকোষে থাকে, সাধারণত উদ্ভিদ কোষে থাকে না।
3. রাইবোজোমে RNA ও প্রোটিন থাকে।	3. থলির ভিতর অসংখ্য আর্দ্র-বিশ্লেষক উৎসেচক থাকে।
4. প্রোটিন সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে।	4. অটোফ্যাগি, অটোলাইসিস, বহিঃকোষীয় পাচন প্রভৃতি কার্যে অংশগ্রহণ করে।
5. দুইটি খণ্ডে বিভক্ত।	5. খণ্ডে বিভক্ত নহে।

ক্লোরোপ্লাস্টিড	ক্রোমোপ্লাস্টিড
1. ইহা সবুজ বর্ণের প্লাস্টিড।	1. ইহা সবুজ বর্ণ ব্যতীত যে কোন রঙীন প্লাস্টিড।
2. থাইলাকয়েড আছে এবং ইহাতে রঞ্জক পদার্থ বিদ্যমান।	2. থাইলাকয়েড নাই এবং রঞ্জক পদার্থ ধাত্রে ছড়ানো থাকে।
3. প্রধান রঞ্জক পদার্থ ক্লোরোফিল।	3. প্রধান রঞ্জক পদার্থ ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল।
4. সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে।	4. ফুল, ফল প্রভৃতিকে রঞ্জিত করে এবং পরাগযোগে সাহায্য করে।

সেন্ট্রোজোম	সেন্ট্রোমিয়ার
1. প্রাণিকোষের সাইটোপ্লাজমে থাকে।	1 উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের ক্রোমোজোমে থাকে।
2. RNA ও প্রোটিন দ্বারা তৈয়ারি।	2. DNA ও প্রোটিন দ্বারা তৈয়ারি।
3. স্পিণ্ডল বা বেম গঠনে অংশগ্রহণ করে।	3. ক্রোমোজোমকে বেমতন্তুর সহিত যুক্ত করে।

ব্যাপন	অভিস্রবণ
1. ব্যাপন তরলে-তরলে, গ্যাসে-গ্যাসে, কঠিনে-তরলে, কঠিনে-গ্যাসে প্রভৃতিতে সম্পন্ন হয়।	1. কেবল তরলে-তরলে সম্পন্ন হয়।
2. কোন পর্দার প্রয়োজন হয় না।	2. অর্ধভেদ্য পর্দার প্রয়োজন হয়।
3. পদার্থের অণুগুলি বেশি ঘনত্ব হইতে কম ঘনত্বের দিকে ছড়াইয়া পড়ে।	3. দ্রাবকের অণুগুলি কম ঘনত্বের তরল হইতে বেশি ঘনত্বের দিকে ধাবিত হয়।
4. ব্যাপন সম অথবা বিষম প্রকৃতির দ্রবণে ঘটিয়া থাকে।	4 অভিস্রবণ সমপ্রকৃতির দ্রবণে ঘটিয়া থাকে।

সক্রিয় শোষণ	নিষ্ক্রিয় শোষণ
1. গাঢ়ত্বের বিপরীতে আয়ন কোষের মধ্যে প্রবেশ করে।	1 গাঢ়ত্বের স্বপক্ষে আয়ন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষের মধ্যে প্রবেশ করে।
2 ATP ব্যয়িত হয়।	2. ATP ব্যয়িত হয় না।
3. আয়ন শোষণে বাহকের প্রয়োজন হয়।	3. বাহকের প্রয়োজন হয় না।
4. একই সঙ্গে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন শোষিত হয়।	4. একই সঙ্গে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন শোষিত হয় না।
5. উৎসেচকের প্রয়োজন হয়।	5. উৎসেচকের প্রয়োজন হয় না।

ইউক্রোমাটিন	হেটারোক্রোমাটিন
1. ক্রোমোজোমের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া অবস্থান করে।	1. ক্রোমোজোমের স্বল্প স্থান জুড়িয়া অবস্থান করে।
2. ইহা ইণ্টারফেজ দশায় হালকা রঙ এবং বিভাজন দশায় গাঢ় রঙ গ্রহণ করে।	2. সর্বদা গাঢ় রঙ গ্রহণ করে।
3. বংশগতির ব্যাপারে সক্রিয়।	3. বংশগতির ব্যাপ্যারে নিষ্ক্রিয় কিন্তু নিউক্লিক অ্যাসিডের সংশ্লেষ এবং ক্রোমোজোমের বিপাকীয় ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
4. ক্রসিং-ওভার এই অংশে ঘটিয়া থাকে।	4 সাধারণত এই অংশে ক্রসিং-ওভার সংঘটিত হয় না।

ডি. এন. এ.	আর. এন এ.
1. দ্বিতন্ত্রী।	1. একতন্ত্রী।
2. ডি-অক্সি রাইবোজ শর্করা থাকে।	2. রাইবোজ শর্করা থাকে।
3. ইহাতে অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিন বেস থাকে।	3. ইহার বেসগুলি ডি. এন. এ.-র ন্যায় তবে থাইমিনের পরিবর্তে ইউরাসিল থাকে।
4. বংশগতির ধারক ও বাহক।	4. ইহা প্রোটিন সংশ্লেষে অংশ গ্রহণ করে।
5. ইহা ক্রোমোজোম, মাইটোকনড্রিয়া, প্লাসটিড প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।	5. ইহা সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিওপ্লাজম ও রাইবোজোমে পাওয়া যায়।

মুখ্য খাঁজ	গৌণ খাঁজ
1. সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোজোমের সংকুচিত অংশকে মুখ্য খাঁজ বলে।	1. মুখ্য খাঁজ ব্যতীত ক্রোমোজোমের এক বা একাধিক খাঁজকে গৌণ খাঁজ বলে।
2. ইহার সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমকে বেমতন্তুর সহিত সংযুক্ত করে ও ক্রোমোজোমের অ্যানাফেজ চলনে সাহায্য করে।	2. ক্রোমোজোমের একটি গৌণ খাঁজ অংশে নিউক্লিওলাস গঠিত হয় এবং ইহাকে নিউক্লিওলার অর্গানাইজার বলে।

সাইন্যাপসিস	সাইন্যাপস্
1. মিয়োসিসের প্রথম প্রফেজের জাইগোটিন উপদশায় সমসংস্থ ক্রোমোজোমদ্বয়ের পাশাপাশি আসাকে সাইন্যাপসিস বলে।	1. দুইটি নিউরোণের সংযোগস্থলকে সাইন্যাপস্ বলে।
2. হোমোলোগাস ক্রোমোজোমদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সাইন্যাপ্টোনেমাল কমপ্লেক্স থাকে।	2. সাইন্যাপসের মধ্যে অ্যাসিটাইল কোলিন নামক নিউরোহিউমর থাকে।

অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি	হলোক্রিন গ্রন্থি
1. এই গ্রন্থির কোষসমূহের অগ্রভাগ বিদারিত হইয়া ক্ষরিত বস্তুকে বাহিরে নির্গত করে।	1. এই গ্রন্থির কোষসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিদারিত হইয়া ক্ষরিত বস্তুকে বাহির করিয়া দেয়।
2. ক্ষরিত কোষগুলি পুনরায় পুনরুৎপাদন পদ্ধতিতে গঠিত হয় এবং ক্ষরিত বস্তু সঞ্চয় করিতে থাকে। যথা—স্তনগ্রন্থি, গবলেট কোষ।	2 বিনষ্ট কোষের স্থান নূতন কোষ দ্বারা অধিকৃত হয়। যথা—ত্বকের সিবেসিয়াস গ্রন্থি।

আবর্তাকার ফসফোরীভবন	অনাবর্তাকার ফসফোরীভবন
1. একটি রঞ্জক তন্ত্রের প্রয়োজন (PS-I)	1. দুইটি রঞ্জক তন্ত্রের প্রয়োজন (PS-I ও II)
2. ক্লোরোফিল a হইতে বিচ্যুত ইলেকট্রন পুনরায় ঐ ক্লোরোফিল অণুতে ফিরিয়া আসে।	2. ক্লোরোফিল a হইতে বিচ্যুত ইলেকট্রন প্রান্ত গ্রাহকের ($NADP^+$) সহিত মিলিত হয় এবং ক্লোরোফিল a অণুর শূন্যস্থান ক্লোরোফিল b হইতে নির্গত ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হয়।
3. এই প্রক্রিয়ায় জল বিশ্লিষ্ট হয় না এবং অক্সিজেন মুক্ত হয় না।	3. এই প্রক্রিয়ায় জল বিশ্লিষ্ট হইয়া অক্সিজেন মুক্ত করে।
4. সবুজ উদ্ভিদের গৌণ প্রক্রিয়া ও সালোকসংশ্লেষকারী ব্যাকটিরিয়ার মুখ্য প্রক্রিয়া।	4. সবুজ উদ্ভিদের মুখ্য প্রক্রিয়া।

সালোকসংশ্লেষ	শ্বসন
1. উপচিতি প্রক্রিয়া।	1. অপচিতি প্রক্রিয়া।
2. আলোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলযুক্ত কোষে সালোকসংশ্লেষ সংঘটিত হয়।	2. শ্বসন আলোক নিরপেক্ষ ও সকল কোষে দিবারাত্র সম্পন্ন হয়।
3. এই প্রক্রিয়ায় CO_2 বিজারিত হইয়া গ্লুকোজে পরিণত হয়।	3. শ্বসনে গ্লুকোজ জারিত হইয়া CO_2 এবং H_2O-তে পরিণত হয়।
4. এই প্রক্রিয়ায় CO_2 গৃহীত হয় এবং O_2 নির্গত হয়।	4. এই প্রক্রিয়ায় O_2 গৃহীত হয় এবং CO_2 নির্গত হয়।
5. এই প্রক্রিয়ায় ATP গৃহীত হয়।	5. এই প্রক্রিয়ায় ATP নির্গত হয়।
6. শুষ্ক ওজন* বৃদ্ধি পায়।	6. শুষ্ক ওজন হ্রাস পায়।

উদ্ভিদের পুষ্টি	প্রাণীর পুষ্টি
1. অধিকাংশ উদ্ভিদ নিজেরা খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে বলিয়া ইহাদের স্বভোজী বলে।	1. সকল প্রাণী (ইউগ্লিনা, ক্রাইসামিবা প্রভৃতি প্রাণী ব্যতীত) খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। সেইজন্য ইহাদের পরভোজী বলে।
2. সংশ্লেষিত খাদ্য তরল পদার্থরূপে সমগ্র দেহে প্রবাহিত হয়।	2. ইহারা তরল বা কঠিন খাদ্যগ্রহণ করে এবং তরল অবস্থায় কোষ দ্বারা শোষিত হয়।
3. ইহাদের পাচন পদ্ধতি অন্তঃকোষীয়।	3. প্রাণীদের পাচন পদ্ধতি বহিঃকোষীয়, অন্তঃকোষীয় বা উভয় প্রকার হইতে পারে।
4. পৌষ্টিক তন্ত্র অনুপস্থিত।	4. অধিকাংশ প্রাণীর নির্দিষ্ট পৌষ্টিক তন্ত্র উপস্থিত।

* শুষ্ক ওজন (Dry Weight) কোষ হইতে জল অপসারণ করিলে যে ওজন পাওয়া যায় তাহাকে শুষ্ক ও জন বলে।

উদ্ভিদের সংবহন	প্রাণীর সংবহন
1. উদ্ভিদের সংবহনের মাধ্যম হইল জল।	1. প্রাণীদের সংবহনের মাধ্যম হইল জল, রক্ত ও লসিকা।
2. নির্দিষ্ট সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত।	2. অধিকাংশ প্রাণীর সুসংবদ্ধ সংবহন তন্ত্র উপস্থিত।
3. সংবহনের জন্য হৃৎপিণ্ডের ন্যায় কোন পাম্পিং অঙ্গ নাই।	3. অধিকাংশ প্রাণীর সংবহনের জন্য হৃৎপিণ্ড বিদ্যমান।
4. উদ্ভিদের সংবহনে জল মাটি হইতে জাইলেমের মাধ্যমে পাতায় পৌঁছায় এবং তথা হইতে সংশ্লেষিত খাদ্য ফ্লোয়েমের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।	4. অধিকাংশ প্রাণীর জল ও অন্যান্য তরল পদার্থ রক্তের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড হইতে দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

উদ্ভিদের রেচন	প্রাণীর রেচন
1. উদ্ভিদের কোন নির্দিষ্ট রেচন অঙ্গ বা তন্ত্র নাই।	1. প্রাণীদের নির্দিষ্ট রেচন অঙ্গ বা তন্ত্র বিদ্যমান।
2. ইহাদের রেচন পদার্থ বল্কল, পাতা অথবা অদ্রাব্য কেলাস বা বিভিন্ন যৌগরূপে কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে।	2. ইহাদের দেহে রেচন পদার্থ সঞ্চিত থাকে না।
3. প্রধান রেচন পদার্থ হইল জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড। ইহা ব্যতীত কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেনবিশিষ্ট উপক্ষার দেহ হইতে নির্গত হয়।	3. ইহাদের রেচন পদার্থগুলি হইল ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি।
4. উদ্ভিদের কিছু কিছু রেচন পদার্থ দেহের কার্যে ব্যবহৃত হয়।	4. প্রাণীদের রেচন পদার্থ দেহের কোন কার্যে ব্যবহৃত হয় না।

উদ্ভিদের চলন ও গমন	প্রাণীর চলন ও গমন
1. মাটির সহিত আবদ্ধ থাকায় অধিকাংশ উদ্ভিদের গমন অঙ্গ নাই (ব্যতিক্রম-স্লাইম ছত্রাক, ক্ল্যামাইডোমোনাস, ডায়াটম, ভলভক্স প্রভৃতি)।	1. স্পঞ্জ, সাগরকুসুম, ওবেলিয়া প্রভৃতি প্রাণী ব্যতীত সকল প্রাণীর নির্দিষ্ট গমন অঙ্গ বর্তমান।
2. নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের গমনের গতিপথ উদ্দীপক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।	2. প্রাণীর গমন উদ্দীপক দ্বারা প্রভাবিত হইলেও উদ্দীপক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না।

উদ্ভিদের জনন	প্রাণীর জনন
1. উদ্ভিদের অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন জনন দেখা যায়।	1. প্রাণীর অযৌন ও যৌন জনন দেখা যায়।
2. রেণুর মাধ্যমে অযৌন জনন সম্পাদিত হয়।	2. সাধারণত দ্বি-বিভাজন অথবা বহুর্বিভাজনের মাধ্যমে অযৌন জনন সম্পাদিত হয়।
3. অন্তঃনিষেকের মাধ্যমে যৌন জনন সংঘটিত হয়।	3. অন্তঃনিষেক বা বহিঃনিষেকের মাধ্যমে যৌন জনন সংঘটিত হয়।
4. পরাগরেণু বা পুংজননকোষ স্থানান্তরের জন্য বাহকের প্রয়োজন।	4. বাহকের প্রয়োজন হয় না।

উদ্ভিদ হর্মোন	প্রাণী হর্মোন
1. উদ্ভিদ হর্মোন সাধারণত মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগ হইতে উৎপন্ন হয়।	1. প্রাণী হর্মোন দেহের কতকগুলি নির্দিষ্ট এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি হইতে উৎপন্ন হয়।
2. উদ্ভিদ হর্মোন ব্যাপন অথবা ফ্লোয়েমের মাধ্যমে দেহে পরিবাহিত হয়।	2. হর্মোন রক্ত ও লসিকার মাধ্যমে দেহে পরিবাহিত হয়।

স্বভোজী পুষ্টি	পরভোজী পুষ্টি
1. এই পুষ্টি পদ্ধতিতে জীব অজৈব পদার্থ হইতে খাদ্যবস্তু তৈয়ারি করে। যথা—ক্লোরোফিলযুক্ত জীব।	1. এই প্রকার পুষ্টি পদ্ধতিতে জীব খাদ্যের ব্যাপারে পরনির্ভরশীল। যথা—স্বভোজী ব্যতীত সমস্ত জীব।
2. অন্তঃকোষীয় পাচন পদ্ধতি দেখা যায়।	2. বহিঃকোষীয় বা অন্তঃকোষীয় পাচন অথবা উভয় প্রকার পাচন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়।

পরিপাক	বিপাক
1. সাধারণত কোষের বাহিরে খাদ্য-নালীর মধ্যে সম্পন্ন হয়।	1. সর্বদা কোষের মধ্যে সম্পন্ন হয়।
2. জটিল খাদ্যবস্তু উৎসেচক সহযোগে ভাঙ্গিয়া সরল ও শোষণযোগ্য খাদ্যবস্তুতে পরিণত হয়।	2. শোষিত খাদ্যবস্তু কোষের মধ্যে ভাঙ্গিয়া শক্তি ও বিভিন্ন পদার্থে পরিণত হয় অথবা বিভিন্ন পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

মুক্ত সংবহন	বদ্ধ সংবহন
1. এই প্রকার সংবহনে রক্ত সর্বদা রক্ত নালীর মধ্যে প্রবাহিত হয় না।	1. এই প্রকার সংবহনে রক্ত সর্বদা রক্ত নালীর মধ্যে প্রবাহিত হয়।
2. নালীপথে রক্ত প্রবাহিত হইবার পর দেহ-গহ্বরে উন্মুক্ত হয় এবং তথা হইতে রক্ত সরাসরি অথবা নালীপথে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে।	2. দেহ গহ্বর অনুপস্থিত এবং নালীর মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে।
যথা—চিংড়ি, আরশোলা, ,শামুক প্রভৃতি।	যথা—কেঁচো, জোঁক ও সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী।

রেচন	ক্ষরণ
1. বিপাকীয় কার্যের ফলে উদ্ভূত বর্জ্য পদার্থের বহিঃষ্করণকে রেচন বলে।	1. বিভিন্ন গ্রন্থি কর্তৃক রস নিঃসরণকে ক্ষরণ বলে।
2. বর্জ্য পদার্থ সাধারণত দেহের অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক।	2. ক্ষরিত পদার্থ (উৎসেচক, হর্মোন, মকরন্দ প্রভৃতি) দেহের বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হয়।

ম্যালপিজিয়ান নালিকা	ম্যালপিজিয়ান করপাস্‌ল্‌
1. পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীদের মধ্যান্ত্র ও পশ্চাদান্ত্রের সংযোগ স্থলে অবস্থিত একমুখ বদ্ধ একগুচ্ছ নালিকাকে ম্যাল-পিজিয়ান নালিকা বলে।	1. ইহা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৃক্কের নেফ্রনের অংশবিশেষ এবং বাওম্যানস্ ক্যাপস্যুল ও গ্লোমেরিউলাস লইয়া গঠিত।
2. ইহারা দেহ গহ্বর হইতে বর্জ্য পদার্থ শোষণ করিয়া অন্ত্রে উন্মুক্ত করে।	2. ইহারা রক্ত হইতে বর্জ্য পদার্থ শোষণ করিয়া বৃক্কনালিকায় উন্মুক্ত করে।

ট্রপিক চলন	ন্যাস্টিক চলন
1. উদ্ভিদের এই প্রকার চলন উদ্দীপকের গতিপথের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।	1. উদ্ভিদের এই প্রকার চলন উদ্দীপক দ্বারা প্রভাবিত হইলেও উদ্দীপ-কের গতিপথ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।
যেমন—আলোর দিকে কাণ্ড বাঁধত হয়।	যেমন—স্পর্শজনিত উদ্দীপনায় লজ্জা-বতীর পাতা বন্ধ হয়।
2. ট্রপিক চলনে অক্সিনের ভূমিকা বিদ্যমান।	2. অক্সিনের কোন ভূমিকা নাই।

নিউরোহিউমর	নিউরোহর্মোন
1. দুইটি নিউরোণের সংযোগস্থলে অবস্থিত রাসায়নিক পদার্থকে নিউরোহিউমর বলে। ইহা অ্যাক্সনের শেষপ্রান্ত হইতে নিঃসৃত হয়।	1. পরিবর্তিত স্নায়ুকোষ বা নিউরোসিক্রেটারী কোষ হইতে নিঃসৃত হর্মোনকে নিউরোহর্মোন বলে।
2. স্নায়ু প্রবাহে অংশগ্রহণ করে।	2. ইহা বৃদ্ধি, জনন কার্য, রূপান্তর প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কার্যে অংশগ্রহণ করে।

প্রকট লক্ষণ	প্রচ্ছন্ন লক্ষণ
1. দুইটি বিপরীত চারিত্রিক লক্ষণযুক্ত জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইলে যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয় তাহাকে প্রকট লক্ষণ বলে।	1. দুইটি বিপরীত চারিত্রিক লক্ষণ যুক্ত জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটাইলে যে বৈশিষ্ট্যটি অপ্রকাশিত থাকে তাহাকে প্রচ্ছন্ন লক্ষণ বলে।
2. হোমোজাইগাস অথবা হেটারোজাইগাস অবস্থায় এই লক্ষণ প্রকাশিত হইতে পারে।	2. কেবল হোমোজাইগাস অবস্থায় এই লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

ফিনোটাইপ	জিনোটাইপ
1. জীবের বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা নির্ধারিত শ্রেণীকে ফিনোটাইপ বলে।	1. জীবের জীন ঘটিত সংযুতির নির্ধারিত শ্রেণীকে জিনোটাইপ বলে।
2. ইহা সর্বদা বাহিরে প্রকাশিত হয়।	2. ইহা বাহির হইতে দেখা যায় না, পরন্তু একটি ফিনোটাইপের দুইটি জিনোটাইপ থাকিতে পারে। যেমন—মটরগাছের লম্বা বৈশিষ্ট্যের জিনোটাইপ TT অথবা Td হইতে পারে।

জীবাশ্ম	জীবন্ত জীবাশ্ম
1. পূর্বতন জীবের সংরক্ষিত দেহাবশেষ বা কোনরূপ নিদর্শনকে জীবাশ্ম বলে।	1. যে সমস্ত জীব সুদূর অতীতে সৃষ্টি হইয়া আজ অবধি বাঁচিয়া আছে অথচ তাহাদের সমসাময়িক জীবেরা বহু পূর্বে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহাদের জীবন্ত জীবাশ্ম বলে।
2. জীবজগতের বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে।	2. বিবর্তনের ইতিহাসে দুইটি জীবগোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে দুইটি নিকট সম্পকীয় জীবগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

সমসংস্থ অঙ্গ	সমবৃত্তি অঙ্গ
1. এই সমস্ত অঙ্গের উৎপত্তি ও মৌলিক গঠন কাঠামো এক কিন্তু কার্য ভিন্ন	1. এই সমস্ত অঙ্গের উৎপত্তি ও গঠন ভিন্ন কিন্তু কার্য এক।
2. অপসারী বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে।	2. অভিসারী বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে।

বায়োস্ফিয়ার	ইকোস্ফিয়ার
1. সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে উপর ও নিচের দিকে জীবের বাস করার যোগ্য অঞ্চলগুলিকে বায়োস্ফিয়ার বা জীবমণ্ডল বলে।	1. জলমণ্ডলের জল, বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাস ও অশ্মমণ্ডলের বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে জীবের আদানপ্রদান ও পারস্পরিক সম্পর্ককে ইকোস্ফিয়ার বা বাস্তব্যমণ্ডল বলে।
2. বায়োস্ফিয়ার জীবের বসতি নির্দেশ করে।	2. ইকোস্ফিয়ার জীবের জীবন যাপন প্রণালী সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ প্রশ্নাবলী

1980

First Paper

1. প্রোক্যারিয়োটিক কোষ বলিতে কি বুঝ ? ইউক্যারিয়োটিক কোষের সহিত উহার পার্থক্য বিবৃত কর।

2 মন্তব্য কর (যে কোন তিনটি) ঃ

(a) সঙ্কর, (b) স্বনিষেক, (c) ফেনোটাইপ, (d) প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন চরিত্র, (e) অটোসোম্, (f) ডি এন এ।

অথবা, জৈব অভিব্যক্তি বলিতে কি বুঝ ? ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ কিভাবে জৈব অভিব্যক্তিকে সমর্থন করে বুঝাইয়া দাও।

3. মৃত্তিকা সংরক্ষণের উপায় কি ?

অথবা, উদ্ভিদের জলসংবহন কি প্রকারে হইয়া থাকে ?

4. দ্বি-পদ নামকরণ বলিতে কি বুঝ ? নিম্নলিখিত নামগুলির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

(a) ট্যাক্সনোমি, (b) সিস্টেমেটিক্স, (c) ক্ল্যাসিফিকেশন এবং (d) সনাক্তকরণ।

5. কোষপ্রাচীর কি ? কোষত্বকের সহিত ইহার পার্থক্য কি ?

6. লিপিড ও পলিস্যাকারাইড কি ? উহাদের মধ্যে পার্থক্য কি ?

7. ফুসফুসীয় শিরা এবং ফুসফুসীয় ধমনীর পার্থক্য নিরূপণ কর।

8. একটি মানুষের বাদামী চক্ষু (B), নীলচক্ষু (b) এর উপর প্রকট। একটি বাদামী চক্ষু বিশিষ্ট লোক যদি একটি নীলচক্ষু বিশিষ্ট মহিলাকে বিবাহ করে এবং উহাদের বাদামী চক্ষু বিশিষ্ট ছয়টি সন্তান হয়, তবে ঐ পরিবারের সকলের জেনোটাইপগুলি কি কি ?

9. পার্থক্য নিরূপণ কর। (যে-কোন পাঁচটি) ঃ

(a) জননকোষ এবং দেহকোষ, (b) শর্তাধীন এবং শর্তবিহীন প্রতিবর্ত ক্রিয়া, (c) রক্ত এবং লসিকা, (d) অস্থি এবং তরুণাস্থি, (e) রেচন ও ক্ষরণ, (f) সাইন্যাপস্ এবং সাইন্যাপসিস্, (g) ইউক্রোমাটিন এবং হেটেরোক্রোমাটিন্, (h) নিউরোহরমোন্ এবং হর্মোন।

10. নিম্নলিখিত যে-কোন দশটির উত্তর দাও ঃ

(a) অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত দুইটি হরমোনের নাম বল।

(b) নিম্নলিখিত উৎসেচকগুলির কার্য লেখ ঃ

(1) অ্যামাইলেজ, (2) পেপসিন্, (3) ল্যাক্টেজ এবং (4) লাইপেজ।

(c) যদি একটি কঠিনাস্থিযুক্ত মাছের জোড়া পাখনাগুলি ছেদন করা হয় তবে কি ঘটিবে ?

(d) যদি একটি জীবিত কোষকে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া যায় তবে কি পরিলক্ষিত হইবে ?

(1) আইসোটনিক, (2) হাইপোটনিক এবং (3) হাইপারটনিক।

(e) একটি কোষের নাম কর যাহার মধ্যে কোন নিউক্লিয়াস নাই।

(f) নিম্নলিখিত অঙ্গগুলি যে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত তাহাদের নাম লিখ :

(1) ম্যালপিজিয়ান নালিকা, (2) সবুজ গ্রন্থি, (3) ফ্লেমকোষ ও (4) কন্ট্রাকটাইল ভ্যাকুওল।

(g) ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন এবং জুপ্লাঙ্কটনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

(h) ব্যাকটিরিয়া এবং ভাইরাসের মধ্যে তুমি কিভাবে পার্থক্য নিরূপণ করিবে ?

(i) কয়েকটি প্রাণীর নাম কর যাহারা নিষেক ব্যতিরেকে অপত্য প্রাণীর জন্ম দেয়।

(j) প্ল্যাঙ্কটন ও বেনথস কি ?

(k) জীবাশ্ম এবং জীবন্ত জীবাশ্ম বলিতে কি বুঝ ?

(l) বায়োস্ফিয়ার এবং বায়োমাসের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

(m) ডি. পি. এন. ও এ. ডি. পি. কি ? কি প্রসঙ্গে উহাদের নাম শুনিয়াছ ?

(n) ভেলামেন কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার যে-কোন একটির কার্য উল্লেখ কর।

1981

First Paper

[দক্ষিণ পার্শ্বস্থ আঁকগুলি প্রতি প্রশ্নের মূল্য নির্দেশক]

1. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—

(ক) বিপাকীয় ক্রিয়া, (খ) উত্তেজিতা, (গ) পরিব্রাহিতা, (ঘ) ছন্দোবদ্ধতা, (ঙ) উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরতা

অথবা ১+১+১+১+২=৬

পার্থক্য নির্দেশ কর :— (যে কোন তিনটি)

(ক) ব্যাপন ও অভিস্রবণ, (খ) কোষ-প্রাকার ও কোষ-পর্দা,

(গ) ক্লোরোপ্লাসটিড ও ক্রোমোপ্লাসটিড, (ঘ) রাইবোজোম ও লাইসোজোম,

(ঙ) DNA ও RNA

৩×২=৬

2. পেশী কলা কাহাকে বলে ? একটি সরেখ পেশীর গঠন বর্ণনা কর। ইহার সহিত অরেখ পেশীর তফাৎ কি ?

২+৪+২=৮

অথবা

উদ্ভিদের দুটি সংবহন কলার নাম কর। এদের মধ্যে যে-কোন একটির গঠনগত উপাদানের বিবরণ দাও। ইহার কাজ কি ?

২+৪+২=৮

3. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নিয়ন্ত্রণে মেরুদণ্ডী প্রাণীর যকৃতের ভূমিকা আলোচনা কর :—(ক) রক্তে শর্করার পরিমাণ, (খ) রক্তে লিপিডের পরিমাণ।

৩+৩=৬

অথবা

উত্তর লিখ ঃ—

(ক) ফটোলাইসিস কি ? (খ) প্লাজমোলাইসিস বলিতে তুমি কি বুঝ ?

(গ) সাইক্লোসিস কাহাকে বলে ? ২+২+২=৬

4. নেফ্রন কি ? নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর। মূত্র উৎপাদন ও নিষ্কাশন প্রণালীর বিবরণ দাও। ১+২½+১½+১=৬

অথবা

নিষেক কি ? একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেক পদ্ধতির বিবরণ দাও। ২+৪=৬

5. (ক) লামার্কের ও (খ) ডারউইনের মতবাদ অনুসারে জিরাফের গ্রীবা ও সম্মুখের পদ দুইটি ক্রমশ প্রলম্বিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৪+৪=৮

অথবা

যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ—

(ক) জীবন-সংগ্রাম কি ? (খ) নতুন প্রজাতির উদ্ভব বলিতে তুমি কি বুঝ ?

(গ) লুপ্তপ্রায় অঙ্গ বলিতে তুমি কি বুঝ ? (ঘ) সংযোগ রক্ষাকারী প্রাণী কাহাদের বলে ?

(ঙ) বিসৃষ্টিবাদ (Special creation) তত্ত্ব বাতিল হইয়াছে কেন ? ৪×২=৮

6. নিম্নলিখিত যে কোন দুইটির অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর ও এই বৈশিষ্ট্যগুলি যথাক্রমে উহাদের বসবাস করিতে কিরূপে সাহায্য করে তাহা বুঝাইয়া লিখ :— ২×৪=৮

(ক) ফণিমনসা, (খ) জলজ পদ্ম,

(গ) একটি আদর্শ মাছ, (ঘ) একটি উট।

অথবা

দূষণ কাহাকে বলে ? কি ভাবে বায়ু ও জল দূষিত হয় ? উহাদের নিবারণের উপায় কি ? ২+৪+২=৮

7. মেণ্ডেলের দ্বিসংকর প্রজনন পরীক্ষার চেকার বোর্ডের সাহায্যে (ছক) বংশধরগুলির সংখ্যা, অনুপাত ও তাহাদের ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপগুলি দেখাও। দ্বিসংকর পরীক্ষার ফলাফল হইতে মেণ্ডেল কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ?

১+১+২+২+২=৮

অথবা

খাদ্য ও উৎপাদক কাহাদের বলে ? ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি ? প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করার পরিণতি উল্লেখ কর। বায়োস্ফিয়ারের সংজ্ঞা দাও।

২+২+২+২=৮

8. নিম্নলিখিত যে-কোন দশটির উত্তর দাও :—

(ক) জলজ উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় গ্যাসের উৎস কি ? (খ) গ্লাইকোলিসিসের ফলে কি কি উৎপন্ন হয় ? (গ) কোন কোন যমজ

অভিন্নরূপের ও কোন কোন যমজ ভিন্নরূপের হয়—ইহার কারণ নির্দেশ কর। (ঘ) গাছের গৌণ বৃদ্ধি কাহাকে বলে? (ঙ) সিনগ্যামি ও কনজুগেসনের (Conjugation) পার্থক্য নির্দেশ কর। (চ) মায়োসিসকে 'হ্রাসকরণ বিভাজন' বলা হয় কেন? (ছ) অ্যামাইনো অ্যাসিড কি? মানুষের শরীরের দুটি প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাম কর। (জ) ভেনাস হৃৎপিণ্ড কাহাকে বলে? (ঝ) ডি. এন. এ. (DNA) অণুর চারিটি ক্ষার মূলকের (Base) নাম কর। (ঞ) ইকোসিস্টেমের প্রবাহিত শক্তির উৎস কি? (ট) সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গের পার্থক্য নির্দেশ কর। (ঠ) মিথোজীবীয় পুষ্টি কাহাকে বলে? (ড) অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের পার্থক্য নির্দেশ কর। (ঢ) পাট কোন্ ধরনের তন্তু? (ণ) সাইনাপসিস কাহাকে বলে? (ত) মাটির 'স্বাভাবিক কর্ষক' কাহাদের বলে? কেন তাহাদের এরূপ বলা হয়? ১০ × ২ = ২০

1982

First Paper

1. নিম্নলিখিত যে-কোন চারটির পার্থক্য নির্দেশ কর :—

(ক) বদ্ধ ও মুক্ত সংবহনতন্ত্র। (খ) স্বভোজী ও পরভোজী পুষ্টি। (গ) গবিনী ও মূত্রনালী। (ঘ) ফুসফুসীয় ধমনী ও শিরা। (ঙ) জীবাশ্ম ও জীবন্ত জীবাশ্ম। (চ) জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপ। ৪ × ২ = ৮

অথবা, নিম্নলিখিত যে-কোন চারটি সমস্যা সমাধানে জীববিজ্ঞানের প্রয়োগ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর :—

(ক) খাদ্যোৎপাদনে। (খ) জনবিস্ফোরণ রোধে। (গ) জনস্বাস্থ্য রক্ষায়। (ঘ) পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণে। (ঙ) বন্যা ও ভূমিক্ষয় রোধে। (চ) মহাকাশ গবেষণায়। ৪ × ২ = ৮

2. নিম্নলিখিত যে-কোন চারটির সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—

(ক) সেলুলোজ, (খ) ক্যালোজ, (গ) গ্লুকোজ, (ঘ) হিমোগ্লোবিন, (ঙ) হিমোসিল, (চ) হিমোসায়ানিন। ৪ × ২ = ৮

অথবা, নিম্নলিখিত যে কোন চারটির সঠিক ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(ক) কোষ কেন বিভাজিত হয়? (খ) মাইটোসিসকে পরোক্ষ কোষ-বিভাজন বলে কেন? (গ) মাইটোসিসকে সম-বিভাজন বলে কেন? (ঘ) উদ্ভিদ কোষে সাইটোকাইনেসিস কিভাবে হয়? (ঙ) প্রাণিকোষে নিউক্লিয়াসের বিভাজনে সেন্ট্রোজোমের ভূমিকা কি? (চ) শ্বসনে উৎপন্ন শক্তি কোন্ অবস্থায় জীবদেহে থাকে? ৪ × ২ = ৮

3. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা বাক্যগুলি সম্পূর্ণ কর :—(যে-কোন তিনটি)

(ক) মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম—। (খ) প্রধানত একটি ক্রোমোসোমে থাকে—শতাংশ নিউক্লিওপ্রোটিন, বাকি দশ শতাংশ — ক্রোমোসোম। (গ) নিউ-

নিউক্লিওপ্রোটিনের 45 শতাংশ ——, বাকি —— শতাংশ হিস্টোন নামক প্রোটিন। (ঘ) সালোক-সংশ্লেষের আলোক নিরপেক্ষ দশায় —— কার্বন ডাই-অক্সাইডের সহিত মিলিত হইয়া —— উৎপন্ন করে। (ঙ) —— উদ্ভিদের ত্রি-ফলক পত্রের নিচের পত্রফলক দুইটি —— তারতম্যে পর্যায়ক্রমে ওঠা-নামা করে। ৩×২=৬

অথবা, জল অথবা খনিজ লবণ মাটি থেকে উদ্ভিদ মূলে এসে প্রকাশ করে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

4. গ্লাইকোলিসিস কি? কোন্ প্রক্রিয়ায় এবং কোথায় ইহা সংঘটিত হয়? ইহার ফলে কি উৎপন্ন হয়? উক্ত পদ্ধতিটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১+½+½+১+৩=৬

অথবা, মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের যে কোন দুইটির পরিপাক কিরূপে সম্পূর্ণ হয় তাহার বিবরণ দাও। ৩×২=৬

5. বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলি হইতে বাছিয়া সঠিক উত্তর লেখ :—

(ক) সময়ে সময়ে অবাঞ্ছিত বিকট শব্দ —— বাহিত হইয়া মানুষের —— প্রবেশ করিয়া বধিরত্ব, হৃদপিণ্ডের ও স্নায়ু বৈকল্য, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি নানা রোগের সৃষ্টি করে (জলে/বাতাসে/নাসারন্ধ্রে/কর্ণে)।

(খ) পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের হৃদপিণ্ড (দুই/তিন/চার) প্রকোষ্ঠযুক্ত।

(গ) দক্ষিণ অলিন্দ ও দক্ষিণ নিলয়ের মধ্যবর্তী সংযোজক ছিদ্রের মুখে (দ্বিশীর্ষ/ত্রিশীর্ষ/অর্ধচন্দ্রাকারে) কপাটিকা থাকে।

(ঘ) জাইলেম গঠনে অংশগ্রহণকারী তন্তু হল (বাস্ট ফাইবার/উড ফাইবার/স্ক্লেরেনকাইমা ফাইবার)।

(ঙ) মানুষ ও আরশোলার রেচন অঙ্গের নাম যথাক্রমে (ফ্লেমকোষ/বৃক্ক/ম্যালপিজিয়ান নালী/নেফ্রিডিয়াম)।

(চ) দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির জনক হলেন (জন রে/অ্যারিস্টটল/লিনীয়াস)।

অথবা ৬×১=৬

বনসম্পদ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? কিভাবে উহাদের সংরক্ষণ সম্ভব তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ কর। ২+৪=৬

6. অনুকূল প্রকারণ, পরিব্যক্তি বা মিউটেশান এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্পর্কে তোমার সুস্পষ্ট ধারণা সংক্ষেপে উল্লেখ কর। ২+৩+৩=৮

অথবা

জৈব অভিব্যক্তির স্বপক্ষে ভ্রূণতত্ত্বভিত্তিক প্রমাণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

7. ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহ সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ। ৮

অথবা মাটির জৈব গুরুত্ব সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ। ৮

8. নিম্নলিখিত যে-কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ—

(ক) কিভাবে রক্ত তঞ্চন হয়? কোন্ ভিটামিন ইহাকে সহায়তা করে? (খ) দ্বিপদ নামকরণ সর্বপ্রথম কে প্রচলন করেন? ইহার তাৎপর্য কি? (গ) কোষে ক্রোমো-

জোমের গুরুত্ব কি ? (ঘ) রক্ত ও লসিকার পার্থক্য নির্দেশ কর। (ঙ) তরুণাস্থি ও অস্থির তফাৎ কি ? (চ) ফোটন কণা কি ? ইহার কাজ কি ? (ছ) RuDP ও PGAld সংকেত দুইটির পুরো নাম কি ? কোন্ প্রক্রিয়াতে কোন্ দশায় ইহারা উপস্থিত থাকে ? (জ) হাইপোন্যাস্টি ও এপিন্যাস্টির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (ঝ) ভাইটামিন ও অ্যান্টি-ভাইটামিনের পার্থক্য কি ? (ঞ) রেচনে ত্বকের ভূমিকা কি ? (ট) মানুষের লোহিত রক্তকণিকাকে 0·9 শতাংশের **কম** এবং **বেশী** ঘনত্বের সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে রাখিলে ফলাফল কি হইবে ? (ঠ) সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় শোষণের পার্থক্য কি ? (ড) অক্সিন ও থাইরক্সিন কোথায় পাওয়া যায় ? ইহাদের কাজ কি ? (ঢ) লাফিয়ে চলার সময়ে ব্যাঙের অগ্র ও পশ্চাৎপদের ভূমিকা উল্লেখ কর। (ণ) জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্র বলতে কি বোঝ ? (ত) প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রধান পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর। ১০ × ২ = ২০

1983

First Paper

1. জীববিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সহিত কিভাবে সম্পর্কযুক্ত ? ৮

অথবা

কৃষিকার্য ও চিকিৎসাবিদ্যার প্রসারলাভে জীবনবিজ্ঞানের ভূমিকা আলোচনা কর।

৪ + ৪ = ৮

2. নিম্নলিখিত যে-কোন **চারটির** পার্থক্য নির্ণয় কর ঃ—

(ক) কোষপ্রাচীর ও কোষপর্দা, (খ) সারকোলেমা ও নিউরোলেমা,
(গ) ব্যাপন ও অভিস্রবণ, (ঘ) সবাত ও অবাত শ্বসন,
(ঙ) ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন, (চ) নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিওলাস।

৪ × ২ = ৮

অথবা

নিম্নলিখিত যে-কোন **চারটির** সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ঃ—

(ক) প্লাসটিড, (খ) নিউক্লিওলাস,
(গ) মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম, (ঘ) সীভ নল,
(ঙ) অ্যাক্সন, (চ) মূলজ চাপ। ৪ × ২ = ৮

3. কিভাবে জীবজগৎ সালোক-সংশ্লেষের উপর নির্ভরশীল ব্যাখ্যা কর। ৬

অথবা

সংবহন বলিতে কি বুঝ ? সংবহনের গুরুত্ব কি ? রক্ত সংবহনে হৃৎপিণ্ডের ভূমিকা কি বল। ২ + ২ + ২ = ৬

4. রেচন কি ? উদ্ভিদের রেচন পদার্থগুলি কি কি ? উদ্ভিদ কিভাবে রেচনক্রিয়া সম্পন্ন করে ? ২ + ২ + ২ = ৬

অথবা

নিম্নলিখিতগুলির উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও ঃ—

(ক) স্বনিষেক (খ) পরনিষেক (গ) বহিঃনিষেক

(ঘ) অপুংজনি। ১½+১½+১½+১½=৬

5. মেণ্ডেল একটি অবিমিশ্র মটর গাছের পরাগ লইয়া একটি অবিমিশ্র বেঁটে মটর গাছের গর্ভমুণ্ডে স্থাপন করেন। এইভাবে উৎপন্ন বেঁটে গাছের বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া কেবল লম্বা গাছের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। [১ম অপত্য বংশ]। মেণ্ডেল অতঃপর ঐ লম্বা গাছগুলির মধ্যে স্বনিষেক ঘটান ও ফলে লম্বা ও বেঁটে উভয় শ্রেণীর গাছই জন্মিয়াছিল [২য় অপত্য বংশ]।

(ক) ১ম অপত্য বংশে সমস্ত গাছের লম্বা হওয়ার কারণ কি ?

(খ) ২য় অপত্য বংশে উৎপন্ন লম্বা ও বেঁটে গাছগুলির অনুপাত কি ?

(গ) মটর গাছের এই পরীক্ষা হইতে মেণ্ডেল কি সিদ্ধান্তে উপনীত হন ?

২½+১½+৪=৮

অথবা

দ্বি-সংকর পরনিষেক (dihybrid cross) কথাটির অর্থ কি ? চেকার বোর্ডের সাহায্যে দ্বি-সংকর পরনিষেকের ফল (result) নির্ণয় করিয়া ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপের অনুপাত দেখাও এবং ইহা হইতে মেণ্ডেল যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহার উল্লেখ কর। ১+৫+২=৮

6. প্রত্নজীববিদ্যা থেকে জৈব অভিব্যক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ দাও। ৬

লামার্কের মতবাদটি বিবৃত কর এবং উহা অনুসরণ করিয়া জিরাফের গ্রীবা প্রলম্বিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩+৩=৬

7. সনাক্তকরণ, নামকরণ ও শ্রেণীবিন্যাস বলিতে কি বুঝ ? শ্রেণীবিন্যাসের একক কি ও উহার উদ্দেশ্য কি ? (১½+১½+১½)+১½+২=৮

অথবা

একটি পুকুরের ইকোসিস্টেম বর্ণনা কর। ৮

8. নিম্নলিখিত যে কোন **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ—

(ক) কোন কোন কোষীয় অংগাণু কেবল উদ্ভিদ কোষে দেখা যায় ? (খ) মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের 'শক্তি-ঘর' বলা হয় কেন ? (গ) ইণ্টারফেজ দশা কি ? (ঘ) মাইটোসিস কি দেহের সমস্ত কোষে হয় ? (ঙ) র‍্যাভিয়ে বা র‍্যানভিয়ের পর্ব কোথায় দেখা যায় ? (চ) ক্রেবস্ চক্রকে কেন TCA cycle বলা হয় ? (ছ) স্যাপ্রোজীয়ক পুষ্টি কি ? (জ) মাছের হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্য দিয়া কি কি ধরনের রক্ত প্রবাহিত হয় ? (ঝ) ফুসফুস ও যকৃতকে রেচন অঙ্গ বলা হয় কেন ? (ঞ) উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের চলনকে গমন বলা হয় না কেন ? রাইবোজোম কি ? উহার কাজ কি ? (ঠ) লুপ্তপ্রায় অঙ্গ বলিতে কি বুঝ ? (ড) পরিবৃত্তি বা প্রকরণ বলিতে কি বুঝায় ? (ঢ) সাপ,

ফড়িং, ব্যাঙ ও ঘাস——ইহাদের খাদ্য-শৃঙ্খলের পর্যায় অনুসারে সাজাও। (ণ) ক্লোরোফিল কণার সহিত আলোর কি সম্পর্ক ? ১০×২=২০

1984

First Paper

1. 'সংরক্ষণ' বলিতে তুমি কি বুঝ ? বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি ? প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করার পরিণতি কি ? ২+৪+২=৮

অথবা

জল ও বায়ু কিভাবে দূষিত হয় ? উহাদের প্রতিকারের উপায়গুলি লিখ। ৪+৪=৮

2. জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্র কাহাকে বলে ? ইহার তাৎপর্য কি ? জলচক্র সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ২+২+৪=৮

অথবা

মাটির জৈব গুরুত্ব সম্বন্ধে তুমি যাহা জান লিখ। কেঁচোকে মাটির স্বাভাবিক কর্ষক বলা হয় কেন ? ৬+২=৮

3. মিউটেশান বা পরিব্যক্তিবাদ কি ? এই তত্ত্বের প্রবর্তক কে ? 'নতুন প্রজাতির উদ্ভব' ব্যাখ্যা করিতে এই তত্ত্ব কিরূপে সহায়তা করিয়াছে ? ৩+১+৪=৮

অথবা

নিম্নলিখিত যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও :— ৪×২=৮

(ক) মেণ্ডেল কে ছিলেন ? (খ) অ্যালীল্ বলিতে কি বুঝ ? (গ) জেনেটিক পদার্থ কি ? (ঘ) হোমোজাইগাস ও হেটারোজাইগাস জীব কি ? (ঙ) ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ বলিতে তুমি কি বুঝ ?

4. মাইটোসিসকে সমবিভাজন বলা হয় কেন ? প্রাণিকোষে মাইটোসিসের মেটাফেজ ও অ্যানাফেজ দশার চিত্র অঙ্কন কর। মাইটোসিসের তাৎপর্য কি ? ১+৪+১=৬

অথবা

হৃদ্‌পেশী ও অস্থিপেশীর যে কোন তিনটি পার্থক্য লিখ। পেশী সংকোচনের কারণ কি ? তরুণাস্থি কাহাকে বলে ? ৩+২+১=৬

5. ফোটো-ফসফরিলেসান কি ? ইহা কোন্ জীবনক্রিয়ায় এবং কোন্ দশায় ঘটে ? উক্ত বিক্রিয়ার তাৎপর্য কি ? ২+২+২=৬

অথবা

'শ্বসনে স্থৈতিক শক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়'—ইহার অর্থ কি ? মানুষের ফুসফুসে গ্যাসের আদান-প্রদান পদ্ধতি বর্ণনা কর। ২+৪=৬

6. মানবদেহের কোথায় কোলেসটেরল পাওয়া যায় ? রক্তে কোলেসটেরলের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে মানুষের কোন্ কোন্ রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে ? ২+২=৪

অথবা

ভাইটামিন ও অ্যাণ্টিভাইটামিন কি ? ভিটামিন সি ও ডি-এর উৎস কি ? এই দুইটি ভিটামিনের অভাবে কোন্ কোন্ রোগ হয় ? ২+১+১=৪

7. নিম্নলিখিত যে কোন পাঁচটির পার্থক্য নির্ণয় কর :—

(ক) অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাক। (খ) মোনোস্যাকারাইড ও ডাইস্যাকারাইড। (গ) মুক্ত ও রুদ্ধ রক্ত সংবহন তন্ত্র। (ঘ) প্রাথমিক ও গৌণ বৃদ্ধি। (ঙ) স্বতঃস্ফূর্ত ও আবিষ্ট চলন। (চ) একলিঙ্গ ও উভয়লিঙ্গ প্রাণী। (ছ) অক্সিন ও থাইরক্সিন। ৫×২=১০

অথবা

নিম্নলিখিত যে কোন পাঁচটির সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—

(ক) পরিবৃত্তিতা, (খ) প্রোক্যারিওটিক কোষ, (গ) মাইটোকনড্রিয়া, (ঘ) ফ্যাগোসাইটোসিস, (ঙ) ইনউলিন, (চ) ইনসুলিন, (ছ) লিনীয়াস। ৫×২=১০

8. নিম্নলিখিত যে কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :—

(ক) পাট কোন্ ধরনের তন্তু ? (খ) বিপাক বলিতে কি বুঝ ? (গ) সেণ্ট্রোজোমের কাজ কি ? (ঘ) গ্লুকাগন কোথা হইতে নিঃসৃত হয় ? ইহার কাজ কি ? (ঙ) মধুমেহ বা বহুমূত্র রোগের কারণ কি ? (চ) ফুলের পাপড়ির রং নানা রকমের হয় কেন ? (ছ) পশ্চিমবঙ্গের দুটি অভয়ারণ্যের নাম লিখ। কোন্ কোন্ বন্য প্রাণীকে উক্ত দুইটি অভয়ারণ্যে সংরক্ষিত করা হয় ? (জ) জীবনসংগ্রাম কি ? জীবকে কতরকম ভাবে এই সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয় ? (ঝ) লসিকা কি ? ইহার কাজ কি ? (ঞ) এণ্টিজেন ও এণ্টিবডির উপর নির্ভর করিয়া মানুষের রক্তের শ্রেণীবিন্যাসের সার্থকতা কি ? (ট) মিঠা জলের একটি মাছকে সমুদ্রের জলে রাখিলে মাছটির পরিণতি কি হইবে তাহা ব্যাখ্যা কর। (ঠ) উদ্ভিদ দেহে রসের উৎস্রোত বলিতে তুমি কি বুঝ ? (ড) বহুবিভাজন কি ? কোন্ প্রাণীতে ইহা সংঘটিত হয় ? (ঢ) সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক কি ? (ণ) শিল্পঘটিত দূষণ বলিতে তুমি কি বুঝ ? ১০×২=২০

1985

First Paper

1. জীবনের সংজ্ঞা কি ? জীববিদ্যার গুরুত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ২+৩+৩=৮

অথবা

নিম্নলিখিত যে কোন চারিটির পার্থক্য নির্ণয় কর : ৪×২=৮

(ক) প্রোক্যারিওটিক কোষ ও ইউক্যারিওটিক কোষ ;

(খ) অভিস্রবণ ও শোষণ ;
(গ) সেণ্ট্রোজোম ও গল্গি বডি ;
(ঘ) প্যারেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা ; এবং
(ঙ) ক্রোমোপ্লাস্ট ও অ্যামাইলোপ্লাস্ট।

2. জৈব অভিব্যক্তির ইতিহাসে নিম্নলিখিত যে কোন **দুইটির** ভূমিকা বুঝাইয়া লিখ :

৩+৩=৬

(ক) লুপ্তপ্রায় অঙ্গসমূহ ; (খ) সমবৃত্তীয় অঙ্গসমূহ ; (গ) জীবাশ্ম।

অথবা

নিম্নলিখিত যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর লিখ :— ৩×২=৬

(ক) বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম বলিতে কি বুঝ ?
(খ) সমসংস্থ অঙ্গ কাহাকে বলে ?
(গ) প্রাকৃতিক বিপর্যয়বাদ কি ?
(ঘ) 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশপরম্পরায় সঞ্চারণ' বলিতে কি বুঝ ?

3. বাস্তুরীতিতে কিভাবে শক্তি-প্রবাহ বজায় থাকে তাহা উদাহরণ সহযোগে বিবৃত কর। উৎপাদক ও ভক্ষক বলিতে কি বুঝায় ? খাদ্য-শৃঙ্খল ও খাদ্য-জালক কাহাকে বলে ?

৫+২+৩=১০

4. চিহ্নিত চিত্র সহযোগে একটি আদর্শ প্রাণিকোষের গঠন বর্ণনা কর। কোষ-আবরণী ও কোষ-প্রাচীরের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ৪+২=৬

অথবা

স্থায়ী কলা ও ভাজক কলার পার্থক্য কি ? ফ্লোয়েম কি প্রকারের কলা এবং ফ্লোয়েমের কাজ কি ? ক্লোরেনকাইমা কি ও কোথায় পাওয়া যায় ?

২+২+২=৬

5. বিন্যাসবিধির (Taxonomy) নীতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। দ্বি-পদ নামকরণ পদ্ধতির প্রস্তাবক কে ?

৫+১=৬

অথবা

কি কি জৈব উপাদান দ্বারা মৃত্তিকা গঠিত ? মৃত্তিকার জৈবনিক গুরুত্ব বিবৃত কর।

৩+৩=৬

6. স্বাধীন বণ্টনের সূত্র বলিতে কি বুঝ ? মেণ্ডেল কিভাবে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন পরীক্ষাসহ ব্যাখ্যা কর। মেণ্ডেলের সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা কর।

১+৪+১=৬

অথবা

অবাত ও সবাত শ্বসনের পার্থক্য উল্লেখ কর। গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ায় কি কি উৎপন্ন হয় ?

৫+১=৬

7. সংবহন বলিতে কি বুঝ ? বদ্ধ রক্ত সংবহন ও মুক্ত রক্ত সংবহন কাহাকে বলে ? স্তন্যপায়ীর হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া আলোচনা কর। ২+১+৩=৬

অথবা

রেচন-পদার্থ কাহাকে বলে ? উদ্ভিদ দেহের রেচন ও রেচনজাত পদার্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ২+২+২=৬

8. ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলনের মধ্যে পার্থক্য কি ? উদাহরণ সহযোগে বিভিন্ন প্রকার ট্রপিক চলন ব্যাখ্যা কর। ২+৪=৬

অথবা

যে কোন তিনটির টীকা লিখ ঃ ৩×২=৬

(ক) নেফ্রন ; (খ) মোটর নার্ভ ; (গ) পরিবেশ দূষণ ; (ঘ) লসিকা।

9. নিম্নলিখিত যে কোন আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ৮×২=১৬

(ক) ফটোলাইসিস বলিতে কি বুঝ ?

(খ) বহিঃ অভিস্রবণ বলিতে কি বুঝ ?

(গ) মুখ্য বৃদ্ধিকাল কাহাকে বলে ?

(ঘ) অ্যাক্রোসেণ্ট্রিক ক্রোমোজোম কাহাকে বলে ?

(ঙ) জীবন্ত-জীবাশ্ম (Living fossil) কাহাকে বলে ?

(চ) দুইটি হর্মোনের নাম লিখ যাহার একটি প্রাণী ও অপরটি উদ্ভিদ দেহে পাওয়া যায়।

(ছ) মিথোজীবীয় পুষ্টি কাহাকে বলে ?

(জ) অপুংজনি কি ?

(ঝ) সিক্রিটিন কোথায় পাওয়া যায় ও উহার কাজ কি ?

(ঞ) রাইবোফ্ল্যাভিন কি এবং ইহা কোথায় থাকে ? উৎস কি ?

Joint Entrance Examination
1980
Group A

1. (ক) একটি পরীক্ষার দ্বারা অভিস্রবণ ব্যাখ্যা কর। এই প্রক্রিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণীর কি উপকার করে? কেমন করিয়া মাটি হইতে জল মূলরোমের ভিতর প্রবেশ করে তাহা ব্যাখ্যা কর। একটি কোমল বীরুৎ মাটির উপর কি উপায়ে ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে থাকে?

(খ) মাইটোসিসের (mitosis) বিভিন্ন অবস্থার চিত্র অঙ্কন কর। এই পদ্ধতিতে উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের কি কি পার্থক্য দেখা যায়? কেন mitosis-কে সমবিভাজন ও meiosis-কে সংখ্যাহ্রাসকারী বিভাজন বলা হয়?

2. (ক) গ্লাইকোলাইসিস্ কাহাকে বলে? শ্বসনে উহার গুরুত্ব বিবৃত কর। কি করিয়া অ্যামিবা ও স্তন্যপায়ীর মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় সংঘটিত হয়?

(খ) সালোকসংশ্লেষের আলোক দশা ও অন্ধকার দশার সংক্ষেপে বর্ণনা দাও এবং ঐ প্রক্রিয়া কোথায় হয় তাহা বিবৃত কর। উদ্ভিদ, যাহারা গুল্ম ও বৃক্ষের ছায়ায় জন্মায়, প্রচুর সূর্যালোক পাওয়ার জন্য তাহারা কি কৌশল অবলম্বন করে? একটি স্বভোজী ব্যাকটেরিয়ামের সালোকসংশ্লেষীয় বিক্রিয়া লেখ।

3. (ক) একটি বিশুদ্ধ লাল ফুলযুক্ত উদ্ভিদ ও একটি বিশুদ্ধ সাদা ফুলযুক্ত উদ্ভিদের সংকরায়ণের ফলে যে সমস্ত বীজ উৎপন্ন হইল তাহারা সমস্তই লাল ফুলযুক্ত উদ্ভিদ প্রকাশ করিল। ইহা হইতে তোমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে? শেষোক্ত লাল ফুলযুক্ত উদ্ভিদকে (অ) পরস্পরের সহিত, (আ) লাল ফুলযুক্ত মাতা বা পিতার সহিত, (ই) সাদা ফুলযুক্ত মাতা বা পিতার সহিত সংকরায়ণ করিলে কি হইবে তাহা ব্যাখ্যা কর।

নিম্নলিখিত জিনোটাইপ হইতে জীব কয় প্রকার জননকোষ উৎপন্ন করিবে?

(অ) AaBB ; (আ) aaBB ; (ই) AAbb ; (ঈ) AaBBCc।

(খ) উৎসেচকের বিভিন্ন প্রকার ধর্ম পর পর উল্লেখ কর। মানবদেহের অগ্ন্যাশয়রস কি কি উপাদান দিয়া গঠিত তাহা বল এবং প্রত্যেকটি উপাদানের কার্য বিবৃত কর।

4. (ক) প্রাণিদেহে সর্বাপেক্ষা কঠিন ও নরম তন্তুর নাম কর। উদ্ভিদদেহে সংবহনে অংশগ্রহণকারী কলাগুলির নাম কর।

(খ) নিম্নলিখিতগুলির ব্যাখ্যা কর ঃ—

(অ) মানবদেহের শ্বেত রক্তকণিকা কিভাবে ফ্যাগোসাইটিক প্রক্রিয়ার দ্বারা হজম করে তাহার ধারাবাহিক বর্ণনা দাও।

(আ) ক্ষয়, সন্ধান ও শটনের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে তাহা লিখ।

(ই) ক্ষারাম্ল সাম্য বলিতে কি বুঝায়?

(ঈ) ABO তন্ত্র (system) বলিতে কি বুঝ?

5. (ক) সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গ কাহাকে বলে? উদ্ভিদ ও প্রাণী হইতে উদাহরণ সহযোগে বুঝাইয়া দাও। সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গসমূহ কিভাবে বিবর্তনের সত্যতা প্রমাণ করে।

(খ) পরিবেশ দূষণ বলিতে কি বুঝ? কতভাবে দূষিত হয়? ইহার প্রতিকার কিভাবে সম্ভব?

5. (ক) প্রতিবর্তক্রিয়া কাহাকে বলে? কণীনিকা প্রতিবর্ত ও মুখ হইতে লালা নিঃসৃত করা প্রতিবর্ত কি কি structure-এর দ্বারা সংঘটিত হয় তাহা তালিকাভুক্ত কর। একটি সহজাত প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের চিত্র অঙ্কন করিয়া চিহ্নিত কর।

(খ) চিত্র সহযোগে একটি স্নায়ুকোষের ও একটি স্নায়ুতন্তুর বর্ণনা কর। স্নায়ুকলার প্রধান কাজগুলি কি?

Group B

7. (ক) পরভোজী কাহাকে বলে? টিনিয়া সোলিয়ামের বিভিন্ন প্রকার অভিযোজন বিশদভাবে আলোচনা কর। টিনিয়ার জীবনে দুইটি পোষকের সুবিধা কি কি?

(খ) Anopheles ও Culex মশার পূর্ণাঙ্গ অবস্থার গঠন, ডিম্বাণু, শূক ও পিউপার যেসব পার্থক্য থাকে তাহার বিবরণ দাও। Anopheles, Culex ও Aedes মশা দ্বারা যেসব রোগের সৃষ্টি হয়, তাহার নাম বল।

8. (ক) কলা সংঘটন হইয়াছে এইরূপ নন্-কর্ডাটা প্রাণীদিগের বিভিন্ন পর্বের নাম লিখ এবং প্রত্যেক পর্ব হইতে দুইটি করিয়া বৈশিষ্ট্য-সূচক উল্লেখ কর। চিকিৎসাশাস্ত্রে নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির গুরুত্ব উল্লেখ কর ঃ—

প্লাস্মোডিয়াম, এন্‌ট্যামিবা, ট্রিপানোসোমা, অ্যাংকাইলস্‌টোমা ডিওডিনেল্, জোনোপশিলা চিওপিস্, কিউলেক্স, ঈডিস্, অ্যানোফিলিস্।

(খ) অনুকূল পরিবেশে এবং প্রতিকূল পরিবেশে অ্যামিবা কি করিয়া তাহার জননকার্য সমাধা করে তাহা চিত্র সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

9. (ক) পশ্চিমবঙ্গে ধানগাছের ক্ষতিকারক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ পতঙ্গগুলির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি পতঙ্গের চিত্র সহযোগে জীবনচক্রের ব্যাখ্যা কর। জীবনচক্রের বিষয় জানা আবশ্যক কেন এবং ইহাদের প্রতিরোধের কয়েকটি উপায় সম্বন্ধে ইঙ্গিত দাও।

(খ গিনিপিগের উদর গহ্বরের মধ্যস্থিত ধমনী ও শিরার উৎপত্তি ও গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে একটি চিত্রের মাধ্যমে বিবরণ দাও।

Group C

0. (ক) ব্যাক্‌টেরিয়াকে উদ্ভিদ বলা হয় কেন? নাইট্রিফিকেশন্, নাইট্রোজেন ফিক্‌সেশন এবং ডি-নাইট্রিফিকেশন্ বলিতে কি বুঝায়? যে যে ব্যাক্‌টেরিয়া এই পদ্ধতিগুলির জন্য দায়ী তাহাদের নাম উল্লেখ কর এবং বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনের সমতা কিভাবে রক্ষিত হয় তাহার বিশদ বিবরণ দাও।

(খ) পেনিসিলিয়াম কোথায় পাওয়া যায় ? পেনিসিলিয়ামের জীবন ইতিহাস ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

11. (ক) মটর গাছের একটি পরাগরেণু সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডের উপর অবতরণ করিল। ভ্রূণাণু ও প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস কেমন করিয়া তৈয়ারি হয় তাহার ক্রমদশার চিত্র সহযোগে বিবরণ দাও।

(খ) নালিকা বাণ্ডিলের উপাদান কি কি ? প্রত্যেক উপাদানের কার্য বিবৃত কর। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের নালিকা বাণ্ডিলের চিত্র সহযোগে বিবরণ দাও।

12. (ক) স্পাইরোগাইরার একটি কোষ অঙ্কন কর এবং উহাতে কি কি উপাদান আছে তাহাদের বর্ণনা দাও। স্পাইরোগাইরার সংশ্লেষে ও মিউকরের সংশ্লেষে সৃষ্ট বস্তুর নাম লিখ। যদি একটি স্পাইরোগাইরার উদ্ভিদ শতকরা দশভাগ চিনির দ্রবণে রাখা হয় তাহা হইলে উহাতে কি পরিবর্তন ঘটিবে তাহার ব্যাখ্যা কর।

খ) জনুঃক্রম কাহাকে বলে ? পোগোনেটাস্ ও ড্রায়প্টেরিস্-এর গ্যামেটোফাইটের মধ্যে কি কি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে তাহাদের তুলনামূলক বিচার কর। পুংরেণুপত্র ও স্ত্রীরেণুপত্র কাহাকে বলে ?

Group D

13. (ক) তোমার প্রাতঃরাশের সময় নিম্নলিখিত খাদ্যগুলি খাইলে ঃ—

(অ) মাখন দিয়া টোস্ট, (আ) সিদ্ধ ডিম একটি, (ই) একটি মাছ ভাজা, (ঈ) কয়েকটি আঙুর।

মুখবিবরে প্রবেশের পর পৌষ্টিক নালী দিয়া যাইবার সময় ও অন্ত্র দ্বারা শোষিত হওয়ার পূর্বে ঐ খাদ্যের পরিণতি কি হয় তাহার বিবরণ দাও।

(খ) নিম্নলিখিত মৌলগুলি কোন্ কোন্ খাদ্যের মধ্যে পাওয়া যায় প্রবং তাহাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে যাহা জান বল। খাদ্যে ইহাদের অভাব ঘটিলে মানবের পরিণতি হয় তাহা নির্দেশ কর ঃ—

লৌহ ; ক্যালসিয়াম্ ; ফস্ফরাস্ ; আয়োডিন ও ফ্লুওরিন।

14. (ক) মানবদেহের হৃদপিণ্ডের বিশিষ্ট কলা কাহাদের বলে ? চিত্রের সাহায্যে মানবদেহের হৃদ্চক্রের ব্যাখ্যা কর।

(খ) বৃক্কের একক কি ? একজন প্রাপ্তবয়স্ক ভারতবাসী দিনে কত পরিমাণ মূত্র ত্যাগ করে ? বৃক্ক দ্বারা মূত্র কিভাবে তৈয়ারি হয় ?

15. (ক) মানবদেহের বিভিন্ন সন্ধির বিষয় যাহা জান লিখ। পুরোবাহু উত্তোলনে বাইসেপস্ ও ট্রাইসেপস্ পেশীর কি পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা চিত্র সহযোগে ব্যাখ্যা কর। মায়োফাইব্রিলে কয় রকম প্রোটিন পাওয়া যায় তাহাদের নাম লিখ।

(খ) পিটুইটারি গ্রন্থিকে endocrine king বলা হয় কেন ? নিম্নলিখিত গ্রন্থি হইতে কি কি হরমোন নিঃসৃত হয় এবং তাহাদের কার্য বিবৃত কর ঃ—

(অ) অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স ; (আ) থাইরয়েড ; (ই) অগ্ন্যাশয়।

1981

Group A

1. (ক) একটি চিহ্নিত চিত্র দ্বারা সবুজ কণিকার পরাণুবীক্ষণ গঠন বর্ণনা কর।

(খ) নিম্নলিখিতগুলির উত্তর লিখ ঃ

(অ) সালোকসংশ্লেষের সময় যে অক্সিজেন উপজাত হিসাবে বাহির হয় তাহার উৎস কি ? ইহা কিরূপে পরীক্ষা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা বিবৃত কর।

(আ) সালোকসংশ্লেষের আলোক দশার গুরুত্ব কি ?

(ই) সালোকসংশ্লেষের সময় উপাদানগুলি গ্রহণের নিমিত্ত পাতা কিভাবে অভিযোজিত হইয়াছে ?

2. (ক) কোথায় এবং কখন জীবে মায়োসিস্ বিভাজন হয় ? প্রথম মায়োটিক প্রফেজ-এর বিভিন্ন দশার চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। ক্রসিং-ওভার কাহাকে বলে ? ক্রসিং-ওভারের তাৎপর্য বল।

(খ) সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ অবায়ুজীবী কাহাদের বলে ? অবাত শ্বসন ও কোহল সন্ধানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের এনিরোবায়োসিস্ দ্বারা সৃষ্ট পদার্থের পরিণতি কি হয় তাহা উল্লেখ কর।

3. (ক) জীব অভিব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার প্রমাণের উল্লেখ কর। অভিব্যক্তির অগ্রগতির ধারায় প্রজাতি যে রূপান্তরিত হয় যাহা বিস্টন বিটুলারিয়া নামক মথ প্রমাণ করিয়াছে তাহা বিশদভাবে বিচার কর।

(খ) লিঙ্গ-সংযোজিত জীন কাহাকে বলে ? মানুষের বর্ণান্ধতার জিন প্রচ্ছন্ন ও লিঙ্গ-সংযোজিত। প্রথম জনুতে (F_1) কি প্রকার সম্ভাব্য সন্তান আবির্ভূত হইতে পারে যদি (অ) একজন বর্ণান্ধ পুরুষ বিবাহ করে একজন স্বাভাবিক মহিলাকে ; (আ) একজন স্বাভাবিক পুরুষ বিবাহ করে একজন বর্ণান্ধ মহিলাকে এবং (ই) একজন বর্ণান্ধ পুরুষ বিবাহ করে একজন বর্ণান্ধ মহিলাকে ?

স্বাভাবিক দৃষ্টির প্রকট জীন—"N"

বর্ণান্ধের প্রচ্ছন্ন জীন—"n"

4. (ক) **Apoenzyme, co-enzyme ও holoenzyme** কাহাদের বলে ? উদ্ভিদ ও প্রাণীদিগের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট জারণ-এর জন্য কি কি উৎসেচকের প্রয়োজন হয় তাহাদের নাম কর। জারণের ফলে জাতদ্রব্য ফলপ্রদ বিশোষণের জন্য ক্ষুদ্রান্ত্রের গঠন বৈশিষ্ট্য কিভাবে অভিযোজিত হইয়াছে ?

(খ) মানবদেহের বিভিন্ন প্রকার শ্বেত রক্তকণিকার নাম কর এবং তাহাদের বৈশিষ্ট্যসূচক গঠন সম্বন্ধে বিবরণ দাও। অ্যাণ্টিজেন ও অ্যাণ্টিবডি এই মূল সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া মানবদেহের বিভিন্ন প্রকার রক্তের শ্রেণীবিন্যাস কর। এই শ্রেণীবিন্যাসের সার্থকতা কি ?

5. (ক) মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিভিন্ন প্রকার বৃক্কের নাম কর এবং প্রত্যেক বৃক্কের নির্দিষ্ট নমুনা কোন্ কোন্ মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায় তাহাদের নাম কর।

উদ্ভিদ্ বর্জ্য পদার্থ কিভাবে ত্যাগ করে? উদ্ভিদের বর্জ্য পদার্থ মানুষের কি কি উপকার সাধন করে? আরশোলা কি উপায়ে তাহাদের বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে তাহা বিবৃত কর।

(খ) কিরূপে কোন একটি প্রকম্পিত অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে ক্রমশ অধিকতর গুরুত্বানুযায়ী জীবের উদ্ভব হয় তাহা বিশদভাবে বর্ণনা কর। একটি Ecosystem-এ বিভিন্ন খাদ্যগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অধীনতা বর্তমান, তাহা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

6. (ক) Osmoregulation কাহাকে বলে? কি কি কৌশলে একটি স্থলবাসী প্রাণী তাহার আস্রবণ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করে? একটি মিঠাজলের মাছকে যদি সমুদ্রের জলে রাখা হয় তাহা হইলে মাছটির কি পরিণতি হয় তাহা যুক্তি দিয়া ব্যাখ্যা কর।

(খ) পরিব্যক্তিবাদ কি? ক্রোমোসোমাল পরিব্যক্তি সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখ এবং অভিব্যক্তিতে পরিব্যক্তির গুরুত্ব উল্লেখ কর।

Group B

7. (ক) একটি চিহ্নিত চিত্রের মাধ্যমে টিনিয়া সোলিয়ামের জননতন্ত্র বর্ণনা কর। টিনিয়া কি উপায়ে নিজের কর্মশক্তি আহরণ করে তাহা ব্যাখ্যা কর।

(খ) কর্ডাটা ও কর্ডাটা নয় এইরূপ প্রাণীদিগের মধ্যে বৈসাদৃশ্য উল্লেখ কর। বিভিন্ন মেরুদণ্ডবর্গের প্রাণীদিগের দুইটি করিয়া বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ দাও। গিনিপিগের বহিরাকৃতি তাহার জীবনধারার সহিত কিরূপে অভিযোজিত হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা কর।

8. (ক) গিনিপিগের মহাধমনী হইতে যে যে ধমনী উদ্ভূত হইয়াছে এবং যে যে শিরা মিলিত হইয়া উপরিক মহাশিরা গঠন করিয়াছে চিহ্নিত চিত্রের মাধ্যমে তাহাদের বর্ণনা কর।

(খ) নিম্নলিখিতগুলির উত্তর লিখ:

(অ) উদাহরণ সহযোগে biological vector এবং mechanical vector-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

(আ) কি লক্ষণ দেখিয়া নির্ণয় করা সম্ভব যে মানুষ টিনিয়া সোলিয়াম কিংবা টিনিয়া সাজিনেটার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে?

(ই) রুই জাতীয় মাছের আবিষ্ট প্রজনন সম্বন্ধে তুমি কি জান?

(ঈ) কেভিয়ার সিম্প্যাথেটিক ও প্যারাসিম্প্যাথেটিক্ নার্ভতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্বন্ধে উল্লেখ কর।

9. (ক) রেশমগুটি চাষ কি? Bombyx mori-র জীবনচক্রের বিভিন্ন দশার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও (চিত্রের দরকার নাই)। রেশম কীটের কি কি রোগ হয় এবং রোগের বিভিন্ন লক্ষণ নির্দেশ কর। কি উপায়ে এই রোগগুলি দমন করা যায় তাহা উল্লেখ কর।

(খ) সংরক্ষণ কাহাকে বলে ? উহার উদ্দেশ্য বিবৃত কর। ভারতবর্ষে বন্য জীব সংরক্ষণের নিমিত্ত কি কি ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে এবং ভারতীয় কয়েকটি বন্যপ্রাণীর নাম কর যাহারা বিপন্ন হইয়া ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। হ্রদের ও নদীর ইউট্রোফিকেশন্ বলিতে কি বুঝায় ?

Group C

10. (ক) উদ্ভিদ্ ভাইরাসের গঠন ও সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যাখ্যা কর। উদ্ভিদ্ প্রাণী ও মানুষের ভাইরাসঘটিত রোগের নাম কর।

(খ) ভাইরাস ও বেক্‌টিরিয়ামের মধ্যে পার্থক্য কি ?

11. (ক) কি পদ্ধতিতে মিউকরের পুষ্টি হয় ? মিউকরের স্পোরের গঠন ও উৎপত্তি ব্যাখ্যা কর।

(খ) স্পাইরোগাইরাতে কি পদ্ধতিতে আজাইগোস্পোর হয় ? আজাইগোস্পোর হ্যাপ্লয়েড না ডিপ্লয়েড ? স্পাইরোগাইরার ব্যবহারিক সুবিধা কি ?

12. (ক) যে কোন তিন প্রকার বায়বীয় পরিবর্তিত কাণ্ডের উদাহরণসহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। প্রত্যেকটির বিশেষ কার্যের উল্লেখ কর।

(খ) গম, ঢেঁড়স, আম ও কাঁঠাল—কি প্রকার ফল এবং কেন ?

Group D

13. (ক) মানবদেহে যকৃৎ, পিত্তস্থলী, অগ্ন্যাশয় ও গ্রহণীর অঙ্গসংস্থানিক সম্বন্ধ একটি চিত্র-সহযোগে দেখাও। পিত্ত কি ? যকৃতনালী হইতে সংগৃহীত পিত্তের উপাদান সাধারণ পিত্তনালী হইতে সংগৃহীত পিত্তের উপাদান হইতে পৃথক কেন ?

(খ) ফ্যাটের পরিপাকে পিত্ত কিভাবে সহায়তা করে ? অগ্ন্যাশয়-রসের মধ্যে বর্তমান বিভিন্ন এন্‌জাইমের নাম লিখ এবং সংক্ষেপে উহাদের ক্রিয়া লিখ।

14. (ক) রক্তের সংবহন কে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং কেন ? হৃদ্-চক্র কাহাকে বলে ? একজন বিশ্রামরত ব্যক্তির হৃদ্-চক্রের বিভিন্ন ঘটনার পারম্পর্য ঐ সব ঘটনার স্থায়িত্বকাল-সহ বর্ণনা কর।

(খ) একজন সুস্থ বয়স্ক পুরুষের দেহে কি পরিমাণ রক্ত থাকে ? "মিনিট ভলিয়ুম" কাহাকে বলে ? একজন মানুষের মিনিট ভলিয়ুম-এর পরিমাণ তুমি ফিক্-বর্ণিত পদ্ধতিতে কিভাবে নির্ণয় করিবে ?

15. (ক) নিঃশ্বাস বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ বায়ুস্থলীর বায়ুর পরিমাণ অপেক্ষা বেশী কেন ? বৃক্কে গ্লোমেরিউলাসের পরিস্রুত রসে গ্লুকোজ থাকে কিন্তু স্বাভাবিক মূত্রে ইহা থাকে না কেন ?

(খ) শুক্রাশয়ের আণুবীক্ষণিক গঠন চিত্রসহযোগে বর্ণনা কর। সংক্ষেপে শুক্রাশয়ের ক্রিয়া লিখ।

1982

গ্রুপ A হইতে চারিটি, গ্রুপ B হইতে দুইটি, গ্রুপ C হইতে দুইটি এবং গ্রুপ D হইতে দুইটি, মোট দশটি প্রশ্নের উত্তর লিখ।

পরিচ্ছন্ন, সুবিন্যস্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরের মূল্য দেওয়া হইবে।

দক্ষিণ প্রান্তস্থ অঙ্কগুলি প্রতি প্রশ্নের মূল্য নির্দেশক।

Group A

1. (ক) কোষ উপাংশ বলিতে কি বুঝ? তিনটি কোষ উপাংশের কার্যাবলী লিখ। ১+৩+৩+৩

(খ) অভিস্রবণ বলিতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাপন ও অভিস্রবণের পার্থক্য লিখ। আইসোটনিক, হাইপোটনিক ও হাইপারটনিক লবণদ্রব বলিতে কি বুঝায়? ২+২+৬

2. (ক) প্রোটিনের শ্রেণীবিন্যাস কর। কাহাদের প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন বলে? উহাদের ঐরূপ বলা হয় কেন? প্রোটিনের সাধারণ কার্য বিবৃত কর। ২+(২+২)+৪

(খ) Smooth পেশী ও striped পেশীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও। Diaphragm এর পেশী কি প্রকার? উহার কার্যের বিবরণ দাও। (৪+২)+২+২

3. (ক) (১) মেণ্ডেলের dihybrid পরীক্ষা বর্ণনা কর। ৭

(২) মেণ্ডেল এই পরীক্ষার ফলে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন? ৩

(খ) R (লাল রং) W (শাদা রং) ফুলের উপরে প্রকট (dominant) S (পুষ্ট গোল) C (কোঁচকান গোল) বীজের উপরে প্রকট (dominant) RRCC× RWSC সংকরকরণের ফলাফল একটি Checkerboard-এ নির্দেশ কর। ৮

(২) কি হারে কত প্রকারের গাদ (Segreation ratio) পাইলে? ২

4. (ক) বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা বর্ণনা কর। ৯

(খ) (১) প্রকৃতিতে মৃত্তিকা কিভাবে সৃষ্টি হয়? ৩

(২) অবক্ষয়ে (erosion) কিভাবে ক্ষতি হয় এবং কিভাবে তাহা বন্ধ করা যায়? ৮

5. (ক) জৈব অভিব্যক্তি বলিতে কি বুঝ? অভিব্যক্তির স্বপক্ষে ল্যামার্কের মতবাদ কতদূর যুক্তিগ্রাহ্য? ৪+৬

(খ) খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজালক কাহাদের বলে? একটি সুস্থিত ইকোলজিক্যাল সিস্টেমে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশৃঙ্খল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কর। ৪+৬

6. (ক) অবাত শ্বসন ও সবাত শ্বসনের পার্থক্য কি? শ্বসনের প্রয়োজনীয়তা কি? ৮+২

(খ) বায়োজিয়ো-কেমিক্যাল চক্র কাহাকে বলে? কলিকাতা ও তাহার আশেপাশে যে যে দূষিত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের নাম লিখ। দূষণের বিভিন্ন প্রকার প্রভাব বিবৃত কর। ২+৪+৪

Group B

7. (ক) (১) যে পরভোজীরা (parasites) ম্যালেরিয়া এবং ফাইলেরিয়া রোগের সৃষ্টি করে তাহাদের নাম কর এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ২+২+(২)

(২) কি প্রকারে এই রোগ দুইটির সংক্রমণ হয় ? ৩

(খ) (১) যে মশা ম্যালেরিয়ার কারণ তাহার জীবন ইতিহাস লিখ। ৪+(৪)

(২) ম্যালেরিয়া কিভাবে দূরীকরণ করা যায় ? ৩

8. (ক) কিরূপে কর্ডাটা প্রাণী নন্-কর্ডাটা প্রাণী হইতে বিসদৃশ ? প্রত্যেক শ্রেণীর দুইটি বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ নির্দেশ করিয়া মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস কর। প্রত্যেক শ্রেণীর একটি করিয়া যথাযোগ্য উদাহরণ দাও। ২+৫+৩

(খ) সংরক্ষণ কাহাকে বলে ? উহার উদ্দেশ্য কি ? ব্যাঘ্র ও একশৃঙ্গী গণ্ডারের সংরক্ষণের নিমিত্ত যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাদের উল্লেখ কর। ২+২+৬

9. (ক) যে সমস্ত মাছ সচরাচর পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় তাহাদের নাম কর এবং একটির চিত্র অঙ্কন কর। ৫+(৩)

খ) (১) অন্তর্দেশীয় মৎস্য চাষে মাসের পর মাস কি প্রথা অবলম্বন করা হয় ? কতিপয় অতি আধুনিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও। ৫+৩

(২) পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যের পরিমাণ কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় ? ৪

Group C

10. (ক) (১) হয়ত Bacteria-ই জৈব বিবর্তনে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন—এরূপ মনে হওয়ার কারণ কি ? ২

(২) একটি Bacteria কোষের ভিতর কি কি দেখা যায় বিশদভাবে বর্ণনা কর। ৪+(২)

(খ) (১) Bacteriaতে কি কোন প্রকারের যৌনতা দেখা যায় ? ৩+(১)

(২) কয়েকটি উপকারী এবং অপকারী Bacteria-র কথা লিখ। ৪

(৩) ব্যাকটিরিও-ফাজ (Bacteriophage) কি ? ব্যাকটিরিও ফাজের বংশ-বিস্তার কিভাবে হয় ? ৪

11. (ক) পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে বসবাস করিবার নিমিত্ত মটরগাছ কিরূপে অভিযোজিত হইয়াছে তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর। ২½+২½+৫

(খ) পরাগ-সংযোগ কাহাকে বলে ? স্ব-পরাগ যোগের ও ইতর-পরাগ যোগের উৎকর্ষ ও ত্রুটি সম্বন্ধে বিশদভাবে বিচার কর। পতঙ্গ পরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ২+৪+৪

12. (ক) Dryopterys-এর জনুক্রম (alternation of generations) একটি শব্দ চিত্রণের (word diagram) মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ৪+৬

(খ) পরস্পরের মধ্যে বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর ঃ— ২½×৪

(১) রাইজয়েডাল অণুসূত্র ও রাইজয়েড।

(২) মৃদ্‌বর্তী অঙ্কুরোদ্‌গম ও মৃদ্‌ভেদী অঙ্কুরোদ্‌গম।

(৩) প্রোটোপ্লাজম্ ও প্রোটোপ্লাস্ট।

(৪) পুংরেণুপত্র ও স্ত্রীরেণুপত্র।

Group D

13. শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের উল্লেখ কর। ফুসফুসের বায়ু বিভাগ বলিতে কি বুঝ। ভাইট্যাল ক্যাপাসিটির (vital capacity) তাৎপর্য কি? প্রশ্বাস বায়ু, নিঃশ্বাস বায়ু ও বায়ুস্থলীর বায়ুর (alveolar air) অক্সিজেনের শতকরা পরিমাণ কত? ৫+৬+৩+৬

14. (ক) বি. এম. আর. কাহাকে বলে? প্রাপ্তবয়স্ক একজন পুরুষ ও প্রাপ্ত-বয়স্কা একজন মহিলার স্বাভাবিক বি. এম. আর. বিবৃত কর। যে কারণগুলি বি. এম. আর কে প্রভাবান্বিত করে তাহা উল্লেখ কর। ৩+৩+৪

(খ) ট্রফিক হর্মোন ও স্থানীয় হর্মোন কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় হরমোনের নাম লিখ ও তাহাদের কার্যের বিররণ দাও। ৩+৪+৩

15. (ক) পাকস্থলীর রস কি? প্রোটিন খাদ্য পরিপাকের জন্য পাকস্থলীর রসের দুইটি উপাদানের নাম কর। ২+৫

(খ) চর্বি জাতীয় খাদ্যের পাচনক্রিয়া-উদ্ভূত দ্রব্যগুলি কি? পৌষ্টিক নালীর কোন্ অংশে চর্বি জাতীয় খাদ্যের পাচনক্রিয়া-উদ্ভূত দ্রব্যগুলি অবশোষিত (absorbed) হয়? ৪+২

(গ) গ্লুকোজ কি? বিশোষণের পর গ্লুকোজ কিরূপে যকৃতে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়। ২+৫

1983

Group A

. (a) চিত্র সহযোগে রবার্টসনের একক পর্দার গঠন বর্ণনা কর।

(b) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে মাইটোকনড্রিয়ার সচিত্র গঠন বর্ণনা করিয়া উহার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ উল্লেখ কর।

(c) অর্ধভেদ্য পর্দা কাহাকে বলে? ইহার সহিত পছন্দযুক্ত ভেদ্য পর্দার পার্থক্য কি?

৬+৮+৬=২০

2. (a) সালোকসংশ্লেষের আলোক ও অন্ধকার বিক্রিয়া বলিতে কি বুঝ? আলোক বিক্রিয়ায় অন্তিম পদার্থ কি কি? প্রথম রঞ্জক তন্ত্র (PS-I) ও দ্বিতীয় রঞ্জক তন্ত্রের (PS-II) প্রধান প্রধান বিক্রিয়াগুলি সরল চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। স্বভোজী ব্যাকটিরিয়া কি সালোকসংশ্লেষের উপজাত পদার্থ হিসাবে অক্সিজেন ত্যাগ করে? কারণ দর্শাও। ২+২+৬+২=১২

(b) নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ— ২×৪=৮

(i) ক্লোরোপ্লাস্টের কোথায় ক্লোরোফিল অণুগুলি ঘনীভূত থাকে ?

(ii) ক্লোরোফিল a অণুর সাংকেতিক গঠন উল্লেখ কর এবং ইহার সহিত ক্লোরোফিল b অণুর পার্থক্য নির্দেশ কর।

(iii) ক্লোরোবিয়াম ক্লোরোফিল কি ? ইহা কোথায় দেখা যায় ?

(iv) ক্যারাটিনয়েডের কাজ কি কি ?

3. (a) দ্বিসংকর জনন কি ? মেণ্ডেলের স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্রটি ব্যাখ্যা কর। ২+৬=৮

(b) Aa এবং Bb হইল দুই জোড়া অ্যালীল। A, a এর উপর প্রকট এবং B, b এর উপর প্রকট। মিয়োসিসের প্রথম ও দ্বিতীয় অ্যানাফেজের চিত্র (Sketch) অঙ্কন কর ও নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রের জননকোষগুলির জিন ঘটিত সংযুতি উল্লেখ কর। ধর যে Aa ও Bb অ্যালীল। ৩×৩=৯

(i) বিভিন্ন সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়ায় বাহিত হয় $\left(\frac{A}{a}\text{ ও }\frac{B}{b}\right)$।

(ii) একই সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়ায় বাহিত হয় $\left(\frac{AB}{ab}\right)$ এবং Aa ও Bb-র মধ্যে ক্রসিং-ওভার ঘটে।

(iii) একই সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়ায় বাহিত হয় $\left(\frac{AB}{ab}\right)$ কিন্তু Aa ও Bb-র মধ্যে ক্রসিং-ওভার ঘটে না।

[কেবল চিত্রের রূপরেখা (Sketch drawing) অঙ্কন কর।]

(iii) উপরি-উক্ত চিত্রগুলি হইতে কোনটি মেণ্ডেলের স্বাধীন সঞ্চারণসূত্র মানিয়া চলে ? তাহার কারণ উল্লেখ কর। ২+১=৩

4. (a)(i) উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত নাইট্রোজেনের বিভিন্ন উৎসগুলি কি কি ? ৩

(ii) উদ্ভিদের বিপাকীয় কার্যে ইহার ভূমিকা কি ? ৩

(b)(i) নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ কাহাকে বলে ? দুইটি নাইট্রোজেন স্থিতিকারী ব্যাকটিরিয়ার নাম কর। ৩+২=৫

(ii) মৃত্তিকা কিভাবে ব্যাকটিরিয়া হইতে নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ সংগ্রহ করে ? ৪

(iii) কিভাবে এক শ্রেণীর উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে স্থিতিকরণ করে এবং মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি করে ? ৩+২=৫

5. (a) নিম্নলিখিত শব্দ বা নামগুলি কিভাবে জীববিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ কর। ২½×৪=১০

(i) NADP (ii) HMS বিগল (iii) ক্রসিং-ওভার (iv) গ্যালাপ্যাগোজ দ্বীপপুঞ্জ।

(b) হর্মোনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। অক্সিন কিভাবে সংশ্লেষিত হয় ? কোথা হইতে STH নিঃসৃত হয় ? STH-এর প্রধান প্রধান কার্যউল্লেখ কর।

৩+৩+১+৩=১০

6. (a) (i) ইকোসিস্টেমের উপাদানগুলির নাম কি ? ৩

(ii) ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহের প্রকৃতি উল্লেখ কর। ৪

(iii) সঞ্চয় ভাণ্ডার ও চক্রাবর্তিত ভাণ্ডার বলিতে কি বুঝ ? ৩

(b)(i) কার্বন ও ফসফরাসের সঞ্চয় ভাণ্ডার কি কি ? ২

(ii) ইকোসিস্টেমের ফসফরাস চক্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

Group B

7. (a)(i) গিনিপিগের স্তন্যপায়ীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ৪

(ii) গিনিপিগ যে শাকাশী তাহা কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য হইতে বুঝা যায় ? ৪

(iii) কোপ্রোফ্যাগি কি ? ২

7. (b) (i) পোর্টাল তন্ত্র কাহাকে বলে ? ৩

(ii) গিনিপিগের পোর্টাল তন্ত্রের বর্ণনা দাও। ৪

(iii) ধমনী ও শিরার পার্থক্য উল্লেখ কর। ৩

8. (a) মেজর ও মাইনর পেস্টের পার্থক্য কি ? ২

(b) পশ্চিমবঙ্গের দুইটি মেজর ও দুইটি মাইনর পেস্টের বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখ। ৪

(c) আমাদের রাজ্যে কিভাবে দুইটি মেজর পেস্ট ধানের ক্ষতিসাধন করে ? ৪

(d) ইহাদের নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ কর। ৪

9. (a) প্যারাজোয়া ও এণ্টারোজোয়ার পার্থক্য কি ? ৪

(b) ব্যাঙাচি ও মাছকে কিভাবে সনাক্ত করিবে ? ৩

(c) হাইপোফাইসেশান কি ? ৩

(d) হাইপোফাইসেশান পদ্ধতির সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা কর। ৩

(e) রেশম উৎপাদনকারী মথের নাম লিখ। ১

(f) রেশম গ্রন্থির বর্ণনা দাও। ৩

(g) রেশম মথের রোগ, উহার কারণ ও লক্ষণগুলি আলোচনা কর। ৪

Group C

10. (a) ভাইরাস কে আবিষ্কার করেন ? কোন্ ভাইরাস প্রথম আবিষ্কৃত হয় ? একটি সংবেদনশীল *E. coli* ব্যাকটিরিয়া নির্দিষ্ট ক্ষতিকারক (Virulent) ব্যাকটিরিওফাজযুক্ত অনুশীলন মাধ্যমে বৃদ্ধি লাভ করিলে কি ঘটিবে ? এই পদ্ধতির ধাপগুলির কথাচিত্র (Word-diagram) সহযোগে অংকন কর। ১+১+৫+৩=১০

(b) (i) ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাকের ক্রোমোজোম, সাইপ্লাজমীয় অঙ্গাণু ও কোষপ্রাচীরের পার্থক্য উল্লেখ কর। ৩×১=3

(ii) একটি খাদ্যোপযোগী ছত্রাকের নাম লিখ।

(iii) গ্রাম পজিটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ার দুইটি পার্থক্য লিখ। ৩

(iv) খাদ্য প্রস্তুতে, শিল্পে, নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে ও ঔষধ তৈয়ারিতে কিভাবে ব্যাকটিরিয়া উপকার করে তাহার একটি করিয়া উদাহরণ দাও। ১×৪=৪

[শুধুমাত্র গুণগত নাম উল্লেখ করিতে হইবে]

11. (i) স্পোরোফাইট কাহাকে বলে? পোগোনেটাম ও ড্রায়োপটেরিসের স্পোরোফাইটের পার্থক্য উল্লেখ কর। উদ্ভিদরাজ্যের কোন্‌ কোন্‌ বিভাগের ইহারা অন্তর্ভুক্ত? ২+৫+১=৮

(ii) উল্লিখিত দুইটি উদ্ভিদের মধ্যে কোন্‌টি বেশী উন্নত? উত্তরের স্বপক্ষে তোমার কারণ দর্শাও। ২+৪=৬

12. (a) উদ্ভিদের কলাতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও। উদাহরণ ও চিত্র সহযোগে উদ্ভিদের নালিকাবাণ্ডিলের শ্রেণীবিভাগ কর। ২+৪+৪+৪=১২

(b) পার্থক্য লিখ ঃ— ২×৪=৮

(i) সহবাসী ও ভিন্নবাসী উদ্ভিদ, (ii) সস্যল ও অসস্যল বীজ, (iii) হাইপোগাইনাস ও পেরিগাইনাস ফুল, (iv) মটর ও ধানগাছের ফল। প্রয়োজন অনুসারে উদাহরণ দাও।

Group D

13. (a) (i) মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শ্বসন পদ্ধতি উল্লেখ কর। ৫+৩=৮

(ii) চিত্র সহযোগে ডিম্বাশয়ের কলাস্থান উল্লেখ কর। ডিম্বাশয় হইতে নিঃসৃত হর্মোনগুলির নাম কর। ৪

(b) (i) নেফ্রনের গঠনগত বৈশিষ্ট্য কিভাবে মূত্র তৈয়ারিতে সাহায্য করে? ৫

(ii) শ্বেত রক্তকণিকার বিভিন্ন প্রকার ভাগ উল্লেখ করিয়া উহাদের কাজ লিপিবদ্ধ কর। ৩

14. (a) (i) প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সংজ্ঞা দাও। (ii) প্রতিবর্ত চাপ কয়প্রকার ও কি কি? (iii) প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? (iv) প্রান্তফলক বিভব বলিতে কি বুঝ? ২+২+৬+১+৩=১৪

(b) (i) মানুষের পৌষ্টিক নালীতে অবস্থিত প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচকগুলির নাম কর। ৩

(ii) অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড বলিতে কি বুঝ? তাহাদের নাম উল্লেখ কর। ৩

15. (a) (i) পেশী সংকোচনের সময় রাসায়নিক ও উষ্ণতাজনিত পরিবর্তনগুলি উল্লেখ কর। ৬

(b) (i) ডাইপেপটাইডেজ ও আর্জিনেজের কার্য উল্লেখ কর। TCA চক্রে অবস্থিত ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিডগুলির নাম লিখ। ২+২+৩=৭

(ii) হার্দউৎপাদ বলিতে কি বুঝ? ৩

(c) একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের দৈনিক মূত্র উৎপাদনের গড় কত? স্বাভাবিক মূত্রে প্রোটিন ও গ্লুকোজ থাকে না কেন? ১+৩=৪

1984

Group A

[1নং প্রশ্ন এবং অবশিষ্ট হইতে যে কোনও তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও ।]

1. (a) প্রোটোপ্লাজমের দুই প্রকার অত্যাবশ্যকীয় ক্ষরণ পদার্থের নাম লিখ । ২

(b) প্রোক্যারিওটিক কোষের দুইটি উদাহরণ দাও । ২

(c) হলোক্রাইন গ্রন্থি বলিতে কি বুঝ ? ২

(d) ব্যাপন এবং সক্রিয় পরিবহণের পার্থক্য কি ? ২

(e) বাস্তুসংস্থানগত শিখর (ecological pyramid) বলিতে কি জান ? ২

(f) কে প্রথম সজীব কোষে মাইটোকনড্রিয়ার উপস্থিতি প্রমাণ করেন এবং শ্বসনকালে উহার কার্যের বিবরণ দাও । ২

(g) হিউমাস (humus) কি এবং গাছের পক্ষে উহার তাৎপর্য বল । ২

(h) প্রচ্ছন্ন ও প্রকট জীনের পার্থক্য বুঝাও । ২

(i) আবরণী ও যোগ কলার পার্থক্য বুঝাও । ২

(j) একটি প্রধান উদ্ভিদ হর্মোন ও একটি প্রধান প্রাণী হর্মোন-এর নাম কর ।

2. (a) কোষ আবরণীর ভেদ্যতা যে শর্তাবলীর উপর নির্ভরশীল তাহা আলোচনা কর । ৫

(b) মনুষ্য রক্তের বিভিন্ন শ্বেত কণিকার বিশিষ্ট লক্ষণগুলির উল্লেখ কর । ৫

(c) মানুষের রক্তের শ্রেণীবিভাগের (blood grouping) ভিত্তি বর্ণনা কর । ৫

(d) গাছ কিভাবে খনিজ লবণ (mineral salt) শোষণ করে তাহার বর্ণনা দাও । ৫

3. (a) সালোকসংশ্লেষের গতি নির্ধারক বিভিন্ন শর্তের (factors) সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর । ৫

(b) নাইট্রোজেন চক্র কি ? ৫

(c) ভূমি অবক্ষয় (erosion) কিভাবে বন্ধ করা যায় তাহা লিখ । ৫

(d) একটি প্রাণিকোষের মাইটোটিক মেটাফেজ অবস্থার চিত্র অঙ্কন কর । ৫

4. (a) অধিকাংশ গাছের পাতার সবুজ বর্ণের তাৎপর্য প্রতিপন্ন কর । ৫

(b) লামার্কের অভিব্যক্তির তত্ত্ব সংক্ষেপে বল ।

(c) যৌন সন্নিবদ্ধ প্রচ্ছন্ন জীন C এবং তাহার স্বাভাবিক অ্যালীল C^+ হইলে মানুষের লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা দেখা যায় । মাতা বর্ণান্ধবিশিষ্ট কোন স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের একটি ছেলে আছে । পিতার বর্ণবিষয়ক ফিনোটাইপ (colour-vision phenotype) জানা নাই । ছেলের বর্ণান্ধতার সম্ভাবনা কি ? ৫

(d) উদাহরণ সহযোগে ফটোট্রপিক ও ফটোন্যাস্টিক চলনের পার্থক্য নির্ণয় কর । ৫

5. (a) বংশগতি সম্বন্ধে মেণ্ডেলের সূত্রগুলি বল । ৫

(b) সমসংস্থ অঙ্গ কি ? ইহা কি ভাবে অভিব্যক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ দেয় ? ৫

(c) ইকোসিস্টেমে 'শক্তি-প্রবাহ' বর্ণনা কর । ৫

(d) গাছের বিপাক কার্যের মাইক্রো উপাদানগুলির বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। ৫

Group B

৬নং প্রশ্ন এবং অবশিষ্ট হইতে যে কোনও একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

6. (a) সর্বপ্রথম কোন্ ভাইরাস আবিষ্কৃত হয় এবং কে উহা আবিষ্কার করেন ? ২

(b) জাইলেম ও ফ্লোয়েমের প্রভেদ লিখ। ২

(c) স্বপরাগ যোগ ও ইতরপরাগ যোগের পার্থক্য কি ? ২

(d) সময়ে সময়ে বৃক্ষ পাতা ঝরাইয়া দিয়া কি ভাবে উপকৃত হয় ? ২

(e) একলিঙ্গ ফুল কি ? ২

(f) কাণ্ড ও মূলের আভ্যন্তরীণ পার্থক্যগুলি বল। ২

(g) মূলত্রের কার্যগুলি লিখ।

(h) দুইটি স্বাধীনজীবী নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটিরিয়ার নাম কর। ২

(i) কোলেনকাইমা কলার বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা দাও। গাছের কোন্ অঙ্গে এই কলা থাকে না ? ২

(j) পোগোনেটামের রাইজয়েডের কার্য কি ? ২

7. (a) স্পোরের সাহায্যে মিউকরের কি ভাবে বংশ বিস্তার হয় লিখ। ৫

(b) অধিকাংশ দ্বিবীজপত্রীর মধ্যে জোড়কলম সবচেয়ে বেশি সফল হয়, একবীজপত্রীর মধ্যে নয় কেন ? ৫

(c) ক্যাম্বিয়াম কি ? ইহাদের কার্যাবলী কি কি ? ৫

(d) মটর এবং ধানগাছে ফুলের পরাগযোগের বাহকদের নাম কর এবং ঐ ফুলগুলির পরাগযোগের জন্য কি ধরনের অভিযোজন পরিলক্ষিত হয় তাহার বর্ণনা দাও। ৫

8. (a) সংক্ষেপে বায়বীয় পরিবর্তিত কাণ্ডগুলির বর্ণনা কর। ৫

(b) শৈবাল এবং ছত্রাকের মধ্যে প্রভেদগুলির উল্লেখ কর। ৫

(c) একটি আদর্শ পুষ্পের প্রয়োজনীয় আবর্তগুলি বর্ণনা কর। ৫

(d) প্রকৃত ফল ও অপ্রকৃত ফলের পার্থক্য লিখ এবং উদাহরণ দাও। ৫

Group C

৭নং প্রশ্ন এবং অবশিষ্ট হইতে যে কোনও একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

9. (a) গিনিপিগ জলে বাস করার অনুপযুক্ত কেন ? ইহার দুইটি কারণ দাও। ২

(b) দুইটি স্তন্যপায়ীর নাম লিখ, যাহারা ডিম পাড়ে। ২

(c) টিনিয়াতে চোষক ও ফ্লেম কোষের কাজ কি ? ২

(d) পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর এওর্টিক মহাধমনীর পার্থক্য কি ? ২

(e) গিনিপিগের অর্ধচন্দ্রাকার নালীসমূহের কাজ কি ? ২

(f) শ্লীপদ (filaria) সৃষ্টিকারী পরজীবীর বিজ্ঞানসম্মত নাম লিখ এবং উহার পর্বের উল্লেখ কর। ২

(g) গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্রগুলি কি ? ২

(h) সেরিকালচার কি ? ২

(i) কর্ডাটা ও নন্‌কর্ডাটার পার্থক্য লিখ। ২

(j) নোটোকর্ড ও নার্ভকর্ডের পার্থক্য কি ? ২

10. (a) 'ম্যালেরিয়া'-র আক্ষরিক মানে কি ? মানুষকে সংক্রামিত করে এমন চারিটি ম্যালেরিয়া পরজীবী প্রজাতির নাম কর। ৫

(b) সিলোমাটা ও সিলেণ্টেরাটা-র মধ্যে বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্য লিখ। ৫

(c) গিনিপিগের সমবেদী ও পরাসমবেদী নার্ভতন্ত্রের কার্যকারিতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ৫

(d) ধান গাছ রক্ষার উপায় হিসাবে সিষ্টেমিক ইনসেক্টিসাইড ও কণ্ট্যাক্ট ইনসেক্টিসাইডের ভূমিকা আলোচনা কর। ৫

11. (a) ফিতাকৃমির পরজৈবিক জীবনযাপনের বিভিন্ন অভিযোজনের বর্ণনা দাও। ৫

(b) গিনিপিগের হৃদ্‌পিণ্ডের অন্তর্গঠন বর্ণনা কর ও উহার মধ্যস্থ কপাটিকার গুরুত্ব উল্লেখ কর। ৫

(c) কিভাবে কোকুন তৈয়ারি হয় এবং রেশম সংগ্রহ হয় লিখ। ৫

(d) অ্যানথ্রোপোডা পর্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ কর। ৫

Group D

12নং প্রশ্ন এবং অবশিষ্ট হইতে যে কোনও একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

12. (a) সমদৈর্ঘ্য পেশী সঙ্কোচন কি ?

(b) বায়ুথলীয় বায়ুর স্বাভাবিক উপাদানগুলি লিখ। ২

(c) ফ্যাগোসাইটোসিস কি ? ২

(d) বহিঃক্ষরা ও অ্যাপোক্রিন গ্রন্থির পার্থক্য লিখ। ২

(e) লাইসোজোম ও লাইসোজাইমের পার্থক্য কি ? ২

(f) লাংগারহান্‌স্‌-বর্ণিত কোষদ্বীপ হইতে কি কি হর্মোন নিঃসৃত হয় ?

(g) গ্লুকোনিওজেনেসিস্‌ কি ? ২

(h) মৌল-বিপাক-হার বলিতে কি বুঝ ? ২

(i) হৃদ্‌-উৎপাদ কি ? ২

(j) প্রান্ত-সন্নিকর্ষ কি লিখ। ২

13. (a) চারিটি অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড-এর নাম লিখ ও তাহাদের উৎসগুলির উল্লেখ কর। ৫

(b) 'নাইট্রোজেন-সাম্য' কি ? ৫

(c) শুক্রাশয়ের আণুবীক্ষণিক গঠন বর্ণনা কর। ৫

(d) রেচনে ত্বকের ভূমিকা লিখ। ৫

14. (a একটি নেফ্রনের চিত্র অঙ্কন কর এবং উহার অংশগুলি চিহ্নিত কর। ৫

(b) সংক্ষেপে উজেনেসিসের (Oogenesis) বর্ণনা দাও। ৫

(c) মানবদেহে রক্তের কার্যগুলি আলোচনা কর। ৫

(d) প্রতিবর্ত ক্রিয়া কি তাহা লিখ এবং একটি প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের প্রধান অংশগুলি বর্ণনা কর। ৫

1985

(সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।)

[দক্ষিণ প্রান্তস্থ অঙ্কগুলি প্রতি প্রশ্নের মান-নির্দেশক।]

1. (ক) অভিস্রবণ ও ব্যাপন ক্রিয়ার পার্থক্য কি ? ২

(খ) ক্লোরোফিল অণু ক্লোরোপ্লাসটিডের কোথায় ঘনীভূত থাকে ? ২

(গ) লিঙ্গ সংযোজিত জিন কি ?

(ঘ) অ্যাপো-এন্‌জাইম, কো-এন্‌জাইম এবং আইসো-এন্‌জাইম কাহাকে বলে ? ২

(ঙ) একটি পূর্ণগঠিত নিউক্লিয়াসের প্রতিটি অংশের নাম লিখ। ২

(চ) ইকো-সিস্টেমে বিয়োজকের ভূমিকা লিখ। ২

(ছ) শরীরবৃত্তিয় শুষ্কমৃত্তিকা কি ? ২

(জ) DNA-এর অন্তর্গত নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারকগুলির (nitrogenous bases) নাম কর। ২

(ঝ) মৃত্তিকাস্থিত অ্যামোনিয়া হইতে নাইট্রাইটে পরিবর্তনকারী ব্যাকটিরিয়ার নাম কর। ২

(ঞ) যে উদ্ভিদের হ্যাপ্‌টোনাস্টিক (haptonastic) চলন ঘটে তাহার নাম কর। ২

2. (ক) মেণ্ডেলের উত্তরলব্ধিতে বৈশিষ্ট্যের স্বাধীন বিন্যাস কি বুঝাইয়া বল। ৫

(খ) পরিবেশ দূষণ বলিতে কি বুঝ ? গঙ্গার জল কি কি মূল পদার্থ দ্বারা দূষিত হয় ? ৫

(গ) কোষ বিভাজনকালে স্থিরদশার গুরুত্ব কি ? ৫

(ঘ) কিভাবে প্রমাণ করিবে যে জল-ই সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন অক্সিজেনের উৎস ? ৫

3. (ক) সালোকসংশ্লেষের নিয়ন্ত্রণকারী শর্তসমূহের বিবরণ দাও। ৫

(খ) প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক কোষের মধ্যে গঠন-পার্থক্য কি ? ৫

(গ) উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন রেচনজাত পদার্থগুলির নাম লিখ ও তাহাদের ব্যবহার উল্লেখ কর। ৫

ঘ) ইকোসিস্টেম কাহাকে বলে ? ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। ৫

4. (ক) প্রাণীর ও উদ্ভিদের দুইটি আত্মরক্ষামূলক অভিযোজন বর্ণনা কর। ৫

(খ) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। ৫

(গ) জীববিজ্ঞানে শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর এবং ইহার সহিত নামকরণের ভূমিকা আলোচনা কর। ৫

(ঘ) মানুষের বাদামী চোখ (B) প্রকট (dominant) এবং নীল চোখ (b) প্রচ্ছন্ন (recessive) চরিত্র; চুলের কালো রং (R) প্রকট এবং লালচে-বাদামী (r) প্রচ্ছন্ন। একটি পুরুষ যাহার চোখ বাদামী ও চুল লালচে-বাদামী, নীল চোখ ও কালো চুল আছে এমন মহিলাকে বিবাহ করেন এবং তাহাদের দুইটি সন্তান হয়, সন্তান দুইটির মধ্যে একটির বাদামী চোখ ও লালচে-বাদামী চুল এবং অন্যটির চোখ নীল ও চুলের রং কালো। পিতামাতা ও সন্তান দুইটির জিনোটাইপ (genotype) নির্ণয় কর।

5. (ক) রাইজোপ্লাস্ট (rhizoplast) কাহাকে বলে এবং কোথায় ইহা পাওয়া যায়? ২

(খ) বায়ুপরাগী পুষ্পের বৈশিষ্টগুলির বর্ণনা দাও। ২

(গ) পোরোগ্যামি (porogamy) এবং চ্যালাজোগ্যামি (chalazogamy) কাহাকে বলে? ২

(ঘ) বিভিন্ন সমকেন্দ্রীয় নালিকাবাণ্ডিলের নাম কর। ইহাদের কোথায় পাওয়া যায়? ২

(ঙ) কলেরা ও টাইফয়েড সৃষ্টিকারী ব্যাক্‌টিরিয়ার নাম কর। ২

(চ) মাইক্রোস্পোরোফিল্ এবং মেগাস্পোরোফিলের পার্থক্য কি? ২

(ছ) গুচ্ছিত ফল ও যৌগিক ফলের পার্থক্য কি? ২

(জ) পর্ণবৃন্ত (phyllode) ও পর্ণকাণ্ডের (phylloclade) পার্থক্য লিখ।

(ঝ) যুক্তগর্ভপত্রী (syncarpus) এবং মুক্তগর্ভপত্রী (apocarpus) স্ত্রীস্তবকের পার্থক্য লিখ। ২

(ঞ) অক্ষীয় (axial) ও প্রান্তীয় (marginal) অমরাবিন্যাসের (placentation) পার্থক্য কি? ২

6. (ক) দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের বহিরাকৃতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৫

(খ) স্ব-পরাগযোগের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি? ৫

(গ) পাইনাসের স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদের ক্রমশ গঠন পদ্ধতির বর্ণনা দাও। ৫

(ঘ) ব্রায়োফাইটা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য লিখ। ৫

7. (ক) এপিফাইসিস ও হাইপোফাইসিস কি? ২

(খ) টিউব ফুট (tubefcot) ও কোম্ব প্লেট (combplate) কি? ২

(গ) মুখ্য পোষক (primary host) ও গৌণ পোষক (secondary host) কাহাদের বলা হয়? ২

(ঘ) কোন্‌ কোন্‌ চরিত্রলক্ষণ নির্দেশ করে যে গিনিপিগ্‌ শাকাহারী ? ২

(ঙ) শিরা ও ধমনীর পার্থক্য নির্দেশ কর। ২

(চ) মেজর (**major**) এবং মাইনর (**minor**) পেষ্টের (**pest**) পার্থক্য কি ? ২

(ছ) প্যারাজোয়া (**parazoa**) এবং এন্টারোজোয়ার (**enterozoa**) পার্থক্য কি ? ২

(জ) তোমাকে একটি ব্যাঙাচি এবং একটি ছোট মাছের চারা দেওয়া হইল ; তুমি কি করিয়া উহাদের সনাক্ত করিবে ? ২

(ঝ) টিনিয়ার চোষক (**sucker**) ও ফ্লেমকোষের (**flame cell**) কাজ কি ? ২

(ঞ) নোটোকর্ড ও নার্ভকর্ডের পার্থক্য লিখ। ২

8. (ক) মৎস্যচাষে হাইপোফাইজেশান (**hypophysation**) পদ্ধতি বর্ণনা কর এবং ইহার উপকারিতা নির্দেশ কর। ৫

(খ) গিনিপিগের চক্ষুর অন্তর্গঠনের একটি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর। ৫

(গ) রেশম (**silk**) উৎপাদক মথ (**moth**) গুলির নাম লিখ। রেশম উৎপাদক মথের রোগসমূহ এবং উহাদের কারণ ও উপসর্গগুলির উল্লেখ কর। ৫

(ঘ) ম্যালেরিয়ার আক্ষরিক অর্থ কি ? মানুষকে সংক্রামিত করে এমন চারিটি ম্যালেরিয়া পরজীবী প্রজাতির নাম কর। ৫

9. (ক) টাইডাল বায়ু (**tidal air**) কি ? ২

(খ) পিনোসাইটোসিস্‌ (**pinocytosis**) বলিতে কি বুঝ ? ২

(গ) স্বেদ (**sweat**) ও সিবামের (**saebum**) মধ্যে পার্থক্য কি ? ২

(ঘ) গ্লাইকোলিসিস্‌ (**glycolysis**) প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পদার্থ (**end-product**) কি ? ২

(ঙ) প্রতিবর্তক্রিয়ার (**reflex action**) বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? ২

(চ) প্রান্তফলকীয় বিভব (**end-plate potential**) বলিতে কি বুঝ ? ২

(ছ) হৃদ্‌উৎপাদ (**cardiac output**) বলিতে কি বুঝ ? ২

(জ) লাইসোজোম ও লাইসোজাইমের পার্থক্য লিখ। ২

(ঝ) মৌল-বিপাক-হার (**basal metabolic rate**) বলিতে কি বুঝায় ? ২

(ঞ) প্রান্ত-সন্নিকর্ষ (**synapse**) কাহাকে বলে ? ২

10. (ক) মানুষের পৌষ্টিক নালীতে দুধের পরিপাক ক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হয় ? ৫

(খ) ডিম্বাশয়ের আণুবীক্ষণিক গঠন চিত্র সহযোগে বর্ণনা কর। ডিম্বাশয়ের হরমোনগুলির নাম লিখ। ৫

(গ) রক্তের শ্বেতকণিকা কত প্রকারের ? মনুষ্যদেহে তাহাদের কার্যের উল্লেখ কর। ৫

(ঘ) নাইট্রোজেন-সাম্য (**nitrogen balance**) কি ? ৫

বংশগতি সম্পর্কীয় কতিপয় প্রশ্নের সমাধান

1. একটি মানুষের বাদামী চক্ষু (B), নীলচক্ষু (b)-এর উপর প্রকট। একটি বাদামী চক্ষুবিশিষ্ট লোক যদি একটি নীলচক্ষু বিশিষ্ট মহিলাকে বিবাহ করে এবং উহাদের বাদামী চক্ষুবিশিষ্ট ছয়টি সন্তান হয় তবে ঐ পরিবারের সকলের জেনোটাইপগুলি কি কি ?

(H. S.—1980)

উঃ—পিতা প্রকট বৈশিষ্ট্যযুক্ত অর্থাৎ বাদামী চক্ষুযুক্ত সুতরাং উহার জেনোটাইপ BB অথবা Bb হইতে পারে। কিন্তু মাতা প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত অর্থাৎ নীলচক্ষুযুক্ত হওয়ায় উহার জেনোটাইপ সর্বদা bb হইবে।

যেহেতু পিতা-মাতার ছয়টি সন্তান বাদামী চক্ষুবিশিষ্ট সেহেতু উহারা প্রত্যেকে পিতার নিকট হইতে একটি প্রকট জীন 'B' লাভ করিবে। তাই পিতার জেনোটাইপ 'BB' হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। যদি পিতার জেনোটাইপ 'Bb' হয় তাহা হইলে উহাদের অর্ধেক সন্তান বাদামী চক্ষুযুক্ত ও অর্ধেক সন্তান নীলচক্ষুযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সুতরাং, পিতার জেনোটাইপ—BB

মাতার জেনোটাইপ—bb

সন্তানের জেনোটাইপ—Bb

2. (a) একটি বিশুদ্ধ লাল ফুলযুক্ত উদ্ভিদের সহিত বিশুদ্ধ সাদাফুল যুক্ত উদ্ভিদের সংকরায়ণের ফলে যে সকল বীজ উৎপন্ন হইল তাহারা লাল ফুলযুক্ত উদ্ভিদের সৃষ্টি করিল। ইহা হইতে তোমরা কি সিদ্ধান্তে আসিতে পার? শেষোক্ত লালফুলযুক্ত উদ্ভিদকে যদি (i) পরস্পরের সহিত, (ii) সাদা ফুলযুক্ত পিতা-মাতার সহিত, (iii) লালফুলযুক্ত পিতা-মাতার সহিত সংকরায়ণ ঘটানো হয় তাহা হইলে কি ঘটিবে ?

(J. E. E.—1980)

উঃ—যেহেতু F_1-এ উৎপন্ন সকল উদ্ভিদ লাল ফুলযুক্ত, সেহেতু লাল গুণটি প্রকট
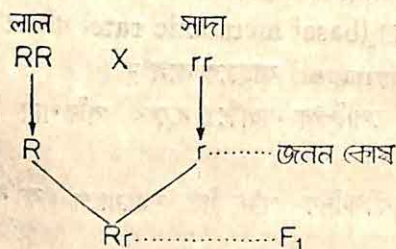
ও সাদা গুণটি প্রচ্ছন্ন। ধর, লালফুলযুক্ত উদ্ভিদের জেনোটাইপ RR এবং সাদা ফুলযুক্ত উদ্ভিদের জেনোটাইপ rr।

(i) F_1 এ উৎপন্ন লালফুলযুক্ত (Rr) উদ্ভিদের পরস্পরের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিলে 1টি বিশুদ্ধ লাল, 2টি সংকর লাল ও 1টি সাদা ফুলযুক্ত উদ্ভিদের সৃষ্টি হইবে। অর্থাৎ, ফেনোটাইপের অনুপাত 3 : 1 ও জেনোটাইপের অনুপাত 1 : 2 : 1.
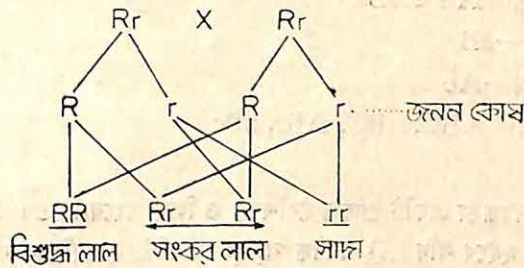
(ii) F_1 এ উৎপন্ন লালফুল যুক্ত (Rr) উদ্ভিদের সহিত সাদাফুল যুক্ত পিতা-মাতার সংকরায়ণ ঘটিলে অর্ধেক সংকর লালফুল এবং অর্ধেক সাদাফুলযুক্ত উদ্ভিদের সৃষ্টি হইবে। অথাৎ ইহাদের ফেনোটাইপ ও জেনোটাইপের অনুপাত 1 ঃ 1.
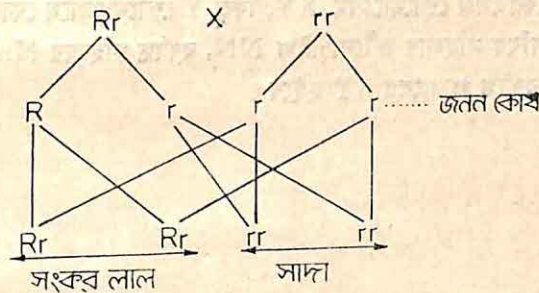
(iii) F_1 এ উৎপন্ন লালফুল যুক্ত (Rr) উদ্ভিদের সহিত লালফুলযুক্ত পিতা-মাতার সংকরায়ণ ঘটিলে সকল উদ্ভিদই লালফুলযুক্ত হইবে। কিন্তু ইহাদের জেনোটাইপের অনুপাত হইবে 1 : 1.
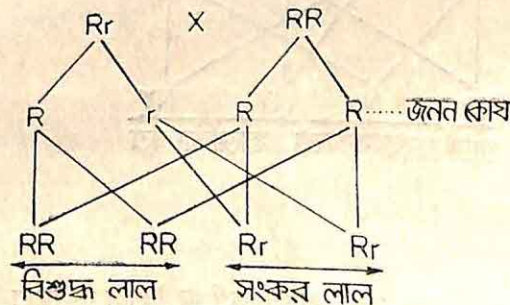
2. (b) নিম্নলিখিত জেনোটাইপযুক্ত উদ্ভিদ হইতে কত প্রকার জননকোষ সৃষ্টি হইতে পারে ?

(i) AaBB, (ii) aaBB, (iii) AAbb, (iv) AaBBCc

(i) দুই প্রকার—AB ও aB

(ii) একপ্রকার—aB

(iii) এক প্রকার—Ab

(iv) চারিপ্রকার—ABC, aBC, ABc, aBc।

3. মানুষের বর্ণান্ধতা একটি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য ও লিঙ্গ সংযোজিত। F_1 জনুতে কি ধরনের সন্তান উৎপন্ন হইবে যদি (i) বর্ণান্ধ পুরুষ একটি স্বাভাবিক মহিলাকে বিয়ে করে ; (ii) স্বাভাবিক পুরুষ বর্ণান্ধ মহিলাকে বিবাহ করে ; (iii) বর্ণান্ধ পুরুষ বর্ণান্ধ মহিলাকে বিবাহ করে। [ধর, স্বাভাবিক দৃষ্টির জন্য প্রকট জীন N ও প্রচ্ছন্ন বর্ণান্ধতার জন্য জীন n] (J E. E.—1981)

উঃ—মহিলার সেক্স ক্রোমোজোম 'XX' এবং দুইটি 'X' ক্রোমোজোমে জীন বিদ্যমান। পুরুষের সেক্স ক্রোমোজোম XY, কিন্তু Y ক্রোমোজোমে কোন জীন থাকে না। সুতরাং স্বাভাবিক মহিলার জীনোটাইপ NN, বর্ণান্ধ মহিলার Nn এবং স্বাভাবিক পুরুষের NY ও বর্ণান্ধ পুরুষের nY হইবে।

(i)

উপরি-উক্ত সংকরায়ণে সকল কন্যা স্বাভাবিক কিন্তু উহারা বর্ণান্ধতা বৈশিষ্ট্যের বাহক (carrier) হইবে ও সকল পুত্র স্বাভাবিক হইবে।

(ii)
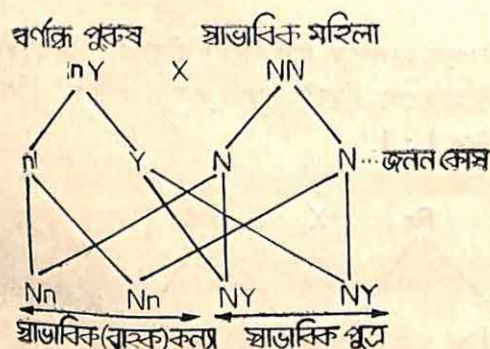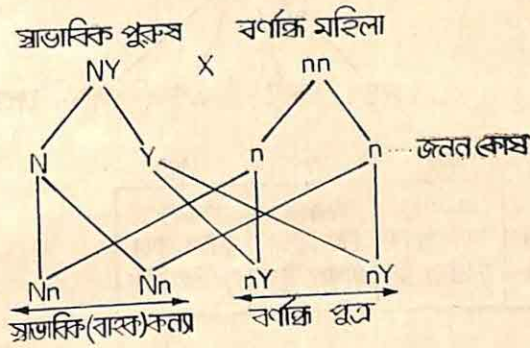
উপরি-উক্ত সংকরায়ণে সকল কন্যা স্বাভাবিক কিন্তু বর্ণান্ধতার বাহক হইবে ও সকল পুত্র বর্ণান্ধ হইবে।

(iii)
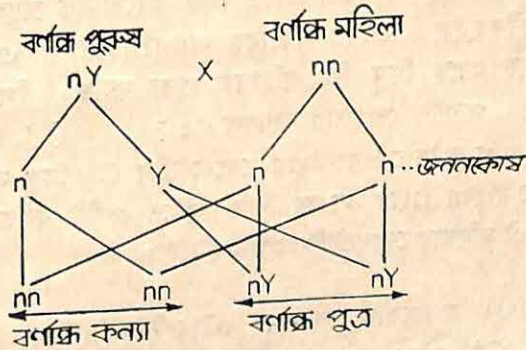
উপরি-উক্ত সংকরায়ণে সকল পুত্র ও কন্যা বর্ণান্ধ হইবে।

4. লালফুল (R) সাদা ফুলের (W) উপর প্রকট এবং মসৃণ বীজ (S) কুঞ্চিত বীজের (C) উপর প্রকট। RRCC ও RWSC উদ্ভিদ দুইটির সংকরায়ণের ফলাফল চেকারবোর্ডের মাধ্যমে দেখাও এবং উৎপন্ন অপত্যের ফিনোটাইপ ও জেনোটাইপের অনুপাত কত? [J. E. E 1982]
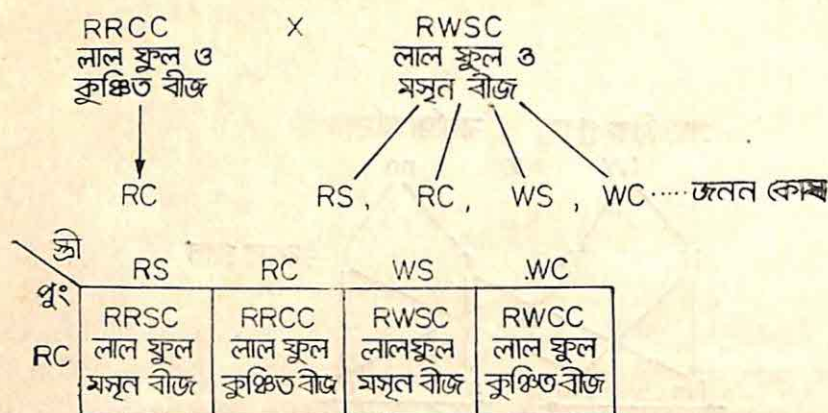
উপরি-উক্ত সংকরায়ণে 1 : 1 অনুপাতে লালফুল ও মসৃণ বীজযুক্ত উদ্ভিদ এবং লাল ফুল ও কুঞ্চিত বীজযুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টি হইবে অর্থাৎ উহাদের ফিনোটাইপের অনুপাত 1 : 1.

জেনোটাইপের অনুপাত হইবে 1RRSC : 1RWSC : 1RRCC : 1RWCC অর্থাৎ 1 : 1 : 1 : 1.

5. মানুষের লাল সবুজ বর্ণান্ধতা একটি লিঙ্গ সংযোজিত প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য এবং উহার জন্য দায়ী জীন হইল C যাহার স্বাভাবিক অ্যালীল C^+। একজন স্বাভাবিক মহিলার একটি পুত্র আছে কিন্তু উক্ত মহিলার মাতা বর্ণান্ধ। পিতার দৃষ্টিশক্তির ফিনোটাইপ অজ্ঞাত। পুত্রটির বর্ণান্ধতার সম্ভাবনা কত ? [J. E. E—1984]

উঃ—মহিলার মাতা বর্ণান্ধ সুতরাং উহার জেনোটাইপ CC কিন্তু মহিলা স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও মহিলা তাহার মাতার নিকট হইতে একটি বর্ণান্ধতার জীন 'C' পাইবে। সুতরাং ঐ মহিলার জেনোটাইপ হইবে CC^+।

উক্ত মহিলার 50% জননকোষ বর্ণান্ধতার (C) জীন যুক্ত এবং 50% জননকোষ স্বাভাবিক জিনযুক্ত (C^+) হইবে। পিতা স্বাভাবিক হইলে উহার জেনোটাইপ C^+Y হইবে এবং বর্ণান্ধ হইলে উহার জেনোটাইপ CY হইবে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই পিতার বর্ণান্ধতার প্রভাব পুত্রের উপর পড়িবে না কারণ প্রত্যেক পুত্র উহার পিতার নিকট হইতে Y ক্রোমোজোম পাইবে যাহার মধ্যে দৃষ্টিশক্তির কোন জীন অনুপস্থিত। সুতরাং মাতার জেনোটাইপের উপর পুত্রের বর্ণান্ধতা নির্ভর করিবে যেহেতু মহিলার 50% জননকোষ বা ডিম্বাণু বর্ণান্ধতার (C) জিনযুক্ত, সেহেতু পুত্রের বর্ণান্ধতা হওয়ার সম্ভাবনা 50% হইবে। নিম্নলিখিত ক্রস হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়।
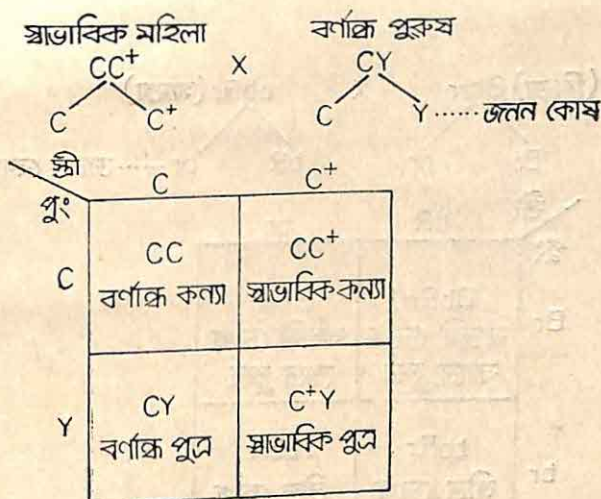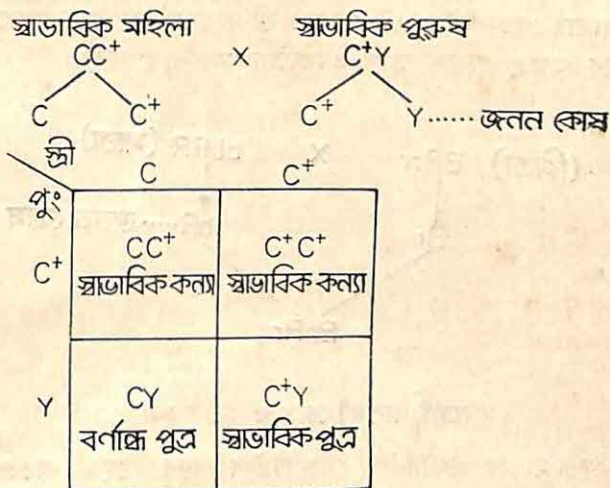
6. মানুষের বাদামী চোখ (B) নীল চোখের (b) উপর প্রকট এবং কালো চুল (R) লাল চুলের (r) উপর প্রকট। একজন বাদামী চোখ ও লাল চুলযুক্ত পুরুষ একজন নীল চোখ ও কালো চুলযুক্ত মহিলাকে বিবাহ করিলে তাহাদের দুইটি সন্তান হইলে তাহাদের মধ্যে একটি ধূসর চোখ ও লাল চুলবিশিষ্ট এবং অপরটি নীল চোখ ও কালো চুল বিশিষ্ট। পিতা-মাতার ও সন্তানের জেনোটাইপ উল্লেখ কর।

[J. E. E.—1985]

উঃ—পিতা বাদামী চোখ ও লাল চুল এবং মাতা নীল চোখ ও কালো চুলযুক্ত হওয়ার উহাদের জেনোটাইপ যথাক্রমে—

(i) BBrr এবং bbRR অথবা (ii) Bbrr এবং bbRr হইতে পারে। যদি পিতা মাতার জেনোটাইপ (i)-এর মত হয় তাহা হইলে সকল সন্তানের জেনোটাইপ Bb Rr হইবে অর্থাৎ বাদামী চোখ ও কালো চুল যুক্ত হইবে।
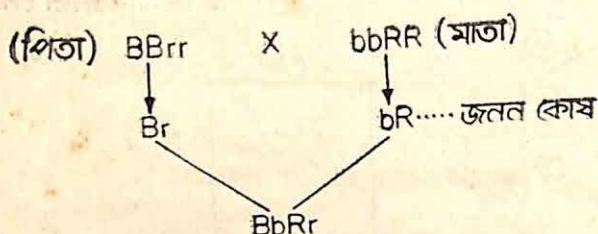
(সকলেই বাদামী চোখ ও কালো চুল যুক্ত)

তাই পিতা-মাতার উপরি-উক্ত জেনোটাইপ সম্ভব নহে। অতএব পিতা-মাতার জেনোটাইপ (ii)-এর মত হইবে এবং তাহাদের সন্তান পিতামাতার ন্যায় বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইবে।

পুং \ স্ত্রী	bR	br
Br	BbRr বাদামী চোখ কালো চুল	Bbrr বাদামী চোখ লাল চুল
br	bbRr নীল চোখ কালো চুল	bbrr নীল চোখ লাল চুল

উপরি-উক্ত ক্রস ও চেকারবোর্ড হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে পিতা, মাতা ও সন্তানের নিম্নলিখিত জেনোটাইপ হইবে।

(1) পিতা—Bbrr
(2) মাতা—bbRr
(3) বাদামী চোখ ও লাল চুল—Bbrr
(4) নীল চোখ ও কালো চুল—bbRr